ভারতী

মাসিক সমালোচনী পত্রিকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ষষ্ঠ খণ্ড।

১৮০৪ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

মূল্য ৩৷৷০ মাশুল সমেত ৪ টাকা।

D. C. M.

সূচীপত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
পুঁথি সংখ্যা :
N 891.4 আ ৮৮

বিষয়			পৃষ্ঠা
অনন্ত মরণ	কবিতা	কবি ...	২৭৯
অভিমানিনী নির্ঝরিণী	"	... ...	৪০৭
অশ্রুজল	"	... ...	৮৯
আমি হারা	"	... ...	২১
ইন্দ্রিয় বিভ্রম		... ...	৩৭
ইবন বতোতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত		...	১২৯, ২১৩
উড়িষ্যার ইতিহাস		... ...	৪৯, ৫৫৩
উপহার	কবিতা	... ...	৩৫৮
কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন		... ..	৯০
কবিতা সাধনা		...	৫৩২
গাথা		... ,, ...	৪৪৬
গান		১৭, ৮৩, ১৬৭, ২০৮, ২০৯, ২৬২, ২৬৪, ৩১৩ ৩৩২, ৩৬০, ৩৯৮, ৪৮৯
ঘুমের ঘোর		... ...	৫৪৭
চণ্ডীদাস, বসন্তরায়, ও বিদ্যাপতি		...	২৯৭
চা-ক্ষেত্রে শিক্ষা নবীশ		... ...	১৪৭, ১৬৬, ২৪৫, ৫২৩
চেঁচিয়ে বলা		... ...	৫১০
টর্কিটো ট্যাসো		... ...	৪৩২
তোমাতে আমাতে		... ...	৫৫২
দার্শনিক শব্দ ও তাহার সহজ অর্থ		...	৪৮৪, ৫০৫
দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ		... ...	২৯
দেবরাণী		... ...	২২৪
দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুকি কবি		...	১৫২, ২০১
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ		...	৩৬১
নীলের বাণিজ্য		... ...	৬৫
নীহারিকা		... ...	৩৪৯
পাণ্ডব বংশ		... ...	৫৩৮
পুন র্মিলনে		... ...	১৪৫, ৫৭৫
পূরবে উঠেছে শশী		... ...	৩০৮
প্রত্যুত্তর		... ...	২৫৭
প্রভাত উৎসব		... ...	৪২১
প্রলয়		... ...	২৯১
প্রলয়ের ধুমকেতু		... ...	১১০
প্রাকৃতিক শক্তি		... ...	৫৯১
প্রেম গীতি		... ...	৫২১

বিষয়			পৃষ্ঠা।
ফাহিয়ানের তীর্থযাত্রা	...	...	৫৬১
ফুলের মালা	...	...	৩৮১, ৪৪৯, ৪৮৯, ৫৪২, ৫৬৫
বঙ্গীয় সেন রাজবংশ	...	...	৩৬৯, ৪২৩
বসন্ত রায়	...	...	১৭০
বিজ্ঞতা	...	...	৮৪
বিজ্ঞান শিক্ষা	...	...	১৯৩
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	...	২৪
বীজ নির্ব্বাচন	...	...	২০৯
বৌঠাকুরাণীর হাট	...	...	১৯, ৬৯, ১১৭, ১৭৮, ২৪৯, ২৭৫
ভারতবর্ষীয় খনিজ পদার্থ	...	...	৩৪৩
মনোবৃত্তির সহিত মস্তিকের সম্বন্ধ		...	২১৮
মালয়দ্বীপ পুঞ্জে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার		...	৫১৭
মায়াদেবী		...	১৬১
মিসর সমর	...	...	৪৭৫
মিসর যুদ্ধ ও আরবী পাশা	...	...	৫৭৮
মেঘনাদ বধ কাব্য	...	...	২৩৪, ২৬৫
যমের কুকুর		...	১৭
যাত্রা	...	...	৯৭
যাত্রা অবসান	...	...	৪৮২
যোগতত্ত্ব	..	...	৬০, ৩৯১
রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি	...	...	৩৫১, ৩৬৪
রুশীয় নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়	...	...	৭৮, ৩৩২
লিপি প্রচার	...	...	১৩৮
লোক সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি	...	...	১০৫
শরৎ কাল	...	...	৩২৮
শ্রীহট্টের তাম্রফলক	...	...	১
সন্ধ্যাস্বপ্ন	...	...	৩১২
সন্ন্যাসীর জীবন	...	...	৪৬৯, ৫২৬, ৫৮৫
সম্পাদকের বৈঠক	...	...	৪৩, ১৫৭, ৩০৯, ৪৯৮, ৫৪৮, ৫৯৬
সেলিবিস দ্বীপ	...	...	২৪০
স্বাধীন জীবিকা	...	...	৩১৩, ৩৯৮, ৪০৯,
স্বাধীন জীবিকার একটি উপায়		...	২২৬
স্বাধীনবৃত্তি	...	...	৪৫৭
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	...	...	৪৫, ১৬৯, ২১১, ২৬৩, ৫০৩, ৫৯৯।

ভারতী।

শ্রীহট্টের তাম্রফলক।

ও

কাছাড় রাজবংশাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তন্ত্রের মতে জয়ন্তীয়া একটী পীঠস্থান। এই স্থানে ভগবতীর বামজঙ্ঘা পতিত হইয়াছিল। "জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘাঞ্চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।"

খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে "রাজমালায়" জয়ন্তীয়া রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরেশ্বর "বিষম-সমর-বিজয়ী" মহারাজ বিজয়মাণিক্য দেব জয়ন্তীয়া রাজ্য হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলমানগণ যদিচ শ্রীহট্ট অধিকার করিয়াছিল তথাপি তাহারা জয়ন্তীয়া রাজ্যের নামলোপ করিতে পারে নাই। সুবিখ্যাত ব্লকমান সাহেব মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত যে কয়েকটী স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, জয়ন্তীয়া তাহার অন্যতম। (১)

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে "জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়" নামক একখানা বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই প্রথম "ভূগোল" ও "জ্যোতিষ"। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে এই গ্রন্থ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজ্য সমূহের তালিকায়—সেই গ্রন্থে—লিখিত রহিয়াছে——

"জয়ন্তীপুর—শ্রীহট্টের উত্তরে দশ ক্রোশ জয়ন্তীপুর নামে ক্ষুদ্র দেশ সে হিন্দুদের প্রাচীন দেশ সে স্বরাজাধীন তাহার রাজধানী জয়ন্তীপুর।

চড়াপুঞ্জির এসিষ্টেণ্ট কমিসনর মৃত হেরি ইংলিশ সাহেবের যত্নে ভারতের একটী প্রাচীন রাজবংশ হৃতসর্ব্বস্ব হই-

১ And the neighbouring countries to the east were Tiparah, kachar (the old Hirumba) the territories of the independent Rajas of the Jaintiah, Khasiah and Garo Hills, &c. (Blochmann's History and Geography of Bengal) J. A. S. B. XLII. 1. 235.

য়াছে। প্রবন্ধলেখকের পিতৃস্বসাপতি ৺ বাবু রামশরণ দত্ত উক্ত সাহেবের আপিসে সেরেস্তাদার ও পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সিংহ মহোদয় সেই সাহেবের অধীনে "জেইলরের" কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের দ্বারা অবগত হইয়াছি যে হেরি ইংলিশ সাহেব চক্রান্ত করিয়া তাহার অনুগত দুই ব্যক্তি দ্বারা জয়ন্তীয়াপতির বিরুদ্ধে নরবলির অভিযোগ উপস্থিত করাইয়াছিলেন। তৎপরে সৈনিক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী ও উক্ত হেরি ইংলিশ এবং তাহার সুযোগ্য সেরেস্তাদার বাবু রামশরণ দত্ত জয়ন্তীয়া রাজধানীতে (অন্য কার্য্যের ভান করিয়া) উপস্থিত হইলেন। কৌশল ক্রমে প্রথমতঃ তাহাকে নিরস্ত্র তৎপরে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শ্রীহট্টে প্রেরণ করা হইল। জয়ন্তীয়ানাথ রাজ্যচ্যুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি ভোগী হইলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পরমদয়ালু ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের কৃপায় সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছে। (১)

এস্থলে আমরা শাসনদ্বয়ের প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয়ের পাঠ সঙ্গত বিবেচনায় আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু ১ নং বা বড় তাম্র ফলকের তিনি যে অঙ্ক লিখিয়াছেন অসঙ্গত বোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

ওঁ নমঃ শিবায়॥ যঃ কর্ত্তা ভুবনত্রয়স্য তনুভির্ব্বিশ্বং পৃথিব্যাদিভির্যস্যেদং ধ্রিয়তে য ঈশ্বর ইতি খ্যাতোভবন্নাপরঃ যঃ সংজ্ঞাত্রয়মেক এব ভজতি ত্রৈগুণ্যভেদাশ্রিতো-ব্রহ্মোপেন্দ্রমহেশ্বরেতি জগতামীশায় তস্মৈ নমঃ। ত্রিপুরহরশিরঃকিরীটরত্নং স্মরযুবতেরভিষেকরৌপ্যকুম্ভঃ কুসুমবিশিখবাণশাণচক্রং জয়তি নিশাতিলকস্তুষাররোচিঃ॥ বংশেস্য ভূমিপতয়ঃ কতি তে নিস্পারপৌরুষা জাতাঃ। যেষাং যশঃ প্রশস্তির্ভুবি ভারতসংহিতৈবাস্তি॥ অথ বিশ্রুতপ্রভাবঃ প্রভবঃ স্বচ্ছরাজ্যকমলায়াঃ। সমজনি নবগীর্ব্বাণঃ খরবাণ ক্ষ্মাভুজাং শ্রেষ্ঠঃ॥ তস্যাত্মজো রাজপিতামহোভূৎ মহীপতির্গোকুল দেবনামা। যস্য প্রতাপার্করুচোপি চিত্রং দিশন্ত্যরিক্ষ্মাপতিজাড্যমুদ্রাম্॥ তস্মাদমন্দভুজমন্দরমথ্যমান-প্রত্যর্থিপার্থিবসমুদ্রসমুদ্ভূতশ্রীঃ। নারায়ণোঽজনি মহীপতিরন্বকারি যেন স্বয়ং স ভগবান্ শ্রিতনন্দকেন॥ তস্মাদসীমগুণগৌরবগীতকীর্ত্তির্ভূপালমৌলিমণিমণ্ডিতপাদপীঠঃ। শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রতিলকো রিপুরাজশোষী গোবিন্দ ইত্যজনি কেশবদেব এষঃ॥ যঃ সীমাভূতপৌরুষস্য যশসাং বামশ্রিয়ামাশ্রয়ো বিদ্যানাং বসতির্নয়স্য নিলয়ো ধাম্নান্তদেকাস্পদং। ত্যাগস্যায়তনং বিলাসভবনং বাচঃ কলানাং নিধিঃ। সৌজন্যস্য নিকেতনং বিজয়তে মূর্ত্তো গুণানাং গণঃ। দোর্দ্দণ্ডেন সমুদ্ধৃতক্ষিতিভৃতাং সংরক্ষ্য গোমণ্ডলং সদ্বৃন্দাবনমাদরেণ বিদধৎ উচ্ছিন্নকং-

(১) জয়ন্তীয়ানাথের রাজ্যচ্যুতি বিষয়ক একটী গীত আমরা শিশুকালে শ্রবণ করিয়াছি। তাহার পদগুলি এক্ষণে স্মরণ হয় না; কিন্তু ইহার মর্ম্মার্থ ওয়াজিদ আলী সাহেবের গীতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য।

সোৎসবম্। শ্রীমৎকেশবদেব এষ নিয়তং চক্রেহবশেষং কৃষা যত্রৈকং শিশুপালমপ্যরিকুলে ক্ষিপ্তারিচক্রো নৃপঃ॥ কৃত্বা যেন ভুজৌজসা বসুমতীমেকাতপত্রামিমাং লোকেহস্মিন্নভিলপ্যতে বিজয়িনানন্যাধিকার স্থিতিঃ। পাণিঃ কল্পতরোঃ পদে দিনকৃতঃ কৃত্যে-প্রতাপো যশঃ শীতাংশোর্ব্বিষয়ে ন্যধায়ি ভুজগাধীশাধিকারে ভুজঃ॥ যস্মিন্ শাসতি নিখিলামাদিমহীপালদীক্ষয়া ক্ষৌণীম্। শ্রুতিপথলঙ্ঘনসাহসমাসীৎ কান্তাদৃশামেব॥ অয়ং সুহৃচ্চক্রমুদং বিভাবয়ন্ প্রসাধিতাশঃ কর-বাললীলয়া। সুদূরমুৎসারিতরাজমণ্ডলো ররাজ পূর্ব্বাবনিভৃৎ শিরোমণিঃ॥ করোতি ধবলং জগৎ বিনয়তেহরিপদ্মোদ্গমং তনোতি কুমুদং যশঃ সদৃশমস্য চন্দ্রোজ্জ্বলং। সিতং কিমথ রঞ্জকং ভ্রমদনারতং কিং স্থিরং সকারণমিদঞ্চ সৎ কিমিব নিত্যমিত্যদ্ভুতম্। বাম্পৈরুর্ব্বীপতীনাং যদয়মন্বমিতোঽমূর্চ্ছিতো যদ্রিপূণাং কীলালৈর্যত্তনোতি দ্বিষদবনিভুজাংজাড্যমর্চ্চির্ব্বিতানৈঃ। কাষ্ঠানাং যদ্যতীত্য প্রকরমুপযযাবম্বরং লেলিহানস্তেনাশ্চর্য্যৈকসীমা জয়তি নরপতেঃ কোপি তেজঃকৃশানুঃ॥ ক্ষৌণীভুজা যুগপদাহবসঙ্গতেন তেনোন্নতদ্বয়মনামি গুণদ্বয়েন একেন কার্ম্মুকমসীমমহঃপ্রকর্ষগম্যেন বৈরিনিবহঃ সহসাপরেণ॥ মহীভুজাজীয়ত চন্দ্রহাসকরেণ তে নামিতবিক্রমেণ। বিলঙ্ঘিতানেকপয়োধিনেয়ং স্বেনৈব কৃৎস্না বশসা ধরিত্রী॥ অথাস্তি কৈলাসনিবাসনিস্পৃহঃ কৃতাবতারো ভুবি হট্টপাটকে। অনাদিরূপো জগদাদিরপ্যয়ং ত্রিলোকনাথো ভগবান্ বটেশ্বরঃ॥ শশিশেখরায় তস্মৈ নৃপশেখররুদ্রবিষ্ণুরচ্চরণঃ। প্রদদৌ নানাগ্রামে নিখিলনৃপগ্রামণীরেষঃ॥ অধিকং পঞ্চসপ্তত্যা ভূহলানাং শতত্রয়ং। শতদ্বয়ঞ্চ বাটীনাং ষণ্ণবত্যা সমন্বিতং॥ নানাপরিজনাংস্তস্মৈ জনজাতীরনেকশঃ। প্রাদাৎ শ্রীহট্টনাথায় শিবায় শিবকীর্ত্তনঃ॥

চাটাপড়াদেবসত্রে ভুহল ৩৫॥ ১৩ মহবাপুরে বাটী ১১০ বড়গামে ভুহল বাটী ১ হটীথানাকে ভূহল ৭ বাটী ৬ দেগিগানোত্তরে ভূহল ১ নব পঞ্চনে হল ৫ বাটী+আয়তনীকে হল ৭ শিড্ডবে বাটী ১ অমনাটে ভবিকে ভূহল ৬ গুড়াবয়ীকে বাটী ৩ কাটা বাঙ্গেতে ভুহল ৩ আথানিকুতে হুনীঘনাকোণার্কে বাটী ১ যিথায়িনগরে ভূহল ১৭ বাটী ৪ নেনুবতাগে বাটী ৩ যোড়াতিথার্কে ঘৃতকবভূহল ৩ বাটী ১১ কৈবামে হলা (?) বাটী ১ বালুনীগামে হল ৫ নবচ্ছাদী-পশ্চিমে হল ××× ভুহল ৫ বাটী অথিনহাটীকে ভুহল ৫ বাটী ৮ কড়ডিয়া দক্ষিণে গোস্যায়া পূর্ব্বেগোবটোত্তরে বনতী-পশ্চিমে ভূহল ১৮ সবগানয়ী (দী) দক্ষিণে ভূহল ৫ বাটী ৩ তথা নিত্যুত্তরে ভূহল ৩৫ বাটী ১৩ তথা নত্যুত্তরে বাটীসস্ত পূর্ব্বেং বাটী ১ তথা নত্যুত্তরে ঘটীভূপশ্চিমে সর্ব্বভুদক্ষিণে ভূহল ৭ কানিয়ানি নত্যুত্তরে যেগম্যগণি যা পূর্ব্বেং ভূহল ৮॥ বাটী ৭ তথা নদীদক্ষিণে থবসোত্তীপূর্ব্বেং ভাস্করটেঙ্করীপশ্চিম ভূহল ১৫ বাটী × জগায়াত্তরে নাটয়ানগ্রামদ্বয়ে ভূহল ৫ বাটী ৩০ সনাগয়ড়াক্কে অনীকাথীপূর্ব্বেং সাগরপশ্চিমে ভুহল ১০ কানিয়ানীনদী-

দক্ষিণোত্তরে ভূহল ৮ ॥ নাগায়ি নদীদক্ষিণে ভূহল ৬ বাটী ১০ ভোগাডত্তবাডডোত্তরে ভূহল ৯ বাটী ৯ তথোগাসনে পশ্চিমে হট্টববোত্তরে ভূহল ৭ বাটী ১০ সালকোষ্ঠা-দক্ষিণে বড়সোচস ভূহল ১০ চেদ্দাষুড়ীকে ভূহল ৩ বাটী ১ আডাণকাথীকে বাটী ৮ ভুকে+গ+নদ্যানীকে বাটী ৮ মে+পবা কবাটী ১ ভুকেউপংসিবো পুর্ব্বে আথাবী উত্তরে ভূহল ৮০ বাটী ১৩ নডকুটীগামেবাটী ৮ তথাগামে থাগনড্যুত্তরে বাটী ৬× গোথে-শপোত পূর্ব্বেং গোপথ+ত্তরে হডীগাঙ্গ-দক্ষিণে ঘনকুণ্ডোডী পশ্চিমে কবগাসনহল ৫ পোঙ্গানিয়া অথানি উতাক ভূহল ১০+দ্য দেবগাসন পুর্ব্বেং ভূহল ৫ বো বাঙডা দক্ষিনে জোগাবানিয়া উত্তরে বাডী ১ ভাট-পডাকে কেদাকরাদিবাবগুচ ১০ তথা কেতীমৃতাকাদি গোপগুড তথা ব×পাকাদি তে নূডড তথাকেকাস্য নোবিন্দাগৃহ ১ বড়গামে গোপগদা ১ তথা কে আবপা-নাকাদিবাবগৃহ ৭ ডোগাডত্তাবানি নিমা-বশূয়। তে গুড্ড ভাটপডাঙ্কঢাথানা। ন +উগঢাকানি গুড় ভাট পড়াববপঞ্চ। তকৃপথাননি বিবাকবাকাদিসানা গুডড ভাটপড়া নিমেবাকাদি গো গুডড ভাট

৪৯। পডানিজাপিত গোনিন্থ। গৃহ ১ বজকসিচম্পাগৃহ ১ বোবাতুছানি বংবাবাটায়ি পাকায়ি গৃহ ৫ তথা। নিডো+বে×+ কাদি গৃহ ৫ নবভাট। নিড়ো+ভাট পা-কাদি গৃহ ৩ ভাট পড়া নিবাপপাকাদি হড়ি-ডপগৃহ ৩ পিআপি নগরে দ্যোন্যে নবিকা +দি গৃহ ৩ সিহাডবগ্রামে দন্তকবিবজবি গো গৃহ ১ কোদ্যী হূহ্কো মহাসাহূঢো কোদ্যীসহূণ কোদ্যীনো কৃতাং বুঢোভাং ছবিষট্টোদ্যপত্র আসিএ ন পিখূয়া আপি-য়াচে ভাল×ড দয় আকাদয়ঃ প্রদত্তাঃ ॥ বসুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভির্যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসু-ন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ পাণ্ডবকুলাদি পালাব্দ ৪৩২৮।

ওঁ নমো নারায়ণায় ॥ মহানীলমণিশ্যামঃ সুবর্ণরুচিরাম্বরঃ পাতু বঃ কমলাকান্তঃ সবি-ত্যুদিব বারিদঃ ॥ তুঙ্গোত্তুঙ্গতমঃস্তোমনাগ যূথ মৃগাধিপঃ। মৌলিরত্নং মহেশস্য জয়ত্য-মৃতদীধিতিঃ ॥ তদন্বয়েভূত্ত বনাবতংসঃ স্বী-য়োদযে প্রোজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশিঃ। সশস্ত্রভূ-ন্মণ্ডলহংসসার্থ-কল্পদ্রুমোগোকুলভূমিপালঃ ॥ তস্যাত্মজঃ শস্ত্রভৃতাং বিশিষ্টঃ সম্ভ্রান্তশস্ত্রা-র্ণবমন্দরাদ্রিঃ। শ্রিয়া হৃদা সঙ্গতমঞ্জুমূর্ত্তি-র্বভূব নারায়ণদেব এষঃ ॥ নিধিঃ কলানাং ভবনং গুণানাং শৌর্য্যস্য রাশির্বিনয়স্য ভূমিঃ সৌজন্যপাথোনিধিরু-ন্নতশ্রীঃ প্রখ্যাতকীর্ত্তি-র্ভুবনাবতংসঃ ॥ তস্যোরুতেজা রিপুরাজ-শোষী গোবিন্দবীরো দ্রুমনাথসংঙ্গঃ। ক্ষমা-পালচূড়ামণিমণ্ডিতাঙ্ঘ্রিঃ পুত্রোহভবৎ কেশ-বদেবদেবঃ ॥ গুণৈর্যদীয়ৈঃ শ্রবণাভিরামৈ-রাকৃষ্যমাণা গুণিনস্সমন্তাৎ। আগত্য সম্প-ন্নমনোরথাশ্চ ন সস্মরুর্জন্মভুবং দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ যস্মিন্ মহীং শাসতি ভূমিপালা নিদ্রাং রজ-ন্যামপি নাধিজগ্মুঃ। সঞ্চিন্তয়ন্ত পরিতোষ-হেতোরমুষ্য বিশ্রাণয়িতুং বসূনি ॥ নিঃসীম-নৌবাটকপত্তিবাজিপ্রভিন্নদন্তাবলসৈন্যসম্পৎ।

স রাজরাজঃ কুমুদাবদাতৈর্বশোভিরুর্ব্বী বিমলীচকার। স মন্দিরং কংসনিসূদনস্য শিলাভিরুচ্চৈর্বিদধে মহৌজাঃ। যত্তুঙ্গশৃঙ্গ-স্থিতচক্রধারাক্ষতাঃ ক্ষরন্ত্যম্বু ঘনা দিবস্থাঃ ॥ তুলাপুরুষদানস্য সম্প্রাপ্য দ্রবিণন্দিজাঃ। কল্পবৃক্ষা ইবাভুবন্ হেমালঙ্কারভূষিতাঃ। তস্মান্মহেশাদিব বাহুলেয়ঃ পীযূষরশ্মেরিব রৌহিণেয়ঃ। শ্রীমানভূন্নির্ম্মলকীর্ত্তিরাশিরী-শানদেবঃ ক্ষিতিপালচন্দ্রঃ ॥ যজ্ঞৈত্রয়াত্রাপ্র-চলৎপদাতিতুরঙ্গদন্তাবলসৈন্যকীর্ণৈঃ। র-জোভিরুর্ব্ব্যাঃ পরিমৃষ্যমাণস্থন্নোন্মহাঃ সন্ত-মিমীলদর্কঃ ॥ যদীয়নৌবাটককেলিপাতঘা-তোচ্ছলদ্বারিভিরুগ্ররশ্মেঃ। রথ্যৈস্তরঙ্গৈরভি-সন্তপন্তিঃ সন্তাপশান্তিঃ সুতরামলম্ভি ॥ বিনি-র্ম্মমেসৌ মধুকৈটভারেঃ প্রাসাদমভ্রংলিহমুর্জি-তশ্রীঃ। যত্তুঙ্গশৃঙ্গপ্রচলৎপতাকানভস্তরো-র্মঞ্জরিকেব ভাতি ॥ এতস্য পৃথিবীভর্তুরা-জপট্টনিকঃ কৃতী। বৈদ্যবংশপ্রদীপঃ শ্রী-বনমালিকরোভবৎ ॥ অস্য বিজ্ঞাপনাদ্ভূপঃ শাসনং কৃতবানয়ম্। রাজপুত্রো যঃ স্থবিরঃ পুত্রশূন্যঃ স্বহস্ততঃ ॥ পাল্যং ভূহলদ্বয়ং সবাস্তমস্যবিস্তৃতং মৃতস্য রাজপুত্রস্য পত্নী যা কুলপালিকা। শিশুশ্চ তনয়ঃ তস্যাঃ পাল্য-মেব তয়োরপি ॥ আদেশিকোভূৎ সমর-প্রবীরঃ শ্রীবীরদত্তঃ পৃতনাধিনাথঃ। দিগ-ন্তসংক্রান্তয়শপ্রশস্তিঃ প্রতাপবান্নুর্জ্জিতধৈর্য্য-রাশিঃ ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ এতাং প্রশস্তিং বিদধে বি বেকী শ্রীমাধবো দাসকুলাবতংসঃ। যাবৎ সমুদ্রা গিরয়শ্চ যাবজ্জীয়াৎ ক্ষিতৌ তাবদি-য়ঞ্চ শশ্বৎ ॥ সং ১৭ বৈশাখদিনে ১

একটী আশ্চর্য্য কথা আমরা কিছু দিবস হইতে চিন্তা করিতে ছিলাম। বাঙ্গা-লার রাজন্যবর্গ প্রায় সকলেই চন্দ্রবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। সেন রাজগণের শাসনপত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় তাঁহারাও চন্দ্রবংশীয় (ক্ষত্রিয) ব-লিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। (১) ত্রিপুর নরেশ্বরগণ চন্দ্রবংশজাত। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারাজগণ চন্দ্রবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মিতাই (মণিপুর) রাজগণ অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া খ্যাত। প্রোক্ত শাসনপত্রদ্বয় জয়ন্তীয়া রাজবংশ চন্দ্রবংশজ বলিয়া সাক্ষ্য দান করিতেছে। কাছাড়পতিগণ পাণ্ডুপুত্র ভীমকে আদি পিতা ও হিড়িম্বাকে আদি মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। (২)

---

(১) বঙ্গীয় বৈদ্য বাবুগণ ইহা স্বী-কার করিতে সম্মত নহেন। ক্লাইব সাহেব রাজ্য লোভে অন্ধ হইয়া একখানি সন্ধি পত্র জাল করিয়াছিলেন। জনৈক বৈদ্য বাবু জাতীয় পক্ষপাতে অন্ধ হইয়া এক-খানা জাল প্রস্তরলিপিশাসনীর বিস্তা-রিত বিবরণ ভারতীতে প্রকাশ করিবেন বলিয়া পাঠকদিগকে ভয় প্রদর্শন করি-য়াছেন। আমরা প্রিয় পাঠকদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছি। যাদবানন্দ বাবুর প্রবন্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করুন। যাদবানন্দ বাবু পাংশু নিক্ষেপ করিয়া পাঠকদিগের দৃষ্টিশক্তি লোপের চেষ্টা পাইতেছেন।

(২) বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজগণও চন্দ্রবংশজ ব-লিয়া শাসনপত্রে লিখিত আছে। কেবল

মিত্র মহোদয় বলেন "শাসনোক্ত নরপতিগণ কাছাড়ের অধিপতি এবং তাহারা ভীমপুত্র ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হইতেন।" আমরা বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া কাছাড়ের লুপ্ত রাজবংশের একখানি বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী কমিসনর এডগার সাহেব কাছাড় রাজবংশাবলীর যে প্রতিলিপি প্রাপ্ত হন, সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেব তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সংগৃহীত বংশাবলীর সহিত ইহার কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এডগার সাহেব বলেন প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। যদিচ আমরা এডগার সাহেবের বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু বংশাবলীর প্রথম ভাগ কল্পনাপ্রসূত অনুমান করিবার জন্য আমাদের হৃদয় নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। বংশাবলীর শীর্ষ দেশ "ভীম" তৎপরে "ঘটোৎকচের" নাম দৃষ্ট হইবে। পাণ্ডুপুত্রগণ বর্ত্তমান কাছার প্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পাণ্ডবদিগের সময়ে পৌণ্ড্র ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য কোন প্রদেশে আর্য্যগণ পদার্পণ করেন নাই। ভারতের জাতি সমূহের পুরাতত্ত্ব-লেখক সুবিখ্যাত ডাক্তর জন উইল সাহেবের মতে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র সুহ্ম ও কলিঙ্গ দেশে পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই আর্য্যগণ পদার্পণ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সমগ্র বাঙ্গালাকেই "পাণ্ডব বর্জ্জিত" (অর্থাৎ পাণ্ডবদিগের সময়ে আর্য্য বর্জ্জিত) দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। (১) সুতরাং আমরা ডাক্তর উইলসনের বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পাণ্ডবদিগের বাঙ্গালায় আগমনই সন্দেহস্থল, এমতাবস্থায় তাহাদিগের কাছাড় গমন কখনই সম্ভব বোধ হইতেছে না! অসভ্য মিতাইগণ মহাভারতে মণিপুরের নামাবলোকনে বড় গর্ব্ব করিয়া থাকে। পাণ্ডবদিগের মণিপুর গমন সত্য হইলে এই সকল তর্ক উদ্ভব হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় "মিতাই লেইপাক" বা "জাল মণিপুরের" সহিত মহাভারতের কোন সংশ্রব নাই। মহাভারত উক্ত মণিপুর কলিঙ্গের (বর্ত্তমান উড়িষ্যা) অন্তর্গত একটী বিখ্যাত নগরী। অর্জ্জুনের গন্তব্য পথাবলম্বনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। (২) সুবিখ্যাত পণ্ডিত এইচ, এইচ, উইলসন সাহেবও এইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন। (৩) ডাক্তর জন উইলসন

আসামপতিগণ, "ইন্দ্রবংশজ," ও মেচ বংশজাত-কুচবিহারপতিগণ "শিব বংশজ" বলিয়া খ্যাত।

(১) Journal Asiatic Society of Bengal Vol XXXIII. page 326.

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব দেখ।

(৩) Manipura—a city on the sea coast of kling.

H. H. Wilson's Vishnu Puran (Hall's Ed.) Vol. IV. page 160.

সাহেব (১) ও মণিপুর কলিঙ্গের অধীন লিখিয়াছেন। বাবু রামদাস সেন বলেন "বাণভট্ট মণিপুরেও বাস করিয়াছিলেন।" ভট্টবাণ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সমকালীন। সুতরাং তিনি খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে জীবিত ছিলেন। বাণের এক শতাব্দীর কনিষ্ঠ শ্যান রাজের ভ্রাতা শ্যামলোং ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে দূত রূপে ত্রিপুরার রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে শান রাজদূত "মিতাই লেইপাক" দিয়া গমন করেন। তিনি মিতাইদিগের অবস্থা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তদ্‌পাঠে তাহাদিগকে বন মনুষ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। বাণভট্ট যে এই সকল পশুবৃত্তি অনার্য্য উলঙ্গ ম্লেচ্ছগণের সহিত বাস করিতে গিয়াছিলেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রাচীন আর্য্যগণ বর্ত্তমান মণিপুরের নামগন্ধও অবগত ছিলেন না। ইহা নিশ্চয়ই জাল মণিপুর, ইহার দেশীয় বা জাতীয় নাম "মিতাই লেইপাক।"

যদিচ আমরা বংশাবলীর প্রথম ভাগ কল্পনাপ্রসূত বলিয়াছি, তত্রাপি আমরা কাছাড় রাজবংশ, জাল মণিপুর কিম্বা কুঁচবেহার রাজ বংশের ন্যায় অভিনব বলিতে প্রস্তুত নহি। কাছাড় রাজবংশের প্রাচীনত্বের প্রমাণের অভাব নাই। রাজমালা বলেন "ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৌহিত্র স্বত্বে হেড়ম্ব রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণদেহ পৈতৃক রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন।" কাছাড়ের শেষ নরপতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের উপাংশু হত্যার পর কাপ্তান ফিসরের হস্তে সেই রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। ফিসর সাহেব বহু অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াগিয়াছেন "প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল একটি রাজবংশ আসাম রঙ্গপুর, কাছার প্রভৃতি প্রদেশ সকল দীর্ঘকালাবধি শাসন করিতে ছিলেন। তাহাদের রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুরে অবস্থিত ছিল। পার্ব্বত্য অসভ্য মানবগণ প্রাগজ্যোতিষেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করে। হতরাজ্য রাজেশ্বরের জেষ্ঠ পুত্র কামরূপের পূর্ব্বদিকে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিপুরা রাজ্য স্থাপন করেন। কাপ্তান ফিসর দেশপ্রচলিত প্রবাদ হইতে এই তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রবাদ-বাক্যে যতদূর সত্য লাভের সম্ভব ইহাতেও ততদূর সত্য সংরক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ ও ইতিহাস রাজমালার লিখিত বাক্যের সত্যতা এই প্রবাদ সম্পূর্ণ রূপে পোষণ করিতেছে। ত্রিপুরা ও কাছাড় রাজবংশ যে এক মূল হইতে উৎপন্ন ইহা বিশ্বাসযোগ্য। সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেবও আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

আসামের পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে ২টী প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিমাপুর ও মাইরাং। উভয়

(১) John Wilson's Indian Cast Vol 1. page 249.

স্থানেই প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ অনুসারে দিমাপুর ও মাইবাং কাছাড় নরপতিদিগের প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমান কাছার প্রদেশ প্রাচীনকালে ত্রিপুর রাজছত্রের অধীন ছিল। জনৈক কাছাড়পতি ত্রিপুর-রাজকন্যা বিবাহ করিয়া সেই প্রদেশ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে কাছাড়পতিদিগের মাইবাং-অবস্থানকালে, একটী নিতান্ত ঘৃণাজনক কার্য্য দ্বারা, কাছাড় ও জয়ন্তীয়া রাজবংশের মধ্যে লোমহর্ষণ কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। "উপেন্দ্র ও ক্ষেত্রমণির" ঘৃণিত অভিনয় ইহার আদর্শ স্বরূপ। জয়ন্তীয়া রাজের ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর কলুষিত প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজকুমার রাজকুমারীকে লইয়া পলায়ন করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ মাইবাং নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পাপিষ্ঠ ও পাপীয়সীর আশ্রয়দাতা বলিয়া, জয়ন্তীরানাথ কাছাড়পতির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়ন্তীয়া রাজকুমার স্বীয় প্রণয়িনী ও অনুচরবর্গের সহিত দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রবাদ অনুসারে সেই জয়ন্তীয়া রাজকুমার ও কুমারী অঙ্গমী নাগা রাজবংশের আদি পিতা মাতা। তাহাদের অনুচরবর্গ ও অন্যান্য পার্ব্বত্য মানব ও মানবী সংযোগে অঙ্গমী নাগাদিগের উৎপত্তি।

সংগ্রাম ক্ষেত্রে কাছাড়রাজ পরাজিত হইলেন। কাছাড়রাজ-প্রাসাদ শীর্ষে জয়ন্তীয়া-রাজ-পতাকা উড্ডীন হইল। কাছাড়পতি সেই প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান কাছাড়প্রদেশে উপনীত হইলেন। কশপুরে তাঁহার রাজপাঠ সংস্থাপিত হইল।

আমাদের সংগৃহীত কাছাড় রাজবংশাবলী এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

বংশাবলী।

১। ভীম। ২। ঘটোৎকচ। ৩। মেঘবর্ণ। ৪। মেঘবল। ৫। উত্তম ধ্বজ। ৬। কেতুধ্বজ। ৭। বিশ্বকীর্ত্তিধ্বজ। ৮। বিশ্রবণেধ্বজ। ৯। তালধ্বজ। ১০। বেতালধ্বজ। ১১। বিশ্বাসনধ্বজ। ১২। উন্মত্তধ্বজ। ১৩। কুলিশধ্বজ। ১৪। রুদ্রধ্বজ। ১৫। কৌণ্ডিল্যধ্বজ। ১৬। শক্রজিতধ্বজ। ১৭। পরিরুদ্রধ্বজ। ১৮। ভাস্করধ্বজ। ১৯। প্রভাকরধ্বজ। ২০। বিষ্ণুধ্বজ। ২১। হিরণ্যধ্বজ। ২২। ভদ্রাসনধ্বজ। ২৩। শুক্রধ্বজ। ২৪। ঈশানধ্বজ। ২৫। গুণকীর্ত্তিধ্বজ। ২৬। পিঙ্গলধ্বজ। ২৭। উপেন্দ্রধ্বজ। ২৮। নীলধ্বজ। ২৯। পদ্মনাভধ্বজ। ৩০। পিকধ্বজ। ৩১। বৃষ্ণধ্বজ। ৩২। গুণধ্বজ। ৩৩। শূরসেনধ্বজ। ৩৪। রিপুদ্রবধ্বজ। ৩৫। বলভদ্রধ্বজ। ৩৬। চন্দ্রশেখরধ্বজ। ৩৭। মুকুটধ্বজ। ৩৮। স্কন্দধ্বজ। ৩৯। দ্বিজেশধ্বজ। ৪০। গণেন্দ্রধ্বজ। ৪১। মহেশ্বরধ্বজ। ৪২। ভানুধ্বজ। ৪৩। মহাকালধ্বজ। ৪৪। কমলধ্বজ। ৪৫। জ্ঞানধীরধ্বজ। ৪৬। ভূপেন্দ্রধ্বজ। ৪৭। ভানধ্বজ (২য়) ৪৮। ইন্দুধ্বজ। ৪৯। অর্কধ্বজ। ৫০। প্রতাপনারায়ণ। ৫১। রুদ্রনারায়ণ। ৫২। বলবন্তনারায়ণ। ৫৩। নির্ভয়নারায়ণ (১)

(১৭) নির্ভয় নারায়ণ কাছাড় রাজ বংশের তিলক। প্রবাদ আছে তিনি কুলদেবতা "রণচণ্ডী" হইতে এক তরবারি লাভ করিয়াছিলেন। একদা স্বপ্নে নির্ভয় নারায়ণ শুনিলেন, যেন জগজ্জননী বলিলেন "বৎস! কল্য নদীতে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" পর দিবস রাজা একাকী নদীতীরে যাইয়া দর্শন করিলেন "একটী বিষধর জলকেলী করিতেছে।" নির্ভয় নারায়ণ সর্পকে দেবী জ্ঞানে তাহার লাঙ্গূলে হস্তার্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একখানি তরবারী রাজার হস্তে উঠিল, নরেশ সেই তরবারী লইয়া গৃহে গেলেন। সেই দিবস রজনীযোগে দেবী পুনর্ব্বার নির্ভয় নারায়ণকে বলিলেন— "বৎস! সর্পের লাঙ্গূল ধরিয়া অন্যায় করিয়াছ, যাহা হউক এই তরবারী যত্নের সহিত রক্ষা করিও, ইহার কৃপায় তোমার বংশধরগণ নির্ব্বিঘ্নে কাছাড়-রাজ্য উপভোগ করিবে। কাছাড়পতিগণ ভক্তির সহিত সর্ব্বদা এই তরবারীকে "রণচণ্ডী" জ্ঞানে পূজা করিতেন। প্রবাদ আছে, গোবিন্দচন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের দিবস এই তরবারী রাজপ্রাসাদ হইতে অপহৃত হইয়াছিল। অদ্যাপি কাছাড়বাসীগণ অত্যন্ত ভক্তির সহিত রণচণ্ডীর পূজা করিয়া থাকে। বাবু হারাণচন্দ্র সাহা "রণচণ্ডী" নামে একখানি "ঐতিহাসিক উপন্যাস" প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কাছাড় ঐতিহাসিক তত্ত্বের নামগন্ধও নাই। হারাণ বাবু অকৃতজ্ঞ ভাবে স্কটের "আন অফ গার্ষ্টেন" "রণচণ্ডী" নামে প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী হইতে "বাহবা" পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

৫৪। উদয়নারায়ণ। ৫৫। বীরনারায়ণ। ৫৬। মদননারায়ণ। ৫৭। চিত্রধ্বজ। ৫৮। বিন্দুধ্বজ। ৫৯। কেতুধ্বজ। (২য়) ৬০। শঙ্খধ্বজ। ৬১। ললিতধ্বজ। ৬২। সিংহধ্বজ। ৬৩। হেমধ্বজ। ৬৪। শিখণ্ডীচন্দ্র। ৬৫। কুমুদচন্দ্র। ৬৬। প্রচতুরচন্দ্র। ৬৭। উদিতচন্দ্র। ৬৮। প্রভাকরচন্দ্র। ৬৯। কর্পূর-চন্দ্র। ৭০। গিরিচন্দ্র। ৭১। ধীরচন্দ্র। ৭২। শূরজিৎচন্দ্র। ৭৩। শক্রজিৎ চন্দ্র। ৭৪। বালপ্রতাপ। ৭৫। প্রকাশচন্দ্র। ৭৬। বিক্রমচন্দ্র। ৭৭। আদিত্যচন্দ্র। ৭৮। বীরচন্দ্র। ৭৯। পুণ্ডরীকাক্ষ। ৮০। ভূপালধ্বজ। ৮১। প্রবলচন্দ্র। ৮২। পুরন্দর চন্দ্র। ৮৩। ত্রিলোচনচন্দ্র। ৮৪। দীপ্তচন্দ্র। ৮৫। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র। ৮৬। নীলচন্দ্র। ৮৭। মকরধ্বজচন্দ্র। ৮৮। নরকুলচন্দ্র। ৮৯। নবচন্দ্র। ৯০। কিশোরচন্দ্র। ৯১। মনচন্দ্র। ৯২। বীরদর্পচন্দ্র। ৯৩। নির্ভয়চন্দ্র। ৯৪। মেঘবলচন্দ্র। ৯৫। বাহুবলচন্দ্র। ৯৬। সুরেন্দ্রচন্দ্র। ৯৭। শিখিধ্বজ। ৯৮। উদয়াদিত্যচন্দ্র। ৯৯। ময়ূরধ্বজচন্দ্র। ১০০। গরুড়ধ্বজচন্দ্র। ১০১। মকরধ্বজচন্দ্র। ১০২। তাম্রধ্বজচন্দ্র। ১০৩। শূরদর্পচন্দ্র। ১০৪। ধর্ম্মধ্বজচন্দ্র। ১০৫। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র। (২য়) ১০৬। রামচন্দ্র। ১০৭। হরিশ্চন্দ্র। ১০৮। লক্ষ্মীচন্দ্র।

১০৯। কৃষ্ণচন্দ্র। ১১০। গোবিন্দচন্দ্র।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মণিপুরীয়গণ চক্রান্ত

করিয়া গোবিন্দ চন্দ্রের উপাংশু-হত্যা সম্পাদন করে। মারজিতের মনোহর অশ্ব (১) এই হত্যাকাণ্ডের মূল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। অপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট কাছাড়রাজ্য অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ঐদিকে কোথায় আছে! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে চুল বাঁধিবার সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন, এখনি সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারি জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না, চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাঁদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা ত কখন এমন করে না! বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে, আর আজ—ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্দ্ধেক বল, অর্দ্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল; যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল—সেই চলিয়া গেল! তিনি তাঁহার শয়ন-গৃহে যাইতেন, যেন কি ভাবিতেন, একবার চারিদিক দেখিতেন, দেখিতেন, কেহ নাই!—ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত, সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন—আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সুমুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে—মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে? সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মত কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারিদিকে দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন—কেহ আছে কি না! যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের ক্ষেতের ও বাগানের ফল মূল শাক সবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন; আজ কাল আর সে সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যা বেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন—শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে, যে, সহসা শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব—সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী ম্লান মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কতকি স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে! এক দিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিভা, এ বাড়িতে আর তোর কে রহিল? তোকে এখন শ্বশুর বাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কি বলিস? আমার কাছে লজ্জা করিস্ না বিভা! তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল্?" বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। একথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃ-ভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেই খানে—সেই চন্দ্র দ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না ত কি? কিন্তু তাহাকে লইতে এ পর্য্যন্ত একটিও ত লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বিভাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উত্থাপন করিলেন। প্রতাপাদিত্য কহিলেন "বিভাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোন আদর থাকিত, তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত! আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখি না।"

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সধবাবস্থার বৈধব্য কি চোখে দেখা যায়? বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, সে একটা কি ছেলেমানুষী করিয়াছে বলিয়া তাহার ফল যে এতদূর পর্য্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভাল লাগে নাই। তিনি মহারাজার কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও!" মহারাজা

(১) মণিপুরের বিবরণ (বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড ২৬৬ পৃষ্ঠা) দেখ।

রাগ করিলেন, কহিলেন "ঐ এক কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে!" মহিষী কহিলেন, "মেয়ে অধিক দিন শ্বশুর বাড়ি না গেলে দশ জনে কি বলিবে?" প্রতাপাদিত্য কহিলেন "আর—প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশ জনে কি বলিবে?"

মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন, মহারাজা এক এক সময় কি যে করেন তাহার কোন ঠিকানা থাকে না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রাজা একদিন চতুর্দ্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুই জন অনভিজ্ঞ তাঁতী তাহাদের কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দ্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহাই লইয়া হুলুস্থূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার যশোহরে তাঁহার শ্বশুর বাড়ির এক চাকরকে তিনি একটা-কি কাজের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারা এক শুনিতে আর শুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল; মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে, শ্বশুরবাড়ির ভৃত্যেরা তাঁহাকে মানে না; তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে, নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষতঃ সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কি-একটা কথা বলিতেছিলেন—অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কি হইতে পারে! একদিন কয়েক জন বালক মাটির ঢিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অনুকরণে খেলা করিতেছিল, রাজার কানে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদীর উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীত দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোন সূত্রে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা শুনিতে পায়, ও তাহাই লইয়া আপনা-আপনির মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই শুনিয়া তাহার শত্রুপক্ষের একজন সে কথাটা রাজার কানে উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন, কি নির্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, "বেটা, তোর এত বড় যোগ্যতা!"

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, "দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই!"

মন্ত্রী কহিতেছেন, "বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আর আমাদের মহারাজের তুলনা!"

দেওয়ান কহিতেছেন, "বেটা, জানিস্ না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তখন তাহাকে রাজটীকা পরাইবার জন্য সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁহার বাঁ পায়ের ক'ড়ে আঙুল দিয়া তাহাকে টীকা পরাইয়া দেন।"

রমাই ভাঁড় কহিতেছে, "বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য, উহারা ত দুই পুরুষে রাজা! প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মত চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জাতসাপ চিনি না?" রাজা বিষম সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্য বদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজ-কাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর একবার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্য পূর্ব্বক শব্দভেদী বচন-বাণ বর্ষণ করিয়া সেনানীদের তূণ নিঃশর হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়। যাহা হউক, আজিকার বিচারে অপরাধী অনেক কাঁদাকাটি করাতে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন—"আচ্ছা যা'—এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস্!"

অন্যান্য সভাসদেরা চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী ও রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতাপাদিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, "আপনি ত চলিয়া আইলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তম্বী কত!"

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন "বটে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, শুনিতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপ্‌শোষে সারা হইতেছেন। এখন কি উপায়ে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।"

রাজা কহিলেন "সত্য না কি!" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়ই আনন্দ বোধ হইল!

মন্ত্রী "আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই! তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের—সাত-পুরুষ—উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নীচু করা, এত পুণ্য এখনো তোমরা কর নাই! কেমন হে ঠাকুর!"

রমাই কহিল, "তাহার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে, পাঁকে পা দিয়াছেন, সে ত পাঁকের বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন নাত কি!"

এই রূপে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষত-বিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কি অপরাধ তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে সকল কথা চুলায় গেল, আর, তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন, এই অপরাধে রামচন্দ্ররায় তাঁহার কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্ররায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি একজন লঘু-হৃদয়, সঙ্কীর্ণ-প্রাণ লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহা ত হইবেই, ইহা না হওয়াই অন্যায়। রামচন্দ্ররায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না ত কি! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্ররায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎসংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না, যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিবারাত্রি শত শত স্তুতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে জগৎকে ও একদিকে নিজেকে চড়াইয়া তিনি নিজেকেই ওজনে ভারী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য সহজে আর কাহারো উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা উদয় না হইবার আর এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণ রক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হাস্য পরিহাসে ত্রুটি করিতেন না। কারণ যেখানে দশজনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাসা করিতেছে, বিশেষতঃ রমাই ভাঁড় কাহাকেও লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাঁহার মনের জোর নাই। তাঁহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কি মনে করিবে।

এখনো বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মত একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্প দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতি অভিমান করিয়া তিনি বিভার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন—কিন্তু যখন সেই রাত্রে প্রথম নিদ্রা ভাঙ্গিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহার ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মত কাঁপিতেছে, যখন তাঁহার মনে সহসা একটা কি উচ্ছ্বাস হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, বিভার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুম্বন করিবার জন্যে হৃদয়ে একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নব-বিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথম তাঁহার নিঃশ্বাস বেগে বহিল, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র-পল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুম্বন করিতে গেলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বাস, সেই যে নয়নের মোহ দৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহারা তৃষা-কাতর হইয়া রামচন্দ্ররায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল। ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্ররায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ইহা যৌবনের মোহ, ইহা একটা অচিরস্থায়ী আশুতৃপ্ত মনোবিকার। একটা বিলাসদ্রব্যের প্রতি সৌখীন হৃদয়ের যেমন সহসা একটা টান পড়ে, সৌখীন রামচন্দ্ররায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভাব জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, রামচন্দ্ররায়ের যৌবন-স্বপ্নে বিভা জাগিতেছিল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা

অভিলাষ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে আনিতে পাঠান্, তাহা হইলে সকলে কি মনে করিবে! সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রৈণ মনে করিবে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবে, রমাই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে। তাহা ছাড়া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কি শাস্তি হইল? শ্বশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা হইল কৈ? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে আনিতে পাঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। এমন কি বিভাকে লইয়া হাস্য পরিহাস চলিতে থাকে, তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার সাহস হয় না, এবং প্রতাপাদিত্যের কথা মনে করিয়া, তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছাও হয় না।

রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রামমোহন মাল আসিয়া যোড়হাতে কহিল, "মহারাজ!"

রাজা কহিলেন, "কি রামমোহন!"

রামমোহন, "মহারাজ, আজ্ঞা দিন্, আমি ঠাকুরাণীকে আনিতে যাই।"

রাজা কহিলেন, "সেকি কথা!"

রামমোহন কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর শূন্য হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। অন্তঃপুরে যাই, মহারাজার ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ কেমন করিতে থাকে! আমার মা লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করুন, আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।"

রাজা কহিলেন "রামমোহন, তুমি

পাগল হইয়াছ? সে মেয়েকে আমি ঘরে আনি?"

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কেন মহারাজ, আমার মা ঠাকুরাণী কি অপরাধ করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "বল কি রামমোহন? প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব?'

রামমোহন কহিল, "কেন আনিবেন না? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের? যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন মেয়ে বাপের; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার—আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে?"

রাজা কহিলেন, "প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কি করিয়া?"

রামমোহন কহিল, "মান রক্ষা? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোন অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য লোকে যাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে?"

রাজা কহিলেন, "যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?"

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, "কি বলিলেন মহারাজ? যদি না দেয়? এতবড় সাধ্য কাহার যে দিবে না? আমার মা জননী, আমাদের ঘরের মালক্ষ্মী, কার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে? যতবড় প্রতাপাদিত্যই হউন না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলেম। তুমি কে মহারাজ? তুমি আদেশ না দিলেই বা আমি শুনিব কেন? আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে?" বলিয়া রামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন—"রামমোহন, যেওনা, শোন শোন। আচ্ছা তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু—দেখ—একথা যেন কেহ শুনিতে না পায়! রমাই কিম্বা মন্ত্রীর কানে যেন একথা না উঠে!"

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুরে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আছে, আপাততঃ উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্ররায় বাঁচেন।

গান।

ব'লে ত দিয়েছি আমি তারে,
ব'লেত দিয়েছি একেবারে,
কখনো এসোনা হেথা আর,
তবু কেন এক কথা—প্রতিদিন এক কথা—
ঘুরে ঘুরে কহে বার বার।
এমনত দেখিনি কখনো,
এমনত শুনিনি কখনো,
একেবারে দুটি পায়ে ধ'রে
একটিও কথা নাহি সরে
চেয়ে থাকে পাগলের প্রায়।
অবশেষে কথা না কহিলে,
একেবারে কেঁদে চলে যায়।

আমাকেও করেছে পাগল
আমিত পারিনে সখি আর।
বুঝিতে পারিনে তার কথা,
বুঝিতে পারিনে তার ব্যথা,
এমন হল গো কেন তার!
প্রতি দিন মনে করি আসিতে দিব না তারে,
তবু কেন পারিনে রুধিতে,
আপনারে নারি সামালিতে।
কতনা আদর কোরে ধীরে ধীরে হাত ধোরে
কি যে করে ভেবে নাহি পায়,
চেয়ে থাকে সজল নয়নে,
চেয়ে থাকে পাগলের প্রায়।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যমের কুকুর।

জীবদেহ নিত্য নহে; জীবমাত্রেরই মৃত্যু আছে। কোন জীব এক দণ্ড বা তদপেক্ষায় অল্প কালমাত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া লীলা সংবরণ করে; কেহ বা শতাধিক বর্ষ যাবত ইহলোকের সুখ দুঃখের ভাজন হয়; কিন্তু কেহই অমর নহে; কোন সময়ে না কোন সময়ে অবশ্য তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে। প্রাণের প্রধান ধর্ম্ম এই যে তৎসত্ত্বে ভৌতিক কারণে দেহের নাশ হয় না, প্রত্যুত ভোগের আধার হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইতে পৃথক্ হইলে দেহস্থ ভৌতিক পদার্থ সকল পৃথক হইয়া

অন্যরূপ ধারণ করে। এই নিয়মানুসারে পশু-পক্ষ্যাদি জীব মরিলে তাহার দেহ গলিত হইয়া অপসৃত হয়, তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য কাহাকে কোন চেষ্টা পাইতে হয় না। ইহা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে যে মনুষ্য যখন অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় বা বন্য পশুর ন্যায় ছিল, তখন তাহাদের দেহেরও সেইরূপ গতি হইত, অর্থাৎ যেখানে দেহের পতন হইত সেই খানেই পড়িয়া গলিত হইত, অথবা শৃগাল কুক্কুরাদি দ্বারা ভুক্ত হইত। পরন্তু যখন মনুষ্য সপরিবার গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করে তখন এ প্রথার অন্যথা অগত্যা ঘটিয়া উঠে। যে গৃহে বাস তাহার মধ্যে একটি শবের গলন কদাপি সহ্য হইতে পারে না; গৃহহইতে কিঞ্চিদ্দূরে কোন অরণ্য চত্বর বা জলাশয়ে শবের নিক্ষেপ অবশ্যই প্রয়োজনীয় হয়; এবং তথায় তাহা বন্য বা জল জন্তু দ্বারা ভুক্ত হইত, অভোজ্য অংশ পড়িয়া থাকিত। পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি পুত্রের দেহ মাঠে পড়িয়া পচিতেছে ইহা কদাপি প্রিয়দর্শন নহে; অতএব যাহাতে দেহ শীঘ্র ভুক্ত হয় ইহার সাহায্যার্থে পালিত কুক্কুর বা বন্য কুক্কুরের আহ্বান করা বিহিত হয়। অপিতু কুক্কুরে মাংসাদি ভক্ষণ করিবার পর আত্মীয় স্বজনের অস্থি কুক্কুরের ক্রীড়ার পদার্থ হইয়া মাঠে পড়িয়া থাকার নিবারণার্থ তাহার নদ্যাদিতে নিক্ষেপ বা সমাধি প্রক্রিয়ার ব্যবহার ঘটিয়া উঠে, এবং অস্থির সমাধি হইতে সমস্ত শবের সমাধি অনায়াসে মনে উদিত হয়। এবংপ্রকারে সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হইলে ক্রমে লোকে অনায়াসে সমাধির সামাজিক দোষসকল অনুভব করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দাহক্রিয়া অবলম্বন করে। ফলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চারিপ্রকার; প্রথম বনে বা জলে নিঃক্ষেপ; দ্বিতীয় কুক্কুরাদি দ্বারা ভক্ষণ; তৃতীয় সমাধি; চতুর্থ দাহ।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে এই অনুভবটি যে প্রকৃতিসিদ্ধ তাহা ইতিহাসের আলোচনায় সপ্রমাণ হয়। অপিতু ঐ আলোচনায় ইহাও ব্যক্ত হয় যে এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র সমক্রমে ঘটে নাই, কোন না কোন কারণে তাহার ক্রমের ব্যাঘাত হইয়াছে। এই কারণের মধ্যে দেশাচার ও ধর্ম্মপরিবর্ত্তন প্রধান। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতিশয় শোকের ব্যাপার, তৎ সম্বন্ধে যে প্রথা এক বার প্রচলিত হইয়াছে তাহার অন্যথা করিতে লোকের বাঞ্ছা হয় না; সুতরাং একবার যাহা হইয়াছে পুনঃ পুনঃ তাহাই করিতে প্রবৃত্তি হয়। অপর পক্ষে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইলে নূতন ধর্ম্মাবলম্বীরা ঐ ধর্ম্মের প্রথানুসারে পূর্ব্বপ্রথা ত্যাগ করিয়া নূতন প্রথার অনুসরণ করে। ইহার দৃষ্টান্ত হিন্দুধর্ম্মচ্যুত মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ানে সর্ব্বদাই লক্ষ হয়। তাহারা ধর্ম্মত্যাগের সহিত পবিত্র দাহক্রিয়া ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত হীন প্রক্রিয়া সমাধির অবলম্বন করিয়া থাকে।

হিন্দুদিগের ইতিহাস দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে এই চারি প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকলই প্রচলিত হইয়াছে। দাহ এইক্ষণে সর্ব্বত্র প্রচলিত;

কিন্তু ইহা যে পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ নাই। প্রত্যুত আশ্বলায়ন বৌধায়ন হিরণ্যকেশী প্রভৃতি ঋষিদিগের গৃহ্য সূত্রে তথা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দৃষ্ট হয় যে তখন প্রথম দাহ পরে দগ্ধাবশিষ্ট অস্থ্যাদির সমাধি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ঐ অস্থির সমাধি ব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্যক্ সম্পন্ন হইত না। পরন্তু ঋগ্বেদ সংহিতার একটি শুক্তে দৃষ্ট হয় যে দাহ-সমাধি এই উভয়াত্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে কেবলমাত্র সমাধিই প্রচলিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা ছিল। এই কথা অনেকে আশু বিশ্বাস করিতে পারেন না, অতএব এইস্থলে উক্ত শুক্তের কিয়দংশের উদ্ধার করা আবশ্যক। উক্ত শুক্তগুলিতে প্রথম কএক প্রক্রিয়ার পর সমাধি দিবার উপযুক্ত এই কয়েকটি মন্ত্র আছে।

উপসর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং সুশেবাং।

ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণা-বত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতে রুপস্থাত্ । ১০।

উচ্ছ্বংচস্ব পৃথিবি মা নিবাধথাঃ সুপায়নাস্মৈ ভব সুপবঞ্চনা।

মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি। ১১।

উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপহি শ্রয়ন্তাং।

তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র। ১২।

উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং তত্ পরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষং।

এতাং স্থূনাং পিতরো ধারয়ন্তু তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু। ১৩।

"বিশাল পৃথিবীরূপ মাতৃভূমিতে প্রবিষ্ট হও; দাতার প্রতি ইনি অত্যন্ত হিতকারিণী, এবং ঊর্ণাসদৃশ কোমল যুবতী। তিনি তোমাকে নির্ঋতি হইতে রক্ষা করুন।১০।

"হে পৃথিবি, ইহাঁর প্রাণকে অনায়াসে ঊর্দ্ধে উঠিতে দেহ; ইহাঁকে ক্লেশ দিও না; ইহাঁর অনায়াসে প্রাপ্য হও। ইহাঁকে স্নেহ করিও। যেমন মাতা তাঁহার শিশু পুত্রকে অঞ্চলদ্বারা আবরণ করেন সেইরূপ তুমি ইহাঁকে আবরণ কর। ১১।

"সহস্র সহস্র রেণু মৃত্তিকা ইহাঁর উপর এমত লঘুভাবে নিঃক্ষিপ্ত হউক যাহাতে ইহাঁর শ্বাস ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। ইহাঁর এই গৃহ ঘৃতে সিঞ্চিত হউক, এবং ইহাঁর চিরকালের আবাস হউক। ১২।

"আমি তোমার উপর মৃত্তিকা স্থাপিত করিতেছি। যেন এই লোষ্ট্র তোমার উপর রাখিয়া তোমাকে ব্যথিত না করি। পিতৃরা তোমার সমাধি রক্ষা করুন, এবং যম তোমাকে এইখানে কল্যাণে রাখুন" ।১৩।

এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্যে অনায়াসে অনুভূত হইবে যে ইহাতে সমাধিরই বর্ণন হইয়াছে, দাহের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং মন্ত্রগুলি সূত্রগ্রন্থে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে দাহের পূর্ব্বে এতদ্দেশে সমাধি প্রচলিত ছিল। এবং সেই সমাধির সময় এই মন্ত্রগুলি পঠিত হইত।

কথিত হইয়াছে যে সমাধি প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কুক্কুর দ্বারা শব ভুক্ত করানর নিয়ম ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথা ছিল কি না তাহার মুখ্য প্রমাণ দৃষ্ট হয় না; পরন্তু তাহার গৌণ প্রমাণের অভাব নাই। এইক্ষণে তিব্বত-দেশে এই প্রথার প্রচার আছে। তিব্বতীয়েরা প্রাতে শব লইয়া একটি প্রাচীর-পরিবেষ্টিত শ্মশানভূমিতে গমন করে, এবং তথায় একটি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শবটিকে শ্মশান-রক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। তদনন্তর শ্মশানরক্ষক তাহার অনুচরদ্বারা ঐ শবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কএকটী পালিত-কুক্কুরকে খাইতে দেয়, এবং সমস্ত মাংস ও অধিকাংশ অস্থি ভুক্ত হইলে অবশিষ্ট অস্থিগুলি একটি কূপে নিক্ষেপ করে। কোন কোন মোগল জাতীয়দিগের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে। আর হিরোদোতস্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীসীয় গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন যে এইরূপ প্রথা পারসী, হির্কেনীয়, ও পার্থীয় জাতিয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অধুনা পারসীরা নির্জ্জন স্থানে শব ফেলিয়া রাখে, এবং তথায় কাক শকুন গৃধ্রাদিদ্বারা শবের মাংস ভুক্ত হইলে তাহার অস্থিগুলি একটি কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। পরন্তু নির্জ্জন স্থানে শব রাখিবার পূর্ব্বে তাহারা একটী অনুকল্প করিয়া থাকে তাহার নাম "শগ্‌দীদ্" অর্থাৎ "কুক্কুরদর্শন"। তাহার প্রধান অঙ্গ এই যে শ্মশানে শব আনিবার পর তাহার উপর কয়েকটি মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহার নিকট একটী কুক্কুর আনিয়া তাহার দর্শন করান। এই প্রক্রিয়াটী যে কুক্কুর-দ্বারা ভুক্ত করাইবার অনুকল্প তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কারণ অনুভূত হয় না। কুক্কুর-দ্বারা পিতা কি পুত্রের কি প্রিয়তমা স্ত্রীর দেহ ভুক্ত করান অত্যন্ত হৃদয়বিদারক কার্য্য; সভ্যতার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেই ইহা লোকে সহ্য করিতে পারে না; অথচ পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথারও একেবারে রহিত করা সুকঠিন, সুতরাং অনুকল্পের অনুসরণ করিতে হয়। মহিষ মেষ ছাগের পরিবর্ত্তে ইক্ষু কুষ্মাণ্ডের বলিদান যেরূপ অনুকরণ "শগ্‌দীদ্" ও সেইরূপ। এই দৃষ্টান্তে অনুভব হয় যে পারসীদিগের ন্যায় হিন্দুদিগের মধ্যে এককালে কুক্কুরদ্বারা শব ভুক্ত করাইবার প্রথা ছিল। পারসী ও হিন্দু এককালে এক জাতীয় ছিল; উভয়েই আর্য্য; উভয়ে একস্থানে বাস, এক প্রথার অনুসরণ, ও এক ধর্ম্মের যাজন করিত; সুতরাং উভয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা যে একই প্রকার ছিল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অপর যদিচ হিন্দুদিগের মধ্যে কুক্কুর-প্রক্রিয়া বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে, তত্রাপি মৃত্যুর সহিত কুক্কুরের সম্বন্ধ বিষয়ে অদ্যাপি সংস্কার লুপ্ত হয় নাই। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান সময়ে একটি কুক্কুর তাঁহার সহিত গিয়াছিল, কাব্যে তাহাকে ধর্ম্মের অবতার বলে; পরন্তু ধর্ম্ম শব্দে এস্থলে যম বা মৃত্যুরই উল্লেখ করা হয়। ঋগ্বেদে এই কুক্কুরের বিশেষ বিবরণ আছে। কথিত আছে যে যমের দুইটি কুক্কুর আছে; তাহারা ভীষণকায়;

পিঙ্গলবর্ণ, চতুরক্ষ, এবং বিস্তার নাসিকা বিশিষ্ট। তাহারা যমের বাটী রক্ষা করে, এবং সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া জীবের প্রাণ সংহার করিয়া যমসদনে লইয়া যায় *। প্রাচীন গ্রীকজাতীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ একটি গল্প প্রসিদ্ধ আছে; সেই গল্প যে তাহারা আর্য্যদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই; কারণ তাহারা আর্য্য জাতীয়ের শাখামাত্র।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই গল্পের অর্থ কি? ইহা যে রূপক গল্প তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এতদ্ভিন্ন ইহার কোন অর্থ উপলব্ধি হয় না। এবং রূপকত্ব স্বীকার করিলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই অনুভূত হয় যে কুক্কুরের সাহায্যে ইহলোকহইতে যমলোক যাইতে হয়। অপর পক্ষে মৃত্যুর পর শব কুক্কুরে খাইলেই জীবের ইহলোকের ব্যাপার শেষ হইত, এবং জীব পরলোকে নীত হইত। সুতরাং উভয় পক্ষেই ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্ত্তী কুক্কুর, এবং সেই কুক্কুর এই রূপক গল্পে অলঙ্কৃত হইয়া বেদে ও গ্রীসীয় ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে।

কথিত হইয়াছে যে তিব্বতদেশে শবভক্ষণ কার্য্য প্রাতঃকালেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এবং পূর্ব্বেও যে সেই প্রথা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা প্রস্তাবিত কুক্কুরের নামের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ কুক্কুরদ্বয়ের নাম "সারমেয়ৌ" বা সরমার পুত্র। সরমার অপর নাম উষা অর্থাৎ প্রাতঃকাল। অর্থাৎ যে প্রাতঃকালে যে কুক্কুর কাণ্ড হইত তাহা সারমেয় বা প্রাতঃকালীন কুক্কুরদ্বারা নিষ্পন্ন হইত। ইহাই প্রস্তাবোদ্দিষ্ট যমের কুক্কুর।

শ্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

* যৌ তে শ্বানৌ যমরক্ষিতারৌ
চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসা।
তাভ্যাং রাজন্ পরিদেহেনং
স্বস্তিচাস্মা অনমীবঞ্চ ধেহি।

আমি হারা।

পরাণের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে
আমি মোর হারাল' কোথায়?
ভ্রমিতেছি পথে পথে, খুঁজিতেছি তারে
ডাকিতেছি, আয়, আয়, আয়,
আর কি সে আসিবেনা হায়!

আর কিরে পাবনা'ক তায়?
হৃদয়ের অন্ধকারে গভীর অরণ্য তলে
আমি মোর হারাল' কোথায়?
দিবস শুধায় মোরে—রজনী শুধায়,
নিতি তারা অশ্রুবারি ফেলে,

শুধায় আকুল হ'য়ে চন্দ্র সূর্য্য তারা
"কোথা তুমি, কোথা তুমি গেলে!"
আঁধার হৃদয় হতে উঠিছে উত্তর
"মোরে কোথা ফেলেছি হারায়ে!"
হৃদয়ের হায় হায় হাহাকার ধ্বনি
ভ্রমিতেছে নিশীথের বায়ে!

হায় হায়!
জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিলরে হৃদয় মাঝারে,
দুলিতরে অরুণ দোলায়!
হাসি তার ললাটে ফুটিত,
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধর শয়নে।
হাসি শিশু আননে তাহার
খেলাইত চপল চরণে,
রবিকর খেলায় যেমন
তটিনীর নয়নে নয়নে।
ঘুমাইলে, নন্দন-বালিকা
গেঁথে দিত স্বপন মালিকা,
জাগরণে, নয়নে তাহার
ছায়াময় স্বপন জাগিত,
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,
চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে
জ্যোস্নাময় অমৃত মাগিত।
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখীটির মত
হরষে করিত শুধু গান!

কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয় মাঝারে
দুলিতরে অরুণ-দোলায়?
সচেতন অরুণ-কিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি!

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথ মাঝে উড়িলরে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।
নয়নে পড়িছে তার রেণু,
শাখা বাজে সুকুমার কায়,
ঘন ঘন বহিছে নিঃশ্বাস
কাঁটা বিঁধে সুকোমল পায়।
ধূলায় মলিন হ'ল দেহ,
সভয়ে মলিন হ'ল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখ পানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক!
কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায়?
পা'য় পা'য় বাজিতেছে বাধা,
তরু-শাখা লাগিছে মাথায়!
চারি দিকে, মলিন আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত-রবিকর?"
কেঁদে কেঁদে সাথে সে চলিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর,

"কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবি কর!"
প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথ হল পঙ্কিল, মলিন,
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হ'ল বল হীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায়!

রাখ' দেব, রাখ' মোরে রাখ',
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাক,
আজি চারি দিকে মোর একি অন্ধকার ঘোর,
একবার নাম ধ'রে ডাক'!
পারি না যে সামালিতে কাঁদি গো আকুল চিতে
কত রব মৃত্তিকা বহিয়া?
ধূলিময় দেহ মম ধূলায় আনিছে ডাকি
ধূলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া!
মলিন দেহের ভারে হৃদয় চলিতে নারে
হৃদয় পড়িছে ভুমে লুটি,
বিমল হৃদয় মাঝে পড়িছে দেহের ছায়া,
দেহের কলঙ্ক উঠে ফুটি।
জড়ের সহিত রণে হারিবে হৃদয় মোর,
মৃত্তিকার দাসত্ব করিবে!
এক মুষ্টি ধূলি লেগে অনন্ত হৃদয় মোর
চিরস্থায়ী কলঙ্ক ধরিবে!
হৃদে লাগে মৃত্তিকার ছাপ,
এ কি নিদারুণ অভিশাপ!

হারায়েছি আমার আমারে,
আজ আমি ভ্রমি অন্ধকারে।

কখন বা সন্ধ্যাবেলা, আমার পুরাণ' সাথী
মুহূর্ত্তের তরে আসে প্রাণে;
চারিদিক নিরখে নয়ানে।
প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,
নিজের সমাধি পরে নিজে বসি উপছায়া
যেমন নিঃশ্বাস ফেলে হায়,
কুসুম শুকায়ে গেলে, যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়,
তেমনি সে আসে প্রাণে, চায় চারিদিক পানে,
কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায়!
বলে শুধু "কি ছিল, কি হল,
সে সব কোথায় চলে গেল!"

* * * *

বহু দিন দেখি নাই তারে,
আসে নি এ হৃদয় মাঝারে।
মনে করি মনে আনি তার সেই মুখ খানি,
ভাল করে মনে পড়িছে না,
হৃদয়ে যে ছবি ছিল, ধূলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা!
ভুলে গেছি কি খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কি কথা বলিত!
যে গান গাহিত সদা, সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে!
যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ চেয়ে
আর তাহা পড়ে না স্মরণে!
শুধু যবে হৃদি মাঝে চাই
মনে পড়ে—কি ছিল, কি নাই!

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অনধিকার।

পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার অধিকার মধ্যে বাস করিতে পারিবেন না।" মহাত্মা জনক এই রূপ আজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ, কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুণ; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেই সমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাহা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! যদিও এই পুরুষ-পরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলা নগরীতে, ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলী মধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রতীত হইল না।

কালীসিংহের অনুবাদিত মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব্ব। অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়। ৪২ পৃঃ

জনক রাজার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছুকে আমরা আমার বলি, তাহার কিছুই আমার নয়। আমার সহিত তাহাদের ন্যূনাধিক সম্বন্ধ আছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার কিছু মাত্র অধিকার নাই। আমরা ষষ্ঠীকে যে, সম্বন্ধ কারক বলি, তাহা অতি যথার্থ, কিন্তু ইংরাজেরা যে তাহাকে Possesive case বলে তাহা অতি ভুল। মানুষের ব্যাকরণে সম্বন্ধ কারক আছে কিন্তু Possesive case নাই। একটি পরমাণুও আমরা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারি না, সম্পূর্ণ জানিতে পারি না, ধ্বংশ করিতে পারি না, নিয়মিত কালের অধিক রাখিতে পারি না। এমন কি, আমাদের শরীর ও মনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের অধিকার নাই। আমরা নিতান্ত দরিদ্র, একটি ধনীর প্রাসাদে বাস করিতেছি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার কতকগুলি গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতে দিয়াছেন মাত্র। একটি মন দিয়াছেন, একটি শরীর দিয়াছেন আরো কতকগুলি ব্যবহার্য্য পদার্থ দিয়াছেন। তাহার একটিকেও আমরা ভাঙ্গিতে পারি না, স্থানান্তর করিতে পারি না। যদি তাহা করিতে চেষ্টা করি, তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি কখনো ভ্রমক্রমে আমরা মনে করি—আমার শরীর আমার, ও সেই মনে করিয়া, তাহার প্রতি যথেচ্ছাচার করি, তৎক্ষণাৎ রোগ আসিয়া তাহার শাস্তি দেয়। এই জন্যই আমার শরীরকে পরের শরীরের মত অতি সন্তর্পনে রাখিতে হয়, যেন কে তাহা আমার জিম্মায় রাখিয়াছে; সর্ব্বদা সশঙ্কিত, পাছে তাহাতে আঘাত লাগে, পাছে তাহাতে আঁচড় পড়ে, পাছে তাহা মলিন হয়। মনকে যদি তুমি মনে কর আমার ও তাহার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার কর, তবে চিরজীবন মনের যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়, এই জন্য আমরা মনকে অতি সাবধানে রাখি, একটি কঠোর হস্ত তাহাকে ছুঁইবামাত্র আমরা সশঙ্কিত হইয়া উঠি। মন যদি আমার নয়, শরীর যদি আমার নয়, ত কে আমার?

অধিকার।

জনক রাজা কহিলেন এক্ষণে আমার মোহ নির্ম্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা আমি সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে; অথবা সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলত ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে।"

মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব্ব। অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৪৩ পৃঃ।

জনক রাজার উপরিউক্ত উক্তি লইয়া একটা তর্ক উপস্থিত হইল, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

আমি। যাহা কিছু আমি দেখিতে পাই, সকলি আমার।

তুমি। সে কি রকম কথা?

আমি। নহেত কি? যে গুণে তুমি একটা পদার্থকে আমার বল, সে গুণটি কি?

তুমি। অন্য সকলে যে পদার্থকে উপভোগ করিতে পায় না, অথবা আংশিক ভাবে পায়, আমিই কেবল যাহাকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পাই তাহাই আমার।

আমি। পৃথিবীতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি? কোনটার ঘ্রাণ, কোনটার শব্দ, কোনটার স্বাদ, কোনটার দর্শন কোনটার স্পর্শ আমরা ভোগ করি, অথবা একাধারে ইহাদের দুই তিনটাও ভোগ করিতে পারি। কিম্বা হয়ত ইহাদের সকল গুলিকেই এক পদার্থের মধ্যে পাইলাম, কিন্তু তবু তাহাকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি কই? জগতে আমরা কিছুই সর্ব্বতোভাবে জানি না, একটি তৃণকেও না,—তবে সর্ব্বতোভাবে ভোগ করিব কি করিয়া? কে বলিতে পারে আমাদের যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত

তবে এই তৃণটির মধ্যে দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ব্যতীতও আরো অনেক উপভোগ্য গুণ দেখিতে না পাইতাম ?

তুমি। তুমি অত সূক্ষ্মে গেলে চলিবে কেন ? "সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করার" অর্থ এই যে, মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততদূর উপভোগ করা।

আমি। এস্থলে তুমি উপভোগ শব্দ ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভ্রমাত্মক কথা কহিতেছ। প্রচলিত ভাষায় স্বত্ব থাকা ও উপভোগ করা উভয়ের এক অর্থ নহে। মনে কর, এক জন হতভাগ্য নিজে ভাঙ্গা ঘরে কুশ্রী পদার্থের মধ্যে বাস করে ও গৌরাঙ্গ প্রভুদের জন্য একটি অট্টালিকা ভাল ভাল ছবি, রঙ্গীন কার্পেট ও ঝাড় লণ্ঠন দিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, সে অট্টালিকা সে ছবি সে উপভোগ করে না বলিয়াই কি তাহা তাহার নহে ?

তুমি। উপভোগ করে না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে।

আমি। সে কথা নিতান্তই ভুল, যদি সে কোন অবস্থায় ছবি উপভোগ করিতে পারিত তবে তাহা নিজের ঘরেই টাঙ্গাইত। মূর্খ একটি বই কিনিয়া কোন মতেই তাহা বুঝিতে না পারুক্, তথাপি সে বইটিকে আপনার বলিতে সে ছাড়িবে না।

তুমি। আচ্ছা, উপভোগ করা চুলায় যাউক্। যে বস্তুর উপর সর্ব্ব সাধারণের অপেক্ষা তোমার অধিক ক্ষমতা খাটে। যে বইটিকে তুমি ইচ্ছা করিলে অবাধে পোড়াইতে পার, রাখিতে পার, দান করিতে পার, অন্যের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পার, তাহাতেই তোমার অধিকার আছে।

আমি। তবুও কথাটা ঠিক হইল না। শারীরিক ক্ষমতাকেইত ক্ষমতা বলে না। মানসিক ক্ষমতা তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীস্থ। তাহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ভ্রম সহজেই দেখিতে পাইবে। তুমি অরসিক, তোমার বাগানের গাছ হইতে একটি গোলাব ফুল তুলিয়াছ, তোমার হাতে সেটি রহিয়াছে, আমি দূর হইতে দেখিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে সে গোলাপটি ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিতে পার, সে ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু সে গোলাপটির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই, ইচ্ছা করিলে আর সব করিতে পার, কিন্তু মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে উপভোগ করিতে পার না ; আর, আমি তাহাকে ছিঁড়িতে পারি না বটে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি। তাহার গোলাব ছিঁড়িবার ক্ষমতা আছে, আমার গোলাপ উপভোগ করিবার ক্ষমতা আছে, কোন্ ক্ষমতাটি গুরুতর ? তবে কেন, সে তাহাকে "আমার গোলাপ" বলে, আর আমি পারি না ? গোলাপ সম্বন্ধে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা, আমার তাহা আছে, তবু সে গোলাবের অধিকারী আমি নহি। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, যে বলদ চিনি বহন করিয়া থাকে, প্রচলিত ভাষায় তাহাকেই চিনির অধিকারী কহে,

আর যে মানুষ ইচ্ছা করিলেই সে চিনি খাইতে পারে, সে মানুষের সে চিনিতে অধিকার নাই।

তুমি হয়ত বলিবে, যাহার উপর আমাদের শারীরিক ক্ষমতা খাটে, চলিত ভাষায় তাহাকেই "আমার" কহে। তাহাও ত ঠিক নহে, যাহার সহিত আমার হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ আছে তাহাকেও ত আমি "আমার" কহি।

তুমি। আচ্ছা, আমি হার মানিলাম। কিন্তু তুমি কি সিদ্ধান্ত করিলে শুনি।

আমি। যে কোন পদার্থ আমরা দেখি, শুনি, ইন্দ্রিয় বা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের। তুমি যে ফুলকে "আমার" বল, তুমি তাহাকে দেখিতে পার, স্পর্শ করিতে পার, ঘ্রাণ করিতে পাও, আমি আর কিছু পাই না, কিন্তু যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে সে মুহূর্ত্তেই তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ বাধিয়া গেল, সে সম্বন্ধ হইতে কেহ আমাকে আর বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তুমিও তাহার সব পাও নি, আমিও তাহার সব পাইনি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব ; তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব তোমারও সে, আমারও সে। এই জন্যই জনক কহিয়াছিলেন, " কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী আমি। ফলত ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান রহিয়াছে।" সন্ধ্যা বা উষাকে কেহ আমার সন্ধ্যা আমার উষা বলে না কেন ? যদি বল, তাহার কারণ, তাহারা সকল মানুষের পক্ষেই সমান, তাহা হইলে ভুল বলা হয়। আমি সন্ধ্যাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক উপভোগ করি, অতএব সেই উপভোগ-ক্ষমতার বলে তোমাদের কাছ হইতে সন্ধ্যার দখলি-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া সন্ধ্যাকে বিশেষ করিয়া আমার সন্ধ্যা বলিনা কেন ? তাহার কারণ আমি সন্ধ্যাকে সর্ব্বপ্রকারে অধিক উপভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের কাছ হইতে সেত একেবারে ঢাকা পড়ে নাই। এইরূপে একটা পদার্থকে কেহ বা কিছু উপভোগ করে, কেহ বা অধিক উপভোগ করে, কিন্তু সে পদার্থটা তাহাদের উভয়েরই।

উপভোগ।

মনুষ্যের যতদূর উপভোগ করিবার অধিকার করিবার ক্ষমতা আছে, স্পর্শেই তাহার চূড়ান্ত। যাহাকে সে স্পর্শ করিতে পারে তাহাকেই সে সর্ব্বাপেক্ষা আয়ত্ত মনে করে। এই নিমিত্ত ঋষিরা আয়ত্ত পদার্থকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বলিতেন। এই জন্য মানুষেরা ভোগ্য পদার্থকে প্রাণপণে স্পর্শ করিতে চায়। স্পর্শ করিতে পারাই তাহাদের অভিলাষের উপসংহার। আমাদের হৃদয়ে স্পর্শের ক্ষুধা চির জাগ্রত, এই জন্য যাহা আমরা স্পর্শ করিতে পারি তাহার ক্ষুধা আমাদের শীঘ্র মিটিয়া যায়, যাহা স্পর্শ করিতে পারি না, তাহার ক্ষুধা আর আর শীঘ্র মেটে না। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

তাঁহার দ্বাদশ সংখ্যক দপ্তরে একটি গীতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই গীতের একস্থলে আছে—

"মণি নও মাণিক নও যে হার করো গলেপরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।"

ইহা মনুষ্য-হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন। তোমার ঐ রূপ, যাহা দেখিতে পাইতেছি, তোমার ঐ হৃদয়, যাহা অনুভব করিতে পারিতেছি, উহা যদি মণির মত মাণিকের মত হইত, উহা যদি হার করিয়া গলায় পরিতে পারিতাম, বুকের কাছে উহার স্পর্শ অনুভব করিতে পারিতাম, আহা, তাহা হইলে কি হইত! উহার অর্থ এমন নহে যে "বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড় পদার্থ কেন?" আমরা যখন বঁধুকে স্পর্শ করি, তখন তাহার দেহ স্পর্শ করি মাত্র। তাহার দেহের কোমলতা, শীতোষ্ণতা অনুভব করিতে পারি মাত্র কিন্তু তাহার রূপ স্পর্শ করিতে পারি না ত, তাহার রূপ অনুভব করিতে পারিনাত। রূপ দৃশ্য হইল কেন, রূপ মণি মাণিকের মত স্পৃশ্য হইল না কেন? তাহা হইলে আমি রূপের হার করিতাম, রূপ দিয়া কেশের বেশ করিতাম। যখন কবিরা অশরীরী পদার্থকে শরীর-বদ্ধ করেন, তখন আমরা এত আনন্দ লাভ করি কেন? কবির কল্পনা বলে মুহূর্ত্ত আমাদের মনে হয় যেন তাহার শরীর আছে, যেন তাহাকে আমরা স্পর্শ করিতেছি। আমাদের বহুদিনের আকুল তৃষা যেন আজ মিটিল। যখন রাধিকা শ্যামের মুখ বর্ণনা করিয়া কহিল "হাসিখানি তাহে ভায়" তখন হাসিকে "হাসি খানি" কহিল কেন? যেন হাসি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যেন হাসিকে ছুঁইতে পারি, যেন হাসিখানিকে লইয়া গলার হার করিয়া রাখিতে পারি! তাহার প্রাণের বাসনা তাহাই! যদি হাসি "হাসিখানি" হইত, শ্যাম যখন চলিয়া যাইত, তখন হাসিখানিকে লইয়া বসিয়া থাকিতাম! আমাদের অপেক্ষা কবিদের একটি সুখ অধিক আছে। আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, কল্পনায় তাঁহারা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেন। উষাকে তাঁহারা বালিকা মনে করেন, সঙ্গীতকে তাঁহারা নির্ঝর মনে করেন, নবমালিকা ফুলকে তাঁহারা যেরূপ স্পর্শ করিতে পারেন, জ্যোৎস্নাকে তাঁহারা সেইরূপ স্পর্শ করিতে পারেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা সাহস করিয়া নবমালিকা লতার "বনজ্যোৎস্না" নামকরণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পাইয়াছি, তাহাকে আর স্পর্শ করিতে চাই না, যাহাকে স্পর্শ করিতে পাই না, তাহাকে স্পর্শ করিতে চাই। এ কি বিড়ম্বনা!

দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ।

হর্বর্ট স্পেন্সর তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "The use of Anthropomorphism" নামক প্রবন্ধে দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তৎবিষয়ে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। অগ্রে, তিনি যাহা বলেন, তাহা প্রকাশ করি, পরে আমাদের যাহা মত তাহা ব্যক্ত করিব।

স্পেন্সর বলেন মনুষ্য-সমাজে যখন যে ধর্ম্ম-মতের প্রাদুর্ভাব থাকে, তখনকার পক্ষে সেই ধর্ম্মমতই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। একথা শুনিলেই হয়ত অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন।

মনুষ্য-বিশেষ এবং মনুষ্য-সমাজ উভয়েই গাছের মত করিয়া বাড়ে, ইহাদের মধ্যে হঠাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই। তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনুষ্যের ধর্ম্মমত, মনুষ্যের রাজ্যতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রের ন্যায় অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে সময়ে যেরূপ ধর্ম্ম প্রয়োজনীয়, সে সময়ে সেইরূপ ধর্ম্ম আপনাআপনিই উদ্ভূত হইয়া থাকে। কেন হইয়া থাকে তাহা বিস্তৃত করিয়া বলা যাক।

ইহা সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বরকে কল্পনা করিতে গেলে, আমরা তাঁহাতে আমাদের নিজত্ব আরোপ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের মনের ধর্ম্ম। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল ধর্ম্মেই এই মানব-স্বভাব লক্ষিত হয়। কোন ধর্ম্মে ইহারই মাত্রাধিক্য দেখিলেই আমাদের ঘৃণা উদয় হয়। যখন শুনা যায়, পলিনেসীয় জাতির ধর্ম্মে তাহাদের দেবতারা মৃত মনুষ্যের আত্মা ভক্ষণ করে, অথবা প্রাচীন গ্রিসীয়দিগের দেবতারা কুটুম্ব-মাংস ভক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জঘন্যতম পাপাচরণ পর্য্যন্ত কিছুই বাকী রাখে নাই, তখন আমাদের মনে অতিশয় ঘৃণা উদয় হয়। কিন্তু যদি আমরা যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখি, যদি আমরা দেব ভক্তদিগের মনোভাব ও সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই ধর্ম্মই সেই অবস্থার উপযোগী, অতএব তাহা নিন্দনীয় নহে।

কারণ; ইহা কি সত্য নহে যে কেবল অসভ্য দেবতাদেরই ভয়ে অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দ্দান্ত হয়—তাহাদের শাসন-বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক, ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্ত্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক? বিশ্বাস-

ঘাতক, চৌর্য্য-বৃত্তি পরায়ণ, মিথ্যাবাদী হিন্দুরা যে তপ্ত-তৈল-কটাহপূর্ণ নরকে বিশ্বাস করে, ইহা কি তাহাদের পক্ষে ভাল হয় নাই? এবং এইরূপ নরক সৃষ্টি করিতে পারে এমন নিষ্ঠুর দেবতা থাকাও আবশ্যক, সেই জন্যই ত তাহাদের দেবতারা ফকির-দের আত্মপীড়ন দেখিয়া সুখী হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, অসভ্য মনুষ্যের পক্ষে অসভ্য দেবতাই উপযোগী। আমরা যে ঈশ্বরকে আমাদের নিজ স্বভাবের আদর্শ করিয়াই গড়ি, তাহা আমাদের পক্ষে শুভ বই অশুভ নহে।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, যে ধর্ম্ম যে অবস্থায় উপযোগী নহে, সে ধর্ম্ম সে অবস্থায় বল পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে গেলে কোন মতে টিকিতে পারে না। অসভ্য দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম নামেমাত্র খৃষ্টান ধর্ম্ম, অসভ্যদিগের প্রাচীনধর্ম্ম তাহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতে থাকে।

স্পেন্সরের মত উপরে উদ্ধৃত করা গেল, এক্ষণে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলি।

স্পেন্সরের প্রথম যুক্তি এই—মনুষ্য দেবতাকে নিজের আকার দিয়া পূজা করে, অতএব, মনুষ্যেরও যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, দেবতারও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। মনুষ্য যখন ক্রোধ পরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ থাকে, মনুষ্য যখন দয়াবান হয়, তখন তাহাদের দেবতারাও দয়াবান হয়, ইত্যাদি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, একটী জাতির দেব-চরিত্রে বা ধর্ম্মে যত দিন গর্হিত আচরণের উল্লেখ থাকিবে, ততদিন জানা যাইবে যে, সেই জাতির স্বভাবও গর্হিত।

স্পেন্সরের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, "যেমন মানুষ, তেমনি দেবতাই তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী।" তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল ধর্ম্মই স্ব স্ব ভক্তের নিকট উপযোগী। কারণ পূর্ব্বেই প্রমাণ হইয়াছে, মানুষ স্বভাবতই নিজেরই মত করিয়া দেবতা গড়িয়া লয়, এখন যদি প্রমাণ হয়, সেইরূপ দেবতাই তাহার পক্ষে যথার্থ উপযোগী, তাহা হইলেই প্রমাণ হইল যে, সকল জাতিরই নিজের নিজের ধর্ম্ম নিজের নিজের পক্ষে উপযোগী। স্পেন্সর ধর্ম্মের উপযোগিতা কাহাকে বলিতেছেন তাহাও এখানে বলা আবশ্যক। দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া রাখাই ধর্ম্মের উপযোগিতা।

স্পেন্সরের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যত দিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে, তত দিনই সে টিঁকিতে পারে, তাহার ঊর্দ্ধে নহে। অতএব জাতি বিশেষের স্বভাব যখন পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম অনুপযোগী হইয়া পড়ে, অতএব আপনাআপনিই ধ্বংশ হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে যদি নূতন ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে প্রচার করিতে যাও, তবে তাহা স্থান পায় না।

স্পেন্সর যে বলিতেছেন, যে, মনুষ্যেরা যখন নিজে ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ হয়, তাহাদের নিজের যে সকল দুষ্প্রবৃত্তি থাকে দেবতাদিগের প্রতিও তাহাই আরোপ করে,

তাহা নিতান্ত অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ যুক্তি। যদি এমন হইত, মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে নিজের মন হইতেই দেবতা কল্পনা করিত, বাহ্য-জগতের সহিত, আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সহিত দেবতা-কল্পনার কোন যোগ না থাকিত, তাহা হইলে স্পেন্সরের কথা সত্য হইত। কিন্তু তাহা ত নহে। ধর্ম্মের শৈশব অবস্থায় মনুষ্যেরা বাহ্য প্রকৃতির এক এক অংশকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। তখন সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, সকলি দেবতা। যদি কোন ভক্ত অগ্নিকে নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহার নিজের স্বভাব নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার দেবতাকেও নিষ্ঠুর করিয়াছে, যদি কেহ বায়ুকে কোপন-স্বভাব কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে নিজে কোপন-স্বভাব। সে যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, অগ্নি সহস্র জিহ্বা বিকাশ করিয়া কুটীর, গ্রাম, বন ধ্বংশ করিয়া ফেলিতেছে, সে তখন নিজে দয়ালু হইলেও অগ্নিকে নিষ্ঠুর দেবতা সহজেই মনে করিতে পারে। বাহ্য জগতে সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, জীবন মৃত্যু দুইই আছে, অতএব যাহারা বাহ্য-জগতের উপর দেবতা প্রতিষ্ঠা করে, তাহারা কতকগুলি দেবতাকে স্বভাবতই নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে। বিশেষতঃ অসভ্য অবস্থায় পদে পদে বিপদ, পদে পদে মৃত্যু, অতএব সে অবস্থায় নির্দ্দয় দেবতা কল্পনা কেবল মাত্র মনের উপরেই নির্ভর করে না। অতএব আমি দয়ালুই হই, আর নিষ্ঠুরই হই, অগ্নির ধ্বংশ-শক্তিকে যতদিন দেবতা বলিয়া মনে করিব, ততদিন তাহাকে নিষ্ঠুর বলিয়াই জানিব। আমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু অগ্নির স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না ত। অতএব দেবতার হীন স্বভাব হইতে মনুষ্যের হীন স্বভাব কল্পনা করা সকল সময় ঠিক খাটে না। আমাদের শাস্ত্র হইতে ইহার শত শত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মার নিজ কন্যার প্রতি আসক্তির বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সেরূপ ঘৃণিত আচরণ আর্য্যদিগের মধ্যে কখনই প্রচলিত ছিল না, তবে এরূপ অসঙ্গত কল্পনা কি করিয়া প্রাচীন আর্য্যদের হৃদয়ে উদিত হইল?

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—প্রজাপতি নিজের দুহিতা আকাশ অথবা উষাকে দেখিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হইলেন। দেবতাদের চক্ষে এ আচরণ পাপ, অতএব তাঁহারা কহিলেন, যিনি নিজের দুহিতা ও আমাদের ভগ্নীর প্রতি এরূপ আচরণ করেন, তিনি পাপ করেন, অতএব তাঁহাকে বিদ্ধ কর। রুদ্র তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।—আমাদের বোধ হয় ইহা উষার প্রতি কুজ্ঝটিকা-আক্রমণের রূপক। কারণ ভাগবত পুরাণের এক স্থলে আছে—পিতার অধর্ম্মে মতি দেখিয়া তাঁহার পুত্র মুনিগণ মরীচিকে পুরোভাগে লইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন "তুমি যে আত্মদমন না করিয়া নিজ-দুহিতাগামী হইয়াছ, এমন পূর্ব্বেও কখন কৃত হয় নাই, এমন পরেও কখন কৃত হইবে না। হে জগদ্গুরু,

যাহাদের অনুসরণ করিয়া লোকে ক্ষেম প্রাপ্ত হয় এমন তেজস্বীদের পক্ষে এ কার্য্য কিছুতেই প্রশংসনীয় নহে!" নিজের সন্তানদিগকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া প্রজাপতি লজ্জিত হইলেন ও নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘোর দেহ দিক্ আচ্ছন্ন করিল ও তাহাই পণ্ডিতেরা অন্ধকার নীহার বলিয়া জানেন।

ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মার কন্যা উষার পরিবর্ত্তে বাণী রহিয়াছে, আমরা উভয়কে মিলিত করিলাম। উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতেই দেখা যাইবে, ব্রহ্মার পাপাচরণ আর্য্যদিগের দ্বারা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু নিন্দনীয় হউক বা না হউক্, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, কুজ্ঝটিকা বল পূর্ব্বক উষাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে সত্য ঘটনা স্বরূপ।

গ্রীসীয় পুরাণে কোন দেবতা যদি নিজের কুটুম্বকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ কি এই যে, গ্রীসীয়গণ এমন অসভ্য ছিল যে, কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করিত, অথবা কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করা অন্যায় মনে করিত না? রজনী ও প্রভাত সম্বন্ধে এক সমস্যা শুনিয়াছিলাম, যে, জন্মাইয়া মাকে সন্তান খাইয়া ফেলিতেছে। উপরি উক্ত গ্রীসীয় কাহিনীও কি সেরূপ কোন একটা রূপকমূলক হইতে পারে না? যদি ইহা সত্য হয় যে, গ্রীসীয়গণ কুটুম্বকে ভক্ষণ করিত না ও কুটুম্ব ভক্ষণ করা পাপ মনে করিত, তবে তাহাদের দেবতাদের কেন কুটুম্ব মাংসে প্রবৃত্তি জন্মিল। যদি বল, অসভ্য অবস্থায় এককালে হয়ত গ্রিসীয়গণ আত্মীয়দিগকে উদরসাৎ করিয়া অধিকতর আত্মীয় করিত, সেই সময়েই উক্ত কাহিনীর আরম্ভ হয়—তবে, যখন সভ্য অবস্থায় গ্রীসীয়দের সে বিষয়ে মত ও আচরণ পরিবর্ত্তিত হইল, তখন তাহাদের বিশ্বাসও পরিবর্ত্তিত হইল না কেন?

মানুষেরা যে সকল কার্য্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অনুষ্ঠান করে না ও যে সকল কার্য্যকে নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করে, সে সকলও যদি তাহাদের দেবতায় আরোপ করে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তাহারা নিজের গুণ দোষ গুলিই দেবতায় আরোপন করে?

অবস্থানুসারে সকল ধর্ম্মই উপযোগী ইহাই প্রমাণ করিতে গিয়া স্পেন্সর বলিতেছেন, "ইহা কি সত্য নহে যে, কেবল অসভ্য দেবতাদের ভয়েই অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দ্দান্ত হয়, তাহাদের শাসন-বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্ত্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা পরায়ণ হওয়া আবশ্যক?" স্পেন্সরের এ কথাটাও সর্ব্বাঙ্গীন সত্য নহে। ধর্ম্মের একটা অবস্থা আছে, যখন কার্য্যসিদ্ধির জন্য, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ও স্বভাবতঃ অনিস্টকারী দেবতাদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্য দেব-আরাধনা করাই ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য

থাকে। চুরী করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, খুন করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, কার্য্যসিদ্ধি হইবে। শত্রু দেশ আক্রমন করিয়াছে, দেবতার পূজা করিলাম, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব। ওলাবিবি, শীতলা, মন্‌সা প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করি, নহিলে তাহারা আমার অনিস্ট করিবে। এরূপ অবস্থায় দেবতারা যতই নিদারুণ হউক না কেন, উপাসকদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য তাহারা কিছুমাত্র উপযোগী নহে, বরঞ্চ দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজক ও দুষ্কর্ম্মের সহায়। কালীর উপাসনা করিয়া ও কালীর নিকট নরবলি দিয়া দস্যুদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তির কি কিছু উপশম হয়? তাহারা কি তাহাদের দুষ্কর্ম্মে দ্বিগুণ বল পায় না? অন্য শত সহস্র বাহ্য কারণ হইতে দস্যুদের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু যুগযুগান্তর কালী পূজা করিয়া আসিলে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বর্দ্ধিত হইবে বই হ্রাস হইবে না। তবে দেবতা নিদারুণ হওয়াতে উপাসকের দুর্দ্দান্ত ভাবের দমন হইল কৈ? বরঞ্চ সে আরো স্ফূর্ত্তি পাইল। সমাজের যখন কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, যখন, দেবতাদের কতকগুলি শুভ আদেশ আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও সেই গুলি লঙ্ঘন করিলে দেবতার কোপ দৃষ্টিতে পড়িতে হইবে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তখন স্পেন্সরের কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু সে অবস্থা সমাজের অনেক উন্নতির ফল। এখনো শত শত লোক চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কেবল মাত্র বিপদ সম্পদের জন্যই দেব-আরাধনা করে, তাহারা অন্যায় মকদ্দমা জিতিবার জন্য, নিরীহ ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার জন্য দেবতার পূজা করে ও একবার মনেও করে না যে, দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্যই দেবতার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা তিন সন্ধ্যা দেবতার পূজা করিতে ভোলে না, কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অসঙ্কোচে শত সহস্র পাপাচরণ করে। পূজার একটা ফুল কম পড়িলে, একটা সামান্য ত্রুটি থাকিলে তাহারা সশঙ্কিত হইয়া উঠে, অথচ অন্যায় কাজ করিতে কিছু মনেই করে না। দেবতার নিকট রক্তপাত করিয়া ও দেবতার নিকট মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহাদের স্বভাবের কি উন্নতি হইতে পারে?

এইস্থলে হর্বার্ট স্পেন্সর একটি গোঁজামিলন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"Certainly, such conceptions as those of the Greeks, who ascribed to the personages of their Pantheon every vice, are repulsive enough. But * * * the question to be answered is, whether these beliefs were beneficent in their effects on those who held them,

এই সকল বিশ্বাস যে উপাসকদিগের পক্ষে যথার্থ হিতসাধক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, অসভ্যদের

প্রকৃতি যতই দুর্দ্দান্ত হয় ততই তাহাদের শাসন কঠোর হওয়া আবশ্যক। এবং শাসন কঠোর হইতে গেলেই শাসনকর্ত্তা দেবতাদিগকেও নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। যতটুকু স্পেন্সরের যুক্তির পক্ষে আবশ্যক, ততটুকুই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশটুকু গোপন করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠুরতাই কিছু একমাত্র পাপ-প্রবৃত্তি (Vice) নহে। দেবতা নিষ্ঠুর না হইতেও পারে, দেবতা যদি চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ শঠ হয়, দেবতা যদি মিথ্যাবাদী ভীরু হয়, তাহা হইলে সে দেবতা উপাসকের কি হিতসাধন করিতে পারে জানিতে ইচ্ছা করি! সকল দেবতারই যদি উপযোগিতা থাকে এমন মত হয়, তবে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর কি? সুতরাং ছাঁটিয়া এই দাঁড়ায় যে, 'স্পেন্সরের মতে অসভ্য অবস্থায় নিষ্ঠুর দেবতারই উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ কথাও সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। সমাজের এমন অবস্থা আছে, যখন দেবতা যতই নিষ্ঠুর হউক্ না কেন, উপাসকদিগের দুর্দ্দান্ত ভাব আরো বর্দ্ধিত হইতে থাকে বৈ হ্রাস পায় না।' যদি বল, সে সময়ে তাহাদের নিজ ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম তাহাদের নিকট টিঁকিতে পারে না, অতএব সেই ধর্ম্মই তাহাদের পক্ষে এক মাত্র সম্ভব ধর্ম্ম ও সেই হিসাবে উপযোগী ধর্ম্ম, তবে আমরা বলি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? স্পেন্সর যে একমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকটে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন, ফিজি দ্বীপবাসী ভেওয়া খৃষ্টান অনুতাপীগণ আত্মার অশান্তিবশতঃ অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; চেতনা লাভ করিয়া তাহারা পুনরায় প্রার্থনা করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পেন্সর কহিতেছেন, ফিজি দ্বীপবাসীগণ নিতান্ত অসভ্যজাতি। তাহারা মানুষ খায়, শিশু হত্যা করে, নরবলি দেয়। তাহাদের পরিবারের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস নাই। তাহারা সর্পের পূজা করে। দেখা যাইতেছে, তাহারা খৃষ্টান হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতিহিংসা, অনন্ত যন্ত্রনা ও সয়তান-তন্ত্র টুকুই বাছিয়া লইয়াছে। এই নিমিত্তই তাহারা ভয়ে আর্ত্তনাদ করে। তাহাদের সেই পুরাতন সর্প-উপাসনাই খৃষ্টান ধর্ম্ম নাম ধারণ করিয়াছে মাত্র। উন্নততর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভেওয়া খৃষ্টানগণের যে কিছু উন্নতি হয় নাই, উপরি উক্ত দৃষ্টান্তে তাহার কিছু প্রমাণ হয় না।

যদি এমন যুক্তি প্রয়োগ কর যে, যতদিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে ততদিনই সে টিঁকিতে পারে, তাহার ঊর্দ্ধে নহে, অতএব যে ধর্ম্ম যে দেশে টিঁকিয়া আছে, সে ধর্ম্ম সে দেশের উপযোগী। তবে সে সম্বন্ধেও আমাদের দুই একটি কথা আছে।

মনুষ্য স্বভাবে উভয়ই আছে, স্থিতিশীলতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা। আবশ্যকের উপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তন যে হইয়াই থাকে তাহা নহে। মনুষ্য স্বভাবে কেন, সমস্ত জগতেই এই নিয়ম। প্লায়োসীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ঘোড়ার পায়ে যে অঙ্গুলীর অসম্পূর্ণ আরম্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা তাহার কোন কাজে লাগে না, উপযোগিতার নিয়মানুসারে তাহা কেন ধ্বংস হইল না? স্তন্যপায়ী জীবের পুরুষ জাতিরও স্তন আছে, এমন কি তাহাদের "mammary glands" পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, অনেক পুরুষের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। পুরুষ জীবেরা যে কোন কালে শাবকদিগকে স্তনপান করাইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যদি পুরুষ মানুষ সন্তানকে স্তন দান করিয়া না থাকে তবে এই অনাবশ্যক প্রত্যঙ্গ কেন পুরুষ শরীরে বর্ত্তমান রহিল?

উপাধ্যায় হেকেল বলেন, জীবিত প্রাণীদিগের মধ্যে দুই প্রকারের উদ্যম আছে; এক কেন্দ্রানুগ (centripetal) যাহাতে করিয়া তাহাদের বংশপরম্পারাগত বিশেষত্ব রক্ষা করে; আর এক কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) যাহাতে করিয়া বাহ্য অবস্থার অনুকূল করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তন সাধন করে। অর্থাৎ নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় না পড়িলে অনেক অনাবশ্যক অঙ্গ প্রত্যঙ্গও থাকিয়া যায়। The Genealogy of Animals নামক প্রবন্ধে উপাধ্যায় হক্সলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই,—

"I think it must be admitted that the existence of an internal metamorphic tendency must be as distinctly recognized as that of an internal conservative tendency; and that the influence of conditions is mainly, if not wholly, the result of the extent to which they favour the one, or the other, of these tendencies"

এই নিয়ম ধর্ম্ম সম্বন্ধেও খাটে। যদি স্বীকার করা যায়, যে অসভ্য অবস্থার দুর্দ্দান্ত হৃদয় দমনে রাখিবার জন্যই কুম্ভীপাক প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ নরক স্বভাবতই কল্পিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, যত দিন পর্য্যন্ত কোন জাতির সেই নরকে বিশ্বাস বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই যে, তাহাদের সেই অসভ্য অবস্থা ও দুর্দ্দান্ত হৃদয় আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে তাহা নহে। অবস্থা-বিশেষে একটা বিশ্বাসের জন্ম হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে সেই বিশ্বাসের ধ্বংশ হয় তাহা নহে। বিশেষতঃ স্বর্গ নরকের বিশ্বাস শীঘ্র ধ্বংশ হইবার কোন কারণ নাই; তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সে বিশ্বাসের প্রতিকূল অবস্থা বিশেষ কিছুই বর্ত্তমান নাই। অতএব একবার যাহা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা পুনশ্চ ভাঙ্গিয়া অবিশ্বাস

করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকের উল্লেখ করিয়া হর্বার্ট স্পেন্সর হিন্দুদিগকে বিশ্বাস ঘাতক, চৌর, মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ইহাই যদি হইল, তবে আমরা খৃষ্টানদিগকে কি না বলিতে পারি! আমাদের শাস্ত্রে অনন্ত যন্ত্রনা নাই। যাহাদের অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে, না জানি তাহাদের স্বভাব কি পৈশাচিক হইবে! আসল কথা এই—বিশ্বাসকে মানুষেরা উপযোগিতার চক্ষে দেখে না। "আবশ্যক হইয়াছে, অতএব, আইস আমরা বিশ্বাস করি" এমন করিয়া যদি লোকে বিশ্বাস করিত, "আবশ্যক চলিয়া গিয়াছে, অতএব আইস আমরা বিশ্বাস করিব না" এমন করিয়া যদি বিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে সমস্তই অত্যন্ত সহজ হইয়া যাইত। একবার যাহা বিশ্বাস হয়, সে বিশ্বাস অনেক কাল চলিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করি। কোন রাজ্যে এক জনের দোষে যদি আর একজনকে শাস্তি দিবার প্রথা থাকে, তবে সে প্রথাকে কে না নিন্দা করিবে? ন্যায়পরতার যে ভাব আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত উক্ত রূপ বিচারের ঐক্য হয় না। কিন্তু মনুষ্যের নিমিত্ত খৃষ্টের মৃত্যু ঘটনাকে খৃষ্টানেরা কেন ঈশ্বরের ন্যায়পরতার প্রমাণ স্বরূপেই উল্লেখ করেন? তাঁহারা নিজে যাহা করেন না, অন্যকে যাহা করিতে দেখিলে নিন্দা করেন, তাহাকেই ন্যায়পরতা বলিয়া ১৮০০ বৎসর বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন কি রূপে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে বিশ্বাস কি রূপে চলিয়া আসে? ইংরাজেরা অনেকে যে বিশ্বাস করেন যে, এক টেবিলে ১৩ জন খাইলে তাহাদের মধ্যে ১ জনের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অনেকবার হয়ত তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন তথাপি তাহা যায় না কেন?

অবশেষে জিজ্ঞাসা করি, গরীব হিন্দুদিগের প্রতি কেন যে নানাবিধ রূঢ় বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কি একটা কারণ আছে? কুম্ভীপাক নরকের কথা পড়িয়াই কি স্পেন্সর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতক, চোর, মিথ্যাবাদী? না, উহা একটা জানা সত্য, ও বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি বা দ্বিমত হইতে পারে না? হিন্দুরা যে বিশ্বাসঘাতক, চোর ও মিথ্যাবাদী সেইটে আগে প্রমাণ করিয়া তার পরে কুম্ভীপাক নরকের কথা তুলিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিলে ঠিক ন্যায়-শাস্ত্র-অনুযায়ী কাজ হইত।

স্পেন্সর বলিয়াছেন, হিন্দুদের কঠোর নরক আছে, অতএব নিষ্ঠুর দেবতাও আছে। দেবতারা যে নিষ্ঠুর, তাহার প্রমাণ কি? না, তাহাদের ফকীরেরা আত্মপীড়ন করে। যে দেবতারা কষ্ট দেখিয়া সুখী হয়, তাহারা অবশ্য নিষ্ঠুর। প্রথমতঃ ফকীরেরা হিন্দু নহে। দ্বিতীয়তঃ অনেক হিন্দু দেবতার নিকট আত্মপীড়ন করিয়া থাকে বটে (যেমন তাড়কেশ্বরের নিকট হত্যা দেওয়া ইত্যাদি) কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহাদের দেবতা নিষ্ঠুর। বরঞ্চ উল্টাটাই সত্য। আমাদের দেশে অনেক ভিক্ষুক আছে, তাহারা হত্যা দিয়া ভিক্ষা আদায় করে। তাহার কারণ এমন নহে যে ভিক্ষাদাতারা কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া ভিক্ষুককে পুরস্কার দেন। মনুষ্যের পরকষ্ট-অসহিষ্ণুতার প্রতি ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুকদের এমন বিশ্বাস আছে যে তাহারা ভিক্ষা করিবার জন্য নিজেকে পীড়ন করে। দেবতার দয়ার প্রতিও হিন্দু উপাসকের তেমনি বিশ্বাস। সে জানে যে, আমি যদি নিজেকে এত খানি কষ্ট দিই, তবে দয়াময় কখনই সহিতে পারিবেন না, নিশ্চয়ই আসিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন যদি আমাদের তপস্বীদিগকে স্পেন্সর ফকির বলিয়া থাকেন তবে সে সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে দেহকে দমন করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিবার জন্য তপস্বীরা যে ঐহিক সুখ ও আরাম হইতে ইচ্ছা পূর্ব্বক নিজেকে বঞ্চিত করিতেন, পাশ্চাত্য দার্শনিক তাহার মর্ম্ম হয়ত ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে স্পেন্সরের ভ্রম বদ্ধমূল। এ ভ্রম কেবল মাত্র যে, এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার Data of Ethics নামক গ্রন্থে স্পেন্সর ঠিক এই কথা গুলিই বলিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়-বিভ্রম।

ইন্দ্রিয়-বিভ্রম কাহাকে বলে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি কি, তাহা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে, কি কারণে এই সকল ইন্দ্রিয়-বিভ্রম উপস্থিত হয় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রথমতঃ দেখা যায়, বহির্ব্বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার সময় যদি আমাদের মনোযোগের অভাব হয়, তাহা হইলে সেই বাহ্য বিষয়ের প্রতিবিম্ব আমাদের ইন্দ্রিয়-মুকুরে অতি অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়—এবং এই অস্পষ্টতা নিবন্ধন আমরা কখন কখন ইন্দ্রিয় বিভ্রমে পতিত হই। এই কারণ বশতঃ এক-জন ভীরু ব্যক্তি, একটা কিছু হঠাৎ দেখিয়া "ভূত" বলিয়া মনে করে, কারণ তাহার ভয়-বিহ্বলতা প্রযুক্ত সে সেই বাহ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্নিগ্ধ-মস্তিষ্ক ও ধীর-প্রকৃতি সে এরূপ ভ্রমে সহজে পতিত হয় না। অনেক

সময়ে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব সকলের (Sense impression) যথার্থ শ্রেণী নিরূপণ করিতে পারি না বলিয়া—তাহাদিগকে ঠিক চিনিতে পারি না বলিয়াই আমরা ভ্রমে পতিত হই। যাহার সহিত আমরা বিশেষ-রূপে পরিচিত নই, এরূপ নূতন কোন ইন্দ্রিয়-বোধ আমাদের উপস্থিত হইলে আমরা সেই বোধটিকে কল্পনায় অনেক সময় অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলি। আমাদের পূর্ব্বানুভূত কোন ইন্দ্রিয়বোধের সহিত এই নবানুভূত ইন্দ্রিয় বোধটিকে এক শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না বলিয়াই আমরা স্বভাবত ইহার তীব্রতা ও পরিমাণকে আমাদের কল্পনায় অতিরঞ্জিত করি। তাহার দৃষ্টান্ত, আমাদের শরীরের এমন কোন অংশে যদি আমরা কোন লঘু বন্ধন পরিধান করি, যে অংশে সচরাচর কোন বাধা বন্ধন থাকে না—তাহা হইলে সে বন্ধন অত্যন্ত লঘু হইলেও, আমাদিগের নিকট অত্যন্ত গুরুভার বলিয়া মনে হয়। আমাদের একটি দাঁত পড়িয়া গেলে মুখ মধ্যে যেন একটা বৃহৎ গহ্বর হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে যে একটা অদ্ভুত ভাব অনুভূত হয়, তাহাও ইহার আর এক দৃষ্টান্ত হইতে পারে। আমাদের ভাষায় যে একটি চলিত কথা আছে—'অনভ্যাসের ফোটায় কপাল চচ্চড় করে"—তাহার মূলে উপরোক্ত তত্ত্বটি নিহিত। স্বপ্নে কখন কখন যাহা বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা বেশি মাত্রায় কেন আমরা অনুভব করি তাহাও কতকটা এই তত্ত্বানুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, যে সকল ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব অস্পষ্টরূপে আমাদের মনোমধ্যে প্রতিভাত হয়, তাহাদিগকে প্রায়ই আমরা অযথা রূপে শ্রেণীবদ্ধ করি। কোন একটি বিশেষ বর্ণ কিম্বা আকার ঘটিত আমাদের কোন ইন্দ্রিয়বোধ যদি অস্পষ্ট হয় তাহা হইলে অন্য ইন্দ্রিয়বোধের সহিত তাহা অনায়াসে মিশিয়া যাইতে পারে এবং এইরূপে ভ্রমের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এইরূপে, দূরস্থিত বস্তু সকলের যে সকল প্রতিবিম্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিভাত হয়, প্রায়ই আমরা তাহাদের অযথা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি।

আমাদের চক্ষু যখন কোন একটি পদার্থের প্রতি স্থিররূপে প্রযুক্ত না হয়, অথচ যদি তাহাতে সেই পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রতিবিম্ব অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়। বিশেষতঃ যদি সেই পদার্থটি দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অনুপযোগী দূরে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে এই অস্পষ্টতা আরও বৃদ্ধি হয়। এই অবস্থায় যদি ঐ অস্পষ্ট প্রতিবিম্বের প্রতি আমরা সহসা মনোযোগ দি, তাহা হইলে আমরা ঐ পদার্থকে ঠিক বুঝিতে পারি না, সহজেই ভ্রমে পতিত হই। Sir David Brewster তাঁহার "Letters on Natural magic" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যখন আমরা জানেলার মধ্য দিয়া কোন বাহিরের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন যদি সেই জানেলার শার্শির উপর কোন মাছি দেখিতে পাই, তখন সেই মাছিকে বাস্তবিক অপেক্ষা

অনেক বড় বলিয়া আমাদের মনে হয়—মনে হয় অনেক দূরে যেন একটি পাখি রহিয়াছে। weber পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কম্‌পাস নামক পরিমাপ যন্ত্রের দুইটি শলাকা একটু ফাঁক করিয়া ধরিয়া তাহাদের অগ্র বিন্দু শরীরের কোন অংশে সংলগ্ন করিলে দুইটি শলাই পৃথক রূপে অনুভব করা যায়—আবার শরীরের আর কোন অংশ বিশেষে সংলগ্ন করিলে একটি শলা বলিয়া অনুভব হয়। ইহার কারণ কি? এরূপ কি বলা যায় না, যে আমরা দুইটি শলারই স্পর্শ অনুভব করি কিন্তু ঐ অভনুব দ্বয় এত এক রকমের যে উহাদের পার্থক্য আমার উপলব্ধি করিতে পারি না, দুইটি অনুভব পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায়? ক্রমাগতক মনোযোগ দিতে দিতে আবার দুইটি শলাকার পার্থক্য আমরা অনুভব করি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, আমাদিগের এই যে ইন্দ্রিয়বোধ ইহার কতখানিই বা বিশেষ প্রকারের স্নায়বীয় উত্তেজনার ফল—এবং কতখানিই বা মনোযোগ বিচার শক্তি প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার ফল?—পূর্ব্বোক্ত কম্পাসের শলাকাদ্বয়ের পার্থক্য যদি খুব মনোযোগ দিলেও আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে যে দুইটি শলাকার স্পর্শ-জনিত দুইটি অনুভব একরকমের বলিয়া যে পরস্পর মিলিয়া যায় এবং এই জন্য যে আমাদের ভ্রম হয় এরূপ নহে—স্থানীয় স্পর্শ শক্তির সীমার প্রতি লক্ষ্য না করায় আমরা ঐ অনুভবের অযথা ব্যাখ্যা করি এবং এই জন্যই ভ্রমে পতিত হই। স্পর্শ শক্তির সীমা কি এই খানে একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। শরীরের কোন অংশের অল্প পরিসরের মধ্যে কোন দুইটি বস্তু এক সঙ্গে পৃষ্ট হইলে দুই বস্তু এক বলিয়া আমাদের অনুভব হয়। ত্বকের এক একটি অংশ বিশেষের নির্দ্দিষ্ট পরিসর আছে তাহার মধ্যে বহু বস্তু স্পৃষ্ট হইলেও আমরা একটি স্পর্শ মাত্র অনুভব করি। একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে দুই বস্তু আমাদের ত্বকে স্পৃষ্ট হইলে তবে আমরা তাহাদের পার্থক্য অনুভব করি। ইহা আমাদের স্নায়ুর বিশেষ ধর্ম্ম। ইহা বোধ হয় সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব সকলের এইরূপ অযথা ব্যাখ্যা করিয়া আমরা যে সকল ভ্রমে পতিত হই তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমত কোন একটি বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হইলে, হয় অনুসঙ্গ নিয়মের সাহায্যে তাহার একটি প্রতিমা আমাদের মনো মধ্যে উদিত হয়—নয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (Preperception) প্রক্রিয়া অনুসারে আমরা একটি প্রতিমা মনো মধ্যে সৃজন করি। কাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে কখন যদি প্রতিধ্বনি উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ আমাদের এই ভ্রম হয় যেন আর এক জনের কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই-

লাম ; কারণ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে দ্বিতীয়-বার শব্দ আহত হওয়ায় অনুসঙ্গের নিয়মানুসারে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের প্রতিমা আমাদের কল্পনায় আপনা হইতেই উদিত হয়। পক্ষান্তরে, যখন ভূতের গল্প শুনিয়া কোন ব্যক্তির কল্পনা অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া থাকে, তখন হয়তো সে অতি পরিচিত দ্রব্য সামগ্রীকেও ভূত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয় ; কারণ সেই সময়ে এই প্রকার কাল্পনিক প্রতিমা সৃজন করিবার দিকে তাহার মনের গতি স্বভাবতই প্রবল হইয়া উঠে। প্রথম শ্রেণীর বিভ্রমগুলি বাহির হইতে উৎপন্ন হয়—ইন্দ্রিয় প্রতিবিম্বই তাহাদের আরম্ভ-স্থল। এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধই সর্ব্বেসর্ব্বা, পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইহার শাসনাধীন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভ্রমগুলি অন্তর হইতে—কল্পনার আত্ম-স্ফূর্ত্ত স্বাধীন উদ্যম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত স্থলে মন অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াধার ভাবে (Passive) থাকে ; দ্বিতীয় স্থলে উহা কর্ত্তৃভাবাপন্ন (Active)—ইন্দ্রিয় প্রতিবিম্বের উপর উহা সাক্ষাৎরূপে কার্য্য করে।

সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশে আমরা একটি শ্রেণীর প্রাকৃতিক এবং অপরটীর পৌরুষিক আখ্যা দিলাম।

এক্ষণে প্রাকৃতিক বিভ্রমের বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, আমাদের স্নায়বীর গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব অনুসারে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধক্ষমতার (Sensibility) কিরূপ তারতম্য উপস্থিত হয় ও সেই ক্ষমতার কত দূর সীমা তাহাই এখানে বিবৃত করা যাইতেছে।

ইহা জানা কথা যে, বাহ্য উত্তেজকের যতখানি তীব্রতা ও পরিমাণ, ঠিক সেই তীব্রতা ও পরিমাণের সহিত সকল সময়ে উত্তেজিত ইন্দ্রিয়বোধের তীব্রতা ও পরিমানের ঐক্য হয় না। কোন ইন্দ্রিয় বোধ হইবার পূর্ব্বে কতকটা উত্তেজনার আবশ্যক। অনেক সময়ে আমাদের মনোযোগের অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনাগুলির (Stimuli) অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, এবং ইহা হইতে এক শ্রেণীর বিভ্রম উৎপন্ন হয়। ট্রেন ছাড়িবার সময় যখন, কখন্ ট্রেন ছাড়িবে বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত আমরা নিরীক্ষণ করিতে থাকি, তখন উহা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া কখন কখন আমাদের ভ্রম উপস্থিত হয়। তাহার কারণ এই যে, সেই সময় যখন আমরা ঔৎসুক্যের সহিত নিরীক্ষণ করিতে থাকি তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে চক্ষের পেশী সকল ঈসৎ সঞ্চালিত হয়, এইরূপ অজ্ঞাতসারে আমাদের চক্ষু পেশী সমূহে গতি উপস্থিত হওয়ায় এবং আমাদিগের ঔৎসুক্য জনিত কল্পনা উত্তেজিত হওয়ায় আমাদের এই মনে হয় যেন সত্যই ট্রেনটি চলিতেছে। এই প্রকার বিভ্রম শুধু ইন্দ্রিয় ঘটিত নহে, ইহাতে কল্পনারও উপাদান আছে। স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ যে উপায়ে টেবিল সঞ্চালন করেন, বোধ হয় তাহার মূলে এই তত্ত্বটি নিহিত। টেবিল-সঞ্চালক প্রতিক্ষণ মনে করেন যে এইবার

টেবিল চলিবে এবং একটু একটু করিয়া কতকটা পৈশিক শক্তি তাহার উপর অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করেন।

আমাদের দুইটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বোধ—অনেক সময়ে মিশিয়া গিয়া আমাদের নিকট একটি বলিয়া মনে হয়। কম্পাসের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বোধ হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, স্নান করিয়া গামছা দিয়া মাথা রগড়াইবার পর চুলে জল না থাকিলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভিজে ভিজে বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কি ?—Helmholtz ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। আমরা যাহাকে আর্দ্র কিম্বা ভিজে ভাব বলি তাহা মিশ্র ভাব। শীতাতপ বোধ ও প্রকৃত স্পর্শবোধ এই উভয় বোধই উহার মধ্যে জড়িত। এই দুইটি বোধ প্রায় একত্রে উপস্থিত হয় বলিয়া আমরা উহাদিগকে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলি। আমরা যে দুই চক্ষু দিয়া এক বস্তু দর্শন করি ইহাও এই সংমিশ্রণের অন্যতর দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয় উত্তেজনার আর একটি নিয়ম এই যে, কোন উত্তেজকের ক্রিয়া স্থগিদ হইলেও তাহার আভাস কিছু কালের জন্য আমাদের অনুভবে থাকিয়া যায়। এইরূপ "পশ্চাৎ অনুভব" নিবন্ধন আমাদের কখন কখন ভ্রম উপস্থিত হয়—আমাদের মনে হয় বুঝি সেই উত্তেজক পদার্থ এখনও কার্য্য করিতেছে। কোন শিশুর ক্রন্দন কিছুকাল ধরিয়া শুনিলে পর তাহার ক্রন্দন থামিলেও আমাদের মনে হয় বুঝি সে এখনও কাঁদিতেছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত আঙ্গুলে আংটি পরিয়া তাহার পর যদি খুলিয়া ফেলা যায় তখনও সেই আঙ্গুলে আংটি আছে বলিয়া অনেক সময়ে আমাদের ভ্রম হয়। কোন উত্তেজক অপসৃত হইবার পরেও যে আমাদের স্নায়বীর গঠন সকলে পূর্ব্ব-উত্তেজন-জনিত কম্পন কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়—এই তথ্যটি হইতে আর একটি বিষয়ের তথ্য জানা যায়। যখন দুইটি বিচ্ছিন্ন উত্তেজনা (Stimulation) একটির পর আর একটি পরস্পর দ্রুতরূপে অনুসরণ করে, তখন এই দুইটি উত্তেজনা বিচ্ছিন্ন হইলেও আমাদের নিকট অবিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই তথ্যটি হইতে অনেক প্রকার দৃষ্টি বিভ্রম উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রঙ্গের ঘের-দেওয়া একটি লাঠিম যখন খুব ঘুরিতে থাকে, তখন এই কারণেই উহার বিভিন্ন রং গুলি এক বলিয়া মনে হয়; একটি জ্বলন্ত চালা কাঠ যখন দ্রুত রূপে ঘুরানো হয় তখন তাহাকে একটি অবিচ্ছিন্ন আলোক-চক্র বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাজিকরেরা যে অনেক প্রকার হাতের চালাকি দেখায় তাহার মধ্যে অনেকগুলি, কতকটা এই তথ্যানুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোন দুইটি কার্য্য কিম্বা দুইটি ঘটনা শ্রেণী, যাহার প্রতি বাজিকর দর্শকের মনকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করে, সেই কার্য্যদ্বয় কিম্বা ঘটনাশ্রেণীদ্বয় যদি একটির পর আর একটি দ্রুত রূপে অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অত্যল্প ব্যবধান

থাকা হেতু তাহাদিগকে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া দর্শকের ভ্রম হয়—সে কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে ঐ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে আর কোন তৃতীয় ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

আমাদের ইন্দ্রিয়বোধক্ষমতার আর একটি সীমা আছে—ইহা উপরোল্লিখিত তথ্যটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদিগের স্নায়বীর উত্তেজনার আর একটি নিয়ম এই যে, কোন স্নায়বীয় গঠন ক্রমাগত উত্তেজিত হইলে আমাদের মনের উপর তাহার ফল ক্রমেই ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং যদি কোন উত্তেজকের ক্রিয়া সর্ব্বদাই চলিতে থাকে, তাহা হইলে সময়ে আমরা তাহা আর উপলব্ধি করিতে পারি না। তাহার দৃষ্টান্ত, একটা ঘানি কলের কাছে যদি আমাদের বসতি হয়, আর তাহার শব্দ যদি আমরা ক্রমাগত শুনি, তাহা হইলে ঐ শব্দ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া পড়ে। এই তথ্যটি হইতে আমাদের কোন কোন বিভ্রমের সূত্রপাত হয়। কতকটা শব্দপ্রবাহ সত্ত্বেও আমরা কখন কখন মনে করি—যেন সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতেছে।

আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ-ক্ষমতার আর একটি সীমার বিষয় এখানে বলা আবশ্যক। আমাদিগের স্নায়ু সমূহের এক একটি বৈশেষিক শক্তি আছে। উত্তেজকের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, এক একটি বিশেষ স্নায়ু কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে একই রূপে সকল সময়ে কার্য্য করে। আমাদের নেত্র-স্নায়ু, আলোক দ্বারাই হউক চাপের দ্বারাই হউক, কি বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারাই হউক, যে কোন প্রকারেই উত্তেজিত হউক না—সেই একই ফল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আলোক দেখিতেছি বলিয়া আমাদের অনুভব হয়। সাধারণতঃ আমাদের এক একটি স্নায়ুর এক একটি বিশেষ উত্তেজক আছে। সচরাচর আমাদের চক্ষু-স্নায়ু আলোক দ্বারাই উত্তেজিত হয় বলিয়া আমাদের শারীরিক প্রকৃতিতে এমনি একটি অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, চক্ষু-স্নায়ু আর কোন রূপে উত্তেজিত হইলেও আমাদের মনে হয় আলোকের দ্বারাই তাহা উত্তেজিত হইয়াছে। এই হেতু, আমাদের চক্ষু-গোলকের পশ্চাদ্ভাগ টিপিয়া ধরিলে আমরা আলোক-চক্র দেখিতে পাই। উহা আমাদের মনের একটা অনুভব মাত্র—বাহ্য আলোক তাহার উৎপাদক নহে। আমাদের স্নায়ু-ক্রিয়ার বিশেষ নিয়মানুসারে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধক্ষমতা কি রূপে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াই এবারকার মত এই প্রবন্ধ শেষ করা গেল।

সম্পাদকের বৈঠক।

এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে সভ্য জাতিদিগের মধ্যে লোকসংখ্যা ক্রমিকই বৃদ্ধি হইতেছে।

খৃষ্টাব্দ ১৮০১ ও ১৮৮০ এই দুই বৎসর তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় ব্রিটিস রাজ্য ও য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ এই দুই রাজ্যের সমবেত লোক সংখ্যা ২ ক্রোড় ২০ লক্ষ হইতে ৮ ক্রোর ৮০ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে—শত করা ৩০০ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং য়ুরোপীয় মহাদেশে শত করা ৬৩ জন মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। এই অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন্ জাতির বিস্তারের সাক্ষাৎ ফল এই হইয়াছে যে, সিজার সম্রাটদিগের আমলে ল্যাটিন ভাষার যেরূপ মর্য্যাদা ছিল, ইংরাজি ভাষায় এক্ষণে সেইরূপ মর্য্যাদা দাঁড়াইয়াছে। এক জন অ্যামেরিকান লেখক বলিয়াছেন "পৃথিবীতে এক্ষণে দুইটি জাতি আছে—যাহারা ইংরাজিতে কথা কহে এবং যাহারা ইংরাজিতে কথা কহে না।"

১৮০১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীস্থ সভ্য জাতির অষ্টমাংশ লোক ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করিত, এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশ লোক ঐ ভাষা ব্যবহার করে। অন্যান্য ভাষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হারের উপর লোক বৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। অধিকাংশ য়ুরোপীয় রাজ্যের জন্ম-হার ব্রিটিস রাজ্য অপেক্ষা শত করা ২৫ কিম্বা এমন-কি শত করা ৫০ কম। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশের জারজ জন্ম কমিয়া গিয়াছে—কেবল ফ্রান্স ও সুয়িডেনে বৃদ্ধি হইয়াছে।

	জারজ	সুজাত
য়ুনাইটেড কিংডম	৯৫ শত করা	৫ শত করা
য়ুরোপীয় মহাদেশ	৯২ "	৮ "
ইহুদি	৯৮ "	২ "

সুইডেন এবং ব্যাবেরিয়া প্রদেশে যমজ সন্তানের আধিক্য দৃষ্ট হয়—জারজ জন্মের হার ঐ দুই প্রদেশেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের Wagner য়ুরোপের যে জনসংখ্যা নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় ১৮৬০ হইতে স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ ও লোক-নির্গমন (Emigration) বোধ হয় তাহার কতকটা কারণ।

স্কটলণ্ডে ও সুইডেনে শত করা ৮ পরিমাণে স্ত্রী সংখ্যার বাহুল্য এবং দক্ষিণ য়ুরোপে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান।

জর্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ডে বিবাহের হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং আয়রলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা কম। গড়ে প্রতি হাজারে ১৬ জন করিয়া সমস্ত য়ুরোপের বিবাহ হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চলিত ঘটনা ও অবস্থার উপর বিবাহের হ্রাস বৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। ১৮৩২

খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণিতে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তাহার পরের বৎসরে শত করা ১২ পরিমাণে বিবাহ সংখ্যা কমিয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডে গমের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সেখানেও ঐরূপ বিবাহ সংখ্যার হ্রাস হয়। আমাদের দেশে এই নিয়ম বড় খাটে না—যেহেতু বিবাহ আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। নিতান্ত প্রতিকূল ঘটনা না হইলে আমাদের বিবাহ বন্ধ হয় না। নিঃসন্তানতার হার নিরূপণ করা কঠিন। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে ইংলণ্ডে ১০ টা বিবাহের মধ্যে ৯টা বিবাহে সন্তান প্রসূত হয়। কেবল উচ্চ বংশীয়দিগের (Nobility) মধ্যে ১০ টার মধ্যে ৮ টা বিবাহে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কতকটা এই জন্য সেখানকার অনেকগুলি পুরাতন উচ্চ বংশ লোপ পাইয়া যাইতেছে। স্বগোত্রে বিবাহ প্রথাও ইহার কারণ হইতে পারে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (marriages of cousins) স্বগোত্র বিবাহের হার সমস্ত ব্রিটিস রাজ্যে এই রূপে নির্দ্ধারিত হয়ঃ—লণ্ডনে শতকরা ১½, সমস্ত রাজ্যে ২ শতকরা, সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে ৩½ এবং উচ্চ বংশীয়দিগের মধ্যে শতকরা ৪½। উত্তর য়ুরোপ অপেক্ষা দক্ষিণ য়ুরোপে বিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। ফ্রান্স ও স্পেনে বিধবার সংখ্যার বাহুল্য। বোধ হয় যুদ্ধ বিগ্রহ কতকটা তাহার কারণ। সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডে বাল্য বিবাহের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডে স্বামীদিগের মধ্যে শতকরা ৪ জনের বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের নীচে—অবশিষ্ট য়ুরোপে শত করা ২ জনের বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের নীচে। যে সকল স্ত্রীলোক ২০ বৎসরের কম বয়সে বিবাহ করে, তাহার সংখ্যা ফ্রান্সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

জল বায়ু, স্বাস্থ্য ঘটিত বিধি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহের উপর কতকটা মনুষ্যের দীর্ঘায়ু নির্ভর করে। Quetelet বলেন "রুসীয় দাসদিগের (Serfs) মধ্যে প্রতি হাজারে ৪৮ জন করিয়া মরে এবং স্বাধীন ইংলণ্ডে মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ২০ জন।" ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই যে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের আয়ুও বৃদ্ধি হইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জর্ম্মনিদেশের লোকের যে সাধারণ আয়ু ছিল তাহা অপেক্ষা সেই সেই দেশে এক্ষণে ৬ বৎসর পরিমাণ দীর্ঘ হইয়াছে। য়ুরোপের দক্ষিণ প্রদেশ অপেক্ষা উত্তর প্রদেশ সকলে মৃত্যু সংখ্যা অধিক কমিয়াছে। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যে আয়ুর পরিমাণ ছিল, তাহা অপেক্ষা ইটালি স্পেন দেশে এখনও কম। সমস্ত য়ুরোপের আয়ুর পরিমাণ গড়ে ৩৫ বৎসর এবং ইহা লক্ষিত হইয়াছে যে কৃষকেরা ও গবর্ণমেণ্ট পেন্‌সন্‌ধারী ব্যক্তিরাই অধিক দিন বাঁচে। মৃত্যুর কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ছাড়া এমনও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে যাহা সকল দেশেই সমানরূপে খাটে। যথা,—অবিবাহিতা অপেক্ষা বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা

অধিক দিন বাঁচে। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা দুই বৎসর অধিক বাঁচে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে জুলাই মাস অপেক্ষা জানুয়ারি মাস অধিক মারাত্মক এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ইহার ঠিক বিপরীত। জল বায়ুরও উপর সকল সময়ে দীর্ঘায়ুতা নির্ভর করে না। স্পেনীয় আমেরিকার নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর প্রদেশেও এমন অনেক সঙ্কর জাতীয় (Half castes) লোক দেখা যায় যাহাদের বয়ঃক্রম এক শত বৎসরেরও অধিক। য়ুরোপে শতজীবী লোকের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। countess of Desmond ১৪৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চেরি গাছ হইতে পড়িয়া মরেন। Thomas Parr ১৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে Lord Arundelএর ভোজে অনভ্যস্ত পান ভোজন করায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। প্রখ্যাত Cardinal de Salis—১১০ বৎসর বয়সে যাঁহার মৃত্যু হয়—তিনি বলিয়াছিলেন দীর্ঘায়ু লাভের রহস্য এই যে মনের সাম্য ভাব রক্ষা করা—সকল ঋতুতেই ব্যায়াম চর্চ্চা করা এবং এক পাইণ্ট করিয়া Valdepenas প্রতিদিন পান করা।"

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—()—

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।

ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।

এই গ্রন্থ দুই খানি বহুকাল হইল, প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সম্প্রতি সমালোচনার্থে পাইয়াছি। যদি কোন পাঠক আজিও এ গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অনুরোধ করি, এ দুইখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। ইহার পূর্ব্বে ভাল জীবন-বৃত্ত বঙ্গ ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। যোগেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া বঙ্গ সাহিত্যের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। আমাদের মতে এই দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত উৎকৃষ্টতর। তাহার দুই কারণ আছে প্রথম, ম্যাট্‌সিনির জীবন বৃত্তে গ্রন্থের নায়কের সহিত লেখকের জলন্ত সমবেদনা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে; লেখক হৃদয়-লেখনী দিয়া সমস্ত পুস্তক খানি লিখিয়াছেন, এই নিমিত্ত পাঠকদের হৃদয়ের পত্রে তাহার মুদ্রাঙ্কন পড়িয়াছে। দ্বিতীয়, প্রথম পুস্তক খানি মস্তিষ্ক ও জ্ঞান

চর্চ্চার বিবরণ, দ্বিতীয় পুস্তক খানি হৃদয় ও কার্য্যের কাহিনী, সুতরাং বিষয়ের গুণে শেষ গ্রন্থটি অধিকতর মনোরম হইয়াছে।

হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা। আজ কাল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। এই নিমিত্ত বঙ্গ দেশে লেখকের সংখ্যা অল্প হইলেও লেখার আবশ্যক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সাহিত্য-সমাজে অত্যন্ত চুরীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, যোগেন্দ্র বাবুর আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ এইরূপ চুরী যায়; চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর্য্যদর্শন সম্পাদক তাঁহার ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে কি, প্রাচীন ভারতের উন্নতি লইয়া গর্ব্ব, আধুনিক ভারতের অবনতি লইয়া দুঃখ, ঐক্যের অভাব লইয়া বিলাপ, বদ্ধপরিকর হইবার জন্য উত্তেজনা এত শুনা গিয়াছে যে, ও বিষয়ে শুনিবার আর বাসনা নাই। শুনিয়া যত দূর হইতে পারে তাহা এত দিনে হইয়াছে বোধ করি, বরঞ্চ ভাবগতিকে বোধ হয় মাত্রা অধিক হইয়া গিয়াছে। না যদি হইয়া থাকে ত আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। ভারতের বিষয়ে কতকগুলা বিলাপ ও উদ্দীপন বাক্য উচ্চারণ করিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। যখন দেশানুরাগের ভাব মাত্র লোকে জানিত না, তখন তাহা উপযোগী ছিল। ভারতের যে পূর্ব্বে উন্নতি ছিল ও এখন যে অবনতি হইয়াছে, ভারতের উন্নতি সাধন করিতে সকলের যে সম্মিলিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই এতবার শুনিয়াছেন, যে, এ বিষয় বোধ করি কাহারো জ্ঞানের অগোচর নাই। অতএব আর অধিক নহে। এখন "ঐক্য" "উন্নতি" "বন্ধন" প্রভৃতি কতকগুলা সাধারণ কথা পরিত্যাগ করিয়া, ঐক্য ও উন্নতি সাধনের যে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে সেই সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বড় বড় কথা শুনিয়া আমাদের যুবকদিগের একটা বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের দুই দুর্ব্বল হস্তে দুই গুরুভার তলবারী লইয়া অধীনতা ছেদন করিবার জন্য দিগ্বিদিক্ হাতড়াইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের যদি বলা যায়, অত হাঙ্গাম করিবার আবশ্যক কি? অধীনতার অন্বেষণে ছুঁচা-বাজির মত চারিদিকে ধড়্‌ফড়্ করিয়া বেড়াইতেছে কেন? অধীনতা যে তোমাদের দুয়ারের কাছে। এমন কি, তোমাদের গৃহের কোণ হইতে শত শত অধীনতার পাশ অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত তোমাদের হাত পা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। তলোয়ার দুটা রাখ। একে একে ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থিগুলা মোচন কর। এ কথা শুনিলে তাঁহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জাহাজের কাছি, লোহার শিকল ছিঁড়িবার জন্য তলোয়ার ঝন্ ঝন্ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের ঐ সরু সূতাগুলি দেখাইয়া দিলে তাঁহারা অপমান বোধ করেন। কেবল বড় বড় ভারী ভারী কথা শুনিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে। এখন ছোট ছোট ঘরের কথা কহিবার সময় আসিয়াছে। এখন এই মহাবীর বৃন্দকে ঠাণ্ডা করিয়া তাঁহাদের মুখের কথাগুলাকে ছাঁটিয়া, তাঁহাদের হাতের তলোয়ার দুটাকে মামাইয়া ছোট খাটো ঘরের কাজে নিযুক্ত করান' আবশ্যক হইয়াছে। বনে মহিষ তাড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে ঘরে ইন্দুরের উৎপাৎ দূর করা হউক। তাই বলিতেছি হৃদয়োচ্ছ্বাসের অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের দেশানুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান পাঠকদের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা অল্প। তাই বলিয়া হৃদয়োচ্ছ্বাসের সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। ইহাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে যাহা সময়োপযোগী, বিশেষ-বিষয়গত ও সমাজের হিতসাধক।

স্যামুয়েল হানিমানের জীবন-বৃত্ত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ছয় আনা।

যোগেন্দ্র বাবুর অনুসরণ করিয়া ইতিমধ্যেই আর এক জন লেখক বঙ্গ ভাষায় আর এক মহাত্মার জীবন-বৃত্ত রচনা করিয়াছেন, দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহা পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে; লেখক অনেক পরিশ্রম ও অন্বেষণ করিয়া গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ অধ্যবসায় প্রশংসা-যোগ্য। গ্রন্থের ভাষা তেমন সহজ, পরিষ্কার সরস হয় নাই। অনর্থক কতকগুলা কঠোর সংস্কৃত কথা ও ঘোরালো পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, এই জন্য পুস্তকখানি সুপাঠ্য হয় নাই। গ্রন্থকার হানিমানের জীবনী হইতে পদে পদে রাশি রাশি নীতি কথা বাহির করিয়াছেন, সে গুলি বিশেষ করিয়া লিখিবার কোন আবশ্যক ছিল না। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের প্রধান দোষ এই যে, হানিমানের প্রতি পাঠকদের ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য লেখক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। একটা শ্রমসাধ্য চেষ্টার ভাব গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে। দুটা তিনটা করিয়া জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়া, "আহা" "আশ্চর্য্য" "ধন্য" "ভাবিতে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে" "অদ্ভুত হানিমানের সকলি অদ্ভুত" ইত্যাদি বিস্ময়াত্মক কথা পদে পদে ব্যবহার করা হইয়াছে; যেন, পাঠকদিগকে ঠেলিয়া, ধাক্কা মারিয়া, চোখে আঙুল দিয়া কোন প্রকারে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেই হইবে, ইহাই লেখকের ব্রত হইয়াছে। এরূপ করিলে অনেক সময়ে পাঠকদের বিরক্তি বোধ হয়। নিজের ভাব পদে পদে প্রকাশ না করিয়া বর্ণনার গুণে স্বভাবতই পাঠকদের ভাব উদ্রেক করা সুলেখকের কাজ। অধিক করিয়া বলিয়া শ্রোতাদিগকে অভিভূত করিয়া দিবার বাসনা মহেন্দ্র বাবুর লেখার প্রধান দোষ দেখিতেছি। যে স্থলে হানিমানের স্ত্রীর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, সে স্থল উদ্ধৃত করি।

"ফ্রেঞ্চ জর্ম্মাণ, ইংরাজি, প্রভৃতি ভাষায় নিলানীর, 'অসাধারণ' অধিকার। * * * সভ্য জগতের তাবৎ সাহিত্যে তিনি 'অলৌকিক ব্যুৎপত্তি-শালিনী'। তিনি স্বীয় 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' রচনা বিষয়ে এক 'অলোকসামান্য' কবি। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে 'প্রাণ মন বিগলিত' হইয়া যায়—'শরীর শিথিলিত' হইয়া পড়ে। 'আহা কি সুন্দর মধুর কবিতা! 'অন্তরাত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে' উঠিতে থাকে এবং ভাবগ্রহ সমাপ্ত হইলে, 'উচ্চতম অবস্থা' প্রাপ্ত হয়'। 'ইচ্ছা করে অনবরত তাহা আবৃত্তি করি'। এই ত গেল কাব্যের কথা। চিত্র অঙ্কনেও 'অনির্ব্বচনীয়' যোগ্যতা—'অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা'।"

বিশেষণ গুলা দেখিলে ভীত হইয়া পড়িতে হয়। হানিমানের স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীতে এত বড় আর একটি লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই। এমন কাহারো নাম শুনি নাই, একাধারে কবিতা ও চিত্র বিদ্যায় যাঁহার "অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা!"

জীবন-বৃত্ত লিখিতে হইলে ভাষাকে ইহা অপেক্ষা আরো অনেকটা সংযত করা আবশ্যক। বিষয়টিও ভাল, উপস্থিত গ্রন্থখানিও অনেক বিষয়ে ভাল, এই নিমিত্তই এত কথা বলিলাম।

যেমন রোগ তেমনি রোজা। প্রহসন। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। মূল্য চারিআনা। এ প্রহসন খানি মলিয়ের-রচিত "Le medecin malgre lui" নামক ফরাসী প্রহসনের স্বাধীন অনুবাদ। লেখক কেন যে তাহা স্বীকার করেন নাই, বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করাতে দোষের কিছুই নাই। বিদেশীয় ভাষার ভাল ভাল কাব্য নাটক বাঙ্গলায় অনুবাদিত হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি হইবার কথা। গ্রন্থখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১।০। এই গ্রন্থের চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী দোষ গুণ বলিতে আমরা ভরসা করি না। তবে ইহার একটি প্রধান গুণ এই দেখিলাম, ইহাতে আমাদের দেশী ও ইংরাজী উভয়বিধ ঔষধের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে বর্ণিত বিষয় সকল বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। * * এদেশে সচরাচর যে সকল পীড়া জন্মে তাহাদের ডাক্তারী ও দেশীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত দেশীয় ঔষধ সকল প্রায় পল্লী গ্রামের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। সহজ সহজ পীড়ায় ও যে সকল স্থানে চিকিৎসক পাওয়া না যায় তথায় এই পুস্তকের সাহায্যে গৃহস্থগণ অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশা করাযায়।" আমরাও তাহাই আশা করি।

শার্ঙ্গধর। মহর্ষি শার্ঙ্গধর কৃত স্বনাম খ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ২৵০।

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের এইরূপ সহজ অনুবাদ নানা কারণে হিতসাধক। এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

যাবনিক পরাক্রম। (উপন্যাস।) শ্রীনীলরত্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা।

এই গ্রন্থখানির কিছুই প্রশংসা করিবার নাই।

স্বপন-সঙ্গীত। (গীতিকাব্য।) শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

এখানি একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। লেখকের এখনো হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উষাহরণ বা অপূর্ব্ব-মিলন। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ৵১০ মাত্র।

মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র! গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ।০ মাত্র।

উক্ত গ্রন্থকার রচিত দুই চারি খানি গীতিনাট্য আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গীতগুলি রাগ রাগিণী সংযোগে গাহিলে কিরূপ শুনায় বলিতে পারি না, কিন্তু পড়িতে ভাল লাগিল না।

উড়িষ্যার ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়।

(ব্রহ্মদত্ত ও তদ্বংশীয় রাজগণ।) সিংহল দ্বীপের কয়েক খণ্ড গ্রন্থে ভগবান শাক্যসিংহেরদন্তের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাচীন ইলু ভাষায় লিখিত "দালদবংশ" সর্ব্বপ্রাচীন; এই গ্রন্থ ২৩২ শকাব্দে লিখিত হইয়াছিল। অধুনা দালদবংশ সুপ্রাপ্য নহে। সিংহল-রাজকুল-তিলক মহাবীর পরাক্রমবাহু শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর অন্ত ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনুরাধপুরের রাজাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা রাজ্ঞী লীলাবতী স্বামীর সিংহাসন অধিকার করেন। মহিষী লীলাবতী ক্রমে দুইবার রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহার শাসন সময়ের প্রথম ভাগে (১১১৮—১১২২ শকাব্দ মধ্যে) "রাজগুরু ধম্মরক্ষিত" সেই দালদবংশ অবলম্বন পূর্ব্বক পালি ভাষায় "দাঁতধাতুবংশ" বা "দাঁতবংশ" গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মান্যবর জর্জ টর্ণার সাহেব সেই দাঁতবংশ অবলম্বন করিয়া ইংরেজি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। (১) এইক্ষণ আমরা টর্ণার সাহেব লিখিত দন্ত প্রস্তাব হইতে উড়িষ্যার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করিব।

৬২১ পূর্ব্ব শকাব্দে (২) বৈশাখ মাসের

১ টর্ণার সাহেবের পরে কয়েক জন বিখ্যাত লেখক দাঁতবংশের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় "মতুকুমার স্বামীর" গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "বুদ্ধদেবের দন্ত" প্রস্তাব লিখিয়াছেন। (ঐতিহাসিক রহস্য, দ্বিতীয় ভাগ ২২৩ পৃষ্ঠা।) আপাতত আমাদের পক্ষে সেই সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং টর্ণার-লিখিত প্রস্তাবই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন। টর্ণারের প্রবন্ধ দাঁতবংশের একখানি উপাদেয় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। রামদাস বাবু "মতকুণ্ডর স্বামী" কে "মতুকুমার স্বামী" লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় উক্ত স্বামীর নাম পালি ভাষায়—মত কুণ্ডর (সংস্কৃত মৃতকুমার)।

২ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ (অধিকাংশের মতে) বলেন বুদ্ধদেব (543 B. C.) ৫৪৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। "543 B. C." ইহার অনুবাদ করিতে যাইয়া বঙ্গীয় লেখকগণ বলেন "খৃষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর" বা "খৃষ্ট জন্মাইবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে"। "B. C." অর্থ "পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ" হইতে পারে, কিন্তু "খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব" শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। ভ্রম ক্রমে খৃঃ জন্মের ৪ বৎসর পর হইতে খৃষ্টাব্দ-গণনা করা হইয়াছে।

পূর্ণিমা তিথিতে মুনীন্দ্র শাক্যসিংহ কুশীনগরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সেই সময় বুদ্ধদেবের শিষ্য ক্ষেম পূর্ব্বনিয়োগ অনুসারে বুদ্ধের বাম পার্শ্বের একটী দন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। (৩) রাজা ব্রহ্মদত্ত একজন পরম সৌগত, তিনি যথোচিত ভক্তি ও সম্মান-পূর্ব্বক সেই দন্ত স্বীয় রাজধানীতে সংস্থাপন করেন। দন্ত সংস্থাপনের স্থান দন্তপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাচীন দন্তপুর বর্ত্তমান পুরী। (৪)

ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর তাঁহার তনয় কাশী (৫) ও তদন্তে তৎপুত্র সুনন্দ উড়িষ্যা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলি শাসন করিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি উড়িষ্যায় প্রতিফলিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাহাদের তিরোধানান্তে কোন্ বংশীয় কোন্ নরপতি উড়িষ্যার রাজদণ্ড ধারণ করেন তাহা দাঁতবংশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং এক্ষণে আমাদিগকে এক খণ্ড প্রস্তর-লিপির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল।

(ঐর রাজ।) ভুবনেশ্বরের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতপুঞ্জ আছে। এই পর্ব্বতগুলি সাধারণতঃ খণ্ডগিরি নামে খ্যাত। কিন্তু শৃঙ্গ সমূহের স্বতন্ত্র নাম রহিয়াছে যথা, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, নীলগিরি, "ধবলগিরি" ইত্যাদি। এই সকল পর্ব্বতের অঙ্গ খনন করিয়া গুহা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্তম্ভবিশিষ্ট সুন্দর প্রকোষ্ঠ ও দ্বিতল ত্রিতল গৃহ ও নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল প্রতিমূর্ত্তির পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া প্রাচীন ভারতনিবাসীদিগের অঙ্গাচ্ছাদনের বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারা যায়। কোনও কোনও প্রতিমূর্ত্তির পদ পূর্ণ-উপানহ-মণ্ডিত। (৬) এই গৃহ সমূহ মধ্যে "রাণী নহর" ই—সর্ব্বপ্রধান, গুহা গুলির মধ্যে "হাতী গুহা," "ব্যাঘ্রগুহা" ও "সর্পগুহা" প্রভৃতি

৩ After the funeral obsequies of Buddho had been performed at Kusnara (in the year 543 B. C.) one of his disciples Khemo thero is commissioned to take his left canine Tooth to Dantapure the capital of Kalinga. The reigning soverign there, who received the relic, was Brahmadatto.

(Turnour's Tooth relic of Ceylon. Chapter 11,)

৪ বিজ্ঞবর কনিংহাম সাহেব বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রীকে প্রাচীন দন্তপুর নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। (Curcumengham's Ancient geography of India page 518.) লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল জেইমস লো সাহেব অনুমান করেন দন্তপুর বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। আমরা উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিপুঞ্জ উৎপাটন না করিলে তাহাদের মতানুসরণ করিতে অক্ষম। বিশেষত প্রাচীন কালে রাজ মহেন্দ্রী উড়িষ্যার অধীন ছিল।

৫ বাবু রামদাস সেন কাশীকে "করী" লিখিয়াছেন।

৬ বুটজুতা।

শ্রেষ্ঠ। এই সকল গৃহ ও গুহা গুলি যে এক সময়ে এক ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবম্প্রকার অনুমান সঙ্গত নহে। প্রতিমূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ, জৈন (৭) ও হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ জগদ্বিখ্যাত ইলোরার খোদিত গৃহাদির পর এই সকলের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উড়িষ্যাগণ এই সকল গৃহাদির ঐতিহাসিক বিবরণ কিছুই জ্ঞাত নহে। (৮)

উদয়গিরি-ক্ষোদিত "হাতীগুহা" র দ্বারস্থ প্রস্তরে একটী বৃহৎ "প্রস্তর-লেখ্য" বিরাজিত রহিয়াছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ষ্টার্লিং সাহেব উৎকীর্ণ লিপির মর্ম্মোদ্ধারের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। তিনি কর্ণেল মেকেঞ্জি সাহেবের সহায়তায় প্রোক্ত লেখ্যের কিয়দংশের আলেখ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। (৯) তৎপর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেনেণ্ট কিটো (Kittoe) সাহেব এই সকল গিরিস্থিত কতকগুলি প্রস্তর-লেখের আলেখ্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিজ্ঞবর প্রিন্সেপ সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। কিটো সাহেবকৃত প্রোক্ত প্রস্তর-লেখ্যের প্রতিলিপি প্রিন্সেপ সাহেব সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (১০) অধিকন্তু প্রিন্সেপ সাহেব কিটোকৃত আলেখ্য দর্শনে তাহার মর্ম্মোদ্ধার পূর্ব্বক স্বীয় মন্তব্যসহ রোমান অক্ষরে প্রস্তর-লেখ্যের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই প্রস্তর-লেখ্যের এক খণ্ড ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মিত্র মহোদয়ের পাঠের সহিত প্রিন্সেপ সাহেবের পাঠের প্রায় ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রোক্ত প্রস্তর-লেখ্য দর্শনে দ্বাবিংশ শতাব্দী পূর্ব্ব ভারতে কি রূপ অক্ষর ব্যবহার ছিল তাহা সুন্দর রূপে অনুমিত হয়। ইহার অক্ষরের সহিত মহারাজাধিরাজ অশোকের শিলাস্তম্ভ সমূহে উৎকীর্ণ অক্ষরের

৭ আমাদিগের বিবেচনায় প্রাচীন কালে বৌদ্ধ ও জৈন এক ধর্ম্ম ছিল। ক্রমে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির পর জৈনগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে।

৮ The ridiculous legend which the natives relate to explain the origin of this isolated hills, is, that they formerly constituted a part of the Himaloya at which time they were inhabited by numerous Rishis, who dug the caves now found in them. They were taken up bodily ascetics and all, by Mahabir Hanuman, with others messis of rock, to build the bridge of Rama, but, by some accident, were allowed to drop in their passage through the air, when they alighted in their present position. (Stirlings Account of Orissa Proper.)

৯ A. R. Vol. XV. plate No 111.

১০ J. A. S. B. Vol. V1,plate LV111

কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভাষা এক প্রকার প্রাকৃত, ইহাকে "পালি" বলা হইয়া থাকে। উৎকীর্ণ আদেশ-লিপির ভাষার সহিত এই প্রস্তর-লিপির ভাষার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ইহার আরম্ভ বাক্য—"নমোঽর্হতায় নমঃ সিদ্ধায়"। যাহা হউক আমরা পরিশিষ্টে এই প্রস্তর-লিপির বঙ্গানুবাদ পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিব; এস্থলে তাহার সার ভাগ গ্রহণ করা হইল।

ঐর (১১) নামক এক ব্যক্তি পঞ্চদশ বর্ষ বাল্য-ক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন। তৎপরে নয় বর্ষ সাহিত্য, গণিত, নৌ-বাণিজ্য, রাজনীতি, ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করেন। চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তৃতীয় যুদ্ধে জয় লাভ পূর্ব্বক কলিঙ্গপতিদিগের প্রধান নগরী অধিকার করেন। বোধ হয় তিনি প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। রাজ্যাভিষেকের পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজধানীর ভগ্ন গৃহাদির সংস্কার প্রাসাদ ও চন্দ্রকৌমুদীসদৃশ সন্তাপহারিণী এক সরোবর, ঘাট ও পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি লুণ্ঠন দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতেন। প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি করিত। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি চৈত্য, মন্দির ও গিরি ক্ষোদিত গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি মগধদেশাধিপতি নন্দরাজকে পরাস্ত করিয়া পুণ্যাদি নগরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মকার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ সৈন্য সামন্ত ছিল।

এক্ষণে আমরা মহাবংশ ও অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ঐররাজের সময়াবধারণের চেষ্টা করিব। মহারাজ ঐর মগধাধিপতি নন্দের সমকালীন, সুতরাং নন্দের সময় নির্ণয় করিতে পারিলেই তাঁহার সময় নির্ণীত হইবে। (১২)

বৌদ্ধদিগের মতে কুমার সিদ্ধার্থ, মগধরাজ বিম্বসারের রাজ্যাভিষেকের ষোড়শ-বর্ষান্তে (৬৬৫ পূর্ব্ব শকাব্দে) বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন। অজাতশত্রুর অভিষেকের অষ্টম বর্ষে বা ৬২১ পূর্ব্ব শকাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই বৎসর বৌদ্ধদিগের প্রথম সঙ্গম হইয়াছিল। কালাশোকের রাজ্যাভিষেকের দশম বর্ষে বা ৫২১ পূর্ব্বশকাব্দে (প্রথম সঙ্গমের এক শতাব্দী পরে) বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় সঙ্গম হয়।(১৩) অজাত শত্রুর তিরোভাব ও কালাশোকের আবির্ভাবকালমধ্যে (৫২ বৎসর) ৫ জন নরপতি মগধের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। (১৪) এস্থলে তাহাদের নাম উল্লেখের প্রয়োজন বোধ হইতেছে না। কালাশোকের মৃত্যুর ৪৪ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ৪৫৯ পূর্ব্ব শকাব্দের সুবিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজদণ্ড ধারণ করেন। (১৫) সুতরাং ৫০৩—৪৫৯ পূর্ব্ব শকাব্দের মধ্যবর্ত্তী ৪৪ বৎসর নন্দ ও তাঁহার অষ্ট পুত্রের রাজ্যকাল।(১৬) অতএব আমরা বলিতে পারি যে মহারাজ ঐর ২২৬২ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন কলিঙ্গ-বর্ত্তমান উড়িষ্যার রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন।

১১ প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ঐর রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র। কিন্তু তিনি বাহুবলে হৃতরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মিত্র মহোদয় ঐররাজকে usurper মাত্র লিখিয়াছেন।

১২ মগধরাজবংশাবলী লিখিতে যাইয়া সুবিখ্যাত তারানাথ নিতান্ত গণ্ডগোল করিয়াছেন। (Miss Lyall's Taranath's account of Magadha kings.) সুতরাং আমরা কোন মতে তাঁহার বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি নাই।

১৩ সুবিজ্ঞ বাবু রামদাস সেন মহাশয় বলেন "দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল।" (ঐতিহাসিক রহস্য, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৬,—৬৭ পৃষ্ঠা।) কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সুবিখ্যাত "অশোকের অধিকারকালে, পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের মহাসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়।" ("হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ দেখ")। এস্থলে পাঠকগণ অবশ্যই আমাদিগের বাক্য নচেৎ রামদাস বাবুর উক্তি ভ্রমমূলক বিবেচনা করিবেন। আমরা যে সকল বিখ্যাত গ্রন্থকার হইতে আত্মমত সঙ্কলন করিয়াছি, আপাতত আমাদের নিকট তাঁহাদের গ্রন্থ নাই। যাহা হউক মান্যবর জর্জ টর্ণার সাহেব লিখিত "An Examination of the Pali Buddhistical Annals." প্রস্তাব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রামদাস বাবু বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আমাদের বাক্য খণ্ডন করিতে পারিলে আমরা কৃতজ্ঞ ভাবে তাঁহার মতানুসরণ করিব। আমরা আত্মভ্রম সংশোধন করিতে কখনও কুণ্ঠিত নহি।

"In that year (543. B. C.) the first convocation was held at Rajyagoha, (রাজ্যগৃহ), then the capital of the Magadha monarch Ajatasattro, in the eighth year of his reign.

"The second convocation was held a century afterwards in B. C. 403, at Wesali then the capital of the Magadha monarch Kalasoko, and in the tenth year of his reign.

"The third convocation was held 134 years of the second one, in B. C. 309 at Patilipura, then the capital of the Indian empire, in the 17th year of the reign of Asoka or Dhammasoko."

তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধদিগের মত ইহার সহিত ঐক্য নহে। রামদাস বাবু তাহাদের মতানুসরণ করেন নাই, সুতরাং সেই সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গ্রীকদিগের লিখিত সময় সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অশোকের শাসনকাল কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তী হইবে। তদনুসারে আমরা "হিয়োন সাঙের বাঙ্গালা ভ্রমণ" প্রবন্ধে বলিয়াছি যে অশোক ৩৪১পূর্ব্বশকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৪ পুরাণগুলির পরস্পর ঐক্য নাই।

১৫ গ্রীকদিগের লিখিত "সন্দ্রকুত্ত" কে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া স্বীকার করিলে, তিনি (চন্দ্রগুপ্ত) পূর্ব্ব শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভ কিম্বা চতুর্থ শতাব্দীর অন্তে মগধ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। যাহা হউক ঐর রাজের বয়ঃক্রম কোন মতেই দ্বাবিংশ শতাব্দীর ন্যূন হইতেছে না।

১৬ প্রিন্সেপ সাহেবের মতে নবনন্দের রাজ্যকাল ১০০ একশত বৎসর। কর্ণেল উইল ফোর্ডসাহেবের মতে ৪০ বৎসর মাত্র।

প্রস্তরলেখ্যে ঐররাজকে এক লক্ষ সৈন্য সামন্তের অধিপতি বলা হইয়াছে। এই বাক্য নিতান্ত অলীক বোধ হইতেছে না, কারণ ইহার কিছুকাল পরে গ্রীকদূত মেগস্থনিস কলিঙ্গ রাজ্যের সৈন্য সঙ্খ্যা ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র পদাতি, ১০০০ এক সহস্র অশ্ব, ৭০০ সপ্তশত গজ লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি মগধরাজ নন্দকে এত দূর অপমানিত করিয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ বিখ্যাত মেকিডোনিয় বীর আলেকজেণ্ডার ভারতের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হইয়া মগধের সৈন্যসঙ্খ্যা এইরূপ জানিতে পারিয়াছিলেন যথা—২০০০০ বিংশতি সহস্র অশ্ব, ২০০০০০ দুই লক্ষ পদাতিক, ২০০০ দ্বি সহস্র রথ ৪০০০ চারি সহস্র গজ। আমাদের বিবেচনায় ঐররাজ কোন সামান্য সংগ্রামে মগধসৈন্য জয় করেন, কিম্বা যখন চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হন তখন ঐররাজ চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পুরাতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে বঙ্গসাগরের তীরনিবাসী তিনটী প্রাচীন জাতি নৌবাণিজ্য দ্বারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কলিঙ্গনিবাসী বা বর্ত্তমান উড়িয়াগণ তাহার অন্যতম জাতি। যব, বালি প্রভৃতি ভারতসাগরের বক্ষঃস্থিত প্লবমান দ্বীপপুঞ্জ তাহাদের ঔপনিবেশিক রাজ্য। ঐর রাজের প্রস্তর-লেখ্য এই সকল উক্তির এক-প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তিনি যত্নপূর্ব্বক "নাব ব্যপার" শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে এস্থানে সুবর্ণগ্রামের ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঐররাজের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে (শাক্য সিংহের সময়ে) কলিঙ্গপতি, কোশল দেশাধিপতিকে একখণ্ড উৎকৃষ্ট বস্ত্র উপহার অর্পণ করিয়াছিলেন। (১৭)

অদ্যাবধি ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রস্তর-লেখ্য ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐররাজের প্রস্তর-লেখ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের নামাঙ্কিত যে একখণ্ড তাম্রশাসন মেকেঞ্জি সাহেব বিদনৌরের দেবমন্দিরে দর্শন করেন তাহা বিজ্ঞবর মেকেঞ্জি ও কোলব্রুক সাহেব "জাল" নির্ণয় করিয়াছেন। (১৮) ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ আরও একখানি তাম্রশাসন দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয় তাহাকেও কৃত্রিম

১৭ The king of Kaling sends to Gsal-Rgyal, the king of Kosala, a piece of fine linen cloth, as present. It comes afterwards in to the hands of Gtug-Dgah-mo, (a lewd or wicked priestess) she puts it on, appears in public, but, from its thin texture, seems to be naked. The priestesses are prohibited from accepting or wearing such thin clothes.

(The 9th Vol, Dulva. Leaf 272.)
Alexander Csoma Korosi. A. R.
Vol XX. p. 85.

১৮ A. R. Vol. IX. p 440.

স্থির করিয়াছেন। (১৯) সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ভারতবর্ষীয় প্রস্তর-লিপি ও শাসন-পত্র গুলির মধ্যে অকুণ্ঠভাবে প্রোক্ত প্রস্তর-লেখ্যকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি প্রভৃতি পর্ব্বতস্থ গুহা ও গৃহ সমূহের কিয়দংশ যে ঐররাজ কর্ত্তৃক দ্বাবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল এই প্রস্তর-লিপিই তাহার প্রমাণ।

(অশোকের আদেশ লিপি।) খোর্দ্দার অধীন ধউলী পর্ব্বতের অঙ্গে মহারাজাধিরাজ "জম্বুদ্বীপপতি" "দেবানাং পিয় পিয়দশি" (২০) শ্রীধর্ম্মাশোকের আদেশ লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এস্থলে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। উদর পরিতোষ কিম্বা যজ্ঞার্থে পশুবধ নিষেধ।

২। রাজ্য মধ্যে মনুষ্য ও পশুর জন্য ঔষধালয় সংস্থাপন ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং পথপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন করিবে।

৩। প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আদেশ সমূহ প্রচার হইবে।

৪। পূর্ব্ব অবস্থা ও বর্ত্তমান রাজ নিয়মের সহিত দেশের উন্নতির তুলনা।

৫। দেশীয় ও বিদেশীয় মানবগণকে, ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা শিষ্য করিবার কারণ উপদেষ্টা নিয়োগ।

৬। প্রজাবর্গের আচার, ব্যবহার ও রীতি, নীতি অনুসন্ধান করিবার কারণ চরনিয়োগ।

৭। সমস্তের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে বিশ্বাসের ঐক্য ও অবস্থার সমভাব সাধন বিষয়ে একান্ত ইচ্ছা।

৮। ইন্দ্রিয়-পরিতোষ জন্য পূর্ব্ব রাজানুমোদিত "বিহার যাত্রার" পরিবর্ত্তে "ধর্ম্মযাত্রার" অনুষ্ঠান।

৯। "ধর্ম্মালোচনা যথার্থ সুখ ও তদ্বারা স্বর্গীয় শান্তি অনুভব" ইত্যাত্মক সত্যের প্রচার।

১০। ঐহিক, অনিত্য যশোপার্জ্জনে অনাস্থা এবং পারত্রিক নিত্যসুখলিপ্সার ব্যগ্রতা।

১১। ধর্ম্মোপদেশ দানই প্রধান দয়ার কার্য্য ও সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ।

(রাজা গুহসিংহ।) তৎপর কয়েক শতাব্দীর (উড়িষ্যার) ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সেই সময়ে যে উড়িষ্যাপতিগণ মগধ সম্রাটদিগের দণ্ডাধীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। অশোকের একাদশ আজ্ঞা ও পশ্চাল্লিখিত বিবরণ সমূহ তাহার প্রমাণ। শকাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে গুহসিংহ নামক জনৈক রাজা উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দন্ত সন্দর্ভ হইতে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করিব।

রাজা গুহসিংহ বুদ্ধ-দন্তের ইতিহাস ও মহিমা অনবগত ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি একদা নাগ-

১৯ P. A. S. B. 1872. p. 188.
২০ দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী

রিকগণকে উৎসবে উন্মত্ত দর্শনে তাঁহার সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য কি জন্য উৎসব হইতেছে।" এই প্রশ্নের উত্তরে কলিঙ্গনিবাসী শ্রমণগণ তাঁহার নিকট বুদ্ধ-দন্তের ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন অদ্য সেই দন্তোৎসব হইতেছে। (২১) অনেক তর্ক বিতর্কের পর গুহসিংহ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করেন। সেই ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমেই তিনি বৌদ্ধদ্রোহী (নির্গ্রান্থা) ব্রাহ্মণ সচিব বর্গকে উড়িষ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। অপমানিত ব্রাহ্মণগণ পাটলীপুত্র নগরে "জম্বুদ্বীপপতি" "রাজাধিরাজ" পাণ্ডুর নিকট উপস্থিত হইয়া গুহসিংহের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। (২২) পাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার অধীনস্থ একজন নরপতির এবম্প্রকার ব্যবহার শ্রবণে নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং চৈতন্য নামক অন্য এক জন সামন্ত নরপতিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। (২৩) গুহসিংহকে তাঁহার উপাস্য দেবতার (বুদ্ধদন্ত) সহিতী বন্দ করিয়া আনিবার কারণ সম্রাট পাণ্ডু, রাজা চৈতন্যকে আদেশ করেন। (২৪) চৈতন্য বৃহৎ একদল সৈন্যের সহিত কলিঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া দন্তপুর-নগরী অবরোধ করিলেন। গুহসিংহ বৈর পরিহার পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে সম্রাট-প্রতিনিধি চৈতন্যের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া যান। চৈতন্য গুহের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্রাটের আদেশলিপি প্রদান করিলেন। গুহসিংহ অম্লানচিত্তে রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে গুহসিংহ চৈতন্যের নিকট তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ স্বরূপ বুদ্ধদন্তের ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সকল শ্রবণ করিয়া চৈতন্য ও তাঁহার অনুচরগণের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিল, তাঁহারা যথায় দন্ত সংস্থাপিত হইয়াছে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধদন্ত দর্শন করিলেন এবং দন্তের মোহিনী শক্তিতে সকলকেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল। (২৫)

চৈতন্য ও গুহ সিংহ বুদ্ধদন্ত লইয়া পাটলীপুত্র নগরে উপনীত হইলেন। রাজাধিরাজ পাণ্ডু সেই দন্ত বিনাশ করিবার

২১ রথযাত্রা বোধ হয় দন্তোৎসবের অনুকরণ মাত্র।

২২ বোধ হয় পাণ্ডু, গুপ্ত বংশীয় নরপতি হইবেন।

২৩ "——bring hither Guhasiwo and the piece of human bone, which he worships day and night."

(Turnour's Tooth relic of Ceylon. Chapter 11.)

২৪ চৈতন্য কোন রাজ্যের অধিপতি তাহা দাতবংশে লিখিত হয় নাই।

২৫ এই স্থানে দাত বংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা দাতবংশের অনুচিত বর্ণনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার মূল প্রস্তাবটী প্রকাশ করিতেছি।

জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। (২৬) পাণ্ডু এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে সেই দন্ত স্থাপন করিলেন। তিনি স্বীয় সাম্রাজ্য দন্তের প্রতি উৎসর্গ এবং রাজা গুহসিংহকে নানা প্রকার উপহার অর্পণ পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন।

স্বত্তিপুরপতি রাজা ক্ষীরাধার বুদ্ধ-দন্ত লাভ জন্য পাণ্ডুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তিনি সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পাণ্ডু কর্ত্তৃক নিহত হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহসিংহ সেই দন্ত আনয়ন পূর্ব্বক দন্তপুরে সংস্থাপন করিলেন।

মালব দেশের জনৈক রাজপুত্র বুদ্ধ-দন্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দন্তপুরে উপস্থিত হন। রাজা গুহসিংহ সেই রাজকুমারের হস্তে স্বীয় কন্যা হেমমালাকে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দন্ত-মন্দিরের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেন। উজ্জয়িনীর রাজপুত্রের প্রকৃত নাম লিখিত হয় নাই। তিনি দন্তের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং উত্তর কালে সেই দন্ত তাহা দ্বারা সিংহলে নীত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি দন্তকুমার আখ্যা প্রাপ্ত হন। শ্যাম দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে দন্তকুমার (Thontha Kuaman) কে রাজা গুহসিংহের পুত্র লেখা হইয়াছে। (২৭) কিন্তু এ সম্বন্ধে দাঁতবংশের লিখিত বাক্যই সমধিক প্রামাণ্য। দন্তকুমার গুহসিংহের কন্যা হেমমালার পাণিগ্রহণ করেন। যদিচ ভারতবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে এক সময়ে সহোদরা বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু শালিবাহন নৃপতির প্রবর্ত্তিত অব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে সেই প্রথা বিদ্যমান ছিল বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

স্বত্তিপুরপতি ক্ষীরাধারের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অন্যান্য চারি জন নরপতি হইতে সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক বৃহৎ এক দল সৈন্যের সহিত দন্তপুরে উপস্থিত হইলেন। এবং দূত দ্বারা গুহসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "রাজা গুহসিংহ অবিলম্বে বুদ্ধ-দন্ত আমাদিগকে সমর্পণ করেন নচেৎ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করুন।"

রাজা গুহসিংহ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কলত্র, দুহিতা ও জামাতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি প্রাণান্তে বুদ্ধ-দন্ত অন্যকে প্রদান করিব না, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু কিম্বা পরাজয় হইলে রাজ্ঞী ছদ্মবেশে

২৬ বুদ্ধ-দন্তের মহিমা প্রচার করিবার জন্য দাতবংশের তৃতীয় অধ্যায়ে বহুবিধ অলৌকিক বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত উড়িষ্যার ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

২৭ Gleanings in Buddhism, or translation of Passages from a Siamese versian of Pali work, termed in Siamese "Phra Pathom" with passing observation on Buddhism and Brahmanism. By Lt. Col. James Low, M. A. S. B. and C. M, R, A, S,

মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।" তৎপর জামাতাকে বলিলেন "তুমি বুদ্ধদেবের দন্ত ও তোমার স্ত্রীকে লইয়া সিংহলদ্বীপে গমন করিবে।" দন্তকুমার বলিলেন "সিংহলদ্বীপে আমরা কোন্ মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিব।" রাজা উত্তর করিলেন "সিংহলরাজ মহাসেন একজন পরম সৌগত, তিনি বারংবার দন্তের জন্য উপহার প্রেরণ করিয়াছেন এবং দন্তস্নানোদক আমার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়া গিয়াছেন।" এই সকল উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক গুহসিংহ রণক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় ক্ষীরাধারের ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

দন্তকুমার শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র "দন্ত" গ্রহণ পূর্ব্বক গোপনে রাজনিকেতন হইতে বহির্গত হইলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করত এক বৃহৎ নদী অতিক্রম করিয়া নদীতীরবর্ত্তী বালুকাচরে সেই দন্ত প্রোথিত করিলেন। রাজকুমার পুনর্ব্বার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া ছদ্মবেশে দন্তপুর পরিত্যাগ করেন। তৎপর বালুকাচর হইতে বুদ্ধ-দন্ত উদ্ধার পূর্ব্বক দন্তকুমার ও তাহার পত্নী কিছু কাল অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা গোপনে তাম্রলিপ্ত নগরে উপনীত হন। তাম্রলিপ্ত নগরে অর্ণবপোতারোহণ করিয়া তাঁহারা সিংহলে গমন করেন।

তাঁহারা সিংহলে পদার্পণ করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে, রাজা মহাসেন কাল-কবলিত হইয়াছেন; শ্রীমেঘবাহন অনুরাধপুরের রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনিও সৌগত; সুতরাং দন্তকুমার ও হেমমালা সিংহলে সাদরে গৃহীত হইলেন। রাজা শ্রীমেঘবাহন দন্তকুমার হইতে দন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক দেবানাম পিয়—তিষ্য নির্ম্মিত মন্দিরে সংস্থাপন করেন। (২৮)

শ্রীমেঘবাহন ২২৪ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের নবম বর্ষে অর্থাৎ ২৩২ শকাব্দে দন্তকুমার ও হেমমালা সিংহলে পদার্পণ করেন। সুতরাং ২৩২ শকাব্দে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব বৎসর ক্ষীরাধারের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ভীমবেশে

২৮ দীর্ঘকাল এই দন্ত সিংহলে ছিল। ভুবনেকবাহুর শাসনকালে (১২২৫—৩৬ শকাব্দ) পাণ্ড্যপতিকুলশেখরের সেনাপতি অরি চক্রবর্ত্তী সিংহল বিজয় করিয়া বুদ্ধ-দন্ত পাণ্ড্য নগরে লইয়া যান। ভুবনেকবাহুর উত্তরাধিকারি রাজা (তৃতীয়) পরাক্রম বাহু পাণ্ড্য নগর জয় করিয়া সেই দন্ত পুনর্ব্বার সিংহলে আনয়ন করেন। ঐতিহাসিক রেবিরো (Rebeiro) বলেন "১৪৮২ শকাব্দে পর্টুগিজ যুদ্ধ কালে কনেষ্টানটাইন ডি ব্রাগাঞ্জা বুদ্ধ-দন্ত বিনষ্ট করিয়াছেন।" অধুনা সিংহলে যে দন্ত রক্ষিত হইয়াছে, তাহা নক্রদন্ত অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ বলেন বুদ্ধ-দন্ত নষ্ট হইবার নহে এবং পর্টুগিজ যুদ্ধ কালে তাহা সাফ্রাগমের দেলগামো মন্দিরে লুক্কায়িত ছিল। (The native authorities, however represented that the Relic was safely coucealed at *Delgamoa* in *Seffragam* during those wars. Turnour's. Tooth relic of Ceylon.)

দন্তপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "রক্তবাহুর উড়িষ্যা আক্রমণ" প্রচলিত প্রবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিজ্ঞবর ষ্টার্লিং সাহেব বলিয়াছেন "এই প্রবাদের মূলে অবশ্যই কোনও সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, কিন্তু আমি সেই সত্য আবিষ্কার করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইয়াছি।" (২৯) আমাদের বিবেচনায় ক্ষীরাধারের ভ্রাতুষ্পুত্রকেই উড়িষ্যাবাসীগণ "রক্তবাহু" আখ্যাদান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ২৩১ কিম্বা ২৩২ শকাব্দে ক্ষীরাধারের ভ্রাতুষ্পুত্র উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। মাদলা পাঞ্জিতে লিখিত আছে ২৪০ শকাব্দে শোভনদেব সিংহাসনাধিরূঢ় হন। তাহার শাসন কালে রক্তবাহু উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিংহল দেশীয় ইতিহাসের লিখিত সময়ের সহিত মাদলা পাঞ্জির লিখিত সময়ের ৯।১০ বৎসর মাত্র অন্তর হইতেছে। বিবেচনা করিতে গেলে এই সামান্য প্রভেদ উল্লেখযোগ্য নহে। (৩০)

মাদলা পাঞ্জিতে লিখিত আছে রক্তবাহু অর্ণবপোতারোহণে উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দাঁতবংশে ক্ষীরাধার ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে স্বত্তিপুর (sawatti pura) পতি বলা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় "স্বত্তিপুরা" ত্রিপুরা শব্দের অপভ্রংশ। শ্যামদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে ক্ষীরাধারকে "চট্টবাড়ী" নামক স্থানের রাজা বলা হইয়াছে। বোধ হয় পাঠকগণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন "চট্টবাড়ী" "চট্টগৃহ" বা "চট্টগ্রাম" শব্দের রূপান্তর মাত্র। চট্টগ্রাম যে প্রাচীন কালে ত্রিপুরেশ্বরদিগের করতলস্থ ছিল তাহা আমরা বিশেষ রূপে প্রমাণ করিয়াছি। (৩১) অতএব আমাদের বোধ হইতেছে ত্রিপুরেশ্বর চট্টগ্রামে অর্ণবপোতারোহণ পূর্ব্বক সাগর অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার দিগম্বর-সৈন্য (কুকি) গণকে দর্শন করিয়া উড়িষ্যাবাসীগণ ত্রিপুরেশ্বরকে "যবন" নির্ণয় করিয়াছিল।

রক্তবাহুর আক্রমণকালে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিবার কথা মাদলা পাঞ্জিতে লিখিত হইয়াছে। দাঁতবংশের মতে সেই সময়ে বুদ্ধ-দন্তও বালুকাচরে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মাদলা পাঞ্জির মতে রাজা, জগন্নাথকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাঁত বংশও প্রায় তাহাই বলিতেছে।

বংশাবলীর ও অন্যান্য উড়িয়া গ্রন্থের মতে ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশের রাজা বা রাজপুত্র। আমাদের দন্তকুমারও তাহাই বটেন। ব্রাহ্মণগণ কৌশলক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশলোপ করিয়াছেন। আমা-

২৯ A. R. Vol. XV. p. 263,

৩০ কালাপাহাড়ের উড়িষ্যাবিজয় একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। এই ঘটনার তারিখ সম্বন্ধে মাদলা পাঞ্জির সহিত মুসলমান ইতিহাস কতদূর অনৈক্য তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

৩১ চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব দেখ।

দের দন্তকুমার ও হেমমালা চিরকালের তরে স্বদেশের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে জগন্নাথদেব বুদ্ধদন্তের রূপান্তর মাত্র। জগন্নাথের ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

যোগ-তত্ত্ব।

প্রথম প্রস্তাব।

ইচ্ছার যে কত বল—ভাবনার যে কি মহিমা, মানব মনের যে কত ক্ষমতা, মানব তাহা জানে না। বহির্জগতের যে কিছু শিল্প সমস্তই মনঃপ্রসূত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর্য্যেরা যাহাকে 'যোগ' বলেন, তাহাও মনঃপ্রসূত বা মনের শিল্প। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।' ক্রিয়ার কৌশলই যোগ সুতরাং অন্তর-ক্রিয়ার কৌশলও যোগ। এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য যে যোগ, তাহাও মানস ক্রিয়ার কৌশল বা মানস শক্তির শিল্প।

মানস শিল্পের ক্ষমতা অসীম। যোগীরা বলেন যে, মানস শিল্পের অসাধ্য কিছুই নাই। যোগ নামক মানস শিল্প লিখিত হইলে অগ্রে মানস ক্রিয়া বা মনোবৃত্তি সকল বিশেষ রূপে জানিতে হয়।

মানস ক্রিয়া বা মনোবৃত্তি অনন্ত। এক একটী করিয়া গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এক একটী করিয়া গণনা করা বা এক একটী করিয়া জানিবার আবশ্যকও নাই। মনোবৃত্তির জাতি বা শ্রেণী জানিতে পারিলেই যোগ নামক মানস শিল্পটী জানা যায়। মনস্তত্ত্ববিৎ যোগিগণের মতে, মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহাদের শ্রেণী পাঁচের অধিক নহে। মনোবৃত্তি সকল যে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত সেই পাঁচ শ্রেণীর নাম এই ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত নাম দেখিয়া পাগল-অবস্থা মনে করিও না। মনের অস্থির বা চঞ্চলাত্মক অবস্থাকেই ক্ষিপ্তাবস্থা বলে। মন যে স্থির থাকে না—সন্তুষ্ট থাকে না—ইহা হউক, উহা হউক, করিয়া অস্থির হয়—

জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্যটী—সেটী ছাড়িয়া আর একটী—ক্রমে সেটী ছাড়িয়া অন্য একটী অবলম্বন করে—তাহাই তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা, বহির্ব্বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হওয়া ক্ষিপ্তাবস্থা।

মূঢ়। মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া, কাম ক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রা তন্দ্রা আলস্যাদি তমোময় অবস্থায় নিমগ্ন হয়—তখন তাহার মূঢ়াবস্থা।

বিক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্তাবস্থা ও বিক্ষিপ্তাবস্থা প্রায় একরূপ; প্রভেদ এই যে, চাঞ্চল্যের মধ্যেও ক্ষণিক স্থিরতা। চঞ্চলস্বভাব মন যে স্বীয় সাংসিদ্ধিক চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে স্থির হয়—দুঃখজনক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে নিবিষ্ট থাকে—সেই টুকুই তাহার বিক্ষিপ্তাবস্থা। এই তিন অবস্থার অর্থাৎ ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত, এই তিন শ্রেণীর মনোবৃত্তি যোগের একান্ত অনুপযোগী। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় নামক চিত্তের সহিত যোগের আদৌ সম্পর্ক নাই। বিক্ষিপ্ত চিত্তে কদাচিৎ যোগ সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইবার নহে। সুতরাং বিক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন চিত্তও যোগ নামের অযোগ্য। একাগ্র ও নিরুদ্ধ নামক আর দুইটী চিত্ত-বৃত্তি আছে—সেই দুই চিত্তবৃত্তিই যোগ শব্দের বোধ্য। এক্ষণে একাগ্র কি? তাহা বলা যাইতেছে।

একাগ্র অর্থাৎ একতানতা। একতান আর একাগ্র একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চিত্ত যখন কোন এক আন্তরস্থ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ভাবে থাকে—তখনকার সেই স্থিরতর অবস্থা অকাগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্রূপ একাগ্রতাকেই আর্য্যেরা "যোগ" বলিয়া থাকেন। ইহারই নামান্তর সমাধি। ইহাই যোগ বা সমাধির সাধারণ লক্ষণ। যাহা কিছু বিশেষ আছে—তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক। একাগ্র বৃত্তির পরিচয় পাইলে, এক্ষণে নিরুদ্ধ বৃত্তি কি রূপ, তাহা শুন।

নিরুদ্ধ ও একাগ্র প্রায় একরূপ। প্রভেদ এই যে, একাগ্রাবস্থায় কোন-না কোন এক প্রকার অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহাও থাকে না। নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইলে চিত্ত তখন স্বকারণে (প্রকৃতিতে) লীন থাকে অর্থাৎ দগ্ধ সূত্রের ন্যায় সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া তখন আর কোন প্রকার মনোবৃত্তির উদয় থাকে না। তৎকালে কেবল আত্মার অস্তিত্ব-প্রভাবেই তাহার দেহের পতন হয় না। এই নিরুদ্ধাবস্থাটী সহজে বোধগম্য হইবার নহে। ফল, এই অবস্থাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি পদের বাচ্য। নিরুদ্ধরূপ সমাধির দ্বারাই জীবের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত একাগ্র নামক যোগকে "সম্প্রজ্ঞাত" আর এই নিরুদ্ধ নামক যোগকে "অসম্প্রজ্ঞাত" বিশেষণ দিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যোগ বা সমাধি এই দুই প্রকার ভিন্ন তৃতীয় প্রকার নাই। এই দ্বিবিধ যোগ, যে উপায়ে সাধিত হয় এবং

সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা যে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা যথাক্রমে ৩য়, ৩য়, ও ৪র্থ প্রস্তাবে বক্তব্য।

আশঙ্কা। পূর্ব্বোক্ত "মনের নিরুদ্ধাবস্থাই প্রকৃত যোগ" এই কথায় আশঙ্কা উত্থিত হইতে পারে যে, যদি মনের লয় বা অভাবই হইল তবে আর থাকিল কি? সে ত যোগ না—সে যে এক প্রকার মরণ! কেন না মনের বিলয় আর আত্মার অভাব, একই কথা। পতঞ্জলি বলেন, না—একই কথা না, বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। অজ্ঞ মানবদিগের ঐ প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে। মন আর আত্মা এই দুইটী যে পৃথক্ পদার্থ, তাহা যোগিগণের সমাধিকালেই সপ্রমাণ হয়, অন্য সময়ে নহে। মন আর আত্মা এক হইলে সমাধি অর্থাৎ চিত্ত-লয় হইবা মাত্র শরীরেরও লয় হইত। তাহা যখন হয় না, শরীর যেমন তেমনিই থাকে, তখন আর তৎকালে মনোলয় হইল বলিয়া আত্মারও লয় হইল, এরূপ নিশ্চয় করিতে পার না। বরং তৎকালে আত্মার যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত পার্থক্যই অনুভূত হয়, অন্য সময়ে তাহা হয় না, ইহাই নিশ্চয় করিতে পার।

বৃত্তি কি? এক্ষণে তাহা জানা আবশ্যক হইতেছে। ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই দুই-এর সম্বন্ধবশতঃ যে নিরন্তর মানস ক্রিয়া বা মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা (পরিণাম) জন্মিতেছে তাহার প্রত্যেক অবস্থার (পরিণামের) নাম বৃত্তি। ইহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। বিষয় অসংখ্য; সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহাদের শ্রেণী অসংখ্য নহে। মনস্তত্ত্ববিৎ যোগীগণ বলেন যে, বৃত্তি সকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের নাম—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই পাঁচ শ্রেণীর মনোবৃত্তির মধ্যে কতকগুলি হেয় অর্থাৎ পরিত্যজ্য; এবং কতকগুলি উপাদেয় অর্থাৎ অপরিহার্য্য। সুতরাং পাঁচ শ্রেণীর মধ্যেও আবার দুই শ্রেণী। কি কি? না ক্লিষ্ট আর অক্লিষ্ট। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবৃত্তি সকল ক্লেশের অর্থাৎ সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট; এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী প্রভৃতি বৃত্তি সকল তাহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তির কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। ক্লিষ্ট বৃত্তি গুলি সকল সময়েই হেয় এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি গুলি যোগের সময় ব্যতীত অন্য সকল সময়েই উপাদেয়। যোগের সময় কি ক্লিষ্ট কি অক্লিষ্ট সমস্ত মনোবৃত্তিই দূর করিতে হয়।

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তির প্রত্যেকটীর এক একটী সংক্ষেপ লক্ষণ আছে—তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

প্রমাণ বৃত্তি।—কোনো এক দ্রবীকৃত ধাতু ছাঁচে ঢালিবা মাত্র তাহা যেমন ঠিক্ ছাঁচের আকার ধারণ করে, সেই রূপ, জীবের অন্তঃকরণও বাহ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবা মাত্র ঠিক সেই সংযুক্ত বস্তুর আকারের অনুরূপ আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের তদ্বিধ পরিণামকেই

আমরা বৃত্তি বলি, জ্ঞানও বলি। অপিচ, ছাঁচ এক প্রকার, কিন্তু ঢালিবার দোষে কি অন্য কোন দোষে আকারের বৈলক্ষণ্য জন্মিলে তাহা যেমন মিথ্যা হয়, সেই রূপ বস্তু এক প্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্য প্রকার, এরূপ ঘটিলেও সে বৃত্তি বা সে জ্ঞান মিথ্যা হয়। মনোবৃত্তিটী অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমাণ বা সত্য জ্ঞান নামে গণনীয়, আর বিপরীত ভাবে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপর্য্যয়, ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য্য। এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রমাণ বৃত্তি সকল তিন প্রকার কারণে উপস্থিত হয়, বলিয়া তিন শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগের অব্যবহিত পরেই যে দৃষ্ট বস্তুর স্বরূপবোধক বৃত্তি জন্মে—তাহার নাম প্রত্যক্ষ। এক বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তৎসহচর অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতি হইল (যেমন ধূম-প্রত্যক্ষের পর তৎসহায় বহ্নির প্রতীতি) তাহা অনুমান এবং বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র তদ্বাক্যে বোধ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে তাহা আগম।

বিপর্য্যয়। বস্তু এক প্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্য প্রকার, এরূপ হইলে তাহা বিপর্য্যয় বা ভ্রম, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিপর্য্যয় নামক ভ্রমের রজ্জু সর্প, শুক্তি রজত, মরু মরীচিকা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বিকল্প। বিকল্প কি? না অনাসন্ন কল্পনা। বস্তু নাই, অথচ শব্দের প্রভাবে এক প্রকার অনাসন্ন কল্পনা বা মনোবৃত্তি জন্মিলে তাহা বিকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। আকাশ-কুসুম নাই, অথচ উহা শুনিবা মাত্র অন্তরে অবশ্যই এক প্রকার বৃত্তি জন্মিবে। পদার্থ দুইটী, কিন্তু শব্দের প্রভাবে একটি বৃত্তি জন্মিলে তাহাও বিকল্প বলিয়া গণ্য হইবে। কিংবা বস্তু একটি কিন্তু শব্দের প্রভাবে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিলে তাহাও বিকল্প হইবে। আত্মা ও চৈতন্য বস্তুতঃ এক কিন্তু "আত্মার চৈতন্য" শুনিলে অবশ্যই দুইটি পৃথক্ বৃত্তি জন্মিবেক। চৈতন্যযুক্ত মূল বুদ্ধিরূপ অহংতত্ত্বটী বস্তুতঃ দুই পদার্থ; কিন্তু "আমি" বলিবা মাত্র এক বৈ দুই বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব, বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া, সমুৎপন্ন অনাসন্ন বা আগন্তুক মনোবৃত্তি গুলিই বিকল্প বৃত্তি।

নিদ্রা। নিদ্রাও এক প্রকার জ্ঞান বা মনোবৃত্তি। প্রকাশময় সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের (অজ্ঞানের) উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। অতএব, তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। যখন অন্ধকারময় অজ্ঞানময় নিদ্রা বৃত্তির উদ্রেক হয়—তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বাংশটী অভিভূত থাকে বলিয়াই কোন প্রকার প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্যই লোকে বলে, "আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না।" বস্তুতঃ তখন তাহার কোন জ্ঞান ছিল না এরূপ নহে অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানটী ছিল। সেই জন্যই

সে নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানটীকে স্মরণ করিতে থাকে।

স্মৃতি। জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়—শুনা যায় চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলে সেই সংস্কারটী প্রবল হইয়া চিত্তে সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপটীকে পুনরুদিত করিয়া দেয় এবং তাহাই স্মৃতি বা স্মরণ নামে উল্লিখিত করিয়া থাকি।

যথাক্রমে বর্ণিত এতদ্বিধ পাঁচ শ্রেণী ভিন্ন ছয় শ্রেণী নাই। যোগকালে এই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়। রুদ্ধ করিবার উপায় দ্বিবিধ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ বহির্গতি ফিরিয়া যায় এবং আন্তরগতি অর্থাৎ আত্মাভিনিবেশরূপ স্থৈর্য্য জন্মে। ক্রমে একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই দুই অবস্থা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত স্থায়ী করিবার নিমিত্ত অভ্যাসের আবশ্যক আছে। কেন না, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই উহা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

যাহার যে বস্তুতে উৎকট বিরাগ জন্মে, তাহার চিত্ত কোন ক্রমেই সে বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল হইবে না বা সে বস্তুর প্রতি ধাবিত হইবে না। এই দৃষ্টান্তে, যদি সকল বিষয়েই বিরাগ উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে কেন না সকল বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে? অপিচ, বৈরাগ্য অপেক্ষা অভ্যাসের ক্ষমতা অধিক। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, অভ্যাস দৃঢ় হইলেই তাহা স্বভাবের সমবল ধারণ করে। মন যে স্থির থাকে না তাহাও তাহার অভ্যাসের ফল। মন চিরকাল বসিয়া কেবল চঞ্চলতা অস্থিরতা অভ্যাস করিয়াছে সুতরাং এখন আর সে সহজে স্থির হইতে পারে না। সে চঞ্চল স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার যদি সে স্থির হওয়া অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই স্থির স্বভাব প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে চিত্তের অনন্ত বৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া একতান-বৃত্তি স্থায়ী হইতে পারে, ইহা যুক্তিবহির্ভূত নহে।

অভ্যাসের সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক বার বার একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্ব্ব-সাধক যম নিয়মাদি সাত প্রকার শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা। এই করিতে করিতে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবে যে, অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তুমি তোমার চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিতে পারিবে, নচেৎ পারিবে না। কিন্তু অভ্যাস সেরূপ দৃঢ় হওয়া দু পাঁচ দিনে হইবে না—দুই একবার করিবার করিলে হইবে না—অযত্ন পূর্ব্বক করিলেও হইবে না। শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত উৎসাহের সহিত সদা সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে। এতদ্রূপ যোগাভ্যাস যখন দৃঢ় হইবে তখন তোমার চিত্ত তোমার অধীন হইবেক। এক্ষণকার ন্যায় আর চিত্তের অধীন থাকিতে হইবেক না। তখন তুমি তাদৃশ স্বাধীন চিত্তকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে।

অভ্যাসের ন্যায় বৈরাগ্য উৎপাদন করাও সহজ নহে। বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য; কিন্তু তাহা বস্তুবিবেকের অধীন। যদি প্রত্যেক বস্তুর দোষ, অনুসন্ধান দ্বারা হাড়ে হাড়ে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করা যায়—তবেই বিষয় স্পৃহা পরিত্যাগ হইতে পারে, নচেৎ পারে না। কিন্তু যখন শতশত বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতে দেখা যায়—তখন অবশ্যই সহস্র সহস্র বস্তুতেও বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারিবেক।

চিত্তস্থ বিষয়ানুরাগ দূর করিবার যত্ন উপস্থিত হওয়াই বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা। কোন্ অনুরাগটী দগ্ধ হইল—কোন্ অনুরাগটীই বা সজীব রহিল—ইহা বিভাগক্রমে অনুভব করা তাহার দ্বিতীয়াবস্থা। ক্রমে যখন চিত্ত আর কোন বিষয়েই আকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু আকৃষ্ট হওয়ার সংস্কার অর্থাৎ সূক্ষ্ম ঔৎসুক্য মাত্র থাকিবেক, তখন তাহার তৃতীয়াবস্থা। ক্রমে যখন সেই ঔৎসুক্য টুকুও থাকিবেক না, তখন তুমি ইহ লোকের কথা দূরে থাকুক—স্বর্গ লোকের প্রতিও স্পৃহা শূন্য হইবে। এই অবস্থাটী বৈরাগ্যের চতুর্থাবস্থা বা পূর্ণাবস্থা। এই চতুর্থাবস্থার বৈরাগ্যের নাম "বশীকার"। এই বশীকার নামক উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যই জ্ঞানের চরম সীমা ও সমাধির অদ্বিতীয় উপকরণ। অনুশীলন দ্বারাই ইহা উৎপন্ন হয়; সুতরাং যৎকালে প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান জন্মিবে তৎকালই এই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য দৃঢ় হইবে।

ক্রমশঃ।

কালীবর বেদান্তবাগীশ।

নীলের বাণিজ্য।

নীল-বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের একটি বিশেষ শিক্ষা লাভ হয়। উদ্ভিজ্জ হইতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে এবং তাহার বাণিজ্য ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে শুধু যে জল বায়ুর উপযোগিতা দেখিতে হইবে এরূপ নহে, কৃষক ও কারখানা-ওয়ালাদিগের উদ্যম ও নৈপুণ্যের উপর অনেকটা তাহা নির্ভর করে। চাউল, তুলা চিনি প্রভৃতির ন্যায় নীলও আমাদের দেশের একটি প্রাকৃতিক দ্রব্যজাত—ভারতবর্ষই

উহার আদিম উৎপত্তি-স্থান। অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশ হইতে নীল যে, অন্য দেশে যাইত তাহার প্রমাণ, Pliny, Arrian প্রভৃতির গ্রন্থে নীলের নাম Indicum বলিয়া উল্লেখ আছে; এই ইণ্ডিকম হইতে ক্রমে ইণ্ডিকো এই কথাটি চলিত হয়—এক্ষণে য়ুরোপীয় বাণিজ্যে ঐ দ্রব্য ইণ্ডিগো নামে খ্যাত। পূর্ব্বে য়ুরোপে Woad নামক একপ্রকার নীলোৎপাদক উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে ভারতবর্ষীয় নীলের এত কাটিৎ হয় যে তাহাতে য়ুরোপ-জাত বোডের বাণিজ্য অনেকটা কমিয়া যায়—এবং এই হেতু ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে নীলের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া এক রাজাজ্ঞা প্রচার হয়। তখন নীলকে ডেবিলের রং (Devil's dye) বলা হইত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি তাহাদিগের বাণিজ্যের প্রথম শতাব্দিতে, যে সকল দ্রব্য আমাদের দেশ হইতে য়ুরোপে চালান করিতেন, তাহার মধ্যে নীল একটি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য দ্রব্য-জাতের ন্যায় নীল বস্তুত উৎকৃষ্ট হইলেও প্রস্তুত করিবার সময়ে ও বাক্সবন্দি করিবার সময়ে অযত্ন ও অনবধানতা প্রযুক্ত তাহার মূল্যের হ্রাস হইত। নীলবড়ির বহির্ভাগে বালি ও ময়লা না থাকে তজ্জন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া পাঠাইতেন।

ক্রমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস ও উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ অংশের ব্রিটিস ঔপনিবেশিকেরা সেই সেই দেশে নীলের চাষ ও কারখানাকার্য্যের প্রতি বিশেষ রূপে মনোযোগ দেওয়ায় তত্রস্থ নীল ভারতবর্ষীয় নীল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে নীল আমদানি বন্ধ করিয়া দিলেন।

পক্ষান্তরে, ফরাসিসেরা তাহাদিগের নিজ উপনিবেশ সেণ্ট ডমিঙ্গোতে নীলের চাষ ও কারখানাকার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। তৎকালে পোর্টুগীজেরা সেই নীল ব্রেজিলে এবং স্পেনীয়েরা মেক্সিকোতে লইয়া যাইত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিস ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার প্রায় সমস্ত নীলকরেরা নীলের চাষ পরিত্যাগ করে। সেই অবধি, গ্রেট্ ব্রিটেন ও অবশিষ্ট সমস্ত য়ুরোপে, স্পেনীয় ও ফরাসিসেরা নীলের যোগান দিত। উহারা তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুত করিত।

কিন্তু ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহাতে ভারতবর্ষীয় নীল অধিক পরিমাণে জন্মে ও উৎকৃষ্ট হয় তাহার প্রতি আবার বিশেষ রূপে মনোযোগ দিলেন। প্রিন্সেপ সাহেব প্রভৃতি চুক্তিদারগণ তাহাদিগকে নীল যোগাইবেন বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত একটা চুক্তি করেন। কিন্তু যে সকল নীল ভারতবর্ষ হইতে চালান হইল তাহাতে লাভ না হইয়া গড়ে প্রায় আশি হাজার টাকা ক্ষতি হইল। কিন্তু এই ক্ষতিতেও তাঁহারা

নিরুৎসাহ হইলেন না। বরং ইহা হইতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ লাভের পথ উন্মুক্ত হইল। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া-প্রণালী-অভিজ্ঞ য়ুরোপীয়েরা বঙ্গদেশে আসায় নীল কারখানা কার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এমন কি, Boyce সাহেব ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে যে নীল পাঠাইয়াছিলেন তাহা স্পেনীয় নীলের সমান হয়। কোম্পানী দেখিলেন, ভারতবর্ষে যে উৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হইতে পারে না এরূপ নহে। তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন, তিন বৎসরের জন্য তাঁহারা নীল ক্রয় করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। তাঁহারা মনে করিলেন, ইহার ফল এই হইবে যে, কোম্পানীর প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেলে ব্যক্তি-বিশেষদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইবে এবং "ইহার দ্বারা এই দ্রব্য যত দূর সম্ভব পূর্ণতায় আনীত হইবে"; ইহার সঙ্গে সঙ্গে কত কম মূল্যে নীল প্রস্তুত হইতে পারে তাহাও নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কিরূপে নীল প্রস্তুত করিতে হয় কোম্পানী তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের প্রতি ভুয়োভুয় উপদেশ পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন, এবং অন্য দেশের উৎকৃষ্ট নমুনা এবং ভারতবর্ষ-প্রেরিত নীল সম্বন্ধে বিলাতী দালালদিগের রিপোর্ট তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৭৮৯ ও ১৭৯০ এই দুই বৎসরের জন্য শুল্ক রহিত করিলেন এবং জাহাজ ভাড়াও কমাইয়া দিলেন। আরও, কোম্পানী কতকগুলি নীল কারখানা ওয়ালাদিগকে বেশি বেশি করিয়া টাকা দাদন দিতে লাগিলেন।

এই সকল উপায় অবলম্বন করিবার পরে অতি অল্প কালের মধ্যেই ভারতবর্ষীয় নীল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। মার্কিন, ফরাসিস ও স্পেনীয় নীল সকলেই ভারতবর্ষীয় নীলের নিকট নতমুখ হইল। ক্রমশ ভারতবর্ষীয় নীলের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া একাধিপত্য লাভ করিল। *

নীলের উন্নতি-সাধনে য়ুরোপীয়েরা এখনও পর্য্যন্ত ক্ষান্ত নহেন। সম্প্রতি Mons. P. J. Michea নীল তৈয়ারির যে একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়াছেন এবং তাহার পেটেণ্ট লইয়াছেন তাহা যশোর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের য়ুরোপীয় কারখানায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নূতন পদ্ধতিটি আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছে—যে যে কারখানায় এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেখানকার মাল কোন কোন স্থলে শতকরা ৩০ কিম্বা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। সেই পদ্ধতিটির স্থূল মর্ম্মগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছেঃ——

১। চারা হইতে রঙ্গীন পদার্থ বাহির করিবার নিমিত্ত নীল-জল আলোড়ন করিয়া যে গাঁজ বাহির করা হয়, সেই গাঁজ আরও উত্তেজিত ও বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এক প্রকার গাঁজ-পদার্থ (yeast) ব্যবহৃত হয়—(এই পদ্ধতি অনুসারে শতকরা

* Essay on the productive resources of India—by I. F. Royle M. D., F. R. S.,

১০ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত অধিক মাল উৎপন্ন হয়।)

২। পচন-হাউজ হইতে গাজ্‌নি-হাউজে নীল-জল প্রবাহিত হইবার পরেও—নীলের ছিব্‌ড়ায় যে কিছু রস অবশিষ্ট থাকে তাহাও কোন উপায়ে পুনর্ব্বার বাহির করিয়া লওয়া হয়। ইহাতেও প্রায় শতকরা ৫ ভাগ মালের বৃদ্ধি হয়।

৩। গাজন-হৌজে গাজনের পর যাহাতে নীলের রঙ্গীন পদার্থ তলায় সহজে তিথিয়া পড়ে তাহার সুবিধার নিমিত্ত Neutral alum salt অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জল নির্গমনের সঙ্গে যে কতকটা মাল বাহির হইয়া গিয়া নষ্ট হয়—সেই মাল আর বাহির হইতে পারে না—সুতরাং শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ আন্দাজ মাল বাঁচিয়া যায়।

৪। হাওয়া ঠাণ্ডা হইলে "মুরি"র জল ষ্টীম দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া আবশ্যক পরিমাণে তাপ রক্ষা করা যায়। ইহাতে নীলকরদিগের আর হাওয়ার উপর বড় নির্ভর করিতে হয় না—এমন কি, নবেম্বর মাস আসিয়া পড়িলেও নীল তৈয়ারির কার্য্য বন্ধ করিবার আবশ্যক হয় না।†

কিন্তু নীলের বাণিজ্য বোধ হয় আর থাকে না। সম্প্রতি একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে একপ্রকার নীল রঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। শোনা গিয়াছিল তাহা প্রস্তুত করিতে যেরূপ অধিক খর্চ্চা পড়ে তাহাতে আমাদের দেশের উদ্ভিজ্জ-নীলের স্থান তাহার দ্বারা কিছুতেই অধিকৃত হইতে পারে না। কিন্তু আবার ফেব্রুয়ারি মাসের Nature নামক বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রে সে দিন দেখিলাম যে, খর্চ্চার প্রতিবন্ধকও দূর হইয়াছে। অতএব নীল-করদিগের এক্ষণে সমূহ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত ‡।

এই বাণিজ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে যেই-মাত্র য়ুরোপীয়েরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিস ও উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ অংশে নীলের চাষ ও তাহার কারখানাকার্য্যে মনোযোগী হইলেন অমনি

† Indian Industries.
by A. G. Eliot James.

‡ Prof. Baeyer succeeded, some years ago, in preparing indigo artificially, but the process was so expensive that it was not likely to be of much practical importance. He has now, however, succeeded in effecting the synthesis in another way, by which he can not only produce the indigo much more cheaply but can produce it within the fibre of the material to be dyed. The artificial production of alizarin has already wrought a great change in the commercial relations of the South of France, and if indigo be produced synthetically at a lower price than it can be grown, similar alterations may result in some parts of our Indian Empire.—Nature. Feb.

ভারতবর্ষীয় নীল হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, আবার যখনই য়ুরোপীয়েরা এখানে আসিয়া তাঁহাদিগের উদ্যম ও নৈপুণ্য নিয়োগ করিলেন, অমনি আবার আমাদের নীল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। অতএব দেখা যাইতেছে, য়ুরোপীয় উদ্যম ও নৈপুণ্যের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। অনেকে ক্রমাগত এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে ইংরাজেরা আমাদের দেশ হইতে অজস্র ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া যাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন। আমাদের লক্ষ্মী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যে বিদেশীয়দিগকে আশ্রয় করিতেছেন, তাহার কারণই এই যে আমরা তাঁহার অযোগ্য, আমাদের নিজের দোষেই আমরা তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তার জন্য অক্ষেপ করা বৃথা। যতই কেন য়ুরোপীয়েরা আমাদের দেশ হইতে ধন লুট করুন না, ইহা কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের উদ্যম ও নিপুণতা গুণে আমাদের দেশে নূতন নূতন কারখানা খোলা হইতেছে, ধনাগমের নূতন নূতন পথ আবিষ্কৃত হইতেছে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে এবং এই রূপে সাধারণতঃ দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে।

—০—

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়াদিত্য কিসে সুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাঁহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় সমুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ত্রুটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন—বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে—, কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা যোগায় না। দুই জনে স্তব্ধ, কাহারো মুখে কথা নাই, মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া সেই ছায়ার

দিকে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া বুক ফাটিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, "দাদা সে কোথায় গেল?" উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠেন, চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন বিভা কি বলিল ভাল বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, "আয়, বিভা একটা গল্প বলি শোন্।"

বর্ষার দিন,—খুব মেঘ করিয়াছে; সমস্ত দিন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক একবার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রাম শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, "সুরমা নাই—সে নাই।" মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হুহু করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়, "সুরমা কোথায়!" বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহে—"দাদা!" দাদা আর উত্তর দিতে পারেন না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বাতায়নের উপরে মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহারের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে, "দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাও'সে!" উদয়াদিত্য কোন উত্তর করেন না। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, "দাদা, উঠ', রাত হইল।" উদয়াদিত্য মুখ তুলিয়া দেখেন বিভা কাঁদিতেছে; তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভাল করিয়া খান্ না। বিভা তাই দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যায়, সে আর আহার স্পর্শ করে না।

বিভা কথা কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না; উদয়াদিত্যকে কি করিয়া যে সুখে রাখিবে ভাবিয়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা যদি দাদা মহাশয় থাকিতেন!

আজ কাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্ব্বেকার সাহস নাই। বিপদকে তৃণজ্ঞান করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্তত করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন, ছাপ্রার জমিদারের কাছারীতে রাত্রিযোগে লাঠিয়াল পাঠাইয়া কাছারী লুঠ করিবার ও কাছারী বাটিতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে কহিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিক দেখিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া

বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন। ভৃত্য আসিয়া কহিল, "যুবরাজ, অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে। কোথায় যাইতে হইবে?" যুবরাজ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও অবশেষে কহিলেন, "কোথাও না। তুমি অশ্ব লইয়া যাও।"

এক দিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া উদয়াদিত্য বাহির হইয়া আইলেন। দেখিলেন রাজকর্ম্মচারী এক প্রজাকে গাছে বাঁধিয়া মারিতেছে। প্রজা কাঁদিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দোহাই যুবরাজ!" যুবরাজ তাহার যন্ত্রণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্ম্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে। তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনি তাহাদের কষ্টের কথা শুনেন, তখনি মনে করেন "আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দেব।" তাহার পরেই ইতস্তত করিতে থাকেন, পাঠান' আর হয় না।

কেহ যেন মনে না করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরূপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে তিনি যেন রহস্যময় কি-একটা মনে করেন? যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনো যদি প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনো তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা রুক্মিণীর (মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া শুদ লইয়া সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রূপ এবং রূপা এই দুয়ের জোরে সে অনেককে বশে রাখিয়াছে। সীতারাম সৌখীন লোক, অথচ ঘরে এক পয়সার সংস্থান নাই, এই জন্য রুক্মিণীর রূপ ও রূপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যে দিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সে দিন সীতারামকে দেখ, দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে, হাতে লাঠি লইয়া, পাতলা চাদর উড়াইয়া, বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, মঙ্গলার বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হে সীতারাম, সংসার কেমন চলিতেছে?" সীতারাম তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলে, "বেশ চলিতেছে! কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল!" সীতারামের বড় বড় কথাগুলা কিছু মাত্র কমে নাই, বরঞ্চ

অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে, কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থাও বড় মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনরারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন।

আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া, কাছে ঘেঁসিয়া কহিল,—

"ভিক্ষা যদি দেবে রাই,
(আমার) সোনা রূপায় কাজ নাই,
(আমি) প্রাণের দায়ে এসেছি হে,
মান রতন ভিক্ষা চাই।"

না ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মান-রতনে আমার আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে; আপাততঃ কিঞ্চিৎ সোনা রূপা পাইলে কাজে লাগে!"

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা' তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে ত তোমাকে দিব না ত কাহাকে দিব?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল "নাঃ—আবশ্যক এমনিই কি! তবে কি জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা ঘোড়াঘাটায় তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব!"

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কি? যখন সুবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ ত আর জলে ফেলিয়া দিতেছি না!" জলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে; সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনা টুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মঙ্গলার এইরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালবাসা একেবারে উত্থলিত হইয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবী করা ও বিনা হাস্যরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, ও আর কাহারো অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়। সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ, সীতারাম যাহাকে মজা মনে করিত, আর সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতেছিল, সীতারাম আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙ্গা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া, কিলের সহিত হাস্যরসের

প্রভেদ ও করুণরসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আজকাল সকল বিষয়েই একটা-না-একটা তত্ত্ব বা নীতি বাহির হইতেছে, দুর্ভাগ্য সীতারামের গল্প হইতে এই তত্ত্ব, এই নীতি পাওয়া যায় যে, ভাল মনে করিয়া কাজ করিলেই হইল না, ভাল কাজ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সীতারামের অনুরাগ সহসা উত্থলিত হইয়া উঠিল, সে রুক্মিণীর কাছে ঘেঁসিয়া প্রীতিভরে কহিল "তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ!"

রুক্মিণী কহিল, "মর্ মিন্সা! সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন!"

সীতারাম কহিল, "তাহা কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে সুভদ্রা হরণ হইল কি করিয়া!"

রুক্মিণী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, "না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও! সুভদ্রা যদি বোনই হইল, তবে সুভদ্রা হরণ হইল কি করিয়া!"

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে, ইহার উপরে আর কথা কহিবার যো নাই!

রুক্মিণী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, "দূর মূর্খ!"

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল, "মূর্খই ত বটে! তোমার কাছে আমি ত ভাই হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মূর্খ!" সীতারাম মনে মনে ভাবিল, খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা যোগাইয়াছে!

আবার কহিল, "আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কি বলিয়া ডাকিলে তুমি খুসী হইবে, আমাকে বল!"

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, "বল, প্রাণ।"

সীতারাম কহিল "প্রাণ!"

রুক্মিণী কহিল "বল, প্রিয়ে।"

সীতারাম কহিল "প্রিয়ে।"

রুক্মিণী কহিল "বল প্রিয়তমে।"

সীতারাম কহিল "প্রিয়তমে!"

রুক্মিণী কহিল "বল প্রাণপ্রিয়ে।"

সীতারাম কহিল "প্রাণপ্রিয়ে।"

"আচ্ছা ভাই, প্রাণ-প্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে, তাহার শুদ কত লইবে?"

রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "যাও যাও, এই বুঝি তোমার ভালবাসা! শুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে?"

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "না না, সে কি হয়? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম? আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ছি, প্রিয়তমে!"

সীতারামের মায়ের কি রোগ হইল জানি না, আজ কাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাই বাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণ শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল! কাজেই

সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজ কাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কি একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেকদিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল, "আমার ভাই অত ফন্দি আসে না। এ বিষয়ে ভাগবতের সাহায্য না লইলে চলিবে না!"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুমদাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড় বড় গাছের শাখা হেল্লিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মত, ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জ্জন। উদয়াদিত্য চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোট একটি মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়াছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠায় নাই। অনেক দিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া "কাকা" "কাকা" বলিয়া সে তাঁহার কোলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার শয়ন গৃহে লইয়া আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে "সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে! ইহাকে যে সে বড় ভাল বাসিত! এত স্নেহ ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে!" মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা মহাশয়, কাকিমা কোথায়!" উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"একবার তাঁহাকে ডাক্ না!" মেয়েটি "কাকি মা" "কাকি মা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের মনে হইল, ঐ যেন কে সাড়া দিল! দূর হইতে ঐ যেন কে বলিয়া উঠিল "এই যাই রে!" যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ঐ না পদশব্দ শুনা গেল? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়দুড় করিতেছে যে, শব্দ ভাল শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব! দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল; উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন "সুরমা কি?" পাছে সুরমাকে দেখিলেই সুরমা চলিয়া যায়! পাছে সুরমা না হয়!

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল, "কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না?"

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিল। চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া কাকা কাকা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপরে ফেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি করিবেন কোথায় যাইবেন, যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। রুক্মিণী কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, "বলি, এখন ত মনে পড়িবেই না! তবে এক কালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে?" উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, "আমি তোমার কি দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিইত আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে, সে আজ ভিখারিণীর মত পথে পথে বেড়াইতেছে, এ পোড়াকপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?"

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল, আমিই বুঝি ইহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন, যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়াছিল, আবর্ত্তের মত তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল—সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন মলিন, ছিন্ন, রুক্মিণী কাঁদিতেছে। করুণ হৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন "তোমার কি চাই?"

রুক্মিণী কহিল, "আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালবাসা চাই। আমি ঐ বাতায়নে বসিয়া তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই! কেন গা, সুরমার চেয়ে কি এ মুখ কালো? যদি কালোই হইয়া থাকে ত সে তোমার জন্যই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া! আগেত কালো ছিল না।"

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না, কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ও বিছানায় বসিও না, বসিও না।"

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া বলিল "কেন বসিব না?"

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন—"না—ও বিছানার কাছে তুমি যাইও না! তুমি কি চাও, আমি এখনি দিতেছি!"

রুক্মিণী কহিল "আচ্ছা, তোমার আঙ্গুলের ঐ আংটিটি দাও!"

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুক্মিণী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল, ডাকিনীর মন্ত্রমোহ এখনো দূর হয় নি, আরো কিছু দিন যাক্, তাহার পর আমার মন্ত্র খাটিবে!

রুক্মিণী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন "কোথায় সুরমা কোথায়! আজ আমার এ দগ্ধ বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাগবতের অবস্থা বড় ভাল নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদিগের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কৃষ্ণবর্ণ পাকচক্রের কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ। সে কাহারো সঙ্গে মেশে না এই যা' তাহার দোষ; হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চ্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মত পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখন ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে, তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখন ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হুঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়—সংসারে যাহাকে ভাল লোক বলে, ভাগবত তাহাই। পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্য করে। দুরবস্থায় পড়িয়া ভাগবত ধার করিয়াছিল, কিন্তু ঘটিবাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

এক দিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ হে?"

ভাগবত কহিল, "ভাল না।"

সীতারাম কহিল, "কেন বল দেখি!"

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হুঁকা দিয়া কহিল "বড় টানাটানি পড়িয়াছে।"

সীতারাম কহিল, "বটে? তা কেমন করিয়া হইল?"

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেমন করিয়া হইল? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে না কি? আমি ত জানিতাম, আমারো যে দশা তোমারো সেই দশা!"

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "না হে, আমি সে কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি ধার করনা কেন?"

ভাগবত কহিল, "ধার করিলে ত শুধিতে হইবে! শুধিব কি দিয়া? বিক্রয় করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিষও বড় অধিক নাই।"

সীতারাম সগর্ব্বে কহিল, "তোমার কত টাকা ধার চাই, আমি দিব।"

ভাগবত কহিল, "বটে? তা' এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে, এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেল। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া

রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই!"

সীতারাম কহিল, "সে জন্যে, দাদা, তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্য-প্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল—"দাদা, রাজার অন্যায় বিচারে আমাদের ত অন্ন মারা গেল।"

ভাগবত কহিল—"কই, তোমার ভাবে ত তাহা বোধ হইল না!" সীতারামের বদান্যতা ভাগবতের বড় সহ্য হয় নাই; মনে মনে কিছু চটিয়াছিল!

সীতারাম কহিল, "না, ভাই কথার কথা বলিতেছি। আজ না যায় ত দশদিন পরে ত যাইবে!"

ভাগবত কহিল—"তা, রাজা যদি অন্যায় বিচার করেন ত আমরা কি করিতে পারি!"

সীতারাম কহিল, "আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবেন, তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে। ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।"

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, "ওসব কথায় আমাদের কাজ কি ভাই? তুমি বড়মানুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা উজীর মার, সে শোভা পায়—আমি গরীব মানুষ, আমার অতটা ভরষা হয় না!"

সীতারাম কহিল, "রাগ কর কেন দাদা? কথাটা মন দিয়া শোনই না কেন?" বলিয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দেখ, সীতারাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি আমার কাছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিও না!"

সীতারাম সে দিনত চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কি একটা ভাবিতে লাগিল। তাহার পরদিন সকালবেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল "কাল যে কথাটা বলিয়াছিলে, বড় পাকা কথা বলিয়াছিলে!"

সীতারাম গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "কেমন দাদা, বলি নাই?"

ভাগবত কহিল "আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

সীতারাম আরো গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল, তাহা এই,—একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ উদয়াদিত্য প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট্-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের শীল-মোহর মুদ্রিত থাকিবে। রুক্মিণী যে আংটিটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম-মুদ্রাঙ্কিত শীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমত কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল। নির্ব্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্তখানি লইয়া দিল্লীর দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল, উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোন সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজার নিকট আসিতেছি। ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই। দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কি অবস্থা হইল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। ভাগবতের পুনর্ব্বার রাজবাড়িতে চাকরী হইল।

রুশীয় নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই ইহা বিশেষ রূপে বিদিত আছেন, যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে "গুপ্ত সমাজ" সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে হইয়া আসিতেছে। দুই একটী ব্যতীত ঐ সকল সভা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লব সাধন উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্ব্বোনেরো, ইলিউমিনেটি, ইয়ং-ইতালী, ইয়ং য়ুরোপ, ইয়ং জর্ম্মাণি, সোসিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি যে সকল গুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে, কমিউনিষ্টদিগের মত সর্ব্বাপেক্ষা সমূলোচ্ছেদক (১) বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক প্রজাতন্ত্রী (২) এবং কমিউনিষ্টদিগের মত কল্পনা-দোষে দূষিত হইলেও তাহাদিগের উদ্দেশ্যের এক প্রকার স্থিরতা দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের মতে, রাজ্য সকলকে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য, তাহাদের বিশ্বাস যে সময়ে সমস্ত সমাজ পুনঃনির্ম্মিত হইবে ও যাহাতে সকল লোকেই পৃথিবীর সমগ্র বিষয় ও মূলধন হইতে সম পরিমাণে উপকার লাভ করিতে পারে এবং ঐ কার্য্য যাহাতে সাধারণের যত্নে সম্পাদিত হয় ইহাই তাহাদিগের মতে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ফলতঃ সকলকে সম স্বত্ব প্রদান করাই

১ Radical.

২ Social Democrats

তাহাদিগের অভিপ্রায়, সমস্ত ধ্বংশ করা উদ্দেশ্য নহে।

অন্য দিকে রুশীয় বৈপ্লবিক দলের সমাজসংস্কারের কিম্বা উন্নতি সাধনের কোন প্রকার স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না। ইহাদিগের চক্ষে বর্ত্তমান যাহা কিছু আছে তাহা সকলই দূষিত এবং কোন বিষয় নূতন এবং সম্পূর্ণ রূপ গঠিত করিতে হইলে সামাজিক চিরন্তনী প্রথা (৩) সকলের এক কালীন ভূমিসাৎ করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম, শাসন প্রণালী, পারিবারিক বন্ধন, বিধি, বিবাহ, নীতি প্রভৃতি সকলই ঘৃণ্য ও কলুষিত অতএব এই সকলকে আমূল উৎপাটিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহাদিগের চক্ষে জগতের সকলই দূষিত বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং ইদানীন্তন সকলই উচ্ছেদনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই কারণ বশতঃ ইহারা আপনাদিগের সম্প্রদায়কে নিহিলিষ্ট বলিয়া থাকে। উহারা যথার্থ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া উহা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে পরিণত করিতে বাসনা করে। তাহাদের ইচ্ছা যে কোন প্রকার রাজনিয়ম বিধি বদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক কোন প্রকার নৈতিক বন্ধন থাকিবে না; সকলেই আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। কিন্তু উহারা যে সকল সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করে তাহার স্থানে কিছু নূতন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে না। ঐ কার্য্যের ভার তাহারা ভবিষ্যৎ উন্নত ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের হস্তে ন্যস্ত করিতে বাসনা করে।

নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্যক রূপে পাঠকদিগের গোচর করিবার অগ্রে, যিনি এই মত প্রথম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় কিছু বলা নিতান্ত আবশ্যক, এবং উহা জানিবার কৌতূহল নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

মাইকেল বাকুনিন, রুশদেশীয় সম্ভ্রান্ত বয়ার্ড (৪) বংশ সম্ভূত। রুশীয় ইতিহাস পাঠক মাত্রেই ইহা বিশেষ অবগত আছেন যে বয়াডবংশ অতি পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত এবং উহারা রাজগৃহে এবং সৈন্য শ্রেণীতে বিশেষরূপে পরিচিত।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বাকুনিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশের নিয়মানুসারে যুদ্ধ ব্যবসা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সাম্রাজিক রক্ষক দলে নিযুক্ত হয়েন। বিংশতিবর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গের তোপ শিক্ষার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সেখানে তিনি অসন্তোষ ও অবাধ্যতার পরিচয় দেন। তাহাতে এই ফল হইল যে তিনি উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াও রক্ষক দলে প্রবেশ করিতে পাইলেন না, অথচ কোন একটী দূরস্থিত কদর্য্য পল্লীগ্রামে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রেরিত হইলেন। এবম্প্রকার অসদ্ব্যবহার

৩ Social Institutions.

৪ Boyard family.

প্রাপ্ত এবং সমস্ত জীবনের জন্য ঐ প্রকার কদর্য্য স্থানে নির্ব্বাসিত হওয়ায় বাকুনিনের অন্তঃকরণে মানব জাতির প্রতি ঘৃণা সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধমূল হইল। ফলত এই কারণে তিনি সাংগ্রামিক কার্য্যে এত দূর অমনোযোগী হইয়াছিলেন যে অবশেষে সৈন্য দল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই প্রকারে তিনি দ্বাবিংশ বর্ষঃ বয়ক্রম কালে অপদস্থ এবং জীবনের উদ্দেশ্য বিহীন হইলেন। মসকাউ নগরে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিয়া তিনি তথায় এলেকজাণ্ডার হার্জেন এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত রুশীয় দিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই সময়ের প্রচলিত হিগেলের সামাজিক দর্শন সম্যক সমালোচনার নিমিত্ত একটী সভা স্থাপিত করেন। শীঘ্রই তিনি ঐ দলের সর্ব্ববাদিসম্মত দলপতি হইলেন; এবং তিনি অধ্যবসায়ে, ও উৎসাহে তাঁহার বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই তিনি স্থির করিলেন যে রুস দেশে উক্ত মতের বিস্তার করা নিতান্ত আবশ্যক; এবং এই গুরুতর কার্য্যভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিগেলের মত উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার মানসে বার্লিন নগরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে হিগেলের মৃত্যু হইয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার মত জর্ম্মানিতে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। ঐ স্থানে কিছুকাল অবস্থিতির পর তিনি হিগেলের মত যাহাতে সর্ব্ব সাধারণের ইহজীবনের দৈনিক কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রুশীয় বন্ধুরা তাঁহার এই প্রকার উন্মত্ততা দর্শন করিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন পরিত্যাগ করিয়া ড্রেস্‌ডেন নগরে গমন করিলেন। তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতির পর তাঁহার রুশীয় বন্ধুদিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে জার্ম্মানিতে শিক্ষা করিবার তাঁহার আর কিছু নাই, এবং ইহাঁর অব্যবহিত কাল পরেই পারিস নগরে গমন করিলেন। তৎকালে সকলের ইহা বিশ্বাস ছিল যে পারিস নগর হইতেই সমগ্র মনুষ্য সমাজ সংস্কার আরম্ভ হইবেক। ঐ সময়ে প্রুঁ এবং লুইব্লাঁ তাঁহাদিগের ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বাকুনিনের উপর রুশ গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ হওয়াতে তাঁহাকে রুশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি ঐ অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া আর পাঁচ বৎসর কাল ফ্রান্সে ও কিয়ৎ কাল সুইজারলণ্ডে অতিবাহিত করিলেন। তিনি ওয়ারসো (৫) বিপ্লবের সাম্বৎসরিক উৎসবে রুশ সম্রাটকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রচলিত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই কারণ বশতঃ সম্রাট নিকোলাসের অনুরোধে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স হইতে রাজবিধি অনুসারে বহিষ্কৃত হইলেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া দিবার জন্য রুশীয় গবর্ণমেণ্ট দশ সহস্র রুবেল (৬) পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি কিছুকাল এই প্রকারে রুশীয় পুলিশের প্রতিনিধি দ্বারায় অনুধাবিত হইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশী বিপ্লবে সুবিধা পাইয়া পারিস নগরে পুনঃ প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু ফ্রান্সে তাঁহার অভীপ্সিত বিষয়ের কোন প্রকার সুযোগ না দেখিয়া ঐ বৎসরের শেষে তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলেন।

৫ Warsaw.

৬ রুবেল = প্রায় দেড় টাকা।

বাকুনিন্ প্রেগে উপস্থিত হইয়া ঐ নগরের যুবকবৃন্দকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবার জন্য অকালে বৃথা চেষ্টা দ্বারায় উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয় পুলিশ দ্বারায় পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তিনি ড্রেসডেন নগরে পলায়ন করেন; তথায় উপস্থিত হইয়া ১৮৪৯ সালের ভয়ানক গোলযোগে প্রধান উদ্যোগী হয়েন। বিদ্রোহীগণ ঐ নগর কিছু দিন অধিকার করে; কিন্তু প্রুশীয় এবং স্যাকসন শিক্ষিত সৈন্যগণ দ্বারা তিন দিবস অবরোধের পর বিদ্রোহীগণ ঐ নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যখন ঐ নগর রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, বাকুনিন্ ঐ নগরে অগ্নি প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন; ইহাতে বিদ্রোহীগণও তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইল। তিনি সেমনিটজ হইতে কিছু দূরে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১০ইমে তারিখে বন্দীকৃত হইলেন। এক বৎসর কাল কারারুদ্ধ থাকিবার পর স্যাক্সনীয় যোদ্ধৃ-বিচারালয়ে তাঁহার জীবনদণ্ড নির্দ্ধারিত হইল। ঐ দণ্ড কার্য্যে পরিণত হইবার অগ্রেই অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহাদিগের বন্দী বলিয়া প্রার্থনা করায় তিনি উক্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইলেন। তিনি প্রেগনগরের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করণাপরাধে অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিচারপতিগণ দ্বারা দ্বিতীয়বার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হন; কিন্তু সম্রাট নিকোলসের অনুরোধে রুশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারায় দণ্ডিত হইবার জন্য রুশে প্রেরিত হয়েন। সেণ্ট পিটার্সবর্গে সেণ্টপিটার এবং সেণ্টপল দুর্গের কারাগারে তিনি ১৮৫১ হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বন্দী রহিলেন।

সম্রাট আলেকজাণ্ডারের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বাকুনিন, জীবনদণ্ডের পরিবর্ত্তে সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব অরণ্য প্রদেশে সমস্ত জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। ঐ প্রদেশের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট মুরেভিয়ফ তাহার নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি হওয়ায়, তিনি তথায় কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারিতেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোন একটী আমেরিকীয় বাণিজ্য পোতে য়োকোহামাতে পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ হইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন। লণ্ডননগরনিবাসী তাঁহার পূর্ব্বতন বন্ধু রাজনীতিবিশারদ এলেকজাণ্ডার হার্জেন এবং ওগারেব দ্বারা তিনি তথায় সাদরে গৃহীত হইলেন। ঐ সময়ে হার্জেন লণ্ডননগরে কলোকল (৬)

৬ Kolokol (bell)

(ঘণ্টা) নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত পত্রে রুশ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিষয় লিখিত হইত। হার্জেন প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন সেই কারণ বশতঃ তাঁহার রাজনৈতিক মত বাকুনিন অপেক্ষা অনেকটা পরিমিত ছিল। কিন্তু বাকুনিন দ্বাদশ বর্ষ কারাগারের কষ্ট এবং নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করায় তাঁহার রাজনৈতিক মত অধিকতর সমূলোচ্ছেদক হইয়াছিল। হার্জেনের উপরোক্ত সংবাদ পত্র রুশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া রুশদেশে প্রচারিত হইত। ঐ সংবাদ পত্র যাহাতে রুশ রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সম্রাটের এই বিশেষ আজ্ঞা থাকা সত্বেও উহা প্রায় অধিকাংশ রুশীয় দ্বারায় পঠিত হইত। কিন্তু বাকুনিন লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পত্রের সহকারিসম্পাদক হওয়া প্রযুক্ত অনেক কুফল প্রসূত হইয়াছিল। তাঁহার আসিবার অগ্রে ঐ পত্রে অধিকাংশই পরিমিত মত প্রকাশিত হইত, কিন্তু তিনি ঐ সকল মত পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক খণ্ডেই বিশ্বজনীন অরাজকতাপোষক মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ ঐ পত্রের পূর্ব্বতন ক্ষমতা ও সম্ভ্রম শীঘ্র নষ্ট হইল। হার্জেন এবং বাকুনিন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোলীয় বিদ্রোহীদিগের মধ্যে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইহার পরেই ইহাঁরা জেনিবা নগরে স্থানান্তরিত হয়েন। তথায় কলোকল নামক সংবাদ পত্রের অকালমৃত্যু হয়। সুইজারলণ্ডে অবস্থিতির কিছুদিন পরেই বাকুনিন তাঁহার বন্ধু হার্জেনের সহিত পৃথক হইয়া বিবিধ য়ুরোপীয় বিপ্লবের উৎপাদনে বিশেষ রূপে লিপ্ত থাকেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হার্জেনের মৃত্যু হয়। বাকুনিন য়ুরোপীয় অনেকগুলি সভায় অগ্রণী হয়েন, কিন্তু ঐ সকল সভার কার্য্য তাঁহার নিজ মতে চালিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হওয়াতে তিনি ঐ সকল সভা হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। এই কারণ বশতঃ তিনি রুশীয় নিহিলিষ্ট দলে মিলিত হয়েন, কিছু দিবস মধ্যেই তিনি ঐ সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদিসম্মত নায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

১৮৭০ খীষ্টাব্দে ফ্রান্স সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অব্যবহিত পরেই বাকুনিন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করেন, তাহাতে তিনি য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশকে সামাজিক বিপ্লব সাধনে সাহায্য করিতে ফ্রান্সকে পরামর্শ দেন; এবং সম্রাটনিযুক্ত ফ্রান্সদেশীয় কর্ম্মচারীগণকে কর্ম্মচ্যুত, সমস্ত ভূম্যধিকারী, মূলধনাধিকারী, যাজক প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ এবং রাজকীয় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সম্পত্তি সাধারণকে বণ্টন করিয়া দিবার পরামর্শ দেন। উপসংহারে বোনাপার্টীয়দিগকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এউ পুস্তক প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই, লিয়োঁ নগরে কমিউন মত ঘোষিত (৭) হইয়াছে শুনি-

৭ কমিউনিষ্টদিগের মতে, মনুষ্য মাত্রেই সম্পত্তির সমান অধিকারী। সুতরাং উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকেই উহার সমান বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। সকলেই ক্ষমতা অনুসারে পরিশ্রম করিবে। এবং শেষে যে আয় হইবে তাহা সকলের মধ্যে সমভাগে বণ্টন হইবে।

য়াই বাকুনিন তথায় ত্বরায় উপস্থিত হইলেন। তিনি উক্ত নগরে ব্লুসেরে রিচার্ড প্রভৃতি কমিউনিষ্টদিগের দ্বারায় বিশেষ সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে হোটেল ডি বিই আক্রমনে বিশেষ রূপ সাহায্য করেন।

চব্বিশ ঘণ্টা পরেই বিপ্লবকারীগণ তথাকার জাতীয় রক্ষক সৈন্যগণ দ্বারায় আক্রান্ত এবং পরাভূত হইয়া হোটেল ডি বিই পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। বাকুনিন বাষ্পীয় শকটারোহণে জেনিভা নগরে পলায়ন করেন এবং রুশীয় বিপ্লব কার্য্য সংসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ বারণ জিউরিচ এবং জেনিবা এই কয়েকটী নগরে অতিবাহিত করেন। তিনি কিয়ৎ দিবস পরে এম ড্রোগোমনৌকে নিহিলিষ্ট দলের অধ্যক্ষ রাখিয়া মানব লীলা সংবরণ করিলেন।

শ্রী অঘোরনাথ দত্ত।

গান।

বুঝিয়াও বোঝে না যে জন,
কেমনে বুঝাব তারে বল!

(২)

নয়নে লেগেছে ঘুম-ঘোর,
তোমারি স্বপনে সদা ভোর,
তোমারি স্বপনে গাই গান,
তোমারি স্বপনে পাই প্রাণ,
ও মুখে দেখিতে হাসি, কতদূর হ'তে আসি,
একবার করিতে চুম্বন,
আদরে করিতে আলিঙ্গন,

(১)

এমনত দেখিনি কোথাও,
কথায় কথায় অভিমান,
মুখানি আঁধার হ'য়ে আসে,
ছল ছল করে দুনয়ান!
মন যোগাবার কথা কহিতে পাই যে ব্যথা,
পেরেত উঠিনে আমি আর,
ভালবাসি এই শুধু জানি
ভালবাসে হৃদয় আমার।
বুঝিলে না বুঝিলে না,সখি ওগো বুঝিলে না,
আমার যে হৃদয় পাগল,

তোমার ও মুখ ধ'রে রাখিলে হৃদয় পরে,
উন্মাদ উচ্ছাসে মেতে উঠে,
বড়ই আকুল হয় প্রাণ
আর যেন সেই আমি নাই,
একেবারে হারাই জ্ঞেয়ান।

(৩)

বুঝিলে না বুঝিলে না,সখি ওগো বুঝিলে না,
আমার যে হৃদয় পাগল,
বুঝিয়াও বোঝে না যে জন,
কেমনে বুঝাব তারে বল!

তবে কেন যখন তখন
কথায় কথায় অভিমান!
মুখানি আঁধার হ'য়ে আসে,
ছল ছল করে দুনয়ান!
মন যোগাবার কথা কহিতে পাই যে ব্যথা,
পেরেত উঠিনে আমি আর,
ভালবাসি এই শুধু জানি,
ভালবাসে হৃদয় আমার।

শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞতা।

সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনেক বাধা আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে, বোধ করি, একটি গুরুতর বাধা আছে। যখন বড় বড় বিজ্ঞগণ ঠোঁট টিপিয়া, চোখে চষমা আঁটিয়া শিশু অনুষ্ঠানটিকে ঘিরিয়া বসেন, সোজা সোজা কাজের মধ্য হইতে বাঁকা বাঁকা উদ্দেশ্য বাহির করিতে থাকেন, ও পরস্পর চোক-টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "ওহে, বুঝেছ এসমস্ত কেন?" তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়, উদ্যমের হাত পা শিথিল হইয়া পড়ে। এই সকল তীক্ষ্ণনাসিকা, ক্ষুরোজ্জলচক্ষু, ধারাল' পেঁচাল বুদ্ধিগণ তিল হইতে তাল, সামান্য হইতে অসামান্য, সৎ হইতে অসৎ আবিষ্কার করিয়া সদনুষ্ঠানের প্রাণে বাঁকা কটাক্ষপাত করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল তাহার বুক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। সর্প জাতি, বোধ করি, বড় বুদ্ধিমান হইবে, নহিলে তাহারা বাঁকিয়া চলে কেন? হে বিজ্ঞগণ, তোমরাও খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু একটা বিষয় তোমাদের জানা নাই, পৃথিবীতে সিধা জিনিষও অনেক আছে; তোমাদের প্রাণের বাঁকা আর্শিতে যে একটা বাঁকা ছায়া দেখিতেছ, জগতের চেহারাখানা নিতান্তই অমনতর নয়। হায় হায়! জন্মেজয় যখন সর্পসত্র করিয়াছিলেন তখন

কি গোটাকতক ঢোঁড়া সাপই মরিয়াছিল, তোমাদের মত বিষাক্ত বুদ্ধিমান সাপগুলা ছিল কোথায়?

তুমি সৎকার্য্য করিতেছ বলিয়া বিজ্ঞ লোকেরাও যে তাহাকে সৎ মনে করিবে, এ কি করিয়া আশা করা যায়? তাহা হইলে বিধাতা তাহাদিগকে বিজ্ঞ করিয়াই গড়িলেন কেন? বসন্ত আসিয়াছে বলিয়া কি কাক মিঠা ডাকিবে? তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে কাক করিলেন কেন? সে যে বুদ্ধিমান পক্ষী! যখন কোকিল ডাকিতে থাকে, ফুল ফুটিয়া উঠে, বাতাস প্রাণ খুলিয়া দেয়, তখন সে শাখায় বসিয়া বুদ্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু মিটমিট করিতে থাকে, অবিশ্বাসের সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখে ও বেসুরে ডাকিয়া উঠে কা। বসন্তের সহিত তাহার সুর মেলে না বলিয়া সে কি চুপ করিয়া থাকিবে? সে যে বুদ্ধিমান জীব! সে বলে, বসন্তের সুর বেসুরা বলিতেছে! যখন কোকিল ডাকে, অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে, কা,—যখন ফুল ফুটে অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে কা—অর্থাৎ কিছুতেই সে সায় দিতে পারে না, সে বলে যে, আগাগোড়া সুর মিলিতেছে না! শুনা গেছে, মনুষ্যলোকে এমন অঙ্গহীন দেখা যায়, যাহার একটা কান নাই, এমন কি, দুইটা কানই খরচ হইয়া গেছে; হে কাক, স্বভাবতই—জন্মাবধিই তোমার কানের অভাব—অতএব কে তোমার কান ধরিয়া শিখাইবে যে, তোমার গলাটাই বেসুরা! জগতের কপাল দোষে বসন্তের সমালোচক কাক! বসন্তের কবি যাহারা—যেমন কোকিল, ফুল, দক্ষিণা বাতাস—তাহাদের সমালোচনার অবসর নাই, তাহারা রচনাতেই মত্ত; সেই অবসর পাইয়া কাক তফাতে উচ্চ শাখায় বসিয়া সমালোচনা করিয়া গলা বাহির করিতেছে—নহিলে জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে কিসে? কিন্তু তবুও ফুল ফোটে কেন, তবুও কোকিল ডাকে কেন? বসন্তের প্রাণের মধ্যে বসিয়া কে এমন একটা তানপুরা বাজাইতেছে, যাহাতে এত বেসুরের মধ্যেও সে অমন সুর ঠিক রাখিতেছে! কিন্তু সুর কি ঠিক থাকে? সাধ কি যায় না গান বন্ধ করি? ক জনের প্রাণ এমন আছে, যাহারা বেতালা বেসুরা সঙ্গতের সহিত—অর্থাৎ অসঙ্গত সঙ্গতের সহিত গান গাহিয়া উঠিতে পারে? কোকিলও তাহা পারে না;—যখন বর্ষার সময় ভেকগুলা অসম্ভব ফুলিয়া উঠিয়া জগৎসংসারে ভাঙ্গা গলায় নিজের মত জারি করিতে থাকে—তখন কোকিলেরও বুঝি তাহা অসহ্য হয়, তাই সে চুপ করিয়া যায়। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম—হে ভেকগণ, তোমাদেরই জয়! তোমরা আরো ফুলিতে থাক—আরো লম্ফ দাও—আরো মক্ মক্ কর! তোমরা কর্কশ কণ্ঠ লইয়া জগতের গান বন্ধ করিতে পারিয়াছ, অতএব তোমরাই জিতিলে!

হে বিধাতা, জগতে কাক সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া তোমার দোষ দিই না। কাকের অনেক কাজ আছে। কিন্তু তা-

হাকে যে কাজ দিয়াছ, সেই কাজেই সে লিপ্ত থাকে না কেন? আর কেহ যাহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিবে, সেই মৃত গলিত জীবকে যখন কাক চঞ্চু দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া ভক্ষণ করে ও পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, তখন তাহা তাহাকে শোভা পায়, কিন্তু বসন্তের সময় সে কেন কা-কা করিতে আসে? সৌন্দর্য্যপূর্ণ বসন্তের প্রাণের মধ্যে সে কেন তাহার কঠোর কণ্ঠের চঞ্চু বিঁধিতে থাকে? ইহাদের চেয়ে যে শকুনী ভাল। হে ধারাল' বুদ্ধিমান গণ, চণ্ডালের মত তোমরা মৃতদেহ দগ্ধ কর, তাহাতে শুভ ফল আছে, কারণ সে কাজ তোমরা ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া সৌন্দর্য্যকে, জীবনকে জ্বালাইয়া মারো কেন?

কেন? তাহার কারণ, বড় বড় বুদ্ধিমান লোকের সৌন্দর্য্যের উপর বড় একটা বিশ্বাস নাই, সৎ-উদ্দেশ্যের প্রতি অকাট্য সংশয় বিদ্যমান। এই জন্য সৎ-কার্য্যের নাম শুনিলেই ইহাঁদের সংশয়-কুঞ্চিত অধরৌষ্ঠের চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ মড়কের মত একটা বিষাক্ত হাসি ফুটিয়া ওঠে। অতি-বুদ্ধিমান জীবের সম্মুখের দাঁতের পাটিতে যে একটা দারুণ হাস্য-বিষ আছে—হে জগদীশ্বর, সেই বিষ হইতে পৃথিবীর সমুদয় সৎকার্য্যকে রক্ষা কর। ইহাঁরা যখন পরস্পর টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "এই লোকটার মতলব বুঝিয়াছ? কেবল আমাদের খোষামোদ করা" বা 'অমুকের নিন্দা করা" বা "সাধারণের কাছে নাম পাইবার প্রয়াস"—তখন সৎলোকের জীবনের মূলে গিয়া কুঠারাঘাত পড়ে তাহার সমস্ত জীবনের আশা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়।

সকল কাজ, সকল বিষয় হইতেই একটা গূঢ় মৎলব বাহির করিবার চেষ্টা অনেক কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কেহ কেহ এমন আত্মাভিমানী আছে যে, নিজেকেই সমস্ত কথা, সমস্ত কাজের লক্ষ্য মনে করে। সমস্ত জগৎ যেন তাহার দিকেই আঙুল বাড়াইয়া আছে। সে যে কথা শুনে, আত্মন্তরিতার ব্যাকরণ ও অভিধানের সহিত মিলাইয়া তাহার একটা গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকে। সে যে কাজ দেখে আত্মাভিমানের চাবি দিয়া সেই কাজের গূঢ় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া তাহার মধ্যে নিজের প্রতিমা দেখিতে পায়। সে মনে করে বিশ্বচরাচর খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার অনিষ্ট বা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই দিন রাত্রি একটা পরামর্শ করিতেছে! সে পথপার্শ্বস্থিত সাপের মত সর্ব্বদাই মনে করে, পান্থগণ তাহারই লেজ মাড়াইবার জন্য পাকচক্র করিতেছে, এই জন্য সে ভীত হইয়া আগে হইতেই ছোবল মারে! এই সকল কীটগণ মনে করে ফুলেরা যে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে সে কেবল ইহাদের দংশন-সুখ অনুভব করিবার জন্যই! এই সকল পেচকেরা মনে করে যে, সূর্য্য যে কিরণ দান করেন, সে কেবল পেঁচার সহিত তাঁহার শত্রুতা আছে বলিয়াই।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা

চিরকাল মৎলব খাটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না, পৃথিবীতে কাহারো উদারতা আছে। সিধা কথা, সামান্য কাজের মধ্য হইতে একটা ঘোরতর গূঢ় মৎলব বাহির করিতে ইঁহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত আমোদ পায়। একটা দুরন্ত অস্থির ছুঁচাল বক্রবুদ্ধি ইঁহাদের মনের মধ্যে দিন-রাত ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাকেত একটা কাজ দিতে হইবে—সিধা কাজে সে খেলাইতে পায় না—এই নিমিত্ত সিধার মধ্যে সে একটা বাঁকা রাস্তা গড়িয়া লয়। খেলাইবার জায়গা ভাল! একজন লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র আশা, যাহার কাছে সে তাহার দুর্দ্দান্ত স্বার্থপরতাকে বলিদান দিয়াছে, মান অপমানকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে তাহাই লইয়া খেলা! এক জন লোক যখন পরের দুঃখ দেখিয়া, দারিদ্র্য দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সেই অশ্রুবিন্দু লইয়া সমালোচনা! এক জন সহৃদয় লোক যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রাণের কথা বলিতেছে, তখন তাহার সেই কথা গুলিকে বাঁকা ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদের আকৃতি সম্পূর্ণ বদলকরিয়া দেওয়া। এ সকল কেমনতর হৃদয় হীন খেলা! ইহাতে যে তোমার নিজের হৃদয়ের সর্ব্বনাশ করা হয়। ফুল মৎলব করিয়া সুন্দর হইয়াছে, পাখী মৎলব করিয়া সুন্দর গাহিতেছে,—সর্ব্বদা পাহারা দিতে থাক, পাছে মৎলব ধরা না পড়ে—পাছে যাহার মৎলব আছে তাহাকে সরল মনে করিয়া তুমি ঠকিয়া যাও, তুমি নির্ব্বোধ বনিয়া যাও। আমার বুদ্ধিমান হইয়া কাজ নাই, আমি চিরকাল ঠকিব, আমি চিরকাল নির্ব্বোধ হইয়া থাকিব! আমি সুন্দরকে উপভোগ করিতে চাই, আমি সৌন্দর্য্যকে বিশ্বাস করিতে চাই। আমি ঠকিতে চাই, কারণ এ স্থলে ঠকিলেও লাভ। আর, সব চেয়ে লোকসান হয় তোমারই! তোমার ঐ বুদ্ধির টেরা চোক দুটার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রকৃতিকে বাঁকা দেখিতেছ—সে কি তোমার বড় সুখের কারণ হইয়াছে? তাহার চেয়ে কি তোমার ঐ চোখ দুটা অন্ধ হইলেই ভাল ছিল না?

তোমাদের সুখ ত ভারি দেখিতেছি! তোমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া পরকে বিশ্বাস করিতে পার না। "যদি" "কিন্তু" "কদাচ" "কিঞ্চিৎ" প্রভৃতি কথাগুলা ব্যবহার করিয়া কৃপণের দড়ি-বাঁধা টাকার থলির মুখের মত তোমাদের ভাষাকে কুঞ্চিত সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছ। ইহাকেই তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ মনে কর। ভাল লোককে "হম্বাগ্" মনে করা, ভদ্রতাকে হীনতা মনে করা, যে তোমাদের নিজের মতাবলম্বী নয় তাহাকে অশিক্ষিত অপদার্থ মনে করা, যশস্বী লোকের যশকে ফাঁকি মনে করা, তোমাদের অপেক্ষা শত গুণে বিদ্বান লোকের বিদ্যার গভীরতা নাই বলিয়া লোকের কাছে প্রচার করা, কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া মত

ব্যক্ত করা, নিজেকে ভারি এক জন মস্ত লোক মনে করা, এই সকলকে তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ বলিয়া জান। তোমরা সিংহাসনস্থ বড় বড় রাজা মহারাজার চেয়ে নিজেকে উচুঁ মনে করিতেছ—তাহার কারণ, তোমাদের আত্মম্ভরিতা নামক লাঙ্গুলের প্রসরটা অত্যন্ত অধিক—নিজ-রচিত কুণ্ডলিত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দূরবীক্ষণের উল্টা দিক দিয়া জগৎ সংসারকে দেখিতেছ। তোমাদের শরীরের আয়তন অধিক নহে, কিন্তু লেজ হইতে মাপিলে অনেকটা হয়। বিজ্ঞতার হৃদয় যদি এতটা প্রশস্ত হয় যে পরকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলে তাহার বক্ষে স্থান কুলায়, কুঞ্চিত-চর্ম্ম সংশয়ের নাম যদি বিজ্ঞতা না হয়, তবে সেই বিজ্ঞতা উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিব। তোমাদের বিজ্ঞতায় যে সূর্য্যের আলো নাই, বসন্ত-কাননের শ্যামল বর্ণ নাই। তোমাদের বিজ্ঞতা সমুদয় জগৎকে অবিশ্বাস করিয়া অবশেষে একটি দুই হাত পরিমাণ ডোবার মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করিয়াছে ও আপনাকে সমুদ্রের চেয়ে গভীর মনে করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের হাসিকে চপলতা জ্ঞান করিতেছে, অনবরত পচিয়া উঠিতেছে, ও মুখটা আঁধার করিয়া বিজ্ঞতার চেহারা বাহির করিতেছে! তোমাদের বিজ্ঞতার প্রাণটা একরত্তি, তাহাকে ছুঁইলেই কচ্ছপের মাথার মত সে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; তোমাদের বিজ্ঞতার হাসিতে কৃপণতা, তাহার ভাষায় দুর্ভিক্ষ, তাহার আলিঙ্গন কাঁকড়ার আলিঙ্গনের মত, সে জিনিষ কিনিয়া কাণাকড়ি দিয়া তাহার দাম শোধ করে! এ বিজ্ঞতা লইয়া তোমরাই গর্ব্ব কর!

যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে সে মহৎ; যে মশক হস্তীকে বিব্রত করিয়া তোলে সে মশক হস্তীর চেয়ে বড় নহে—যে পাঁকে সৎপথগামী সাধুর পা বসিয়া গেছে, সে পাঁকের জাঁক করিবার বিষয় কিছুই নাই। সংশয় করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সৎকার্য্যকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক তরুণ হৃদয়ের নবীন আশাকে তাঁহাদের হাস্যের বিদ্যুতাঘাতে চিরকালের জন্য দগ্ধ করিয়াছেন, অনেক উন্মুখ প্রতিভাকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করিয়া হয়ত পৃথিবীর এক একটা শতাব্দীকে অনুর্ব্বর মরুময় করিয়া দিয়াছেন—ইঁহারা যদি এই সকল দলিত অঙ্কুর, দগ্ধ আশা, ভগ্ন হৃদয় স্তূপাকৃতি করিয়া নিজের কীর্ত্তি-স্তম্ভ রচনা করেন তবে কি কোন পিরামিড্ আয়তনে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে? রোগ দুর্ভিক্ষের সহোদর বিজ্ঞতা শ্মশানের ভস্ম দিয়া একটা উৎসবাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেখানে অস্থিকঙ্কালের নৃত্য হইতেছে, হৃদয় শোণিতের পান চলিতেছে, খরধার রসনা-খড়্গে আশা উদ্যমের বলি হইতেছে; আইস, যাহাদের হৃদয় আছে, আমরা প্রকৃতি মাতার উৎসবালয়ে যাই; সেখানে জীবনের অভিনয় হইতেছে, সেখানে সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইতেছে, সেখানে মাপাজোকা কার্পণ্য নাই, সেখানে বাঁকা-চোরা অনুদারতা নাই—সেখানে দুই-মুখা প্রাণ নাই। এ সকল বিজ্ঞলোকদের সহিত আমাদের পোষাইবে না—আমরা ইহাদের চিনিতে পারিব না, ইহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারিব না—ইহারা উপদেশ দিবার সময় বড় বড় নীতিকথা বলে, কিন্তু ইহাদের মনে পাপ আছে, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে সংক্রামক রোগ!

অশ্রু জল।

কেন অশ্রুজল—
স্বরগ-সৌন্দর্য্য তোর মুখে,
হৃদয়েতে দারুণ গরল।
পাছে মৃদু নিশ্বাসের বায়ে,
পাছে কোন উপহাস ঘায়ে,
অশ্রু, তোর বহে অশ্রুজল,
ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে
হৃদে রাখি লুকায়ে যতনে,
তারি কিরে দিস্ প্রতিফল?
কেন অশ্রুজল,
ফুল হতে হয়ে সুকোমল,
ধরিস্ বজ্রের হিয়া বল্।
কত যেরে ভালবেসে তোরে
কত যে প্রাণের মত ক'রে
হৃদয়ের রক্ত পিয়াইয়া
সোহাগে রাখিতে চাই সদা
হৃদি মাঝে ঘুম পাড়াইয়া;
কেবলি শোণিত পান কোরে
সাধ কেন মেটেনারে তোর?
দেখিবারে হৃদয় শোণিত
কেন এত আমোদেতে ভোর?
হৃদিরক্তে সবল হইয়া,
মনোসাধে হৃদি দণ্ডশিয়া,
রক্ত-নদী বহাইয়া বুকে,
দেখিস্ বড়ই মনোসুখে;
কুটিল এমন কেন সেরে
মুখ যার এমন বিমল?
জুড়াইতে হৃদয় বেদনা
জুড়াইতে হৃদয় যাতনা
হৃদয়ের সখা মনে করি
হৃদে তোরে যত চেপে ধরি,
ততই যে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া
ফেলিস্‌রে মরমের তল।
কেন অশ্রুজল
সুকোমল দেহ খানি লয়ে
দারুণ নিঠুর কেন বল্।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন।

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ও বঙ্গহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই বোধ হয় শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন" নামক বঙ্গসাহিত্যবিজ্ঞানদর্শনসঙ্গীতপ্রভৃতিবিষয়িণী একটি সমালোচনী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার অনুষ্ঠান-পত্র ও নিয়মাবলী হইতে কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—ইহা হইতে সঙ্কল্পিত সভার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

"বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেক শুভ ফল আছে:—

১। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখা-শুনা হয় ও সৌহার্দ্দ্য জন্মে।

২। পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান-প্রদান হওয়ায় একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

৩। এই বিদ্বজ্জন সম্মিলনের উপলক্ষে আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি কল্পে বহুবিধ শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনাদির অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথা সৃষ্টির আবশ্যক হয়, তাহা আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে, ও তৎসঙ্গেসঙ্গে বঙ্গভাষায় এক সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অভিধান সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দ সমূহ বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয় তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।

(গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(২) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদ পত্র বা প্রবন্ধ পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(৩) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গলা গ্রন্থ

সমালোচিত হইবে অথবা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৯) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা সমক্ষে উপস্থিত করিলে সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(১২) যে অধিবেশনে সমালোচনা পাঠ হইবে—লিখিত সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থ সঙ্গে করিয়া লইয়া সভাপতি তাহার পরের অধিবেশনে সংক্ষেপে তাঁহার মত লিখিয়া আনিয়া পাঠ করিবেন।

(১৩) সভার অন্যান্য কার্য্য-বিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনের সংক্ষিপ্তসার ও তর্ক বিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায় সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-পত্রে প্রকাশিত হইবে। সভায় যে কোন মত ব্যক্ত হইবে তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে অথবা কার্য্য শেষ হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট বিষয়সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদির কাজ না থাকিলে সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।"

এতদ্ব্যতীত সভার গঠন সম্বন্ধে অনেকগুলি আনুসঙ্গিক নিয়ম আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিবার আবশ্যক বোধ হইতেছে না—উল্লিখিত অনুষ্ঠান পত্রের উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া দেখা যায় সভার মুখ্য উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম, বঙ্গ ভাষার অভাব মোচন। দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ বর্দ্ধন। তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন।

যাঁহারা কিছুমাত্রও বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, বঙ্গভাষা এখনও এতদূর পরিপুষ্ট হয় নাই যে আমাদের সকল ভাব ঐ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষায় ভাবপ্রকাশ করিতে গিয়া আমরা যে পদেপদে অভাব অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কে অস্বীকার করিবেন? পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত দিন দিন আমাদের যতই পরিচয় বাড়িতেছে, ততই আমরা আমাদের ভাষার দারিদ্র্য অনুভব করিতেছি। নূতন সাহিত্য, নূতন বিজ্ঞান, নূতন রাজশাসন আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় নূতন ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দিন দিন নূতন কথা সৃষ্টির আবশ্যক হইতেছে। এবং এই সৃষ্টি কার্য্য অনেক দিন হইতে আমাদের ভাষায় আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই ইচ্ছামত নূতন কথা সৃষ্টি করিতেছেন কিন্তু কোন্ কথাটি ঠিক্ তাহার মীমাংসা কে করে? তাহার দৃষ্টান্ত—Self-Goverment-এর অনুবাদে কেহ লিখি-

তেছেন "আত্ম-শাসন" কেহ লিখিতেছেন "স্বায়ত্ত শাসন।" (আমাদের মতে "স্বায়ত্ত-শাসন" এই কথায় ঠিক্ ভাবটি প্রকাশ হয়। কেন না, "আত্ম শাসন" অর্থে Self-discipline হইতেও পারে।) যাহা হউক, সারস্বত সভার ন্যায় কোন সভা থাকিলে এই সকল বিরোধী মতের একটা মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের কথার ভাণ্ডার নিতান্ত অপ্রতুল। প্রতি সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের নিমিত্ত আমাদের ভাষায় তদনুরূপ পৃথক্ কথা নাই—অনেক সময়ে এক কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতে হয়—যথাঃ—"মত" এই কথাটি আমরা "Opinion" ও "Theory" উভয় অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি—"Personal" ও "Individual" এই দুই পৃথক্ ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, আমাদের দুইটি স্বতন্ত্র কথা নাই। "ব্যক্তিগত" এই এক কথাতেই আমরা উভয় ভাব প্রকাশ করি। আমাদের "ভাব" কথাটিতে Feeling, Sentiment, Thought সকলই বুঝায়। এই রূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাব প্রকাশের অভাব পূরণ করিবার জন্য শুদ্ধ যে নূতন কথা সৃষ্টি করিবার আবশ্যক এরূপ নহে—ভাবের তারতম্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য, ও ভাষার অস্পষ্টতা নিবারণের জন্য, কতকগুলি নূতন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও অক্ষর আমাদের ভাষায় সৃষ্টি করা এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যথা, কোন বাক্যের প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে কিম্বা কোন কথায় বিশেষ ঝোঁক দিতে হইলে, ইংরাজি ভাষা-ব্যবহৃত ইটালিক্‌সের ন্যায় কোন প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করা এবং দেশ নগর প্রভৃতির আদ্যক্ষর বড় করিয়া লেখা যেরূপ ইংরাজিতে নিয়ম আছে, সেইরূপ কোন প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ হয়। ইংরাজি অক্ষর v ও z বাঙ্গলায় প্রকাশ করা যায় না, এই জন্য অনেক সময়ে অসুবিধা হয়। অনেকে ইংরাজি v অক্ষরের স্থলে অন্ত্যস্থ ব ব্যবহার না করিয়া অন্যায় রূপে ভ ব্যবহার করেন। কিন্তু বর্গীয় বয়ের সহিত প্রভেদ রাখিবার জন্য এই অন্ত্যস্থ 'ব'য়ে কোন প্রকার প্রভেদসূচক চিহ্ন দেওয়াও কর্ত্তব্য।

ব্যাকরণ-ঘটিত কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে, তাহারও মীমাংসা করা উচিত। যথা, কেহ লেখেন "তাহারদিগের" কেহ বা লেখেন "তাহাদিগের" কেহ বা প্রতি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বিশেষ্যের পূর্ব্বে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বিশেষণ ব্যবহার করেন, কেহ বা পুংলিঙ্গ বাচক বিশেষণ ব্যবহার করেন। এইরূপ নানা প্রকার বিভিন্ন প্রয়োগ প্রচলিত আছে। এক্ষণে এই সকল বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি সুরুচিসঙ্গত ও আমাদের ভাষা-প্রকৃতির ঠিক্ অনুযায়ী তাহা স্থির করা আবশ্যক।

ভাষার এই সকল অভাব মোচন করা সঙ্কল্পিত সারস্বতসম্মিলনের একটি প্রধান কার্য্য। কেহ বলিতে পারেন—এই সকল অভাব কালক্রমে আপনাআপনিই মোচন হইবে, ইহার জন্য সভার আব-

শ্যকতা কি?—তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সকল বিষয়েই যে কারণে সভার আবশ্যকতা, ভাষার উন্নতি সাধন পক্ষেও সেই একই কারণে সভার আবশ্যকতা আছে। যে কোন উদ্দেশ্যই হউক না কেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে যাঁহাদের একরূপ স্বার্থ,অনুরাগ ও যোগ্যতা আছে, তাঁহারা যদি একত্র হইয়া সেই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সেই উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় কোন ফল নাই—বরং আমাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা না হইলে সাধারণের সমবেত চেষ্টা হইতেই পারে না। সকল কার্য্যেই ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা যেমন আবশ্যক, সমবেত চেষ্টাও তেমনই আবশ্যক। উভয়ই উভয়ের পোষক ও পরিবর্দ্ধক।

এক্ষণে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধন পক্ষে ব্যক্তি বিশেষের উদ্যম চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষিত হইতেছে। এই জন্যই বলিতেছি, সমবেত উদ্যমেরও এক্ষণে সময় আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে হইবে. প্রস্তাবিত সভার শাসনে ব্যক্তিগত উদ্যমের লাঘব হইতে পারে কি না। সে বিষয়েও আমাদের আশঙ্কা নাই—কারণ, যাহাতে ব্যক্তি বিশেষের মুখ বন্ধ না হয়, বরং যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের আরও স্ফূর্ত্তি হয় তদ্বিষয়ে প্রস্তাবিত সভার বিশেষ লক্ষ্য আছে। সভা এরূপ বলিতেছেন না, যে সভা হইতে যে মত প্রকাশ হইবে তাহা অকাট্য অভ্রান্ত, নতশির হইয়া জনসাধারণকে সেই মতের অনুবর্ত্তী হইতেই হইবে। বরং সভার (১৩) সংখ্যক নিয়ম পাঠ করিয়া এইরূপ প্রতীতি হয় যে, কোন সভ্যের কিম্বা সভাপতির মত সভার মত বলিয়া গৃহীত হইবে না। কোন আলোচ্য বিষয়ে সভ্যগণের ও সভাপতির ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র মতগুলিই কেবল সাধারণের অবগতির জন্য কোন বিশেষ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে। সেই সকল যোগ্য ব্যক্তিগণের মতামত পাঠ করিয়া জনসাধারণ একটা নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। ফল কথা, জনসাধারণের উপরেই শেষ বিচারের ভার। কোন এক আলোচ্য বিষয়ের সকল দিক্ গুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দেওয়া মাত্রই সভার কার্য্য, সভার খ্যাতি প্রতিপত্তির গুরু ভারে জন সাধারণের বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া ফেলা তাহার উদ্দেশ্য নহে।

কেহ কেহ বলেন,সমালোচনায় কি ফল? সমালোচনার দ্বারা সাহিত্যের কোন উপকার হয় না। আমরা তাহার উত্তরে ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি,যে এই ঊনবিংশ শতাব্দী যে উন্নতি শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহা কেবল সমালোচনার প্রভাবে। লুথরের আবির্ভাব হইতে আধুনিক য়ুরোপে প্রকৃত সমালোচনার যুগ আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে খৃষ্টীয়-

ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর কাহারও কথা কহিবার অধিকার ছিল না—পূর্ব্বতন ধর্ম্মাচার্য্যদিগের কথা অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া সাধারণ লোকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিত কিন্তু লূথর সাহস পূর্ব্বক তাঁহাদের মতামত সমালোচনা করিয়া য়ুরোপে স্বাধীন জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিলেন। সেই অবধি কি ধর্ম্ম,কি রাজনীতি, কি সাহিত্য বিজ্ঞান সকল বিষয়েই সাধারণ লোকে নিজ স্বাধীন বুদ্ধি চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্যক্তি বিশেষের নাম-মাহাত্ম্যের প্রভাব এবং অপরিবর্ত্তনীয় প্রথার শাসন উঠিয়া গিয়া সেই স্থানে স্বাধীন বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বেকন্, ডেকার্ট, গ্যালিলিয়ো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান রাজ্যে স্বাধীনতা স্থাপন করিলেন ; রুসো, বল্টেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি সমালোচনা করিয়া ফরাসিস বিপ্লবের সূত্রপাত করিলেন এবং সেই ফরাসিস বিপ্লবে য়ুরোপের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হইল। ইহা কি সমস্তই সমালোচনার ফল নহে? যদি মনুষ্যের সকল কাজেই সমালোচনার শুভ ফল লক্ষিত হয়, তাহা হইলে একমাত্র সাহিত্যই কি তাহার ব্যতিক্রমস্থল হইবে। সমালোচনার প্রভাব নাকি অতি গূঢ়রূপে, নিস্তব্ধ ভাবে, ভিতরে ভিতরে কাজ করে, সেই জন্য অমন করিয়া স্পষ্টরূপে সকল সময়ে দেখান যায় না যে অমুক গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে ; তাই বলিয়া যে তাহার প্রভাব জনসমাজে পৌঁছে না এরূপ বলা যাইতে পারে না। শিলর, শ্লেগেল, গতে প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ যদি সেক্সপিয়রের সমালোচনা না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইংরাজদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে সেক্সপিয়রের মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিত।

সমালোচনার আবশ্যকতা নানা কারণে দিন দিন বাড়িতেছে। ঘটনাক্রমে য়ুরোপের সমস্ত সাহিত্যভাণ্ডার আমাদের নিকট এক্ষণে উন্মুক্ত হইয়াছে। সে সাহিত্যের আদি নাই, অন্ত নাই। যে সকল নূতন নূতন গ্রন্থ রোজ রোজ বাহির হইতেছে, তৎসমস্ত পাঠ করা এক জন লোকের পক্ষে অসাধ্য; কাজেই সমালোচকের শরণাপন্ন না হইলে এখন আর উপায় নাই—তিনি যে গ্রন্থকে ভাল বলেন তাহাই আমরা পাঠ করি, যাহাকে মন্দ বলেন তাহা আমরা পাঠ করি না—এইরূপে আমাদের অনেকটা সময় বাঁচিয়া যায়। এক্ষণে আবার য়ুরোপীয় সাহিত্যের সংসর্গ লাভ করিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্য নবোদ্যম ও নবজীবন লাভ করিয়াছে, আমাদের সাহিত্যক্ষেত্র হঠাৎ উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া আবার যদি বঙ্গীয় সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়, তাহা হইলে ৫০ বৎসরব্যাপী বাঙ্গালী-জীবন তাহাতে কুলায় না বোধ করি, সুতরাং বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রেও এক্ষণে সমালোচকের আবশ্যক হইয়াছে।

প্রস্তাবিত সভার একটি নিয়ম পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে কেবল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-

কারগণই যে এই সভার সভ্য হইতে পারেন এরূপ নহে, বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অধিকাংশের মতে সভ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। কেহ বলিতে পারেন, যাঁহারা নিজে কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া সুরুচি ও ক্ষমতার পরিচয় দেন নাই, তাঁহারা কি করিয়া সেই বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচক হইতে পারেন? কিন্তু তাহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার না হইলেও উৎকৃষ্ট সমালোচক হওয়া যাইতে পারে। আমি গায়ক না হইতেও পারি কিন্তু গানের সমজ্‌দার হইতে পারি। আমি কবি না হইতেও পারি কিন্তু আমি কবিত্বের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। বরং অনেক সময়ে গ্রন্থকার অপেক্ষা গ্রন্থসমালোচক কোন গ্রন্থের দোষগুণ শীঘ্র ধরিতে পাবেন। কারণ, গ্রন্থকার তাঁহার নিজের একঝোঁকা ভাবে এত দূর নীয়মান হন যে চারিদিক দেখিবার তাঁহার ক্ষমতা থাকে না, অবসরও থাকে না। দাবা-খেলার সময় যাহারা খেলায় যোগ না দিয়া কেবল নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করে, তাহারা যেরূপ অনেক সময়ে উপর-চাল দেখিতে পায়, খেলোয়াড়েরা সেরূপ পারে না, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু সমালোচনার কাজ বড় সহজ নহে। সমালোচকের কতখানি দায়িত্ব তাহা অনেক সময় সমালোচক বোঝেন না। সাধারণ লোকে অনেক সময়ে খ্যাতনাম সমালোচকদের কথার উপর নির্ভর করিয়াই কোন নূতন গ্রন্থের ভাল মন্দ স্থির করেন। অতএব এরূপ স্থলে, সমালোচক যদি দলাদলী কিম্বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কোন গ্রন্থের অযথা নিন্দাবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি সাহিত্য-সংসারের যে কতদূর অনিষ্ট করেন তাহা বলা যায় না। কতকগুলি সমালোচক গুণের প্রতি বড় মনোযোগ দিতে ভাল বাসেন না—তাঁহারা ছিদ্রানুসন্ধানেই বিশেষ আমোদ পান। তাঁহাদের সম্বন্ধে এই সংস্কৃত শ্লোকটি বেশ খাটে ;—"মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।" আমাদের বলিবার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, কোন গ্রন্থে দোষ থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিবে না—কেন না দোষগুণ উভয়ই না দেখাইয়া দিলে প্রকৃত সমালোচনাই হয় না—তবে, অধিকাংশ সমালোচনায় যে একটি নিন্দা করিবার দিকে অসাধারণ প্রবণতা ও ইচ্ছা প্রকাশ পায়, সেইটিই দূষণীয়। আমাদের কোন বন্ধুকে আমরা তাঁহার দোষগুণের কথা যেরূপ ভাবে বলি, সেইরূপ বন্ধুভাবে কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিলে সাহিত্যের যতখানি উপকার হয়, নির্দ্দয় কঠোর ভাবে সমালোচনা করিলে সেরূপ উপকার না হইয়া প্রত্যুত সমূহ অপকারই হয়। দোষ থাকিলে ভাল কথা বলিয়া দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা কর—তীব্র বিদ্রূপ ও কঠোর উপহাসের বাণ বর্ষণ করিয়া গ্রন্থকারের হৃদয়ে অনর্থক কষ্ট দেওয়া কেন? এইরূপ কঠোর সমালোচনাই আজ কালের ধরণ হইয়াছে। কঠোর সমালোচনার আবশ্যকতা যে একে-

বারে নাই, আমরা তাহা বলি না। যখন কোন গ্রন্থকার অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়া কিম্বা কোন প্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে প্রখর তীব্র লেখনী ধারণ করা অতীব কর্ত্তব্য। গ্রন্থকারের ক্ষমতার অভাবে গ্রন্থে যে সকল দোষ লক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকারের সূক্ষ্মশরীরে আঘাত দেওয়া নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সহৃদয় সমালোচকের এরূপ করা কখনই উচিত নহে। সাহিত্যের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, কঠোর সমালোচনায় কত গ্রন্থকারের মুকুলিত আশা উদ্যম মুকুলেই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ লেখনীর তীব্র বিষাক্ত আঘাতে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অনেকে বলেন Keats কবির যে অকাল-মৃত্যু হয়, তীব্র সমালোচনাই তাহার কারণ। কবিবর Tasso কঠোর সমালোচনায় ব্যথিত হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। Montesquieu কঠোর সমালোচনার আঘাতে শীঘ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হন। নিন্দুক সমালোচকদের হৃদয়-ভেদী সমালোচনায় কবিবর Shelley স্বদেশত্যাগী হয়েন। তাহার পর হইতে সমস্ত জীবন তিনি অসুখে কাল যাপন করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু Leigh Hunt-কে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ ও জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আর কিছুই লিখিতে পারি না। যাহা লেখা যায় তাহাতে নিশ্চয়ই অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইব এই রূপ প্রবল উত্তেজনা না থাকিলে কাহারও পক্ষে লেখা অসম্ভব।"

সমালোচনা যে কত দূর গুরুতর কার্য্য অনেক সময়ে সমালোচকেরা তাহা বোঝেন না—তাঁহারা মনে করেন, দুই এক কলম যা-তা একটা লিখিয়া দিলেই হইল। "প্রাঞ্জলতা" "ওজস্বিতা" "মধুরতা" "সরলতা" "চিন্তাশীলতা" "গবেষণা"—"স্থানে স্থানে ভাল"—"মন্দ নহে"—"ভবিষ্যতে ভাল হইতে পারে" "এরূপ গ্রন্থ যত বেরোয় ততই ভাল" ইত্যাদি কতক গুলি বাঁধিবোল তাঁহাদের একমাত্র পুঁজি। সমলোচনার হাঁড়ি চড়াইয়া দিয়া এইরূপ দুই চারিটি বাঁধি-বোলের ফোড়ন তাহাতে ছাড়িয়া দিয়া চট্‌পট্ করিয়া যে-সে লোক একটা অপূর্ব্ব অপক্ক খিচুড়ি তৈরি করিতে পারে। আজ কাল আমাদের প্রবন্ধপত্র ও সংবাদপত্রে গ্রন্থের সমালোচনা-কার্য্য যেরূপে সম্পাদিত হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই এই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। সমালোচনার্থ সম্পাদকের নিকট কোন গ্রন্থ আসিলে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে সমালোচনার ভার দেন—সে গ্রন্থ সমালোচনের যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না, সে বিষয়ে তিনি বড় দৃষ্টি করেন না। তাঁর বন্ধু গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পাঠ না করিয়াই হয়তো যা-তা একটা লিখিয়া দিলেন—তাহাতে তাঁহার নাম রহিল না। বাহিরের লোকে মনে

করিল সম্পাদকই তাহা লিখিয়াছেন। এই প্রণালী-অনুসারে অতি কদর্য্য লেখাও সম্পাদকের নাম-মাহাত্ম্যে বিকাইয়া যায়। এই রূপ বেনামী লেখার অনেক দোষ।

মৃত Lord Lytton বেনামি সমালোচনার দোষ গুণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন;—"কেবল দুই শ্রেণীর লোকের নিকট বেনামী সমালোচনা প্রার্থনীয় হইতে পারে; যে ব্যক্তি বন্ধুদিগের অন্যায় নিন্দা করিয়া ভয় করে পাছে বন্ধুরা তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে ত্যাগ করে এবং যে মিথ্যাবাদী পাজি ভয় করে পাছে তাহার নিন্দার পাত্র তাহাকে চাব্‌কাইয়া দেয়।" এই সমালোচনার অভাব পূরণ করা প্রস্তাবিত সভার অন্যতর উদ্দেশ্য। এই সভা হইতে কোন বেনামী সমালোচনা প্রকাশ হইবে না—সভাপতি সভ্যগণের ব্যক্তিগত মতামত নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে। অতএব বেনামী সমালোচনার দোষ সকল ইহাতে বর্ত্তিবে না।

সভার স্থায়িত্বের প্রতি এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে। আমাদের সাহিত্য-সংসারে অনেক গুলি দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই এক স্থানে সমবেত হইয়াছেন—এক্ষণে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলীর ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত এক হৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারস্বত সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল, নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে, সে কেবল বাঙ্গালীর আর একটি কলঙ্ক ধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যাত্রা।

The Yatras or the Popular Dramas of Bengal. By Nisikanta Chattopadhya.

London: Strubner & Co 1882 Price 2 Shillings.

শ্রদ্ধাস্পদ নিশিকান্ত বাবুর উক্ত পুস্তকখানি পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমাদের দেশের প্রাচীন বিষয় সকল যতই সমালোচিত হয় ততই ভাল।

যাত্রা যে শাক্যসিংহের সময়েও অভিনীত হইত সে বিষয়ে লেখক কতকগুলি আংশিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া লিখিতেছেন যে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার নিদেন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে কৃষ্ণযাত্রা ভারতবর্ষে অভিনীত

হইত ও তাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশেষ প্রীতিকর ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই।" নিশিকান্ত বাবুর সমস্ত গবেষণা এখন আমাদের আলোচ্য নহে—কিরূপে যে আদি কবিদের কাব্য লইয়া প্রথম অবস্থায় গীত ও কথকতা প্রচারিত হইত; কিরূপে সেই গান ও কথকতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যাত্রা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিনীত হইত; এবং কিরূপে সেই সকল যাত্রা হইতে নাটক রচনা ও অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহা আর আমরা সবিস্তারে আলোচনা করিব না। কেবল সে বিষয়ে নিশিকান্ত বাবুর চিন্তাশীলতা ও গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।*

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে প্রথমে মুনিঋষিদের দ্বারায় আশ্রমে আশ্রমে শ্রোতৃবর্গের নিকটে বেদ পুরাণ পাঠ হইত, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। ক্রমে সেই পুরাণ পাঠ আশ্রম অতিক্রম করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে তাহা সাধারণের উপযোগী সহজ ভাষাতে কথকতারূপে পরিণত হইল। এই প্রকারে সাধারণে যখন পুরাণের মর্ম্ম অবগত হইল, তখন তাহারা আবার ইতরসাধারণের জন্য সুরতানলয় দিয়া চলিত ভাষাতে রাসধারী নামে এক প্রকার যাত্রার অভিনয় করিতে লাগিল। বঙ্গদেশেও তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। বঙ্গদেশের আদি বঙ্গীয় কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতগুলি তাঁহাদের সময়ে জনসাধারণে যে কি আকারে শুনিতে পাইত তাহা আমরা জানি না। যতদূর পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে সে গুলি গ্রীক র‍্যাপসডিস্‌টদের মত কেহই পথে পথে একত্রিত শ্রোতৃবর্গকে শুনাইত না, কিম্বা তাহা কেহ যাত্রা রূপেও পরিণত করে নাই। বোধ হয় সে পদ সকল সঙ্কীর্ণ স্থলেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সে সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েও যে কথকতা প্রচলিত ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এই কথকতা প্রভাবে তখনকার নিতান্ত অজ্ঞ বঙ্গবাসীদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ সকল অতি সহজ ভাষায় বিবৃত হইত। এইরূপেই আদিরসাত্মক শ্রীমদ্‌ভাগবত করুণরসাত্মক রামায়ণ ও বীররসাত্মক মহাভারতের কথা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া পড়ে। এই কথকতা না থাকিলে, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বঙ্গ ভাষার

---

* নিশিকান্ত বাবুর কতকগুলি ভ্রম আমরা স্থানাভাবে বিস্তারিত রূপে দেখাইতে পারিলাম না। সংক্ষেপে দুই একটি ভুল না দেখাইয়া দেওয়া নিতান্ত অন্যায়—

১ গ্রন্থকার জটিলা ও কুটিলাকে সকল স্থলেই ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জটিলা মাতা, ও কুটিলা তাঁহার কন্যা।

২ অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী বেশ" এই পংক্তিটী গ্রন্থকার এইরূপ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন—

"Love has given the Lotus-shaped the air of a fool."

পত্তনভূমি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারিত না। কথকদের উদ্দেশ্যই এই ছিল যে, সংস্কৃত পুরাণের ভাবগুলি সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে। সেই উপলক্ষে তাঁহারা বঙ্গ-ভাষার যথাসাধ্য পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। বঙ্গ-ভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ঊষাকালে আমরা চারিটি দেদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের প্রভা দেখিতে পাই, এবং সেই চারিটির প্রভাবেই বঙ্গভাষা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

১। চৈতন্যদেবের অবতারণা এবং তাঁহার ও তাঁহার ভক্তদের নগরকীর্ত্তন এবং সেই ভক্তদের রচিত গ্রন্থাবলি।

২। কবিকঙ্কণের চণ্ডী।

৩। কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৪। কাশীদাসের মহাভারত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে চৈতন্যদেবের অবতারণার উদ্দেশ্য কি? তাহার উত্তর এই যে, দেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় অর্থ ও মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া এবং ভাগবত-উক্ত কথার আপাতপ্রতীয়মান অর্থ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে যারপরনাই অশ্রদ্ধার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদেরই কুসংস্কার সকল পরিষ্কার করিতে ও ভাগবতের সূক্ষ্মমর্ম্ম সবিস্তারে বিবৃত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে উচ্চতর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতেই চৈতন্যদেবের জীবন। কিন্তু চৈতন্যদেবের সাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের সহজ কথা সকলই বা কোথা হইতে সংগ্রহ করিল? এদেশে যখন সংস্কৃত ভাষা বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল না, এবং যখন সংস্কৃত কোন গ্রন্থই ভাষাতে অনুবাদিত হয় নাই, তখন দেশীয় জন-সাধারণে ভাগবতের একটি কথাও কোথা হইতে শিখিল? ইহা নিঃসন্দেহ যে আদৌ কথকদের দ্বারাই এদেশে ভাগবতের কথা প্রচারিত হয় ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়। সেই বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য চৈতন্যের আবির্ভাব। এবং তাঁহার আবির্ভাবে তদীয় ভক্তগণ নূতন তেজে তেজস্বী হইয়া নগরকীর্ত্তন দ্বারা ও ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গভাষার অট্টালিকার প্রথমস্তর স্থাপনা করে। কিন্তু কথকেরাই সেই অট্টালিকার ভিত্তিভূমি খনন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পরেই রামায়ণ ও মহাভারতের প্রচার হইল;—কিন্তু কৃত্তিবাস কোথা হইতে, রামায়ণের এবং কাশীরামদাসই বা কোথা হইতে মহাভারতের সারাংশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন? কৃত্তিবাস নিজেই লিখিয়াছেন যে তিনি "পুরাণ শুনিয়া গীত রচিলা কৌতুকে" এবং কাশীরামদাসও লিখিয়াছেন যে——

"শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার।"

এই সকলের দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, বঙ্গসাহিত্য আদৌ বৈষ্ণবদিগের কাছেই বিশেষ ঋণী এবং ইহা বলাও বোধ হয় বাহুল্য যে বৈষ্ণবেরাই সে সাহিত্যের মূল প্রতিষ্ঠক। কিন্তু চৈতন্যদেবের নগরকীর্ত্তনের ফলাফল অদ্যাবধি কোন

লেখকই উচিতমত মনোযোগের সহিত দেখেন নাই। ঐ নগর-কীর্ত্তনেই চৈতন্য দেবের ধর্ম্ম ভাব সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, ঐ নগর-সংকীর্ত্তনেই তাঁহার ধর্ম্ম-উন্মত্ততা গ্রামে গ্রামে সংক্রামিত হইয়া পড়ে এবং নগর-সংকীর্ত্তনেই বঙ্গ দেশজ সুরতানবিশিষ্ট সহজ ভাষায় ধর্ম্মগীত সকল রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সংক্রামক সংগীতময় উচ্ছ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিতকায় হইয়া নানা আকারে বিকাশ পাইতে লাগিল। সেই নূতন উত্তেজনা, নূতন উন্মত্ততা হইতেই আমাদের যাত্রা প্রসূত হয়। যাত্রা যে এদেশে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে ছিল না, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে, এবং তাহা চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্ত্তন হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হয়, তাহাও সহজে প্রমাণ হয়। সংস্কৃত নাটকে যেমন "নান্দী" আছে, যাত্রায় সেই রূপ "গৌর-চন্দ্রী" আছে—কিন্তু যাত্রার সূচনা "গৌরচন্দ্রী" নামে প্রসিদ্ধ থাকাতে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, যাত্রা সকল চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কালীন। তার পর, প্রাচীন যাত্রা সকলের অধিকাংশ সুর, ভাষা ও বিষয়—এমন কি বাদ্য যন্ত্র সকলই সংকীর্ত্তনের অঙ্গীভূত। আমরা এই সব কারণেই বলিতেছি যে আমাদের দেশীয় যাত্রা চৈতন্য দেবের ও তদীয় ভক্তদিগের নগর-সংকীর্ত্তন অবলম্বন করিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। তখন দেশে বৈষ্ণবদেরই প্রাধান্য—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা লইয়াই যাত্রার প্রথম অবতারনা। সর্ব্ব প্রথমে কে কে যাত্রা বাঁধিল, বা শ্রীকৃষ্ণের কোন্ বিশেষ লীলা প্রথমে অভিনীত হয় বা কোথায় সে অভিনয় সম্পাদিত হয়, তাহা স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। তবে, কোন্ কোন্ যাত্রা পূর্ব্ব কালে বঙ্গ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এবং কোন্ কোন্ যাত্রার অধিকারী কি কি বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহার স্থূল বিবরণ ইতি পূর্ব্বেই ভারতীতে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণযাত্রা হইতে আরম্ভ হইয়া রামযাত্রা, চণ্ডীর যাত্রা, শিবের বিবাহ যাত্রা ইত্যাদি নানা প্রকার যাত্রার ক্রমশঃ অবতারণা হয়। সে সকল যাত্রার নির্ব্বিশেষে সুখ্যাতি করা যায় না বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে আবার সুখ্যাতি না করিয়াও থাকা যায় না।

আজ কাল ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া যে সকল "সখের" দল করিয়া যাত্রা করেন, তাহাতে যে প্রাচীন যাত্রার কোন উন্নতি হইয়াছে এমন ত বোধ হয় না। স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রাচীন যাত্রা সকলের কথা আলোচনা করিতে হইলে অনেক গুলি দোষ আমরা দেখিতে পাই—সেই অষ্টমবর্ষীয়, অলকা তিলকা আচ্ছাদিত, ঝুঁটো-জরীর চূড়াধড়া বিশিষ্ট, সেই এক পয়সার রাঙ্গা লাঠির মুরলি ধারী শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়িলে এখন হাস্যের উদয় হয়। বিশেষতঃ এখন যদি ভাবি যে সেই অষ্টম বর্ষীয় একটী কচী ছেলে রাধার প্রেমে গদগদ হইয়া, রাধার মানে ব্যথিত হইয়া গোঁপকামান,' নোলক-নাকে, পাকামুখ

বিন্দে দূতিকে মনের দুঃখে কচী গলাতে গাহিয়া বলিতেছেন—

"দে গো বিন্দে!—আমায় দে—যোগী সাজায়ে—

সর্ব্বত্যাগী হোতে হল শ্রীরাধার মানের দায়ে—

দে গো বিন্দে ভস্ম মাখি,—

ভৃগু-পদ-চিহ্ন ঢাকি,

রাধে—রাধে—বোলে ডাকি, কুঞ্জ দ্বারে দাঁড়ায়ে—"

তখন আর হাসি সম্বরণ করা যায় না। যখন সেই ঝুঁটো পুঁতীর মুক্তাহারবিশিষ্টা ও নারিকেলের মালা দ্বারা "পীনোন্নত পয়োধরা" পঞ্চম বর্ষীয়া "বৃকভানু রাজনন্দিনীর" কথা মনে পড়ে, এবং যখন মনে করি শ্রীকৃষ্ণের উপর দুর্জ্জয় অভিমান করিয়া, ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দরের কাল বর্ণের উপর কটাক্ষ করিয়া রাই বিন্দে দূতীকে বলিতেছেন—"কাল জল' আর খাব' না গো দূতি!"—

দূতী। কাল' চুল—রাই—কাল চুল?

রা। ছেঁটে ফেল্‌বো গো দূতি।

দূ। কাল বসন?

রা। আর প'রবো না গো দূতি।

দূ। কাল তারা—ও রাই—তোমার ঐ চোখের কাল তারা?

রা। ছিঁড়ে ফেল্‌বো গো দূতি।

দূ। ও রাই! কালো মেঘ?

রা। আমি চাঁদোয়া খাটায়ে দিব রে—

আমি চাঁদোয়া খাটায়ে দিব রে—

বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, বিন্দে, ললিতা.—এমন কি নন্দঘোষ ও যশোদা পর্য্যন্ত ধেই ধেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন,—"চাঁদোয়া খাটায়ে দিব রে" গাহিতে গাহিতে ঘুরে ঘুরে নৃত্য আরম্ভ,—ও দিকে খোল কর্ত্তাল ঘন ঘন ঝঙ্কার দিতে লাগিল, শ্রোতারা আমোদে উন্মত্ত হইয়া টপাটপ্ পেলা দিতে লাগিল—নৃত্যের দাপটে পাকানো দড়ির মশাল-ওলারা সোরে সোরে দাঁড়াতে লাগিল—ঘোর উচ্ছ্বাস—নৃত্যের উৎসাহে ঝুটো জরীর কাঁচুলী ভেদ করিয়া শ্রীরাধার নারিকেল মালা দেখা দিতে লাগিল,—বিন্দেদূতীর কম্বলের পরচুল খসিয়া পড়িতে লাগিল, নন্দ ঘোষের পুঁতীর হীরকহার অতিক্রম করিয়া তেলকুচ্‌কুচে কাঠের মালা উঁকি মারিতে লাগিল—খোল কর্ত্তালওলার ঝন্ ঝন্ ঝনাৎকার, দর্শকদের "বাহবা—বাহবা" বৃদ্ধদের রোদন ধ্বনি—ছেলেদের আহ্লাদ ধ্বনি,—ও দিকে চীকের ভিতর থেকে মেয়েদের চাপা গোঁ গোঁ শব্দ—তাহার মাঝে আবার "চাঁদোয়া খাটায়ে দিব রে"—নানা কণ্ঠ হইতে নানা স্বরে গগণ-মণ্ডলে উত্থিত হইতেছে—যখন এই সকল কথা মনে করা যায় তখন এই ইংরাজিশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটের উদ্গতশ্মশ্রু মুখকমলে হাস্যের দুচারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁকা রেখা প্রকাশ পায়। এই ত গেল যাত্রার প্রেমরস অভিনয়। কিন্তু যাত্রার বীররসের অভিনয় আরও চমৎকার। আজ রামরাবণের যুদ্ধ অভিনয় হইবে। আমরা সন্ধ্যার সময়েই রাত্রভোজ সমাপন করিয়া

তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইতে গেলেম,—কিন্তু তবুও চক্ষে ঘুম নাই—এপাশ ও-পাশ করিতে করিতে মধ্যরাত্র উপস্থিত, তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া ও প্যালা দিবার জন্য দুই চারিটী টাকা লইয়া যাত্রাস্থলে যাইলাম। যাত্রাস্থলে লোকে লোকারণ্য, ভীড় অতি বিস্তর, সম্মুখে দালানে বাবুরা নানাভাবে আসীন, পিছনে ইতর লোকেরা জমাট বাঁধিয়া দণ্ডায়মান, আর দুই পাশে চীকের ভিতরে পুরবাসিনীদের জটলা। সমস্ত উঠানটাই উৎসাহের ভূকম্পনে কম্পান্বিত——ইতিমধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম লক্ষ্মণ, দু জনেই পঞ্চম বর্ষীয় বালক,—নাকে নোলক, পিঠে ছিন্ন রাঙ্গা শালুর পিঠ-বস্ত্র, বুকে চন্দনের বিচিত্র চিত্র, মাথায় রাখালে চূড়া এবং হাতে শোলার ধনুর্ব্বাণ। এই দুইটী সংক্ষিপ্ত পকেট-এডিষণ্ রাম লক্ষ্মণ বীরোচিত আস্ফালন করিয়া সমরাঙ্গণে আসিলেন, অমনি অন্য দিক হইতে রাক্ষস-পতি দশানন নয়টি শোলার মুণ্ড ও আঠারটি শোলার হাত লইয়া হুহুঙ্কার করিতে করিতে ঢাল তরয়াল লইয়া সমরক্ষেত্রে লম্ফঝম্প আরম্ভ করিলেন। দুইপক্ষে দেখা হইল, রাবণ হুহুঙ্কার ছাড়িলেন, শ্রীরামচন্দ্র কচীগলায় বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বিচিত্র বাঙ্গালা ভাষাতে অনেক বেদ পুরাণ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর্য্যবীর "সৌমিত্রী কেশরী" সে সকল কথায় কান না দিয়া নাকের নোলক নেড়ে নাকীসুরে মিহিগলায় আর্য্যোচিত বিস্তর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে বাজনার দল দেশ-কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া খোল কর্ত্তালে চূণাগলির ইংরাজি বাজনার ধূম উঠাইল। রাম রাবণের মহা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মহা সমর! শোলার নয়টী মুণ্ড একহাতে ধরিয়া রাখিয়া এবং আর-হাস্ত শোলার তরবারী সঞ্চালন করিতে করিতে ইংরাজি বাজনার তালে রাবণ ঘুরে ঘুরে নাচিতে লাগিল, এবং রাম লক্ষ্মণও তালে তালে শোলার ধনুকে টঙ্কার দিয়ে পিছনে পিছনে নাচিতে লাগিল।——যুদ্ধ আর শেষ হয় না; আমরাও আহ্লাদে উন্মত্ত, প্যালার টাকা ছুঁড়িতে লাগিলাম, এবং প্যালা পাইয়াই রাম লক্ষ্মণ, রাবণ ও রাক্ষসেরা আরও নাচিতে লাগিল—বাজনা আরও ঝন্ ঝনাৎকার করিতে লাগিল—কে মরে, কে বাঁচে, এই ভয়ে আমরা ভীত হইতে লাগিলাম, এমন সময়ে দশানন শোলার মুণ্ডগুলি এক হাতে দৃঢ় রূপে ধরিয়া শুইয়া পড়িলেন, রাম লক্ষ্মণ ও হনুমান নাচিতে নাচিতে রাবণের নকল মুণ্ডের উপর ছয়টী চরণ বসাইয়া প্যালার আশায় ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া ছয়টী হস্ত বিস্তার করিলেন। তাঁহারা প্যালা পাইতে না পাইতেই দশানন সেই রামের যুদ্ধ জয়ের আনন্দে যোগ দিবার জন্য বাজে মুণ্ড গুলি ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি রাম লক্ষ্মণের পিছনে বেহালা ধরিয়া রামের বিজয় গীতের সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। এই ত বীর রস! কোন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন যে রামরাবণের যুদ্ধ রাম

রাবণের যুদ্ধের মত,—তেমনি আমরাও বলিতে পারি যে যাত্রায় রাম রাবণের যুদ্ধ যাত্রার রামরাবণের যুদ্ধেরই মত—উভয়ই উপমা বিরহিত। কিন্তু তবে কেন সকলেই যাত্রায় এত মুগ্ধ হইত? শুধু সুকুমারমতি শিশুরা ও চীকবিড়ম্বিত পুরবাসিনীরা কেন, তখনকার বৃদ্ধ ও বিজ্ঞজনেরাও যাত্রার এত পক্ষপাতী ছিল কেন? আমাদের বিলক্ষণ মনে আছে যে ঐ সকল বৃদ্ধ ও বিজ্ঞদের মুখে "আহা আহা" শব্দে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইতাম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন তাঁহারা এত মর্ম্মান্তিক ভাবে গলিয়া যাইতেন? এ কথার উত্তর অতি সহজেই দিতে পারা যায়। বাঙ্গালীরা স্বভাবতই কখন আড়ম্বরপ্রিয় নয়——শিক্ষার দোষেই আমরা আড়ম্বরপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। এক জন প্রকৃত বাঙ্গালীর হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে সে হৃদয়ে গভীরতা থাক্ বা না থাক্, আড়ম্বর প্রিয়তা নাই। একজন প্রকৃত বাঙ্গালীর কর্ণে খোল করতাল অপেক্ষা হারমোনিয়ম বা পিয়ানোর শব্দ কখনেই ভাল লাগিবে না, এবং তাঁহার চক্ষে শ্রীকৃষ্ণের হাতে এক পয়সার একগাছি রাঙ্গা লাঠী অপেক্ষা একটী সোনার ফ্লুট্ বা ক্লারিয়নেট্ কখনই সুদৃশ্য হইবে না। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার দ্বারায় অপ্রকৃতিস্থ একজন বাঙ্গালী হৃদয়ের কথা যদি আমরা ভুলিয়া যাই তাহা হইলে আমরা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিব যে, কেনই বা প্রকৃতিস্থ বঙ্গ হৃদয় ঐ সকল যাত্রার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়িত। বাঙ্গালীর হৃদয় সহজেই সহজ কথার দ্বারা সহজ ভাবেই উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তাহারা কোন সমাসবিশিষ্ট সংস্কৃত কথার ধার ধারে না—কোন ইংরাজি হইতে চুরি করা উন্নত মহান ভাবেরও ধার ধারে না। সুতরাং প্রাচীন যাত্রা সকলের বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গ যাত্রার সরঞ্জাম, নায়ক নায়িকাদের পরিচ্ছদ, বাদ্য বাদনের কঠোরতা ও বেহাগ এবং কেদারার তারতম্যের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সহজ গানের সহজ ভাবেতেই প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিতেন। মনে কর একদল প্রাচীন কৃষ্ণ যাত্রার দলের গোপিকাগণ মথুরাগামী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

রথচক্র ধ'রে আমরা সকলে,
দেখিব হে চক্রধর কেমনে রথ চক্র চলে।
দেখিব কেমনে কর অশ্বরশ্মী সঞ্চালন,
মনোরথ ভেঙ্গে কর রথে আরোহন।
সেই দিন মধুপুরে যেও হে মধুসূদন,
গোপিকার প্রেম-ব্রত উদ্যাপন হোলে॥
আয়োজন ক'রে আমরা সবে ব্রতী হয়েছি
ফল-প্রাপ্ত হব ব'লে আশা ক'রে রয়েছি,
যদি সে আশার তরু সমূলে নির্ম্মূল হয়,
গোপিকা জীবন কিসে রহিবেহে দয়াময়!
নিতান্তই যাও যদি, পড়িয় ঐ রথের তলে,
দুখিনী গোপিনীদের যেওহে দোলে।"

সেই সকল পুরাতন যাত্রার পোষাক পরিচ্ছদ, সেই সকল দীনহীন সরঞ্জাম তাহাতে আবার ঐ রূপ প্রকারের গীত—বোধ হয় এখনকার কোন কৃতবিদ্য যুবকই আর ঐ সব যাত্রা শুনিতে চাহিবেন

না। প্রথমেই ত তাঁহারা গীতের মধ্যে "চক্র" "চক্র ধর," এবং "রথ" ও "মনো-রথ" দেখিয়া এখনকার মার্জ্জিত রুচি অনুসারে চটিয়া উঠিবেন। দ্বিতীয়তঃ গীতটীর ভিতরে Byron কিম্বা Shelley র গন্ধ মাত্রও নাই বলিয়া তাঁহারা ওগীতটীতে কবিতার ছায়াও দেখিতে পাইবেন না। তৃতীয়তঃ আগেকার বৃদ্ধ ও বিজ্ঞদের মত তাঁহাদের সে ভক্তির ভাব নাই, সেই সহজে ও অল্পে সন্তুষ্ট হইবার ভাব নাই। সেই জন্যই বোধ হয় এখনকার নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব "সখের" যাত্রার দল হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্বেকার ঠিক বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই বোধ হয় এখন রাজা নন্দঘোষ খুব ঝল্‌মলে "মোড়াসা" মাথায় দিয়া হুদ বিক্রয় করিতে যান এবং সাচ্চা জরীর পেষোয়াজ পরিয়া গীল্টী করা একটী ঘড়া লইয়া সীতা দেবী বাল্মীকির আশ্রম নদী হইতে জল আনিতে যান। পোষাক ও সাজ গোজের দিকে এখন এতদূর দৃষ্টি পড়িয়াছে যে বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যেই "যশোদা ঠাকুরুণ" গউন পরিয়া ঘোল মইবেন ও হনুমানচন্দ্র মুখ-চন্দ্রমায় পাউডর ও রুজ মাখিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিবে। এখনকার যাত্রায় সেই জন্যই গীত গুলিতে সংস্কৃত কথার আধিক্য ও ক্ষুদ্র ভাবের বৃহৎ ফাঁপা আয়তন দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার "সখের" যাত্রায় শ্রীমন্ত মশানে এই বলিয়া দেবীর আরাধনা করেন——

"করুণা, করুণা, কুরু মে, করুণা।

করুণা প্রদানে মা গো কৃপণতা কোরো না।

যাত্রা কালে "দুর্গা" বোলে, হেন যদি ভাগ্যে ফলে, "দুর্গা" বোলে কেহই তবে যাত্রা কোর্বে না—

বেদাগমে এই উক্তি, তুমি জীবের গতি মুক্তি—সে নামে তোমার যেন কলঙ্ক রটে না।

এই গীতে সংস্কৃত কথা আছে, দুর্গাকে ভয় দেখানো আছে—বেদাগমের কথা আছে, এমন কি, দুর্গাকে কটাক্ষে একটু উপদেশ দেওয়াও আছে। পূর্ব্বেকার যাত্রায় এরূপ গান বাঁধিতে পারিত না। কিন্তু পূর্ব্বেকার ভাল ভাল যাত্রার গানে কেমন একটী সহজ ভাব ও সহজ ধরণ ছিল। পূর্ব্বেকার যাত্রায় শ্রীমন্ত মশানে এই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন—

"কোথায় গো! মা শঙ্করী!

পোড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন-জ্বালায়, প্রাণেতে মরি!

তরী ল'য়ে, যখন আসিলাম সিংহলে যাত্রা-কালে মুখে "দুর্গা" "দুর্গা" বোলে, তবে কেন আমার ভাগ্যে এমন ফলে—অকূলে ডুবালে তরী!"

সমস্ত গীতটী যেন একটী সরল সুকুমারমতি বালকের ভক্তিময় কাতরতার উচ্ছ্বাস—যদিও শ্রীমন্তের "বন্ধন-জ্বালা" এক-টুকরা রাঙ্গা রুমালের দরুণ, তবুও শ্রোতারা তাহা দেখিত না, কারণ তাহারা তাহাদের মনের গুণে, সরলতার গুণে, শ্রীমন্তের অবস্থার সহিত এত দূর মমতা অনুভব করিতে পারিত যে এখন আমরা আর ততটা কোন মতেই পারি না।

——:০:——

লোক সংখ্যা ও বলবৃদ্ধি।

বৈশাখমাসের ভারতীতে সম্পাদকের বৈঠকে আমরা য়ুরোপীয় জাতিদিগের জন্ম-মরণ হার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি। বলা হইয়াছিল "এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য জাতিদিগের মধ্যে লোকসংখ্যা ক্রমিকই বৃদ্ধি হইতেছে।"—বৃদ্ধি হইতেছে সত্য বটে কিন্তু সমান রূপে নয়। কোন কোন জাতির মধ্যে (যেমন ফরাসিস জাতি) বিবাহের সংখ্যা কম, বিবাহে সন্তানও অধিক জন্মে না; অপর জাতির মধ্যে বিবাহ অধিক—ফলও প্রচুর লাভ হয়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ন্যূনাধিক্য বশতঃ জাতীয় বলের হ্রাস বৃদ্ধি গণনা করা যাইতে পারে। আমাদের সহযোগী বম্বেগ্যাজেট সম্পাদক সম্প্রতি এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে এই যে, বংশ বৃদ্ধিতেই বল-বৃদ্ধি—এই মূল মত অবলম্বন করিয়া ৫০ বৎসর পরে য়ুরোপীয় কোন্ জাতির অবস্থা কিরূপ হইবে তিনি তাহার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ফ্রান্সের পতন ও ব্রিটানিয়ার জয় ঘোষণা করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় সমাজের আধুনিক অবস্থা দেখিতে গেলে এইক্ষণে তাহাতে প্রথম শ্রেণীর ছয়টি জাতি দৃষ্ট হয়। আমেরিকা ধরিলে পৃথিবীতে প্রধান রাজ্যের সংখ্যা সাত। ইহাদের শক্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি সমান নহে কিন্তু সামান্যতঃ ইহারা এক দলে ভুক্ত হইতে পারে। ইহাদের কোন এক জাতি অপর দুই জাতির সমবেত বলের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত নহে। ফ্রান্স তাহার নবসজ্জিত সৈন্য সামন্ত লইয়াও জর্ম্মনি ও অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধরূপ আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী নহে। ফ্রান্স ও রুষিয়া একত্র হইলে জর্ম্মনি একক তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। ইটালি, যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও কনিষ্ঠদরের রাজ্য, সেও ফ্রান্স কিম্বা জর্ম্মনি কিম্বা রুষিয়াকে সহায় পাইলে অন্য কোন পরাক্রমশালী সম্রাটকেও পদানত করিতে পারে। য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের সৈন্য সংখ্যা ৩০০০০ মাত্র। তাহার জাহাজের বল নাই। সে য়ুরোপীয় কোন রাজ্যকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ আমেরিকার সহিত দ্বন্দ বাধাইতে সহসা অগ্রসর হইবে না, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের আত্মরক্ষার সামর্থ্য বিলক্ষণ আছে, অন্য কোন জাতি তাহার উপর অত্যাচার করিলে সে তাহার সুদ শুদ্ধ ফিরাইয়া দিবার বিহিত উপায় অল্প কালের মধ্যেই করিয়া লইতে পারে। এই সপ্তজাতির মধ্যে একজাতি অপর

জাতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বলবান্ হইতে পারে। রুষিয়া ইটালি অপেক্ষা বলীয়ান্ সন্দেহ নাই। জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ফ্রান্সের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল তাহা চিন্তনীয়, কিন্তু সকল দিক্ দেখিতে গেলে দেখা যায় যে হরেদরে ইহাদের বল সমান। ইহাদের প্রত্যেক জাতি অপর জাতীয় কোন এক শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্ম সংরক্ষণে সমর্থ। এই সাত রাজ্য যে সমান পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ এই যে উহাদের লোক সংখ্যা সমান ও গড়ে তাহা ৪ কোটি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। রুষীয়দের সংখ্যা ৪ কোটি ও রুষিয়ার অধীনস্থ সমস্ত প্রজামণ্ডলী একত্র করিয়া গণনা করিলে তাহার সম্রাটকে ৯ কোটি লোকের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের জন সংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষ, জর্ম্মণির ৪ কোটি ৬০ লক্ষ—হঙ্গারি সমেত অষ্ট্রিয়ার ৩কোটি ৮০লক্ষ। তার পর ফ্রান্সের ধর ৩কোটি ৭০লক্ষ, ব্রিটিষ দ্বীপপুঞ্জ ৩কোটি ৬০ লক্ষ, ইটালি ২ কোটি ৯০ লক্ষ।

গড়ে এই সকল দেশের জন সংখ্যা সমান দেখা যাইতেছে। যাহার যে ন্যূনতা আছে তাহা পূরণ করিবার উপায়ও আছে। ইংলণ্ড যেমন কৌশলে তুর্কি হইতে সাইপ্রস্ প্রদেশ লাভ করিয়াছেন ইটালির পক্ষেও ছলে বলে কৌশলে সেইরূপ নীস্ কিম্বা সাবয় (Savoy) কি অন্য কোন ভূমিখণ্ড লাভ করিয়া লওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়, এই রূপ রাজ্যবৃদ্ধি করিয়া কোন এক দুর্ব্বল জাতি বলবৃদ্ধি করিয়া লইতে সক্ষম হইতে পারে। অন্য কথায়, এই সপ্ত রাজ্য প্রায় সমবল, কেহ কাহারো নিকটে হার মানে না—কেহ কাহারো উপর অক্ষয় প্রভুত্ব লাভে সক্ষম নহে।

এই ত ইহাদের আধুনিক অবস্থা কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পরে কি হইবে? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। এখন যে সকল রাজ্য পৃথিবীতে প্রখ্যাত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের জন সংখ্যা কত ও তাহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল? তাহাদের প্রত্যেক রাজ্যে লোকসংখ্যা কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল আর অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বা তাহা বৃদ্ধি হইবার কীদৃশ সম্ভাবনা। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেই তাহার ভাবী অবস্থা কতকটা নির্ণয় করা যাইতে পারে। যদি জন্মহারের হ্রাস বৃদ্ধির উপরে দেশ বিশেষের উন্নতি অবনতি সত্যই নির্ভর করে, তাহা হইলে ফ্রান্সের জন্মহার বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার আসন্ন বিপদ সহজেই মনে উদয় হয়। এক শত বৎসর পূর্ব্বে (ফরাসিস্ বিপ্লবের সময়) অষ্ট্রিয়া প্রুষিয়া মিলিত জর্ম্মণ রাজ্যের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ ছিল, ফ্রান্সের ২ কোটি ৬০ লক্ষ, রুষিয়ার ২॥০ কোটি, ব্রিটিষ দ্বীপের ১ কোটি ২০ লক্ষ য়ুনাইটেড্ ষ্টেটসের ৩০ লক্ষ মাত্র। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ফরাসিস বিপ্লব কালে যে ফ্রান্স লোক সংখ্যায় অগ্রগণ্য ছিল এক্ষণে তাহার অপেক্ষাকৃত হীন দশা। ইহার কারণ এই ফরাশিস্ পরিবার মধ্যে সন্তান জনন ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে ও বর্ষে বর্ষে আরো কমিবার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ফরাসিস সাম্রাজ্য পতনের সময় হইতে এই রূপ নিঃসন্তানতার বিস্তার আরো বিশিষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। ফ্রান্স ও রুষিয়ার তুলনা করিলে ফ্রান্সে হাজারের মধ্যে যত সন্তান প্রসূত হয় রুষিয়াতে তাহার প্রায় দ্বিগুণ হইবে। ফ্রান্সে হাজারে ২৬, রুষিয়ায় হাজারে ৫০, এত তফাৎ। ইংলণ্ডের জন্মহার হাজারে ৩৫—প্রুষিয়ায় ৩৪—সাক্সনিতে ৪৬। এই বিষয় অন্য প্রকারে বলিতে গেলে এই হয় যে জর্ম্মণিতে প্রতি বিবাহে গড়ে ৫০ সন্তান জন্মে—ইংলণ্ডে ৪৮০ ফ্রান্সে ৩।০। ফরাসিস পরিবারে ৫টী সন্তান জন্মানো আকাশ কুসুমের ন্যায় দুর্লভ-দর্শন। ফ্রান্সের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে তাহা সামান্য ঘটনা। পূর্ব্বে ফ্রান্সের দশা এরূপ ছিল না। তখন ফ্রান্সে বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা রাজার নিকট হইতে পারিতোষিক পাইতেন। সে এক কাল তখন ফরাসিস্রা মনে করিত—

"ঘন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্গৃহং"

—তখন ফ্রান্সের পুত্রেরা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে ইংরাজদের কাছেও হার মানিত না। এখন আর সে কাল নাই। প্রজোৎপত্তিই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম এখন সে ভাব গিয়াছে—বন্ধ্যা ভার্য্যা জনসমাজে হতাদর হয় না। ভবিষ্যতে ইহার ফল কি হইবে? যদি রুষিয়া জর্ম্মণি ইংলণ্ডে অতীত কালের ন্যায় আগামী অর্দ্ধ শতাব্দীতে জনতা বৃদ্ধি হয়, আর ফ্রান্সের জনসংখ্যা সেই পরিমাণে কমিয়া যায়, তাহা হইলে বিংশ শতাব্দীর ৩০ বৎসর পরে যাহা দাঁড়াইবে তাহার তালিকা বম্বে গ্যাজেট হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

য়ুনাইটেড ষ্টেট্স্	...	১৯ কোটি
রুষিয়া	...	১৫ কোটি ৮ লক্ষ
জার্ম্মনি সাম্রাজ্য	...	৮ ,, ৩ ,,
ব্রিটিষ দ্বীপ	...	৬ ,, ৩ ,,
হঙ্গেরি	...	৫ ,, ১ ,,
ফ্রান্স	...	৪ ,, ৫ ,,
ইটালী	...	৪ ,, ৪ ,,

অর্থাৎ তখন স্পেন রাজ্যের ন্যায় ফ্রান্স অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। য়ুরোপীয় সমাজে তাহার মান মর্য্যাদা এইক্ষণে যতটা বেলজিয়মের ভাগ্যে তার ঊর্দ্ধে আর উঠিবে না। জন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের সৈন্যবল জর্ম্মণির অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে। গ্রেট ব্রিটন রুষিয়া তাহা অপেক্ষা ত্রিগুণ চতুর্গুণ বলে বলীয়ান্ হইবে। ইটালি ফ্রান্সের সঙ্গে একই নৌকায় ভাসিবে। রুষিয়া ও য়ুনাইটেড্ ষ্টেটস্ অক্ষয় সৈন্যবলে বলী হইয়া সভ্য জাতি দলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে। ব্রিটনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার সময় তাহার রাজ্য শুধু কতকগুলি দ্বীপের মধ্যেই বদ্ধ করিলে চলিবে না। যে রাজ্য ব্রিটিষ দ্বীপবহির্ভূত Greater Britain বলিয়া বিখ্যাত তাহাও ধরিয়া লওয়া উচিত। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ভারতবর্ষের প্রজা সংখ্যা ২৫ কোটি হইতে ৩০ কোটি হইয়া দাঁড়াইবে। অষ্ট্রেলিয়া কানাডা ইহাদের লোকেরা সামান্য বৃদ্ধি

শীল নহে—তাহাদের তখনকার সংখ্যা ৬ কোটি ধরিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব গ্রেট্ ব্রিটন্ ৫০ কোটি প্রজাপুঞ্জের অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইবেন। আমেরিকা কিম্বা রুষিয়াও ইহার সঙ্গে সমস্পর্দ্ধী হইতে পারিবেন না। অতএব অন্য যে জাতির ভাগ্যে যাহাই লেখা থাকুক ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে তাহাদের দশা যে রূপই হউক্ না কেন—ইংরাজ জাতি ভবিষ্যতের প্রতি অম্লান-বদনে অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারে।

গ্যাজেট কর্ত্তা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রফুল্লিত আছেন, যদি জাতীয় বল জন-সংখ্যার উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু তাহা কি সকল সময়ে সকল অবস্থায় ঠিক? তাহা সত্য হইলে ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ইংরাজগণ এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের অধীশ্বর হইতে পারিতেন না। তবে যদি বল যে পরাধীন জাতি—যে সকল জাতি অন্যের দ্বারা মেষপালের ন্যায় চালিত তাহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। তাহাদের জনসংখ্যার উপর কি পৃথিবীর উন্নতি দুর্গতি নির্ভয় করিতেছে? তাহা যে করে না তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত চীন। বিস্তার ও জনসংখ্যায় চীন রাজ্য কত বড়, কিন্তু প্রতাপে তাহা য়ুরোপের এক ক্ষুদ্র রাজ্যেরও সমকক্ষ হইতে পারে কি না সন্দেহ। এসিয়া কেন, য়ুরোপেই দেখ তুর্কির জনসংখ্যার খাতিরে তাহার চির-রোগী সুলতানকে য়ুরোপে কি কেহ ভয় করিয়া চলে? গ্যাজেট কর্ত্তা হয়ত বলিবেন "আমি এই সকল অনুন্নতিশীল গতিহীন স্থাবর জাতির প্রতি লক্ষ্য করি নাই, স্বাধীন সভ্য উন্নতিশীল জাতি সম্বন্ধেই আমার কথা খাটিবে।" কিন্তু তাহাই কি ঠিক? তিনি যে নিয়ম বাঁধিয়াছেন তাহাতে অনেক ব্যতিক্রম ঘটে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মানব সমাজে জনসংখ্যা অপেক্ষা বুদ্ধিবলে অনেক কাজ হয়। "বরমেকোগুণী পুত্র নচ মূর্খ শতৈরপি।" আমরা দেখিতে পাই এক এক প্রতিভাশালী বীরপুরুষ মধ্যে মধ্যে উদয় হইয়া ঘটনা স্রোতকে কি আশ্চর্য্য রূপে উল্টাইয়া দেন, পৃথিবীর সমুদয় ইতিবৃত্ত পরিবর্ত্ত করিয়া ফেলেন। এক নেপোলিয়ান উদিত হইয়া ফরাসিস আধিপত্য সমুদয় য়ুরোপ খণ্ডে কিরূপে বিস্তার করিলেন! এই ঘটনার অনতিকাল পূর্ব্বে কেবল মাত্র ফ্রান্সের লোকসংখ্যা দেখিয়া কি তাহার ভাবী প্রভাব কেহ কল্পনাও করিতে পারিত? পুরাকালে মাসিডোনিয়ার আয়তন ও জনসংখ্যা দেখিতে গেলে তাহা বৃহৎরাজ্য ছিল বলা যায় না, কিন্তু সেকন্দর বাদসা সিংহাসনারূঢ় হইয়া তাহার প্রতাপ দিগদিগন্তে বিস্তার করিলেন। সকলেই জানেন কি করিয়া একটি মাত্র মহাবীরের প্রতিভাবলে শিখদিগের ন্যায় অত বড় পরাক্রমশালী জাতির অভ্যুত্থান হইল। একমাত্র শিবজির বলে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় জাতি এককালে কিরূপ বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা

কাহারো অগোচর নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। জন সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও সমাজ ভাল চলে না, আবার জন সংখ্যা নিতান্ত অধিক হইলেও সমাজের বিপদের কারণ হইয়া উঠে। আর্য্যগণ যখন প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের জনসংখ্যা এত অল্প ছিল যে, শ্রমবিভাগের নিমিত্ত পাকাপাকি করিয়া জাতির নিয়ম বাঁধিতে হইয়াছিল। তখনো অল্প সংখ্যক হইয়াও তাঁহারা ভারতবর্ষের আদিম অসভ্যদের অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে, আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের সকলকেই যোদ্ধা হইয়া উঠিতে হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক ভাগ মাত্র যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তথাপি জনসংখ্যা বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহারা সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। মনুর শাসন অনুসারে প্রত্যেকেরই বিবাহ করা আবশ্যক, নহিলে পুন্নামনরক হইতে পরিত্রাণ নাই। যাহারা নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহারা জন সংখ্যা বর্দ্ধনের উপযোগিতা বিশেষ অনুভব করে। অতএব কেবল মাত্র বাহুবল বৃদ্ধির নিমিত্তই যে জনসংখ্যা বর্দ্ধনের উপযোগিতা তাহা নহে, সভ্যতার একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমবিভাগের নিমিত্ত তাহা আবশ্যক। কিন্তু যখন সমাজের এমন অবস্থা হইয়াছে, যে, জন সংখ্যা আবশ্যকের অতিরিক্ত হইয়াছে, কাজ হাতে নাই বলিয়া হাহাকার উঠিয়াছে, দেশে যে অন্ন উৎপন্ন হয় তাহাতে সকলের পেট ভরে না, তখন সে আয়তন বৃদ্ধিতে সমাজের কি কোন লাভ আছে? তখন দেশের বাহিরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনের আবশ্যকতা জন্মে। ঔপনিবেশিকদিগের সন্তানেরা সকল সময়ে পিতামহীর বশে থাকিতে চায় না। সে অবস্থায় তাহারা পিতামহী-ভূমির বলের কারণ হয় না। যেমন যুনাইটেড ষ্টেট্স্। আবার ঔপনিবিশিকেরা যদি তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের জন্মভূমির সহিত যোগ রাখিয়া থাকিতে চাহে, ও উপনিবেশের আয়তন ক্রমেই বাড়িয়া বাড়িয়া অযথা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তবে এই অতিবিস্তৃত পরিবারের পক্ষে কি আশঙ্কার কারণ ঘটে না? আবার, উপনিবেশ বিস্তার অপেক্ষা অধিকার-বিস্তার আরো বিপদজনক। অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিয়া যখন নিজের দেহ বোঝা হইয়া উঠে, তখনই ত মেরুদণ্ড নুইয়া পড়ে, তাহার উপরে পরের দেহ ঘাড়ে লইলে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব জন সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেই যে বল বাড়ে এমন কোন কথা নাই। দেখিতে হইবে যে কোন এক রাজ্য যে পরিমাণে বিস্তৃত তাহা রক্ষা করাও সেই পরিমাণে দুষ্কর। তাহার বলই অনেক সময় দুর্ব্বলতার কারণ হইয়া পড়ে। রোম সাম্রাজ্যের পতন কি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত নাই? ঔরঙ্গজীবের রাজত্ব কালে কে বলিতে পারিত যে অনতিকাল বিলম্বেই মোগল রাজ্য প্রলয় দশা প্রাপ্ত হইবে? রুষিয়া

তাহার সাম্রাজ্য এসিয়া খণ্ডে বিস্তার করিবে করুক—তাহার ঘরের কাছে কি Nihilist দের উপদ্রব নাই—কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ শত্রু উঠিয়া সীজরের সিংহাসন সমূলে উৎপাটন করিবে কে বলিতে পারে? ব্রিটানিয়া ৫০ কোটি প্রজার অধীশ্বর ইহা সুখের স্বপ্ন বটে কিন্তু ভাবা উচিত যে সেই বিস্তীর্ণ রাজ্যযন্ত্রের এক অঙ্গ আহত হইলে অচিরাৎ তাহার ধাক্কা সমুদয় রাজ্যে পৌঁছিতে পারে। ইতিহাস হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতেছি? সিপাই বিদ্রোহে কি সে রাজ্য কম্পিত হয় নাই? এত কথায় কাজ কি, আয়রলণ্ডের এই ঘোরতর উপস্থিত শঙ্কট দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ ব্রিটিস রাজ্যের ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে সাহসী হইতে পারেন। দূর দূরান্তরে বিস্তৃত রাজ্যের এক প্রধান অসুবিধা এই যে, দৈবক্রমে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গোলযোগ ঘটিলে সমস্ত সাম্রাজ্যের মাথা ঘুরিয়া যায়। ব্রিটনের প্রজা সংখ্যা যে তাহার বলের কি দুর্ব্বলতার কারণ রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপদের সময় ইংলণ্ডের অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জ তাহার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলে যেমন তাহার বল, তাহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলে তেমনি শঙ্কট। ৫০ বৎসরের মধ্যে কত কি হইতে পারে কে বলিবে—জন সংখ্যার উপরেই আমাদের মতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে না। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যেমন প্রতি জনের সেই রূপ মানব জাতির দর্পহারী মধুসূদন আছেন—কখন্ কি উপায়ে তিনি বলবানের দর্প চূর্ণ করেন তিনিই জানেন।

গ্যাজেট কর্ত্তার প্রতি আমাদের উপদেশ এই—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমন স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রলয়ের ধূমকেতু।

ধূমকেতু একটি জ্যোতিষ্ক সমস্যা। সম্প্রতি ইহার প্রতি কিছু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে। আমেরিকায় ধূমকেতুর বিষয়ে সুপ্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধানের নিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ব্রিস্টলে ডেনিং সাহেব কয়েক মাস ধরিয়া তাঁহার সুবিধানুসারে আকাশের অংশ বিশেষে উল্কা ও ধূমকেতুর অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। অতএব দেখা যাইতেছে ধূমকেতুর প্রতি বিশেষ নজর পড়িয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ধূমকেতু সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৭০০ হইবে। কতক বড়, কতক ছোট, কতকগুলি খালী চক্ষে দেখা গিয়াছে, আবার অনেকগুলি দূরবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। কোন কোন ধূমকেতু দূর নক্ষত্র হইতে অভ্যাগতের ন্যায় আমাদের সম্মুখে উদয় হয় আবার কোন্ দিক্ দিয়া দূরে চলিয়া যায় তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না। কতকগুলি আবার আমাদের সৌরজগতের অঙ্গীভূত। অল্পাধিক কাল ব্যাপিয়া আমাদের এই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে। তাহাদের ভ্রমণ পথ চক্রাকার নহে, সামান্যত বলিতে গেলে তাহা Ellipse অথবা ডিম্বাকৃতি। তাহাদের 'বৎসরের' এক ভাগে তাহারা সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে অপর ভাগে সূর্য্য হইতে অত্যন্ত দূরে ভ্রমণ করে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে যে এক ধূমকেতু পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধ হইতে দেখা গিয়াছিল তাহাই এই প্রস্তাবের শিরোদেশে প্রলয়ের ধূমকেতু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রক্টর সাহেব এই ধূমকেতু সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ও তাহা লইয়া সম্প্রতি কিছু গোলমাল হইয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত ধূমকেতু সম্বন্ধে যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহসা মনে হইতেও পারে যে, ইহা হইতে সৌরজগতে কোন একটা অসামান্য উৎপাত ঘটিবে। এমন কোন আশঙ্কা নাই যে তাহা হইতে সূর্য্য কিম্বা গ্রহগণের স্থিতি গতির কোন বিশৃঙ্খলা হইবে। আপাততঃ মনে হয় বটে যে ধূমকেতু সৌরজগতের কোন অঙ্গে পতিত হইলে সেই অঙ্গ বুঝি ভগ্ন চূর্ণ ভস্ম হইয়া যায় কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনেক কাল সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে ধূমকেতু যে সকল লঘু উপাদানে সংগঠিত তাহাতে তাদৃশ অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। ১৭৭০ শতাব্দীর একটী ধূমকেতু বৃহস্পতির চন্দ্রাবলীর মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু ইহার ভার এত অল্প যে, যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা সেই সকল চন্দ্রের পথে কোন বিঘ্ন ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু বৃহস্পতি ও তাহার চাঁদেরা মিলিয়া সেই ধূমকেতুটিকে মহা উৎপাতে ফেলিয়াছিল। এমন কি, যখন তাহা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল তখন যদিও তাহার বিশেষ কোন হানি হয় নাই, তথাপি তদবধি তাহার ভ্রমণপথ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আকর্ষণবলে সে তাহার পুরাতন পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে ধূমকেতুর সংস্পর্শে সূর্য্য কিম্বা তাহার পরিবারস্থ কোন গ্রহ স্থানভ্রষ্ট হইবে অথবা তাহার গতিবিধিতে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা নাই। কিন্তু ধূম-

কেতুর প্রকৃতি আমরা এত অল্প জানি যে, ও বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাহসের কার্য্য। সে যাহা হউক্ ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ধূমকেতু প্রপাতে সৌরজগতের আর কিছু অনিষ্ট না হউক্ সেই জগতবাসী জীবজন্তুগণের সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

আমরা যে সকল ধূমকেতু আকাশে দেখিতে পাই তাহাদের কোন কোনটী নিয়মিত কালে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আইসে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা এই সকল ধূমকেতুর ভ্রমণ চক্র নিরূপণ করিয়া বলিয়া দিতে পারেন আবার কোন্ সময়ে তাহারা দৃষ্টিপথে উদয় হইবে। পৃথিবী হইতে এই সকল ধূমকেতুর ভ্রমণপথের অল্প ভাগই দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ সেই অল্প ভাগ দেখিয়াই তাহাদের সমুদয় ভ্রমণ পথ নির্ণয় করিতে পারেন। যদি কোন বক্ররেখার একভাগ আমরা দেখিতে পাই, অপর ভাগ আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত থাকে তবে দৃস্ট ভাগ হইতেই নির্ণয় করা যায় যে, সে রেখা চক্রাকার কি ডিম্বাকার কিম্বা তাহার দুই প্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া যাইতেছে, আর মিলিত হইবে না। ধূমকেতু সূর্য্যের চারিদিকে সচরাচর ডিম্বাকার পথে ভ্রাম্যমান হয়, কোন গ্রহের সন্নিকর্ষ হইতে বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলে (আর সে প্রতিবন্ধক নির্ণয় করা কঠিন নহে) তাহা সেই পথেই সর্ব্বদা ভ্রমণ করিবে ইহা জানাই আছে, সুতরাং সেই পথের একভাগ নিরূপিত হইলেই সমুদয় পথটা বলিয়া দেওয়া যায়। গ্রহগণের ভ্রমণ পথও কতকটা এইরূপে নিরূপিত হয়। ইহা সকলেই জানেন যে Uranus গ্রহ তাহার পথের দশমাংশ অতিক্রম করিতে না করিতেই সে কোন্ পথ দিয়া চলিতেছে তাহা নির্দ্ধারিত হয়। সেইরূপ আবার Neptune গ্রহের ভ্রমণপথ ২৫ বৎসর হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে, যদিও সে গ্রহ প্রকাশ হইয়া অবধি তাহার পথের চতুর্থাংশও সে অদ্যাপি ভ্রমণ করে নাই। এই নিয়ম অনুসারে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ কোন ধূমকেতুর সূর্য্য-সন্নিহিত পথের অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার সমুদয় পথচক্র নিরূপণ করেন। যদি তাহার সূর্য্য-সন্নিধানস্থ পথের আকার ঠিক দেখিতে পান অথবা তাহার কোন ভাগে ধূমকেতুর গতির বেগ ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাহার সমুদয় পথচক্র স্থির করিয়া ফেলেন। পণ্ডিতেরা সকল সময়ে অভ্রান্তরূপে যে ইহা স্থির করিতে পারেন তাহা নহে, অনেক সময়ে গণনার তারতম্য বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইয়া পড়ে। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধূমকেতুর আকার যেরূপ অসমান, তাহাদের গমনপথ যেমন অসরল, গ্রহগণের ভ্রমণচক্রের ন্যায় সরল চক্র নহে; তাহাতে আবার তাহারা যে অল্প কালের জন্য আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয় তাহাতে তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার তেমন সুবিধা হয় নাই।

এই হেতু কতকগুলি ধূমকেতুর প্রদক্ষিণ কাল এখনো পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ নিরূপিত হয় নাই। একজন বিচক্ষণ গণৎকার যাহার কাল ৭ কিম্বা ৮ শত বৎসর বলিয়া গণনা করিয়াছেন আর একজন পণ্ডিত হয়ত তাহার পরিমাণ ৯ কিম্বা ৮ সহস্র বৎসর সিদ্ধান্ত করিলেন। অনেক সময় এইরূপ মত ভেদ দৃষ্ট হয়।

যে সকল ধূমকেতু কালে কালে আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে Halley's comet একটি প্রসিদ্ধ। জ্যোতিষী হ্যালি গণনা করিয়া এই ধূমকেতুর কাল নির্ণয় করিয়া ১৬৮২ অব্দে স্বনামে উহার নামকরণ করেন। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৭৬ বৎসর লাগে—ভ্রমণ করিতে করিতে সে এক সময়ে সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী হয় যে শুক্রতারাও তত নিকটে যায় না, আবার অন্য সময়ে Neptune গ্রহ অপেক্ষাও সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া পড়ে। আর একটী ধূমকেতু যাহার নাম Encke's Comet, তাহা সাড়ে ৩ বৎসরে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আইসে। Newton's Comet ২০০ বৎসর পূর্ব্বে দৃস্ট হইয়াছিল কিন্তু তাহার ভ্রমণ পথ এমন বিস্তীর্ণ যে যুগ যুগান্তরে আবার কখন যে ফিরিয়া আসে ঠিক নাই।

এখন আমাদের 'প্রলয় ধূমকেতুর' কথা আরম্ভ করা যাউক্। ১৮৪৩ অব্দে যে ধূমকেতু উদয় হইয়াছিল তাহার ন্যায় সুশোভন উজ্বল ধূমকেতু প্রায় দেখা যায় না। তাহার ভ্রমণ পথ সূর্য্যের এত কাছাকাছি গিয়াছিল যে এক সময়ে তাহা সেই সূর্য্য পৃষ্ঠ হইতে ৩০০০০ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। যখন মনে করা যায় যে সূর্য্যের কিরণশিখা সকল অনেক সময় ৫০,০০০ মাইলেরও উর্দ্ধে ওঠে তখন উক্ত ধূমকেতু যে কি প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করিতেছিল তাহার কতক বুঝিতে পারা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে ১৮৮০ বর্ষে এই ধূমকেতু পুনর্ব্বার উদিত হয়। ইহাদের একতার যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে আর সে সকল যুক্তি পাঠক সাধারণের বোধগম্য হওয়াও সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে তাহার দুই একটি প্রমাণের আভাস দেওয়া যাইতে পারে।

দুইটি ধূমকেতু যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকাশের একই মার্গে বিচরণ করে তাহা হইলে এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে তাহারা দুই নহে এক। উপরোক্ত ধূমকেতু দ্বয়ের ভ্রমণ পথ যতদূর নিরূপিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহারা উভয়েই একপথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ১৮৪৩র ধূমকেতু সূর্য্য সন্নিধানে (Perihelion) যে পথে ভ্রমণ করিতেছিল ১৮৮০র ধূমকেতুও সেই পথ দিয়া চলিতেছিল। প্রথমোদিত ধূমকেতুর কাল গণনায় যদিও মতভেদ দৃষ্ট হয় তথাপি কোন কোন বিচক্ষণ জ্যোতির্ব্বেত্তা একমতে তাহার কাল ৩৭ বৎসর স্থির করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ Sir John Herschel তাহার মধ্যে একজন, তিনি গণনা করিয়া

তাহার কাল ৩৭ বৎসর নির্ণয় করেন। তাঁহার গণনা সত্য হইলে ঐ ধূমকেতু আবার ১৮৮০সম্বৎসরে উদিত হইবার কথা। ফলেও তাহাই হইল। উহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইল। ইহার উপর যখন দেখা গেল যে ১৮৮০ অব্দে এই নূতন ধূমকেতু পূর্ব্বটির পুরাতন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, এ দুয়ের ভ্রমণপথ একই, তখন তাহা হইতে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে এই দুই ধূমকেতু বাস্তবিক ভিন্ন নহে একই পদার্থ। পণ্ডিত Encke সাহেব ও অপরাপর জ্যোতির্ব্বিদগণ তাঁহাদের একতা সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা আরো অনুমান করেন যে ১৬৬৮ অব্দে যে ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল তাহাও ঐ একই, একই ধূমকেতু ফিরিয়া তিনবার উদয় হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তে এক আপত্তি এই উঠিতে পারে যে তিন একই পদার্থ হইলে কালের ব্যত্যয় কি করিয়া হইল? ১৭৫ বৎসর কি ৩৭ বৎসরে নামিয়া গিয়াছে? একথা বলিবার যো নাই যে এ ধূমকেতু ৩৭ বৎসর অন্তর উঠিয়া আসিয়াছে, হয়ত সকল সময় চক্ষে পড়ে নাই। কেন না ১৮৪৩র ধূমকেতু এমন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার, তার রূপ এমন চমৎকার, উজ্জ্বল শির, বৃহৎ পুচ্ছ, যে লোকের চক্ষে না পড়া অসম্ভব। তাহা হইলে কিরূপে সম্ভব হয় যে ১৮৪৩ অব্দের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবির্ভাব কালে অথবা তাহার পরে ১৭৫ বৎসরের মধ্যে তাহা লোকের দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই?

এ আপত্তি গুরুতর বটে কিন্তু এদিকে ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে এই তিনটি ধূমকেতু একই পদার্থ না হউক আকাশের একই পথে ভ্রমণ করিতেছে, নিদান সূর্য্যের সন্নিধানে তাহারা যে পথে চলিতেছে তাহা একই—ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত হইতেছে? Proctor সাহেব বলেন যে নিম্নলিখিত দুইটির অন্যতর সিদ্ধান্ত অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে।

প্রথম এই, ১৮৪৩এর ধূমকেতু যে পথ দিয়া চলিতেছে অন্য একটা কিম্বা হয়ত অন্য কতকগুলি ধূমকেতু সেই পথ দিয়া ভ্রমণ করে।

দ্বিতীয় এই, যে এ ধূমকেতু একই কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহার প্রদক্ষিণ কাল সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম অনুমানটি তাদৃশ সম্ভবপর বোধ হয় না। ইহা দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ধূমকেতুর পথে উল্কাপিণ্ডরাশি চলিয়া যায়। তাহা হইতে অনুমান হয় যে প্রত্যেক ধূমকেতুর পশ্চাতে উল্কা অনুচর বর্গ ভ্রমণ করে। কিন্তু উল্কাপিণ্ডের অবয়ব অন্যরূপ, ধূমকেতুর সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। দেখিতে তাহা মেঘরূপী—উল্কারাশি কখন শিরঃপুচ্ছযুক্ত ধূমকেতুর আকার ধারণ করে না। তবে কি একটি কিম্বা একাধিক ধূমকেতু আর একটীর পশ্চাৎ সমান পথে ভ্রমণ করিতেছে? এরূপ কখন দেখা যায় নাই আর সম্ভবও বোধ হয় না। দ্বিতীয় অনুমানটিই অধিক সম্ভবনীয়, অর্থাৎ উক্ত দুই ধূমকেতু বাস্তবিক ভিন্ন নহে কিন্তু একই পদার্থ। তাহার প্রদক্ষিণ কাল পূর্ব্বে যত দীর্ঘ

ছিল এক্ষণে কমিয়া ৩৭ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে পরে পরে আরো কমিয়া যাইতে পারে। এমন কি হইতে পারে না যে কোন কারণ বশতঃ উহার প্রদক্ষিণ কাল সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে? এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। Encke's Comet নামে যে ধূমকেতু দৃষ্ট হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া Encke সাহেব অনুমান করেন যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তাহার কালের হ্রাস হইয়াছে ও তাহার গতিতে কোন বাধা পাইয়া এইরূপ হইয়া থাকিবে স্থির করেন। যদি ইহা সত্য হয় যে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল তাহাই ১৮৪৩ ও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া উদয় হইয়াছে তবে তাহার কালের ব্যবধান ১৭৫ বৎসর হইতে ৩৭ বৎসরে পরিণত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী Marth সাহেব ১৮৮০ শতাব্দীতে লিখিতেছেন।

"যদি মনে করা যায় ১৮৪৩ এর ধূমকেতু আর ১৬৬৮ এর ধূমকেতু একই পদার্থ তাহা হইলে ১৭৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে যে ৩৭ বৎসরে তাহার পুনঃপ্রকাশ হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। আকাশ পথে কোন বাধা পাইয়া তাহার গতির বেগ যেমন কমিয়া যাইতে পারে তাহার প্রদক্ষিণ কালও সেইরূপ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। ইহা কিছু অসম্ভব নহে যে সূর্য্যের কিরণমুকুটের (Corona) মধ্য দিয়া ধূমকেতু ধাবমান হইবার সময় বাধা পাইয়া তাহার গতির ব্যত্যয় ঘটিবে। আমি ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য দেখি না যে এই ত্রিকালো-দিত ধূমকেতু একই পদার্থ, ইহার প্রদক্ষিণ কাল ক্রমিক কমিয়া আসিতেছে হয়ত ১৭ বৎসর পরে ইহা পুনরায় আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইবে।"

এ অনুমান যদি সত্য হয় ত দেখ ইহার ফল কি দাঁড়ায়। ঐ ধূমকেতু সূর্য্যের কিরণমণ্ডলীর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যদি ইহার মধ্যেই এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে যে উহার প্রদক্ষিণ কাল কমিয়া আসিতেছে, তবে উহার পুনঃ পুনঃ পরাবৃত্তির পর কি এরূপ হইতে পারে না যে সূর্য্যমণ্ডলীর মধ্যে সে একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে? দুই একবার পরেই সূর্য্য তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইবে? উপরে যে Newton's Comet-এর কথা উল্লিখিত হইয়াছে (যাহা ১৬৮০ শতাব্দীতে উদয় হইয়াছিল) তদ্বিষয়ে Sir Isaac Newton অনুমান করেন যে তাহা হয়ত সূর্য্যের উপর পতিত হইয়া পৃথিবীর সমূহ অনিষ্ট সাধন করিবে। তাহা সূর্য্যের নিকটে উপনীত হইয়া এত প্রচণ্ড উত্তাপ ভোগ করিয়াছিল যে, সে উত্তাপ দগ্ধলৌহনিঃসৃত অনল অপেক্ষা প্রায় দুই হাজার গুণ অধিক। চার দিন সে সূর্য্য কিরণে প্রচ্ছন্ন ছিল। Newton তখন ইহাই ভাবিয়া থাকিবেন যে, সূর্য্যের চুলায় এতটা ইন্ধন গিয়া পড়িলে কত না প্রাকৃতিক বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এই তাঁহার ভয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ধূমকেতুর শিরোদেহ সূর্য্যে পড়িয়া ভস্ম হইলে যে বিশেষ ক্ষতি হয়

তাহা নহে। কিন্তু ঐ দ্রুতগামী পিণ্ডের গতিবেগ-জনিত উত্তাপই প্রকৃত ভয়ের কারণ। ঐ ধূমকেতুর প্রদক্ষিণ কাল যদি ৩৭ বৎসর মনে করা যায় তবে সূর্য্যের সন্নিকর্ষ লাভ করিলে তাহার শরীরের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ মাইল অপেক্ষা অধিক হইবে। আমারা ইহাও দেখিতেছি ধূমকেতুর পশ্চাতে কত রাশি রাশি উল্কাপিণ্ড ধাবমান হয়। ১৮৬৬, ধূমকেতু যাহার নাম Tempel's Comet, যাহা এত অস্পষ্ট যে দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় নাই, তাহার পিছনেই কত কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড ধাবিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। আর আমাদের এই পৃথিবী যখন সেই উল্কা রাজ্যের মধ্যদিয়া গমন করে তখন সে উল্কার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৯ মাইল বই নয় তথাপি সেই উল্কা উজ্বল বাষ্পের আকারে পৃথিবীর উপর পতিত হয়। এখন যদি মনে কর যে যে সকল উল্কাতে ১৮৪৩-এর ধূমকেতুর শরীর ও মস্তক সংগঠিত তাহার প্রত্যেক উল্কা কি প্রকাণ্ড, আর সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবার সময় তাহার বেগ, আমাদের উপর যে বেগে উল্কাপাত হয় তদপেক্ষা, কতগুণ অধিক তখন Newton যে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ছিলেন তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। Proctor সাহেবের মতে কোন কোন তারকের জ্যোতি কখন কখন যে তাহার স্বাভাবিক জ্যোতি অপেক্ষা সমধিক উজ্বল প্রতীয়মান হয়, কোন বৃহৎ ধূমকেতু ও তদীয় উল্কা অনুচর বর্গের সংস্রবই তাহার কারণ। Northern Crown নামে যে তারা পুঞ্জ আছে তাহার একটী তারা যেমন একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ১৮৮০র ধূমকেতুও সূর্য্যর মধ্যে পতিত হইয়া সেইরূপ তাহাকে প্রজ্বলিত করিয়া দিবে। যদি কখন পৃথিবীর প্রলয় কাল উপস্থিত হয় তবে তাহা এইরূপ কোন ধূমকেতু প্রপাতে হইবে। তবে এরূপ প্রপাতের সম্ভাবনা আছে কি না তাহা কে জানে? পৃথিবীর উপর কোন ধূমকেতু আসিয়া পড়িলে তাহাতে যে বিস্তর হানির সম্ভাবনা আছে তাহা নহে। কেন না সূর্য্য হইতে পৃথিবী যতদূর ততদূরে ধূমকেতু-শরীরস্থ উল্কাপিণ্ডের বেগ এত প্রচণ্ড হইতে পারে না যে তাহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট আশঙ্কিত হয়। পৃথিবীর উপর উল্কাবর্ষণ যদি অত্যন্ত প্রবল ও ঘন হয় আর তাহার এক একটী উল্কা যদি এত বৃহৎকায় হয় যে বায়ু-আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের উপর আসিয়া পড়ে, তবে সে বর্ষণে না হয় কতকগুলি প্রাণী বিনষ্ট হইতে পারে, না হয় শত শত কিম্বা সহস্র সহস্র জীব বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু তাহাতে বিস্তীর্ণ প্রাণী রাজ্যের বিনাশের আশঙ্কা করা যায় না। পরন্তু সূর্য্যের উপর কোন বৃহৎ ধূমকেতু পতিত হইলে তাহার ফল বাস্তবিক ভয়ঙ্কর। ধূমকেতুর শরীরস্থ অসংখ্য অসংখ্য উল্কাপিণ্ড প্রভুত বেগে সূর্য্যের উপর গিয়া পড়িলে যে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হয় তাহা কল্পনা করিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাহার ফল অধিককালস্থায়ী না হইতে পারে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হইলেও আমাদের নিপাত। কয়েক সপ্তাহ—সপ্তাহ কেন কয়েক দিবস মাত্র সূর্য্য এক্ষনকার অপেক্ষা প্রচুর তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার প্রখর করজাল বিস্তার করুক, পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু ধ্বংসের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। Northern crown তারাবলীর একটী তারকে এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়াছিল। উহা একটী নবমশ্রেণীর তারক বৈ নয় কিন্তু দুই একদিবস উহা অত্যুজ্বল প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিল। ক্রমে তাহার জ্যোতি ম্লান হইল—তাহার আগুণ নিবিয়া গেল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আবার সে তাহার পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। কিন্তু যদি সেই দূর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে কোন গ্রহ ভ্রমণ করে আর সেই সূর্য্যের স্বাভাবিক আলোক ও উত্তাপে সেই গ্রহবাসী জীবগণের আবশ্যক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হয় তাহা হইলে ১৬বৎসর পূর্ব্বে সেই তারকার উপর যে অপরিমিত আলোক ও উত্তাপ বর্ষণ হইয়াছিল তাহাতে সেই সকল জীব বিনষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহ যে যদি কখন কোন এক বৃহৎ ধূমকেতু সূর্য্যের উপর পতিত হইয়া তাহার উল্কারাশির প্রবল প্রপাতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ বিরুদ্ধ করে তবে তাহা পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর, নিদান উচ্চশ্রেণী সমস্ত জীবজন্তু উদ্ভিদের প্রলয়সাধন করিবে। আর যদিও এইরূপ বিপ্লবের পর অল্প দিনের মধ্যেই সূর্য্যের অপরিমিত তেজ ও প্রতাপ হ্রাস হইয়া আবার সে তাহার স্বাভাবিক পূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করে তথাপি তখন তাহার কিরণজাল যে সকল গ্রহের উপর পতিত হইবে তাহাতে উচ্চ জাতীয় উদ্ভিজ্জের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকিবে না। সূর্য্য তখন আমাদের পৃথিবী পানে চাহিয়া দেখিবে তাহা হইতে জীবন ও সুখের রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কি যেন একটা মর্ম্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী, চরাচরগ্রাসী, শুষ্ক, সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারি একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে! বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ সময়ে বিভার

কাছে কেহ নাই! বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া বিভা কাঁদিয়া বিভা আকুল হইয়া কহিল, "আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি?" কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, "আমি কি অপরাধ করিয়াছি?" দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, বালিশ বুকে লইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার করিয়া কহিল "আমি কি করিয়াছি?" "একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারো মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না! আমি কি করিব? বুক ফাটিয়া, ছট্ ফট্ করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারো মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না! মা গো মা, দিন কি করিয়া কাটিবে!" এমন কত দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে, কত অপরাহ্নে, কত রাত্রে সঙ্গীহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়!

এমন সময়ে এক দিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া "মা গো, জয় হোক্" বলিয়া প্রণাম করিল। বিভা এমনি চমকিয়া উঠিল, যেন তাহার মাথায় একটা সুখের বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল, "মোহন, তুই এলি!"

"হাঁ মা, দেখিলাম, মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি!"

বিভা কত কি জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল, কিন্তু লজ্জায় পারিল না—বলে বলে করিয়া হইয়া উঠিল না—অথচ শুনিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া রহিল!

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন মা, তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন? তোমার চোখে কালী পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই!"

বিভা ম্লান হাসি হাসিল; কিছু কহিল না! হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্লাবিত করিয়া জল পড়িতে লাগিল—অশ্রু আর থামে না! বহু দিন অনাদরের পর একটু আদর পাইলে যে অভিমান উথলিয়া উঠে, বিভা সেই অতি কোমল, মৃদু, অনন্তপ্রীতিপূর্ণ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, "এত দিন পরে কি আমাকে মনে পড়িল?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল—"একি অলক্ষণ! মালক্ষ্মী, তুমি হাসি মুখে আমাদের ঘরে এস। আজ শুভ দিনে চোখের জল মোছ!"

মহিষীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে। রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাই বাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে রামমোহনকে আহার করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন কাটিল। কাল যাত্রার দিন ভাল; কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল। প্রতাপাদিত্য এ বিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না!

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বসিয়া কি একটা ভাবিতেছিলেন। বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈর্ষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, "বিভা, তবে তুই চলিলি? তা' ভালই হইল! তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্ব্বাদ করি—লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক্!"

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল! উদয়াদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল;—বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন,—"কেন কাঁদিতেছিস্? এখানে তোর কি সুখ ছিল বিভা? চারিদিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি—তুই বাঁচিলি!"

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, "যাইতেছিস্? তবে আয়। স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে যেন ভুলিয়া যাস্নে। এক এক বার মনে করিস্, মাঝে মাঝে যেন সংবাদ পাই।"

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল "এখন আমি যাইতে পারিব না!"

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল "সে কি কথা মা?"

বিভা কহিল "না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট—এত দুঃখ, আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব? যত দিন তাঁহার মনে তিল মাত্র কষ্ট থাকিবে, তত দিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। এখানে আমার মত তাঁহাকে কে যত্ন করিবে?" বলিয়া বিভা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; তাহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন; বিভা কেবল কহিল—"না মা, আমি পারিব না!"

মহিষী রোষে বিরক্তিতে কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন মেয়েও ত কোথাও দেখি নাই!" তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। মহারাজ প্রশান্ত ভাবে কহিলেন, "তা' বেশ ত, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় ত কেন যাইবে?"

মহিষী অবাক্ হইয়া, হাত উল্টাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—"তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাই কর, আমি আর কিছুতে থাকিব না।"

উদয়াদিত্য সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন; বিভা চুপ

করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভাল বুঝিল না!

হতাশ্বাস রামমোহন আসিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কি বলিব ?'

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল, "তবে বিদায় হই মা!" বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতরস্বরে ডাকিল "মোহন!"

মোহন ফিরিয়া আসিয়া কহিল,"কি মা!"

বিভা কহিল 'মহারাজকে বলিও, আমাকে যেন মার্জ্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট!" রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল 'যে আজ্ঞা!"

রামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একেত বিভার প্রাণ যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না;—তাহার উপর, রামমোহন, যাহাকে সে যথার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষাণ ভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। ম্লান, শীর্ণ একখানি ছায়ার মত সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া, আদর করিয়া কোন কথা কহিলে চোখ নীচু করিয়া একটু খানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে। যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে, ও অবশেষে একখণ্ড মলিন মেঘের মত ভাসিয়া চলিয়া যায়। যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে, "বিভা, তুই এত রোগা হইতেছিস্ কেন" বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্ব্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়। প্রথম দেখিবামাত্র প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া উঠিলেন—পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, যুবরাজ যে একাজ করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।" যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, "ওকথা কানে আনিতে নাই। যুবরাজ একাজ করিবেন ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে।" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমারো ত বড় একটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কি? সেখানে কোন প্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে তাহার জন্য পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।"

উদয়াদিত্য যখন কারাবাসের আদেশ

শুনিতে পাইলেন, তখন কিছু বলিলেন না। তাহার পরে বিভাকে কাছে আসিতে দেখিয়া একেবারে বলিয়া উঠিলেন, "বিভা, আমি কি করিয়াছি? কেন আমার উপরে এ অত্যাচার। আমিত আর কিছুতে লিপ্ত থাকি নাই, আমি আপনার মনে থাকি, তবে আর কেন এ দুঃখের উপরে দুঃখ, অশান্তির উপরে অশান্তি! কবে আমি বিশ্রাম পাইব?" বলিয়া সাশ্রুনেত্রে গাহিতে লাগিলেন,

"মা আমি তোর কি করেছি?
শুধু তোরে জন্ম-ভোরে মা বলেরে ডেকেছি!
চির জীবন পাষাণীরে, ভাসালি আঁখিনীরে,
চির জীবন দুঃখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে, চাহিলাম তোর
কোলে যেতে
সন্তানেরে কোলে তুলে নিলিনে,
মা-হারা সন্তানের মত কেঁদে বেড়াই অবিরত
এ চোখের জল মুছায়েত দিলিনে!
ছেলের প্রাণে ব্যথা দিয়ে, যদি মা তোর
জুড়ায় হিয়ে,
ভাল ভাল তাই তবে হোক্—অনেক দুঃখ
সয়েছি।"

গাহিতে গাহিতে উদয়াদিত্যের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য কেবলি গাহিতে লাগিলেন,—দুই ভাইবোনে একত্র বসিয়া একত্র মিলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কারাগারে যাইতে হইবে বলিয়া যে উদয়াদিত্যের দুঃখ, তাহা নহে, তাঁহার গৃহে আর কারাগারে প্রভেদ কি? তিনি দেখিতেছেন, কোথাও তাঁহার একটা স্থিতি নাই শান্তি নাই। তিনি কিছুই করেন নাই, তিনি কিছুতেই লিপ্ত থাকেন নাই, তিনি আপনাকে জগৎ সংসারের পরিত্যক্ত মনে করিয়া সংসার হইতে দূরে আছেন, তবু কেন তিনি ক্রমাগতই দুর্ঘটনার আবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন? যে মাটির পরে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন তাহারি উপর হইতে তাঁহার বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, তিনি দেখিতেছেন তাহা চোরা বালি, তাহার উপরে একটা চিরস্থায়ী কুটীর বাঁধিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দুঃখের কোলেও আরাম পাওয়া যায়, যদি জানি সেই খানেই আমার স্থিতি, তাহাই আমার চরম, তাহাই আমার পরিণাম। আর কিছু নহে, উদয়াদিত্য কোথাও একটা ঠিকানা পাইতেছেন না। খৃষ্টান নরকের অনন্ত অগ্নিদাহ, নরক রাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সেও বোধ করি ভাল, কিন্তু হিন্দু পাপী দিগের কোটি কোটি পশু-জন্ম পরিভ্রমণের সুদীর্ঘ অশান্তি, সে বোধ করি, আরো নিদারুণ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন রামমোহন চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া একাকী যোড়হস্তে অপরাধীর মত রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, বিভা আসিলে-পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশসম্বন্ধে খুব দুচারিটা খরধার কথা শুনাইয়া

তাঁহার শ্বশুরের উপর শোধ তুলিবেন। কি কি কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন্ বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্ররায় গোঁয়ার নহেন, বিভাকে যে কোন প্রকারে পীড়ন করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিলনা। কেবল, বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন কি, এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে। এমন সময়ে রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্ররায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কি হইল, রামমোহন ?"

রামমোহন কহিল, "সকলি নিষ্ফল হইয়াছে!"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আনিতে পারিলি নে!"

রামমোহন—"আজ্ঞা,—না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম!"

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "বেটা, তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল! তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর, আজ—"

রামমোহন কপালে হাত দিয়া ম্লান মুখে কহিল, "মহারাজ, আমারি অদৃষ্টের দোষ!"

রামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না! এত বড় অপমান আমাদের বংশে আর কখন হয় নাই।"

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে কহিল "ও কথা বলিবেন না! প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম! আপনার কাছে তাহাত বলিয়াই গিয়াছিলাম। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা ত সে নয়!"

রাজা কহিলেন, "তবে হইল না কেন?"

রামমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জলের রেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, শীঘ্র বল্!"

রামমোহন যোড় হাতে কহিল—"মহারাজ"—

রাজা কহিলেন—"কি, বল্!"

রামমোহন—"মহারাজ, মাঠাকরুণ আসিতে চাহিলেন না!" বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সন্তানের অভিমানের অশ্রু! বোধ করি এ অশ্রু জলের অর্থ—"মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া, আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম, আর মা আসিলেন না, মা আমার সম্মান রাখিলেন না।" কি জানি কি মনে করিয়া বৃদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোক পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে—!" অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না!

"আসিতে চাহিলেন না বটে! বেটা, তুই বেরো, বেরো, আমার সুমুখ হইতে এখনি বেরো!"

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারি সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অন্যায় নহে।

রাজা কি করিয়া যে ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতের কাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না হইলে আর মুখরক্ষা হয় না। এমন কি, প্রজারা পর্য্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা কহিল "আমাদের মহারাজার অপমান!" অপমানটা যেন সকলেরই গায়ে লাগিয়াছে! একেত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান আছে, তাহার উপরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না লইলে প্রজারা কি মনে করিবে। ভৃত্যেরা কি মনে করিবে! রমাই ভাঁড় কি মনে করিবে। তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই কথা লইয়া রমাই আর এক জন ব্যক্তির কাছে হাসি টিট্‌কারী করিতেছে, তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

একদিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, "মহারাজ, আপনি আর একটি বিবাহ করুণ!"

রমাই ভাঁড় কহিল, "আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক!"

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন "ঠিক বলিয়াছ রমাই!"

রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল ফর্ণাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মত লোকেরা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সততই ব্যস্ত, কিন্তু সম্ভ্রম কাহাকে বলে ও কি করিয়া সম্ভ্রম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, "মন্ত্রী মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও তাঁহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

রমাই ভাঁড় কহিল—"এ শুভকার্য্যে আপনার বর্ত্তমান শ্বশুর মহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কি জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন!" বলিয়া রমাই চোক টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল; যাহারা দূরে বসিয়া ছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, "বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শ্বাশুড়িঠাকরুণকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন, তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠাইয়া দিবেন!"

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখে চাদর দিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল। ফর্ণাণ্ডিজ্ অলক্ষিত ভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "মিষ্টান্নমিতরে-জনাঃ, যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে, তাহা হইলে ত যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না!"

কথাটা শুনিয়া কাহারো হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাক্ হইয়া চাহিল, এমন কি, একজন অমাত্য বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি কথা দেওয়ানজি মশায়? রাজার বিবাহে মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কি এতই কম হইবে?" দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত কারাগার নহে। তাহা প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটির ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ, ও তাহার পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানলা কাটা। তাহার মধ্য-দিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড়, ও একটি শিব-মন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জানলার কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দৈবাৎ দুই এক জন পথিক চলিতেছে, ছপ্ ছপ্ করিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূর্ব্বদিক হইতে, কারাগারের হৃৎ-স্পন্দন ধ্বনির মত প্রহরীদের পদশব্দ অনবরত কানে আসিতেছে। এক এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক একটা হাঁক শুনা যাইতেছে। আকাশে একটি মাত্র তারা নাই, যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন, তাহা জোনাকীতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে রাত্রে উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন না, জানলার কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে, বোধ করি, অনেক লোক; চারিদিকে দাস দাসী,

চারিদিকেই পিসি মাসী, কথায় কথায় "কি হইয়াছে, কি বৃত্তান্ত" জিজ্ঞাসা করে, প্রতি অশ্রু বিন্দুর হিসাব দিতে হয়, প্রতি দীর্ঘ নিশ্বাসের বিস্তৃত ভাষ্য ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই, ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূর্য্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল। কখন্ যে দিনের অবসান হইল, ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোনার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। মেঘের উপর মেঘ জমিতে লাগিল, আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘন-শ্রেণী ঝাউগাছ গুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল, যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজ বাড়ির প্রদীপ একে একে নিভিয়া গেল। বিভা ঝাউগাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীরু, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল, যতই আঁধার বাড়িতেছে, ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে; যেন সুখ হইতে, শান্তি হইতে, জগৎসংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে; ক্রমেই ডুবিতেছে ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই, চারিদিকে কিছুই নাই, আশ্রয়, উপকূল, জগৎসংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন, একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপারে কতকি পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারের সকলি দেখা যাইতেছে, সেখানকার সূর্য্যালোক, খেলাধূলা, উৎসব সকলি দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুর ভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সেদিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্য চক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘন ঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎসংসারে একাকী বসিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই, দেহ নিস্পন্দ, নেত্র নির্ণিমেষ। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল; অন্ধকারে গাছপালাগুলা হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতিদূরে হূ—হূ করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল যেন দূর—দূর—দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের, স্নেহের, প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা

বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সমুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না; যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন, লক্ষ যোজন গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল। বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, "কেরে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস্, তোরা কোথায়!" বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকিনী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কেবল সেই বায়ুহীন, শব্দহীন দিনরাত্রিহীন, জনশূন্য তারা শূন্য দিক্‌দিগন্তশূন্য মহান্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারিদিক হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল; কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল হু- হু!

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পর দিন বিভা কারাগারে উদয়াদিত্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত দিন ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল। এমন কি, স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। বিভার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল। পর দিন প্রভাত হইতে-না-হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া, বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া বিভার প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। অনেক কষ্টে রোদন সম্বরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখীরা গাহিয়া উঠিল। পাশের রাজপথ হইতে পান্থেরা গান গাহিয়া উঠিল। দুই একটি রাত্রি-জাগরণে-ক্লান্ত প্রহরী আলো দেখিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির হইতে শাঁক ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উদয়াদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "এ কি বিভা, এত সকালে যে?" ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—"এ কি—আমি কোথায়?" মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে পড়িল, তিনি কোথায়। বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "আঃ—বিভা, তুই আসিয়াছিস্? কাল তোকে সমস্ত দিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল, বুঝি তোদের আর দেখিতে পাইব না।"

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "দাদা, মাটিতে বসিয়া কেন? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারো তুমি খাটে বস' নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ?" বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "খাটে বসিলে আমি যে, আকাশ দেখিতে পাই না বিভা। জানলার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখীদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারো একদিন

খাঁচা ভাঙ্গিবে, আমিও একদিন ঐ পাখীদের মত ঐ অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানলা হইতে যখন সরিয়া যাই, যখন চারিদিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে, মনে হয় না যে জীবনের বেড়ী একদিন ভাঙ্গিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে একদিন খালাস পাইব। বিভা, এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে, যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে, আমি স্বভাবতই স্বাধীন, কোন রাজা মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ঐ খানে ঐ ঘরের মধ্যে ঐ কোমল দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা, ঐ খানেই আমার কারাগার।"

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। কাল সমস্ত দিন বিভাকে দেখিতে পান নাই, মনে করিয়াছিলেন, যে এক বিন্দু সুখ সংসারে অবশিষ্ট ছিল, যে এক বিন্দু আলো মাঝে মাঝে চোখে পড়িত, তাহাও বুঝি কারাগারের বাহিরে ফেলিয়া আসিলেন! উদয়াদিত্যের হৃদয় অনন্ত প্রীতি পূর্ণ, তিনি ভালবাসিতে চান, ভালবাসা চান, তাঁহার হৃদয় পরের হৃদয়ের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল; তিনি হৃদয়-হীন জীবিত মৃৎপিণ্ডের মত কেবল মাত্র ক্ষুদ্র আপনাকে লইয়াই বাঁচিত পারেন না; ভাল বাসিবার নিমিত্ত, ভালবাসা পাইবার নিমিত্ত আর কেহ যদি না থাকে তবে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যায়, তাঁহার মহৎহৃদয়ের একটা কোন অর্থ থাকে না। তিনি আলোক হারাইতে পারেন, স্বাধীনতা হারাইতে পারেন, কিন্তু স্নেহ হারাইয়া প্রীতি হারাইয়া বাঁচিতে পারেন না। বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদায় দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল। সে দিন তিনি বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন, যে, কারা প্রবেশের পূর্ব্বে বোধ করি এত কথা কখন বলেন নাই। বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল। জানিনা, এক প্রাণ হইতে আর এক প্রাণে কি করিয়া বার্ত্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে' আর এক প্রাণে কি নিয়মে তরঙ্গ উঠে। বিভার হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের উদ্দেশ্য আজ সফল হইল। বিভা, সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল। হৃদয়ে সে বল পাইল। এত দিন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিত, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিব। আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এত দিনকার সমস্ত শ্রান্তি একেবারে ভুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মত অশ্রুজল দেখা দিল,

আজ তাহার অধরে অরুণ কিরণের মত নির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনি প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া গিয়া তখনি বিভার বিমল মূর্ত্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদয় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত। একটি টিয়াপাখী আনিয়া ঘরে টাঙ্গাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত। ঘরে একটি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতরে একটি কষ্ট জাগিয়া আছে। প্রতিদিন, বিভার প্রতি যতই তাঁহার নির্ভরের ভাব বাড়িতেছে, তাঁহার মনের মধ্যে ততই একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছে। তিনি জানেন, তাঁহার সঙ্গে যাহারই কোন সম্বন্ধ হয়, তাহারই যেন একটা অমঙ্গল ঘটে। এই জন্য বিভাকে ভাল করিয়া ভাল বাসিতেও তাঁহার যেন ভয় করে। যেমন সংক্রামকরোগগ্রস্ত ব্যক্তি স্নেহের মুখ না দেখিয়া সুশ্রূষা না পাইয়া, একাকী পড়িয়া বরঞ্চ মরিয়া যাইতেও পারে, তবু প্রিয়জনদিগকে কাছে বসিতে বলিতে পারে না—তেমনি উদয়াদিত্য যদিও বিভাকে কাছে না পাইলে থাকিতে পারেন না, তবুও কাছে রাখিবেন কি বলিয়া? তিনি জানেন, বিভা শ্বশুরালয়ে না গেলে সুখী হইতে পারিবে না, তবু তাহাকে কোন্ প্রাণে তিনি এই কারাগারের অন্ধকারে শোক দুঃখের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন? তিনি ত ডুবিতেই বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ-সুখ, অতৃপ্ত-আশা সুকুমার বিভাকে আশ্রয় স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া, তাহাকে পর্য্যন্ত ডুবাইতেছেন? প্রতিদিন মনে করেন, বিভাকে বলিবেন "তুই যা;" কিন্তু বিভা যখন উষার বাতাস লইয়া, উষার আলোক লইয়া, তরণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহেরধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোন মতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, "বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস্ না, তোকে আর দেখিব না।" প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব। কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না! অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, "বিভা, তুই আর এখানে থাকিস্‌নে। তুই না গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে। বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারিদিক হইতে দেশের

বিপদ ছুটিয়া আসে। তুই শ্বশুর বাড়ি যা'। মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি সুখে থাকিব। আমার জন্য তুই কেন অসুখী হইবি?"

বিভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিল, "দাদা, তুমি কি মনে কর, তোমাকে এই কারাগারের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া আমি স্বর্গে গিয়াও সুখী হইব? তুমি আমার জন্য কি না করিয়াছ, কত না সহিয়াছ, প্রাণ দিয়াও তোমার সেই অসীম স্নেহের ঋণ শুধিতে পারিব না। দাদা, আমাকে ওকথা আর বলিও না, আমি আর সুখভোগ করিতে পারিবও না, আমার আর সুখভোগ করিবার ইচ্ছাও নাই।" বলিতে বলিতে বিভা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আসিল।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, "আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না। কি করিয়া মুক্ত হইতে পারিব!"

ইবন বতোতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

"His Travels' contain very valuable accounts of India."

Lethbridge.

সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর সেখ আবু আব্দ আল্লা এল লাবাতি (সঙ্কীর্ণ নাম ইবন বতোতা) বতোয়া বা বতোতিয়া জিব্রাল্টার প্রণালী তীরস্থ টেঞ্জিয়ার নগরে শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবিত পীর ও লোকান্তরগত পীরগণের সমাধি ক্ষেত্র দর্শনাভিলাষে তিনি ১২৪৬ শকাব্দে (৭২৫ হিঃ অঃ) জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইবন বতোতা প্রথমে আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে উপনীত হইয়া পীর ইমাম বোরাহেনদ্দিন এল আরজের সহিত সাক্ষাত করেন। অন্যান্য আলাপের পর ইমাম ইবনকে বলিলেন "আপনাকে অত্যন্ত দেশ-ভ্রমণপ্রিয় দেখিতেছি; বোধ হয় আপনি বহুদূর গমন করিবেন, অতএব আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আমার ভ্রাতা—ভারতবর্ষে ফরিদউদ্দিন, সিন্ধুদেশে রোকনউদ্দিন ও

চীন দেশে বোরাহেন উদ্দিনের সহিত সাক্ষাত করিয়া, তাঁহাদিগকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন।" পীরের বাক্য শ্রবণে ইবন নিরতিশয় বিস্মিত ও উৎসাহিত হইলেন; তাঁহার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল।

ইবন তথা হইতে নীলবক্ষঃস্থিত মৈসর বদ্বীপ দর্শনার্থ গমন করেন। তিনি অনেকানেক নগরী দর্শন করিয়া কাইরোতে উপনীত হন। পরিব্রাজক ভুবনমোহন মিসরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে নীল নদের জলও তাহার নিকট অত্যন্ত সুস্বাদ বোধ হইয়াছিল। তিনি বলেন নীল জগতের প্রধান পঞ্চনদের অন্যতম। সেই প্রধান পঞ্চনদের নাম টিগ্রিস, ইউফ্রেটিস, নীল, সিহুন (সিন্ধু), জিহুন ও গিহুল (যমুনা ও গঙ্গা)। ইহার পরেই তিনি আথিল (বলগা) ও তাতার বিধৌতকারী সারুনদীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইবন মিসরের মধ্যদিয়া নিউবিয়ার প্রান্তে উপনীত হন। কিন্তু নিউবিয়াবাসীগণের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন। গাজায় উপনীত হইয়া ইবন এব্রাহিম, আইজেক, জ্যাকুব ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের সমাধিমন্দিরগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে নীরবেষ্টিত উপদ্বীপ সদৃশ টায়ার নগরী দর্শন করিয়া তাব্রিজে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি কএকটী উষ্ণপ্রস্রবণ ও প্রাচীন মন্দিরের রাশীকৃত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি আসাসিনীর দুর্গ মধ্য দিয়া লিবনাস পর্ব্বতে গমন করেন; ইবন লিবনাস পর্ব্বতের অতুল সৌন্দর্য্য যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাহাকে প্রকৃতি দেবীর স্বহস্ত-নির্ম্মিত উদ্যান বলিয়া বোধ হয়। ক্ষীণকায় স্বচ্ছসলিলা গিরিনন্দিনীকলাপ মৃদু কলকল নাদে প্রবাহিত হইয়াছে, ফল পুষ্প সুশোভিত তরুলতা অতুল সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। কুসুমসৌরভে পর্ব্বত আমোদিত রহিয়াছে। সংসারবিরাগী যোগী ঋষিগণ নির্ঝরিণীতটে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুখে বাস করিতেছেন।

তথা হইতে পরিব্রাজক বাল'বাক্ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ দামস্কাস নগরে গমন করেন। তিনি এই দুই নগর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখেন নাই। কিন্তু তিনি একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন, যথা—দামস্কাস নগরের বহির্দ্দেশে "পদ মন্দির" বিরাজিত রহিয়াছে। সেই মন্দিরে মুসার পদলাঞ্ছিত এক খণ্ড প্রস্তর সংস্থাপিত হইয়াছে। (১) নগরবাসিগণ দৈবদুর্ব্বিপাকে

(১) ঐতিহাসিক কুলচূড়ামণি হিরোদতস টায়রাস নদীসৈকতে এবম্প্রকার একখণ্ড পদচিহ্নলাঞ্ছিত প্রস্তর প্রাপ্ত হন। তিনি তাহাকে হারকিউলিসের পদাচহ্ন লিখিয়াছেন। সিংহলদ্বীপস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গে একখণ্ড পদাঙ্কিত প্রস্তর আছে। তাহাকে হিন্দুগণ মাহাদেবের, বৌদ্ধগণ শাক্য সিংহের, মুসলমানগণ "বাবাআদমের" পদচিহ্ন বলিয়া থাকেন। গয়াক্ষেত্রে নারায়ণের পদচিহ্ন বোধ হয় আমাদের পাঠকবর্গমধ্যেই অনেকেই দেখিয়াছেন। যবদ্বীপেও পদচিহ্নসুশোভিত প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল পদাঙ্কিত প্রস্তর যে বহু প্রাচীন তৎপক্ষে সন্দেহ হইতে পারেনা, কিন্তু এসকলের সৃষ্টি প্রকরণ আমরা অবগত নহি।

পতিত হইলে তথায় যাইয়া সেই পদচিহ্নের উপাসনা করে। তাহাতেই তাহারা বিপন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১২৬৭ শকাব্দে (৭৪৬ হিঃ অঃ) দামস্কাসে মহামারী উপস্থিত হয়। তদ্দ্বারা দৈনিক অন্যূন দুই সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত, ক্রমে ২৪ সহস্র লোক কালকবলিত হইলে নাগরিকগণ পদমন্দিরে উপনীত হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। উপাসনা শেষ হইতে না হইতেই মহামারী দামস্কাস হইতে পলায়ন করিল। ইবন বলেন, তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

পরিব্রাজক দামস্কাস হইতে মসেদআলী নগরে যাইয়া একটী আশ্চর্য্য পঙ্গুর মেলার বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। প্রতি বৎসর ১৭ ই রজব (প্রায় ২৩ জৈষ্ঠ) দিবসে ফার্স, রোম, খোরাশান ও ইরাক প্রভৃতি দেশ হইতে পঙ্গুগণ দলে দলে তথায় উপনীত হইয়া সমস্ত রাত্রি আলীর সমাধিক্ষেত্রে কোরাণ পাঠ করিয়া রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

ইবন মসেদআলী হইতে বসরা দর্শন করিয়া ইরাকে উপনীত হন। ইরাকের রাজসভায় আমাদের পরিব্রাজক সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। ইরাক-রাজ ইবন ও তাঁহার সহচরবর্গকে পাথেয় ব্যয় সম্বন্ধে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। তদন্তে পরিব্রাজক স্পাহান অবলোকন করিয়া সিরাজনগরে গমন করেন। "পীরচূড়ামণি অলৌকিক কার্য্যক্ষম" সেখ মগ্‌দুদ্দিনকে দর্শন করাই তাঁহার সিরাজ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য, তৎপর—ইমাম আবু আব্‌দুউল্লার সমাধি-মন্দির দর্শন করা। পরিব্রাজক ইমামের সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তৎপাঠে তাঁহাকে প্রথম মুসলমান সিংহলভ্রমণকারী লেখা যাইতে পারে।

তৎপরে পরিব্রাজক বগ্‌দাদে গমন করেন। ৬৭৭ শকাব্দে মুসলমান সাম্রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। একজন খলিফা স্পাহানে ও অন্য এক জন বগদাদ নগরে রাজপাঠ সংস্থাপন করেন। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর বগ্‌দাদ প্রাচ্য মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। আরব্যোপন্যাসের পত্রে পত্রে এই বগ্‌দাদ নগরীর সমৃদ্ধি ও মহিমা কীর্ত্তিত রহিয়াছে। মুসলমান লেখকগণ যে হারুণ অল রসিদের গুণ গান দ্বারা আপনাদের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন, সেই খলিফা কুলতিলক হারুণ অল-রসিদ শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে ত্রয়োবিংশ বৎসর বগ্‌দাদের রাজাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ যত্নে মুসলমানদিগের মধ্যে ভৈষজ্য, জ্যামিতি ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। নবরত্নপরিশোভিত বিক্রমাদিত্যের সহিত হারোন অল রসিদের তুলনা করা যাইতে পারে।

ইবন বতোতার কিছু কাল পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী সেই নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তথাপি সমৃদ্ধি দর্শনে পরিব্রাজক ইহাকে প্রথম শ্রেণীর একটী নগরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপর ইবন তেব্রিজ দর্শন করিয়া মদিনায় গমন করেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর মক্কা ও মদিনায় বাস করিয়া তীর্থ সকল দর্শন করিয়াছিলেন।

ইবন মক্কা হইতে বণিকদিগের সহিত য়িমানে গমন করেন। অন্যান্য নগরগুলি দর্শন করিয়া পরিব্রাজক এদেন হইতে আবিসিনিয়ার অন্তঃপাতী যেইলা বন্দরে উপনীত হন। তিনি বলেন এই বন্দরটী সাউদনবাসী বর্ব্বরদিগের অধিকৃত, ইহারা সফিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। উক্ত বর্ব্বরজাতি দুই মাসের পথ বিস্তৃত একটী মরুক্ষেত্রে বাস করে। এই মরু স্থান দুই অংশে বিভক্ত, প্রথম ভাগ যেইলা, দ্বিতীয় ভাগ মকদসু। পটুগিজগণ মকদসুকে "মগদোছিয়া" লিখিয়াছেন। এই বর্ব্বর জাতির প্রধান ভক্ষ্য মৎস্য ও উষ্ট্র।

তদন্তে পরিব্রাজক জঙ্গুজদিগের বাসভূমি (জঞ্জিবার) ও মামবাসা (২) দ্বীপ দর্শন পূর্ব্বক জল যানে জঙ্গুজ উপকূল ভ্রমণ করিয়া জাফর নগরে উপনীত হন। এই নগরটী জিমানের প্রান্ত ভাগে অবস্থিত। ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি জাফরের পদমূল প্রক্ষালন করিত। সেই জাফর নগর হইতে ভারতবর্ষে অশ্ব প্রেরিত হইত। তত্রত্য অধিবাসীগণ পালিত পশুদিগকেও মাংস ভোজন করাইত। তৎপর পরিব্রাজক এল আকেফ নগরী দর্শন করিয়া, আরব উপকূল দিয়া ওমানে যাত্রা করেন। গমনকালে তিনি হাসিফে এক-প্রকার সুগন্ধি তরু দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার নির্য্যাস দুগ্ধ বৎ, কিন্তু কিছুকাল রাখিলেই জমিয়া যায়, তখন তাহাকে লুবান বলে। ওমানবাসিগণ মৎস্যের হাড় দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। সেই সকল গৃহের চাল উষ্ট্র চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। পালিত গর্দ্দভের মাংসই ওমানবাসিদিগের প্রধান খাদ্য। প্রত্যেক নগরের রাজপথ-পার্শ্বে গর্দ্দভ মাংস ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

ওমানের অন্তর্গত খল্লাত (বা কলাতু) নগর হইতে সেই সময়ে ভারতে অশ্ব প্রেরিত হইত। এই নগরী সাগরতটে অবস্থিত। পরিব্রাজক বলেন এস্থানে একটী সুন্দর মসজিদ আছে, এরূপ সুশ্রী ও কারুকার্য্য-খচিত মসজিদ জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) অধিকাংশ ওমানবাসী

(২) খৃষ্টাব্দের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পটুগিজগণ মাসবাসা দ্বীপের অধিকারী ছিলেন।

৩ ইবন বতোতার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত বিনিষীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো এই নগর দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—Calatu is a great city, within a gulf which bears the name of the Gulf of Calatu. It is a noble city * * The people are Saracens, and are subject to Hormas. And whenever the Melik of Hormas is at war with some prince more potent than himself, he betakes himself to this city of Calatu, because it is very strong, both from its position and its fortifications. * * they also export many good Arab horses from this to India. For as I have told you before the number of horses exported from this and others cities to India something astonishing. (Yule's Travels of Marco Polo Vol 11.) সেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরীর বর্ত্তমান অবস্থা রোজ সাহেব লিখিয়াছেন, "Kalhat is an insignificant place, but extensive ruins are traced." (Ross Annals of Oman.)

৪ The Schismatecs alluded to by Ibn Bututa were doubtless Ibadhis then the prevailing sect in Oman.

(Ross, Annals of Oman.)

সিছমেটি সম্প্রদায়ভুক্ত (৪) ওমান ওরমাজ রাজতন্ত্রের অধীন; সুলতান ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সিছমেটিকগণ প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিত না।

পরিব্রাজক ওমান হইতে উপকূলে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ওরমাজ নগরে গমন করেন। তিনি বলেন বর্ত্তমান ওরমাজ, প্রাচীন ওরমাজ নগরের নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপ মাত্র। তত্রত্য রাজধানীর নাম "হারোয়ানা।" ডাক্তার লসনার বলেন "ওরগণা দ্বীপে প্রাচীন ওরমাজবাসীগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাকেই ওরমাজ আখ্যা দান করিয়াছিল। ওরমাজে ইবন বতোতা একটী ক্ষুদ্রপর্ব্বতসদৃশ মৎস্যমুণ্ড দর্শন করেন। তাহার অক্ষি কোটর পর্ব্বত গহ্বরের ন্যায়। মানবগণ একটী চক্ষুরন্ধ্র দ্বারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্যটীর দ্বারা নির্গত হইতে পারিত।

পরিব্রাজক ওরমাজ হইতে গমন করিয়া কিছুকাল পারস্যের অন্তর্গত ফার্স প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি পুনর্ব্বার মক্কায় গমন করেন (১২৫৪ শকাব্দ) সেস্থানে ধর্ম্মকার্য্যাদি সমাপন করিয়া জুডিয়ায় উপনীত হন। তিনি ভারত-যাত্রী অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল বায়ুতে সেই অর্ণবতরী রাস-ডওয়ার বন্দরে উপনীত হইল।

ইবন সেই বন্দর হইতে একদল "বনু-ইন" আরবের সহিত উষ্ট্র-পক্ষী ও গজেলি পরিপূর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া উপর মিসরে উপনীত হন। তথা হইতে কাইরো, সিরিয়া, জেরুজিলম ও ত্রিপলী প্রভৃতি স্থান সমূহ দর্শন করিয়া আনেটোলিয়ায় পদার্পণ করেন।

পরিব্রাজক আনেটোলিয়ার তুর্কী যুবকদিগের একটী আশ্চর্য্য গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রতি নগরে যুবকদিগের এক একটী সভা আছে, তন্মধ্যে একজন সভাপতি, তাহার উপাধি 'ভায়া,'' অন্যান্য সকলই সভ্য, তাহাদের উপাধি "যুবক''। সভ্যদিগের মধ্যে দৃঢ় একতা আছে। ইহাদের ন্যায় প্রকৃত আতিথেয় জগতে অতি বিরল।

"No people are more courteous to strangers, more readily supply them with food and other necessaries * * Should a stranger arrive among

them, they cheerfully maintain him till he leaves the country."

ইবন বতোতা যে দিবস প্রথম আনেটোলিয়ায় উপনীত হন, সেই দিবস হঠাৎ এক যুবক আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরদিগকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। দরিদ্রের ভবনে গমন করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে পবিব্রাজক ইচ্ছুক ছিলেন না. সুতরাং তিনি প্রথমত যুবকের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ তিনি "ভ্রাতৃসভার" বিবরণ অবগত হইলেন। আরও শুনিলেন, যে সভা কর্ত্তৃক তিনি আহূত হইয়াছেন, দুই শত রেশম ব্যবসায়ী ধর্মবান যুবক সেই সভার সভ্য, তখন নিমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁহার আর কোনও আপত্তি রহিল না।

পরিব্রাজক আনেটোলিয়ার অন্তর্গত নগর সমূহ দর্শন করিয়া অবশেষে আর্জরোমে গমন করেন। ইবন আর্জরোমপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। রাজা ইবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বর্গ হইতে পতিত প্রস্তর দর্শন করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন "না।" রাজা বলিলেন "আমার রাজধানীতে একবার প্রস্তর-বৃষ্টি হইয়াছিল।" এই কথা বলিয়া রাজা, পরিব্রাজককে এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল প্রস্তর দেখাইলেন।

এস্থলে আমরা আমাদের পাঠকগণকে চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব (৫) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মুসলমান লেখকগণ প্রস্তর-বৃষ্টির বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্য আফ্রিকায় একবার প্রস্তর বৃষ্টি হইয়া সেই দেশ জীবজন্তুশূন্য হইয়াছিল। তাবিরি স্থানে একবার প্রস্তরবৃষ্টি হয়; তাহার একখণ্ড প্রস্তর খলিফা মোতওয়াক্কেল নিকট অর্পিত হইলে তিনি তাহা ৮৪০ রতল (৭৮ সাতনন ত্রিশ সের) ওজন করাইয়াছিলেন।

পরিব্রাজক আনেটোলিয়ার প্রায় সমস্ত তুর্কী রাজন্যবর্গের সভায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে অথমানদিগের পরাক্রমে পৃথ্বী কম্পিত হইয়াছিল, ইবন তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লিখেন নাই। যাহা লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। ইবন বলেন "আমি অথমান জকের পুত্র একতিয়ার-উদ্দিন উরখান বেগের রাজধানী ব্রুসায় গমন করিয়াছিলাম, তাহার রাজ্যই বিস্তৃত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন। তুর্কীদিগের মধ্যে তিনিই সমধিক পরাক্রমশালী ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুর্কী সৈন্যের ধুরীণ। তিনি সর্ব্বদা স্বয়ং স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ ও দুর্গ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন স্থানেই একমাসের অধিক বাস করেন না।

পরিব্রাজক কাষ্টেমুনি হইতে কৃষ্ণ সাগর অতিক্রম করিয়া ক্রিমে উপনীত হন। তথা হইতে মহম্মদ উজবেগ খাঁর অধিকৃত এলকাফা নগরে পদার্পণ করেন। সুলতান এই সময়ে বিষুটগ (বা পঞ্চ পর্ব্বত)

৫ ভারতী, ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ফাল্গুণ, ৫১৯ পৃষ্ঠা।

নামক স্থানে স্কন্ধাবারে অবস্থান করিতেছিলেন। ইবন রাজসভায় উপস্থিত হইলে, সুলতান তাহাকে একটী মেষ, একটী অশ্ব ও এক পাত্র অশ্বদুগ্ধ দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক এই স্থানে আকাশোপরে একটী চঞ্চলনগরী দর্শন করিয়াছিলেন।

ইবন পূর্ব্বে পরিব্রাজকদিগের নিকট বলগার নগরে শীতের আধিক্য ও দিবা রাত্রির অসাম্য প্রভৃতি শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণ তিনি সুলতান উজাবগ নিকট সেইস্থান দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। সুলতান জনৈক অনুচর দ্বারা পরিব্রাজককে বলগার নগরে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গ্রীষ্ম ঋতুতে বল্‌গারে গমন করেন। সেই সময় রজনী এত ছোট ছিল, যে, তিনি সায়ং ও মধ্যাহ্ন কালে তিমিরাচ্ছন্ন দেশের বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটী বল্‌গার হইতে ৪০ দিবসের পথ। পথ-দুর্গম-বন্ধুর ও বিপদ সঙ্কুল।

বলগার হইতে তিনি পুনর্ব্বার সুলতানের সভায় গমন করেন। তৎপর সুলতানের সহিত আস্ত্র খাঁ নগরে গমন করিয়াছিলেন। সুলতান কানস্‌টাণ্টিনোপলের এক রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বেগম এই সময় পিতৃসন্দর্শনে গমন করেন। আমাদের পরিব্রাজক সুলতান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বেগমের সহিত কনেস্‌টাণ্টিনোপলে গমন করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজক একমাস ছয় দিবস কনেস্‌টাণ্টিনোপলের রাজসভায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার আস্ত্র খাঁ নগরে উপনীত হন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া তিনি তুর্কীদিগের অধিকৃত সর্ব্বপ্রধান ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগরী খোরাশ্যানে গমন করেন। খোরাশ্যান বাসীগণ ভদ্র, নম্র ও আতিথেয়। ইবন বলেন এই নগরে যে ব্যক্তি সাধারণ ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া উপাসনা না করে, ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাহাকে বেত্রাঘাত ও অর্থদণ্ড করিয়া থাকে। প্রত্যেক মসজিদে এক এক খানা বেত ঝুলান রহিয়াছে। (৬)

পরিব্রাজক খোরাশ্যান হইতে বোখারায় যাইয়া করাল কৃতান্ত সদৃশ দুরাচার জঙ্গিস খাঁর অত্যাচারের চিহ্ন কলাপ দর্শন করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি সুবিখ্যাত সমরকন্দ নগরে গমন করেন। পরিব্রাজক এস্থানে অনেকগুলি বিখ্যাত ফকিরের সমধিক্ষেত্র দর্শন করিয়াছিলেন। সমরকন্দ হইতে "জিহুন" নামক নদী পার হইয়া খোরাসানে উপনীত হন। তথা হইতে এক দিবা রাত্রি আশ্রয়হীন মরুভূমি দিয়া গমন করত বাহ্লিক নগরে উপস্থিত হইয়া তাহার সমৃদ্ধির ধ্বংশাবশেষ মাত্র দর্শন করেন। রাক্ষসবৃত্তি দুরাচার জঙ্গিস এই নগর সমূলে উৎপাটন করিয়াছিল। ইবন বলেন "বাহ্লিক নগরে একটী জগদ্বিখ্যাত মনোহর মসজিদ ছিল,

৬ এই প্রথাটী অদ্যাপি বোখারার প্রচলিত থাকা জ্ঞাত হওয়া যায়।

জঙ্গিস খাঁ ধনলোভে সেই মসজিদের ভিত্তি মূল উৎপাটন করে।"

বাহ্লিক হইতে কুহিস্থান (পার্ব্বত্য প্রদেশ) অতিক্রম করিয়া পরিব্রাজক হিরাটে উপনীত হন। সেই সময়ে সেই প্রদেশে হিরাটই সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল। তৎপর তিনি হিন্দুকুষ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বররয়ান নগরে গমন করেন। এই পর্ব্বতের নামকরণ সম্বন্ধে পরিব্রাজক বলেন—"হিন্দুস্থান হইতে প্রেরিত হিন্দু দাস সকল তুহিননিপাতে এই পর্ব্বত মধ্যে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বলিয়া এই পর্ব্বত হিন্দুহন্তা বা হিন্দুকুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

হিন্দুকুষ পর্ব্বতের নামকরণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ পুরাতত্ত্ববিৎ মিত্র মহোদয় লিখিয়াছিল "কিম্বদন্তী আছে কাঙ্গরা দেশীয় একজন রাজপুত্র মহীপাল পঞ্চ সহস্র অকুতোভয় যোদ্ধাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাশ্মীর দেশের পার্শ্বে পাঠানদিগের দমনার্থে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পথিমধ্যে হিন্দুকুষ পর্ব্বতের এক গিরিসঙ্কটের দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহাকে লোকে কহিল যে, এই গিরিসঙ্কট একজন দানবের অধীন। তাহার সম্মান রক্ষা করত নিস্তব্ধ ভাবে এই পার্ব্বত্য পথ দিয়া গমন করাই ভাল, নচেৎ ঐ দানব পর্ব্বতাকার বৃহৎ বৃহৎ হিমশিলা প্রক্ষেপ পূর্ব্বক সকলকে বিনষ্ট করিবেক। তিনি কহিলেন রাজপুত্র-শরীরে ভয় পদার্থ কদাপি বর্ত্তে না, এবং আমিও জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিবার পাত্র নহি। অপর ঐ অভিপ্রায়ানুসারে তোপ ও ডঙ্কাধ্বনি করিতে করিতে তিনি এই পার্ব্বত্য পথ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে হিমশিলার পতনে সসৈন্যে তন্মধ্যে প্রোথিত রহিলেন; একাধিক ব্যক্তি প্রত্যাগমন করত তদ্বার্ত্তা কহিতে জীবিত রহিল না। এই ঘটনা হইতে প্রস্তাবিত পর্ব্বতের নাম হিন্দুকুষ অর্থাৎ হিন্দুহন্তা হইয়াছে।" (৭)

সুবিখ্যাত এরিয়ান এই পর্ব্বত শ্রেণীকে "পরপ মিসস" লিখিয়াছেন। প্রাচীন আফগানস্থানবাসীগণ ইহাকে "পরপমসাস" বলিতেন, কিন্তু সেই পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ ও গিরিসঙ্কট তাহাদের নিকট হিন্দুকুষ নামে পরিচিত ছিল। আরিষ্টটল ইহাকে "পরনসস" লিখিয়াছেন, বিজয়ী আলেকজেণ্ডার ও তাঁহার অনুচরগণ এই পর্ব্বত শ্রেণীকে "ইণ্ডিকুশ কিউকসস" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুবধ করিয়া যে একটী গিরিসঙ্কট "হিন্দুকুষ" তদনুসারে এই বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্ব ভাগ হিন্দুকুষ আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

বসাই পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে একজন "আতা এভলিয়া" (প্রধান পীর) বাস করি-

৭ "তিব্বত দেশীয় পার্ব্বত্য পথে এই প্রকার ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে; এবং তত্রত্য লোকেরা তদ্দ্বারা দানবের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বস্তুত পতনোন্মুখ হিমশিলা সকল শব্দের বেগে কম্পিত হইয়াই পতিত হয়।" মিত্র মহোদয়ের প্রাকৃত ভূগোল, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

তেন। লোকে তাহার বয়ঃক্রম সার্দ্ধ তিন শতাব্দী অনুমান করিত। শতাব্দী অন্তে তাহার একবার নূতন দন্ত ও কেশ উঠিয়া থাকে বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি এক সময়ে "রাজা আবরাহিম রত্ন" নামে ভারতের জনৈক নরপতি ছিলেন। পরিব্রাজক তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলেন যে "আমি কোন মতেই তাহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের অধিক অনুমান করিতে পারিলাম না।

ইবন বতোতার ভ্রমণ কালে কাবুল ও কান্দাহারের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি কাবুলবাসীদিগকে আফগান ও প্রাচীন পারস্যবাসীগণের সন্তান বলিয়া লিখিয়াছেন। আফগানেরা আপনাদিগকে ইহুদিবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু ইতিহাস আলোচনায় পরিব্রাজকের বাক্যই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আধুনিক নৃজাতি বিদ্যাবিশারদগণ তাহাদিগকে "আর্য্যবংশের" একটী শাখা বলিয়া স্বীকার করেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

গান।

১

ওই হোথা সাগরের ধারে
একটি বিছানা পেতে দাও!
একেলা ঘুমাব' মনোসুখে
তোমরা নীরবে চ'লে যাও!
ওই যে আকাশ-গ্রাসী উত্তাল তরঙ্গ রাশি
লাফায়ে লাফায়ে ছুটে যায়,
মাথার উপর দিয়া সাগরের পাখীগুলি
মনোসাধে উড়িয়া বেড়ায়!
যতদূর যায় দুনয়ান,
শূন্য—শূন্য—উদার—উদার—

২

একেলা একেলা থাকি আমি,
তোমরা নীরবে চলে যাও!
আন' আন' সাধের বীণাটি
এই মোর বুকে রেখে দাও!

৩

সাঁঝের তারাটি হাসিতেছে,
স্নিগ্ধ জ্যোতি নয়ন মেলিয়া;
এসে এই সাগর পুলিনে
জুড়ায়েছে জীবন আমার!

উদাসীন সাঁঝের বাতাস
ধীরে ধীরে যেতেছে বহিয়া,
দূ—র স্বপন সম একটি মধুর তান
উথলিয়া উঠিতেছে প্রাণে,
কি-যেন-কি মোহময় স্বপ্নময় গান
ভেসে আসে কেন গো কে জানে।

এই হেথা সাগরের ধারে
সাধের বীণাটি মোরে দাও,
একেলা একেলা থাকি আমি
তোমরা সকলে চ'লে যাও!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

লিপি-প্রচার।

এক জন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যেমন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মূল, তেমনি, একমাত্র বুদ্ধি যাবন্ত বিদ্যার মূল। যে দেশে যত প্রকার বিদ্যার প্রচার থাকুক—সমস্তই বুদ্ধিমূলক; বুদ্ধি-সংযোগ ব্যতীত কোনও দেশে কোনও কালে কোন প্রকার বিদ্যা উৎপন্ন হয় নাই। অতএব বিদ্যাকে এক প্রকার বুদ্ধির শিল্প বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। বুদ্ধির শিল্পের নাম বিদ্যা, আর বর্ণরাশি তাহার উপকরণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণের প্রতিভায় অর্থাৎ নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিতে যে সকল উদার সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে সেই সকল সিদ্ধান্তরাশিকেই আমরা "বিদ্যা" বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। অতএব, বিদ্যাকে বুদ্ধির শিল্প বলা অসঙ্গত নহে।

এ পর্য্যন্ত যত প্রকার শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে একটীও বর্ণলিপি বা অক্ষর শিল্পের তুল্য নহে। এই মহোপকারী শিল্পের উপজ্ঞাতা * যে কে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। বর্ণলিপি বা অক্ষর-শিল্পের সৃষ্টি করিতে যে কত কৌশল, কত চিন্তা ও কত বুদ্ধির আবশ্যক হইয়াছিল তাহাও আমাদের চিন্তার বহির্ভূত। পুরাতন বৃদ্ধেরা যদি অক্ষর শিল্পটীর সৃষ্টি না করিতেন—তাহা হইলে বেদ বল বেদান্ত বল, ব্যাস বল আর বাল্মিকী বল, কে কোথায় থাকিতেন তাহার ঠিকানা কি? বর্ণলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে অনেক

---

* আদ্য-জ্ঞানের নাম "উপজ্ঞা"। যিনি যাহা সর্ব্ব প্রথমে জানিতে পারেন, তিনি তাহার উপজ্ঞাতা।

প্রকার ক্ষমতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। লিপি-প্রচারের পূর্ব্বে হয়ত কত শত বুদ্ধিমানের হৃদয়ে কত শত উদার সিদ্ধান্ত উদিত হইয়া প্রচারের উপায়াভাবে বিলুপ্ত হইয়া ছিল, সেই সমস্ত লুপ্ত-সিদ্ধান্ত হয়ত অদ্যতনীয় মনীষিগণের হৃদয়ে পুনরারূঢ় হইয়া "নূতন বিদ্যা" নামে প্রচারিত হইতেছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক প্রাচীন জ্যোতিঃগ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না রচনেয়ং বিবস্বতঃ।
প্রসাদাৎ কস্যচিৎভূয়ঃ প্রাদুর্ভবতি কামতঃ॥"

স্বয়ংবহাদি শিল্প রচনা সকল কালে কালে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় এবং সেই গুলিই আবার কোন মহাত্মার প্রসাদে ও ইচ্ছায় পুনরাবির্ভূত অর্থাৎ নবাবিষ্কৃত বলিয়া প্রচারিত হয়। একবারে অভিনব সৃষ্টি নাই বলিলেও বলা যায়।

যাহাই হউক, অতিমহোপকারী উন্নতির সোপান স্বরূপ শিল্পরাজ অক্ষর-শিল্পটী যে কোন্ সময়ে কোন্ বৃদ্ধ মহাত্মার দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত হইয়াছিল—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্ণলিপির প্রথমাবিষ্কর্ত্তা বর্ত্তমান সভ্য সমাজের বা আধুনিক শিল্প সমাজের বুদ্ধিপথের বাহিরে লুক্কায়িত থাকিলেও অধ্যাপক মোক্ষমূলার সাহেব তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা যে কতদূর সফল হইয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করা যাউক।

"ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, যে, বৈদিক কাল হইতে পানিনিকৃত ব্যাকরণোৎপত্তি কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোনও প্রকার বর্ণলিপির প্রচার ছিল না।

তৎকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা শব্দময় বেদরাশিকে কেবল গুরুমুখের উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করিতেন, অভ্যাস করিতেন। বর্ণলিপির প্রচার না থাকায়, বৈদিক মহাবাক্য সকল তৎকালে মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হইত, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হইত না। অর্থাৎ শ্রবণ করা ভিন্ন, পুস্তকাকারে দেখা ঘটিত না। সেই কারণেই বৈদিক গ্রন্থ গুলি শ্রবণঘটিত "শ্রুতি" ও "আনুশ্রব" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তৎকালে যদি অক্ষর-শিল্পের প্রচলন থাকিত—তাহা হইলে অবশ্য কোন দৃষ্টি ঘটিত নাম পাওয়া যাইত। যখন তাহা যায় না—কেবল শ্রবণ ঘটিত "শ্রুতি" প্রভৃতি নামই পাওয়া যায়—তখন আর পূর্ব্বোক্ত অনুমান অসত্য হইতে পারে না।

যে সম্প্রদায়ের মধ্যে লিপি প্রচার থাকে, সে সম্প্রদায়ের কৃত নিবন্ধে অবশ্য কোন না কোন প্রসঙ্গে লিপিবোধক শব্দ বিন্যস্ত হয়। লিপিপ্রচার অবস্থায় "বর্ণ" "অক্ষর" "গ্রন্থ" "লিখন" কিম্বা অন্য কোন লিপিবোধক শব্দের উল্লেখ অনিবার্য্য। কোন না কোন উপলক্ষ্যে উহার উল্লেখ হইবেই হইবে, কোন ক্রমেই নিবারিত হইবে না। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থ মাত্রেই "গায়ন্তি" "অবোচাম" "অধীতে" "অনুব্রূয়াৎ" গান করিতেছে, বলিয়াছি, উচ্চারণ করিতেছে, পশ্চাৎ বলিবেক, ইত্যাদি প্রকারের কথোপকথনবোধক শব্দ ভিন্ন, লিপিবোধক "লি-

খতি" "বাচয়তি" "অক্ষরাণি" "পুস্তকং" "গ্রন্থঃ" "বর্ণাঃ" "পত্রং" "লেখনী" কি অন্য কোনরূপ শব্দ নাই। ঋগ্বেদ হইতে পানিনীয় সূত্র পর্য্যন্ত যাবন্ত গ্রন্থেই উক্তরূপ শব্দের অভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঋগ্বেদের সময় হইতে পানিনীয় সূত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে লিপি-কৌশল আবির্ভূত হয় নাই ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।" ম্যাক্স মূলারের বক্তৃতার অনুবাদ।

খ্যাতনামা ম্যাক্স মূলার সাহেবের এই কথা গুলি আপাত-রমণীয় ও শ্রুতিমধুর বটে। শুনিবামাত্রই মন ভুলিয়া যায়। কিন্তু যদি তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করা যায়—তাহা হইলে আর তাঁহার উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা থাকে না। বিবেচনা কর,—তিনি বলিয়াছেন যে "ঋগ্বেদ হইতে—আরম্ভ করিয়া পানিনীয় সূত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত সমুদায় বৈদিক গ্রন্থেই লিপিবোধক শব্দের অভাব আছে।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে সকল গ্রন্থেই তাহার সদ্ভাব আছে। পানিনি মুনি স্বকৃত সূত্রপাঠের তৃতীয়াধ্যায়ে দিবাকর নিশাকর ও লিপিকর প্রভৃতি শব্দের সাধুতা সাধনের নিমিত্ত "দিবা-বিভা নিশা-প্রভা সূত্র করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে পানিনির বহু পূর্ব্বে "লিপিকর" ও "লিবিকর" শব্দ প্রচলিত ছিল। ঐ দুই শব্দ বহু পুরাতন না হইলে তিনি কদাচ স্বীয় ব্যাকরণ-সূত্রে সন্নিবিষ্ট করিতেন না। কেন না প্রচলিত পুরাতন শব্দের সাধুতা নির্ণয় করাই ব্যাকরণের প্রধান উদ্দেশ্য। একথা কেবল আমরা বলি না, শব্দপারঙ্গত পতঞ্জলি মুনিও বলিয়াছেন। "নহি মৃৎপিণ্ডেন ঘটাইব ব্যাকরণেনা পূর্ব্বাঃ শব্দা উৎপাদ্যন্তে কিন্তু সিদ্ধানামেব শব্দানাং সাধুত্ব মন্বাখ্যায়তে।" অতএব, পানিনির সময়ে কিংবা পানিনির চলিবার পূর্ব্বে বর্ণলিপি ছিল না" একথায়আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ ভাষার বিস্তার ও অক্ষরের সৃষ্টি ব্যতীত ব্যাকরণের সৃষ্টি ও তাহার পঠন পাঠন চলিবার সম্ভাবনাই নাই। সে বিচার স্বতন্ত্র বলিয়া এস্থলে উপেক্ষিত হইল, ফল, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা আপনাআপনি বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

এস্থলে আর একটু কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। পানিনি মুনি আদি বৈয়াকরণ নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেক বৈয়াকরণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সূত্র পাঠ দ্বারা জানা যায়। "লঙঃ শাকটায়নস্যৈব" "অবঙ্ স্ফোটায়নস্য" "বা সুপি আপিশলেঃ।" "সর্ব্বত্র শাকল্যস্য"। ইত্যাদি বহুতর সূত্রেই তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈয়াকরণ মুনিদিগের নাম ও তাঁহাদের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের ব্যাকরণও যে বিনা বর্ণ লিপির সাহায্যে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ প্রাচীন যজুর্ব্বেদের ৬ কাণ্ডের ৪ প্রপাঠকের ৯ অনুবাকে একটী মন্ত্র আছে—তাহার অর্থ পর্য্যালোচনা

করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন যজুর্ব্বেদের সময়েও এক প্রকার সংক্ষেপ ব্যাকরণ ছিল এবং তাহার বহু পূর্ব্বের কোন এক অনিশ্চিত সময়েই ব্যাকরণোৎপত্তির সূত্রপাত আরম্ভ হইয়া ক্রমে বিস্তীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

"বাক্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবন্। ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু ইতি। সঃ অব্রবীৎ। বরং কৃণৈ মহ্যং চৈচবায়বে চ সহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্র বায়বঃ সহ্যতে। তা মিন্দ্রো মধ্যতোহবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাক্ উদ্যতে। তদ্ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম।"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পরাচী অর্থাৎ পুরাতনী বাণী পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল মেঘ-স্তনিতের ন্যায় অখণ্ড ভাবে উচ্চারিত হইত। অর্থাৎ এই বর্ণ, এই পদ ও এই বাক্য, এরূপ প্রভেদ কেহ জানিত না। পশু পক্ষীরা যেমন স্বর বিকার মাত্র দ্বারা আত্মগত ভাব ব্যক্ত করিত এবং অন্যগত ভাব বুঝিয়া লইত সেইরূপ ছিল। পরে তাহার মধ্যে অবক্রমণ অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড বিচ্ছেদ করিয়া ব্যাকৃত করিলেন। অর্থাৎ উচ্চারিত কণ্ঠ রবের এই পর্য্যন্ত বাক্য, এই বাক্যে এত গুলি পদ, এই পদে এই প্রকৃতি ও এই প্রত্যয় এবং এই প্রকৃতি প্রত্যয়ে এই এই বর্ণ আছে, ইহা প্রকাশ করিলেন। সেই পর্য্যন্তই লোকে ব্যাকৃত বাক্য বলিয়া থাকে। তাহাই ব্যাকরণ এবং তাহাই ব্যাকরণের ব্যাকরণত্ব। প্রাচীন যজুর্ব্বেদের সময়েও কোন এক প্রকার সংক্ষেপ ব্যাকরণ দিল।

থাক। মহাত্মা ম্যাক্স মূলার সাহেব কোনও বৈদিক গ্রন্থে লিপি সদ্ভাবের অনুমাপক "অক্ষর" কি অন্য কোন শব্দ দেখিতে পান নাই। তাই তিনি বলেন যে, বৈদিক সময়ে লিপিকৌশল জানিত না। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রত্যেক বৈদিক গ্রন্থেই লিপিসদ্ভাবের অনুমাপক শব্দ আছে। কাজে কাজেই আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নহি। পাঠকগণের সুগোচরার্থে আমরা কএকখানি প্রধান প্রধান বৈদিক গ্রন্থ হইতে কতিপয় স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ১ম পঞ্চিকার ২য় খণ্ডে একটী মন্ত্র আছে। "অষ্টকাপাল অগ্নেয়ো-হষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী গায়ত্রমগ্নেশ্ছন্দঃ।" গায়ত্রী নামক বৈদিক ছন্দের প্রত্যেক পাদে যে ৮টী অক্ষর থাকে এস্থলে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। অক্ষর ও বর্ণ একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

উক্ত ব্রাহ্মণের ১ম অধ্যায়ের ৫ম খণ্ডেও "দ্বায়ার্ব্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি।" এইরূপ আছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদের ১৩ শ অধ্যায়ে "কতি অস্য বিষ্টাঃ কতি অক্ষরাণি" এই একটী প্রশ্নমন্ত্র আছে, এবং ইহার প্রত্যুত্তর মন্ত্রেও "ষট্ অস্য বিষ্টাঃ শতমক্ষরাণি" এইরূপ আছে। এখানেও অক্ষর শব্দের বর্ণবাচকতা ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হয় না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ১ম পঞ্চিকার ২১ খণ্ডে গ্রন্থাবয়ববাচী "পটল" শব্দ আছে। যথা "তৎকার্ত্তৈঃ সমর্থয়তি ইতি নু পূর্ব্বং পটলম্।"

শতপথ ব্রাহ্মণের ৮ম কাণ্ডে ছন্দস্যা নামক পদার্থের দ্বারা ইষ্টকার উপধান করিবার উপদেশ আছে। যথা "ছন্দস্যা উপদধাতি।" এস্থলে "ছন্দস্যা" শব্দের বৈদিক প্রসিদ্ধ অর্থ ছাদনশীল বৃক্ষত্বক্ ও পত্র। এই সময় বোধ হয় বৈদিক মন্ত্র সকল বৃক্ষের ত্বক ও পত্রে লিখিত হইত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১৫ শ অধ্যায়ে বৈদিক মন্ত্রের ছন্দের গণনা আছে। তন্মধ্যে "ক্ষুরভ্রজ ছন্দঃ" শব্দটী ছন্দের বিশেষণ। উক্ত বৈদিক প্রসিদ্ধ ব্যুৎপত্তি এইরূপ "ক্ষুর-বিলেখনে। ক্ষুরেণ লেখনসাধনতীক্ষ্ণাগ্র-লৌহশলাকয়া ভ্রাজতে প্রকাশতে।" ক্ষুর অর্থাৎ লৌহশলাকা। তাহার দ্বারাই ছন্দঃ সকল প্রকাশ করা হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে তৎকালে ক্ষুর-শলাকার দ্বারাই বৈদিক মন্ত্র সকল বৃক্ষত্বকে লিখিত হইত। উড়েরা অদ্যাপি লিপি-কার্য্যের উন্নতি করিতে পারে নাই। আজও তাহারা ক্ষুর-শলাকা বা খুন্তীর দ্বারা তালপত্রে মন্ত্রাদি লিখিয়া থাকে।

শতপথ ব্রাহ্মণের ১০ম কাণ্ডে "পংক্তি যুগ্মানি" শব্দ থাকায় তৎকালে বর্ণলিপি থাকা অনুমিত হইতেছে। অক্ষরেরশ্রেণীর নাম "পংক্তি" ইহা সকলেই জানেনা। লিখিত পুস্তক ব্যতীত পংক্তি কল্পনা হইতে পারে না।

ম্যাক্সমূলার সাহেবের তাদৃশ আশঙ্কার মূল কারণ "শ্রুতি"। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়বিধ বেদই শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ দেখিয়া তাঁহার মনে তৎকালে পুস্তকের ও লিপির অনস্তিত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল সংশয় নাই। "শ্রুতি" কি "আনুশ্রব" নাম দেখিয়া লিপি সদ্ভাবের অভাব অনুমান করা সুসঙ্গত না হইতেও পারে। কেন না উক্ত নাম দ্বয় অন্যরূপ তাৎপর্য্যে প্রচারিত হইলেও হইতে পারে। সংস্কৃত তাৎপর্য্যবিৎ প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন যে "শ্রূয়তএব কেবলং নতু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ।" কেবল শুনাই যাইতেছে অতএব ইহা কেহ করে নাই। তাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিবার জন্যই উক্তরূপ তাৎপর্য্যে উক্ত নাম-দ্বয় প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা সত্য হইবার বাধা নাই। যদি তাহা অস্বীকার কর তবে শ্রুতির ন্যায় স্মৃতি শব্দ দেখিয়াও স্মৃতিকালেও লিপি সদ্ভাবছিল না, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে না। কারণ, প্রত্যেক স্মৃতিতেই লেখ্য প্রকরণ আছে। অতএব কেবল মাত্র শ্রুতি নাম দ্বারা বর্ণ-লিপির অভাব অনুমান করা সুসঙ্গত নহে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একটী মন্ত্র আছে, তাহার অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও তৎকালে পুস্তক সদ্ভাবের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"উত ত্বঃ পশ্যন ন দদর্শ বাচঃ উতত্বঃ শৃন্বন ন শৃণোত্যেনাম্।"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কোন কোন পুরুষ

বেদবাক্যকে দেখিয়াও দেখে না। এবং অন্য কোন পুরুষ ইহা শুনিয়াও শুনে না। অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তিরাই বেদকে পুস্তকাকারে দেখে মাত্র ও কথায় শুনে মাত্র।

এখন বিবেচনা করুন, পুস্তকের কি কোনরূপ বর্ণলিপির সাহায্য ব্যতীত উক্ত-রূপ বর্ণন অর্থাৎ বাক্যের দর্শন সম্ভবে কি না। বর্ণলিপির দ্বারাই বাক্যের দর্শন কল্পনা করা যাইতে পারে নচেৎ পারে না। সুতরাং ঋগ্বেদের উল্লিখিত মন্ত্রের ভাবার্থ দ্বারাও তৎকালে বর্ণলিপির অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে।

"লিখতি", "বাচয়তি" "পুস্তকানি" ইত্যাদি প্রকারের বিস্পষ্ট নামের উল্লেখ নাই, একথা অস্বীকার্য্য নহে। যদিও তৎ-কালে কোনরূপ অক্ষর বা বর্ণলিপি ছিল—কিন্তু তাহার ব্যবহার অতি অল্পই ছিল, ইহা নানা কারণে উপলব্ধ হয়।

এ বিষয়ে আর একটী সূক্ষ্ম সংবাদ আছে। সেটী আর কিছু না—গণিত প্র-ক্রিয়া। গণিত প্রক্রিয়াটী যেরূপ গহন—যেরূপ দুর্ব্বোধ্য অক্ষর-লিপির সাহায্য ব্য-তীত যে তাহার ব্যবহার চলিতে পারে না ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। সেই গণিতপ্রক্রিয়া বেদ-কালে বর্ত্তমান ছিল। অন্ততঃ তাহা দেখিয়াও তাৎকালিক অক্ষর জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। বৈদিক সময়েও যে এদেশে গণিত-বিদ্যার আলোচনা ছিল—তাহার দুই একটা উদাহরণ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি।

গণিত বিদ্যার মূল যে একাদি অঙ্ক—তাহা শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১৭ শ অধ্যায়ে "একা চ দশ চ দশ চ শতঞ্চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চাযুতঞ্চ——"ইত্যাদি ক্রমে উক্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ৪ র্থ অষ্টকের ২ য় অধ্যায়ের ১২ শ বর্গে গ্রহণ-গণনার বিষয় বর্ণিত আছে। যথা—

"যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসা বিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ব বিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্।"

অসুরকুলোৎপন্ন রাহু যে আপনার ছায়ার দ্বারা সূর্য্যকে বিদ্ধ করেন—ইহা অত্রিগোত্রের ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্ব প্রথমে জানিয়া ছিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা উহার যথার্থ মর্ম্ম জানিতে অক্ষম ছিলেন। অত-এব যথার্থ রূপে গ্রহণ গণনা করা গণিত বিদ্যার সাহায্য ব্যতীত সম্ভবে না।

মলমাস নির্ণয় একটী বিশিষ্ট গণিত প্রক্রিয়ার ফল। তাহাও বৈদিক সময়ে ছিল। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ২০ শ অধ্যায়ে ১২ মাসের উল্লেখ করিয়া অবশেষে অধি-কন্তু রূপে মলমাসের উল্লেখ আছে। ঋগ্বে-দের একটী মন্ত্রেও অধিক মাসের অর্থাৎ মলমাসের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"বেদ মাসঃ ধৃতব্রতঃ দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে।"

১ ম অষ্টক, ২ য় অধ্যায়।

অর্থ এই যে বরুণদেব কালরূপী দ্বাদশ মাসের বিষয় অবগত আছেন এবং দ্বাদশ মাসের সমীপে যে মাস জন্মে তিনি তাহাও জানেন। এস্থানে উপমাস অর্থাৎ মলমাস। এই সকল দেখিলে কাহার মনে না প্রতীতি

হয় যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশিষ্ট গণিত বিজ্ঞানের প্রচার ছিল? যখন অতি গহনতর গণিত প্রক্রিয়া ছিল—তখন নিশ্চিত অক্ষরাঙ্কন প্রক্রিয়াও ছিল। ছিল বটে, কিন্তু তাহা অল্প সঙ্খ্যক ব্রাহ্মণের মধ্যেই ছিল। সাধারণ্যে ছিল না। সাধারণ্যে ছিল না বলিয়াই "লিখতি" "বাচয়তি" "বর্ণাঃ" "অক্ষরাণি" "পুস্তকং" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ নাই। ফল কথা এই যে, কোন্ সময়ে যে এদেশে বর্ণলিপির প্রথম প্রচার হয় এবং তাহার প্রথম প্রচারক কে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যিনি বলেন "আমি নির্ণয় করিতে পারি" তিনি ভ্রান্ত অথবা প্রতারক; এ দেশের প্রাচীন ঋষিরা যাহার আদি খুঁজিয়া পাইতেন না তাহা ব্রহ্মার কৃত বলিয়া উল্লেখ করিতেন। সেই জন্য, যে যে বিষয় ব্রহ্মার কৃত বা প্রচারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা অতীব পুরাতন বলিয়া স্বীকার্য্য এই নিয়মের আশ্রয় লইলে অক্ষর-প্রচার এদেশের অত্যধিক পুরাতন হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক আর্য্যই জানেন যে, "অস্য মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ" পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী মাতৃকা সরস্বতীর আদিজ্ঞাতা ব্রহ্মা। দেবগুরু বৃহস্পতিও স্বপ্রণীত সংহিতায় বলিয়াছেন "যাম্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ। ধাত্রাঽক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যহতঃ পুরা।" ছয় মাস হইলেই লোক সকল অভ্যস্ত কথা ভুলিয়া যায় দেখিয়া বিধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মা অতি পূর্ব্ব কালে অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা শিক্ষিতব্য সকলকে পত্রারূঢ় করিবার উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য-ব্রাহ্মণেরাও নানা বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করিতেন। কেবল আমরাই করিতেছি এমত নহে। আমাদের অনুসন্ধান অপেক্ষায় তাঁহাদের অনুসন্ধানে বিশেষ সত্য থাকাই সুসম্ভব। কেন? তাহা অনেক কথা। সে বিচার এপ্রস্তাবের অন্তর্ভূত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, "পূর্ব্বে লিপিপ্রথা ছিল না বলিয়া পূর্ব্বকালের অনেক বৈদিক শাখা লুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা আছে—তাহাতে পাঠের অনৈক্য বর্ণ লিপির অভাবই পাঠের অনৈক্যের মূল।" একথা অসার। এখন যে বর্ণলিপির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তথাপি বহুতর গ্রন্থের উচ্ছেদ ঘটনা হইতেছে এবং পাঠের অনৈক্যও ঘটিতেছে। পাঠের অনৈক্য ও পুস্তকের উচ্ছেদ হওয়ার কারণ স্বতন্ত্র। ফল, এ বিষয়ের বহু আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন, এ সকল বিষয়ের প্রকৃত নির্ণয় হইবার উপায় নাই।

শ্রী কালীবর বেদান্তবাগীশ।

পুনর্মিলনে।

১

পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে নাজানি কি ভাগ্যবলে
উঠিনু হেথায়!
কোন্ দৈব-কৃপা আজি হ'ল অনুকূল মোরে
মিলাল তোমায়!
কল্পনার,—দুরাশার এ অপরিচিত স্থান!
—স্বপন-অতীত!
নিদাঘ-মরুভূ মাঝে আচম্বিতে মন্দাকিনী
হ'ল প্রবাহিত!
পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে—আবার তোমার সনে
হইবে মিলন,
পূর্ব্বে যদি জানিতাম—কে চাহিত মুছিবারে
স্মৃতির লিখন,
নানা-রত্ন-পরিপূর্ণ সাধের হৃদয় খানি
কে ভাঙ্গিত হায়!
প্রাণের মদির-স্বপ্ন, আঁখির জ্বলন্ত-শিখা
কে আজি নিবায়!
—জ্বলন্ত নয়নান্তরে করিত কি গরজন
রুদ্ধ তরঙ্গিনী?
শ্মশান-হৃদয়-মাঝে দাপটে বেড়াত ছুটে
আশা-উন্মাদিনী?
ফুলময়ী স্নিগ্ধ-স্মৃতি জ্বালামুখী উল্কালতা
আজি কি হইত?
প্রেম-নদী মন্দাকিনী বরষার পদ্মা-রূপে
আজি কি বহিত?

২

আজি যদি ভাগ্যবলে ও মধুর মুখ-খানি
দেখিনু আবার,
অবোধ নয়ন যদি—আবার মোহিল মোহে
দেখিতে আঁধার,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে, এত উপদেশ শুনে,
এত যন্ত্রণায়
দুর্জ্জয় প্রণয়-আশা আপন্ন মরণ পথে
তবু ছুটে যায়!
মধুময়ী সুখ-আশা—নিদাঘের শুষ্কলতা—
পুন মুঞ্জরিত!
অতীত-শৈশব-ছায়া—লুপ্ত-ফল্গুনদী—আজি
পুন উচ্ছ্বসিত!
কুহকিনী কল্পনার ইন্দ্রজালময়ী ছবি
অন্তর-অন্তরে
প্রতিপলে নব মূর্ত্তি—নবীন অমৃত-ধারা—
ছুটি'ছে লহরে!
জাগ্রতে সুখের স্বপ্ন স্বর্গের নন্দন-ছায়া—
সম্মুখে ভাসিছে!
ওমুখের প্রতিবিম্ব—ভাঙ্গা-হৃদে-চাঁদ-আলো
আবার হাসিছে!
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে—শুন একবার সখি
স্মৃতির গর্জন!
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে—দেখ একবার সখি
হৃদয়-মন্থন!

৬

৩

একটী তরঙ্গ আজি হ'য়েছিল অনুকূল
হ'য়েছে মিলন!
একটী তরঙ্গ রোষে আসিবে,—পড়িব দূরে
সহস্র-যোজন!
এই স্বপনের দেখা,—এই স্বপনের কথা—
এখনি ফুরা'বে!
অনন্ত আঁধারাকাশে কক্ষ-ভ্রষ্ট তারাটুকু
এখনি লুকা'বে!
কিন্তু ও আকাশ পানে যেখানে ও তারাটুকু
দাঁড়া'য়ে এমনে!—
ওই অন্ধকার পানে চাহিয়া, উদাস-প্রাণে,
নিশ্চল নয়নে,
দুর্ব্বহ জীবনভার নিঃশবদে অকাতরে
হইবে বহিতে।
নিবা'তে হইবে জ্বালা নিরাশার বিষ পিয়া,
জ্বলিতে জ্বলিতে!—
এস তবে একবার—মিলাইয়া, সুলোচনে,
নয়নে নয়ন,
দেখিলো কেমন লাগে নিদাঘের মরুময়
এ মরু-জীবন!
শুন তবে একবার এ প্রাণের জ্বালাময়ী
দুঃখের কাহিনী!
বলিতে বলিতে সুখে জন্ম-মত একেবারে
ঘুমাই অমনি!

৪

পড়িয়া কালের স্রোতে অকালে ভাঙ্গিয়াগেছে
হৃদয় আমার!
পড়িয়া কালের স্রোতে না জানি মুহূর্ত্ত পরে
কি ঘটে আবার।
হল হদি সম্মিলন—একটু অপেক্ষা কর
দেই উপহার!
একটু অপেক্ষা কর—নির্ব্বাপিত করি দীপ,
যন্ত্রণা আমার!
দেখিয়া নিমিষ তরে প্রাণের যন্ত্রণা শূন্য
শূন্যময় দেহ!
তার পর ধীরে ধীরে যেখানে মনের সাধ
সেইখানে যেও!
সংসারের গণ্ডগোল বড় বাজিতেছে কাণে
পারিনা সহিতে!
স্বর্গীয় প্রাণের সনে জগতের তিক্ত বিষ
পারি না বহিতে!
ধরাতল বিপ্লাবিনী উন্মত্তা কল্পনা নদী
এ ক্ষুদ্র অন্তরে,
নৈরাশ্য পাষাণ দিয়া কত দিন বল আর
রাখি রুদ্ধ ক'রে।
আশার অমৃত ভাণ্ড সম্মুখে ধরিয়া করে
মরুর উপরে,
বারেক না করি স্বাদ কত দিন বল আর
ধমনী সঞ্চরে!
একটু অপেক্ষা কর—মনে বড় আছে সাধ
দিব উপহার
জগত-বন্ধন হীন, দুঃখ সুখ প্রেমাতীত
পরাণ আমার।

শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল।

চা-ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ।

(পত্র।)

আমি চা কার্য্য শিখিতে সংকল্প করিলাম, এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, অনেক যোগাড় করিতে হয়। সাহেবরা বাঙ্গালীদের কোন মতে চা-কাজ শিখাইতে রাজী হয় না, তাহারা বাঙ্গালীদের শিক্ষানবীশ রাখিতে চায় না; এ দিকে আমাদের (বাঙ্গালীদের) অতি অল্প সংখ্যকই চা-বাগান আছে, থাকিলেও এক জন শিক্ষানবীশ রাখিয়া তাহাকে কাজ শেখান তাহাদের পোষায় না। আর যদিও দুটো একটা বড় কারবার আছে তা সেখানে গিয়া নিযুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আশা নাই, কেন না চিরকাল সেই বাগানের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সাহেবদের এত অসংখ্য চা-বাগান আছে যে এক বাগানের কর্ম্মচারীকে অন্য বাগানে একটা ভাল কাজ খালি হইলে সেখানে বদলি করিয়া দেয়; এইরূপ সকলের একটা আশা আছে যে, কালে সে একটা ভাল কাজ পাইতে পারিবে। কিন্তু আমাদের স্বজাতির একটা বাগানে ঢুকিলে হয়ত আজন্ম কাল এক কাজই করিতে হয়, এক ম্যানেজারের অধীনে চিরকাল থাকিতে হয়। আমি অনেক যোগাড় করিয়া একটা বড় বিলাতী চা-বাগানের শিক্ষানবীশ হইলাম, এবং তদুপলক্ষে কাছাড় যাত্রা করিলাম। আমার কলিকাতা হইতে কাছাড় যাইতে প্রায় ১৫ পনর দিন লাগিয়াছিল। কাছাড় যাইবার অনেক গুলি পথ আছে, তন্মধ্যে আমি যে পথে গিয়াছিলাম—তাহাতে শীঘ্র পৌঁছান যায়। আমি প্রথমে গোয়ালন্দ যাইবার জন্য ট্রেনে উঠিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমার বিদেশে একেলা থাকা অভ্যাস ছিল না, একটা জঙ্গলের মধ্যে একেলা থাকিতে হইবে ভাবিয়া মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সেখানে সাহেবরা আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে, কি হয় না হয়, এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতেছি এমন সময় আমার কামরায় একজন সাহেব উঠিলেন। কথায় বার্ত্তায় জানিতে পারিলাম তিনিও কাছাড়ে চা-বাগানে যাইতেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ করিয়া রাতটা একরকম কাটিয়া গিয়াছিল। সাহেবটিকে দেখিয়া আমার সাহস হইল, আমি মনে করিয়াছিলাম নিতান্ত একলাটি কতদূর যাইতে হইবে, তবুও একজন সঙ্গী পাইলাম এই ভাবিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা দেখিলাম; ঘুম হইল না, নানা রকম ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি ভাবিতেছিলাম, কাছাড়ে ত যাইতেছি, তার পর বছর খানেক

থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া কিছু সংস্থান হইবে। প্রথম বৎসর রোজগার করিয়া বিদেশে থাকিবার বন্দোবস্তটা একটু সুবিধা রকম করিয়া লইতে হইবে; দ্বিতীয় বৎসর যদি পারি ত কর্ত্তৃপক্ষদের ধ'রে ক'য়ে দার্জ্জিলিঙ্গে বদলি হইব, তাহইলে বাড়ীর কাছে হইবে, যখন-তখন বাড়ী আসিতে পারিব। ইতি মধ্যে একএক-বার আসল কথা মনে হইতেছিল, সেখানে কি তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিবে? শুনিয়াছিলাম চা-করেরা ভারি বর্ব্বর, আমাকে কি করে না করে এ ভাবনাটাও মাঝে মাঝে হইতেছিল। তারপর তৃতীয় বৎসরে—কিছু টাকাও হইয়াছে, দার্জ্জিলিঙ্গে বদলিও হয়েছি, এখন এত টাকার হিসাব রাখে কে? কে কখন ঠকাইয়া লয় আর কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হইবে—কে দেখে কে শোনে ইত্যাদি। এমন সময় গাড়ী গোয়ালন্দে পৌঁছিল। সুতরাং আমি আমাকে আর বেশী প্রশ্রয় দিবার সময় পাইলাম না। তার পর আমি ট্রেন হইতে নাবিয়া ঢাকায় যাবার জন্য ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমারে আমার কতকগুলি বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হইল। আমি গল্প করিতেছি এমন সময় এক জন বাঙ্গালী হ্যাট কোট-পরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁকে দেখিয়া প্রথমে আমার বেশ ভদ্র বলিয়া মনে হইল, সেই জন্য আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে ব্যস্ত হইলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম মশায় ঢাকায় যাইতেছেন? তিনি হাঁ কি না কিছুই বলিলেন না, যেন আমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই যে তিনি বুঝিয়াছিলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। তাঁর সঙ্গে যে ব্যক্তি ইংরাজিতে কথা কহিতেছিল সেই উত্তর পাইতেছিল। মধুসূদনের আর সহ্য হইল না, তিনি দর্পহরণ করিলেন। মধুসূদন তার মুখ দিয়া বাংলা না বলাইয়া ছাড়িলেন না। ষ্টীমার ঢাকায় থামিল। আমরা সকলে নাবিলাম। উপরি-উক্ত হ্যাট-কোটে বাবু-সাহেব সাহেবি-চালে যেমন নাবিতে গেছেন দৈবাৎ পা পিছ্‌লিয়া জলে পড়িয়া গেলেন। সাঁতার জানিতেন না হাবু-ডুবু খাইয়া বাংলা ভাষায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তার পর, খালাসীরা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। তিনি হয় ত তার পর মনে মনে ভারি লজ্জা পাইয়াছিলেন। জলে পড়িয়াছিলেন তাতে দুঃখ নাই—কিন্তু দুঃখ এই যে বাংলা কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। যখন ঢাকায় পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া পড়িয়াছে। সহরের ভিতরটা তেমন ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তবে বাহির হইতে মনে হইল সহরটা মন্দ না। বুড়ী-গঙ্গার ধারে সারি সারি বাড়ী গুলি বেশ সুন্দর দেখায়! যে রকম শোনা গেল তাতে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনেকটা একতা আছে বলিয়া বোধ হয়। আমি সেখানে পৌঁছিবার দিনকতক আগে বেঙ্গল থিয়েটার কম্পানি তাঁদের দল বল লইয়া অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বেশ্যা লইয়া অভিনয় করা তাঁদের

মতের সঙ্গে না মেলাতে সকল ছাত্ররা একত্র হইয়া কোন মতে তাঁদের অভিনয় করিতে দিল না! এই রকম অনেক বিষয়ে ছাত্রদের একতা দেখা যায়। কলিকাতায় যেমন লেখা-পড়ার চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ভদ্রতার চর্চ্চাটা সে পরিমাণে বোধ করি হইতেছে না। কলিকাতার রাস্তা দিয়া কোন স্ত্রীলোক গেলে তিনি ভাল ব্যবহার পান কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখানে ভদ্র মহিলাগণ প্রায় পদব্রজে বেড়াইতে যান—তাঁদের দিকে কেউ হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে না। আমার আলাপী একটি ভদ্র মহিলা বলিলেন যে, তিনি কলিকাতায় এরকম করিয়া বেড়াইতে সাহস করিতেন না কিন্তু এখানে বেড়াইতে তাঁর কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। তিনি বলিলেন একদিন বেড়াইতে গিয়া রাস্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি একজন যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে—সে এমনি বিনীত ভাবে তাঁকে পথ দেখাইয়া দিল, সেই দিন হইতে ঢাকার লোকদের উপর তাঁর বিশেষ আস্থা হইল। এখানকার লোকদের আপনা-আপনির উপর খুব বিশ্বাস আছে। এ গুলো খুব ভাল গুণ বলিতে হইবে। আমি ঢাকা ছাড়িয়া নারায়ণগঞ্জে যাত্রা করিলাম। নারায়ণগঞ্জ ঢাকা হইতে ২১ মাইল। আমি যখন নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিলাম তখন রাত হইল, আমি কার কোম্পানির আপিসে ষ্টীমার আসিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম, শুনিলাম আসে নাই, আসিতে প্রায় ৫।৬ দিন দেরী হইবে। আমাকে সেখানে সে রাতটার মত কাটাইতে হইল। এমন বিশ্রী জায়গা আমি কোথাও দেখিনি। না আছে ভাল বাড়ী, না আছে ভদ্র লোক, অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমার একটি বন্ধু একটা ঘর ঠিক করিয়া দিলেন। বাড়ীটা যখন দূর হইতে দেখিলাম, তখন মনে হইল দিব্য বাড়ী। কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া প্রাণ যায়। একে সেদিন গরম পড়িয়াছিল, তার উপর ঘরে একটিও জানালা নাই, ঠিক জেল-খানার মত। চারিদিকেই দেয়াল। আর সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রায় হামাগুড়ি দিয়া না উঠিলে সিঁড়ির উপরের ছাত মাথায় ঠেকে। এ দেশের সব বাড়ীর লক্ষণই বোধ করি, এই রকম। কোন ক্রমে সে রাতটা কাটাইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে বেশ আরামে কাটাইয়াছিলাম। তার পর, আমি ঢাকা হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত একেবারে বোটে করিয়া যাইব স্থির করিলাম। বোট ঠিক হইল, আমি উঠিলাম। বোটটা বড় ভাল নয়। আমি তিন দিন পরে মেঘনায় আসিয়া পড়িলাম। মেঘনাটা খুব প্রকাণ্ড নদী, অনেকটা সমুদ্রের মত, নীল জল, আর যখন ঢেউ উঠে তখন সমুদ্রের মত দেখায়। নীল জলের উপর সাদা ফেনা হয়, আর মাঝে মাঝে এত বড় ঢেউ উঠে যে চারিদিকের কিছুই দেখা যায় না। মেঘনা ছাড়াইয়া বরাক নদীতে পড়িলাম। এটা খুব ছাট নদী, কিন্তু দুধারের দৃশ্য খুব চমৎকার। তারপর আমাকে তিন চারি

দিন ক্রমাগত জঙ্গলে জঙ্গলে কাটাইতে হইয়াছিল.এই ক দিন আমি আমাদের পাঁড়ী মাঝী ভিন্ন অন্য কোন মানুষের মুখ দেখিতে পাই নাই। এখান থেকে অনেকগুলি পাহাড় দেখা যায়, সাদা মেঘের নীচে নীল বর্ণ পাহাড়গুলি যেন কে আঁকিয়া দিয়াছে। আমি যখন বালাগঞ্জে পৌঁছিলাম তখন জঙ্গলের সীমানা ছাড়াইলাম, এখান থেকে সব পরিষ্কার স্থানের আরম্ভ হইল। আমি চার দিন পরে কাছাড়ে পৌঁছিলাম। কাছাড়ের প্রধান আড্ডার নাম সিল্‌চার। এই খানেই আসিয়া যাত্রীদের উঠিতে হয়. এ জায়গাটা মন্দ নহে. অনেক বাড়ী ঘর। একটা ছোট সহরের মত। কাছাড়ের মধ্যে এই স্থানটা যা ভাল। কাছাড় মরুভূমির মধ্যে এইটে ওয়েসিস্ বলিলেও চলে। এখানে সাহেবরা মিলে অনেকগুলি ক্লাব বাজার গুদাম প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। কাছাড় এমন জঙ্গলেও শারীরিক সুখের উপযোগী যত রকম জিনিসের দরকার সব পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য! ইংরেজরা নরককেও স্বর্গ করিয়া তুলিতে পারে। কাছাড়ের এমন বিশ্রী বন্য জায়গায় কি না পাওয়া যায়! তবে বেশি দাম দিয়া কিনিতে হয়—পাওয়া যায় এই আশ্চর্য্য। কাছাড়ের মধ্যে এই দুহাত জায়গা যা ভাল.তার পর আর সমস্ত বন। আমি যে বাগানে যাইতেছিলাম তার নাম সিলকুরি। সিলচারে অনেক খুঁজিলাম গাড়ি পাল্কী প্রভৃতি কোন রকম যাবার বন্দোবস্ত দেখিলাম না। সুতরাং সে দিন আর যাওয়া হইল না। তার পর দিন আমার একটি বন্ধু অনেক চেষ্টা করিয়া একটি ঘোড়া জুটাইয়া দিলেন। ঘোড়াটা দেখিয়া তার উপর চড়িতে আমার মায়া করিতে লাগিল। বেচারী আমার মুখের দিকে অত্যন্ত করুণ ভাবে তাকাইয়া রহিল। আমি খুব মনের জোর বাঁধিয়া নিষ্ঠুর হইয়া তার উপর ত চড়িয়া বসিলাম। প্রথমে আস্তে আস্তে চালাইলাম। সে এম্নি বেঁকেচুরে চলিতে লাগিল আমার বোধ হইল বুঝি বা তার বত্রিশ নাড়ী মিলিয়া কপাটি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি একবার ভাবিলাম নাবি —কিন্তু প্রায় চার ক্রোশ যাইতে হইবে, একে রক্ষুর উঠিয়াছে, তাতে আবার হাঁটিয়া যাওয়া, সে আর হইয়া উঠিল না। খানিকটা গিয়া মনে করিলাম দৌড় করাই। তাতে সে এম্নি ভাবে চলিতে লাগিল আমার ভয় হইল বুঝিবা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো আলাদা আলাদা হইয়া খুলিয়া পড়িয়া যায়। এ ছাড়া ঘোড়াটির আর একটি বিশেষ গুণ ছিল,যখন কোন গাছ দেখে অম্নি তার গা চুলকাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়। সে যেই গাছ দেখে অমনি তাতে পিট ঘসে, তার পিঠ চুলকোন হয় না, আমার কেবল পায়ের নুন ছাল ওঠে। তার ভারি অসুখ বোধ হইল। সে ক্রমাগত পিঠ ঘসড়ায় কিন্তু কিছুতে আরাম পায় না। অবশেষে ভারি বিরক্ত হইয়া কান দুটো খাড়া করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমি ভয়ে শশব্যস্ত, কোন গতিকে তার পিঠের উপর বসিয়াছিলাম মাত্র। সহিস তার সঙ্গে দৌড়িতে পারে না আর আমি ঘোড়া থামাইতেও পারি না—

আমি রাস্তা চিনি না আর আমি ঘোড়া থামাইতেও পারি না, কিছুতেই রাশ মানে না। তার উপর নির্ভর করিয়া বসিলাম তার যে দিকে প্রাণ চায় সেই দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল একবার উঁচুতে উঠে একবার নীচুতে নাবে। আমি ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলাম। মনে হইল আজ বাঁচিলে ঢের দিন বাঁচিব। সে দিন আমি কোন গতিকে বাঁচিয়াছিলাম; কেননা, মরিলে এ ঘটনা লিখিব কেমন করিয়া?

সে দিন সিলকুরিতে পৌঁছিলাম। ঘোড়া হইতে নাবিলাম। যে দিন পৌঁছিলাম সে দিন রবিবার। রবিবারে আমাদের ম্যানেজার সাহেবের বাড়ী আসিয়া সকলে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন, তিনি একেবারে সকলকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে প্রতি রবিবারে তাঁর ওখানে নিমন্ত্রণ। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন আহারের উদ্‌যোগ হইতেছে আর অনেক চা-কর ক্রমশঃ জুটিতেছে। যাক্ আমিও হংস মধ্যে বক হয়ে একটি চেয়ার দখল করিয়া বসিলাম। ম্যানেজার সাহেবকে ভারি ভদ্র বলিয়া মনে হইল। আমাকে যথেষ্ট সম্ভাষণ করিয়া পাশে লইয়া বসাইলেন কখন পৌঁছিলাম কি বৃত্তান্ত সমুদয় জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন— আমি আমার ঘোড়ার বিষয় সব বিস্তারিত রূপ বলিলাম তিনি তাতে একটু হাস্যরস প্রকাশ করিলেন। আমার সিলকুরিতে যাবার আগে মনে হইয়াছিল—চা-করেরা না জানি কি ব্যাপার—আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করে কি না—তারা সকলেই আনকোরা সাহেব, তাদের মধ্যে আমি একজন বাঙ্গালী, আমাকে নিয়ে কি কাণ্ড করে, ভাল ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না—তাদের দেখে আমার বেশ সাহস হইল। সকলেই আমার সঙ্গে বেশ ভদ্রতা করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন! তার পর আহার প্রস্তুত হইল,সকলেই গিয়া খাইতে বসা গেল। আহার সমাপ্ত হইল, তার পর বিকাল বেলা লনটেনিস খেলা গেল। এই রকম করিয়া আমার প্রথম দিনটা কাটিয়া গেল। তার পর দিন ম্যানেজার আমাকে বলিলেন যে ঘোড়ায় চড়িয়া সমস্ত বাগানটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবে তা হইলে বাগানটা চারি দিক দেখিতে পাইবে, আমি ঘোড়ায় চড়িয়া একটু বেড়াইয়া আসিলাম। ভাল পথ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি।

প্রথম প্রস্তাব।

যদি কোন ভাবুক ভ্রমণকারী ইংলণ্ড দেশ ভ্রমণ করিয়া আমাদের বঙ্গদেশ আসিয়া দেখেন ত সহজেই তাঁহার মনে হইবে যে, শিক্ষিত বঙ্গদেশ, শিক্ষিত ইংলণ্ডের ভাঁড়ামি মাত্র। কি আমাদের সামাজিক প্রথা, কি রীতি নীতি, শিক্ষা ও শিক্ষার ফল—এমন কি, আমাদের হাব ভাব পর্য্যন্ত দেখিলেই তাঁহার মনে হইবে যে বঙ্গবাসীরা সুন্দরবনের মধ্যে ইংরাজি সভ্যতারূপ শিব গড়িতে গিয়া আর একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য গড়িয়া ফেলিয়াছে! শুধু যদি পরিচ্ছদে বা আহারবিহারে এইরূপ সং সাজা পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে বিশেষ কোন কথার স্থল থাকিত না—কেবল হাসিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম; কিন্তু বাস্তবিক তাহা ত নয়—আমাদের মস্তিষ্কে, আমাদের হৃদয়ে পর্য্যন্ত বিলাতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। সে ছায়ার আওতায় আমাদের মনের বা হৃদয়ের সহজ স্ফূর্ত্তি বুঝি আর সম্ভবপর নহে। দেখ দেখি, দিন দিন দেশে কত নাটক, কত কাব্য, কত উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে—তাহাতে আমাদের লাভ ব্যতীত লোকসান নাই, কিন্তু সে সকল গ্রন্থগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃত প্রস্তাবে লাভ কি লোকসান হইতেছে। দুই তিন জন সূক্ষ্মদর্শী লেখকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সমগ্র বঙ্গীয় লেখকদের গ্রন্থ সকল মন্থন করিলে গরল ব্যতীত অমৃতের বিন্দুও ত দেখিতে পাই না। সকল নাটক, কাব্যে, ও উপন্যাসে ভালবাসা-বাসির ছড়াছড়ি দেখিতে পাইবই পাইব। আচ্ছা, তাহা কিছু মন্দ নয়, কিন্তু সে "ভালবাসা-বাসি" কোন্ দেশের ভাল বাসা-বাসি? সমাজ উচ্ছেদকরী—শাসন বিরহিত আড়ম্বরময় ভালবাসা-বাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত সহজ হৃদয়ের ভাব? একটী অবিকৃত বঙ্গ মহিলার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে যে, সে হৃদয় ভালবাসায় পরিপ্লুত, সে হৃদয় ভাদ্রমাসের পদ্মা-নদীর মত প্রেমে ভরপুর—প্রেমে উন্মত্ত—প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু প্রকৃত পদ্মার মত সে প্রেমে কোন কূলই সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সেই উন্মত্ত উচ্ছ্বাস এতদূর সমাজ-ভয়ে, এতদূর ধর্ম্ম ভয়ে—এতদূর প্রাকৃতিক কোমলতা-গুণে প্রশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত, যে পদ্মা-নদীর মত তাহা প্রবল হইলেও ফল্গুনদীর মত তাহা অপ্রকাশ্যে বহিয়া যায়। কিন্তু এই বঙ্গীয় রমণী-হৃদয় আধুনিক লেখকদের হাতে কতদূর পর্য্যন্ত না কলঙ্কিত হইয়াছে! এই সকল লেখকদের বিদ্যা পরিচয়ে দেখিতে পাইবে

যে, কোন বঙ্গীয় কুমারী Desdemona-র মত বৃদ্ধ পিতাকে দুচারি কথায় ডিস্‌মিস্ করিতেছে, কেহ বা বিবাহের দিনে Calistas মত নিজ স্বামীকে দগ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় পরবশ Lothario-র অনুগমন করিতেছে—এবং কেহ বা বিবাহিত হইয়াও Guinevere-এর মত স্বামী-সঙ্গীর সহিত প্রেমের নদীতে আত্মবিসর্জ্জন দিতেছে। এ সকল ইংরাজি কবিতার গুণাগুণ থাকিতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের গঙ্গার উপকূলে এ সকল নায়িকার কি রূপে আমদানী হইল? আধুনিক বঙ্গীয় লেখকেরা মনে স্থির করিয়াছেন যে, নাটক বা কাব্যে বা উপন্যাসে প্রেমত চাইই। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজে বাস্তবিক অতদূর আড়ম্বরময় ভেল্কী লাগানো প্রেমের অবতারণা হইতেই পারে না। বেচারী বঙ্গীয় কুমারী প্রায় দশম বৎসরের মধ্যেই অন্যের অধিকারে যাইয়া পড়ে—যতদিন পর্য্যন্ত না যৌবনের আরম্ভ হয় তত দিন শ্বশুর শ্বাশুড়ী ননদিনীর শাসন-আবর্ত্তে তাহাদিগকে ঘুরিতে হয়—তার পর প্রকৃত যৌবনের সমাগমে নিজ স্বামীর সহিত প্রাণের আলাপ হয়;—সেই আলাপেই তাহাদের জীবনের সুখের সূত্রপাৎ, এবং তাহার অবসানেই তাহাদের জীবনের প্রকৃত ধ্বংশ। সুতরাং এরূপ সোজা-পথে প্রেমের বৈচিত্র্য, প্রেমের রঙ্গভঙ্গ, প্রেমের স্বর্গারোহন ও পাতাল গমন কিছুই ঘোরতর আড়ম্বর করিয়া দেখান' যায় না। বঙ্গীয় কবি কি করেন? তিনি Byron Shelley Swinburne আদিতে প্রেমের বিবিধ লীলা-খেলা দেখিয়াছেন, সুতরাং "ঘোরো" নরম-গোছ প্রেমের বর্ণনায় আর তাঁর রুচেনা, তিনি কড়া বিদেশী প্রেম নহিলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং কি করেন? কখন, তিনি শ্যামীকে পঞ্চদশ বৎসরের কুলীন কন্যা করিয়া, কখন বামীকে দৈব-বিপাকে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিয়া পরে প্রেমের তুমুল ঘোরপাকের পর বিবাহ দিতেছেন, কখন বামীকে বিবাহ-বিরোধিনী করিয়া ও দশম বর্ষীয়া ক্ষেমীর মাথা কবিত্ব-উন্মাদে পূর্ণ করিয়া তাহাদের মল-পরা আলতা দেওয়া কচি পা দুখানি দিয়া বলিষ্ঠ বৃদ্ধ সমাজের মাথায় পদাঘাত করাইতেছেন। সুতরাং দেখিতে পাই যে, সেই শ্যামী, বিবাহের সময় Juliet-এর মত বেনেখোঁপা নাড়িয়া বক্তৃতা দিতেছে—এবং বামী Ellen-এর মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ও মস্ত মস্ত কথা বলিয়া স্বার্থ ত্যাগ করিতেছে।

এ সকল দেশ-কাল-পাত্রভ্রষ্ট অসঙ্গত কল্পনা দৃশ্যে যাঁহারা প্রমোদিত হইতে চাহেন, সচ্ছন্দে তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া প্রমোদিত হউন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে পারি না। বিলাতী বিবিদের প্রগল্‌ভতা ভাল কি মন্দ, তাহা আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু ইংলণ্ড-মহিলা-সুলভ ঘনঘটাচ্ছন্ন বাগ্মিতা আমাদের মহিলাদের পক্ষে স্বাভাবিক কি না, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। বঙ্গীয় স্বামীর প্রবাস-যাত্রা সূত্রে এখনকার কবিদের ভাষায় স্ত্রী বলিয়া থাকে

এত করে সাধিলাম, এত করে কাঁদিলাম
তবুও কি চলে যাবে নাথ ?
লাজ ভয় নাহি জানি তব প্রেমে উন্মাদিনী
তাই কি করিলে বজ্রাঘাত ?
একান্তই যদি যাবে, মুহূর্ত্ত দাঁড়াও তবে
একবার দেখাই হৃদয়,
আন ছুরী, চিরি বুক যেথা আছে সুখ দুখ,
পরাণের নিভৃত নিলয়।
দেখাইব কত আশা, কত খানি ভালবাসা,
উথলিছে হৃদয় মাঝার
দেখাইব কার ছবি, প্রভাত তরুণ রবি
নাশিতেছে হৃদয় আঁধার !
তবু যদি যেতে চাও, যেথা সাধ সেথা যাও
ভাঙ্গিতে হৃদয় নব নব,
দোলে যাও সেই আশা, দোলে যাও ভালবাসা
পার যদি মোছ ছবি তব !

এই উচ্চ ভাবাপন্ন বিদ্বান কবি আমাদের সশঙ্কিত বঙ্গ-নারীর হৃদয় কি ঠিক বর্ণনা করিয়াছেন ? আমরা বলিব—কখনই না। একজন বঙ্গ মহিলা ওরূপ স্থলে এবং ওরূপ অবস্থায় স্বীয় সহচরীর নিকটে এই মাত্র ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিবে না—

"হাসি হাসি যখন সে "আসি" বলে,
সে "আসি" শুনিয়ে ভাসি নয়নের জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে—ছিঃ ছিঃ ছুঁয়ো না—
মনে রইল, সই, মনের বেদনা !
প্রবাসে, যখন যায় গো সে,
তারে বলি—বলি—আর বলা হ'ল না !
সরমে মরমের কথা কহা গেল না।
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে,
নিলজ্জ রমণী বোলে হাসিত লোকে,
সখি—ধিক থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম আর যেন করে না।

আমরা জানি যে জলদবিহারী বাজপক্ষীর তেজস্বিতা আছে—অথচ আঁধারময় নিভৃত কোটরের কপোতীর সশঙ্কিত কোমলতাও আছে—আমরা জানি যে অভ্রভেদী অশ্বত্থ বটের মহীয়সী গরিমা আছে, কিন্তু তাহার জন্য কি আমরা সঙ্কুচিত লজ্জাবতী লতার নিরীহ সঙ্কোচনের ম্রিয়মাণ কোমলতা ভুলিতে পারি ? সতেজ হৃদয় ইংরাজ মহিলাদের আমরা নিন্দা করি না, কিন্তু তা বলিয়া সুকোমল বঙ্গ মহিলাতে অস্বাভাবিক ভাবে তাহাদের তেজস্বিতা আরোপ করিয়া বঙ্গমহিলার জ্যোৎস্নাময় প্রতিমা বিকৃত করি কেন ? বাস্তবিক অশ্বত্থ বট ও লজ্জাবতী লতা একই নহে—বাস্তবিক বিলাতী নৃসিংহ-মর্দ্দিনী হৃদয় ও বঙ্গীয় মমতাময়ীর হৃদয় একই উপাদানে গঠিত নহে। এই আধুনিক প্রেমের কথা বলিতে গেলে অনেক কথা মনে আসিয়া পড়ে। আজ কালের নাটক কাব্য ও উপন্যাস সকল পাঠ করিলেই মনে হয় যে, বঙ্গ-মহিলারা বিবাহের আগেই নিজ নিজ লুকানো "প্রাণ-বল্লভের" চরণে হৃদয় বিকাইয়া ফেলে এবং সেই "প্রাণ বল্লভের" সহিত বিবাহিত না হইলেই তাহাদের পাঁজরায় পাঁজরায় খীল আঁটিয়া যায়। শুধু তাহাও নয়—সেই লুকানো "প্রাণ বল্লভও"

অভিলষিত বালিকাটীকে না পাইয়া "মরমে—মরমে" মরিতে থাকেন, এবং স্বীয় মর্ম্ম-যাতনা গোপন করিতে না পারিয়া ছন্দোবন্ধে তাহা সংবাদ পত্রে প্রচার করিয়া হৃদয়ের তরঙ্গ সমিত করিয়া ফেলেন। একজন প্রেমিক এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন—

কৌমার যখন তার, বলিত সে বা স্বার,
'আমি—তার, সে—আমার—অন্যকার(ও) হব না,
ও রে দুষ্ট দেশাচার ! কি করিলি অবলার,—
কার ধন কারে দিলি ?—আমার সে হ'ল না !
লোক লজ্জা মানভয়ে, মা বাপ নিদয় হ'য়ে
আমায় হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল !
অভাগার যত আশা জন্ম শোধ ঘুচিল !"

আমরা বলি "ঘোচাই" ত উচিত ! যেখানে "লোকলজ্জা মান ভয়" আছে, সেখানে বাস্তবিকই ত বিস্তর গোলযোগের কথা আছে, কিন্তু তা বলিয়া শিক্ষিত "নাগর নাগরীদের" ছাই ফেলিবার একমাত্র উপায় স্বরূপ মা-বাপের ও সমাজের উপর এত আক্রোশ কেন ? আমরা অবশ্য স্বীকার করি উক্ত কবিতাটী বিশেষ অবস্থাগত বিশেষ প্রেমিকের কাতর উচ্ছ্বাস হইতে পারে—কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে প্রায় আধুনিক সকল নাটকে কাব্যে ও উপন্যাসে ঐরূপ সুবিধা মত অবঙ্গীয় প্রেমের ঢেউ খেলিতে থাকে, তখন নিতান্ত পক্ষেই আমাদিগকে বলিতে হয় যে, আমাদের প্রাচীন গঙ্গা টেম্‌স্-নদীর কাছে তরঙ্গ-নাচনী অভ্যাস করিতেছে। কিন্তু এটা বিবেচনা করা উচিত বিলাতে নাচে Polka ; আর আমরা মূলেই নাচি না। একজন প্রকৃত বঙ্গ-মহিলা বিবাহের পূর্ব্বে কিছুই জানে না; পূর্ব্বরাগের "ধড়ফড়" বিচ্ছেদের "হাঁসফাঁস" কিছুই বুঝে না, কারণ বিবাহের পূর্ব্বে বঙ্গ-মহিলা বালিকা মাত্র। সুতরাং বঙ্গমহিলার যদি "বিরহ ব্যথা" বা "বিচ্ছেদ-বিকার" কখন হয়, তাহা তাহাদের বিবাহের পরেই হইবে। আধুনিক কবি বিবাহের পূর্ব্বেই নায়িকাকে যেরূপ বিলাপ করান, তাহা উদ্ধৃত হইল—

"পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন,
পাবে না কি অভাগিনী আর দরশন ?
* * *
কাছে এস প্রাণপতি প্রেম-পারাবার,
চির দুঃখিনীরে দুঃখ দিওনাকো আর।
* * *
এমন সময়ে পতি রহিলে কোথায়,
তুমি অবলার গতি, সাহস, সহায়,
প্রাণ কাঁদে প্রাণপতি কর হে বিহিত,
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত !"

এক জন প্রকৃত বঙ্গ-মহিলার কথা এই—

"বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভালই ছিলাম সই,
ছিলনা সুখ অভিলাষ !
পতি চিন্‌তেম না, ও সুখ জান্‌তেম না,
হৃদ-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সেই শতদল—মুদিত কমল, কাল
পেয়ে ফুটিল—

কিন্তু—বিরহেতে জন্মের মত বুঝি তা শুকালো ?”

এই বিরহের ভাবার্থ আমরা বুঝিতে পারি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ইহাতে কাল্পনিক প্রেমের ভেল্কি নাই বটে কিন্তু প্রকৃত সত্যের জাজ্বল্য প্রতিমা আছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, একজন যথার্থ কবি বিদেশীয় রীতি পদ্ধতির জটিল গোলকধাঁধার ভিতরে কখনই আপন কল্পনাকে বিচরণ করিতে দিতে পারেন না। বাস্তবিক যাহা চারিদিকে জীবন্ত ভাবে উঠিতেছে পড়িতেছে জ্বলিতেছে বা নিভিতেছে, তাহাই তাঁহাদের কল্পনা-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। এবং সেই কল্পনা যদি হীরকখণ্ডবৎ হয়, তবে সেই সকল সামগ্রী হইতে অনন্ত প্রকারের বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। কখনই তাঁহারা একটী নিরীহ “বেনেবউকে” গাউন বা জুতা পরাইয়া Imogen-রূপ স্ত্রী-হৃদয়ের তেজস্বিতা দেখাইতে চাহিবেন না। বা পত্নীর অঞ্চল-আশ্রয়ী বাঙ্গালী কাপুরুষের মুখে প্রতাপসিংহের বা পুরুরাজের প্রকৃত বীরদর্পোচিত জলন্ত তেজের বাক্যগুলি দিতে বাস্তবিক পারিবেন না। সেই সকল উত্তেজনাবাক্যের অপরিহার্য্য সার মর্ম্ম এই যে—“যে দেশে রামচন্দ্রের বীর্য্যে ও লক্ষ্মণের শৌর্য্যে লঙ্কাকাণ্ড হইয়া গিয়াছিল, যে দেশে অর্জ্জুনের বাহুবলে মহাদেব পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়াছিলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ ভীম প্রভৃতি মহাবীর সকল অপরিমেয় পরাক্রমে আপনা-আপনি ছারখার হইতে একটুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই—যে দেশে সাবিত্রী সতী ছিলেন ও লীলাবতী অঙ্ক কসিতেন—সে দেশ আজ কি না যবনের অধীন হইল ?” বাস্তবিক আমরা বুঝিতে পারি না যে এই প্রকার গিল্টী-করা চাকচিক্যময় উত্তেজনা-বাক্যের সারত্ব কি। প্রথমতঃ রাম লক্ষ্মণাদি বীরের সঙ্গে বঙ্গবাসীদের যে কতদূর নিকট সম্পর্ক তাহা সকলেই জানেন—দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের সত্তা আভাস মাত্র। বায়রণ পড়িয়া সহসা আমাদের চৈতন্য হইল, যে, কবি যদি হইলাম তবে দেশের উপর কবিতা লেখা উচিত। কি করা যায়; ব্যাস ও বাল্মীকির প্রাচীন কুলুঙ্গি হইতে ধূলা ঝাড়িয়া ভীম অর্জ্জুন দ্রোণ কর্ণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির নামগুলিকে বাহির করিলাম ও সেইগুলিকে লইয়া আমাদের এই গড়া-পেটা বীররসের খেলানা স্বরূপ করিয়া খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এই পুঁতুল-বাজির জন্যই কি ব্যাস বাল্মীকি তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ? যখন Burns লিখিয়াছিলেন।

Scots who have with Wallace bled
Scots whom Bruce has often led :
Welcome to your gory bed,
Or to victory ?”

কিম্বা যখন Campbell বলিয়াছিলেন—

“The spirits of your fathers
Shall start from every wave,
For the deck it was their field of fame
And ocean was their grave ;
Where Blake and mighty Nelson fell
Your manly hearts shall glow,
As ye sweep,
Through the deep
While the stormy winds do blow :

তখন আমরা জলন্ত আদর্শের অমোঘ প্রভাব বুঝিতে পারি—তখন আমরা বুঝিতে পারি যে উহাদের প্রকৃত পিতৃপুরুষেরা যাহা করিয়াছেন, উহারাও তাহা করিতে পারিবে, অথবা করিতে চেষ্টাও করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা না বলিয়া রাম লক্ষ্মণ যেরূপে হনুমান ও সুগ্রীব ও অঙ্গদের সাহায্যে সেতুবন্ধন করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন, অথবা অর্জ্জুন যেরূপে স্বর্গে অস্ত্রশিক্ষা করিয়া ও সকল দেবতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আত্মীয় জ্ঞাতি গোত্রজ সকলকে ধ্বংশ করিয়াছিলেন,——তাহা লইয়া উত্তেজনা করিতে গেলে কানে কেমন কৃত্রিম বলিয়া ঠেকে। কিন্তু বেচারা বঙ্গীয় কবি কি করেন ? যাহা অনুভব করেন নাই, তাহাই লিখিতে হইবে, সুতরাং যাহা ইংরাজী কেতাবে দেখেন তাহাই লেখেন।

শ্রী অঃ—

—:০:—

সম্পাদকের বৈঠক।

আঠা। *

জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সহজে ও মজবুত করিয়া জুড়িতে কি কি আঠার প্রয়োজন ও তাহা কি রূপে প্রস্তুত করা যায়, তাহা জানিলে পাঠকদের সচরাচর নানাবিধ কাজে লাগিতে পারিবে। নিম্নে কতকগুলি আঠার বিষয় প্রকাশ করা গেল।

১। ছানাকে দ্রবনীয় সিলিকেট্ অব্ সোডা অথবা পোটাসার (Soluble silicate of soda or potassa) সহিত গলাইয়া কাঁচের দ্রব্য বা চীনের বাসন জুড়িবার জন্য খুব শক্ত আঠা প্রস্তুত হয়।

২। তিন ভাগ টাট্‌কা মন্থন-করা রক্তে চার ভাগ পাথুরে চুন এবং অল্প ফট্‌কিরি মিশাইলে একপ্রকার কাদার মত পদার্থ প্রস্তুত হয়। চীনেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন জিনিষে ইহা দুই তিন বার লেপিয়া দিলে জল লাগিয়া তাহার কোন লোকসান হয় না। তৃণ-নির্ম্মিত ঝুড়ি চুপ্‌ড়ির মত সছিদ্র দ্রব্যে এই পদার্থ লেপিয়া দিলে তাহা এমন দৃঢ় হয় যে তাহাতে তেল

* Year book of Pharmacy and Transactions of the British Pharmaceutical conference. 1881.

রাখা যাইতে পারে। পিস্‌বোর্ডে (paste-board) এই দ্রব্য মাখাইয়া দিলে তাহা কাঠের মত দেখিতে ও কাঠের মত শক্ত হয়। চীনদেশে সরকারী কাঠের বাড়িতে এই পদার্থ লাগাইয়া দেয় ও এই উপায়ে তাহা মজবুত হয়। "Vienna Association of Industry"-তে এই আঠা পরখ করিয়া তাহার উপরি-উক্ত গুণ সকল প্রমাণ হয়।

৩। রজন্ পাঁচ আউন্স, মোম এক আউন্স, গেরিমাটি চূর্ণ এক আউন্স। গেরিমাটি গুঁড়া ২১২ ডিগ্রির উত্তাপে আগুনের ঝাঁজে বিশেষ রূপে শুকাইয়া ফেলা আবশ্যক। রজন ও মোম একত্রে গলাইয়া সেই গেরিমাটি গুঁড়ায় ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিয়া যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হয় ততক্ষণ নাড়িতে হইবে। কাঁচের পাত্রে পিত্তলের কাজ লাগাইবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়। ইহা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিষ্কৃত। ইহাকে cap cement অথবা Electrical cement কহে।

৪। ডিমের শাদা ভাগ তাহার সমান পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া উত্তম রূপ মন্থন করিবে। ও তাহাতে গুঁড়া করা চূন মিশাইয়া পাত্‌লা কাদার মত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কাঁচ, মৃৎপাত্র প্রভৃতি জোড়া যায়। প্রস্তুত হইবামাত্র ব্যবহার করা আবশ্যক।

৫। দুই ভাগ পিচ্ (common pitch) ও এক ভাগ গাটা পার্চ্চা (Gutta-Percha) এক লৌহপাত্রে গলাইতে গলাইতে যতক্ষণ না বিশেষ রূপে মিশিয়া যাইবে ততক্ষণ খুব করিয়া নাড়িতে হইবে। পরে সেই দ্রব পদার্থ ঠাণ্ডা জলে ফেলিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ইহা কালো, নিরেট ও স্থিতিস্থাপক হইয়া যাইবে। উত্তাপে ইহা নরম হয়। ১২০ ডিগ্রি উত্তাপে ইহা তরল হইয়া যায়। নরম কাদার মত, অথবা তরল, উভয় অবস্থাতেই ইহা ব্যবহার করা যায়। এই আঠা সর্ব্বত্র প্রশংসিত। ইহাতে ধাতু, কাঁচ, চিনারবাসন হাতির দাঁত প্রভৃতি অভি উত্তমরূপে জোড়া যায়।

৬। খুব উত্তম রূপ গুঁড়া-করা মুদ্রাশঙ্খ (Litharge) এবং সংহত গ্লিসেরিন্ (concentrated glycerine) একত্র মিশাইয়া যে আঠা হয়, তাহাতে কাঠের সঙ্গে লোহা অতি সুন্দর রূপে জোড়া যায়।

৭। শিরিষ আঠার বিষয় সকলেই জানেন, কিন্তু কি করিয়া তাহা ভাল রূপে ব্যবহার করিতে হয় তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। ভাল শিরিষ শক্ত, পরিষ্কার, এবং কোন প্রকার বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ বর্জ্জিত। যে শিরিষ ঠাণ্ডা জলে সহজে গলিয়া যায় সে শিরিষ ভাল নহে। ভাল শিরিষ ঠাণ্ডা জলে ফুলিয়া উঠে মাত্র। এবং ফুটন্ত জলেই ভাল করিয়া গলে। ভাল শিরিষ গলাইতে খারাপ শিরিষের অপেক্ষা অধিক জল লাগে। খুব মজবুত শিরিষের আঠা প্রস্তুত করিবার কতকগুলি উপায় আছে। তাহার মধ্যে দুইটি নীচে লেখা গেল।

চার আউন্স শিরিষ ১৬ আউন্স খুব কড়া অ্যাসেটিক্ অ্যাসিডের (Strong acetic acid) সহিত অগ্নি উত্তাপে গলাইলে এক প্রকার

অর্দ্ধতরল অর্দ্ধ কঠিন আঠা তৈয়ারি হয়। এই শিরিষ একটা পাত্রে লইয়া গরম জলের উপর বসাইয়া একটু গরম করিয়া লইলেই কাযের উপযোগী হয়।

একটি প্রশস্ত-মুখ বোতলে আদ পাইণ্ট জলে আট আউন্স সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিরিষ দিবে। অগ্নির উত্তাপে এক পাত্র জল গরম করিতে থাকিবে ও সেই জলের উপর উপরি-উক্ত বোতল বসাইয়া শিরিষ গলাইবে। তাহাতে ক্রমশঃ অতি অল্প অল্প করিয়া ২॥০ আউন্স নাইট্রিক অ্যাসিড্ (nitric acid sp.gr. 1.330) ঢালিবে ও ক্রমাগত নাড়িবে। সমস্তটা ঢালা হইয়া গেলে সেই দ্রব পদার্থকে ঠাণ্ডা হইতে দিবে। এই রূপে তরল শিরিষ প্রস্তুত হয়। ইহা বোতলে পুরিয়া উত্তম রূপে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহা জমিয়া যায় না, পচে না, এবং যখন আবশ্যক তখনি বিনা উদ্যোগে ব্যবহার করা যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা। বৈশাখ। বামাবোধিনীর দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। নববর্ষের প্রথম সংখ্যক বামাবোধিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ইহাতে বিচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও সকল গুলিই প্রায় সরস হইয়াছে।

মহাপূজা। শ্রী শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য দেড় আনা। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি শ্রীহট্ট মেলা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে যথার্থ উদ্দীপনা আছে। কবি যে এই কবিতাটি হৃদয়ের সহিত লিখিয়াছেন তাহা ইহার প্রতিছত্রে প্রকাশ পায়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

অজেন্দুমতী নাট্যগীতি। মূল্য ছয় আনা। এই নাট্যগীতির কিয়দংশ রঘুবংশের অবিকল অনুবাদ। ইহার মাঝে মাঝে কবিতা আছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে লীলাময়ী চটুল কল্পনার খেলা আছে।

মহৎজীবনের আখ্যায়িকাবলী। প্রথম খণ্ড। মূল্য তিন আনা। এই খণ্ডে থিওডোর পার্কার ও ভগিনী ডোরার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। এই পুস্তক খানি সাধারণ বালক

বালিকাদের পাঠ্য হইলে দেশের যথার্থ উপকার হইবে।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত। মূল্য আট আনা। এই খণ্ড কবিতাগুলিতে স্থানে স্থানে কবিত্বের আভাস আছে। ইহার কতকগুলি কবিতা ইংরাজি কবিতার অনুবাদ, যেমন "অতীত জীবনালোক" "শয্যাকণ্টক;" এবং কতকগুলি কবিতা অনুবাদ অপেক্ষাও নিম্নশ্রেণীর, তাহাতে খাঁটি হৃদয়ের ভাব নাই, তাহা কৃত্রিমতা পূর্ণ, যেমন "দুটি চাঁদ" "রূপ রবে কতক্ষণ"। বাকী কতকগুলি কবিতা গভীর না হউক্ মধুর হইয়াছে। যেমন "কেন বিষাদিত হৃদয় আমার?" "বিভাবরী।"

পাগলিনী নাটক। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। এই নাটক খানি ভাল হয় নাই। তবে স্থানে স্থানে পাঠ করা যায়—এই পর্য্যন্ত।

মায়াদেবী।

১

"সাগর তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই,
দুরন্ত ঝটিকা-বালারে খেলাই,
কখন আকাশে কখন পাতালে
নিমেষে চলিয়া যাই;
ঘোর ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ সমরে
কাঁপে রণাঙ্গন বীর-পদ-ভরে,
এক হুহুঙ্কারে স্তব্ধ চরাচর,
হরষে দেখিতে পাই।

২

"হুঙ্কারে বিদরে অনন্ত আকাশ,
ছুটিয়া পালায় দুর্দ্দান্ত বাতাস,
কোটি কোটি সূর্য্য ভেঙে চুরমার
কে কোথা ছড়িয়ে পড়ে;
বীর শৃঙ্গ সব হিমালয় হতে
ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটে শূন্যপথে,
আকুল ব্যাকুল ধায় উভরায়
জীমূত প্রলয় ঝড়ে।

৩

"অলকা অমরা কাঁপে থরথরি,
চন্দ্রলোক ভেঙে পড়ে ঝরঝরি,
শূন্যে শূন্যে ধরা ঘুরিতে ঘুরিতে
কোথায় চলিয়া যায়;
প্রলয় পিনাক ঘোর ঘন রব,
ভয়ে জড়সড় যক্ষ রক্ষ সব;
ধেই ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াই,
দৃক্‌পাত করি কায়?

৪

"দিগ্ দিগঙ্গনা আড়ষ্টের প্রায়,
বিকট দামিনী কট মট চায়,
ঘোর ঘর্ঘর উদগ্র অশনি
পদাগ্রে পড়িছে লুটে;
হো হো! পৃথ্বীতটে তিষ্ঠিতে পারে না,
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উগারিছে ফেনা,
লাফায়ে লাফায়ে পাগল সাগর
আকাশে চলেছে ছুটে।

৫

"ঘোর কোলাহল, গর্জ্জে নীল জল,
তুলিব অম্বরে দেহ টলমল্,
ছড়াইয়া দিব কাল কেশ রাশি
বিজলী বেড়াবে তায়;
জ্বলন্ত তারকা মালাকা গলায়,
উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়,
ধায় ধূমকেতু দীঘল অঞ্চল
গোমুখী নির্ঝর প্রায়।

৬

"দুরু দুরু মেঘ-মৃদঙ্গ বাজাব,
মধুর নিনাদে জগত জাগাব,
জাগিবে মানব দানব দেবতা,
নবীন হরষ ময়;

চেয়ে রবে সবে পিপাসী নয়ানে
কুতূহলী হয়ে গগনের পানে,
হেরিবে আনন্দে আননে আমার
তরুণ অরুণোদয়।

৭

"প্রতি নিশীথিনী বিরাম সময়ে,
স্ফুট-চন্দ্র-তারা ব্যোমের হৃদয়ে
প্রসারিয়া এই সুদীর্ঘ শরীর
শুয়ে থাকি আমি সুখে ;
মায়াময় মম অপরূপ জ্যোতি,
ছায়াপথ বলে যত ভ্রান্তমতি,
ব্যোম-গঙ্গা বলে কবি পাগলেরা
শুনি আমি হাসি মুখে।

৮

"সাগর-অম্বরা কুসুম জোগায়,
প্রচণ্ড পবন চামর ঢুলায়,
দিগ্‌বধূ বালা সেবাসখী সব
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
নয়ন-কিরণে কমলা সঞ্চরে,
শুভ সরস্বতী অধরে বিহরে,
মহান্ অম্বর প্রিয় প্রাণপতি
সম্ভ্রমে প্রণয় যাচে।"

৯

মায়াময় তব জ্যোতি মনোহারী
বটে গো কালের অজেয় কুমারী,
মহা মহীয়সী উদার-রূপসী
অম্বর-হৃদয়-রাণী।
অলীক স্বপন জনন মরণ,
চিরকাল তব নবীন যৌবন ;
তোমারি সন্তোষে হাসে ত্রিভুবন,
রোষেতে নিধন জানি।

১০

স্থির ধীর নীল অনন্ত অপার
এই যে বিরাট ব্যোম পারাবার,
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার
চলিয়াছ ভাসি ভাসি ;
মৃদুল মৃদুল ঠেকে ঠেকে গায়
কিরণের ফেন উছলিয়া যায়,
দশ দিক দিয়ে দেখিতে তোমায়
ফুটেছে তারকা-রাশি।

১১

এ নীল আকাশ তরল আরশি,
ব্রহ্মের বিমল মানস সরসী,
ফুটে ফুটে তায় ভাবের কুসুম
তারকা ছড়ায়ে আছে ;
তুমি স্বপ্নময়ী রাজহংসমালা
ঘুম-ঘোরে তাঁর কর লীলাখেলা,
বসি, হাসি হাসি হেরিছে চন্দ্রমা
ধরার কোলের কাছে।

১২

অহো! আদি-দেব-স্বপন-রূপিণী,
অবোধ মানব কিছুই জানিনি,—
উদাস—উদাস অনন্ত আকাশ
চলি চলি কোথা যাও!
কার সঙ্গে ধেয়ে চলেছ কি হেতু
চন্দ্র সূর্য্য তারা ধরা ধূমকেতু!
বল বল বল ওপারে কি আছে,
কিছু কি দেখিতে পাও?

১৩

সেই কি আমার গৃহ চিরন্তন,
এই কিরে সুদু নাট-নিকেতন!

কেনই কেবল হাসিতে কাঁদিতে
এখানে এসেছি সবে!
চকিতে ফুরা'ল রস-রঙ্গ-খেলা,
একেলা আসিনু, চলিনু একে'লা,
কতই সাধের বসন ভূষণ
কেন গো কাড়িয়া লবে!

১৪

কেন, মায়াদেবী! ছেড়ে দাও দাও,
পথ রোধ করি ঘুরিয়া বেড়াও!
উধাও উধাও ভেদিব আকাশ,
দেখিব আপন দেশ ;
ডুবিব সে মহা তমান্ধ সাগরে,
দূর—দূর—দূর—অতি দূরান্তরে
অসংখ্য জগত দীপ্ দীপ্ করে
দীপকের পরিবেশ।

১৫

ধীরে ধীরে ধীরে তিমির গভীরে
ঊর্দ্ধ-পদতল নিম্ন-নতশিরে
অনন্ত আরামে ঘুমায়ে ঘুমায়ে
তলায়ে তলায়ে যাব!
মাটির শরীর তিমিরে গলিয়া
পরাণপুতলী উঠিছে জাগিয়া,
জাগিয়া উঠিছে আলোকে আলোক,
কি এক পুলক পাব!

১৬

দূর পদতলে তিমির-সংহতি,
ফোটেনাক আর আকাশের জ্যোতি,
জগতের কোলাহল হাহাকার
কালের সাগরে লীন ;
মধুর মধুর আলোক সঞ্চারি
প্রফুল্ল-মূরতি প্রাণী মনোহারী
কিরণ মণ্ডলে বেড়ায় সকলে,
কি এক মধুর দিন!

১৭

সুখ-স্বপ্ন-ময় অমৃত-সাগর
ঈষৎ ঈষৎ কাঁপে থর থর,
অপূর্ব্ব সৌরভে আকুল পরাণ,
ফুলের পুলিন-দেশ ;
বেড়ায় সকল মধুর মূরতি
কিবে অপরূপ রূপের স্ফূরতি!
সুধাংশু-কলিত ললিত শরীর,
নিবিড় চাঁচর কেশ।

১৮

ধীরে ধীরে হাসি অধরে বিহরে,
কপোল-কুসুম ফোটে থরে থরে ;
কিরণে কিরণে জীয়ায়ে জীবনে
করুণ নয়নে চায়,
পৃথিবীর সেই সুমঙ্গল তারা
ঘুমঘোরে যেন হয়ে পথ-হারা,
চাহিয়া চাহিয়া উষারে খুঁজিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া ভায়।

১৯

অতি অমায়িক প্রশান্ত-কিরণ
ঘুমন্ত শিশুর হাসির মতন
কি যেন ফুটেছে ত্রিদিব-কুসুম
ওকি ও আলোক ভায়!
ওই নিরমল আলোকের মাজে
কে গো ও পরম পুরুষ বিরাজে,
প্রেমেতে বাঁধিয়া পরাণ পুতলী
ভুলায়ে লইয়া যায়!

২০

পাগল-বিহ্বল,—হরষ ধরে না,

জড়িমা-জড়িত চরণ চলে না,
অঘোর উল্লাসে আলস অবশে
ঢুলিয়ে পড়িছে মন ;
অতি স্নিগ্ধ ওই স্নেহময় কোলে,
—মা'র কোলে শুয়ে শিশু মেয়ে দোলে—
দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়িব !
সচেতনে অচেতন।

২১

ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসিয়ে হাসিয়ে
চাই মুখ পানে নয়ন মেলিয়ে,
কি যে নিধি পাই করেতে আমার
তা সুদু শিশুই জানে !
যে দূর-সংগীত শোনে মনে মনে,
ফুটে তা বলিতে পারে না বচনে ;
হাসিয়া কাঁদিয়া কতই ব্যাকুল
চাহিয়া স্বরগ পানে !

২২

কর, দেব, পুন শিশু কর মোরে,
আদরে মায়ের গলা ধোরে ধোরে,
দেখিব তাঁহার স্নেহের বয়ানে
তোমার মঙ্গল মুখ !
মা'র সোহাগের কথা সুললিত,
শুনিব তোমার সুমঙ্গল গীত !
নাচিব হাসিব কাঁদিব হরষে,
উদার স্বরগ-সুখ !

২৩

আর শিশু আমি নাইরে এখন,
ফুরায়ে গিয়েছে স্বরগ-স্বপন,
সুধার সাগরে উঠেছে গরল,
জীবন যন্ত্রণা-ময়,
আর ত্রিভুবন নাই অধিকারে,
একেলা পড়িয়া আছি একধারে ;
তোমারি পৃথিবী, তোমারি আকাশ
কিছুই আমারি নয় !

২৪

ফের্ কেন মায়া প্রেমে বাধা দাও,
কোথাকার আমি, কোথা নিয়ে যাও !
ফিরে দাও দাও, দাও সে আমার
জীবন-জুড়ান ধন !
ধাও রে পবন স্বন স্বন স্বনে,
গড়াও পৃথিবী গভীর গর্জ্জনে,
হাস রে চন্দ্রমা নীল গগনে,
গাও গাও ত্রিভুবন !

২৫

কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-প্রাণী,
ফল-ফুল-ভরা মনো-হরা ধরাখানি,
কোন্ দেব এনে দিয়েছে না জানি
আমারি সুখেরি তরে !
হরষে সাগর ধেয়েছে মাতিয়া,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলিয়া,
আকাশ পাতাল ভরিয়া পবন
প্রাণ খুলে গান করে !

২৬

উন্মুখে আমারে হাসিতে দেখিয়া
কোটি কোটি তারা ফুটিছে হাসিয়া,
ফুটিয়া হাসিছে অনন্ত কুসুম
ধরার উদার বুকে ;
হিমাদ্রির মহা হৃদয় উছলি
চলিয়াছে গঙ্গা মহা কুতূহলী,
কল কল নাদে ধায় মন সাধে
ফেন-ময়-হাসি-মুখে।

২৭

কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী ওঠে ডাকি ডাকি,
স্তব্ধ হ'য়ে শোনে সারি দিয়ে শাখী,
আহ্লাদে আকুল মেখল-লতিকা
পূরিয়ে উঠেছে প্রাণ ;
গৌরীসঙ্কর শুভ্র শৃঙ্গ পরি
ঘুমায় প্রকৃতি পরমা সুন্দরী,
চাঁদের কিরণ হেরি সে আনন
কি যেন করিছে ধ্যান।

২৮

ধীরে—ধীরে—অতি ধীরে শুনা যায়
স্বরগে কে যেন বাঁশরী বাজায়,
ভাসি ভাসি আসি, চলি চলি যায়
সুদূর মধুর স্বর !
কে যেন আমারে ঘুম পাড়াইয়ে
হৃদয়ে আপন হৃদয় ঢালিয়ে
পরাণ কাড়িয়া পালিয়ে বেড়ায়
ধর ধর, ধর ধর !

২৯

কেন কাদম্বিনী ! দাঁড়ায়ে সমুখে
ঢাকিয়া রেখেছ অমৃত ময়ুখে !
ওই আধ আধ চাঁদের আভাস
পাগল করেছে মোরে !
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
চারিদিকে আমি কি যেন নেহারি !
কাঁদিয়া উঠেছে পরাণ পুতলী,
বেঁধো না বন্ধন-ডোরে !

৩০

বিশ্ববিমোহিনী দেবী ! চল চল,
থল থল করে স্বচ্ছ নীল জল,
অতি স্নিগ্ধ এই উদার আকাশে
ঘুমাও আরামে মা-গো !
জাগ সরস্বতী অমৃত-বিজলী,
জাগ মা আমার হৃদয় উজলি,
কিরণে কিরণে চেতাও চেতনে,
জাগ মা, জাগ মা, জাগো !

গান।

ভৈঁরো, একতালা। ভজনের সুর।

কেরে বালা কিরণ-ময়ী,
ব্রহ্ম-রন্ধ্রে বিহরে !
দিক্ প্রকাশ,
বিমল ভাস,
বিমল হাস অধরে !

নাচিতে নাচিতে হৃদয় ধায়,
আকাশ ভেদিয়া কোথায় যায়,
অপরূপ এ কি নয়নে ভায় !
ভায় প্রাণের ভিতরে !

কেন দরদর নয়নে বারি,
প্রাণ ভোরে আহা হেরিতে নারি !
কেন কেন শূন্যে বাহু পসারি !
কেন তনু শিহরে !

কোথা সে আমার সাধের ভবন,
কোথা প্রাণপ্রিয়া প্রিয় পরিজন,

কোথা চন্দ্র তারা কোথা ত্রিভুবন!
মগন সুধার সাগরে!

অহো! মহাযোগী দাও প্রাণ খুলি,
দাও-বাল্মীকি, শিরে পদধূলি,
গুরু কৃপা-মোদ-ভরে ঢুলি ঢুলি
ভ্রমিব স্বপন-নগরে—
চিরজীবন ভ্রমিব স্বপন-নগরে!

শ্রী বেহারীলাল চক্রবর্ত্তী *

চা-ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ।

(পত্র।)

এই বার আমি সেখানে কি রকম আমোদ প্রমোদ করিতাম, কি করিয়া সময় কাটাইতাম, সেখানকার সাহেবরা কি রকম—এই সব লিখিব। আমি প্রথমে কিছু দিন ম্যানেজারের সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম। আমার একটা আলাদা বাংলা ছিল, সেটা তখন মেরামত হইতেছিল—বাংলা শুনিয়া তোমার হয়ত মনে হইবে, ইঁটের দেয়াল আর খড়ের চাল, তা যদি মনে কর তো ভারি ঠকিবে। এখানকার বাংলায় দরমার বেড়া আর খড়ের চাল। আমি আট দিন ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলাম। তিনি খুব আমুদে লোক। তাঁর বয়স যদিও আমাদের সকলের চেয়ে বেশী ছিল, তাঁর মতন আমোদ করিতে আমরা কেহই পারিতাম না; তিনি অল্পেতে খুব মাতিয়া উঠিতেন। চা-কর-জীবনে একটু অভিজ্ঞতা না জন্মাইলে এঁদের সঙ্গে ভাল মিশা যায় না বরঞ্চ এঁদের কাছে বিরক্তি-ভাজন হইয়া পড়িতে হয়; সেই জন্য এখানে কোন নূতন শিক্ষানবীশ আসিলে প্রথমে তাঁহাকে একলা থাকিতে হয়। এই অভিপ্রায়ে তাঁহাদের জন্য একটা আলাদা বাংলা পর্য্যন্ত আছে। এই খানে তাঁহাকে চার মাস কি এক বৎসর—যত দিন না পর্য্যন্ত তিনি আপনাকে চা-কর জীবনের উপযোগী করিয়া দাঁড় করাইতে পারেন তত দিন আলাদা থাকিতে হয়। আমাকে একলা থাকিতে হইয়াছিল। আমি একটা প্রকাণ্ড বাংলা অধিকার করিয়া ছিলাম, সেটার নাম Hill, সেটী আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাহা একটা উঁচু টিলার উপর —বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তার দুধারে ঝাউ অশথ গাছ ছিল, এই বাংলাটা শিলকুরির সব বাংলার চেয়ে উঁচু জায়গায়। যাক্, আমি এইখানে থাকিয়া চায়ের কাজ শিখিতে

* মায়াদেবীর প্রথম তিনটি শ্লোক শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনা।

প্রবৃত্ত হইলাম। এখানকার চা-করদের কথাবার্ত্তা ইত্যাদি সব ভিন্ন রকম, নূতন সহর থেকে কোন লোক গেলে তাঁহাকে সে সব শিখিতে হয়। এখানকার সাহেবদের কথাবার্ত্তা প্রায় ঘোড়া লইয়া, নয় চা বাগান লইয়া। কার কেমন ঘোড়া, কার ঘোড়া ভাল "হকি" খেলিতে পারে, কোন্ বাগানে কত মন চা হয়, কি রকম করিলে চায়ের গন্ধ ভাল হয়—এই সব কথা অধিকাংশ সময়ই হয়; এঁদের সঙ্গে মিশিতে হইলে এই সব খবরগুলো ভাল রকম জানা চাই। আমি প্রথমে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। মনে কর, এক জন বলিল Boer played awfully nice. তার মানে বোয়ার নামে একটা পণি ভাল হকি খেলিয়াছিল। আমি ইতি পূর্ব্বে কখন তাকে দেখি নাই আমি তার বিষয় জানিব কি করিয়া? উহাদিগের মধ্যে প্রায়ই এই রকম কথা হইত, সুতরাং অধিকাংশ সময়ই আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত। এখানে সব খোলাখুলি ভাব, ততটা আদব্ কায়দা রীতি নীতি বজায় রাখিয়া চলিতে হয় না (তাই জন্য আমার পক্ষে সুবিধা ছিল) তবে এক-জন লেডি আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়। এটুকু রক্ষা করিতে হয়। অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে কোন গোলযোগ ছিল না। অবিবাহিতদের মধ্যে কি রকম কাণ্ড কারখানা পরে বলিব। আমি বাঙ্গালী বলিয়া চা-করেরা আমাকে, তেমন ঘৃণার চক্ষে দেখে নাই কিন্তু সেখানকার বাঙ্গালীদের উপর তাঁরা অত্যন্ত চটা। আমি বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা কই এটা তাঁদের গায়ে সহিত না। আমি একদিন একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে কি কথা কহিয়াছিলাম সেই জন্য একটি সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "অমন করে ওদের নাই দিওনা, ওরা ক্রমে বাড়াবাড়ী করিবে, ক্রমে ওরা তোমার বাঙ্গলার উপর উঠিবে।" আমি বলিলাম সে বোঝাপড়া উঁহার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে হইবে। তাতে তিনি তখন আর কিছু বলিলেন না কিন্তু আমাকে প্রায়ই সকলে বলিতেন যে বাঙ্গালীর সঙ্গে আদবে মিশিও না। তার মানে আছে। চা বাগানের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা আপনাদের মন্দ আপনারা করিয়াছে। তারা কোন সাহেব দেখিলে অমনি তাড়াতাড়ী ঘোড়া হইতে নাবিয়া সেলাম করিয়া হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং তাহাদের যাহাতে সাহেবরা খুব নীচ চাকর মনে করে তার জন্য বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করে। এ গুলো দেখে দেখে সাহেবদের ক্রমে অভক্তি হইয়া গেছে। আমি জানি যখন কোন নূতন সাহেব বিলাত থেকে আসেন, তিনি প্রথমে তাঁর বাবুকে (সাহেবরা বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের যেমন বলেন) আপনার পাশে লইয়া বসান্, খুব ভদ্রতা করিয়া কথা কন তার পর ক্রমে তিনিই আবার তাঁকে বাংলায় উঠিতে দেন্ না। আমি দেখিয়াছি এখানকার সাহেবরা বাবুদিগকে কুলিদের মতন দেখেন। এখানকার

সাহেবদের কাছে বাবু একটা খুব দরকারী জিনিস (না হলে বোধ হয় তাদের উপর এত চটা যে একটা বাঙ্গালীও বাগানে রাখিতেন না) কেন না, সাহেবদিগকে তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, নইলে চলে না, হিসাবপত্র জমাখরচ এ সব রাখা ইংরেজদের পোষায় না—তার মানে পারেন না। সাহেবরা কেবল একবার হাঙ্গাম করিয়া বাগানের চারিদিকে বেড়াইয়া আসেন, কুলিরা কাজ করিতেছে কি না দেখেন, এ ছাড়া চা বাগানে যত শক্ত কাজ সবই প্রায় বাঙ্গালীর দ্বারায় হয়। সাহেবরা প্রথমে আমার কাছে খুব জাঁক দেখাইতেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশিতাম। একদিন শুইয়া আছি, রাত প্রায় নয়টা বাজে এমন সময় একজন চা-কর সাহেব আমার বাংলায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন Mr. T তোমার উপকারের জন্যই আসিয়াছি। তিনি বলিলেন "আমি শুনেছি তুমি বাবুদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। আমি যদিও এটা বিশ্বাস করি না তবুও তুমি নূতন লোক, তোমাকে কতক গুলি উপদেশ দিব। আমি মনে মনে বলিলাম তথাস্তু। তার পর তিনি এই রকমে আরম্ভ করিলেন "বাবুদের উপর আদবে নির্ভর করিও না, তারা এক রকম কুলি। একেবারে কুলি না হোক, কুলির চেয়ে জোর এক ধাপ উঁচু, ওরা তোমার সঙ্গে মিশিবার জন্য খুব চেষ্টা করিবে কিন্তু তুমি মিশোনা, এমন কি ওদের সঙ্গে কথাও কহিবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি তুমি আমাকে বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা আমোদ প্রমোদ করিতে দেখ তাহা হইলে আমার উপর তোমার মনের ভাব কি রকম হয়? তিনি বলিলেন তাঁর মনের ভাব কি রকম হয় তাহাতে বড় একটা যায় আসে না কিন্তু অন্য সাহেবরা আর আমার সহিত কথা কহিতে চাহিবে না। আরও বলিলেন যে তুমি যদি ও রকম করিয়া উহাদের সঙ্গে কথা কও তাহা হইলে হইবে এই যে, ক্রমে ওরা আমাদের সঙ্গে ওই রকম করিতে আসিবে, সেটা আমরা ভাল বাসি না।" আমি যখন কলিকাতা থেকে আসি, তখন আমি আমার সঙ্গে বই আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে সিলচার ষ্টেসনে সেখানকার ধনী বাঙ্গালীরা মিলিয়া একটা পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, আমি ভারি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সেখানকার গ্রাহক হইলাম। আমি যখন লিখিয়া পাঠাইতাম তখনি পুস্তক পাইতাম। কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, অমুক পুস্তকালয়ের কথা শুনিয়াছ? তিনি বলিলেন, না—আমি জানি না যে কাছাড়ে লাইব্রেরী আছে, তুমি কোথা থেকে সন্ধান পাইলে? আমি বলিলাম যে এখানকার ডাকবাবু আমাকে সন্ধান দিয়াছেন। তিনি বলিলেন Oh Mr. T. you are dangerously mixing with the Baboos, আমি যদি হইতাম ত কখনও এ লাইব্রেরীতে চাঁদা দিতাম না। আমি বলিলাম আমার এখানে অন্য কোন রকম সুবিধা নাই, বাড়ী থেকে বই আনাইলে

অনেক বৃথা খরচ পড়ে, অথচ আমি এত অল্প দামে এখানে সব রকমই বই পাই। তিনি বলিলেন তুমি ভারি বোকা, তুমি যদি বাড়ীতে বই-এর জন্য লেখ তাহা হইলে তোমার কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারিবেন যে তুমি পড়িতেছ শুনিতেছ, তোমাকে বই পাঠাইয়া দিতে তাঁদের বিশেষ আমোদ হইবে, তা নয় তুমি যত নেটিবদের প্রশ্রয় দিতেছ। আর এক কথা, তুমি নাকি বাঙ্গালীদের উপর সব বিষয়েই নির্ভর কর? বাগানের যত কাজ তোমার নিজের করা উচিত। মনে কর বাবুরা ইঁদুর আর আমরা বেড়াল। তারা কি করে? আমরা যখন বাগানে থাকি না অন্য কোথাও যাই তখন তারা আর কাজ করে না কিন্তু আমরা যখন বাগানে থাকি তখন তারা ভয়ে ভয়ে কাজ করে—When the cat's away the mice will play (অর্থাৎ "বামন গেল ঘর, নাঙ্গল তুলে ধর") বস্তুতঃ বাবুদের উপর নির্ভর করিবার আমার কোন দরকার উপস্থিত হয় না। এঁর ইচ্ছা যে আমি জানি যে ইনি সমস্ত কাজ আপনি চালান, হিসাবপত্র ইত্যাদি সমস্ত আপনি করেন—ও হরি! তারপর শুনি যে ইনি যত বাঙ্গালীদের উপর নির্ভর করেন অমন কাছাড়ে আর কেউ করেন না। শেষে যাবার সময় বলে গেলেন "M. T. তুমি সব বুঝেছ, আর আমাকে বল্‌তে হবে না।" দৈবাৎ মাঝে মাঝে ইহাঁরা বাবুদের ঘাঁটাইয়া দিবি উত্তম মধ্যম প্রহার খান। আমি শুনেছি আমাদের বাগানের কাছাকাছি একটা বাগানে ম্যানেজার কিছু বাড়াবাড়ী করিয়াছিলেন তিনি তাঁর হেড্ বাবুকে লাথি মারেন, বাবুটি খুব বলিষ্ঠ ছিলেন, আর তাঁর দলে সমস্ত কুলিরা ছিল, কুলিরা রাগিয়া উঠিয়া মারিতে যায়, বাংলা জ্বালাইতে যায়, অনেক কষ্টে তাদের নিবারণ করা হইয়াছিল। বাবুটি দিব্যি ঘাকতক দিয়াছিলেন, সেই অবধি তিনি একটু সিদে আছেন। সব বাঙ্গালীরা যদি এই রকম করেন তবে সব ঠিক হয়। সাহেবরা যখন সিলচার ষ্টেসানে যান, তখন আর বাঙ্গালীর কাছ থেকে সম্মান পান না। ষ্টেসনের সব বাঙ্গালীই তাঁদের উপর চটা, আর সেখানে বাঙ্গালীরই রাজত্ব, সেখানে গেলে তারা এঁদের বড় একটা গ্রাহ্য করে না—তাঁদের উপর কোন রকম প্রভুত্ব না করিতে পারিয়া এঁদের মনে মনে ভারি আপশোষ হয়। আবার সময়ে সময়ে বাবুদের সঙ্গে ভারি ভাব করেন। যখন কোন একটা শক্ত হিসাব করিতে হয় তখন বাবুদিগকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া ভারি আপ্যায়িত করেন, হিসাবপত্র করিয়া লন। আবার বাবুরা পূজার সময় বাই নাচ দেন, তখন বাবুদের খাতির দেখে কে! যত চা-কর সাহেব রাত্রিতে বাবুদের বাড়ীতে জোটেন, নানা রকম রঙ্গরস করিতে থাকেন, সে একেবারে হুলস্থূল ব্যাপার। একটা বাগানের বাবুরা একবার নাচ দিলেন, আমার সেখানে নিমন্ত্রণ হয়, সেখানে তিন জন লেডি ও অন্যান্য বাগানের চা-কর সব আসিয়া জুটিলেন। বাবুর বাসায় সে দিন বড় ধুম—বেললণ্ঠণ টাঙ্গাইয়া

ফুলের মালা ঝুলাইয়া সে এক কারখানা করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা গিয়া ত চেয়ারে বসিলাম। আমাদের আশেপাশে মেলাই কুলি, তারা মাঝে মাঝে বিলক্ষণ রসিকতা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে নাচ Obscene বলিয়া Ladyরা উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এতক্ষণে বোধ করি বিবি-catগুলি বিদায় হওয়াতে সাহেব-mouse গুলি নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিবার অবসর পাইল। আমাকে সকলে ধরিয়া বসিল, যে, বাইওয়ালীরা যে গান গাহিতেছে সে সমস্ত ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া তাহাদের শুনাইতে; প্রথমতঃ আমি তাদের গানের ভাষা ভাল বুঝিনা, দ্বিতীয়তঃ আমার ইংরাজি ভাষায় যা কিছু পুঁজী ছিল তাতে কুলাইয়া উঠিল না। ভারি মুস্কিলে পড়িয়া ছিলাম। তার পর নাচ হইয়া গেল, আমরাও যে-যার বাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। নাচ ফুরাইল, বাবুদের খাতিরেরও শেষ হইল। আর একটা কথা বলিয়া বাবুদের কথা শেষ করি। এখানকার সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে জবাব দিবার অগ্রে তাঁহাদিগকে জানান হয়। কিন্তু বাবুদের সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই। যখন-তখন তাঁহাদের জবাব দেওয়া হয়। আর জবাব হইয়া গেলে তাঁদের এক মিনিটিও বাগানে থাকিতে দেওয়া হয় না। মনে কর একজনকে আজ জবাব দেওয়া হইল, সে বেচারার বাড়ি হয়ত দূর দেশে; হাতে টাকা নাই, সে অত্যন্ত বিপদে পড়ে। সেই জন্য যেখানে বাবুরা সকলে মিলিয়া একটি আবেদন-পত্র লিখিলেন, লেখা হইল ছাপাও হইল। তাহাতে লেখা ছিল—সাহেবরা তাঁহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন কেন? তাঁহারা চান যে তাঁহাদের জবাব হইবার অগ্রে যাহাতে খবর পান; তাঁহাদের উপর কেনবা এত অত্যাচার করা হয়, তাঁহারা কিসে সাহেবদের অপেক্ষা কম কার্য্যদক্ষ? তাঁরা ত সমস্ত বাগানের কাজ কর্ম্ম করেন ইত্যাদি। সাহেবরা এই দরখাস্তর খবর শুনিয়াই অমনি বাবুদের খাসাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—ওরূপ করিলে সকলেরই জবাব হইবে, সেই অবধি সকলে চুপ করিয়া আছেন।—

(ক্রমশঃ)

—:০:—

বসন্তরায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বসন্তরায় আর বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি। এই মতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আছে কি না জানি না, কিন্তু উভয়ের লেখা পড়িয়া দেখিলে উভয়কে স্বতন্ত্র কবি বলিয়া আর সংশয় থাকে না। প্রথমত, উভয়ের

ভাষায় অনেক তফাৎ। বিদ্যাপতির লেখায়—ব্রজভাষায় বাঙ্গলা মেশান,' আর রায়-বসন্তের লেখায়—বাঙ্গলায় ব্রজভাষা মেশান'।) ভাবে বোধ হয়, যেন, ব্রজভাষা আমাদের প্রাচীন কবিদের কবিতার আফিসের বস্ত্র ছিল। শ্যামের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলেই অমনি সে আটপৌরে ধূতি চাদর ছাড়িয়া বৃন্দাবনী চাপকানে বত্রিশটা বোতাম আঁটিত ও বৃন্দাবনী শাম্‌লা মাথায় চড়াইয়া একটা বোঝা বহিয়া বেড়াইত। রায় বসন্ত প্রায় ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। তিনি খানিকক্ষণ বৃন্দাবনী পোষাক পরিয়াই অমনি—"দূর কর" বলিয়া খুলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কখন এমন বেয়াদবি করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়াছেন, এমন আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও কায়দা লঙ্ঘন করেন নাই। বসন্তরায়ের কবিতার ভাষাও যেমন, কবিতার ভাবও তেমন। সাদাসিধা; উপমার ঘনঘটা নাই; সরল প্রাণের সরল কথা; সে কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াই মিথ্যা। কারন, সরল প্রাণ বিদেশী ভাষায় কথা কহিতে পারেই না; তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি, তাহার সূক্ষ্ম, স্পর্শ-কাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলেমালে একেবারে চুপ করিয়া যায়, বিদেশী ভাষার জটিলতার মধ্যে আপনাদের হারাইয়া ফেলে। তখন আমরা ভাষাই শুনিতে পাই, উপমাই শুনিতে পাই, সে সুকুমার ভাবগুলির প্রাণছোঁয়া কথা আর শুনিতে পাই না। এমন মানুষত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের দেখিলে মনে হয়, মানুষটা পোষাক পরে নাই, পোষাকটাই মানুষকে পরিয়া বসিয়াছে। পোষাককে এমনি সে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোষাক ঝুলাইয়া রাখিবার আল্না মাত্র মনে করে, পোষাকের নামেই তাহার দাম। এমনি করিয়া সে পাগড়ি পরে যে, তাহার পাগড়ি দেখিয়া লোকে তাহার মুখ দেখিতে একেবারে ভুলিয়া যায়। আমার ত বোধ হয়, অনেক স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ঘোমটার চেয়ে অধিক কাজ করে, তাহার হীরার সিঁথিটার দিকে লোকে এতক্ষণ চাহিয়া থাকে যে তাহার মুখ দেখিবার আর অবসর থাকে না! কবিতারও সেই দশা আমরা প্রায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। ভাষার পাগড়ির মধ্যে তাহার মুখ এমনি ঢাকিয়া যায় যে, মুখের সৌন্দর্য্য দেখান'র বিষয়ে সে একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পাগড়ির উপরেই হীরা জহরাৎ লাগাইতে থাকে। প্রাচীন কবিদের এক এই মস্ত সুবিধা ছিল যে, তখন এত বসন ভূষণের সৃষ্টিই হয় নাই, সুতরাং সহজ ভাবগুলির প্রতিই তাঁহারা একমাত্র মনোযোগ দিতেন। তবে এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যেও তারতম্য ছিল। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডিদাসের তুলনা করিলেই টের পাওয়া যাইবে যে, বিদ্যাপতির অপেক্ষা চণ্ডিদাস কত সহজে সরলভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার বিদ্যাপতির

সহিত বসন্তরায়ের তুলনা করিলেও দেখা যায়, বিদ্যাপতির অপেক্ষা বসন্তরায়ের ভাষা ও ভাব কত সরল। বসন্তরায়ের কবিতায় প্রায় কোন খানেই টানাবোনা তুলনা নাই, তাহার মধ্যে কেবল সহজ কথার যাদুগিরি আছে। যাদুগিরি নহে ত কি? কিছুই বুঝিতে পারি না, এ গান শুনিয়া প্রাণের মধ্যে কেন এমন মোহ উপস্থিত হইল,—কথাগুলিও ত খুব পরিষ্কার, ভাব গুলিও ত খুব সোজা, তবে উহার মধ্যে এমন কি আছে, যাহাতে আমার প্রাণে এতটা আনন্দ, এতটা সৌন্দর্য্য আনিয়া দেয়?) এইখানে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। প্রথমে বিদ্যাপতির রাধা, শ্যামের রূপ কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই,—

এ সখি কি দেখনু এক অপরূপ,
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল,
তা পর উপজল তরুণ তমাল।
তা পর বেড়ল বিজুরী লতা,
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা।
শাখা-শিখর সুধাকর পাঁতি,
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি।
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ,
তা পর কির থির করু বাস।
তা পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়,
তা পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়।

আর বসন্তরায়ের রাধা শ্যামকে দেখিয়া কি বলিতেছেন?

সজনি, কি হেরনু ও মুখ শোভা!
অতুল কমল সৌরভ শীতল,
অরুণ-নয়ন অলি আভা।
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর
মুকুর-কান্তি মনোৎসাহা।
রূপ বরনিব কত ভাবিতে থকিত চিত,
কিয়ে নিরমল শশি-শোহা।
বরিহা বকুল ফুল অলিকুল আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ!
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি কুণ্ডল,
প্রিয় অবতংস বনান।
হাসিখানি তাহে ভায়, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়,
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুলশীল দিনু তায়।
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অনুখন মদন তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
চরণে নূপুর মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ-সাগরে রস-হিলোলে নয়ন মন
আটকল রায় বসন্ত॥

বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত কবিতাটি পড়িয়াই বুঝাযায়, এই কবিতাটি রচনা করিবার সময় কবির হৃদয়ে ভাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয় যেন, বিদ্যাপতি কৃষ্ণ হইয়া রাধার রূপ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই।

বিদ্যাপতির যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা ব্যতীত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে বিদ্যাপতি-রচিত আর একটি মাত্র কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা আছে, তাহাও অতি যৎসামান্য। বসন্তরায়ের কৃষ্ণের বর্ণনা পড়িয়া দেখ। কবি এমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন যে, প্রথম ছত্র পড়িয়াই আমাদের প্রাণের তার বাজিয়া ওঠে। "সজনি, কি হেরনু ও মুখ-শোভা!" শ্যামকে দেখিবা মাত্রই যে বন্যার মত এক সৌন্দর্য্যের স্রোত রাধার মনে আসিয়া পড়িয়াছে, রাধার হৃদয়ে সহসা যেন একটা সৌন্দর্য্যের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—একেবারে সহসা অভিভূত হইয়া রাধা বলিয়া উঠিয়াছে—"সজনি কি হেরনু ও মুখ-শোভা!" আমরা রাধার সেই সহসা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রথম ছত্রেই অনুভব করিতে পারিলাম। বিদ্যাপতির রচিত বর্ণনাটি সমস্তটাই বস্তুগত। বসন্তরায়ের ভাবগত। বিদ্যাপতি শ্যামের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুটিনাটি করিয়া বর্ণনা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু বসন্তরায় তাহা করেন নাই। শ্যামকে দেখিবামাত্রই তাঁহার প্রথম মনের ভাব মোহ। প্রথম ছত্রে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সমস্তটা আপ্লুত করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের ভাব মাত্র বিরাজ করিতেছে। রাধা মাঝে মাঝে রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মনঃপুত না হওয়ায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—"রূপ বরনিব কত ভাবিতে থকিত চিত," তাহার রূপ কেমন তাহা আমি কি জানি, তাহার রূপ দেখিয়া আমার চিত্ত কেমন হইল, তাহাই আমি জানি। রাধা মাঝে মাঝে বর্ণনা করিতে যায়, অমনি বুঝিতে পারে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিলে খুব অল্পই বলা হয়, আমি যে কি আনন্দ পাইতেছি, সেটা তাহাতে কিছুতেই ব্যক্ত হয় না। শ্যামের রূপের আকৃতিত সজনিরা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু রাধা যে সেই রূপের মধ্যে আরো অনেকটা দেখিতে পাইয়াছে, যাহা দেখিয়া তাহার মনে কথার অতীত কথা সকল জাগিয়া উঠিয়াছে সেই অধিক-দেখাটা ব্যক্ত করিবে কি রূপে? সে কি তিল তিল বর্ণনা করিয়া? বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়া বর্ণনা বন্ধ করিয়া কেবল ভাব গুলি মাত্র ব্যক্ত করিতে হয়। হাসি বর্ণনা করিতে গিয়া "হাসি খানি" বলিতে হয়, রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মুরলীর গান মনে পড়ে। শ্যামের ভাব—রূপেতে হাসিতে গানেতে জড়িত একটি ভাব, পৃথক পৃথক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত একটি ভাব নহে। রাধা যে বলিয়াছেন, "হেরইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ" ঐ কথাটাই সত্য, নহিলে "ভুরু বাঁকা" বা "চোখ টানা" বা "নাক সোজা" ও সব কথা কোন কাজের কথাই নয়।

বিদ্যাপতি রচিত রূপবর্ণনার সহিত বসন্তরায়-রচিত রূপ-বর্ণনার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। বিদ্যাপতি রূপকে একরূপ চক্ষে দেখিতেছেন, আর বসন্তরায় তাহাকে আর এক চক্ষে দেখিতেছেন। বিদ্যাপতি

কহিতেছেন, রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর, আর বসন্তরায় কহিতেছেন, রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য্য ও ভোগ একত্রে থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে। সৌন্দর্য্যস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায় এবং ভোগস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায়। যাহার যেমন মনের গঠন। বসন্তরায় তাঁহার রূপ বর্ণনায় যাহা কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি তাঁহার রূপ-বর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক্। বিদ্যাপতির—যেখান হইতে খুসী—একটি রূপ বর্ণনা বাহির করা যাক্—

গেলি কামিনী গজবর গামিনী,
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্র জালক কুসুম সায়ক
কুহকী ভেল বর-নারী।
জোরি ভুজ যুগ মোরি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরভাবে শরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহ কওর,
চরণ যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

এমন, একটা কেন, এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আবার রায় বসন্ত হইতে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক্।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম,
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনার জল নিরমল চলচল
দরপণ নবীন রসাল॥
কিয়ে নবনীল নলিনী, কিয়ে উতপল,
জলধর, নহত সমান।
কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ,
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিনী বিলাস॥

ইহাতে কেবল ফুল. কেবল মধুর হাসি ও সরস সম্ভাষণ আছে, কেবল সৌন্দর্য্য আছে। এক, শ্যামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগতের সৌন্দর্য্যের রাজ্য উদ্ঘাটিত হইতে চাহে। যমুনার নিরমল ঢলঢল ভাব ফুটিয়া উঠে, একে একে একেকটি ফুল শ্যামের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, (কারণ সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যকে কাছে ডাকিয়া আনে) ফুলের যাহা প্রাণের ভাব সে তাহা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বসন্তরায় এ সৌন্দর্য্য মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াছেন, লালসা-তৃষিত নেত্রে দেখেন নাই। এমন, একটি কেন—রায় বসন্ত হইতে তাঁহার সমুদয় রূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়—দেখান' যায় যে, যাহা তাঁহার সুন্দর লাগিয়াছে, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রূপ বর্ণনা ত্যাগ করা যাক্—সম্ভোগ-বর্ণনা দেখা যাক্। বিদ্যাপতি কেবল সম্ভোগ মাত্রই বর্ণনা করিয়াছেন, বসন্তরায় সম্ভোগের মাধুর্য্যটুকু, সম্ভোগের কবিত্বটুকুমাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি রচিত "বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল, ইত্যাদি পদটির সহিত পাঠকেরা বসন্তরায়-রচিত নিম্নলিখিত পদটির তুলনা করুন।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে,
ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়ানে মিলিত নয়ানে
উলসিত অরবিন্দ,
শ্যাম সোহাগিনী-কোরে ঘুমায়লি
চাঁদের উপরে চন্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত,
তাহে পিকুকুল গান,
মরমে মদন বাণ দুঁহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈল নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ পবন বহে মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস-ধন দোঁহার দুঁহু জন,
কহয়ে রায় বসন্ত॥

মৃদু বাতাস বহিতেছে, কুঞ্জে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, চাঁদনী রাত্রে কোকিল ডাকিতেছে, এবং সেই কুঞ্জে, সেই বাতাসে, সেই জ্যোৎস্নায়, সেই কোকিলের কুহুরবে, কুসুম-শয়ানে, মুদিত নয়ানে, দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মত শ্যামের কোলে রাধা—চাঁদের উপর চাঁদ ঘুমাইয়া আছে। কি মধুর! কি সুন্দর। এত সৌন্দর্য্য স্তরে স্তরে একত্রে গাঁথা হইয়াছে—সৌন্দর্য্যের পাপ্‌ড়ির উপরে পাপ্‌ড়ি বিন্যাস হইয়াছে, যে সবসুদ্ধ লইয়া একটি সৌন্দর্য্যের ফুল, একটি সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ও সুখ কো করু অন্ত" এমন মিলন কোথায় হইয়া থাকে!

বসন্তরায়ের কবিতায় আর একটি মোহমন্ত্র আছে, যাহা বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর দেখাযায় না। বসন্তরায় প্রায় মাঝে মাঝে বস্তুগত বর্ণনা দূর করিয়া দিয়া এক কথায় এমন একটি ভাবের আকাশ খুলিয়া দেন, যে, আমাদের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, মেঘের মধ্যে হারাইয়া যায়! এক স্থলে আছে—"রায় বসন্ত কহে ওরূপ পিরীতি ময়।" রূপকে পিরীতিময় বলিলে যাহা বলা হয়, আর কিছুতে তাহার অপেক্ষা অধিক বলা যায় না। যেখানে বসন্তরায় শ্যামের রূপকে বলিতেছেন।—

কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ।"

সেখানে কবি এমন একটি ভাব আনিয়াছেন, যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না—এমন একটি ভাবকে ধরিবার জন্য কবি যেন আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। "কমনীয়" "কিশোর" "সুকোমল" প্রভৃতি কত কথাই ব্যবহার করিলেন কিছুতেই কুলাইয়া উঠিলনা—অবশেষে সহসা বলিয়া ফেলিলেন

"কেবল রস নিরমাণ!" কেবল তাহা রসেই নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আর আকার প্রকার নাই।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন;——

"আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব?
তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ-রাশি,
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!
আনন্দ-মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি,
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি।
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥"

এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার একেকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্ত্তি, আমার মূর্ত্তিমতী কামনা—অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়;—না—তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই;—না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ;—রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারো অধিক, তুমি প্রাণেরো গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে! ঐ যে বলা হইয়াছে "মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!" ইহাতে হাসির মাধুর্য্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে! বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশির ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্ম-মৃণাল কঁপিয়া সরোবরে একটু খানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর অতি মৃদু একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোক বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।

রাধা কৃষ্ণকে যাহা বলিতেছেন তাহার কি আর তুলনা আছে?

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি?
তোমা বিনা মন করে উচাটন
কেজানে কেমন তুমি!
না দেখি নয়ন ঝরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মূরছিত হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়ে তোমার চরিত,
আন না ভাবিয়ে মনে।
নিমেষের আধ পাসরিতে নারি
ঘুমালে দেখি স্বপনে!

জাগিলে চেতন হারাই যে আমি
তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বাঁধি!

ইহার প্রথম দুটি ছত্রে, ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" বিদ্যাপতি যে এত করিয়া বলিয়াছেন,

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল!"

তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল। বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" দ্বিতীয় ছত্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া কহিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" যাহার একতিল ঊর্দ্ধে উঠিলেই ভাষা মরিয়া যায়, সেই, ভাষার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রাধা বলিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" এত উচ্চ বিদ্যাপতি কখন উঠেন না, এবং ইহার ঊর্দ্ধে রায় বসন্ত স্বয়ং উঠিতে পারেন না।

আর এক স্থলে রাধা বলিতেছেন—

"ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ পুতলী তুমি জীবনের সখি!
অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন,
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন!
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি,
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি!"

ঠিক কথা বটে,—নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি! যতই সময় পাওয়া যায়, ততই কাজ করা যায়। আমাদের হাতে "শতেক যুগ" নাই বলিয়া আমাদের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। শতেক যুগ পাইলে আমরা অনেক কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু প্রেমের সময় গণনা যুগ যুগান্তর লইয়া নহে। প্রেম নিমিখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রেমের সর্ব্বদাই ভয়, পাছে নিমিখ হারাইয়া যায়। এক নিমিখেমাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়াছিলাম, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যুগ বাঁচিয়া থাকিতে পারি; আবার হয়ত আমি শতেক যুগ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, কখন আমার একটি নিমেষ আসিবে একটি মাত্র চাহনি দেখিব! দৈবাৎ সেই একটি মুহূর্ত্ত হারাইলে আমার অতীত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, আমার ভবিষ্যৎ কালের শতেক যুগ হয়ত নিষ্ফল হইবে। প্রতিভার স্ফূর্ত্তির ন্যায় প্রেমের স্ফূর্ত্তিও একটি মাহেন্দ্র ক্ষণ একটি শুভ মুহূর্ত্তের উপরে নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া

আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভালবাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই—কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল, তখন না জানি কোন গ্রহ কোন কক্ষে ছিল—দুই জনে চোখাচোখি হইল, ভাল বাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবিষ্যত শতযুগের পাড় গড়িয়া দিল। এই নিমিত্তই রাধা যখন ভাগ্যক্রমে প্রেমের শুভ-মুহূর্ত্ত পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিক্ষণে ভয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক নিমিখ হারাইয়া গেলে শতেক যুগ হারাইয়া যায়। পাছে শতেক যুগের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া সেই এক নিমিখের হারাণ' রত্নটুকু আর খুঁজিয়া না পাওয়া যায়! সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন "নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি!"

এমন যতই উদাহরণ উদ্ধৃত হইবে, ততই প্রমাণ হইবে যে, বিদ্যাপতি ও বসন্ত-রায় এক কবি নহেন, এমন কি, এক শ্রেণীর কবিও নহেন।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্ম-গৌরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখন বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না—কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন? আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে, তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠান' না হয়! এই রূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া পাঁচ জনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে, ওই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড় সাধারণ সাহসের কর্ম্ম নহে। রামচন্দ্র রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্ব্বতে বেগে নাবিতে নাবিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। রামমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন—"এই পত্র

যশোহরে লইয়া যা।" রামমোহন যোড়-হস্তে কহিল, "আজ্ঞা, না মহারাজ, আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি, আর যশোহরে যাইব না। এক যদি, পুনরায় মা-ঠাকুরাণীকে আনিতে যাইতে বলেন ত আর একবার যাইতে পারি নতুবা, এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।" রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে, কিন্তু নয়ানচাঁদের মনে বড় ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কি করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড় ভাল নয়। একদিকে বিভার জন্য তাঁহার ভাবনা, আর এক দিকে উদয়াদিত্যের জন্য তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলেমালে তিনি যেন একবারে ঝালাফালা হইয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর ঘরকন্নায় মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন—কি যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না; তাহা হইলে সুকুমার বিভা আর বাঁচিবে না। মহারাজের কানে এ চিঠির কথা উঠিলে কি যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সংকটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া, কাহারো নিকট কোন পরামর্শ না লইয়া মহিষী বাঁচিতে পারেন না। চারিদিকে অকূল পাথার দেখিয়া মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন—'মহারাজ, বিভার ত যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে!"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "কেন বল দেখি?"

মহিষী কহিলেন,"নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে—তবে বিভাকেত এক সময়ে না এক সময়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইতেই হইবে!"

প্রতাপাদিত্য—"সে ত বুঝিলাম, তবে এত দিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল?"

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন—"ঐ তোমার এক কথা; আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে? যদি কিছু হয়—"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"হইবে আর কি?"

মহিষী—"এই মনে কর, যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।" বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখদিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মহিষী জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন "তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো তোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইওনা, তাহা ত নহে—তবে কথা এই, যদি কোন দিন তাই লিখিয়া বসে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জন্য ভাবিবার অবসর নাই।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখ'। একবার ভাবিয়া দেখ বিভার কি হইবে! আমার পাষাণ প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যতদূর যন্ত্রণা দিবার তা' দিয়াছ—উদয়কে—আমার বাছাকে—রাজার ছেলেকে—সামান্য অপরাধীর মত রুদ্ধ করিয়াছ—সে আমার, কাহারো কোন অপকার করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে সোঝে না, রাজকার্য্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা' ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন তাহার দোষ কি।"—বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ও কথাত অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে কথা হইতেছিল তাহাই বল না।"

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন "আমারি পোড়া কপাল! বলিব আর কি? বলিলে কি তুমি কিছু শোন? এক বার বিভার মুখপানে চাও মহারাজ! সে যে কাহাকেও কিছু বলে না—সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মত হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না! তাহার একটা উপায় কর।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে। যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত পা আছড়াইয়া বাঁচে না। প্রথমেই ত সে রুক্মিণীর বাড়ি গেল। তাহাকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর কি! কহিল, "সর্ব্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম! আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম, রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ওই কালামুখ লইয়া এই শানের উপরে ঘষিব, তোর মুখে চুন কালী মাখাইয়া সহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব!"

রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁত লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়-বদ্ধ হইল, তাহার ঘন-কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তাহার ঘন-কৃষ্ণ চক্ষু-তারকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হইয়া গেল; ক্রমে তাহার স্থূল অধরৌষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ঘন ভ্রূ তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশ রাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটা পৈশাচিক

অভিশাপ, একটা সর্ব্বাঙ্গস্ফীত কম্পমান হিংসা সীতারামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্ত্তে সীতারাম কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন রুক্মিণীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরৌষ্ঠ পৃথক্ হইল, কুঞ্চিত ভ্রূ প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বটে! যুবরাজ তোমারই বটে! যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড় লাগিয়াছে—যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়! পোড়ারমুখা, এটা জানিস্ না, সে যে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভাল করিতে পারি, আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস্! দেখিব কেমন তাহা পারিস্!"

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্তরায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পর পারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্তরায়ের হাতে তাঁহার চির-সহচর সে সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন—

"আমিই শুধু রইনু বাকী!
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা' তা'
কেবল ফাঁকি!
আমার ব'লে ছিল যারা,
আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তা'রা, কোথায় তা'রা? কেঁদে
কেঁদে কারে ডাকি'!
বল্ দেখি. মা, শুধাই তোরে,
"আমার" কিছু রাখ্লি নে রে?
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি!

কে জানে কি ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতে ছিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম, তাহারা যে নাই! গান আপ্‌নি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই! এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু আমার আনন্দের আনন্দ কোথায়; মনে যখনি আনন্দ জন্মিত, তখনি যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত, তাহারা কোথায়? যে দিন প্রভাতে রায়গড়ের ঐ তাল গাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত, সেই দিনই আমি যাহাদের দেখিতে যশোরে যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না? এখনো এক একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে কিন্তু হা——এই সব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকালবেলায় অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্তরায়ের মুখে আপনা-আপনি গান উঠিয়াছে—"আমিই শুধু রৈনু বাকী!"

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্তরায় উৎফুল্ল হইয়া—কহিলেন—"খাঁ সাহেব, আইস, আইস!" অধিকতর নি-

কটে গিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন "সাহেব, তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভাল আছে ত?"

খাঁ সাহেব—"মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই। একটি বয়েদ আছে—রাত্রি বলে আমি কেহই নই, আমি যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারি সহিত আমি একত্রে হাসি, তাহারি সহিত আমি একত্রে ম্লান হইয়া যাই!—মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কি? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব!"

বসন্তরায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "সে কি কথা সাহেব? আমার ত অসুখ কিছুই নাই,—আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি—নিজের আনন্দে নিজে থাকি—আমার অসুখ কি খাঁ সাহেব?"

খাঁ—"মহারাজ এখন আপনার আর তেমন গান বাদ্য শুনা যায় না।"

বসন্তরায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমার গান শুনিবে সাহেব?

"আমিই শুধু রইনু বাকী,
যাছিল তা' গেল চলে, রইল যা' তা'
কেবল ফাঁকী।"

খাঁ—"আপনি আর সে সেতার বাজান্ কই? আপনার সে সেতার গেল কোথায়?"

বসন্তরায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"সে সেতার কি নাই, তাহা নয়। সেতার আছে, শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর সুর মেলে না।" বলিয়া আম্রবনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব একটা গান গাও না—একটা গান গাও; গাও "তাজবে তাজ নওবে নও।"

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন "তাজবে তাজ নওবে নও।" দেখিতে দেখিতে বসন্তরায় মাতিয়া উঠিলেন—আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন "তাজবে তাজ, নওবে নও।" ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন, এবং বার বার করিয়া গাইতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়িমুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল। এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম "মহারাজের জয় হৌক" বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্তরায় একেবারে চমকিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া, তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন "আরে সীতারাম যে! ভাল আছিস ত। দাদা কেমন আছে? দিদি কোথায়? খবর ভাল ত?"

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল "একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।" বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটিয়াছিল, সে কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্তরায়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। তাঁহার ভ্রূ ঊর্দ্ধে উঠিল, তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাঁহার অধরোষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল—নির্নিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্তরায় কহিলেন "সীতারাম।"

সীতারাম—"মহারাজ।"

বসন্তরায় "তাহা হইলে দাদা এখন কোথায়?"

সীতারাম "আজ্ঞা তিনি কারাগারে।"

বসন্তরায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভাল করিয়া বসিতেছে না, কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন—"সীতারাম।"

সীতারাম—"আজ্ঞা মহারাজ!"

বসন্তরায়—"তাহা হইলে দাদা এখন কি করিতেছে?"

সীতারাম "কি আর করিবেন! তিনি কারাগারেই আছেন।"

বসন্তরায় "তাহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে?"

সীতারাম "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্তরায় "তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না?"

সীতারাম "আজ্ঞা না।"

বসন্তরায় "সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে? কেহ তাহাকে স্নেহ করে না? সন্ধ্যা হইলে সে কি করে? সে একলা বসিয়া থাকে?"

বসন্তরায় এ কথাগুলি বিশেষ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই—আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই—সে উত্তর করিল—"হাঁ মহারাজ।"

বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন—"দাদা, তুই আমার কাছে আয়রে। আমি তোকে যত্ন করিব, তোকে কেহ ভাল বাসে না। তোকে কেহ চিনিল না।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বসন্তরায় তাহার পর দিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন, কাহারো নিষেধ মানিলেন না। যশোহর পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটির অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহসা তাহার দাদা মহাশয়কে দেখিয়া যেন কি হইয়া গেল! কিছুক্ষণ, কি যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিস্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ—খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল—পায়ের ধূলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর, বসন্তরায় একবার নিতান্ত একাগ্র দৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বিভা?" আর কিছু বলিলেন না কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন "বিভা?" যেন তাঁহার মনে

একটি অতিক্ষীণ আশা জাগিয়া ছিল যে, সীতারাম যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া ফেলে! তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয়ে ভয়ে বিভার মুখখানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিভা?" তাই তিনি অতি একাগ্র দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না। তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া গেছে। আগে যখন দাদা মহাশয় আসিতেন, সেই সব দিন তাহার মনে পড়িয়াছে! সে এক কি উৎসবের দিনই গিয়াছে! তিনি আসিলে কি একটা আনন্দই পড়িত! সুরমা হাসিয়া তামাসা করিত, বিভা হাসিত, কিন্তু তামাসা করিতে পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দ মূর্ত্তিতে দাদা মশায়ের গান শুনিতেন। আজ দাদা মহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা—সুখের সংসারের একমাত্র ভগ্নাবশেষের মত একলা—দাদা মহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদা মহাশয় আসিলে যে ঘরে আনন্দ-ধ্বনি উঠিত—সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন? সে আজ স্তব্ধ, অন্ধকার, শূন্যময়—দাদা মহাশয়কে দেখিলেই সে ঘরটা যেন এখনি কাঁদিয়া উঠিবে! বসন্তরায় একবার কি যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারিদিক দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুক-ফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি, ঘরে কি কেহই নাই?"

বিভা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না, দাদা মহাশয়, কেহই না!"

স্তব্ধ ঘরটা যেন হা-হা করিয়া বলিয়া উঠিল—"আগে যাহারা ছিল তাহারা কেহই নাই!"

বসন্তরায় অনেক—ক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাহিয়া উঠিলেন—

"আমিই শুধু রৈনু বাকী!"

বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন—"বাবা, প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও—সে তোমাদের কি করিয়াছে? তাহাকে যদি তোমরা ভাল না বাস,' পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে—তবে তাহাকে এই বুড়ার কাছে দাও না। আমি তাহাকে লইয়া যাই—আমি তাহাকে রাখিয়া দিই—তাহাকে আর তোমাদের দেখিতে হইবে না—সে আমার কাছে থাকিবে!"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া চুপ করিয়া বসন্তরায়ের কথা শুনিলেন—অবশেষে বলিলেন—"খুড়া মহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি—এ বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অল্প

জানেন—অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।"

তখন বসন্ত রায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন—"বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই? তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, সে কি আর মনে পড়ে না? স্বর্গীয় দাদা যে দিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সে দিন হইতে আমি কি এক মুহূর্ত্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি, এক দিনও কি তুই আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি? প্রতাপ, বল্ দেখি, আমি তোর কি অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী—তোদের মানুষ করিয়া আমিই আমার দাদার স্নেহ-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতএব, প্রতাপ, আমি প্রাপ্য বলিয়া তোর কাছে কিছুই চাহি না, কখনো চাহিও নাই, আমি কেবল তোর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি তাও দিবি না?"

বসন্ত রায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বসন্তরায় আবার কহিলেন—"তবে আমার কথা শুনিবি না,—আমার ভিক্ষা রাখিবি না?—কথার উত্তর দিবিনে প্রতাপ?"—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"ভাল—আমার আর একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই—আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে—এই অনুমতি দাও!"

প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এত খানি স্নেহ প্রকাশ করাতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরো বাঁকিয়া দাঁড়ান।

বসন্তরায় নিতান্ত ম্লান মুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন—তাঁহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদা মহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল—"দাদা মহাশয় আমার ঘরে এস।" বসন্তরায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রকাশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল—"দাদা মশায়, এস, তোমার পাকাচুল তুলিয়া দিই।" বসন্তরায় কহিলেন "দিদি, সে পাকাচুল কি আর আছে? যখন বয়স হয় নাই তখন সে সব ছিল, তখন তোদের পাকাচুল তুলিতে বলিতাম—আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি—আজ আর আমার পাকাচুল নাই!"

বসন্তরায় দেখিলেন বিভার মুখখানি

মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন—"আয়, বিভা, আয়। গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকাচুল সর্‌বরাহ করিয়া উঠিতে আর ত আমি পারি না ভাই! বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথায় টাক পড়িতে চলিল—এখন আর-একটা মাথার অনুসন্ধান কর্—আমি জবাব দিলাম।" বলিয়া বসন্তরায় হাসিতে লাগিলেন।

এক জন দাসী আসিয়া বসন্তরায়কে কহিল "রাণী মা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।"

বসন্তরায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কারাগারে গেল।

মহিষী বসন্তরায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্তরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন "মা, আয়ুষ্মতী হও।"

মহিষী কহিলেন "কাকা মশায়, ও আশীর্ব্বাদ আর করিবেন না! এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি!"

বসন্তরায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "রাম, রাম! ও কথা মুখে আনিতে নাই!"

মহিষী কহিলেন "আর কি বলিব কাকা মহাশয়, আমার ঘরকন্নায় যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে!"

বসন্তরায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, "বিভার মুখ খানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্ন জল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না; কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে! তাহাকে লইয়া যে আমি কি করিব কিছু ভাবিয়া পাই না!"

বসন্তরায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন!

"এই দেখুন কাকা মহাশয়, এক সর্ব্বনেশে চিঠি আসিয়াছে।" বলিয়া রামচন্দ্র রায়ের সেই চিঠি বসন্তরায়ের হাতে দিলেন।

বসন্তরায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার আর কিসের সুখ আছে! উদয়—বাছা আমার কিছু জানে না তাহাকে ত মহারাজ——সে যেন রাজার মতই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে ত আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ত আমার আপনার সন্তান বটে! জানি না, বাছা সেখানে কি করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না!" মহিষী আজ কাল যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে একস্থলে আসিয়া পড়ে। ঐ কষ্টটাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে!

চিঠি পড়িয়া বসন্তরায় একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন—চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্তরায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ চিঠি ত কাহাকেও দেখাও নি মা?"

মহিষী কহিলেন, "মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিতেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিত!"

বসন্তরায় কহিলেন "ভাল করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইও না বউ মা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার শ্বশুর বাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান অপমানের কথা ভাবিও না!"

মহিষী কহিলেন—"আমিও তাহাই মনে করিয়াছি মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহারা অযত্ন করে।"

বসন্তরায় কহিলেন—'বিভাকে অযত্ন করিবে! বিভা কি অযত্নের ধন! বিভা যেখানে যাইবে সেই খানেই আদর পাইবে! অমন লক্ষ্মী অমন সোনার প্রতিমা আর কোথাও আছে! রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে!" বসন্তরায় তাঁহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্তরায় কহিলেন "বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দাও যে বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে বিভা নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না!" মহিষীও তাহাই স্থির করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর বসন্তরায় একাকী বহির্বাটিতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্তরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সীতারাম, কি খবর?"

সীতারাম কহিলেন "সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে!"

বসন্তরায় কহিলেন "কেন, কোথায় সীতারাম?"

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। বসন্তরায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন "সত্য না কি?"

সীতারাম কহিল "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্তরায় মনে মনে অনেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কহিলেন—"এখনি যাইতে হইবে না কি!"

সীতারাম "আজ্ঞা, হাঁ!"

বসন্তরায়—"একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না?"

সীতারাম—"আজ্ঞা—না—আর সময় নাই!"

বসন্তরায়—"কোথায় যাইতে হইবে?"

সীতারাম—"আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।"

বসন্তরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি না কেন?"

সীতারাম—"আজ্ঞা না, মহারাজ! দেরী হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে!"

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি কহিলেন "তবে কাজ নাই—কাজ নাই!" উভয়ে চলিলেন।

আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন "একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না?"

সীতারাম—"না মহারাজ তাহা হইলে বিপদ হইবে!"

"দুর্গা বল" বলিয়া বসন্তরায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্তরায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেন না যখন উভয়ের দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তখন এ সংবাদ তাঁহার কষ্টের কারণ হইত। সন্ধ্যার পর বিদায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি প্রদীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন। জানালার ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, অক্ষর ভাল দেখা যাইতেছে না। কীট পতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক একবার দীপ নিভ'নিভ' হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল—দীপ নিভিয়া গেল। উদয়াদিত্য বই পুঁথি করিয়া তাঁহার খাটে গিয়া বসিলেন। একে একে কত কি ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল। আজ বিভা কিছু দেরী করিয়া আসিয়াছিল, কিছু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু বিশেষ ম্লান দেখিয়াছিলেন;—তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই—সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান না—বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে—তৃষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন উপভোগ করে, তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেহের প্রতিমা বিভার ম্লান মুখ খানি ভাবিতে ছিলেন। সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল—"বিভার কি ক্রমেই বিরক্ত ধরিতেছে? এই নিরানন্দ কারাগারের মধ্যে এক বিষন্ন অন্ধকার মূর্ত্তির সেবা করিতে আর কি তাহার ভাল লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার সুখের বাধা—তাহার সংসারপথের কণ্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরী করিয়া আসিয়াছে—কাল হয়ত আরো দেরী করিয়া আসিবে—তাহার পরে এক দিন হয়ত সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন্ বিভা আসিবে—বিকাল হইল—সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল, বিভা আর আসিল না!—তাহার পর হইতে আর হয়ত বিভা আসিবে না।" উদয়াদিত্যের মনে যতই এই কথা উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনটা হা-হা করিতে লাগিল—তাঁহার কল্পনা-রাজ্যের চারিদিক কি ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন! এক দিন যে আসিবে যে দিন বিভা তাঁহাকে স্নেহশূন্য নয়নে তাহার সুখের কণ্টক বলিয়া দেখিবে—সেই অতি দূর কল্পনার আভাস মাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন "আমি কি ভয়ানক স্বার্থপর! আমি বিভাকে ভালবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি,

কোন শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।" বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আর বিভার উপরে নির্ভর করিবেন না—কিন্তু যখনি কল্পনা করিতেছেন তিনি বিভাকে হারাইয়াছেন, তখনি তাঁহার মনের সে বল চলিয়া যাইতেছে—তখনি তিনি একেবারে অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতেছেন—মরণাপন্ন মজ্জমান ব্যক্তির মত বিভার কাল্পনিক মূর্ত্তিকে আকুল ভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছেন।

এমন সময়ে বহির্দ্দেশে সহসা "আগুন আগুন" বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল। উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সহসা নানা কণ্ঠের নানাবিধ চীৎকার আকাশে উঠিল—বাহিরে শত শত লোকের দ্রুত পদ শব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, হয় প্রাসাদের কোন অংশে—নয় প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল—তাঁহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা দ্রুতবেগে তাঁহার কারার দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাঁহার অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল—তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?"

সে উত্তর করিল "আমি সীতারাম—আপনি বাহির হইয়া আসুন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"কেন?"

সীতারাম কহিল—"যুবরাজ কারাগৃহে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন!" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারার বাহিরে লইয়া গেল।

অনেক দিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন—মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোখের বাধা চারিদিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, আকাশের অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিম্নে, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করিব, কোথায় যাইব?" অনেক দিন সঙ্কীর্ণস্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই—আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায় ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিব? কোথায় যাইব?" সীতারাম কহিল "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন!"

এদিকে আগুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট কি-একটা নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্র বসিয়াছিল—তাহারাই প্রথমে আগুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্য কারাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটীর-শ্রেণী ছিল—সেইখানেই তাহাদের চারপাই, বাসন, কাপড়চোপড় জিনিষপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী

পারিল সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা নিতান্তই পারিল না, তাহারা হাত পা আছড়াইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের গৃহদ্বারেও দুই এক জন প্রহরী ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কড়াক্কড় পাহারা দিবার কোন আবশ্যকই ছিল না। দস্তর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ উদয়াদিত্য এমন শান্ত ভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে বোধ হইত না যে তিনি কখন পালাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পালাইবার ইচ্ছা আছে। এই জন্য তাঁহার দ্বারের প্রহরীরা সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল আগুন নেভে না—কেহ বা জিনিষ পত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল, কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়াই বেড়াইতে লাগিল, আগুন নিবিলে পর তাহারাই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল, সেকি একটা বলিতে চায়—কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল "যুবরাজ পালাইলেন তাতে আমার কি মাগি, তোরই বা কি? সে দয়াল সিং জানে—আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।" বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বারবার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ডা হইয়া উঠিল। একজন যাহাকে সমুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল—"পোড়ারমুখা, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরী কর সে জ্ঞান কি নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা করিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল!"

"ভালই হইয়াছে—তোর তাহাতে কি?" বলিয়া সে তাহাকে উত্তম রূপে প্রহার করিল—যাহারা ঘরে আগুন লাগাইয়াছিল, এব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্ত্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল—ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত তাহার চোক দুটা জ্বলিতে লাগিল, তাহার চুল গুলা ফুলিয়া উঠিল, তাহার দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহ্নিশিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মত দেখিতে হইল। সম্মুখে একটা কাষ্ঠ খণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইটি তুলিয়া লইল, হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না, সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া—সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল—তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া গেল, তখন সেই পিশাচী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল; সেখানে এক দীর্ঘ নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া

নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল "দাদা, আসিয়াছিস্?" উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—সেই চির পরিচিত স্বর, যে স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত—পৃথিবীতে যতটুকু সুখ আছে যতটুকু আনন্দ আছে যেস্বর তাহারি সহিত অবিচ্ছিন্ন—এক এক দিন কারাগারে গভীর রাত্রে বিনিদ্র নয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশী ধ্বনির ন্যায় যে স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন—সেই স্বর—বিস্ময় ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে বসন্তরায় আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পূরিয়া গেল। উভয়ে সেই খানে তৃণের উপরে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন "দাদা মহাশয়!" বসন্তরায় কহিলেন 'কি দাদা।" আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া বসন্তরায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুল কণ্ঠে কহিলেন—'দাদা মহাশয় আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি,—তোমাকে পাইয়াছি, আমার আর সুখের কি অবশিষ্ট আছে? এ মুহূর্ত্ত আর কতক্ষণ থাকিবে?" কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম যোড়হাত করিয়া কহিল—"যুবরাজ, নৌকায় উঠুন্।"

যুবরাজ চমক ভাঙ্গিয়া কহিলেন—"কেন, নৌকায় কেন?"

সীতারাম কহিল—"নহিলে এখনি আবার প্রহরীরা আসিবে।"

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্তরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা মহাশয়, আমরা কি পালাইয়া যাইতেছি?

বসন্তরায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি! এ যে পাষাণ হৃদয়ের দেশ—এরা যে তোকে ভাল বাসে না! তুই হরিণ শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস—আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরাপদে থাকিবি!" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন—যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান্।

উদয়াদিত্য অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন "না দাদা মহাশয়, আমি পালাইতে পারিব না।"

বসন্তরায় কহিলেন "কেন দাদা, এ বুড়াকে কি ভুলিয়া গেছিস্।"

উদয়াদিত্য কহিলেন "আমি যাই—একবার পিতার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাই গে, তিনি হয়ত রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন।"

বসন্তরায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন "দাদা, আমার কথা শোন্, সেখানে যাস্নে, সে চেষ্টা করা নিস্ফল।"

উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তবে যাই—আমি কারাগারে ফিরিয়া যাই।"

বসন্তরায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন "কেমন যাইবি যা দেখি। আমি যাইতে দিব না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন "দাদা মহাশয়, এ হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ! আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শান্তির সম্ভাবনা আছে?"

বসন্তরায় কহিলেন—"দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারারাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে--সে কি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?" বসন্তরায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন "তবে চল চল দাদা মহাশয়।" সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন "সীতারাম, প্রাসাদে তিন খানি পত্র পাঠাইতে চাই!"

সীতারাম কহিল—"নৌকাতেই কাগজ-কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন অধিক সময় নাই।" লেখ্য আনিয়া দিল।

উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন—"মা, আমাকে জন্ম দিয়া তুমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা—আমি দাদা মহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, স্নেহে থাকিব, তোমার কোন ভাবনার কারণ থাকিবে না।" বিভাকে লিখিলেন "চিরায়ুষ্মতীষু তোমাকে আর কি লিখিব—তুমি জন্ম জন্ম সুখে থাক—স্বামী গৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাও!" লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখ জলে পূরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিন খানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন—এমন সময়ে দেখিলেন কে এক জন ছুটিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। সীতারাম চমকিয়া বলিয়া উঠিল "ঐরে—সেই ডাকিনী আসিতেছে!" দেখিতে দেখিতে রুক্মিণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো—তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোক দুটা অগ্নি উদ্গার করিতেছে—তাহার বারবার প্রতিহত বাসনা, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে যেন যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোষ মিটাইতে চায়। যে খানে প্রহরীরা আগুন নিভাইতেছিল সে খানে বারবার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতন প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে—একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বারবার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘিনীর মত সে উদয়াদিত্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল—চীৎকার করিয়া সে সীতারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল—সহসা সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্ব্বক রুক্মিণীকে

ছাড়াইয়া লইল। আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে থাকে তেমনি সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল "কিছুই হইল না কিছুই হইল না,—এই আমি মরিলাম এ স্ত্রীহত্যা তোদের লাগিবে।" সেই অন্ধকার রাত্রে এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুৎ-বেগে রুক্মিণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল—কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজাইয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্যের কপালে ঘর্ম্ম বিন্দু দেখা দিয়াছে, তাঁহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন—বসন্তরায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন; দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। সীতারাম ভীত হইয়া কহিল "যাত্রার সময় এ কি অমঙ্গল!"

—:০:—

বিজ্ঞান শিক্ষা।

জীবনের প্রভাত কালে, চৌদিকে সজ্জিত প্রাকৃতিক বস্তুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ি, পরে দেখিতে দেখিতে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ-স্পৃহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্যের প্রভাবও মন্দ হইয়া পড়ে। তখন আমরা শুধু বিস্মিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি না, বিস্ময়-উদ্দীপক বস্তুকে কেবল মাত্র দেখিয়াই আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না, আশ্চর্য্য প্রভৃতি মনোভাবের দ্বারা আমরা প্রথমে যে সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই বস্তু সমুদ্রের উপকূলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি, মনোভাব শমিত হইলে আমরা সেই সকল বস্তুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হই। মনুষ্যের এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। বস্তুদিগের প্রাকৃতিক তত্ত্ব নির্ব্বাচন করাই বিজ্ঞানের কার্য্য।

ভারতবর্ষই বিজ্ঞানের আদিম জন্মভূমি, বেদবর্ণিত সময়েও ভারতবর্ষে আমরা বিজ্ঞান-চর্চ্চা দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষীয়গণ যে অঙ্ক বিদ্যার প্রবর্ত্তক তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ১।২ প্রভৃতি অঙ্ক আরবেরা এ দেশ হইতে শিখিয়া ইয়োরোপে প্রচার করে। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণ বীজগণিত জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ইয়োরোপে তাহা সম্প্রতি

আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিলেই হয়। চিকিৎসা বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যাতেও ভারতবর্ষীয়গণ জগতের গুরু। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ আরবেরা নিজভাষায় অনুবাদ করিয়াছে এবং গ্রীকগণও ইহা এদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্যাও হিন্দুদিগের দ্বারা প্রথমে আলোচিত। খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্রবৎসর পূর্ব্বে এদেশে জ্যোতিষ আলোচনা দেখা যায়। যদিও আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস নাই তথাপি অন্য সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে—এবং ইয়োরপীয় পণ্ডিতগণের যত্নে ও অনুসন্ধানে এই সমুদায় এখন অতি সহজেই জানা যাইতেছে।

৭০০০ বৎসর কাল মাত্র আমরা মনুষ্য-জন্মের নিশ্চিত প্রমাণ পাই। ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যদি ভারতে জ্যোতিষের ন্যায় কঠিন বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়া থাকে তবে না জানি মনুষ্য জীবনের কত শৈশবেই ভারতবর্ষীয়গণ সভ্যতার সোপানে উঠিয়াছিলেন। এদেশ হইতেই জ্যোতিষ ক্রমে কালডিয়া মিশর গ্রীস প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে ইয়োরপে ষোড়শ শতাব্দীতে মাত্র তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিতেছেন—

ভূপঞ্জরঃ স্থিরোভূরে বারুত্ত্যা বৃত্ত প্রাতিদৈবসিকৌ।

উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাং॥

পৃথিবীর আবর্ত্তন বশতঃই স্থির নক্ষত্র মণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।

পৃথিবীর সমস্ত গতিই তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল এমন কি ক্রান্তিপাতের বক্রগতি (Precession of the Equinoxes) যে পৃথিবীর গতিসম্ভূত তাহা মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরপে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও আর্য্যভট্টের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই।

দূরবীন সৃষ্টি হইবার পর ইয়োরপে অল্পকাল মাত্র সূর্য্য বিম্ব (Solar spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে।

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ।

তেনাস্মিন শ্যামিকা জাতা শাতনোর্চিষ স্তথা।

বিশ্বকর্ম্মা, অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।

তাঁহারা যে তখন কলঙ্ক দেখিয়াছিলেন এই শ্লোকটি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সূর্য্য বিম্বের কথা আরো স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্শেল সূর্য্য-বিম্বের সহিত দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান বরাহ মিহির বহুদিন পূর্ব্বে তাহাই বলিতেছেন—

"যস্মিন যস্মিন্দেশে দর্শনমায়ান্তি সূর্য্য বিম্বস্যাঃ।

তস্মিন তস্মিন ব্যসনং মহীপতীনাং

পরিজ্ঞেয়ং। * * * * *

* * * বারিমুচো ন প্রভূত বারিমুচঃ

সরিতো আয়ান্তি তনুত্বং ক্বচিৎক্বচি জ্জায়তে শস্যং।

যে যে দেশে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায় সেই সেই দেশাধীপের বিপদ জানিতে হইবে। * * * মেঘ সকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না। নদী সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন স্থানে মাত্র শস্য জন্মায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল স্বরূপ যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া নিউটন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন সেই নিয়মের সুস্পষ্ট জ্ঞান পুরাকালে ছিল বলিয়া যদিও আমরা প্রমাণ পাই না, কিন্তু ইহার আংশিক জ্ঞান বহু কাল পূর্ব্বে যে সরস্বতী নদীতীরবাসী আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই, মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের পূর্ব্বে ক্রান্তি পাতের গতি পৃথিবীর গতি সম্ভূত বলিয়া ইয়োরপে কেহ জানিত না, মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম অবলম্বন করিয়াই নিউটন প্রথমে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন কিন্তু আর্য্যভট্ট বহুকাল পূর্ব্বে সেই গতি সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে আসিয়া ছিলেন। জ্যোতিষিক আকর্ষণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলে কি ইহা সম্ভব হইত? আর্য্যদিগের এ বিষয়ে যে জ্ঞান ছিল অনুমান ছাড়া তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়।

নিউটনের অনূন আটশত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন

"বৃতা ধৃতা ধরা কেন যেন নেয়মিয়াদধঃ"—এই যে পৃথিবী কিসের দ্বারা ধৃত, আর কেনই বা অধঃপতিত হয় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।

আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পতিতীব ভাতি,
সমে সমন্তাৎ কুরিয়ং যতঃখে।"

এই পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিমতী, সেই আকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকাশস্থ গুরু-ভার বস্তু সকলকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা পড়িতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। যেহেতু এই পৃথিবী আকাশে অবস্থিত, এবং ইহার চারিদিকে সমান আকাশ, সেইহেতু ইহার অধঃউর্দ্ধ নাই, তবে ইনি কোথায় পড়িবেন?"

আর একস্থানে লিখিতেছেন

"নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈবিরতি
নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজ-
মনুজা দিত্য দৈত্যং সমন্তাৎ"।

এই পৃথিবীর অন্য কোন আধার নাই, ইনি আপনার আকর্ষণ শক্তিতেই আপনি আকাশে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহারি সেই আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে দৈত্যদানব ও মানবাদি সমস্তই ইহার পৃষ্ঠ স্থিতি করিতেছে।

সূর্য্যের আকর্ষণ সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে ছাড়া প্রাচীন ঋগ্বেদেও দেখা যায়

"আকৃষ্টেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃতং।

হিরন্ময়েন রথেন সবিতা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।

আকর্ষণ শক্তিযুক্ত সর্ব্ব-পরিচালক রজোগুণ যাহার বর্ত্তমান আছে সেই সূর্য্যদেব অমরলোক সকলকে সন্নিবিষ্ট রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময় রথের দ্বারা ভুবন সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন।

এই একটি ঋকের মধ্যে আধুনিক সূর্য্য সম্পর্কীয় অনেকগুলি সত্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

অণু অণুকে আকর্ষণ করে মাধ্যাকর্ষণের এই যে একটি নিয়ম প্রাচীন গ্রন্থে ইহারও পরিচয় পাওয়া যায়

জৈন দর্শনে রহিয়াছে

অণ্বাদীনাং সংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যতে। তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্ট শক্তিরেবাদ্য সংযোগে কারণ ভাবমাপদ্যতে।"

অণুদিগের পরস্পর সংঘাতে দ্বি-অণু ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এস্থলে অণুদিগের মধ্যে অবস্থিত আকৃষ্ট শক্তিই আদ্যসংযোগে কারণতা প্রাপ্ত হয়।

ইহার দ্বারা প্রত্যেক পরমাণুরই আকর্ষণ শক্তি বলা হইতেছে। আকর্ষণ শক্তি যে তখন জানা ছিল তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আকর্ষণ শক্তির আবিষ্ক্রিয়ার জন্যই নিউটনের খ্যাতি নহে, তাঁহার পূর্ব্বেতেই হাইগেন্স প্রথমে কেন্দ্রাকর্ষণ শক্তি বাহির করিয়াছিলেন।

একটি আকর্ষণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যে বিশ্বচরাচর চালিত হইতেছে এই নিয়মের উপরেই যে সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ব স্থাপিত ইহাই নিউটন আমাদের প্রথমে শিক্ষা দেন এবং সেই জন্যই তিনি বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। মাধ্যাকর্ষণের এই সুস্পষ্ট জ্ঞানটি আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাচীন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। কিন্তু ইহা হইতেই যে আমরা নিষ্পত্তি করিতে পারি তাঁহারা মাধ্যাকর্ষণ জানিতেন না, তাহাও নহে। ভারতবর্ষে যে কতদূর বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল আমরা তাহার সবিশেষ কিছু জানি না, ভারতবর্ষ প্রকৃত ইতিহাসশূন্য, ভারতবর্ষের পুস্তক প্রভৃতি স্থায়ী কীর্ত্তিসমূহও প্রায় বিলুপ্ত, এই অবস্থায় প্রচলিত শ্রুতি পরম্পরায় পৌরাণিক উপাখ্যানে, ও লুপ্তাবশেষ পুস্তকে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতে সেই প্রাচীন উন্নতির ছায়া মাত্র প্রকাশ পায়।

পৌরাণিক উপাখ্যানে রূপক রূপে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

এই যে ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর জীবনইতিহাসে চারিটি যুগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন পৌরাণিক আখ্যানে তাহারি কি পরিচয় পাওয়া যায় না? পুরাতত্ত্ব অধ্যায়ী মাত্রেই জানেন, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে দুই প্রকারে সত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণেরা শিষ্যদিগকে নিগূঢ় সত্য শিক্ষা দিতেন, কিন্তু সেই সকল কঠিন সত্য সর্ব্ব সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইবে বুঝিয়া তাহাই সাধারণের জন্য রূপকরূপে প্রচারিত হইত; যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব সেই জন্য অতি অল্পলোকেই জানিত। সুতরাং ক্রমে যখন জাতীয় অবনতি আরম্ভ হইল, কঠিন জ্ঞানাভ্যাস হইতে সকলে বিরত হইতে লাগিল, তখন অল্পলোকনিবদ্ধ সত্য সকলও সেই লোকদিগের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লোপ পাইয়া আসিল, সাধারণপ্রচলিত রূপক মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

পুরাণানুসারে জীবশূন্য অপার জলধি জলের প্রথমজীব মৎস্য, দ্বিতীয় জীব কূর্ম্ম, তৃতীয় জীব বরাহ, চতুর্থ নৃসিংহ। রূপক করিয়া তাঁহারা বিধাতাকে বার বার এইরূপে অবতার করাইয়াছেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হইল, সুতরাং স্বয়ং তিনি যেন এক এক বার এক এক জাতীয় জীবরূপে অবতার হইলেন। বুঝিয়া দেখিলে এই রূপকেই কি আধুনিক বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্য পাওয়া যায় না? ইয়োরপীয় ভূবেত্তাগণ পৃথিবীর ইতিহাসকে যে চারিযুগে ভাগ করেন তাহার পর্য্যায় কি?

প্রথম, মৎস্য যুগ, Age of Fishes.

দ্বিতীয়, সরীসৃপ যুগ, Age of Reptiles.

তৃতীয় স্তন্যপায়ী যুগ, Age of Mammals.

চতুর্থ মনুষ্য যুগ, Age of Men.

প্রথমযুগে পৃথিবীতে মৎস্যই শ্রেষ্ঠ জীব ছিল, ইয়োরপীয় ভূবেত্তাগণ সেই জন্য তাহার নাম মৎস্য যুগ রাখিয়াছেন, পৌরাণিক উপাখ্যান রূপক সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুকে এই যুগে মৎস্য রূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। তাহার পর দ্বিতীয় যুগের প্রধান জীব সরীসৃপ, তখনকার সরীসৃপ অতি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতায়তনের। পুরাণে সেই জন্য এক কিম্ভূত কিমাকার প্রকাণ্ড শরীরী কচ্ছপকে দ্বিতীয় যুগে অবতারণা করা হইয়াছে। পুরাণের কূর্ম্ম যেরূপ অদ্ভূতাকার ও প্রকাণ্ড শরীরী, তাহাতে ইয়োরপের দ্বিতীয় যুগ-স্তর প্রাপ্ত ম্যাগালিসোরস্ ইকথিওসোরস্ প্রভৃতি প্রকাণ্ড সরীসৃপদিগের আর এক জাতি আমরা চোখের উপর দেখিতে পাই। তাহার পর ইয়োরপীয় ভূবেত্তাদিগের মতে তৃতীয় যুগে স্থূলচর্ম্মী স্তন্যপায়ী হস্তী মহিষ বরাহ ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তুই প্রধান, সুতরাং তৃতীয় যুগে বরাহ অবতার বলিলে তাহা কিছুই অসম্ভব বলা হয় না। হয় ত তৃতীয় যুগে ভারতবর্ষে বরাহেরই প্রাধান্য ছিল—ইহারা তখন যেমন সংখ্যায় অধিক তেমনি আকারে প্রকাণ্ড হইত। সর্ব্বশেষে মনুষ্য যুগ, মনুষ্য প্রথম জন্মকালে এখনকার মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিতে ছিল এজন্য পরশুরামরূপী মানুষের পূর্ব্বে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ হইয়াছে।

এইরূপে পৌরাণিক আখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে, অনেক লুকায়িত সত্য উদ্ধার হইতে পারে।

প্রাচীন বিজ্ঞান শাস্ত্র ধারাবাহীরূপে ভারতবর্ষে কি অন্য কোথাও চলিয়া আসে নাই, মাঝে মাঝে অসভ্য জাতির উপদ্রবে,

দেশীয়দিগের অবহেলায়,কালের স্মৃতিলোপী অন্ধকারে প্রাচীন বিজ্ঞান একরূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল। বহুকালের পর ষোড়শ শতাব্দীতে আবার তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিল। নূতনাবিষ্কৃত প্রণালী ক্রমে বর্ত্তমান বিজ্ঞান পূর্ব্বজানীত সত্য পুনরাবিষ্কার করিয়া একটি নূতন যুগের আরম্ভ করিল।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ইয়োরপে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে গ্রীকগণই ইয়োরপে বিজ্ঞানকে তাঁহাদের একাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আরিষ্টটল ইয়োরপের সেই প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ। ইনি চিন্তাজগতের একজন স্বেচ্ছাচারী রাজা। ইনি যে সকল স্বকপোলকল্পিত মত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন, পরবর্ত্তী সময়ে কেহ তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিলে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত। আরিষ্টটল পৃথিবীকে অচল ও সূর্য্যকে সচল বলিয়াছে বাইবেলেরও ঐ মত সে জন্য খৃষ্টানধর্ম্মযাজকেরা আরিষ্টটলের কথাই সত্য বলিয়া মানিতেন; তাঁহারা সেই জন্য স্বাধীন চিন্তার পথে তখন কণ্টকস্বরূপ ছিলেন। জর্ম্মাণ দেশীয় রোমানক্যাথলিক পুরোহিত বৈজ্ঞানিক শিনার একজন আরিষ্টটল ভক্ত ধর্ম্মযাজককে সূর্য্যে কলঙ্ক দেখিয়াছেন বলায় সে ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে বলিল "তাহা কখনই হইতে পারে না, কেন না আরিষ্টটল এমন কথা বলিয়া যান নাই, তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সূর্য্যের কলঙ্ক নহে, তোমার চক্ষের" গ্রীকদিগের বহুকাল অধিকৃত বৈজ্ঞানিক সিংহাসন ষোড়শশতাব্দীতে ইয়োরপের অন্যান্য জাতিরা অধিকার করিয়া লইলেন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কোপনির্কস এই শতাব্দীতে পৃথিবীর সূর্য্য পরিভ্রমণ ও কেপলার গ্রহগণের গতির মূল নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইয়োরপের মুখোজ্জ্বল করিলেন; এই শতাব্দীতেই ইতালীয় পণ্ডিত গেলিলিও গতির কয়েকটি নিয়ম বাহির করিয়া আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিলেন, এবং ইংলণ্ডে গিলবর্ট কর্ত্তৃক তাড়িত ও চৌম্বক তেজ আবিষ্কৃত হইল। তাহার পর এই শতাব্দীর শেষে বেকন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার প্রণালী সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিলেন। তাহার পর হইতে ক্রমে অপ্রতিহত প্রভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন লুপ্ত বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম যুদ্ধের কাল, দ্বিতীয় জয়। যুদ্ধ যুগের নেতা কোপর্নিকস কেপলার গেলিলিও। ইঁহারা গুরুবাক্য অনুযায়ী পূর্ব্ব কল্পিত মতকে অকাট্য ভাবিয়া তাহার অনুযায়ী করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে দাঁড় করাইতে যাইতেন না, ইঁহারা অগ্রে ঘটনা দেখিয়া তাহার অনুযায়ী কারণ নির্দ্দেশ করিতে যত্নশীল হইতেন, এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহার উপর আপন আপন মতকে নির্ম্মাণ করিতেন। ইহাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের প্রণালী,আরোহন—(Induction.(

এই প্রণালী অনুসারে রীতিমত অনুসন্ধান দ্বারাই বিজ্ঞান জগতের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পূর্ব্বের ভ্রম পূর্ণ মতগুলি দূর করিয়া যথার্থ সত্য শিখাইতে এই যোদ্ধাগণের যে কত সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এই অত্যাচার গেলিলিওতেই শেষ হয়। তাঁহার পর হইতে ক্রমে বিজ্ঞান বিজয়ী হইল, সত্যের জয় শেষে পড়িয়াই রহিয়াছে। বেকন বিনা যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ব্বাচন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিলেন। বেকন এই প্রণালীর উদ্ভাবক বলিয়া কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হন—কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত। বেকনের অল্পকাল পূর্ব্বে গিলবার্ট চৌম্বক তেজের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা এই প্রণালীর একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। ১৫ শতাব্দীতে লিওনার্দো দাবিঞ্চি নামক বিখ্যাত ইতালীয় বৈজ্ঞানিক স্পষ্ট করিয়া এই বিষয়ে লিখিয়াছেন। "কোন একটা বিষয় অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে আমি সে বিষয় পরীক্ষা করি কেন না আমার অভিপ্রায় এই, যে প্রথমে পদার্থের ধর্ম্ম স্থির করিয়া পরে সেই ধর্ম্মের অনুসন্ধান করা" ইহা ছাড়া অনেক প্রাচীন দার্শনিক অতি বিশদরূপে এই প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। এক কথায় জন্ম হইতেই এই প্রণালীতে মানুষের চিন্তা চালিত হইয়াছে তবে বেকনই প্রথমে ইহা বাঁধাবাঁধিরূপে যথা-বিন্যস্ত-অবস্থায় লিপি বদ্ধ করিয়া, এবং ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একমাত্র প্রণালীরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া চির স্মরণীয় হইয়াছেন। ইহার পর দেকার্ত্ত হাইগেন্স নিউটন প্রভৃতি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকেরা ১৭ শতাব্দীকে কুসুমিত করিয়া তুলিলেন। এই রূপে বিজ্ঞান উত্তরোত্তর অবাধে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল।

ইয়োরপে এখন যেরূপ দ্রুতপদে বিজ্ঞান অগ্রসর হইতেছে তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। ফরাসী পণ্ডিত রেঁনা ইহাতে বলেন, আর এক শতাব্দীর পর বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন বিদ্যারই মনুষ্য মণ্ডলীতে চর্চ্চা থাকিবে না। একশত বৎসর পরে কি হইবে বলা বড় দুঃসাধ্য, তবে মনুষ্য জাতির মধ্যে না হউক, ইয়োরপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞান ক্রমশই যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য বিস্তার করিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল জ্ঞানগত উন্নতি ছাড়া বিজ্ঞান প্রসাদে বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবহারগত বিষয়েও উক্ত দেশবাসীগণ দ্রুত পদে অগ্রসর হইতেছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না, বিজ্ঞানের কার্য্যগত শিক্ষার অভাবেই ইয়োরোপীয় জাতি হইতে আমরা সকল বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহাতেই উন্নতি করিতে চাও বিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক হইবেই। যদি জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে চাও ত বিজ্ঞানের ধ্যান কর। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারের চাবি স্বরূপ। যে রহস্য দ্বারা অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ হইতে পৃথিবীর কঠিন আচ্ছাদন সৃজিত হইয়াছে, বিজ্ঞান সেই রাসায়নিক

রহস্য আমাদের নিকট খুলিয়া দেয়, যে সকল নিয়মে জগতের উপর জগৎ সুশৃঙ্খলা ক্রমে অনন্ত আকাশপথে ধাবিত হইতেছে বিজ্ঞান সেই সকল আমাদের দেখাইয়া দেয়। জ্যোতিষিক অনুসন্ধান দ্বারা সৃষ্টির জন্মের সময় আমরা উপস্থিত থাকিতে পারি, বিনাশও কল্পনার চক্ষে আনিতে পারি।

বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বারাই মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে বুদ্ধি-বৃত্তি দৃঢ়তা লাভ করে, কল্পনাসম্ভূত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা মুক্তি লাভ করি। এক কথায় বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে যাহাকে আমরা কুসংস্কার বলি তাহার অপনয়ন হয়।

কেবল ইহাই নয়—যদি জাতীয় উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহারগত সুখের বৃদ্ধি করিতে হয় তো বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করিতে হইবে। সেই মহাব্যাপার বাষ্পীয় শকট বাষ্পীয়তরী হইতে সামান্য দেশলাইটি পর্য্যন্ত সকলই বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল। এইরূপে আমরা যেদিকে চাহিয়া দেখি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব যতদিন না ভারতবর্ষীয়গণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিবে ততদিন আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতির আশা নাই। দরিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথের প্রধান কণ্টক, বিজ্ঞানের ক্ষমতা বলেই একমাত্র সে দারিদ্র্য মোচন হইতে পারে। আমরা হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি দ্বারা দেশের আর এক নূতন রূপ দেখিতে পাইব। এদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে তখন আমাদের আর অন্য জাতির উপর নির্ভর করিতে হইবে না, কি শিল্পে কি বাণিজ্যে সকল বিষয়েই আমরা স্বপ্রধান হইতে পারিব। আজ কাল ইয়োরপীয়গণ আমাদের এই রত্নগর্ভা ভারত ভূমিতে আসিয়া আমাদের দেখাইয়া দেখাইয়া রত্ন সকল লুটিয়া লয়েন, আমরা যখন তাঁহাদের মত শিক্ষিত হইব, তখন আমাদের আর এরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে না। এখন অতীতকালেই আমাদের অহঙ্কার, স্মৃতিতেই আমাদের মাহাত্ম্য, বর্ত্তমানে আমাদের কিছু নাই, সুতরাং অতীত কথা নাড়াচাড়া করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। যেদিন বিজ্ঞান আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন, সেই দিন অতীত ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমানের অহঙ্কার হইয়া দাঁড়াইব। সেই দিন সর্ব্বতোভাবে আমাদের উন্নতি হইবে, ধনে মানে যশে আমরা অন্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইতে পারিব।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা গতবারে এইটুকু দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম যে আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা ইংরাজি কবিতার ছায়া মাত্র। তাড়িত সংযোগে মৃতব্যক্তিও যেমন দৃশ্যতঃ চেতনা প্রাপ্ত হয়, আমাদের আধুনিক কবিতাসকলও সেইরূপ দৃশ্যতঃ কবিতা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা হইতে যদি বিদেশীয় কবিতার তাড়িৎ প্রভাব নির্ব্বাসিত করা যায় ত দেখিতে পাইব যে সে সকল কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে হীন-শক্তি নির্জ্জীব সামগ্রী মাত্র? প্রকৃত হৃদয়-উচ্ছ্বাসের যে একটী দুর্দ্দমনীয় অমোঘ শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে প্রায়ই দৃষ্টি-গোচর হয় না। আর, তাহা কেমন করিয়াই বা হইবে? আধুনিক বঙ্গীয় কবির অন্তর-দৃষ্টি ত একেবারেই নাই—তাহা শতসহস্র উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আমরা গতবারেই দেখাইয়াছি যে, তাঁহাদের কিছুমাত্র অন্তর-দৃষ্টি থাকিলে কখনই বঙ্গ মহিলার মৃণাল ভুজে "ঢাল-তরবাল" ঝুলাইতে, ও বঙ্গীয় "বাবুর" মুখে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনী শুনাইতে, পারিতেন না। যখন দেখিতে পাই যে, আধুনিক একজন "মহাকবি" নরক বর্ণনা করিতে গিয়া Dante ও Virgil-এর ক্রীতদাস স্বরূপে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন, যখন দেখি প্রখ্যাত কবিগণ বীররসে দেশ মাতাইতে গিয়া সংজ্ঞাহীন উন্মত্ত প্রলাপে নিজে মাতিয়া উঠেন, যখন দেখি একজন কৃতবিদ্য পয়ার-রচয়িতা আদিরসের অবতারণাতে Byron প্রভৃতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন, যখন দেখিতে পাই যেএই সকল "অদ্বিতীয় মহা-কবিদের" অনুগামী নিকৃষ্টতর কবিরা ভাঙ্গা বা কচী-কণ্ঠে সেই একই সুর নানা প্রকারে ভাঁজিয়া ব্যাস বাল্মীকির মস্তক মুণ্ডন করিতেছে, তখন ধৃতরাষ্ট্রের মত আমাদিগকেও বলিতে হয় যে, "যখন এই সকল দেখিলাম ও শুনিলাম, তখন এ দেশের কবিতার জয়ের আশা আর করি না।" যদি এমন দেখিতাম যে বঙ্গ কবিতা-কাননে নানা প্রকার দেশীয় বন ফুল-গাছের মাঝে মাঝে বিদেশীয় ফুলগাছের কলমের চারা সকল রোপিত হইয়াছে, তাহা হইলেও আমরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতাম না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সেই সকল কলমের চারাই মহা তেজস্বী হইয়া বনফুল দলকে একেবারে নিহত করিয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে পাই যে আধুনিক কবিতাতে আমাদের প্রকৃতিগত

অনেকগুলি মনোভাব আর স্থান পায় না—এখনকার বিলাতী আব্-হাওয়ার প্রভাবে সে বনফুলগুলি আর ফুটে না।

যে কেহ ঈষৎ মাত্র যত্নের সহিত অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় ও প্রকৃত দেশজ কবিতা দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয়ে অভিমানের ভাব অতি প্রবল, প্রকৃত দেশজ কবিতাতে অভিমানের সঙ্গীতই জাজ্বল্যমান। সমগ্র ইংরাজি সাহিত্যে অভিমানে গদগদ একটীমাত্রও হৃদয়-উচ্ছ্বাস নাই,—এমন কি, ইংরাজি ভাষাতে অভিমানের একটিও প্রতিশব্দ নাই। সেক্সপীয়রের দুই এক স্থানে মাত্র অভিমানের একটু আভাস আছে, কিন্তু সেক্সপীয়রত "জগতের কবি"—তিনি যেমন বঙ্গীয় নিকুঞ্জের কোকিল, তেমনি আবার বিলাতী কাননের nightingale। কিন্তু প্রকৃত দেশজ ইংরাজি কবিতাতে অভিমানের নাম-গন্ধও নাই, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে তাহা কি রূপে থাকিবার সম্ভব? ইংরাজি কবিতাতে নবপ্রেমের ঊষারাগ আছে, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে তাহা প্রচুর পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজি কবিতাতে প্রেমের জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন তীব্রতার অনল-উচ্ছ্বাস আছে, বঙ্গীয় কবি তাহাকে জ্বলন্ততর করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাইয়া, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল করিয়া, প্রলয়ের সর্ব্বনাশী ঝটিকাকে আহ্বান করিয়াও নিরস্ত হইতে চাহেন না, আবার, ইংরাজি কবিতাতে প্রেম নিরাশারূপ অমা-শর্ব্বরীর ঘোরতমসাচ্ছন্ন বিভীষিকার অবতারণা আছে সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে ঘোরতর নিবিড়তর অমাশর্ব্বরী আমরা প্রত্যেক সংবাদ পত্রেও দেখিতে পাই——কিন্তু আমরা এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, অভিমানের গোধূলী আমরা আধুনিক কবিতায় কোথায় দেখিতে পাই? সেই যে সেই অভিমান,—যে অভিমান প্রেমের কোন ধার ধারিতে চাহিতেছে না অথচ সকল ধার শোধিতে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে প্রাণপণে যত্ন করিতেছে, যে অভিমান প্রকাশ্যরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে প্রয়াস পাইয়াও অকাতরে—নীরবে—প্রাণের ভিতর প্রাণ ঢাকিয়াও চক্ষুজল সম্বরণ করিতে প্রাণ দিয়াও যত্ন করিতেছে,—যে অভিমান, লীলাময় মানের অবরোধ কাটিয়া ও হৃদয় ভেদী নিরাশার আশার মধ্যেও থাকিয়া এ-কূল-ওকূল-দুকূল দেখিয়া মর্ম্মের অতলস্পর্শে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে—সেই প্রকৃত ভালবাসার জ্বলন্ত অভিমান আধুনিক কবিতায় কোথায়?—সে অভিমান ইংরাজি কবিতাতে নাই, সে অভিমান ইংরাজি প্রকৃতিতে নাই। সেই জন্যই তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও নাই। অভিমানে যে একটী পরাধীনতা—যে একটি প্রাণ-ঢালা নির্ভরের ভাব আছে—তাহার সহিত ইংরাজি হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বতন্ত্র ভাবের কখনই ঐক্য হইতে পারে না। বঙ্গীয় হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে প্রাণ-মন-হৃদয়সর্ব্বস্ব অকাতরে বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু ইংরাজি হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াও নিজের নিজত্ব কখনই ভুলিতে পারে না। ভালবাসার স্থলে বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিবে যে "হে হৃদয় সর্ব্বস্ব! আমি তোমারই—তোমাতেই আমার জীবন, তোমাতেই আমার মৃত্যু,—তোমা ছাড়া আমার আমিত্বই নাই"— কিন্তু ইংরাজি হৃদয় বলিবে যে "হে হৃদয় সর্ব্বস্ব! তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তোমাকে নহিলে আমি সুখী হইতে পারি না।" গভীর প্রেমেতেও ইংরাজি হৃদয় কখনই নিজের স্বতন্ত্র-স্বাধীন নিজত্ব একেবারে বিসর্জ্জন করে না। প্রেমের অপমানে—প্রেমের নির্ম্মম তাচ্ছিল্যে একটি ইংরাজ হৃদয় উগ্রভাবে ইহাই বলিবে যে

"I wish you were dead, my dear ;
I would give you, had I to give
Some death too bitter to fear ;
It is better to die than live.
I wish you were stricken of thunder,
And burnt with a bright flame through,
Consumed and cloven in sunder,
I dead at your feet like you."

ইহাতে জ্বলন্ত ভালবাসার কিছু অভাব নাই,—নহিলে শেষ পংক্তিতে সেও মরিতে চাহিবে কেন?—কিন্তু সে জ্বলন্ত ভালবাসা সত্ত্বেও ইংরাজি হৃদয় নিজের নিজত্ব, নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিতে পারে নাই—এরূপ স্থলে একটী অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিবে—

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হল এ পথে আগমন,
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধু বদন!
প্রণয় ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি,
আমার কপালে নাই সুখ—
বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও সধা মাণিক পেলাম না—
দাঁড়াও—দাঁড়াও—প্রাণনাথ!— বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি—তাই
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু—থাক' থাক' বোলে ধোরে রাখ্‌ব না—
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল!—
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবি না পর—
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

মর্ম্মভেদী প্রেমের অপমানেও এরূপ অসীম উদারতা—প্রোজ্জ্বল ভালবাসা সত্ত্বেও এরূপ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর বৈরাগ্য—বৈরাগ্যে এরূপ অনুরাগ—অনুরাগে এরূপ বৈরাগ্য—এমন কে কোথায় আর দেখিয়াছ? ইংরাজি সাহিত্যে ত কখনই দেখিতে পাইবে না—এ রূপ প্রেমের অপমান-স্থলে একটি ইংরাজি হৃদয় প্রকৃত কবি Tennyson-এর মুখ দিয়া এই বলিবে—

Better thou and I were lying, hidden
from the heart's disgrace

Rolled in one another's arms, and
silent in a last embrace.

* * * * *

Am I mad,that I,should cherish that
which bears but bitter fruit
I will pluck it from my bosom,
though my heart be at the root."

এই প্রকৃত ইংরাজি হৃদয়—এই প্রকৃত ইংরাজি প্রতিজ্ঞা। ইহার যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করি না যে উহা আমাদের দেশজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হইতে পারে। ইংলণ্ডের lily পুষ্প ইংলণ্ডেরি পুষ্প,—তাহা প্রচণ্ড উত্তর বাতাসেও অক্ষুন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয় হৃদয় যে নিতান্তই কামিনী কুসুম সদৃশ, মৃদুল দক্ষিণ বাতাসেও তাহার পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া পড়ে—কি করিব? কিন্তু প্রকৃত কবি ত কামিনী কুসুমকে কামিনী কুসুম-রূপেই বর্ণনা করিবেন। ওরূপ বর্ণনার কথা দূরে থাক্—আজ কাল দু একখানি মাত্র কাব্য ব্যতীত অভিমানের কবিতা ত কোথাও দেখিতে পাই না। কিন্তু যে কেহ বঙ্গীয় হৃদয় সামান্য যত্নের সহিতও দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে তাহা বীররসে তেজস্বী নহে, মহান-ভাবে প্রশস্ত নহে—তাহা করুণ রসে মগ্ন—তাহা ভালবাসাতেই উথলিত, এবং অভিমানই সেই ভালবাসার সফেন তরঙ্গভঙ্গ। কি বাল্যকালে পিতা মাতা সম্পর্কে—কি যৌবনে প্রণয় সম্পর্কে—কি প্রৌঢ়ে বা বার্দ্ধক্যে দেবতা-সম্পর্কে, আমাদের অভিমানের ভাবই বিশেষ প্রবল—অভিমানই আমাদের হৃদয়ের একটি বিশেষত্ব। সংবৎসর পরে যখন পার্ব্বতী কৈলাসপুরী অন্ধকার করিয়া পাষাণ মা-বাপের ঘরে আসিলেন, তখন মহাদেবের জন্য তাঁর আর দুঃখ নাই,—মা-বাপকে পাইয়া তাঁর হৃদয়ের দিগন্তব্যাপী উল্লাস নাই—তিনি অভিমানেই গদগদ—অভিমানেই উন্মত্ত। একজন দেশজ কবি এরূপ স্থলে আমাদের নব-বিবাহিত বালিকা হৃদয় কত দূর বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই সংগীতটীতেই বুঝিতে পারিবেন——

পুরবাসী বলে উমার মা, তোর হারা তারা এল ওই।

শুনে পাগলিনীর প্রায় অমনি রাণী ধায়, কই উমা বলি কই।

কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে, একবার আয় মা, একবার আয় মা একবার আয় মা করি কোলে।

অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি, অভিমানে কাঁদি, রাণীরে বলে,—

কই মেয়ে বলে আন্তে গিয়েছিলে, তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ,

জেনে, এলাম আপনা হতে, গেলেনাক নিতে, রব না, যাব দুদিন গেলে।

এই সমস্ত সংগীতটিতে আমরা যে এক মনোহর ছবি দেখিতে পাইতেছি সেরূপ মনোহর একখানিও ছবি কি আধুনিক কবিতাতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? সেই নববিবাহিতা নববালিকা যে কেমন

করিয়া আজ বৎসরেকের পরে অভিমান ভরে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—সেই গৌরকান্তি মুখমণ্ডল কেমন আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে—সেই দরবিগলিত সুদীর্ঘ অর্দ্ধ মুদিত নয়ন দুটী—পাছে মায়ের সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হয়,এই ভয়েই যেন নতপল্লব—সেই এক একটী কথার পরে এক-একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! আবার ওদিকে মেনকারাণী—লজ্জায় ও কষ্টে কোন কথাই কহিতে পারিতেছেন না, অথচ প্রাণের দুহিতাকে কোলে পাইয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে—দুহিতার প্রত্যেক কথায় ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আরও আরও তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেছেন—মায়ের চোখের জলে ও মেয়ের চোখের জলে গঙ্গার মত আর একটি পবিত্র নদী যেন হিমালয় বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে—আবার দুজনেই মুগ্ধ—দুজনেই নিস্তব্ধ—অনেকক্ষণ পরে মেনকারাণীও অভিমানের উত্তরে অভিমান করিয়া বলিতেছেন——

"সুধাই তাই ও গো ঈশানী।
যার উমা, জগতের মা,
তার কি মা এমন হয়;
হ্যাঁগো প্রাণের তারা, সেও কি উমা হারা রয়?
মা,তোর শ্রীমুখ না হেরে,যে দুঃখ অন্তরে,
ছিলাম মণিহীনা ফণী দিবা যামিনী।
ভাল, মা গো, মা তোর যেন পাষাণী,
তুই ত জগৎ জননী,
ভাল তা বোলে মা একবার, মায়ে তোমার, মনে কর কৈ গো তারিনী॥

কৈলাস শিখরে শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা ভুলে থাক মায়, মা বোলে করিস্ না মা মনেতে, এ দুঃখ বলি গো মা কায়।
বালিকা দুহিতায় না হেরে মা নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন, ও মা হর-অঙ্গনে!—
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা,
শক্তিহীন শক্তি-তত্ত্বে—ঈষানী।"

আজ কঠোর হিমাচলের শিখরে এই ভুবনমোহিনী প্রতিমা কোন্ আধুনিক কবি দেখাইতে পারে? এমন সহজ, সরল, হৃদ্‌গত ভাব লইয়া কোন্ কবি অনন্ত তুষার রাশির উপরে শারদ জ্যোৎস্না ফুটাইতে পারে? তবুও স্বীকার করিতে হয় যে মাতা ও দুহিতার সম্পর্কে অভিমান ততটা তীব্র হইতে পারে না, কেন না উভয়েরই উভয়ের ভালবাসার উপর সহজ বিশ্বাস আছে—উভয়েই মনে মনে কতকটা জানে যে কেহই কাহারও পরিত্যজ্য নহে,—এই জন্যই ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য;—দ্রষ্টব্য, যে এরূপ মর্ম্মগত বিশ্বাসের স্থলেও বঙ্গীয়হৃদয়ে অভিমান উথলিয়া উঠে, কারণ আমাদের কোমল প্রাণে ভালবাসার সকল অবস্থাই—কি স্নেহ, কি প্রেম, কি প্রণয়—ভালবাসার সকল অবস্থাতেই অভিমান প্রধান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমই অভিমানের অরাজকতার রাজ্য। কারণ, প্রেমেতে ভালবাসার উপর মর্ম্মগত বিশ্বাস লইয়াই টানাটানী। একেবারে বিশ্বাস না থাকিলে ত নিরাশা-শ্মশানে আসিয়া পড়িতে হয়, আবার মনের দৃঢ় অথচ অপ্রকাশিত বিশ্বাস থাকিলে অভিমান লীলাময় "মা-

নেতে" অবনত হইয়া পড়ে——কিন্তু যে খানে ঐ মনের বিশ্বাস থাকিয়া যেন নাই, আবার না থাকিয়া ও যেন আছে—যেখানে আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের দেখা হইয়াও হইতেছে না—মিশিয়াও মিশিতেছে না,—হৃদয়ের সেই সায়ং গোধূলীর অবস্থাটিই অভিমানের অবস্থা। এরূপ অবস্থায় কোন কথাই প্রায় কহা যায় না, এক একটী কথা প্রত্যেক পঞ্জরে আটক খাইয়া কণ্ঠ হইতে সাবধানে, অতি সন্তর্পনে, অতি ভয়ে ভয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বাহির হয়। কিন্তু যদি ঐ চঞ্চল বিশ্বাসের একটুও দাঁড়াইবার স্থল হয়, তখন অভিমান কতকটা মুখরা হইয়া পড়ে অতি ধীরে ধীরে—অতি প্রশান্ত ভাবেও কতকটা যেন মুখরা হইয়া পড়ে। নেত্র-দ্বয় ভিতরে ভিতরে অশ্রুতে আকুল, ধরা-নিবিষ্ট, কিন্তু দৃশ্যতঃ চক্ষে জল নাই—রস-নায় জড়তা নাই—অভিমান বরং ঈষৎ ভ্রুকুটী করিয়া এইরূপে চাপাকান্না কাঁদিতে যাইয়াও দিবালোকে বিদ্যুতের ম্লান হাসি হাসিয়া বলিতে থাকে—

"নূতন যারা, তোমার তারা নয়নের তারা,
একি স্থূলে ভুল,
যে জন আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা ?
কোথায় শিখ্‌লে নাথ এমন মন রাখা,
বুঝতে নারি ভাব, এ কি ভাব, তোমার আজ সখা।
ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান
কেন, কর পূজ্য ধনের অপমান ?
ছিঃ ছিঃ নাথ! বলো না "প্রাণ,"
ইথে হাসবে লোকে, আমার পাকে,
শেষে কি হে হবে অপমান!
যারে প্রাণ সঁপেছ সেই এখন প্রাণ।
আমায় বোল্লে "প্রাণ"—প্রাণ জুড়াবে না,
শুন্‌লে সে আবার, পাবে নাথ প্রাণে যাতনা।
আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, অন্যে অন্তরে দিয়েছ স্থান।
যথায় তব নব ভাব, তারে "প্রাণ" বল গে—হবে তার সুখ,
আমায় কেন বোলে "প্রাণ" বাড়াও দ্বিগুণ দুখ ?
ভেবেছিলাম প্রাণনাথ গিয়েছে সে দিন,
এখন হলাম "প্রাণ" কেবল কথার "প্রাণ"
কিন্তু কর্ম্মে ফল হীন!
তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার,
ক'রবো অনাদর কি দোষে বল হে তাহার!
চোখের দেখা মুখের আলাপন,
এখন তাই লক্ষ লাভ জ্ঞান।"

কিন্তু প্রেমের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইষ্ট-দেবতার সম্পর্কে যে এক প্রকার অভিমান আছে, তাহা বঙ্গীয় হৃদয় ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরের উপরে আবার অভিমান —এ কথা শুনিলেই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, হয় ত অনেকে তাহা "পাষণ্ড নাস্তিকের" প্রলাপ মনে করিয়া শুনিতে চাহিবেন না। যে দেশে বা যে ধর্ম্মে ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিতে

জানে না, সে দেশের বা সে ধর্ম্মের লোক ত এরূপ অভিমানের মর্ম্মই বুঝিতে পারিবে না। কারণ, "পিতা" বলিতেই যে ভাবটী আমাদের মনে আসে তাহার সহিত ভক্তির সম্পর্কই অধিক। কিন্তু মাতা ?—মা—ঐ একটী অক্ষরের শব্দের ভিতরে কি অপার—অগাধ—অতলস্পর্শ স্নেহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে। তিনি আমাদের ভক্তির বিষয় কি ভালবাসার বিষয়,—ভয়ের বিষয় কি "আব্‌দারের" বিষয়, তাহা আমরা জানি না, জানিতে চাহিও না—তিনি আমাদের "মা"—তাঁহার সুকোমল পক্ষচ্ছায়ায় আমরা দিন দিন প্রতিপালিত দিন দিন বর্দ্ধিত—দিন দিন উল্লসিত! তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁর দেহের অঙ্গীভূত, তাঁর হৃদয়ের রুধির, তাঁর প্রাণের প্রাণ! সুখ হইলে উল্লাসে তাঁহার বক্ষে গিয়া পড়িব, দুঃখেতে তাঁহারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিব—অনুরাগে তাঁহার কোলে মাথা রাখিব, আবার রাগেতে তাঁহারই উপর উপদ্রব করিব। বালক-কালে যখন আমরা মায়ের উপর অভিমান করিয়া ভাত খাইতে চাহিতাম না, তখন ভাত না খাইলে যে আমাদের কষ্ট হইবে, তাহা ত ভাবিতাম না, কিন্তু আমি ভাত খাইলাম না বলিয়া মায়ের মনে যে আঘাত লাগিবে, সেই আঘাতের উপর লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা দূরে দূরে থাকিতে পারিতাম।—যেন মনে মনে বুঝিতাম যে আমার ক্ষুধার যাতনার অপেক্ষাও মায়ের মর্ম্ম যাতনা অধিকতর তীব্র হইবে, এবং সেই জ্ঞানেই—সেই অহঙ্কারেই আমরা ভাত ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতাম। আজ যদি আমার ইষ্টদেবতাকে সেই আমার "মা"-ভাবে না দেখিতে পাইলাম, ত আমার ইষ্টদেবতার থাকা আর না থাকা আমার ভরসার পক্ষে—সাহসের পক্ষে—উল্লাসের পক্ষে—প্রায়ই সমান হইয়া পড়ে। যাঁহারা জগদীশ্বরকে প্রকৃত "মা" বলিয়া জানেন, যাঁহারা সংসারের অত্যাচারে, বিপদের ঘূর্ণ্যবাত্যায়, হৃদয়ের শূল-বেদনায় অস্থির হইয়া ইহলোকের "মা" অপেক্ষাও মাতৃতর ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদের মনের সাহস ও ভরসা, উল্লাস ও শান্তি অনিবার্য্য। তবে মায়ের উপর অভিমান হইবে কেন ?—তাহারও আবার বিলক্ষণ কারণ আছে। বিশ্বাস দুই প্রকার—একটি মনের বিশ্বাস, আর একটি মর্ম্মের বিশ্বাস। "মা" সম্পর্কে অনেক সময়ে আমাদের মর্ম্মের বিশ্বাস ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ অবস্থাগত ব্যবহারে মনের বিশ্বাস বিচঞ্চলিত হইয়া পড়ে। যখন নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রনার মধ্যে পড়িয়া আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করি, তখন এই ভাবি যে "আমার অমন মা থাকিতে কেনই বা যন্ত্রনা পাইব'—অথচ যন্ত্রনা পাইতেছি, কল্পনার যন্ত্রনা নয়,—প্রকৃত কঠোর যন্ত্রনা ভুগিতেছি তখন আমার ইষ্টদেবতার স্নেহের উপর কতকটা মনের অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে, কিন্তু মর্ম্মের বিশ্বাস একেবারে যায় না, এবং যায় না বলিয়াই আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল—নিঃসহায় আশ্রয়হীন শিশুর মত এই

বলিয়া দারুণ অভিমানভরে কাঁদিতে থাকি—

"মা—মা—বোলে আর ডাকিব না!
ও মা,—দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা!
বারে বারে ডাকি "মা"-"মা"—বলিয়ে
মা বুঝি আছ গো অচৈতন্য হোয়ে—
মাতা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা বেঁচে তার কি ফল বল না।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর (ও) কি ক্ষমতা রাখিস্ সর্ব্বনাশি!
না হয়—দ্বারে দ্বারে যাব,
ভিক্ষা মেগে খাব,
মা মোলে কি ছেলে বাঁচে না।
রামপ্রসাদ ছিল মায়েরি পুত্র
'মা' হোয়ে হলি মা ছেলেরি শত্রু,
তাই—দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি—
না হয়—বারে বারে দিবি জঠর যন্ত্রণা!"

এই জ্বলন্ত অভিমানের গীতটী পড়িলেই আমাদের সেই ছেলেবেলার অভিমানভরে ভাত না খাওয়ার কথাটী মনে আসিয়া পড়ে। সেই দুর্ব্বল নিঃসহায় অবস্থা, সেই অনাদরের সুতীব্র অভিমান, সেই মর্ম্ম-বিশ্বাসকে ঢাকিয়া মনের বিশ্বাসের প্রাধান্য, সেই আশা, সেই ভরসা—সেই "মা"-সর্ব্বস্ব ভাব।

এরূপ মোহ-মুগ্ধকর ভাব বা ভাবের আভাসও আধুনিক কবিতাতে কোথায়?

শ্রী অঃ—

গান।

(১ম)

ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
আমার কানের কাছে আমার প্রাণের মাঝে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!

গাও তুমি বিরামের গান,
গাও তুমি মরণের গান,
শুনি আমি ধীরে ধীরে ধীরে
চিরতরে মুদিয়া নয়ান।

কুসুমের কানে কানে শীতের দুরন্ত বায়
জাননাক কি যে গান গায়!
যে গান শুনিলে পরে, দিশেহারা ফুলগুলি
একেবারে শুখাইয়া যায়!

জান যদি সেই গান, জান যদি সেই তান
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
আমার কানের কাছে, আমার প্রাণের মাঝে
ধীরে ধীরে অতিধীরে গাও গো!

২

বড় ভাল লাগিয়াছে প্রাণে
শিবার নিশীথ কোলাহল,
কপোতীর করুণ ক্রন্দন,
কুসুমে শিশির অশ্রুজল,
শোকাচ্ছন্ন সন্ধ্যার গগন,

সন্ধ্যার উদাস বায়, প্রতিদিন গান গায়
সেই এক বিষাদের গান,
সেই এক বিরামের গান,
সেই এক মরণের গান।
সে গান শুনেছি কানে, বাঁধা আছে প্রাণে প্রাণে
তাই বলি ধীরে ধীরে গাওগো,
আমার কানের কাছে, আমার প্রাণের মাঝে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাওগো।

গান।

নিবে আসে জগতের আলো,
নিবে আসে অনন্ত সংসার,
নিবে আসে কালের প্রদীপ,
নিবে আসে জীবন আমার।
ডুবায়ে রবির ভাতি, প্রসারি অনন্ত কায়া
সম্মুখেতে ঘোর অন্ধকার,
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, একি গো মহান্ স্তব্ধ
ঝাঁ—ঝাঁ—করে চারি ধার!

ঘুমা ওই আঁধারের কোলে,
ঘুমা তুই হৃদয় আমার!
কাঁদিবার দিন গেছে চোলে
কাঁদিতে শকতি নাহি আর।

২

কহিস্ না একটিও কথা,
একেবারে ঘুমাইয়া পড়্,
ওই দেখ্ চারিদিক ঘেরে
উঠিতেছে প্রলয়ের ঝড়!
শ্রান্ত মাথা রেখে দেরে, রেখে দেরে এইখানে
আঁধারের মোহময় বুকে,
উঠুক্ সহস্র ঝড় গরজি গরল ফণা
ঘুমা তুই ঘুমা তুই সুখে!
জুড়াইবে হৃদয়ের জ্বালা,
জুড়াইবে আকুল পরাণ
কেড়ে নে ঝড়ের মুখ থেকে
এলো মেলো পাগলের গান।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বীজ নির্ব্বাচন।*
ও
শস্য উৎপাদন।

সুযোগ্য নির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া য়ুরোপে পালিত জন্তুদের অনেক প্রকার উন্নতি সাধন করা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এইরূপ উপায়ে ইংলণ্ডের গোপালেরা গোজাতির শারীরিক আকৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, কালো গোরুর বংশধরদিগকে শাদা করিয়া তুলিয়াছে, এই উপায়েই "ডর্হামে"র গরু অসাধারণ মাংসল হইয়াছে এবং "ইয়র্কে"র গাভী দুগ্ধবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদের বিষয়ে এতদূর মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। শস্যাদি উৎপাদন সম্বন্ধেও যদি নির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে যে প্রচুর ফল লাভ করা যাইতে পারে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এক জাতীয় সকল উদ্ভিদে কিছু সমান ফল হয় না,

* Foed plant improvemento. Paper read by Major Hallet at the Brighton Health Congress. Nature May 25. 1882.

কোনটায় ভাল হয়, কোনটায় মন্দ হয়। সেই ভাল উদ্ভিদ হইতে ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া বপন করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে সেই উদ্ভিদ্ জাতির যে যথেষ্ট উন্নতি হইবে ইহাই সম্ভবপর। আমাদের দেশে অনেক অনেক ভাল ভাল বিশেষ প্রকারের আম্র-ফল আজপর্য্যন্ত যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, সে কতকটা এই উপায়ে। শস্যাদি সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটাইলে তাহাতে অনেক উপকার দেয়। এক ঘোড়া গরু হইতে এক কালে একটির অধিক বাছুর পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু একটি ধান রোপিলে যে গাছ হয়, সে গাছে যতগুলি শীষ জন্মায় তাহাতে প্রায় সাত আট হাজার ধান জন্মাইতে পারে। এই সাত আট হাজার ধান হইতে সাত আট হাজার গাছ জন্মাইলে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গাছ গুলি রাখিলে তাহা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

কেবল মাত্র সম্ভাবনার কথা বলিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে চাই না, কার্য্যতঃ কতদূর হইয়াছে, তাহাও আমরা দেখাইব। হ্যালেট্ নামক একজন ইংরাজ পূর্ব্বোক্ত-রূপ বীজ বাছাই করিবার জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন—ইঁহার পদ্ধতির নাম Hallet's Pedigree System। ইহাঁর নির্ব্বাচিত বীজের শস্য-উৎপাদন-ক্ষমতার শত শত আশ্চর্য্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তির ১২ একর জমী আঙুরের চাষ ছিল—তিনি হ্যালেটের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বীজ বপন করাতে এত অধিক ফসল পান যে, পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ অধিক মদ্য প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন—অর্থাৎ পূর্ব্বে ছত্রিশ একরে যে ফল হইত, এখন বারো একরে সেই ফল হইল। সকলেই জানেন য়ুরোপে এবং আমেরিকার স্থানে স্থানে বিট্-পালণ্ডের মূল হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কানাডা হইতে একব্যক্তি Gardener's Chronicle and Agricaltural Gazette"-এ লিখিতেছেন যে বিট্ চাষ করিতে হইলে তাহার বীজের গুণাগুণের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম বিট্ হইতে শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র চিনি উৎপন্ন হইত, কিন্তু বীজ-নির্ব্বাচন পদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিয়া এখন তাহা হইতে শতকরা ১৫ ভাগ চিনি উৎপন্ন হইতেছে। বিলমোরিন্ নামক এক ব্যক্তি বীটের মূল পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র তৈয়ারি করেন। প্রত্যেক বীটের মূলে কতটা পরিমাণে চিনি আছে, অতি সূক্ষ্ম ওজনের পদ্ধতি অনুসারে এই যন্ত্রের দ্বারা সহজে তাহার প্রমাণ হয়। যে সকল বীটের মূলে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি আছে, বীজ-উৎপাদনের জন্য সেই গুলিই কেবল রোপিত হয়। তাহার বীজ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বীটমূল উৎপন্ন হয়—এইরূপে ক্রমশই বিটের উন্নতি হইতে চলিয়াছে।" অষ্ট্রেলিয়াতে হ্যালেটের নির্ব্বাচিত বীজ লইয়া গমের চাষ হয়। যেখানে পূর্ব্বে এক একরে দশ বুষেল (প্রত্যেক বুষেল প্রায় ৯॥০ সের) গম উৎপন্ন হইত, উক্ত বীজ বপন করিয়া সেইখানে ৯ হইতে ৩৫ বুষেল্ উৎপন্ন হইতে লাগিল। বড় বড় শীষে ১১৩টি করিয়া শস্য জন্মিতে লাগিত। এইরূপে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া ১৮ বৎসর পরে ৭২ বুষেল শস্য জন্মিল। অনেকগুলি গাছে প্রায় ৯০টি করিয়া শীষ বাহির হইল, এবং অনেকগুলি শীষে ১৩২টি করিয়া শস্য জন্মিল। ফ্রান্সে ক্রসিয়ের নামক স্থানে একটি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসারে বীজ বপন হইয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন গড়ে ২৪ বুষেল শস্য উৎপন্ন হইল, এই ক্ষেত্রে তখন ৫৬ বুষেল শস্য জন্মাইল। কেবল ফসলের ন্যূনাধিক্য না দেখিয়া যদি অন্যান্য গুণ দেখাযায়, তাহা হইলেও হ্যালেটের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বেল্‌জিয়মে পরীক্ষিত হইয়াছে—যে, যখন বরফে অন্যান্য সকল শস্য নষ্ট হয় তখন হ্যালেট নির্ব্বাচিত জীবের চারা নষ্ট হয় নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বম্বের গবর্ণর সর্ সীমোর ফিট্‌জেরল্‌ড তুলার চাষের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত আছে "ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর ধরিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিয়া বপন করিলে তাহা হইতে যে কি পরিমাণে শস্যের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহা আমি ইংলণ্ডে আমার নিজের জমী ও অন্যান্য ভদ্রলোকের জমী হইতে দেখিয়াছি। হ্যালেটের বীজ নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ ;—প্রথম বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শীষ গুলি হাতে করিয়া বাছিয়া লইয়া তদুৎপন্ন বীজ বপন করিবে। পরে গাছ জন্মিলে পুনশ্চ তাহা হইতে সর্ব্বোত্তম শীষগুলি বাছিয়া লইবে, ও তদুৎপন্ন বীজ রোপণ করিবে,এমনি উপর্য্যুপরি কএক বৎসর করিলে পর হ্যালেটের "Pedigree" বীজ উৎপন্ন হয়। আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বাজারে কেনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজের অপেক্ষা এই বীজে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ অধিক পরিমাণে ও শতকরা ৫০ ভাগ অধিক ভাল শস্য উৎপন্ন হয়।" বম্বের গবর্ণর উক্ত পদ্ধতি অনুসারে দক্ষিণে তুলার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সেইসময়কার তুলার কমিসনর মেজর মুর রিপোর্টে লেখেন যে,—হ্যালেটের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বকার অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক ফসল হইতেছে। যে সকল বীজ বাকী ছিল চাষারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। একটি গ্রাম হইতে সন্ধান পাওয়া গেল যে, এই বীজ হইতে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ অধিক ফসল জন্মিয়াছে। যদি মনে করা যায় এই পরিমাণই স্থায়ী হইবে, ইহা হইতে অধিক ফসল আর জন্মিবে না, তাহা হইলেও দেখা যাইবে—পূর্ব্বাপেক্ষা ২৬৩৬৫৯৭৯ টাকা মূল্যের অধিক শস্য উৎপন্ন হইল।"

দেখিলাম,—চাকরী প্রভৃতি অবলম্বন ব্যতীত কি উপায়ে শিক্ষিত লোকদিগের স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়া ভারতীর সম্পাদক মহাশয় এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বিবেচনা করি, আমাদের দেশে সহজে ও অল্প মূলধনে জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে কৃষিকার্য্যই প্রশস্ত। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় ও জীবিকা অর্জ্জনের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি কয়েক বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ভাল বীজের লক্ষণগুলি আবিষ্কার করেন ও নির্ব্বাচিত বীজ-রোপণ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাঁহাদের পরিশ্রমের প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইবেন। কাজটি নিতান্ত দুরূহ বলিয়া মনে হয় না। বড় বড় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা এখনো বাঙ্গালীদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতে পারি না, কিন্তু যত্ন ও শ্রম সহকারে বীজ-নির্ব্বাচন-প্রণালী আবিষ্কার করা বোধ হয় তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত।

—:০:—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পদ্য-বিন্দু। প্রথম ভাগ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে প্রণীত। মূল্য /১০ আনা।

এই গ্রন্থে শিশুদিগের জন্য হোমিওপাথিক মাত্রায় কবিতার সহস্রতম ডাইলিউষনের পদ্য-বিন্দু ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের মতে ইহা অপেক্ষা অধিক মাত্রা শিশুদের ধাতে সয় এবং তাহাতেই তাহাদের যথার্থ উপকার হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায়

বলিয়াছেন ;—"বহু দিন হইল একটা ভারি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। শক্তি ও অর্থাভাবরূপ ঔষধের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, তখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই। আজ তাহার পুনরাবির্ভাব,—নমুনা এই পত্র কতিপয়। পাঠক, বুঝিয়াছেন, রোগটা কি। এখন জিজ্ঞাসিবেন উদ্দেশ্য কি? সমালোচক উত্তর দিবেন—উদ্দেশ্য শিশুদের শিরশ্চর্ব্বণ।"

আজ কাল লেখকদের মধ্যে এক প্রকার "আহ্লাদে"-রসিকতা, চটুল-ছিব্‌লামীর ফেসিয়ান হইয়াছে, এই ভূমিকাটীও তাহাই। গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, রোগের আবার উদ্দেশ্য কি? রোগ উদ্দেশ্য-বিচার করিয়া আসে না। রোগের যদি উদ্দেশ্যই থাকিবে তবে লেখকের প্রতি আমাদের প্রশ্ন এই, তিনি যে সময়-অসময় বিচার না করিয়া বালকদিগের জন্য গ্রন্থ লিখিতে গিয়াও তাহার ভূমিকায় অনর্থক একটা কাষ্ঠ-রসিকতা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এ রোগের উদ্দেশ্যটা কি? এ রোগ যদি অনেকটা সাধারণ না হইত, তাহা হইলে আমরা এত কথা বলিতাম না।

সুলোচনা। এই গ্রন্থখানির মলাটে পুস্তকের নাম ধাম বিবরণ সমস্তটাই ইংরাজিতে লিখিত। তাহার কোন কারণ পাওয়া গেল না। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় প্রথমে ইংরাজি অক্ষরে পুস্তক ও গ্রন্থকারের নাম লিখিত থাকে ও তাহার নীচে বাঙ্গলা অক্ষরে পুনশ্চ তাহাই মুদ্রিত থাকে; কোন গ্রন্থে বা বাঙ্গলায় পুস্তকের নাম প্রভৃতি লিখা থাকে পরে "or" সংযোগ করিয়া ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ বা ব্যাখ্যা লিখিত হয়। মুদ্রাঙ্কনে এই প্রকার ফিরিঙ্গিবৃত্তি কখনো না একটা ভাল অর্থ আছে, না তাহাতে সুরুচি প্রকাশ পায়। সমালোচ্য গ্রন্থখানি একটি উপন্যাস। ইহাতে আখ্যানের ভাগ অতি অল্পই আছে, তবে সহজ বাঙ্গালায় ও ভুল বানানে আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার যথাযথরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাতে উপদেশ প্রচুর আছে। কিন্তু পেটে না খাইলে পিঠে সয় না;—যদি উপাখ্যানের ভাগ যথেষ্ট থাকিত, তবে এ উপদেশ গুলি গায়ে সহিত।

বিলাতী সতী। বা সতী এমিলি। প্রকাশক শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ব্যভিচার করিয়া বিলাতী সতী লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এক স্থলে আছে—"কেবল স্বভাবের উপদেশ ভিন্ন তাহার আর ক্রন্দন করিবার অবসর ছিল না।" এ কোন্ মুল্লুকের বাঙ্গালা? উপন্যাসটি পড়িয়া বোধ হইল, এখানি কোন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরাজি উপন্যাসের কদর্য্য অনুবাদ।

আর্য্যগাথা। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ বিষয়ক গান প্রকাশিত হইয়াছে। গান গুলি প্রায় সমস্তই ভাল। সুর-সংযোগে আরো ভাল লাগিবার কথা। অনেক স্থানেই লেখকের যথার্থ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। স্বভাব-সৌন্দর্য্যের প্রতি কবির অনুরাগ সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়াছে। এ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

শরৎ-শশী নাটক। সেক্ষপীয়র প্রণীত নিদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন হইতে সংগৃহীত। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৷০ আনা।

আমরা এ গ্রন্থখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। অনুবাদের হিসাবেও ইহা ভাল হয় নাই, রচনার হিসাবেও ইহা ভাল হয় নাই।

ইবন বতোতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরিব্রাজক কাবুল হইতে ভারতে উপস্থিত হন। তিনি কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যাইতে পারে না। কিন্তু বোলান পাস দ্বারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুবিজ্ঞ Yule সাহেবও এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া একটি নিম্ন জলা-ভূমি প্রাপ্ত হন। তৎপরে দুই দিবস গমন করিয়া জনানইর নগরী প্রাপ্ত হন। জনানইর অধিবাসীগণ সমিরা নামে পরিচিত। সিন্ধুর মোহনাস্থিত ব দ্বীপের পূর্ব্বাংশে সমিরা বা সোম্রাদিগের বাস ছিল। (৮) পরিব্রাজক জনানইর হইতে শিবস্থান বা শিবানে গমন করেন। তথা হইতে তিনি সাগরতীরবর্ত্তী লাহরি বোরি বা লাহরি (বন্দ)তে উপনীত হইয়াছিলেন। লাহরির কিঞ্চিদ্দূরে "তার্ণা" নামক একটী পরিত্যক্ত পল্লী ছিল। পরিব্রাজক সেই স্থানে যাইয়া কতকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত মনুষ্য ও পশু পক্ষী দর্শন করেন। তিনি দেশবাসীদিগের নিকট শ্রুত হইয়াছিলেন যে এই সকল পূর্ব্বে জীবন্ত ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধে ইহারা প্রস্তর হইয়া গিয়াছে।

তৎপর পরিব্রাজক বাম্বুর, উজ্জা (উচ্ছা) দর্শন করিয়া মুলতানে গমন করেন।

প্রবাদ অনুসারে মাল নামক জাতি এস্থানে বাস করিত। তদনুসারে ইহাকে "মালি," "মালভূমি" বা "মালস্থান" বলিত। বিজয়ী আলেক্‌জেণ্ডার ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিন্ধুতীরস্থিত মালিদিগের বাসভূমি (Country of malle) দিয়া গমন করেন। গ্রীক রাজদূত মেগস্থনিস ভারতবাসী জাতি সমূহের তালিকায় "মালি" দিগকে স্থান দান করিয়াছেন। এরিমান বলেন, মালিদিগের রাজ্যে অকসেনী (চিনাব) নদী সিন্ধু-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। এই মালস্থান এই বর্ত্তমান মুলতান, নামটী অপভ্রংশ। ভূগোলবেত্তা টলেমির (৯) জগত চিত্রে মুলতান Maleta নামে চিত্রিত হইয়াছে।

৮ Elliot's India. By Dowson. 1. 324, 343 484.

৯ মিসরের অন্তর্গত পিলুসিয়ম নগরে ১ পূর্ব্ব শকাব্দে টলেমি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে বাস করিয়া

কবিচূড়ামনি কালিদাস যক্ষমুখে রামগিরি হইতে কৈলাসযাত্রী মেঘের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে মালক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। (১) কোনও কোনও লেখক মূলতানকেই সেই মালক্ষেত্র নির্ণয় করেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা সঙ্গতবোধ হইতেছে না। কারণ উত্তর-দিক-যাত্রী মেঘ মালক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া "আম্রকূট" পর্ব্বত প্রাপ্ত হন। (১১) আম্রকূট নামান্তর অমরকণ্টক বিন্ধ্য পর্ব্বতের একটী শাখাশ্রেণী মাত্র। এই শাখা পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যদেশের পশ্চিম ও বিলাসপুরের উত্তর। এই মালক্ষেত্র যে মালস্থান (বর্ত্তমান মূলতান) হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় অন্য প্রমাণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ (১২) আমাদের পাঠকগণের নিকট বিশেষ রূপে পরিচিত। শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি মূলতান দর্শন করেন। সেই সময় মূলতানবাসীগণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। একটী বৃহৎ মন্দিরে ভগবান আদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

শকাব্দের সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগে ডাহির নামক নরপতি পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। মূলতান তাঁহার অন্যতম রাজধানী। তিনি আরব দেশীয় বণিকদিগের কয়েক খানা জাহাজ লুণ্ঠন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করেন। ইরাকের শাসনকর্ত্তা হজ্জজে এই সম্বাদ শ্রবণ মাত্র বৃহৎ একদল সেনা ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রায় মহম্মদ

নাবিক ও বণিকগণ হইতে পৃথিবীর বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি যে সকল গ্রন্থ হইতে জগৎচিত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। ভূগোলবেত্তাগণ মধ্যে তাঁহাকেই আদিস্থান দেওয়া যাইতে পারে। গণিতবিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন অসম্পূর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল ভূগোল গ্রন্থ সংশোধন করিয়া তিনি প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে জগৎবাসীদিগকে জগতের প্রকৃত চিত্র দেখাইয়াছিলেন। তিনিই প্রথমত দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা অঙ্কিত করিয়া দেশ ও নগরাদির স্থিতিস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ অতি সামান্য এবং তজ্জন্য তাঁহার দোষ গান করা উচিত নহে।

১০ মেঘ দূত, পূর্ব্ব মেঘ, ১৬ শ্লোক।
১১ ,, ,, ১৭ শ্লোক।

১২ বঙ্গীয় লেখকগণ অনেকে Heown Thsang এর বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দুই জন লেখকের নিকট এই নামটী একপ্রকার দেখিতে পাইলাম না। দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক পরিব্রাজকের নাম "হোয়েন্থ সাঙ" ও "হায়েন্থসাঙ" লিখিয়াছেন। মাতওয়ালিনের গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদক এই নামের প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে Heown chang লিখিয়াছেন। যদিচ আমরা চীন ভাষাজ্ঞ নহি, তথাপি আমাদের বিবেচনায় পরিব্রাজকের নামের মধ্য ভাগে "থ" সংযুক্ত করা যাইতে পারে না। হিয়োনসাঙকে হোয়েন্থসাঙ বলিলে মহারাজ, অশোককে "অথোক" লিখিতে হইবে। কারণ উভয় নামের মধ্যেই "Kh" প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিন কাসিম (১৩) সেনাপতি হইয়াছিলেন। মহম্মদ বিন কাসিম পারস্য ও বেলুচিস্থান অতিক্রম করিয়া ভারতের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া সিংহনাদ করিলেন। সুপ্তসিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল, আর্য্যবীরকেশরী ডাহির ম্লেচ্ছ যবনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আর্য্যজাতির অধোগতি বিধাতার ইচ্ছা, আর্য্যবীরগণ জন্মভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদান করিয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত পঞ্চনদ প্রদেশ যবনপদানত হইল। ৬৩৪ শকাব্দে মহারাজ ডাহির সমরক্ষেত্রে প্রাণ দান করিলেন। তৎপুত্র যুবরাজ জয়সিংহ পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিলেন। বিজেতাগণ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। মহম্মদ বিন কাসিম মূলতানে উপনীত হইয়া ভগবান আদিত্যের গলে গোমাংশহার বিলম্বিত করিলেন।

The idol of Multan was called *Aditya* because it was consecrated to the *Sun*, and that Mahamud bin Kassan, the first invader suspended a piece of Cow's flesh from its neck, in order to show his contempt of the superstition of the Indians, and to disgust them with this double insult to the dearest objects of their veneration.

(Elliots India)

১৩ "বিন" অর্থ পুত্র," সুতরাং ইনি কাসিমের পুত্র মহম্মদ।

পঞ্চনদ প্রদেশ দুই বৎসর মাত্র মুসলমানদিগের অধীন ছিল। ৬৩৬ শকাব্দে নূতন খলিফা, মহম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লিখিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে জয়সিংহ ব্রাহ্মণাবাদ নগরে নূতন রাজপাঠ স্থাপন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তিনি ও সিন্ধুদেশের অন্যান্য রাজগণ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান আদিত্য মহম্মদ বিন কাসিমের দণ্ডবিধান করেন নাই বলিয়াই কি জয়সিংহ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাহার দণ্ডের ত্রুটি হয় নাই। খলিফার সমক্ষে উপস্থিত হইলে রাজাজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

আরবদেশীয় সুবিখ্যাত ভূগোলবেত্তা মসোদি (১৪) ৮৬৯ শকাব্দে লিখিয়াছেন

১৪ মসোদি ভারত, সিংহল, চীন উপকূল ও মুসলমানদিগের অধিকৃত অন্যান্য প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া ৮৬৯ শকাব্দে নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। তাহার গ্রন্থের নামার্থ "স্বর্ণ প্রান্তর ও রত্নাকর"। তিনি পৃথিবীকে একটী বিহঙ্গ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মক্কা ও মদিনা তাহার মস্তক, পারস্য ও ভারতবর্ষ দক্ষিণ পক্ষ, গগ (চীন) দিগের বাসভূমি বাম পক্ষ। আফ্রিকা তাহার পুচ্ছ।

তাহার লিখিত ভারত বৃত্তান্তের কিয়দংশের সার ভাগ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ভারতবর্ষ নদনদী হ্রদ চিত্রিত একটী বিস্তৃত দেশ, ইহার সীমান্ত ভাগে এজ জানিজ? সাম্রাজ্য। এদেশের সম্রা-

"এল মূলতান" অর্থ স্বর্ণ প্রান্তর। মূলতান রাজ "কোরই সিত্তি" বা কুতরমান। তিনি ওসমান বেন লওয়াইবেন ঘালিবের সন্তান। তাহার রাজ্য খোরাশ্যান অবধি বিস্তৃত।

মাসাদির কিঞ্চিদূন এক শতাব্দীর কনিষ্ঠ "আস্কালুল-বেলাদ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—"বিস্তৃতি অনুসারে মূলতান মানসোয়ারর অর্দ্ধেক। ইহাকে প্রকারান্তরে "স্বর্ণগৃহের সীমান্ত" বলা হইয়া থাকে। মূলতান হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থান। এস্থানে একটী দেবমূর্ত্তি আছে। হিন্দুগণ তাহাকে অত্যন্ত ভক্তি করে। দূরদেশবাসী তীর্থযাত্রিগণ এই দেবতার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। অনেকে চিরকাল এই দেবতার উপাসনা করিয়া জীবন যাপন করে। এই দেবতার নাম হইতে মূলতান নগরী নিজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নগরের উচ্চ ও জলপূর্ণ অংশে এই দেবতার মন্দির স্থাপিত রহিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে একটী বাজার আছে। শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণ গজদন্তনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সেই স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। দেবমূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যস্থানে সংস্থাপিত। তীর্থযাত্রি ও পুরোহিতগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বাস করে।"

"বিগ্রহটী নরাকৃতি।" ভূগোলবেত্তা এদ্‌রিসী (১৫) ভ্রমক্রমে ইহাকে "চতুর্ভুজ"

টের উপাধি মহারাজ। ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপস্থ রাজ্যগুলি ভারতের অধীন। খোরাশানের পর্ব্বতসীমান্ত ও সিন্ধু দেশ হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ হিন্দুদিগের বাস। ইহাদের ধর্ম্ম ও ভাষা নানা প্রকার। ইহাদের মধ্যে কিছুমাত্র একতা নাই। ইহারা সর্ব্বদা পরস্পর কলহ করিয়া থাকে। হিন্দুবর্ণ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন। "জায়েন্‌দিদেমাদেম" ও অন্যান্য কৃষ্ণবর্ণ জাতি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। ওজস্বিতা, রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, জ্ঞান, বিজ্ঞতা এবং শারীরিক গঠন ও আকৃতি দ্বারা ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৪০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কোনও নরপতি হিন্দু বিধি অনুসারে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে না। ভূপতিগণ প্রায়ই অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকেন। সম্মান রক্ষার জন্যই তাহারা এরূপ করেন। একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহির্গত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। রাজবংশজ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। তদ্রূপ "উজির" "খাদে" প্রভৃতি পদগুলি তাহাদের উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। হিন্দুগণ মদ্যপান করেন না। কোন রাজা মদ্যপান করিলে তিনি প্রকৃতিবর্গ দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকেন।

১৫ এদ্‌রিসী নামান্তর এলদ্‌রিসী, আরবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভূগোলবেত্তা। সিসিলিরাজ প্রথম রোজার যে সকল পণ্ডিতরত্ন দ্বারা নিজ সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এদ্‌রিসী তাহার অন্যতম। সেই রাজসভার অবস্থান কালে (১০৭৫ শকাব্দে) এদ্‌রিসী নিজ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাহার গ্রন্থের নামার্থ "পৃথিবীর আশ্চর্য্য বস্তু সমূহের তত্ত্বানুসন্ধায়ী মানবের বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত।" তদানীন্তন জ্ঞাত জগতের ভূবৃত্তান্ত সেই গ্রন্থে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দেশ, প্রদেশ ও নগরাদির প্রা-

লিখিয়াছেন। (পদ্মাসনং পদ্মকরং পদ্মগর্ভসমুদ্ভবং সপ্তাশ্ব-রথমারূঢ়ং ত্রিনেত্রং দ্বিভুজং ভজে। সূর্য্যের ধ্যান।) "দেব মূর্ত্তি ইষ্টকবেদির উপরে আসীন রহিয়াছেন। তাহার দুই খানি মুষ্টিবদ্ধ হস্ত জানুর উপরে বিলম্বিত। ইহার অঙ্গের "ত্বক" (বর্ণ) „মরোক্কো" চর্ম্মের ন্যায় উজ্জ্বল-লোহিত। (মন্দাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। রবিস্তোত্র।) নেত্রগুলি উন্মীলিত, বোধ হয় কোন প্রকার বহুমূল্য উজ্জ্বল প্রস্তর দ্বারা নেত্রগুলি গঠিত হইয়াছে। দেবতার শীর্ষে স্বর্ণ মুকুট। তীর্থযাত্রিগণ যে সকল ধন ও দ্রব্য দান করেন, আমীর সেই সকল লইয়া গিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। হিন্দুগণ অনেকবার এই বিগ্রহটী স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। কারণ তাহারা যুদ্ধবেশে উপনীত হইলে, আমীর বলেন, অস্ত্র ত্যাগ কর, নচেৎ আমি তোমাদের দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিব। বাধ্য হইয়া তাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করে। আমীর এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে সমাগত হিন্দুরাজগণ এত দিনে মূলতান ভস্মসাৎ করিত।"

ইবন বতোতার প্রয়াণ কালে মূলতান

কৃতিক শোভা, অধিবাসী ও তাহাদের আচার ব্যবহার এদ্‌রিসী যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জল বায়ুর প্রভেদ অনুসারে তিনি পৃথিবী ৭ ভাগে বিভক্ত করেন। তাহার এক এক খণ্ডকে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার জগৎ চিত্র ৭৭ খণ্ডে খণ্ডিত। তিনি, পৃথিবীর পরিধি ১১০০০ লিগ লিখিয়াছেন।

সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল। অলাদেল পরিব্রাজক ভগবান আদিত্যের বিষয় কিছুই বলেন নাই। বোধ হয় সুপ্রসিদ্ধ অত্যাচারি "বিগ্রহচূর্ণকারক" (Iconoclast) মহম্মদ ঘজনি (৬) ভগবান আদিত্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। মূলতান নগরে পরিব্রাজক ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের জীবন যাপনের প্রণালী সমূহ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

পরিব্রাজক মূলতান হইতে আবুহর নগরে গমন করেন। তথা হইতে একটী সমতল ক্ষেত্র দিয়া গমন করিতেছিলেন এই সময় পরব্রাজক ও তাহার সহচরগণ দস্যুহস্তে পতিত হন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে দস্যুগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল। পরিব্রাজক নিহত দস্যুদিগের মস্তক লইয়া আবু বাঘরের দুর্গে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সকল দস্যুমস্তক প্রাচীরে ঝুলাইয়া দিলেন।

আবু বাঘরের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া দুই দিবস পরে আজুদাহান প্রাপ্ত হন। সেতলাজ নদীর তীরস্থিত বর্ত্তমান পাক-

(১৬) ইনি আলাপ্ত জিনের দৌহিত্র ও সক্‌ত জিনের পুত্র। ৯১৮ শকাব্দে মহম্মদ ঘজনির সিংহাসন অধিরূঢ় করেন। তিনি ১৬।১৭ বার ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দ্বাদশবারের আক্রমণ ই সমধিক প্রসিদ্ধ, তাহার চতুর্থ ও অষ্টম যুদ্ধ যাত্রা কেবল মূলতানের বিরুদ্ধে ই ছিল। ষোড়শ যুদ্ধ যাত্রা কালে ও মূলতান নগরী তাহার চরণরেণু গ্রহণ করিয়াছিল।

পত্তন প্রাচীন আজুদাহান অনুমিত হইয়াছে। এস্থানে পারব্রাজক পীর ফরিদ উদ্দিনের দরগা দর্শন করিয়াছিলেন। তথা হইতে গমন করিয়া ৪ দিবস অন্তে তুগুলের বাণিজ্য স্থানে সরস্বতী (Sarsati) প্রাপ্ত হন। সরস্বতী বর্ত্তমান "সিরসা" বা "সরসা"। তথা হইতে হাসি ও মস্থদাবাদ দর্শন করিয়া পরিব্রাজক ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরে উপনীত হন।

পরিব্রাজক বলেন "প্রাচ্য মুসলমান রাজ্য সমূহে যতগুলি উৎকৃষ্ট নগরী আছে তাহার একটীও দিল্লীর সমকক্ষ নহে। এবং চারিটী পৃথক রাজধানী সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান দিল্লী গঠিত হইয়াছে। "পুরাতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাচীন দিল্লী,কুতুব দুর্গ, ঘয়েসপুর, বিলুখেরী, তুগনকাবাদ, মহম্মদাবাদ জাহানাপানা, ফিরোজাবাদ, খিজিরাবাদ মৌবারকাবাদ. সাহপুর, পুরাণ কিল্লা, সেরসাহের দিল্লী, সেলিম গড়, সাহজানাবাদ প্রভৃতি ১৬ টী সম্মিলিত রাজধানী অধুনা দিল্লী নামে পরিচিত।

এক্ষণে আমরা দেখিব এতন্মধ্যে কোন ৪ টী রাজধানী পরিব্রাজকের লক্ষ্য হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

—:০:—

মনোবৃত্তির সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ।

শারীর তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মস্তিষ্কের এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, মস্তিষ্ক কি ?—না—গতি-কেন্দ্রসমূহ ও বোধ-কেন্দ্রসমূহের জটিল যন্ত্র বিশেষ। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, মস্তিষ্কের কার্য্য ও মানসিক ক্রিয়া উভয়ই এক কথা বুঝায়—এবং মানসিক ক্রিয়া সকলের আলোচনা মনস্তত্ত্বের অধিকারের মধ্যে আইসে। কিন্তু উহার তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী শারীর তত্ত্বের অনুসন্ধানপ্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র শারীর তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী অনুসারে কোন ক্রমেই সংজ্ঞা-ব্যাপারের ব্যাখা করা যাইতে পারে না। তবে, মস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা করিতে গিয়া মনের সহিত মস্তিষ্কের যে যে স্থলে যোগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

মস্তিষ্ক যে মনের যন্ত্র স্বরূপ—এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ও মস্তিষ্কের দ্বারাই যে মানসিক ক্রিয়াসকল সম্পন্ন হয়—তাহা

এক্ষণে এতদূর সুপ্রতিপন্ন ও সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে সৎসম্বন্ধে আর কোন আপত্তি উথাপন না করিয়া ঐ চূড়ান্ত-সিদ্ধান্ত সত্যটি হইতেই আমরা এই প্রস্তাবের সূত্রপাৎ করিব।

কিন্তু মস্তিষ্ক-কোষ সমূহে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—সেই সকল পরিবর্ত্তনের অনুরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া সংজ্ঞাতেও আবার উপস্থিত হয়—তাহা বুঝা সুকঠিন। যথা, নেত্র-নিপতিত আলোকের কম্পনে দৃষ্টি-বোধরূপ সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন কি রূপে সংঘটিত হয় তাহার সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। কোন ইন্দ্রিয়-বোধ মনোমধ্যে অনুভূত হইলে মস্তিষ্ক-কোষ মধ্যে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহা হয়তো ঠিক্ নির্ণয় করা যাইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা সেই অনুভব-ব্যাপারের যথার্থ প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান-বৃদ্ধি হয় না। উহার মধ্যে একটি objective হইতেছে বিষয়সম্বন্ধীয়—বাহ্য, আর একটি subjective হইতেছে বিষয়ীসম্বন্ধীয়—আন্তরিক। অতএব বাহ্য-ব্যাপার-ঘটিত পরিভাষায় আন্তরিক ব্যাপার সকল ঠিক প্রকাশ করা কখনই যাইতে পারে না—কিম্বা আন্তরিক ব্যাপারের পরিভাষায় বাহ্য ব্যাপার সকল প্রকাশ করা যাইতে পারে না। আমরা একথা কখনই বলিতে পারি না যে, শরীর ও মন উভয়ই এক পদার্থ কিম্বা এমনও বলিতে পারি না—যে একটা আর একটাতে বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে। তবে, Laycock-এর ভাষায় হদ্দ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মস্তিষ্ক ও মন উভয়ই উভয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধী (Correlated) কিম্বা Bain-এর ভাষায় বলিতে পারি যে, শারীরিক পরিবর্ত্তন ও মানসিক পরিবর্ত্তনসকল "দ্বিমুখী একতার" (double-faced unity) আন্তরিক ও বাহ্য দুইটি বিভিন্ন দিক্ মাত্র।

"আমাদের প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার অনুসঙ্গী এক একটি যে অখণ্ড জড়ীয় পরিবর্ত্তন পরম্পরা উপস্থিত হয় তাহা আমাদিগের বিশ্বাস করিবার সর্ব্বপ্রকার হেতু আছে। কোন অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়বোধ হইতে সেই ইন্দ্রিয়বোধের প্রত্যুত্তরসূচক বহির্মুখী প্রতিক্রিয়া পর্য্যন্ত যত প্রকার মানসিক পরিবর্ত্তনপরম্পরা সঙ্ঘটিত হয়, তৎ সমুদায় তাহার আনুসঙ্গিক শারীরিক পরিবর্ত্তন পরম্পরা হইতে মূহূর্ত্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয় না; মনে কর, কোন নূতন দৃশ্য দৃষ্টি-পথে পতিত হইল; অমনি ইন্দ্রিয়বোধ, হৃদয়-ভাব এবং চিন্তার সমষ্টিগত মানসিক পরিণাম সেই সঙ্গে উপস্থিত হইয়া ভাষা ও ভাবভঙ্গী দ্বারা বাহিরে প্রকাশ হইল। এই মানসিক ব্যাপারপরম্পরার সমান্তরাল শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত আন্দোলনরূপ আর একটি শারীরিক ব্যাপার-পরম্পরার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। আমরা যৎকালে, ইন্দ্রিয়-বোধ, হৃদয়-ভাব এবং চিন্তারূপ একটি মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করি—সেই সময় শারীরিক ক্রিয়ারও আর একটি অখণ্ড মণ্ডল দৃষ্ট হয়।

এই শারীরিক ব্যাপারের শৃঙ্খল হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়া সেই শূন্যস্থান কোন অজড়

পদার্থ দ্বারা অধিকৃত হয় এবং এই অজড় পদার্থ একাকী কার্য্য করিয়া স্বীয় কার্য্য-ফল সকল ঐ শারীরিক ব্যাপারসমূহের ভগ্ন শৃঙ্খলার অপরান্তে সংযোজন করিয়া প্রত্যুত্তরসূচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে—অর্থাৎ, দুই জড়রূপ উপকূলের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী একটি অজড়ের সমুদ্র বিদ্যমান আছে—এই যে অনুমানটী ইহার সহিত যতদূর আমরা মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার বিষয় অবগত আছি তাহার সম্পূর্ণরূপে অনৈক্য হয়। বস্তুতঃ স্নায়বীয় অনুবৃত্তিতে আদৌ ভঙ্গ উপস্থিত হয় না। তবে এই একটি মাত্র সম্ভবপর অনুমান হইতে পারে, যে, শারীরিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়াসকল উভয়ে অবিভক্ত যমক যুগলের ন্যায় একত্র কার্য্য করে। অতএব কোন মানসিক কারণের কথা উল্লেখ করিলে দুই পক্ষবিশিষ্ট কোন কারণ বুঝায়। উহা হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাকে কেবল মাত্র মনের কার্য্য বলা যাইতে পারে না—পরন্তু তাহা শরীর ও মনের সমবেত কার্য্য।" (Bain—Mind and Body 1873 P. 131.)

এই অনুমান অনুসারে পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানসিক ক্রিয়াসকল ইন্দ্রিয়-বোধগত ও গতিচালনা-গত বাহ্য আধারের আন্তরিক (subjective) পক্ষ মাত্র।

সে যাহাই হউক, কিন্তু মস্তিষ্কের শারীরতত্ত্ব-ঘটিত ক্রিয়াশীলতা উহার মনস্তত্ত্ব ঘটিত কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমব্যাপক নহে। গতি ও ইন্দ্রিয়-বোধের যন্ত্র বলিয়া মস্তিষ্ককে দেখিতে গেলে—অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় সংজ্ঞার যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে উহাকে দুই অর্দ্ধবিশিষ্ট একটি সমগ্র যন্ত্র বলিয়া দৃষ্ট হয়। এবং মনন ও কল্পনের (ideation) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে অর্থাৎ পুনরাবির্ভূত সংজ্ঞার (representative consciousness) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে—উহাকে দ্বিগুণাত্মক (dual) যন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়—অর্থাৎ উহার প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। যদি কোন রোগ বশতঃ একটি মণ্ডলার্দ্ধ স্থানান্তরিত কিম্বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীরের একদিককার গতি এবং ইন্দ্রিয়-বোধ রহিত হইয়া যায় বটে কিন্তু অবশিষ্ট মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যেই মানসিক ক্রিয়াসকল সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

মস্তিষ্কের একার্দ্ধে কোন রোগ উপস্থিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-বোধ ও গতি-চালনা-শক্তি অসাড় হইয়া পড়ে—তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহার মানসিক ক্রিয়াতেও অসাড়তা উপস্থিত হয় না—কারণ সে তখনও অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যেই অনুভব করিতে পারে, ইচ্ছা করিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে এবং বুঝিতে পারে। সেই সকল বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ব্বের ন্যায় তত বলবৎরূপে চালিত না হউক কিন্তু তাহাদিগের সম্পূর্ণতা বিষয়ে কোন ক্ষতি দৃষ্ট হয় না।

কোন ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্য প্রতিবিম্ব সকল পতিত হইলে পর, বোধ-ব্যাপার উত্তেজন করিতে হইলে সেই সেই ইন্দ্রিয়-নির্দ্দিষ্ট মস্তিষ্ক-কেন্দ্রের কোষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তন্মধ্যস্থ আণবিক পরিবর্ত্তন সকল প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক হয়।

যদি কৌণিক Gyrus নামক মস্তিষ্কাংশ বিনষ্ট কিম্বা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে নেত্র-মুকুর-নিপতিত প্রতিবিম্বসকল পূর্ব্বের ন্যায় নিয়ম-মত শারীরিক পরিবর্ত্তনসকল প্রবর্ত্তিত করিতে পারে বটে কিন্তু সংজ্ঞাকে উদ্বোধিত করিতে পারে না। যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার কোন বিষয়ী-আন্তরিক পক্ষ (Subjective side) থাকে না।

কৌণিক gyrus-বিহীন দৃষ্টিযন্ত্র কি রূপ?—না প্রতিবিম্বধারক কাচ-ফলক-বিহীন আলোক-চিত্র যন্ত্রের আঁধারেকাম্‌রা যেরূপ। আলোক-রশ্মি সকল পূর্ব্বেকার ন্যায় রীতিমত কেন্দ্রীভূত হয় বটে, কিন্তু কোন রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে না—চিত্রবিষয়ীভূত পদার্থটি অপসারিত করিয়া লইলে কিম্বা আলোক-পথ রুদ্ধ করিলে সেই পদার্থের প্রতিবিম্ব আর তাহাতে স্থায়ী হয় না। অতএব Angular gyrus, প্রতিবিম্ব-ধারী কাচ-ফলকের ন্যায়। মস্তিষ্ককোষসকলে কতকগুলি আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া সেই সকল পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী, নেত্রপতিত প্রতিবিম্ব বিষয়ক সংজ্ঞা অর্থাৎ দৃষ্টি-বোধরূপ কতকগুলি মানসিক পরিবর্ত্তনও উপস্থিত হয়। আঁধারে-কাম্‌রার অন্তর্গত প্রতিবিম্ব-ধারী কাচ-ফলকে যেরূপ এক প্রকার রাসায়নিক লিপি-ক্রিয়া দ্বারা চিত্রবিষয়ীভূত পদার্থের আকারগত প্রতিবিম্ব লিপিবদ্ধ হয়, সেইরূপ মস্তিষ্ককোষমধ্যস্থ আণবিক পরিবর্ত্তনরূপ লিপি-প্রণালী দ্বারা দৃষ্ট পদার্থের দর্শনীয় লক্ষণসকল angular gyrus-এ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

এই উভয়ের মধ্যে আরও কোন কোন বিষয়ে উপমা প্রদর্শিত হইতে পারে। আলোক-চিত্র ব্যাপারে আলোক-রশ্মিদ্বারা যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উৎপাদিত হয়, তাহা যেরূপ স্থায়ী করা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা দর্শনীয় বস্তুর স্থায়ী প্রতিরূপ রক্ষিত হইতে পারে, সেইরূপ মস্তিষ্ক কোষ মধ্যে নেত্রপতিত প্রতিবিম্ব-ঘটিত যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহাও চিরস্থায়ী হয়—এই দৃষ্টিবিষয়ক স্থায়ী প্রতিবিম্বকে আকারবিষয়ক মানসিক স্মৃতির শারীরিক প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। ঐ মস্তিষ্ক কোষস্থ স্থায়ী পরিবর্ত্তনসকল পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইলে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়—অর্থাৎ সেই প্রতিবিম্ব কল্পনায় পুনর্ব্বার উদিত হয়। এই উপমা প্রদর্শন করায় কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, কাচ-ফলকে পদার্থসকলের আলোক-চিত্র যেরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়—ঠিক্ সেইরূপই angular gyrus-এ দৃষ্ট পদার্থের প্রতিবিম্ব চিত্রিত হয়। উপমা দ্বারা এই মাত্র ব্যক্ত হইতেছে যে, নেত্র-প্রতিবিম্বিত কোন বস্তুর যেরূপ দৃষ্টি-বিষয়ীভূত লক্ষণ, তাহারই প্রতিনিধি স্বরূপ কতক গুলি স্থায়ী পরিবর্ত্তন মস্তিষ্ক-কোষ মধ্যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। কোন পদার্থের দৃষ্টিবিষয়ীভূত লক্ষণ

কি ?—না—আলোকের বিকম্পন মাত্র। কিন্তু কেবল মাত্র এই লক্ষণ দ্বারা অতি অল্প পদার্থই আমাদিগের জ্ঞান গোচর হয়। প্রত্যেক পদার্থ আমাদিগের জ্ঞান-গোচর হইবার পক্ষে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যও আবশ্যক করে। কোন পদার্থের সমগ্র কল্পনা যখন মনোমধ্যে উদিত হয় তখন সেই পদার্থ জ্ঞান-গোচর হইবার সময়—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনগুলি পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠে। angular gyrus নামক দৃষ্টি-কেন্দ্রের বিষয় যেরূপ বলা হইল এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রসম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রগুলি, স্বীয় স্বীয় বিষয়ীভূত বাহ্য প্রতিবিম্ব সকলের শারীরিক ভিত্তিভূমিস্বরূপ—এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কেন্দ্রই, মস্তিষ্কের কৌষিক রূপান্তরের আকারে ঐ সকল প্রতিবিম্ব বিষয়ক স্মৃতির আধার রূপে অবস্থিতি করিতেছে। কোন পদার্থের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ঘটিত যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ থাকে, ঐ সকল বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অধীনস্থ কৌষিক পরিবর্ত্তন সকলের উত্তেজনায় সেই পদার্থের সেই সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ঘটিত বিশেষ লক্ষণসকল কল্পনাতে পুনর্জীবিত হয়। এই সকল উপকরণের মধ্যে পরস্পর শারীরিক যোগ আছে বলিয়াই কোন একটি শৃঙ্খলের অংশ জাগিয়া উঠিলেই সমস্ত শৃঙ্খলটিই অনুসঙ্গনিয়মে জাগিয়া উঠে।

অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ-কেন্দ্রগুলি যে শুদ্ধ অব্যবহিত বর্ত্তমান বোধ-ক্রিয়ারই যন্ত্র তাহা নহে পরন্তু বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ বোধ-ক্রিয়া সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবারও প্রতিলিপি-পুস্তক স্বরূপ। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষইন্দ্রিয়বোধসকলের প্রতিলিপি ঐ সকল ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রে কৌষিক পরিবর্ত্তনরূপ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে মেধারূপ মানসিক শক্তির শারীরিক আধার বলা যাইতে পারে—এবং ঐ সকল স্থায়ী কৌষিক পরিবর্ত্তন সকল যখন পুনরুত্তেজিত হয় তখনই ঐ সকল ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রকে স্মৃতি ও কল্পনারূপ মানসিক শক্তির শারীরিক আধার বলা যাইতে পারে। Bain অন্য প্রকার হেতু বিন্যাস করিয়া এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "মূল-বোধ-ক্রিয়া সকল যে যে অংশ যে প্রকারে অধিকার করিয়া থাকে—তাহাদের প্রতিলিপি-স্বরূপ পুনরাবির্ভূত বোধ-ক্রিয়াগুলিও সেই সেই অংশ সেই প্রকারে অধিকার করিয়া থাকে" এক্ষণে এই সিদ্ধান্তটির শারীরিক পত্তন ভূমি কি তাহা আলোচনা করা যাউক। Spencer বলেন যে, কোন পদার্থের কোন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধের সময় যে সকল প্রক্রিয়া বলবৎরূপে উত্তেজিত হয়—সেই ইন্দ্রিয়-বোধের পুনরাবির্ভাব কালে সেই সকল প্রক্রিয়াই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে উত্তেজিত হয় মাত্র। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়বোধের সময় যেরূপ স্নায়ুমণ্ডলবর্ত্তী কোন ইন্দ্রিয় হইতে একপ্রকার আণবিক স্পন্দন আরম্ভ হইয়া মস্তিষ্ক কোষ

পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়—কল্পনা-গত কিম্বা স্মৃতি-গত ইন্দ্রিয়-বোধের সময় মস্তিষ্ককোষ মধ্যে সেই আণবিক স্পন্দনের পুনরাবির্ভাব হয় মাত্র কিন্তু সেই পুনরাবির্ভাব এত বলবৎরূপে সংঘটিত হয় না যে তাহা শরীরের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে মস্তিষ্ক-কোষ মধ্যে ইন্দ্রিয়-বোধের পুনরাবির্ভাব এত প্রবলরূপে সংঘটিত হয় যে, তন্নিবন্ধন স্নায়বীয় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধও কখন কখন উপলব্ধি হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থায়, কোন কোন বাতুলতা রোগে, এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হয়।

প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধ-গত স্মৃতির যে শারীরিক পত্তন-ভূমী, সাধারণ জ্ঞানেরও সেই একই শারীরিক পত্তন ভূমি, যদি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধ সকল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইত কিম্বা ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত পদার্থটি যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণই তাহা স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান পর্য্যন্তই সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি-মূলক জ্ঞান-ক্রিয়ার পরিসর হইত। এবং তাহা হইলে কোন পদার্থ সম্বন্ধেই বাস্তবিক জ্ঞান আমরা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম না। সাদৃশ্য কিম্বা প্রভেদ চিনিতে পারার নামই জ্ঞান। "এ বিষয় আমি জানি"—এ কথার অর্থ এই যে, সে বিষয় সম্বন্ধে আমার অতীত ও বর্ত্তমান সংজ্ঞা-ঘটিত পরিবর্ত্তনসকলের মধ্যে হয় সাদৃশ্য নয় প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। কোন রং যখন সবুজ বলিয়া চিনিতে পারি তখন আমাদিগের বুদ্ধিতে কিরূপ প্রক্রিয়া উপস্থিত হয় ?—না—সেই সবুজ রঙ্গের বর্ত্তমান বোধানুভব ও তাহার কোন অতীত বোধানুভবের মধ্যে সাদৃশ্য কিম্বা সেই রঙ্গের সহিত অন্য কোন রঙ্গের প্রভেদ উপলব্ধি করি। যদি মস্তিষ্ক মধ্যে পুনরুত্তেজনশীল অতীত স্মৃতির কোন আধার না থাকিত—তাহা হইলে কি সাদৃশ্য কি প্রভেদ কিছুই আমরা চিনিতে পারিতাম না। মধ্যে মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে, আমরা সজ্ঞান হইতাম কিন্তু কাল বিষয়ে অনুবৃত্তি না থাকা প্রযুক্ত কোন বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান উপার্জন করা আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইত। অতীত ইন্দ্রিয়-বোধের সময় যে সকল আণবিক প্রক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়-বোধানুভবের সময় সেই একই আণবিক প্রক্রিয়া পুনরুত্তেজিত হওয়াই আমাদিগের সাদৃশ্য-জ্ঞানের পত্তন ভূমি এবং এক প্রকার আণবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইতে আর এক প্রকার আণবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তনই আমাদের প্রভেদ জ্ঞানের পত্তন-ভূমি। অতএব, ইন্দ্রিয়-বোধ-কেন্দ্রসকল কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-বোধের অর্থাৎ কেবল মাত্র তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়-বোধের যন্ত্র নহে পরন্তু তদানুসঙ্গিক মস্তিষ্ক-পরিবর্ত্তনসকলের স্থায়িত্ব ও পুনরুত্তেজনশীলতাশক্তি-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়-ঘটিত নানা প্রকার সামান্য ও জটিল জ্ঞানক্রিয়ার যন্ত্র স্বরূপ।

দেবরাণী।

১

স্বপন নগরে বেড়িয়ে বেড়াই
ঢুলিয়া ঢুলিয়া আপন মনে,
কখন বিহরি শিখরী শিখরে,
কখন বা ভ্রমি বিজন বনে।

২

কখন কখন কলপনা যানে
আরোহণ করি আকাশে ভাসি,
দেখি বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে গ্রহতারা,
ঘোরে দূরে দূরে অনলরাশি।

৩

ফিরে ফিরে চাই পৃথিবীর পানে,
গিরি নদ নদী মিলায়ে যায়;
উদার সাগর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর,
ডোরা ডোরা ডোরা রেখার প্রায়।

৪

দেখিতে দেখিতে একি আচম্বিতে
কোথায় সে সব উবিয়ে গেল!
শূন্য—শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য-ময়
নীল নিথর আকাশ এল।

৫

আহা আহা একি সমুখে আমার,
একি এ বিচিত্র আলোকোদয়,
চন্দ্র সূর্য্য নাই, অপরূপ ঠাঁই,
কোটি কোটি যেন চাঁদের কিরণে
সদাই কিরণময়!

৬

ভাসে নীলাম্বরে ফুলে ফুলময়
প্রসারিত পথ সমুখে একি!
পদ পরশনে চমকিয়া ফুল
ফুটিয়ে হাসিল আমারে দেখি।

৭

ঝুরু ঝুরু ঝুরু গন্ধে ভরপূর
কেমন পাবন সমীর বায়!
কোথা হতে ভেসে আসে মৃদুগীত,
না জানি কে হেন মধুর গায়!

৮

না জানি কোথায় বাজে বেণু বীণা,
উদাস—উদাস হৃদয় প্রাণ,
না জানি কিসের সুরভি সৌরভ
তর কোরে দেয় মগজ ঘ্রাণ!

৯

বিমল-সলিলা নদী মন্দাকিনী
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে
কুলু কুলু ধ্বনি আধ আধ বাণী,
খেলিছে কেমন মেখলা ভাগে!

১০

দূরে দূরে সব নধর মন্দার
দুধারে দাঁড়ায়ে আছে;
কত অপরূপ প্রাণী মনোহর
বেড়িয়ে বেড়ায় কাছে।

১১

রূপে আলোকরি ঘুমায় কেমন
দেবদেবীগণ কুসুম দলে!
নেত্র-পত্র-পক্ষ কাঁপায়ে কাঁপায়ে
ধীরি ধীরি ধীরি অনিল চলে।

১২

জ্যোতির্ম্ময় বপু, রোমাঞ্চ কিরণে
উজলিয়া দশ দিশি,
মন্দাকিনী তটে যোগে নিমগন
দীপ্ত দীপ্ত সপ্ত ঋষি।

১৩

নিমীল লোচন, প্রফুল্ল কপোল,
হাসি রাশি যেন ধরে না মুখে;
কোন্ সুধাপানে সদাই বিহ্বল,
মহাসুখী কোন্ মহান্ সুখে?

১৪

বহি বহি পড়ে জলে অশ্রুজল,
কনক কমল ফুটিয়া ভায়,
লহরী-মালায় দুলিতে দুলিতে
হাসিতে হাসিতে ভাসিয়ে যায়।

১৫

ফুলে ফুলময় কমল কানন,
কে তুমি মা হেথা করিছ খেলা!
ঢল ঢল তব বিমল মুখানি,
হেরে জুড়াইল প্রাণের জ্বালা।

১৬

ত্রিলোক-তর্পণ করুণ নয়ন,
হৃদয়ে করুণা-কুসুম-হার,
সুধাংশু-কলিত ললিত শরীর,
সহেনা বসন ভূষণ ভার।

১৭

শ্রীচরণ ভাতি রাতি সুপ্রভাত
ত্রিদিবের চির অরুণোদয়,
অমরগণের ঘুমন্ত আনন
কিরণে কিরণে ফুটিয়ে রয়।

১৮

অধরে উদার মৃদু মন্দ হাসি,
ভাসি ভাসি আসে স্নেহের তান,
দুলে দুলে কোলে বীণা বিনোদিনী
আধ আধ কিবে করিছে গান!

১৯

জড়িমা-জড়িত তনু প্রাণ মন,
মোহন স্বপন সাগরে ভাসি,
আধ ঘুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে
দূরে বাজে যেন ভোরের বাঁশী।

২০

মৃদুল মৃদুল স্বরের লহরী
প্রাণের ভিতরে প্রবহমান,
বিরাগ-আঘাতে বিগত-জীবন
উঠিয়ে দাঁড়ায় পাইয়ে প্রাণ।

২১

উঠিয়ে দাঁড়ায় দিগঙ্গনাগণে
হেরিতে ভুবন-মোহিনী মেয়ে,
চমকি দামিনী দানব-বালারা
এলোচুলে আসে হরষে ধেয়ে।

২২

চারি দিকে বাজে মঙ্গল বাজনা,
আমোদে মাতিয়ে অনিল বায়,
দশ দিকে দশ দোলে ইন্দ্র ধনু
আনন্দে তোমায় পানেতে চায়।

২৩

এই অচেতন দেব দেবীগণ
সহাস আনন স্বপন-ভোলে,
তুমি দেবরাণী সদয়া জননী
ঘুমায় তোমারি অভয় কোলে।

২৪

তোমার শ্রীপদ পরম সম্পদ,
সদা সপ্ত ঋষি করেন ধ্যান ;
ভূচর খেচর বিশ্ব চরাচর
গাহিছে তোমার মহিমা গান।

২৫

যেন মা ও পদ পরশি পরশি
হরষে আমার জীবন বয়!
মা তোমার রাঙা চরণ দুখানি
ধরিলে থাকে না মরণ ভয়।

২৬

কলি যুগে সব দেবতা নিদ্রিত,
কেবল জাগ্রত তুমি ;
আলো কোরে আছ লাবণ্য কিরণে
পবিত্র স্বরগ ভূমি!

গান।

এমন অপরূপ রূপ
কভু হেরি নাই নয়নে!
কে এ বালা করে খেলা
কনক কমল কাননে!

একি অপরূপ ঠাঁই,
চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই,
কোটি চন্দ্র হাসিতেছে
বিমল রূপের কিরণে!

আপনি আকাশ মাজে
চারিদিকে বীণা বাজে,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু
দুলিছে মেঘ গগনে।

ধর গো আকাশ বালা,
মানস-কুসুম মালা!
পাসরি যন্ত্রনা জ্বালা
লুটিব রাঙা চরণে।

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

স্বাধীন জীবিকার একটি উপায়।

ভারতীর ষষ্ঠ ভাগ ২ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সুবিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে সম্পাদকের দেশহিতসাধক ব্যাপারের অনুশীলনাভিলাষ দর্শনে আনন্দিত হইয়াছেন এবং যে সহৃদয় মহাত্মারা মধ্যবৃত্তির লোকশ্রেণীর বিপন্নাবস্থা দেখিয়া কাতর ও চিন্তান্বিত আছেন তাঁহাদিগের মনোমহীরুহাবলম্বিনী নৈরাশনিদাঘার্ত্তা আশালতিকার প্রতি এই বিজ্ঞাপন নব-মেঘমুক্ত অমৃত শ্রবের কার্য্য করিয়াছে। এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রাগুক্ত মহাত্মারা বুঝিয়াছেন যে মধ্যবৃত্তির লোকদিগের জন্য তাঁহাদিগের সম দুঃখী ব্যক্তি আরও আছে এবং উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের মঙ্গলার্থে নিষ্ফল চিন্তা ও নিরুদ্যমতা ত্যাগ করতঃ এক্ষণে উপযোক্তাবনের চেষ্টা হইতেছে। উল্লেখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আমাদিগের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা অত্রস্থলে ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং বোধ করি পশ্চাল্লিখিত সপ্রকরণ প্রস্তাব দ্বারা যে ফল হইবে আমাদিগের চিত্তোদিত ভাবের ব্যঞ্জনা দ্বারা তদপেক্ষা অধিক ফল ও ফলোৎপত্তির কারণ হইবে। কথিত বিজ্ঞাপন ও তত্র নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার ৫০ টাকা যদিও বিশেষ প্রলোভ-জনক নহে তত্রাচ আমরা ইহা দৃষ্টে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি এবং পাছে প্রবন্ধ-লেখকাভাবে পুরস্কারটী বৃথা যায় এই জন্য একটী যথার্থ উপকারপ্রদ প্রবন্ধ লিখিতে যত্নবান হইয়াছি।

ভারতী সম্পাদকের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিয়া তদ্বিষয়ে বক্তব্যাদি প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনায় তাহা এস্থলে দিতেছি—"আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট চাকরী, ডাক্তারী, আইন, এঞ্জিনিয়রিং প্রভৃতি প্রচলিত ব্যবসায় অবলম্বন ব্যতীত অন্য কি উপায়ে শিক্ষিত লোকদিগের স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে। যাঁহার প্রবন্ধ আমাদের মনোনীত হইবে তিনি ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। প্রবন্ধে সাধারণ মত থাকিলেই হইবে না। জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ যদি এদেশের উপযোগী কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ের উল্লেখ করা হয় তবে তাহার কার্য্যোপযোগী বিবরণ প্রবন্ধে নিবিষ্ট থাকা চাই।———" এই বিজ্ঞাপনের "আমাদের দেশে" হইতে "জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে" পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বোধ হইতে পারে যে উল্লেখিত ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হইলেই গ্রহনীয় হইতে পারে, ফলত তাহা নহে কারণ উকিলী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে তত্তৎ বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক। বিদ্যা বিশেষ শিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সহস্র প্রকার পথ হইতে পারে ; যেহেতু আমাদিগের মধ্যে সুশিক্ষিত চিত্রকর, যান্ত্রিকশিল্পী (Mechanic) আদর্শ লেখক (Designer) প্রভৃতি ব্যবসায়ীর অসদ্ভাব দেখা যায় ও বর্ত্তমান সময়ে উক্ত ব্যবসায়াদি দ্বারা অনেক ডাক্তার, উকিল অপেক্ষা অর্থোপার্জন হইতে পারে। সম্পাদক উক্তরূপ কোন ব্যবসায় বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইবার উদ্দেশে বিজ্ঞাপন দেন নাই, কারণ তিনি জানেন যে ৫ বা ৭ বৎসর ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জনীয় কোন বিদ্যা একটী প্রবন্ধে বহু বাহুল্যে ও রীতিমত যোগ্যতার সহিত লিখিত হইলেও তৎ পাঠ দ্বারা শিক্ষার্থীগণ তদ্বিদ্যার্জন ক-

রিতে পারে না। বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগ পাঠ করিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে সম্পাদক এরূপ কোন ব্যবসায় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখাইতে ইচ্ছা করেন যে ব্যবসায় অবলম্বন করতঃ শিক্ষিত লোকেরা স্বয়ং তাহাতে কৃতকর্ম্ম না হইলেও অর্থ, যত্ন, শ্রম এবং বুদ্ধির সাহায্যে উত্তম রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এবম্প্রকার ব্যবসায় অনেক আছে কিন্তু সম্পাদক মূল ধনের পরিমান বিষয়ে কিছুমাত্র না লেখাতে আমরা এরূপ একটী ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছি যাহাতে অল্প মূলধনের আবশ্যক হয়।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে ভারতীর সম্পাদকের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি কিন্তু সেই আনন্দের কারণ এখনও পাঠকগণ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের আনন্দের দুই কারণ। প্রথম এই যে, এবম্প্রকার উৎসাহ দ্বারা যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে তাহার অনেক গুলি শিক্ষিত লোকগণের স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের পথপ্রদর্শক হইবে এবং অনেকে পরাধীন বৃত্তির জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণে নিবৃত্ত হইয়া প্রদর্শিত পথাবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিবেন। আনন্দের আর একটী কারণ কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক যে হেতু সম্পাদক যে উদ্দেশে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন বিজ্ঞাপনই যে তাহার সংক্ষিপ্ত, সরল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শিক্ষিত লোকগণ যদি মূলধন না লইয়া কোন ব্যবসায় দ্বারা শ্রম, যত্ন ও বুদ্ধিবলে স্বাধীন ভাবে জীবনোপায় করিতে পারেন তবে তাহা সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ রচনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে যথার্থ জ্ঞানগর্ভ বা ফলপ্রদ প্রবন্ধের মূল্য আছে এবং সর্ব্বজ্ঞ সম্পাদকেরা ভিন্ন নিরহঙ্কারী সরলচিত্ত সম্পাদকেরা সেই মূল্য দিতেও ইচ্ছুক আছেন। আমরা এককালে মূল্য দানে ইচ্ছুক হইয়াও উপযুক্ত লেখা প্রবন্ধাভাবে কোন সাময়িক পত্র প্রকাশে নিবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং বোধ করি এখনও যোগ্য প্রবন্ধ-লেখক পাইলে সেই পত্র পুনর্জ্জীবিত হয়। প্রবন্ধের মূল্য হইলে যথারীতি প্রবন্ধও দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিত লোকও স্বাধীনভাবে জীবনোপায় করে এবং শিক্ষাও তোতাপাখির শিক্ষার ভাব ত্যাগ করিয়া সুফল প্রসবিনী হয়েন। এই বিষয়ের আন্দোলন ও উন্নতি সাধনের জন্য একটী সভা হইলে বিশেষ ফল হইতে পারে এবং ভারতী সম্পাদক যখন এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছেন তখন সভা সংস্থাপনের উদ্যোগ তাঁহার দ্বারা প্রথম হইলে ভাল হয়। এক্ষণে আমরা বিষয়ান্তরে কালক্ষেপ না করিয়া প্রবন্ধে প্রবেশ করিতেছি এবং প্রবন্ধ সরল, স্পষ্ট এবং অনায়াস বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে পারিভাষিক শব্দ ও কঠিন ভাষা ত্যাগ করিয়া চলিত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করিব। বোধ্য ও অবোধ্যতার প্রতিই লক্ষ রাখিব সাধুভাষার নিমিত্ত ব্যাকুল হইব না।

আমরা অত্র প্রবন্ধে যে ব্যবসায়ের ব্যাখ্যা করিব তাহার নাম ঢালাই কার্য্য। ইংরাজীতে উহাকে কাষ্টিং বলে। ঢালাই কার্য্যের কারখানা এদেশে অনেকগুলি উন্নত ভাবে ও যথেষ্ট মূলধনের সহিত চালান' হইতেছে তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ও রেলওয়ে কোম্পানীর কারখানাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাঙ্গালীদেরও দুই একটী কারখানা কার্য্যপটুতা জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে ; যথা ৺ ক্ষেত্র মোহন বসাকের কারখানা, যাহাতে বঙ্গের সকল কারখানা হইতে উৎকৃষ্ট রেড়ির তৈল মাড়িবার কল প্রস্তুত হয়। যে সকল ঢালাই কারখানার কথা বলা হইল তাহা বৃহৎ কারখানা এবং অন্যান্য মধ্যম শ্রেণীরও সামান্য যে কারখানা সমস্ত আছে তাহাও আমাদিগের প্রস্তাবিত কারখানার সহিত তুলনায় বৃহৎ ও মূলধন-সাধ্য বলিতে হইবে। এই কারখানা লৌহ ঢালিবার জন্য একটী অতি ক্ষুদ্র ও ১০০০ টাকার অনধিক মূলধন হইলে সুচারুরূপে কার্য্য চলিবার যোগ্য। ইহার বাহুল্য চিত্র ও ব্যাখ্যা আবশ্যক করে না, কারণ এদেশে লৌহ ঢালাই অনেক স্থানে হইতেছে, তদ্বিষয়ের কারিগরও যথেষ্ট আছে এবং তৎসম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি আবশ্যকমত পাওয়া যায় ও নির্ম্মাণ হয় ; যথা—ফারনেস অর্থাৎ লৌহ গালাইবার চুলা, ফার্‌ম বা লৌহ বাক্স বা ঘরা যাহার ভিতর বালি ঠাসিয়া ছাঁচের নক্‌শা তোলা হয়, মোল্‌ড অর্থাৎ ছাঁচ, ফ্যান অর্থাৎ চুলায় বায়ু দিবার জন্য লৌহ পাখা প্রভৃতি সকল বস্তু বানাইবার কারিগর এদেশে আবশ্যক মত পাওয়া যায় এবং ঐ সকল দ্রব্য বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়। অতএব আদ্যোপান্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিত্র ও ব্যাখ্যা লিখিয়া প্রবন্ধের কায়াবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই কেবল মূল সন্ধান দেওয়ার ও কার্য্যটীর মর্ম্মমাত্র বুঝাইবার জন্য যে কিছু চিত্র ও ব্যাখ্যার আবশ্যক তাহাই নিম্নে দিতেছি। ঢালাই কারখানার চুলাই সর্ব্বপ্রধান সুতরাং তাহার বর্ণনা করাই আবশ্যক, আর সেই বর্ণনা দ্বারাই প্রস্তাবিত কারখানার যন্ত্রাদি কত স্বল্পায়াস-সাধ্য তাহাও বুঝা যাইবে। অত্রদত্ত চিত্রখানি চুলা প্রভৃতির বর্ণন ও ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য লিখিত হইল এবং সহজ করিবার ইচ্ছায় আলোক ও নিরালোক স্থান (light and shade) নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল রেখাচিত্র দেয়া গেল (linial sketch)। প্রদত্ত চিত্রের ১নং টীতে চুলা, পাখা ও চক্র কিরূপ ভাবে সংলগ্ন ও স্থাপিত থাকে তাহা দর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কক অঙ্কে চিহ্নিত মূর্ত্তিটী চুলা, যাহা নিম্নকথিত প্রকারে নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রথমে ৫ ফুটে একটী নিরেট স্তম্ভ (৫ ফুট ব্যাসের) চার ফুট উচ্চ করিয়া ভূমির উপর ইষ্টক দ্বারা এরূপে গাঁথিতে হয় যে উহার এক ফুট ভূমির ভিতর বনেদ হয় ও তিন ফুট বাহিরে থাকে। পরে সিকি ইঞ্চি পুরু লৌহের চাদরের (যে চাদরে বাষ্পযন্ত্রের জল ফুটাইবার নলা করে Boiler plate) একটী ৩ ফুট মোটা ও ৮ ফুট লম্বা চোঙ্গা বানাইয়া ঐ

ইস্টকে গাঁথা স্তম্ভের উপর এ অবস্থায় বসাইতে হয় যে তাহার সকল পার্শ্বেই যেন ১ ফুট করিয়া গাঁথনি বাহির হইয়া থাকে এবং ঐ বাহিরের গাঁথনির উপর ১ বা ১॥ ফুট উচ্চ ও ১ ফুট চওড়া করিয়া ইট গাঁথিয়া দিতে হয়। তদন্তে চোঙ্গাটীর ভিতর গায়ে ও তলায় একহারা করিয়া চীনের ইটের (Firebricks) গাঁথনি ঐ চোঙ্গের মস্তক পর্য্যন্ত করিতে হয়। উক্ত রূপ গাঁথনি হইলে পর চোঙ্গের ভিতরে যে ফাক থাকে তাহা ফ চিহ্নিত চক্রে ব্যক্ত হইতেছে, ভিতরের চীনের ইটের গাঁথনি × × × × চিহ্নিত চক্র দ্বারা দর্শিত এবং দেশী ইটের গাঁথা স্তম্ভ চুলার নিম্নভাগে পরিস্কার লিখিত আছে। চোঙ্গের ভিতরের গাঁথনির তিন স্থানে তিনটী পথ রাখিতে হয় যথা খথ দুই নলের বায়ু যাইবার জন্য থং থং এবং ম মুখ দিয়া গালিত লৌহ বাহির হইবার জন্য মং পথ ফাক থাকিবে। ম মুখ একটী নর্দ্দামার নলের মত চুলার চোঙ্গের গায়ে লাগান থাকে এবং লৌহ গালাইবার সময় উহা মাটি দিয়া বন্ধ করে ও গালান হইলে ম মুখের মাটি ভেদ পূর্ব্বক ছিদ্র করিলেই গালিত লৌহ সেই ছিদ্র পথে বাহির হয়। চুলার ভিতরের যে স্থানে যে রূপ ফাক থাকে তাহা বিন্দুময় রেখা দ্বারা দর্শিত হইল। ১ নং চিত্রের খ খ খ খ, চুলার দুই ধারের দুইটী বাতাস দিবার নল; গ গ গ ঐ দুই নলের যে ভাগ ভূমির ভিতর থাকে তাহা জ্ঞাপক আর ব ব ব ব ঐ মিলিত নলের শেষ ভাগ যাহা কলসীর মত ও ভিতরে পাখাবিশিষ্ট। ব ব ব ব নল খণ্ড সম্পূর্ণ থাকিলে ভিতরস্থিত পাখা দেখা যায় না; তবে যে আমরা উহা দেখা যাইতেছে লিখিয়াছি তাহা কেবল পাঠকগণকে ভিতরের পাখার অবস্থা দেখাইবার জন্য। চ চ চ চ একটী লৌহের দণ্ড তাহার গায়ে ছ ছ ছ ছ চারখান লৌহের পদক বা পাত সংলগ্ন আছে এবং উহাই বাতাস দিবার পাখা। ঐ পাখার অবস্থা বিশেষ বর্ণনা ব্যতীত, পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন না এই জন্য বর্ণনা দ্বারা যথারীতি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটী কলসীর পেটের দুইধারে যদি সোজাসুজি দুইটি ছাঁদা করা যায় পরে কলসীটীকে করাত দিয়া কানা হইতে তলা পর্য্যন্ত এরূপে দুই ভাগ করা হয় যে ঐ ছাঁদা দুইটীর মাঝ দিয়া কাটা পড়ে ও একটী কাষ্ঠের দণ্ডে চার খান তক্তা ছ ছ ছ ছ পাখার অবস্থায় আঁটিয়া কলসীর পেটের দুই ধারের ছিদ্রের উপর ঐ কাষ্ঠের দণ্ডের দুই শেষ ভাগ রাখিয়া ফের কলসীটীকে যোড়া যায় তাহা হইলে পাখার সহিত বর্ত্তমান ব ব ব ব নল খণ্ডের আদর্শ হয়। ব ব ব ব নল খণ্ড এরূপে করা কর্ত্তব্য যে ছ ছ ছ ছ পাখা তাহার ভিতর ঘুরিতে পারে কিন্তু অপর পার্শে অধিক ফাক না থাকে তাহা হইলে সমস্ত বায়ু গ গ গ নলে যায়। পাখার চ চ চ চ দণ্ড ধারণের জন্য ত ত দুইটী খুঁটি, যাহাতে চ চ চ চ দণ্ড এরূপে বসান

থাকে যে তাহা ঘুরান যায়। চ চ চ চ দণ্ড একাধারের ত খুঁটি হইতে প্রায় ৬ ইঞ্চি বাহির হইয়া থাকে এবং সেই বাহিরস্থিত ভাগে প প পেটী লাগাইয়া দিতে হয়। প প একটী পেটী বা বন্দ; ৪ ইঞ্চি চওড়া সিকি ইঞ্চি পুরু ও ২০ হাত লম্বা একটী ফিতার বা চর্ম্মের পটীর শেষ দুই ভাগ যুড়িয়া সেলাই করিলেই প প পেটী হয়। য য য য একটী চক্র যাহার মধ্যস্থল (কেন্দ্র) হইতে নেমীর শেষ ভাগ পর্য্যন্তের মাপ ৪ ফুট; নেমী ৬ ইঞ্চি চওড়া ও তাহার শেষ ভাগ দুইধারে ১ ইঞ্চি করিয়া উচ্চ রাখিয়া বক্রী মাঝের ৪ ইঞ্চি কাটিয়া ১ ইঞ্চি নিচু করিতে হয় এবং ঐ মধ্যের নিচু নালীর ভিতর প প পেটী বসে। নেমী আড়ে কাটিলে যে রূপ দেখায় তাহা ৩ নং চিত্রে দর্শিত হইল। য য য য চক্রের অন্তরস্থিত ভ ভ ভ ভ চক্র নিরেট কাষ্ঠের, তাহার মধ্যের দ চিহ্নিত স্থান দিয়া একটী লৌহের দণ্ড আঁটা থাকে এবং ঐ দণ্ড ধরিয়া ঘোরাইলেই য য য য চক্র চালিত হয়। ভ ভ ভ ভ চক্র হইতে যে সকল পাকি (অর) কৃষ্ণবর্ণ রেখা দ্বারা দর্শিত হইয়াছে সে গুলি ১ ইঞ্চি মোটা লৌহের দণ্ড। য য য য চক্রের স্থাপনা বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যার জন্য ২ নং চিত্র দেয়া গেল উহাতে ন ন বিন্দুময় রেখা দ্বারা সমতলভূমি দর্শিত হইয়াছে। থ থ দুইটী খুঁটি যাহা দ দ দণ্ডের ধারক এবং য য য য চক্র ঐ দণ্ডে আঁটা থাকে।

লৌহ ঢালাই করিতে হইলে লৌহ গালাইবার জন্য ৮ জন মজুরের আবশ্যক হয় ঐ ৮ জনে ক্রমাগত য য য য চক্রের মধ্যস্থিত দ দ দণ্ডের দুই ধার ধরিয়া ঘোরাইতে থাকে, তাহা হইলে চক্রে যুক্ত প প পেটী চক্রের গতি অনুসারে চালিত হয় এবং তাহাতেই চ চ চ চ দণ্ড ঘূর্ণ্যমান হইয়া তৎস্থিত ছ ছ ছ ছ পাখার ঘূর্ণনে বায়ুর উদ্ভব হয় এবং ঐ বায়ু গ গ গ খ থ দুই নলের দ্বারা চুলার ভিতর যাইয়া অগ্নিকে উত্তেজিত করে। ক ক চুলার ভিতর বাট লৌহ (Pig iron) উপর নিচে কয়লা দিয়া দিতে হয় এবং সেই কয়লায় অগ্নি ধরাইয়া য য য য চক্র ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে ছ ছ ছ ছ পাখার দ্বারা উৎপন্ন বায়ু খ থ গ গ গ দুই নলের ভিতর দিয়া চুলাতে প্রবেশ করত অগ্নি উত্তেজিত করিতে থাকে ও লৌহ ক্রমশ গলিত হয়। লৌহ গলাইবার উদ্যোগী একজন কারিগর থাকে তাহাকে ফারনেস্‌ম্যান বলে। এইরূপে লৌহ গলিত হইলে সমুখের মাটীতে ছিদ্র করিলে গলিত লৌহ অতি তরলাবস্থায় সেই ছিদ্র দিয়া পড়িতে থাকে এবং ঢালাই কারিগরেরা তাহা পাত্রে করিয়া লইয়া বালুকায় বসান' নকসায় ঢালে। এক্ষণে ছাঁচ গৃহের বর্ণনাবশ্যক—ছাঁচ তুলিবার জন্য একটী খোলার ঘর করিতে হয়; ঐঘরে বাঁশতলার মিহিবালি দুইফুট উচ্চ করিয়া ঢালিতে হয় এবং সেই বালিতেই ছাঁচ তুলিতে হয়। সূক্ষ্ম ও পরিস্কার কায করিতে হইলে বিলাতী কাফ্টিং অর্থাৎ ঢালাই কার্য্যোপযোগী বালি

দেয়া উচিত। ৪নং চিত্রটী ঢালাই করিবার বাকসের চিত্র, তলা ও ডালাহীন ১॥ বা ২ ফুট চওড়া,৪ ফুট লম্বা ও ৫ বা ৬ ইঞ্চি গভীর আদইঞ্চি পুরুকাঠের বাকস করিয়া তাহাতে হহহহ চারটী ধরিয়া তুলিবার মুট ও টট দুইটী ঠেস দেয়া হইলে ও ঐ বাকসের উপর দিকের কিনারা সরল না রাখিয়া চিত্রে দর্শিতের ন্যায় দাঁতকাটা হইলেই ঢালাই বাকসের আদর্শ হয় এবং ঐরূপ ঢালা লৌহের বাকসকেই ঢালাই বাকস কহে। এই প্রকার বাকস অনেকগুলি ঢালাই কার্য্যে আবশ্যক করে, কারণ পূর্ব্বোক্ত বালি-ঢালা খোলার ঘরের বালির ভিতর এক একটী ঢালাইবাকস বসাইয়া উহার মধ্যে বালি খুব ঠাসিতে হয় এবং এইরূপে সারি সারি বাকস বসাইয়া ঐ বাকস সমস্তের অন্তর স্থিত বালিতে ছাঁচ গুলির এক এক দিক চাপিয়া বসাইতে হয় পরে বালিতে বসান বাকস সকলের উপর উপর দাঁত কাটায় দাঁত কাটায় রুজু করিয়া অন্য ঢালাই বাকস উলটিয়া বসাইতে হয় পরে সেই সমস্ত বাকস বালি দিয়া ঠাসিয়া ভরাট করিতে হয়। এইরূপে উপরে দেয়া বাকস গুলি ভরাট হইলে হহহহ মুট ধরিয়া তুলিয়া লইলেই দেখা যায় সে ছাঁচগুলির উপরদিকের যে সকল নকশা থাকে তাহা উপরের বাকসের বালিতে অঙ্কিত হইয়াছে। ঢালাই বাকস করিবার কারণ এই যে বালি ঐ বাকসের মধ্যে ঠাসিলে তাহাতে যে সকল অঙ্ক পূর্ব্বকথিত প্রকারে তোলা হয় তাহা নষ্ট হয় না ও নাড়িতে চাড়িতে বালি খসিয়া পড়ে না। এইরূপে বালিতে সকল ছাঁচের নকল তোলা হইলে তাহা চেয়াড়ির মাটনী দিয়া মিস্তিরীরা দুরস্ত করে এবং পুনশ্চ বাকস গুলি পূর্ব্বমত উপরোউপরি করিয়া রাখে। যখন প্রথম বালির মধ্যে ছাঁচ রাখিয়া উপরের বাকসে বালি ভরাটকরে তখন ঐ ছাঁচ সমস্তের সহিত ঠেকাইয়া এক একটী কাঠি রাখিতে হয় এবং বালির অঙ্কগুলি মাঠা হইলে ঐকাঠী গুলি টানিয়া নিলেই নকশা গুলির সহিত মিলিত এক একটি ফাকপথ হয় ঐ ফাক মুখদিয়া বালির নকশা গুলিতে গলিত লৌহ ঢালিত হয়। এইরূপে সমস্ত প্রস্তুত হইলে লৌহ ঢালিবার উক্ত মুখগুলি ফাক রাখিয়া উপরোউপরি করা ঢালাই বাকস গুলির উপর তক্তাদিয়া তদুপরে কথক ভারী বস্তু রাখিতে হয় কারণ তাহা না রাখিলে গালিত লৌহের তেজে বাকস সরিয়া পড়িতে পারে। বালিতে নকসা উঠান ও মাটা হইলে বেত পোড়া ছাই সূক্ষ্ম করিয়া গুঁড়াইয়া সকল নকশাতে থুবি দিতে হয় তাহা হইলে ঢালাই হইলে ঢালিত দ্রব্য গুলির গায়ে বালি কামড়াইয়া ধরে না। ছাঁচের নকশা বালিতে উঠান কঠিন ব্যাপার নহে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি প্রথম বাকস বালিতে বসান ও তাহাতে বালি ঠাসা হইলে এক খানি থাল যদি তাহাতে চাপিয়া বসান যায় তাহা হইলে থালের নিচভাগের নকশা নিম্নস্থ বাকসের বালিতে অঙ্কিত হয় এবং উপরে বাকস বসাইয়া তাহাতে বালি ঠাসিলেই থালের উপর ভাগের নকশা উপরস্থিত

বাকসের বালিতে উঠে এবং উপরের বাকস তুলিয়া থাল সরাইয়া সেই বাকস পূর্ব্ববৎ অবস্থায় রাখিলেই বালির মধ্যে থালার নকশাটী ফাক হইয়া থাকে এবং গালিত লৌহ সেই ফাকস্থান পূরণ করিলেই থালার আকার প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব নিয়মে বালিতে তোলা নকশা গুলিতে গালিত লৌহ ঢালাই হইলে একদিন না নাড়িয়া রাখিয়া দিতে হয় এবং পরদিন বাকসগুলি তুলিয়া ঢালিত দ্রব্য গুলি বাহির করত উকার দ্বারা তৎ সমস্তের পাশাদির যে কিছু ছোটবড় হইয়া থাকে তাহা ঠিক করিয়া দিতে হয় এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য সম্বন্ধীয় অপরাপর কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিতে হয়। বালিতে ছাঁচের নকশা তোলা ও ঢালিত দ্রব্য গুলির চাঁচন, ছোলন, ঘোড়ন প্রভৃতি যত সূক্ষ্ম প্রয়োজন হয় ততই ভাল কারিগর দরকার করে। আমরা এই প্রবন্ধে ছাঁচ শব্দ বহু বার প্রয়োগ করিয়াছি কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা করি নাই এতদর্থে বলিতেছি যে লোহার যেরূপ ঢালিত গড়ন হইবে সেই মত কাষ্ঠের ছাঁচ বানাইতে হয় এবং সেই ছাঁচ গুলিই বালিতে বসাইয়া তাহার নকশা তুলিতে হয়। পূর্ব্ব কথিত থালার নকশা তোলার উদাহরণে থালই ছাঁচের কার্য্য করিয়াছে এবং একখানি কাষ্ঠের বা যে কোন দ্রব্যের হউক থাল হইলেই তাহাকে একটী ছাঁচ বলা যায়। অল্পকায় ভারতীতে প্রকাশের জন্য ইহা অপেক্ষা বাহুল্যে প্রবন্ধ লেখা যায় না সে জন্য এই স্থলে বিবরণে নিবৃত্ত হইয়া কার্য্যটীর লাভালাভ অঙ্কপাত দ্বারা দর্শাইয়াই লেখনী সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাগুক্ত ঢালাই কারখানায় বৃহৎ বৃহৎ বস্তুর ঢালাই হয় না। ঊর্দ্ধতঃ রেল হইতে পারে এবং অল্পতঃ দোয়াত হইতে পারে, সুতরাং রকম রকম কার্য্যের আয় ব্যয় দেখান কর্ত্তব্য বিবেচনায় তালিকা দ্বারা সংক্ষেপে তাহা দেখাইতেছি। এই কার্য্যে আমরিকান হার্ড কোক কয়লা, লৌহের মন-প্রতি ।০ করিয়া ফারনেসে লাগে ও তাহাতেই লৌহ গলে।

নিম্নের লিখিত তালিকাটি ৩৫ হইতে ৪০ টাকা টন লোহার দাম, মোনকরা ।০ সের ঝড়তি পড়তি ও কারিগরের কার্য্যের সূক্ষ্মতা অনুসারে ১২ টাকা হইতে ৩০ টাকা বেতন হিসাব করিয়া দেওয়া গেল।

	লৌহের দাম	ঢালাই খরচা	ছাঁচ বানান ও সাফাই খরচা	মোট খরচা	যে দামের নিচে বিক্রয় হইবে না
রেল বা অপরাপর তৎসম বস্তুর মন করা	১৸০	১।০	১	৪	৪॥০
তৌলের কুচা বাটখারার ঐ	১৸০	১॥০	১॥০	৪৸০	৭
সেজের শ্যামাদান, দোয়াতদান প্রভৃতি ঐ	১৸০	১॥০	২॥০	৫৸০	২০
দোয়াত, কাগজ চাপা, কলমদান প্রভৃতি ঐ	১৸০	১৸০	২	৫॥০	১০
মরদ বা পুত্তলিকা ঐ	১৸০	১॥০	৬	৯।০	২৫

ফার্‌নেস, ঢালাই ঘর প্রভৃতিতে ৪০০ টাকা মূল ধনের আবশ্যক এবং ৬০০ টাকা কার্য্য চালাইবার পুঁজি থাকে। ঢালিত বস্তু কখন আটকাইয়া থাকে না কেবল বুদ্ধি খাটাইয়া আবশ্যকীয় দ্রব্য ঢালিতে হয়। চার আনায় দস্তার (যাহা বাঁকিয়া যায়) কাগজচাপা কে কিনিতে ইচ্ছা করে যদি দুই আনায় তদপেক্ষা সুন্দর লৌহ কাগজচাপা পাওয়া যায়?

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী।

—:০:—

মেঘনাদ বধ কাব্য।

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এই জন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে এই জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে, যে, যখনি তাহার ফুল-বাগানে বসন্তের বাতাস বয়, তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুল বাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কি করে? সে প্যাটার্ণ্ (pattern) কিনিয়া, ঘর গণিয়া রাত জাগিয়া, চোখে চসমা দিয়া পশমের ফুল তৈরি করে। তাহাকে হঠাৎ ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে গঠিত করেন; তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণ রূপে. কখন বা হ্যাম্‌লেট্ রূপে কখন বা ম্যাক্‌বেথ রূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থা-বিভেদে, প্রকৃতি বিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন, তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; —ইহাঁদের কেবল কেরাণী গিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি

বলেন, কারণ, আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই।

নকল-নবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের-প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি, সকল গুলিতেই প্রায় শেষ কালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণতঃ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া দূর দর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহন কালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায়, যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এত দিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান্ অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্য্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমী মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না, যেখানে সে তাহার উপার্জ্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে; ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নাবিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনীত এ ট্র্যাজে-

ডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁধিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ-বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকীটুকু কেবল চোক বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি! অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে, অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান. তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফর্‌মাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে সুরু করেন।

এপিক্ (Epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে, একটা মারামারী কাটাকাটীর ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই, তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক্ দেখিয়াছি তাহার প্রায় সব গুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভাল হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে, তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না! এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন "এস, একটা এপিক্ লেখা যাক্" বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন এক জন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য-চরিত্রের উদার-মহত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে! সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনা কালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি, হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের

নায়ক ও যুদ্ধ বর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মবলই যথার্থ মহত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংসাপ্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখ, একদিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের, প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধ বর্ণনা মাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেম বাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্ব্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্ত্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্ব্বত্র চরিত্র-বিকাশ, চরিত্র-মহত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদ বধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র তুষার-ললাটে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়! কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে

চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন, ক্ষুদ্র, তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করা, অথবা পুত্র-শোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎ সামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংশ-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয়-গৌরব কীর্ত্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরব-কল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোন্ খানে সেই উদ্দীপনী শক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি, মেঘনাদবধকাব্যে ঘটনার মহত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনাই নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদ বধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি, ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখ-দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে, চন্দ্রশেখরের চরিত্রে অমরতা আছে,—যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিবে!

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি, তেমনি আর একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম; তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্ব জগতে না জন্মিয়া ভিন্ন দেশীয় কবিত্ব-জগতে জন্মিতাম, তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন, আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই সকল অমর সহচর সৃষ্টিই মহা কবিদের কাজ—আড়ম্বর করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করা তাঁহাদের কাজ নহে। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দ্দিকব্যাপী সেই কবিত্ব জগতে মাইকেল কয় জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ-চরিত্র যদিবা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ-চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন "I despise Ram and his rabble" সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীকে কিরণদান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কাবর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্য চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সঙ্গীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি। হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি

বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণা করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর, পীড়িত, কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য, এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না!

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া, তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম, তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেলিবিস দ্বীপ।

ভারত মহাসমুদ্রে যে বহুসংখ্যক দ্বীপ আছে তন্মধ্যে সেলিবিস একটি প্রধান। পাঠক বর্গের অনেকেই সেলিবিসের নাম ভূগোলে পাঠ করিয়াছেন। অদ্য এই প্রস্তাবে ঐ প্রকাণ্ড দ্বীপের লোকদিগের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সেখানকার প্রাকৃতিক তত্ত্ব এবং জীব ও উদ্ভিজ্জ রাজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিত হইতেছে।

সেলিবিস দ্বীপ একটি প্রাচীন রাজ্য, কিন্তু ইহা বহুকাল হইতে ভিন্ন দেশীয় রাজার অধীনে অবস্থিত থাকায় কোন বিষয়েই বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার আদিম বাসীরা এ পর্য্যন্ত অশিক্ষিত ও অসভ্য আছে। সেলিবিস ডচ্ জাতির উপনিবাসস্থল এবং ইহা প্রকৃত রূপে তাহাদিগেরই রাজ্য। আপাতত যদিও সেলিবিস্ দেশীয় লোকদিগের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যার আলোক এ পর্য্যন্ত সম্যকরূপে তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তাহাদিগের স্বভাব এখনও অনেক পরিমাণে পশুবৎ আছে, এবং তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি উত্তমরূপে পরিমার্জিত হইতে এখনও অনেক সময় আবশ্যক। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইউরোপীয় সুসভ্য জাতির সংসর্গে ও শাসনে থাকিলে যে সকল উপকার হওয়া উচিত এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

সেলিবিসের লোকদিগের বর্ণ সচরাচর গৌর ও সুন্দর। অবয়ব কিঞ্চিৎ খর্ব্ব ও হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু অনেকাংশের লোকদিগের আকৃতি ইহা হইতে বিস্তর প্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়, পাপুয়া ও সেলিবিস দেশীয় লোক এবং ইউরোপীয় জাতিতে ক্রমশঃ অনেক শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মোঙ্গল জাতীয় লোকের ন্যায় তাহাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত গণ্ডাস্থি উন্নত হয়। তাহারা অন্যান্য মালয়জাতির ন্যায় মস্তকে দীর্ঘ কেশ রক্ষা করে। তাহাদিগের মূর্ত্তিতে সরলতা ও স্ফূর্ত্তি যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাদিগের মানসিক বৃত্তি সমূহও নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে। তাহারা স্বভাবতঃ বিনয়ী ও আজ্ঞাবহ, এবং তাহাদিগের শিক্ষাকার্য্যে ও অনুকরণ বিষয়ে বিশেষ পটুতা লক্ষিত হয়। তাহারা সকলেই সাধারণতঃ শিল্প নিপুণ। তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত, সুতরাং এক স্থানের লোকদিগের সহিত অপর স্থানের নিবাসিগণের সৌহৃদ্য স্থাপনের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা চিরকাল রহিয়া গিয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইত, এবং এক দল পরাভূত হইলে বিজয়ীরা বিজিতদিগের শিরশ্ছেদ করিয়া ঐ নরমুণ্ড দ্বারা নিজ নায়কদিগের গৃহচূড় সজ্জিত করিত। এক্ষণে যদিও তাহাদিগের জিঘাংসা কথঞ্চিৎ শমিত হইয়াছে, কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদ আজও একেবারে তিরোহিত হয় নাই।

ডচ্ জাতীয় রাজপুরুষেরা অন্যূন ৬০ বৎসর হইতে এই দ্বীপে কাপিচাস আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তৎকাল হইতে সেখানকার নিবাসীদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থাও কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঐ বাণিজ্য রাজহস্তে একচেটিয়া থাকায় আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। কাপিচাসে অনেক আরণ্য ও পতিত ভূমি পরিষ্কৃত ও কর্ষিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ইউরোপীয় লোক কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত আছে। কৃষকগণের মধ্যে কোন রূপ কলহ উপস্থিত

হইলে ঐ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দেন। কোন কোন স্থানে দেশীয় কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছে। এই রূপে ক্রমশঃ সমগ্রদেশ সুশাসিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সুন্দর ও বিস্তৃত রাজ পথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বহুল পরিবর্ত্তন ও পারিপাট্য আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন গ্রামে সাধারণতঃ পথের দুই পার্শ্বে গোলাপবৃক্ষ রোপিত হওয়ায় ও উহা সর্ব্বদাই কুসুমে পরিশোভিত থাকায় অতি রমণীয় দৃশ্য সৃষ্ট হইয়াছে। গৃহ সকল সচরাচর বংশ ও দারুনির্ম্মিত, এবং স্থূল স্থানু দ্বারা পরিপুষ্ট। গৃহ প্রাকার সকল শুভ্র ও স্থানুসকল নীলবর্ণে রঞ্জিত থাকায় দূর হইতে অতি সুন্দর বোধ হয়। প্রায় প্রত্যেক গৃহের সর্ম্মুখে অলিন্দ ও তৎপরে একটী ক্ষুদ্রায়তন ফল ও পুষ্প বৃক্ষ শোভিত উপবন সংস্থিত থাকায় এক রমণীয় দৃশ্য উৎপন্ন হয়। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকায় তাল, ও অপরাপর বৃক্ষ এবং উত্তুঙ্গ আগ্নেয় পর্ব্বতের শিখর সমূহ দণ্ডায়মান থাকায় সেই মধুর দৃশ্যকে মহান্ করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ মধুর ও মহান্ দৃশ্যের একত্র সন্নিবেশ প্রায় জগতের আর কোন অংশেই লক্ষিত হয় না।

সম্প্রতি সেলিবিসের লোকদিগের আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তাহারা এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উন্নত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ইউরোপীয় জাতিদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। পূর্ব্বে প্রায় অধিকাংশ লোকেই বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিত, কিন্তু কাল সহকারে বস্ত্রের ব্যবহার সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য লোকেরা সারং নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র পরিধেয় নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। এক্ষণে ভদ্রলোকেরা চর্ম্মপাদুকা পর্য্যন্ত পরিধান করিয়া থাকে। পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গে আহারেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ইহারা নানারূপ মাংসও ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছে। তবে পূর্ব্ব প্রচলিত তণ্ডুল, আলু এবং অপরাপর ফলমূল রন্ধন করিয়াই সচরাচর উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। ইদানীন্তন বিশিষ্ট লোকেরা ইউরোপদেশীয় নানারূপ সুরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং রুটী, ডিম্ব, মাখন ও কাপি প্রভৃতি খাইতেও শিখিয়াছে। ফলতঃ এ সকল ইউরোপীয় আহার সামান্য অবস্থার লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখানে সিরি নামে এক প্রকার বৃক্ষপত্র তাম্বুলের ন্যায় গুবাকের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তামাকুও দেশে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

সেলিবিস-নিবাসীরা তণ্ডুল, জনারা ও অপর দুই একটী শস্যের চাস করিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে কাপি চাসেই অনেক কৃষক নিযুক্ত। কৃষিকার্য্য প্রায় মহিষের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাপি বৃক্ষ সচরাচর চারি পাঁচ হাত উচ্চ হইলেই তাহার শিরবিটপ ছেদন করিয়া দেয়, এবং তাহার পার্শ্ব

শাখা সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া স্থূল ও পূর্ণাবয়ব ধারণ করে এবং আপাদমস্তক ফলে পরিপূর্ণ হয়। প্রতিবৃক্ষ হইতে বৎসরে পাঁচসের হইতে দশ সের কাপি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাপি এক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কৃষকগণের নিকট হইতে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন, এবং তৎপরে উহা অনেক অধিক মূল্যে ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রীত হয় ও সমস্ত অর্থ রাজস্ব স্বরূপ রাজকোষে নীত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় ও দেশীয় কার্য্যাধ্যক্ষেরা প্রতিশতের একটা নিরূপিত অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন মাত্র।

সেলিবিসের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বিলক্ষণ আছে। নারিকেল, বিভিন্ন জাতীয় তাল, কমলালেবু ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ স্বতঃ বনমধ্যে জন্মিয়া থাকে। এখানকার লোকেরা এক প্রকার তালের রস পান করে, এবং তাহা হইতে গুড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সচরাচর পার্ব্বতীয় প্রদেশের ক্রমনিম্ন স্থানে ও নিম্ন জলময় ভূমিতে ধান্য রোপণ করে। এখানে বেত্রবন প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থানের তাপাংশ অন্যান্য সন্নিকটস্থ দ্বীপ সমূহের অপেক্ষা অনেক ন্যূন; সাধারণতঃ ৬৯ ডিগ্রি হইতে ৭৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একারণ ইহার বায়ু স্নিগ্ধ ও মনোহর এবং স্বাস্থ্যবিধায়ক। এখানে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, এবং কখন কখন সমগ্র দেশ এরূপ আন্দোলিত হয় যে অনেক গৃহ ও মনুষ্য নষ্ট হইয়া যায়! আগ্নেয়-গিরি সকলই এই ভয়ানক ভূকম্পনের কারণ। সেলিবিসের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অনেকগুলি আগ্নেয় শিখর আছে এবং সময়ে সময়ে তথা হইতে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতও হইয়া গিয়াছে। ভারত মহাসমুদ্রের ও প্রশান্ত সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী যে সকল দ্বীপ আছে তাহার অধিকাংশেই আগ্নেয় পর্ব্বত বিরাজিত, এবং এই পর্ব্বত শৃঙ্খল সুমাত্রা হইতে লুজন দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে সমুদ্রতল দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতীয় প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলপ্রপাত আছে। এক এক স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে নিয়ত ধূম ও বাষ্প উত্থিত হইতে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে এক একটী হ্রদের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া থাকে, এবং তাহাতে নানাবর্ণের মৃত্তিকা কর্দ্দমে পরিণত হইয়া ফুটিতে থাকে। এই কর্দ্দমে গন্ধকের আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এবং গন্ধকই যে নিয়ত নিম্নস্তর ভূমির মধ্যে জ্বলিয়া থাকে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে স্থানে স্থানে ধূম নির্গমনের পথ পরিস্কৃত হওয়াতেই বোধ হয় অধিক অগ্ন্যুৎপাতের কারণ নিবারিত হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশে কালক্রমে ঐরূপ হ্রদ বিশুষ্ক ও তন্মধ্য হইতে ধূমোদ্গম নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং তখন নিবাসীরা উহাতে শস্য রোপণ করিয়া থাকে। ঐরূপ ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এত অধিক যে উহা রীতিমত কর্ষণ করিবারও আবশ্যক হয় না।

সেলিবিস দেশীয় স্ত্রীলোকেরা অতি পরিশ্রমী। গৃহকর্ম্ম ব্যতীত তাহারা ধান্য

হইতে চাউল প্রস্তুত ও কাষ্ঠ আহরণ করে। সূতা তৈয়ার ও বস্ত্র বুনিয়া থাকে, এবং গৃহ রঞ্জিত করে। ইহারা বড় অলঙ্কার-প্রিয়; সাধারণতঃ তাহাদিগকে পিত্তলের অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখা যায়। উন্নত অবস্থাপন্ন লোকেরা স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণও পরিধান করিয়া থাকে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য ব্যতীত ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকে, একারণ তাহাদিগের সন্তানাদি লালন পালনে অনেক তাচ্ছল্য ঘটে এবং বালমৃত্যুও তন্নিমিত্ত অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না পারার ইহা একমাত্র কারণ।

সেলিবিস দ্বীপ অনেক নূতন জাতীয় পশু ও পক্ষীর আবাস স্থান। জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার প্রাণী-প্রাচুর্য্যে মোহিত হইয়া থাকেন। অন্যূন দুইশত ভিন্ন জাতীয় নূতন পক্ষী এস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে! তন্মধ্যে আট জাতীয় শুকপক্ষী জগতের আর কোন অংশেই পাওয়া যায় না। ছয় প্রকার সুন্দর শিকরা জাতিও এই স্থান ব্যতীত অন্য কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না। ম্যালিওম্ নামে এক প্রকার পক্ষী সেলিবিস ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না। ইহা দেখিতে সুদৃশ্য, আকৃতিকে কুক্কুটের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। ইহারা নিবিড় অরণ্যে বাস করিয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই যে ইহারা কুলায় নির্ম্মাণ করিতে জানে না। প্রসবকালীন ইহারা বহুক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরস্থ বালুকা খনন করিয়া ডিম্ব রক্ষা করে। ইহারা এককালে একটী ডিম্ব মাত্র প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে দুই তিন মাসের মধ্যে সর্ব্বসমেত আট নয়টী ডিম্ব সচরাচর প্রসব করিতে দেখা যায়। ইহারা প্রসব করিয়াই বনে প্রত্যাগত হয়, সুতরাং শাবকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে না। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য নিয়ম! শাবক ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়াই স্বতঃ বনের দিকে ধাবিত হয়। অনেক ম্যালিওম শিশু এইরূপে যাইতে যাইতে যে কালগ্রাসে পতিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। ম্যালিওমের মাংস ও ডিম্ব অতি সুখাদ্য বলিয়া খ্যাত।

এতদ্ব্যতীত সেলিবিসে নূতন জাতীয় ধনেশ, পেচক, পারাবত ও অন্যান্য ক্ষুদ্র পক্ষী প্রচুর পাওয়া গিয়া থাকে। যদিও এখানকার স্তন্যপায়ী পশুর সংখ্যা অধিক নহে, তথাপি তন্মধ্যে কয়েকটী জাতি আছে যাহার সদৃশ জন্তু অদ্যাপি কোন দেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। সাপি-উটান নামে যে এক প্রকার ক্ষুদ্রদেহ গাভী পাওয়া গিয়া থাকে তাহা দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহারা ধূসর বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ইহাদিগের শৃঙ্গদ্বয় পশ্চাদ্গামী হইয়া জন্মে। প্রাণীবিদ্যা-বিশারদেরা অনেকে ইহাকে গো-শ্রেণীয় পশুর মধ্যে গণ্য করেন না; তাঁহারা বলেন এই পশুর মুখ ও অন্যান্য অবয়বে হরিণ জাতীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। ইংরাজেরা এই পশুকে এনোয়া কহিয়া থাকেন। এই দ্বীপে এক নূতন জাতীয় কৃষ্ণ বানর পাওয়া গিয়া থাকে। ইহা নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপের বানর হইতে অনেক স্বতন্ত্র। জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে সাইনোপিথিকাস্ নাইগ্রেসেন্স (Cynopithecus nigrecens) কহিয়া থাকেন। এখানে শূকর জাতীয় এক প্রকার নূতন পশুও পাওয়া গিয়া থাকে। ইহার নাম ব্যাবিরুসা (Babirusa)। ব্যাবিরুসার অবয়ব যদিও শূকরের সদৃশ বটে, কিন্তু এই উভয় জাতির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়। ব্যাবিরুসা শূকরের ন্যায় মুখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া মূল প্রভৃতি ভক্ষণ করে না। ইহা সম্পূর্ণ ফলভোজী। বৃক্ষ নিপতিত ফলই ইহার আহার। ইহার চারিটী বৃহৎ জন্তু জন্মিয়া থাকে, উপরের দন্ত দুইটী ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া বক্রভাবে চক্ষুর উপর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। নিম্নপাটীর বৃহৎ দন্ত দুইটীও ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। এই জন্তুগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮। ১০ ইঞ্চি হইয়া থাকে।

সেলিবিস দ্বীপে পতঙ্গ প্রাণীর প্রাচুর্য্য অসামান্য। অসংখ্য নূতন ও অতি সুন্দর জাতীয় প্রজাপতি ও কীট পতঙ্গাদি এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণীবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এখান হইতে নানারূপ সুদৃশ্য ও নানাবর্ণ রঞ্জিত প্রজাপতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। বনস্থলীতেই এই সমস্ত পতঙ্গাদি জন্মিয়া থাকে।

প্রাণীবিদ্যানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে সেলিবিস ভ্রমণ অতীব আনন্দপ্রদ।

শ্রী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চা-ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ।

আমাদের এখানে কুলিদের সাহেবরা তেমন মারধোর করেন না। তবে দোষ করিলে শাস্তি পায়। শুনিতে পাই, অনেক বাগানের সাহেবরা কুলিদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন। আমি প্রায়ই শুনিতাম অমুক বাগানের সাহেব একটা কুলিকে এমন মারিলেন যে সে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আমাদের বাগানে ভাল manager থাকাতে কেহ প্রহারাদি করিতে পারিতেন না। আমি শুনি; যদি কেহ অত্যাচার করেন তাহা হইলে আমাদের ম্যানেজার তাঁহার নামে কলিকাতায় রিপোর্ট করেন. এইজন্য একটি আসিস্টাণ্টকে আমাদের বাগান হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছিল। আমি এখানে আসিয়া শুনিলাম, পূর্ব্বে কুলিদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার ছিল, এখন কমিয়া আসিয়াছে। পুরাতন কুলিরা গল্প করে যে তাহাদের বালক অবস্থায় ভুলাইয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত ছিল

যে তিন বৎসর কি চারিবৎসর কাজ করিতে হইবে কিন্তু প্রায় তাদের মৃত্যু কাল উপস্থিত স্বদেশে যাইতেও পারিলনা, কিম্বা বৃদ্ধাবস্থায় তেমন পরিশ্রম করিতেও পারেনা সুতরাং অন্নাভাবে কষ্ট পায়। বেচারীরা এত দিন পর্য্যন্ত প্রাণপণে অত কষ্ট সহ্য করিয়া বাগানের কাজ করিল আর এই বৃদ্ধাবস্থায় যখন তাহারা পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম তখন তাহাদের সম্বন্ধে কোন রকম বন্দোবস্ত করা কি উচিত নহে? তারা বলে পূর্ব্বে যখন বাগানের কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয় তখন ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইয়াছে অনেক পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল পরিস্কার করিয়াছে; এখন তেমন শক্ত কাজ নাই। আমাদের বাগানে কুলি সম্বন্ধে এই রূপ নিয়ম—প্রতি বৎসরে কুলিদের নিকট এগ্রিমেণ্ট লওয়া হইবে, প্রত্যেক কুলিরা এগ্রিমেণ্ট দিবে যে এত মাস বাগানে কাজ করিব। যে এগ্রিমেণ্ট দিত তাহাকে আট টাকা ও আদ বোতল মদ দেওয়া হয়। আমি প্রায় শুনিতাম কুলিরা বলাবলি করিতেছে যে, আমরা এ বৎসর এগ্রিমেণ্ট দিব না, আমাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে কিন্তু আবার টাকার লোভে ও মদের লোভে এগ্রিমেণ্ট দিত। এই জন্য আমাদের বাগানের কুলিদের পক্ষে সুবিধা আছে, তাহাদের এগ্রিমেণ্টের কাল ফুরাইলে তাহারা যদি পছন্দ করে তাহা হইলে অন্য বাগানে গিয়া নিযুক্ত হইতে পারে। যেখানে তাহারা সুখে থাকে সেই স্থানে যাইতে পারে। এখন কুলি বিল পাস হইল এখন কি হয় দেখা যাউক। আমার বোধ হয় কুলিদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবেনা। যখন কুলি বিল পাস হইল তখন এখানে এক দল সাহেবের আনন্দের সীমা দেখে কে? এক দল সাহেব আছেন শুনিলাম তাঁরা কুলিদের নিকট হইতে এগ্রিমেণ্ট নেন না আর কুলিদের রীতিমত বেতন দেন না এই দলের মহা উৎসাহ। যখন কুলি বিল পাশ হইল তখন একটি সাহেব আমাদের বাগানে আসিলেন। তাঁর আনন্দ দেখে কে? তিনিত খুব উৎসাহের সঙ্গে কুলি বিলটা কি পদার্থ সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। (আমি কুলি বিলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। তবে তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা শুনিলাম তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে অন্যান্য নিয়মের মধ্যে ইহাও একটি নিয়ম যে, যে বাগানের যে কুলি তাহাকে সেই বাগানেই থাকিতে হইবে। কুলি বিল পাস হইবার পূর্ব্বে এগ্রিমেণ্ট ফুরাইলে কুলিরা এক বাগান হইতে অন্য বাগানে যাইতে পারিত। এইরূপ সকল বাগানেই হয়। অন্য বাগানের কুলি প্রায় আমাদের বাগানে আসিত এবং আমাদের বাগানের কুলিও অন্য বাগানে যাইত। কিন্তু কুলিবিল অনুসারে তাহারা এখন অন্য বাগানে যাইতে পারিবে না যদিও লুকাইয়া যায় তাহা হইলেও অন্য বাগানের সাহেব তাহাকে কুলি শ্রেণী ভুক্ত করিতে পারিবেন না।) এইরূপ আজ

কাল খুব উৎসাহ, তর্ক বিতর্ক ও নানা রকম কাণ্ড কারখানা চলিতেছে। কুলি খাটাইবার সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম আছে, প্রথম কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত কুলিরা প্রাতে ৭টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে ও ফাল্গুন মাস হইতে অন্য রকম বন্দোবস্ত—তখন সকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত খাটে তৎপরে আহারাদি করিবার জন্য ছুটি পায়, আবার দুইটা হইতে পাঁচটা ও ছটা পর্য্যন্ত কাজ করে। কার্ত্তিক মাসেই কুলিদের অত্যন্ত দুঃখের সময় কেন না আহার করিবার নিমিত্ত একবারও ছুটি পায় না। প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক ভাবে কাজ করিতে হয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের বাগানে অত্যাচার নাই কেবল এক বিষয়ে কুলিরা আমার কাছে প্রায় দুঃখ জানাইত। কুলিদের নিয়ম ছিল, যে, সকাল হইতে বিকাল পর্য্যন্ত খাটিবে, ইতিমধ্যে যদ্যপি কোন লোক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত, টিলার * উপর বিশ্রাম কিম্বা আপন আপন বাড়ী গিয়া খাইতে কিম্বা বিশ্রাম করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহাদের হাজরী বন্ধ হইত; সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আধ ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য তাহাদের সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা একেবারে মাটী হয়ে গেল; আমি যত দিন কাজ করিয়াছিলাম ততদিন তাহাদের হাজরী কাটি নাই।

* পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ ভূমি। এখানেও চাগাছ রোপণ করা হয়।

আমাকে কুলিরা অত্যন্ত ভাল বাসিত। আমি প্রায়ই শুনিতাম তাহারা বলাবলি করিতেছে—এ সাহেব এ বাগানে থাকিলে আমরা অত্যন্ত সুখে থাকিব, কিন্তু এঁকে এখানে কখনই থাকিতে দিবেনা, যতবার ভাল সাহেব আসিয়াছে ততবার তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা সকলে বোরাকাই নামে একটি বাগানের ম্যানেজারের অত্যন্ত সুখ্যাতি করে। তারা বলে যত সাহেব এসেছিল তার মধ্যে ইনিই ভাল,—এর জন্য এখনও তারা কাঁদে। এইরূপ তাহারা বলিত যে সেই সাহেব ও এই সাহেব দুজনে প্রায় সমান। অন্য সাহেবদের ব্যবহারে তারা সন্তুষ্ট নয়, কেন না তাঁহাদের মায়া দয়া নাই, তাঁরা উহাদের কষ্ট আদবে অনুভব করেন না। বেচারীরা সকাল বেলায় কোদাল ধরিয়াছে, সমস্ত দিন সমান পরিশ্রম করে কিরূপে? একটু বসিয়াছে অমনি "হাজরী বন্দ করেগা" বলিয়া ভয় দেখাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে দিত না। আমি মাঝে মাঝে তাহাদের বিশ্রাম করিতে দিতাম এই জন্য আমাকে কখন কখন সাহেবদের কাছে হিসাব দিতে হইত। সাহেব আসিয়া টিলার উপর সকল কুলিকে না দেখিতে পাইলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন সকল কুলি থাকে না কেন? আমি বলিতাম জল খাইতে গিয়াছে, তাহাতে তিনি আমাকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু সর্দ্দারদের বলিতেন কুলি টিলায় হাজীর না থাকিলে তাহাদের জরিমানা হইবে। আমি যখন

কুলিদের সঙ্গে থাকিতাম তখন শুনিতাম তারা প্রায়ই বলাবলি করিতেছে এত খাটি তবুও ঠিকমত মাইনে পাই না—আমরা যদি কিছু কাজ না করি, যদি আদ নল কাজ করে থাকি তাহলেও এর চেয়ে বেসী মাইনে পাবার কথা, কিন্তু আমরা এত বেশী পরিশ্রম করিয়াও আদনলের হি-সাবেও হাজরী পাই না। এখানে কুলিদের মাইনে দেওয়া সম্বন্ধে নিয়ম এইরূপ—৯ হাত একটা কোন গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লয়, তাহাকে নল বলে। এই রকম দশ নল কাজ করিতে পারিলে এক হাজরী পায়। প্রত্যেক হাজরীতে তিন আনা হিসাবে পায়। এই রূপে কুলিরা সমস্ত দিনে যত নল কাজ করে ৯ নলে তিন আনার হিসাবে তত নলের দাম পায়। কুলিরা মাসের শেষে শেষে যাহা কিছু পাইত তাহাতেই সন্তুষ্ট হইত—তারা যে বলিত ঠিক মাইনে পাইনে সেটা কত দূর সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না। কুলিরা যে নিজের অবস্থার উপর নিতান্ত নারাজ, তাহা নহে। এই রকম জীবন তাদের এক রকম অভ্যাস হইয়া গি-য়াছে। বাগান হইতে পলাইয়া আসিতে তাহারা চায়ও না, তাহার সুবিধাও বড় নাই। সেখানে অনেক বৎসর বসতি ক-রিতে করিতে তাহারা সেই দেশের লোক হইয়া পড়িয়াছে—সেই খানে বিবাহ করি-য়াছে সন্তান সন্ততি হইয়াছে এই সব কা-রণে একেবারে জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্য স্থানে গেলে এত পরিবারের আহার যোগাইতে পারে না। চা-বাগানে এই সুবিধা যে, কুলিদের যতই পরিবার বাড়ুক না কেন সকলেই এই বাগানে কাজ করিয়া এক রকম রোজগার করিতে পারে—এইরূপে তাদের এক রকম চলিয়া যায়। কেবল তারা মাঝে মাঝে সাহেবদের উপর অত্যন্ত রাগিয়া উঠে। সে সময় সাহেবদের ব্যবহারের বেশ প্রতিফল দেয়। কুলিরা মাঝে মাঝে এক একটা অন্ধের মত কাজ করিয়া ফেলে তাদের অল্প বুদ্ধিতে আর কিছু আশা করা যায় না। একবার একজন সাহেবের উপর একজন কুলি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। একটি সাহেব সন্ধ্যার পর একটি কুলির স্ত্রীকে তার উপর কি একটা কাজের ভার দিবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠান, তার স্বামী মনে করিল সাহেবের কোন মন্দ উদ্দেশ্য ছিল। সাহেব যখন ঘুমাইতেছে তখন সে একটা বর্ষা হাতে করিয়া তাঁর বাংলায় যাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল; সে তাঁর শুইবার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বর্ষা তুলিয়াছে এমন সময় তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চোক চাহিয়াই দেখেন যে তাঁহাকে মারিবার জন্য বর্ষা উঠাইয়াছে, তিনি বিছানা হইতে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিতে চেষ্টা করিলেন। ইতি মধ্যে সে তিন চারিটি খোঁচা মারিল, সাহেব প্রাণ বাঁচাইতে নিরাশ হইয়া পড়িলেন—কপালে খোঁচা মারিয়াছিল সেখান হইতে বেগে রক্ত পড়িতেছিল সুতরাং চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না সেই জন্য বর্ষা কা-ড়িয়া লইতে পারিলেন না। ওরূপ আ-ঘাত পাইবার পরেও তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তৎপরে কুলি ধরা পড়ে এখন তার মেয়াদ হইয়াছে। এই ব্যক্তিই যেমন একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু প্রায়ই এমন শুনা যায় না—তবে, কুলিরা প্রায়ই বলাবলি করিত সাহেব যদি কিছু বলে ত কোদালের বাঁট খুলিয়া মারিব।

ক্রমশঃ।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়াদিত্যের নৌকা যখন খাল অতি-ক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া সহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুব-রাজের নিকট হইতে তাঁহার তলোয়ারটি চাহিয়া লইল।

উদয়াদিত্যের তিনখানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারো হাতে দিতে তাহাকে গোপনে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও বিভার চিঠি খানি রাখিয়া বাকী পত্র খানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

তখন আগুন আরো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য অনেক লোক জড় হইয়াছে। তাহাতে নির্ব্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বই সুবিধা হইতেছে না।

এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েক জন প্রজা ও প্রাসা-দের ভৃত্যের সাহায্যে সে এই কীর্ত্তি করি-য়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আগুন ধরিয়া উঠিল, ইহা কখন দৈবের কর্ম্ম নহে, এত-ক্ষণ এত চেষ্টা করিয়া আগুন নিবিয়াও যে নিবিতেছে না, তাহারো কারণ আছে। যাহারা আগুন নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই এক জন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আগুন নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে, জল আনিতে গিয়া জল আনে না, দৈবাৎ ক-লসী ভাঙ্গিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আগুন আর নেবে না।

এদিকে যখন এইরূপ গোলযোগ চলি-তেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আগুন লাগা-ইয়া দিল। একে একে জানালা, দরজা,

কড়ি, বরগা, চৌকাঠ, কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে, কোন সূত্রে আগুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সুতরাং সে দিকে আর কাহারো মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আগুন বেশ রীতিমত ধরিয়াছে। কতকগুলা হাড়, মড়ার মাথা, ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোন প্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে যাহারা প্রহরী-শালার আগুন নিভাইতে ছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক চীৎকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"ও কি রে!" একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"ওরে, যুবরাজের ঘরে আগুন ধরিয়াছে!" প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিষ-পত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর এক জন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল;—"কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ চীৎকার করিতেছেন, শুনা গেল!"—তাহার কথা শেষ না হইতে হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"ওরে তোরা শীঘ্র আয়! যুবরাজের ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আরত তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না!" যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—চারিদিকে আগুন—ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেই খানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কাহার অসাবধানতার এই ঘটনাটি ঘটিল, সকলেই তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল, এমন কি, মারামারী হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহ দাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া দিয়া আপাততঃ কিছু দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আগুন লাগিয়াছে, অভিপ্রেত জনরব বিশেষ রূপ রাষ্ট্র হইয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আনন্দ মনে তাহার কুটীরাভিমুখে চলিল। প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারিদিক স্তব্ধ—বাঁশগাছের পাতা ঝর্ ঝর্ করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে;—সীতারামের সৌখীন প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রস-গর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশূন্য স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পান্থ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছু দূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে ত সপরিবারে পালাইতেই হইবে, অমনি বিনা মেহন্নতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক্ না। মঙ্গলা পোড়ারমুখীত মরিয়াছে—বালাই গিয়াছে—একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক্—

বেটীর টাকা আছে ঢের—তাহার ত্রিসংসারে কেহ নাই—সে টাকা আমি না লই ত আর এক জন লইবে,—তায় কাজকি, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্! এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম রুক্মিণীর বাড়ির মুখে চলিল—প্রফুল্ল মনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে একজন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এ সকল কিছুই এড়াইতে পায় না। দুটা রসিকতা করিবার জন্য তাহার মনে অনিবার্য্য আবেগ উপস্থিত হইল—কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিল।

সীতারাম রুক্মিণীর কুটীরের নিকটে গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হৃষ্টচিত্তে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল। ঘোরতর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাইতেছে না। একবার চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিন্ধুকের উপর হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, দুই একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে! কাহার যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শুনা যাইতেছে। আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়ন-গৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জ্বলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কেও রমণী থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অর্দ্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছে! ঘরে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশু বর্ণ মুখের উপর পড়িয়াছে—পশ্চাতে সেই রমণীর অতি বৃহৎ এক ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে। ঘরে আর কিছু নাই—কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী, সেই দীর্ঘছায়া, আর এক ভীষণ স্তব্ধতা! ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোকে, এলোচুলে, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে! সহসা দেখিয়া, তাহাকে প্রেতিনী বলিয়া মনে হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না—ভরসা বাঁধিয়া পিছন ফিরিতেও পারিল না! সীতারাম নিতান্ত ভীরু ছিল না; অল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহ্যিক সাহস ও মৌখিক উপহাসের স্বরে কহিল—"তুই কোথা হইতে! মাগী, তোর মরণ নাই না কি!" রুক্মিণী কট্‌মট্ করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল "বটে! তোদের এখনো সর্ব্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব!" উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, "যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসি-

লাম! আগে, তোকে, আর তোর যুবরাজকে চুলায় শুয়াইব, তোদের চুলা হইতে দুমুটা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব—তার পরে যমের সাধ মিটাইব—তাহার আগে যমালয়ে আমার ঠাঁই নাই!"

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! খুব যে কাছে ঘেঁসিয়া গেল, তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমলস্বরে কহিল,—"মাইরি ভাই, ঐ জন্যইত রাগ ধরে! তোমার কখন্ যে কি মতি হয়, ভাল বুঝিতে পারি না!

গড় করি তোর ভালবাসায় কতই খেলা খেলালে!
এই তুলে দিস্ স্বর্গে, আবার এই ফেলে দিস্ পাতালে!

বল্‌ত মঙ্গলা, আমি তোর কি করেছি! অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস্ বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?

"মর্‌চি সেধে সেধে,
(আজ) মর্‌বোলো তোর চরণ তলে,
গলায় চাদর বেঁধে!"

সীতারাম যতই অনুরাগের ভান করিতে লাগিল রুক্মিণী ততই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিতে লাগিল—সীতারাম যদি তাহার নিজের মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পট্‌পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত, সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নখ দিয়া উপড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিছুই হাতের কাছে পাইল না! দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, "একটু রোস; তোমার মুণ্ডপাত করিতেছি' বলিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একটা বঁটির অন্বেষণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল—সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলঙ্কারে মরিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল, এবং চৈতন্য হইল যে, সত্যকার বঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই—এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটীরের বাহিরে সরিয়া পড়িল। রুক্মিণী বঁটি হস্তে শূন্য গৃহে আসিয়া ঘরের মেজেতে সীতারামের উদ্দেশে বারবার করিয়া আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন "মরিয়া" হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণ শাণিত হাস্য নাই, বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢল তরঙ্গউচ্ছ্বাস নাই—রাজবাটীর যে সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া, তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সে দিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে ঝাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিল—মঙ্গলা যুবরাজের পলায়নবৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে—সর্ব্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন! যাহা হউক—আমার আর যশোহরে এক মুহূর্ত্ত থাকা শ্রেয় নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড়ে পলাইল।

শেষ রাত্রে মেঘ করিয়া মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আগুনও ক্রমে নিভিয়া গেল। যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দ্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই একজন সভাসদ আসিল। একজন সাক্ষ্য দিল, যখন আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন সে যুবরাজকে জানলার মধ্য হইতে দেখিয়াছে। আর কয়েকজন কহিল, তাহারা যুবরাজের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর একজন, যুবরাজের গৃহ হইতে তাঁহার গলিত দগ্ধ তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুড়া কোথায়?" রাজবাটি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল—যখন আগুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারাগারে ছিলেন—কেহ কহিল—না, রাত্রেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য এইরূপে যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে, গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। এক জন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও!" সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈস্বরে বলিল "আমি আর কিছু চাই না—তোমার ঐ প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে, না তোমাকে ভয় করে!" এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল "চুপ কর্ মিন্সেরা। কাল যখন তোদের হাতে পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম—ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড় রাজার সঙ্গে পালায়—তখন যে তোরা পোড়ার মুখারা আমার কথায় কান দিলিনে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড় অহঙ্কার হইয়াছে তোমরা

সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ! পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্ত বল।"

রুক্মিণী কহিল "বলিব আর কি! তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড় রাজার সঙ্গে পালাইয়াছে।"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘরে কে আগুন দিয়াছে জান?"

রুক্মিণী কহিল—"আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড় পীরিত—আর-কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতারামই যেন তাঁর সব। এ সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড় রাজা, সীতারাম, আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিন জনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইহা করিয়াছে—এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম!"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এসব কি করিয়া জানিতে পারিলে?" রুক্মিণী কহিল,—"সে কথায় কাজ কি গা! আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমার রাজবাড়ির চাকররা সব ভেড়া—উহারা একাজ পারিবেনা।"

প্রতাপাদিত্য রুক্মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও প্রহরীদিগের প্রতি যথাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কি বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরস্বরে কহিলেন "মহারাজ!" মহারাজ তাহার কোন উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য একজন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন সংবাদ পাইলেন। নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছিলেন সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুক্মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল, তাহারা এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই স্ত্রীলোকটী কোথায়।" তাহারা কহিল, "সে আর ফিরিয়া আসিল না সে সেই খানেই রহিল।"

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কি একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছিলেন, য়ে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কি করিবেন?

প্রতিদিন মহারাজ যখন এক একটি করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাস মাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে বিষয়ে কোন কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখ', এবার উদয়কে মাপ কর! বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও, তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব!"

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিলেন —"আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমিত কিছুই করি নাই!"

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা বাঁকিয়া দাঁড়ান, এই নিমিত্ত মহিষী ওকথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আইলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মহারাজের কোন প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইলনা। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশ্বস্তা হইলেন। মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ায় মহারাজ মনে মনে বুঝি সন্তুষ্ট হইয়াছেন!

এখন কিছু দিনের জন্য মহিষী এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতি পূর্ব্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্ররায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আহ্লাদ ধরে না। রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি ছিল না। যখনি সে অবসর পাইত, তখনি ভাবিত তিনি কি মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয়ত তিনি রাগ করিয়াছেন! তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?" উল্‌টিয়া পালটিয়া বিভা ক্রমিক এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়া ছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কি অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কি ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল! লজ্জাসরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কত ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল, তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন—তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দন কানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কি প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল। তাহার স্বামীর

ভালবাসার উপর কত খানি আশ্বাস, কত-খানি আস্থা জন্মিল! সে মনে করিল, তাহার স্বামীর ভালবাসা এজগতে তাহার অটল আশ্রয়! সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মত বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মত প্রসারিত, নির্ম্মল হইয়া গেল। সে এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমানুষের মত কত কি খেলা করে। ছোট স্নেহের মেয়েটির মত তাহার মায়ের কাছে কত-কি আবদার করে, তাহার মায়ের গৃহ-কার্য্যে সাহায্য করে। আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন, নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ ছায়ার মত ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে—এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয় খানি পরিস্ফুট প্রভাতের ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মত সে সঙ্কোচ, সে লজ্জা, সে বিষাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই। সে এখন আনন্দভরে, বিশ্বস্ত ভাবে, মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইতনা। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে—কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখন প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু একতিল মলিন করিবেন! এই জন্য মেয়েটি প্রতি দিন চোখের সামনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হাস্য মুখে, অপরিতৃপ্ত নয়নে তাহাই দেখেন!

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয় একটা সন্দেহ বর্ত্তমান ছিল, তাই জন্য আজ কাল করিয়া এ পর্য্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারিতেছেন না। দুই এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেবল বিভার যে কি করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছু দিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে—যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন—তখন আর কিসের জন্য বিলম্ব করা! একবার তিনি মার্জ্জনা করিয়াছেন, আবার——! কয়েক দিন বিভা আর কিছু বলিল না—অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভা কহিল, "মা!" ঐ কথাতেই তাহার মা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কি বাছা!" বিভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল, "মা, তুই আমাকে কবে পাঠাইবি মা!" বলিতে বলিতে বিভার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পাঠাইব বিভু!" বিভা মিনতির স্বরে কহিল—"বল না মা।" মহিষী কহিলেন, আর কিছু দিন সবুর কর্ বাছা। শীঘ্রই পাঠাইব।" বলিতে বলিতে তাঁহার চখে জল আসিল।

প্রত্যুত্তর।

(দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি।)

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" নামক সুরচিত প্রস্তাবে সুনিপুন লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আংশিক সত্য আছে—কিন্তু কথা এই, সত্যকে আংশিক ভাবে দেখিলে, অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। একপাশ হইতে একটা জিনিষকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয়, তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। সত্যকে সর্ব্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্রথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পূর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চারি-কোণা দ্রব্যের সবটা দেখিতে পাই না—ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত উচিত এই যে, যে যে দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার আর কোন উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সত্য একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না; এই জন্যই কিছু দিন ধরিয়া, আমরা হস্তীকে, কেহ বা স্তম্ভ, কেহ বা সর্প, কেহ বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি, অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভূমিকাচ্ছলে এতটা কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই—আমি জানাইতে চাই—একপেশে লেখার উপর আমার কিছু মাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে সত্যের চারিদিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোন দিকই

ভাল করিয়া দেখাইতে পারে না—তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়া যায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থতঃ যে দ্রব্য যেরূপ, ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড় করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোট করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছ গুলি আয়তনে ছোট। একজন যদি কোন ছবিতে সব গাছ গুলি সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না—অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড় করিয়া না আঁকি, ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই—তবে তাহাতে কোন উদ্দেশ্যই ভাল করিয়া সাধিত হয় না; না সমস্তটার ভাল ছবি পাওয়া যায়, না এক অংশের ভাল ছবি পাওয়া যায়। এই জন্যই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ, তাহাই বড় করিয়া আঁক; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া—ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাট করিবার কোন আবশ্যক নাই।

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" নামক প্রবন্ধের লেখক এক দিক-হইতে ছবি আঁকিয়া তাঁহার নিকটের দিকটাকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন;—আবার বিপরীত দিকটাও দেখান আবশ্যক।

কবিতায় কৃত্রিমতা দোষার্হ, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন লেখক এই সাধারণ মত ব্যক্ত না করিয়া কতকগুলি বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই তাঁহার সহিত আমাদের মতান্তর উপস্থিত হয়। যখন তিনি বলেন, দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইলে কবিতা কৃত্রিম হয় ও আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা দেশ-কালপাত্র-বহির্ভূত হইতেছে, সুতরাং কৃত্রিম হইতেছে, তখনই তাঁহার সহিত আমরা সায় দিতে পারি না।

"দেশকালপাত্র" কথাটাই একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গা কুলা—উহার উপর দিয়া অনেক ছাই ফেলা গিয়াছে। কোন বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের তাহা খারাপ লাগিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন। যখন কোন যুক্তিই নাই, তখনো দেশকালপাত্র মাটি কামড়াইয়া আছে।

যাঁহারা দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া কোন পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই হয় ত নিজের যুক্তিতে নিজে মারা পড়েন। দেশ কাল পাত্রের কিছু হাত পা নাই—তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোন উপায় নাই। টলেমি দেশ কাল পাত্রের নাম করিয়া ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্য পৃথিবীকে অনায়াসেই ভৎর্সনা করিতে পারেন, কিন্তু গ্যালিলিও বলিবেন যে, আমরা এত ক্ষুদ্র ও পৃথিবী এত বৃহৎ, যে, পৃথিবী যে চলিতেছে, পৃথিবী যে একস্থানে দাঁড়াইয়া নাই ইহা আমরা জানিতেই পারিনা; বাস্তবিকই যদি পৃথিবী না চলিত, তবে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটিবেই বা কেন? তেমনি সমাজ-সংস্কার-বিরোধীরা কোন একটি পরিবর্ত্তন দেখিয়া যখন অন্য কোন যুক্তির অভাবে কেবল মাত্র দেশ-কাল পাত্রের উল্লেখ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের বিরোধীপক্ষীয়েরা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, দেশ কাল পাত্রের যে পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা তোমাকে কে বলিল? তাহাই যদি না হইবে, তবে কি এ পরিবর্ত্তন মূলেই ঘটিতে পারিত?

লেখক বলিতেছেন—আমাদের আধুনিক কবিরা দেশ কাল পাত্রের ব্যভিচার করিয়া কবিতা লেখেন। কি তাহার প্রমাণ? না আমাদের প্রাচীন কবিরা যে ভাবে কবিতা লিখিতেন, এখনকার কবিরা সে ভাবে কবিতা লেখেন না, কথাটা যদি সত্য হয় তবে তাহা হইতে কি ইহাই প্রমাণ হইতেছে না যে, বাস্তবিকই দেশ কাল পাত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; নহিলে কখনই লেখার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেই পারিত না! অতএব লেখক যদি বলেন, যে, প্রাচীন কবিরা যেরূপ লিখিতেন, আমাদেরও সেইরূপ লেখা উচিত—তাহা হইলে আর এক কথায় এই বলা হয় যে, দেশকালপাত্রের ব্যভিচার করিয়াই কবিতা লেখা উচিত।

ইংরাজি পড়িয়াই হউক্, আর যেমন করিয়াই হউক্, আমাদের মনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে সে নিশ্চয়ই। একবার লেখক বিবেচনা করিয়া দেখুন্ দেখি—তিনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা-বিন্যাস, তাহার ভাব-ভঙ্গী, তাহার রচনা প্রণালী, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গলা হইতে কত তফাৎ। তাঁহার প্রবন্ধটির অস্থি মজ্জায় ইংরাজি শিক্ষার ফল প্রকাশ পাইতেছে কি না, একবার মনোযোগ দিয়া দেখুন্ দেখি! অতএব, এই উপলক্ষে আমি কি বলিতে পারি যে, লেখক কষ্ট করিয়া মেহন্নত করিয়া, একটি ইংরাজি আদর্শ অবিরাম চক্ষের সম্মুখে খাড়া রাখিয়া উল্লিখিত প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন—তাহা তাঁহার হৃদয়ের সহজ বিকাশ, তাঁহার ভাষার সহজ অভিব্যক্তি নহে?

"আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচিনি ত তাহা কাহারো কাছে!
ভাঙ্গাচোরা হোক্, যা হোক, তা হোক্,
আমার হৃদয় আমারি আছে!
চাহিনে কাহারো মমতার হাসি,
ভ্রুকুটীর কারো ধারিনে ধার,
মায়াহাসিময় মিছে মমতায়
ছলনে কাহারো ভুলিনে আর!"
ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত কবিতার ভাব আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতায় কখনো দেখা যায় না। এবং ঐ শ্রেণীর কবিতা ইংরাজিতে

দেখা যায়। শুদ্ধ এই কারণেই কি আমি বলিতে পারি যে, কবি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া উক্ত কবিতা লেখেন নাই, ইংরাজেরা ঐ প্রকারের কবিতা লেখেন বলিয়া তিনিও কোমর বাঁধিয়া লিখিয়াছেন? আমি বলিব যে—"না, তিনি অনুভব করিয়াই লিখিয়াছেন।" তাহার পরে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রাচীন কবিরাই বা কেন এরূপ ভাব অনুভব করিতে পারিতেন না, এখনকার কবিরাই বা কেন করেন। সে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন, এবং ইতিহাস দেখিয়া তাহার বিচার হইতে পারে। ইহা যদি সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাচীন কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করিতেন, এখনকার কবিরা তাহা করেন না (কারণ, করিলে নিশ্চয়ই তাহা লেখায় প্রকাশ পাইত,) এবং এখনকার কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করেন, প্রাচীন কবিরা তাহা করিতেন না; তাহা হইলে কেমন করিয়া কবিদিগকে পরামর্শ দিব যে, যাহা তোমরা অনুভব কর না, তাহাই তোমাদিগকে লিখিতেই হইবে! বাস্তবিকই যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গলা দেশের বদ্ধ, স্থির, নিস্তরঙ্গ সমাজের মধ্যে সহসা এক তুমুল পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সমাজের কোন পাড় ভাঙ্গিতেছে, কোন পাড় গড়িতেছে, সমাজের কত শত বদ্ধমূল বিশ্বাসের গোড়া হইতে মাটি খসিয়া যাইতেছে, কত শত নূতন বিশ্বাস চারিদিকে মূল প্রসারিত করিতেছে, যখন আমাদের বাহিরে ওলট্‌পালট্, যখন আমাদের অন্তরে ওলট্‌পালট্, তখনো যে আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কবিদের কবিতার আঁচল ধরিয়া থাকিব, আমাদের কবিতার মধ্যে এই দুর্দ্দান্ত পরিবর্ত্তনের কোন প্রভাব লক্ষিত হইবে না—ইহা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক! লেখক যে একটি কল্পনার জেলখানা নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিতে চাহেন, দিশি ইঁট দিয়া তাহার প্রাচীর নির্ম্মিত হইবে বলিয়াই যে কবিরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে রাজি হইবেন, এমন ত বোধ হয় না।

আধুনিক কবিরা তাঁহাদের কবিতায় সমাজ-বিরুদ্ধ ভাবের অবতারণা করেন বলিয়া লেখক একস্থলে দুঃখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "সমাজ-উচ্ছেদকরী, শাসন-বিরহিত আড়ম্বরময় ভালবাসাবাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত ভাব? একটি অবিকৃত বঙ্গমহিলার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে যে, সে হৃদয় ভালবাসায় পরিপ্লুত, সে হৃদয় ভাদ্রমাসের পদ্মানদীর মত প্রেমে ভরপূর, প্রেমে উন্মত্ত, প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু প্রকৃত পদ্মার মত সে প্রেমে কোন কূলই সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে না। * * কিন্তু এই বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয় আধুনিক লেখকদের হাতে কতদূর পর্য্যন্ত না কলঙ্কিত হইয়াছে!" সে কি কথা! আমি ত বলি, বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয়-চিত্রের কলঙ্ক আধুনিক কবিদের দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা যে প্রেমের প্রবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন্ কূল অবশিষ্ট ছিল? "সমাজ-উচ্ছেদকরী

শাসন-বিরহিত" প্রেম আর কাহাকে বলে? বিদ্যা এবং সুন্দরের যে প্রেম তাহাতে কলঙ্কের বাকী কি আছে! সচরাচর প্রচলিত আমাদের দেশীয় প্রেমের গানে "অবিকৃত বঙ্গ মহিলার" মনোবিকার কিরূপ মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে? এখনকার কবিতায় ও উপন্যাসে যদিও বা সমাজ-বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাই কিন্তু রুচি-বিরুদ্ধ বীভৎস ভাব কয়টা দেখ? লেখক কি বলিবেন যে, প্রেমের সেই কানাকানি, ঢাকাঢাকি, লুকাচুরী, সেই শ্বাশুড়ি-ননদী-ভীতিময় পিরীতি, সেই মলয়, কোকিল, ভ্রমরের বিভীষিকা পূর্ণ বিরহ, সেই সুমেরু-মেদিনী সঙ্কুল ভৌগোলিক শরীর বর্ণনা, তাহাই আমাদের দেশজ সহজ হৃদয়ের ভাব, অতএব তাহাই কবিতায় প্রবর্ত্তিত হউক্—আর আজকালকার এই প্রকাশ্য, মুক্ত, নির্ভীক, অলঙ্কারবাহুল্য বিরহিত কালাপাহাড়ী ভাব, ইহা বিদেশীয় ইহা আমাদের কবিতা হইতে দূর হউক! সমাজের যথার্থ হানি কিসে হয়; গোপনে গোপনে সমাজের শিরায় শিরায় বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, না প্রকাশ্য ভাবে সমাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া?

প্রকৃত কথা এই যে, সমাজকে সমাজ বলিয়াই খাতির করা, এবং দেশকালপাত্রের অন্ধ অনুসরণ করিয়া চলা কবিরা পারিয়া উঠেন না। প্রবহমান সমাজের উপর যে সকল ফেনা, যে সকল তৃণ খণ্ড ভাসে তাহা ত আজ আছে কাল নাই, কবিরা সেই ভাসমান খড় কুটায় বাঁধিয়া তাঁহাদের কবিতাকে সমাজের স্রোতে ভাসান্ দিতে চান না। সেই স্রোতের বাহিরেই তাঁহারা ধ্রুব আশ্রয়ভূমি দেখিতে পান। সামাজিক নীতি ও সামাজিক নিয়ম প্রভৃতিরা সমাজের কাছে ঠিকা কাজে নিযুক্ত আছে—যত দিন তাহাদের আবশ্যক, ততদিন তাহারা মাহিয়ানা পায়, আবশ্যক ফুরাইলেই তাহাদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়—সমাজের সকল অবস্থায় তাহারা কাজ করিতে পারে না। সমাজের এই ঠিকা চাকরদের চাকরী করা কবিদের পোষায় না। এক কথায় বলিতে গেলে, কবিদিগকে অনেক সময়ে অসামাজিক হইতেই হইবে। কারণ, সমাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই—সমাজ যাহাকে ভাল বলে, তাহা মন্দের ভাল, তাহা বাস্তবিক ভাল নহে—আবার সমাজ স্বয়ং মন্দ বলিয়া অনেক ভালও সমাজের পক্ষে মন্দ হইয়াছে। কবিরা যথার্থ ভালকে ভাল বলেন, ও যথার্থ মন্দকে মন্দ বলিতে চাহেন, তাহাতে ফল হয় এই যে,—যাহাতে মন্দকে আমাদের চাকরী হইতে ছাড়াইয়া দিতে পারি, অর্থাৎ মন্দ আমাদের কাজে না লাগিতে পারে ক্রমে এমন অবস্থা হয়, আর ভালর উপযোগী হইতে পারি এইরূপ চেষ্টা করিতে পারি। নহিলে, ক্ষণিক ভালকে ভাল বলিয়া জানিলে, ও ক্ষণিক মন্দকে মন্দ বলিয়া জানিলে তাহারাই চিরস্থায়ী ভালমন্দরূপে পরিণত হয়—এবং ভালই হউক, মন্দই হউক, পরিবর্ত্তনের নাম মাত্র শুনিলেই আমরা ডরাইয়া উঠি। সমাজকে দাস ভাবে অনুসরণ করিয়া না চলিলে কবিদের এই একটি মহৎ উপকার হয়—

যখন সমাজের উপর দিয়া সহস্র বৎসরের পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, যখন এক সমাজ ভাঙ্গিয়া আর এক সমাজ গঠিত হইয়াছে, যখন চারিদিকে সকলি ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে—তখনও তাঁহাদের কবিতা দীপস্তম্ভের ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। নতুবা সমাজের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উঠিয়া পড়িয়া তাহারা কোথায় মিলাইয়া যায়।

শ্রী র:—

গান।

১

পাছে কেহ হাসে কথা শুনে,
পাছে কেহ উপহাস করে,
একটি হাসির উপেখায়
একেবারে যাই যে গো ম'রে!
মরম সরমে সারা কোন দিকে পথ নাই—
কেঁদে চারি দিক্ পানে চাই,
কেহ নাই কেহ নাই আর্
সম্মুখেতে কঠোর সংসার।
ভেঙে যায়, চুরে যায়, ডুবে যায়, নিবে যায়
জীবনের রাজ্য সমুদায়!
চেয়ে আছি অবাক্ হইয়া,
চেয়ে আছি পাগলের প্রায়!

২

দাও দাও ভেঙে ফেলে দাও
ভেঙে ফেলে দাও এই বুক,
হাসিয়া উড়ায়ে দাও সব,
তাহাতেও পাইব যে সুখ!
ভাঙা বীণা ছেঁড়াতার বাজেনা-বাজেনা আর,
দাও তারে ফেলে একধারে!
কখনো কাঁদিয়া যদি কোরে ওঠে হাহাকার
দেখনা—দেখনা তবু তারে!
হাস হাস যত প্রাণ চায়,
কর কর শত উপহাস,
নিবে যদি যায় একেবারে
নিবে যাক্ প্রাণের পিয়াস!

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বনবালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল্য ৸০ আনা।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে না আছে ইতিহাস, না আছে উপন্যাস। নভেলের সমস্ত কাঠ খড় আনা হইয়াছে, কেবল মূর্ত্তি গড়া হয় নাই।

হর-বিলাপ। শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই গীতিনাট্য খানিতে কতকগুলি সুন্দর গান আছে। পড়িতেই যখন ভাল লাগিতেছে, তখন সুর-সংযোগে শুনিলে আরো ভাল লাগিবার কথা। এই গ্রন্থখানি অভিনয়ের যোগ্য কি না বলিতে পারি না, কারণ ইহাতে উপাখ্যান ভাগ কিছুই নাই বলিলেও হয়, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠের যোগ্য ও গান গুলি গাহিবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

কমলে কামিনী বা ফুলেশ্বরী। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই গীতিনাট্য খানি পড়িতে তেমন ভাল লাগিল না। কমলে-কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্ত যে গান গাহিয়া উঠিয়াছে, সেই গানটিই পুস্তকের মধ্যে ভাল লাগিল।

কল্পনা-কুসুম। শ্রীমতী কামিনী-সুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

এই গ্রন্থখানি পড়িয়া স্পষ্টই মনে হয়, লেখিকার কবিত্ব শক্তি আছে। "অভাগিনীর বিলাপ" "নারদ" প্রভৃতি কতকগুলি যথার্থ কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীরাম-নারায়ণ অগস্তি প্রণীত। মূল্য ৷৷৵০ আনা।

কবিতাবলীর এই প্রথম ভাগ দেখিয়া দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আর বাসনা রহিল না। যে বন্ধু গ্রন্থকারকে এই কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি বাস্তবিকই বন্ধুর মত কাজ করেন নাই।

কুসুমারিন্দম। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।

এই উপন্যাস খানি পড়িয়া আমরা

বিস্মিত হইলাম। ইহার আদ্যোপান্ত এ- ছেলেমানুষী প্রকাশ পাইয়াছে, আবার কটা ঘোরতর বিশৃঙ্খল গোলমাল। ইহার স্থানে স্থানে লেখকের ক্ষমতা ব্যক্ত হই- অনেক জায়গায় বাস্তবিকই লেখকের য়াছে।

গান।

১

নিশীথ বাঁশীর স্বর
ক্রমে হ'য়ে ক্ষীণতর
দিগন্তের কোলে গিয়ে যেমন মিলায়,
জীবন-লহরী-মালা
করিতে করিতে খেলা
তেমনি কালের কোলে মিশাইয়া যায়।

২

যাবে যাবে সব যাবে,
কোথা যাবে—কোথা যাবে,
জীবনের শেষ কথা কোথা অবসান!
কোথা আমি জীবনের যাব শেষ গান!
এসেছি বা কোথা হ'তে,
যাব শেষে কোন্ পথে,
দাও দাও দাও বোলে! ব্যাকুল পরাণ!

৩

বল বল কেন ফুল ফোট?
বল বল কেন পাখী গাও?
বল বল কেন চাঁদ হাস?
বল নদী কেন ছুটে যাও?

৪

চিরকাল কেন কেন, এক কথা কেন কেন
কেনতেই হবে অবসান।
আকাশ ভেদিতে চাই, কেন বল নাহি পাই;
কেন বল ফিরে আসে প্রাণ?

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মেঘনাদবধ কাব্য।

আমাদের সমালোচকগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "মেঘনাদ বধ" একটি এপিক্ অর্থাৎ মহাকাব্য।

এক্ষণে দেখা যাউক্ য়ুরোপীয় এপিক্ ও আমাদের মহাকাব্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, উহাদের মুখ্য তাৎপর্য্য একই কি না এবং "এপিক কাব্যের"স্থলে আমরা "মহাকাব্য" প্রয়োগ করিতে পারি কি না।

প্রসিদ্ধ ইংরাজি আলঙ্কারিক Hugh Blair বলেনঃ—" এপিক্ কবিতার প্রকৃতি সহজভাবে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, কবিতার আকারে কোন প্রসিদ্ধ মহানুষ্ঠানের আবৃত্তি করা"। তিনি আরও বলেন ঃ—

"মনুষ্যের পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কল্পনার পরিসর বৃদ্ধি করা, কিম্বা আর এক কথায়, আমাদিগের বিস্ময় ও ভক্তি রসের (Admiration) উদ্রেক করাই এপিক্ কবিতার উদ্দেশ্য। বীরোচিত ক্রিয়া-কলাপ এবং উন্নত চরিত্রের বর্ণনা ভিন্ন এই উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইতে পারে না। কারণ মনুষ্য মাত্রই উন্নত চরিত্রের ভক্ত ও পক্ষপাতী। এই সকল রচনায় বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, ধর্ম্ম ঈশ্বরভক্তি, উদারতা প্রভৃতি উন্নত ভাব সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত হইয়া আমাদিগের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আনীত হয় এবং এই রূপে সাধু লোকদিগের প্রতি আমাদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সঙ্কল্পে ও তাহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় আমাদিগের ঔৎসুক্য ও মমতা জন্মে, আমাদিগের হৃদয়ে উদার জনহিতকর ভাবসকল জাগরিত হয়, ইন্দ্রিয়-কলুষিত হীন কার্য্যের চিন্তা সকল অপসারিত হইয়া আমাদিগের মন নির্ম্মল হয় এবং উন্নত ও বীরোচিত মহানুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদিগের হৃদয় অভ্যস্ত হয়।" "বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে গেলে এপিক্ কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে—প্রথমতঃ, কাব্যগত বিষয় কিম্বা কার্য্য সম্বন্ধে—দ্বিতীয়তঃ, কর্ত্তা কিম্বা পাত্রদিগের সম্বন্ধে—তৃতীয়তঃ, কবির আখ্যান ও বর্ণনা সম্বন্ধে।

এপিক কবিতাগত কার্য্যের তিনটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। কার্য্যটি এক হইবে, মহান্ হইবে এবং উপাদেয় হইবে।" এই তো গেল য়ুরোপীয় এপিকের সার মর্ম্ম। এক্ষণে আমাদিগের আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের কিরূপ লক্ষণ দিয়াছেন, দেখা যাউক।

সাহিত্য দর্পণে আছে :—"কাণ্ড-বিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক, হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্তগুণান্বিত কোন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে। সৎকুলোদ্ভব একবংশজাত কতক গুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তি এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। বৃত্তান্তটি ইতিহাসোদ্ভব বা সজ্জনাশ্রয় হইবে। উহাতে সমস্ত চতুর্ব্বর্গ ফল কিম্বা কোন একটি ফল থাকিবে। উহার আদিতে নমস্কার আশীর্ব্বাদ কিম্বা বস্তুনির্দ্দেশ থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধুদিগের গুণকীর্ত্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্যে একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে। কখন কখন উহাতে নানা ছন্দময় সর্গ দৃষ্ট হয়। উহা নাতি স্বল্প ও নাতি দীর্ঘ হইবে। উহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবি সর্গের কথা সূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, ঋতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে কিম্বা বৃত্তান্তের নামে কিম্বা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধ্যে যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়, তাহারই নামে সর্গের নাম হইবে। মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত যথা, রঘুবংশ, শিশুপালবধ, নৈষধ ইত্যাদি। আর্ষ্য মহাকাব্যকে আখ্যান বলে। যথা, মহাভারত।"

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহার মর্ম্মগত তাৎপর্য্য কি, তাহার প্রাণগত ভাব কি—সে বিষয়ের কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উহাতে কেবল বাহ্য আকার ও বাহ্য উপকরণের কথাই আছে।

এপিক কাব্যের যে সকল লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপিক কাব্যগত বিষয়টি এক হইবে, মহান্ হইবে এবং উপাদেয় হইবে। যদিও সাহিত্যদর্পণকার ঠিক এই রূপ কথায় মহাকাব্যের লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে য়ুরোপীয় এপিকের সার মর্ম্মটি কোন প্রকারে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ আপনা হইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে য়ুরোপীয় এপিককাব্যের কার্য্যগত একত্বও সূচিত হইতেছে। তাহার পর, সাহিত্যদর্পণে যে আছে :—সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য্য, রণপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাব্যে বর্ণনীয়—তাহার তাৎপর্য্য এই, একটি মহৎ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় করিতে হইলে কাব্য মধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক। উক্ত লক্ষণগুলি এপিক কাব্যের লক্ষণের সহিত

সাধারণতঃ একরূপ মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাহিত্য দর্পণ যে বলিয়াছেন, শৃঙ্গার রসও মহাকাব্যের অঙ্গী হইতে পারে—এই কথাটিতে একটু গোল বাধে। কারণ, শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকিলে এপিক কাব্যের মহান্ গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইতে পারে কি না এবং উহাতে মহৎ ও উচ্চ ভাবের তেমন স্ফূর্ত্তি পায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। সে যাহাই হউক—এপিক কাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক—ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত য়ুরোপীয় এপিকের আদর্শেই তাঁহার মেঘনাদবধকাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব য়ুরোপীয় এপিকের লক্ষণ অনুসারেই আমরা তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক মেঘনাদ বধ কাব্যের কার্য্যটি এক কি না। অ্যারিষ্টটল বলেন, কার্য্যের একত্ব এপিক্ কবিতার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা নিশ্চিত, যে-উপন্যাস এক ও অখণ্ড, যাহাতে ঘটনাগুলি পরস্পরের উপর পরস্পর লম্বমান, এবং একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ঘটনাই উন্মুখ—তাহাতে পাঠকের যতদূর মনোরঞ্জন হইতে পারে, তাঁহার হৃদয় যতদূর আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-নিরপেক্ষ ঘটনার বর্ণনায় কখনই হইতে পারে না। অ্যারিষ্টটল আরও বলিয়াছেন, এই একত্ব একজন মনুষ্যের কার্য্যকলাপে বদ্ধ থাকিলেই হইবে না, কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের ঘটনা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, কিন্তু রচনার বিষয়টির মধ্যেই একত্ব থাকা আবশ্যক। বড় বড় এপিক কাব্য মাত্রেই কার্য্যের একত্ব উপলব্ধি হয়। ইটালি দেশে ঈনিয়সের বাসস্থাপন—এই বিষয়টি ব-র্জ্জিলের কাব্যগত বিষয়। ঐ কাব্যের আদ্যোপান্তে ঐ উদ্দেশ্যটি জাজ্বল্যমান। অডিসির একত্বও এই একই প্রকৃতির। অর্থাৎ স্বদেশে য়ুলিসিসের প্রত্যাগমন ও পুনর্বসতিই উহার উদ্দেশ্য। এখিলিসের ক্রোধ ও তদুদ্ভূত ফলাফল ইলিয়ড্ কাব্যের বিষয়। অথৃস্টানদিগের নিকট হইতে জেরুসালেম উদ্ধার করা ট্যাসোর এবং স্বর্গ হইতে আদমের বহিষ্করণ মিল্টনের রচনাগত বিষয়। ঐ সকল-কাব্যেই উপন্যাসের একত্ব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধসাধন কিম্বা শক্তিশেলাহত লক্ষণের পুনর্জীবন লাভ—উহার কোন্‌টি কাব্যগত বিষয় তাহা বুঝা নাও যাইতে পারে। কারণ কবি মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন নাই; তাহার পরেও লক্ষণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। অ্যারিষ্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক, মেঘনাদবধকাব্যের বর্ণিত কার্য্যটি বৃহৎ ও মহৎ কি না। কার্য্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলে

সেই সঙ্গে সেই কার্য্যের কর্ত্তাকে অর্থাৎ নায়ককেও মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান করা যায়। যদিও সমস্ত রামায়ণের মধ্যে সীতা-উদ্ধারই সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান, তথাপি মেঘনাদের বধসাধনরূপ কার্য্যকে কবিবর মধুসূদন তাঁহার নিজ কাব্যে প্রাধান্য দেওয়ায় বিশেষ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যেহেতু সীতা উদ্ধারের পক্ষে মেঘনাদ বধ একটি প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায়; যে মেঘনাদের প্রতাপে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সর্ব্বদাই সশঙ্কিত, তাহাকে বধ না করিতে পারিলে সীতা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হইত। কিন্তু কবি, লক্ষ্মণ কিম্বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নায়করূপে নির্ব্বাচন করায় তাঁহার কাব্যগত মহত্ত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কিম্বা ইন্দ্রজিৎ পাশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল কিন্তু যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়া ন্যায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, সেই বীরত্বগুণে ভূষিত উন্নতচরিত্র মহাপুরুষই মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক যে কে তাহা আমরা কাব্যের নাম মাত্র পাঠেই অবগত হইতে পারি না। কারণ কাব্যখানির নাম মেঘনাদ বধ, উহাতে মেঘনাদকেও নায়ক বুঝাইতে পারে এবং মেঘনাদবধের কর্ত্তা লক্ষ্মণকেও নায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে, আসল নায়ক ধরা পড়ে কোথায়?—না, যেখানে কবি লক্ষ্মণ ও মেঘনাদকে একত্র আনিয়াছেন। লক্ষ্মণকে তস্কর ও সর্পের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করাইয়া কাপুরুষের ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে নিরস্ত্র অথচ বীরদর্পে দর্পিত মেঘনাদকে বধ করাইয়া লক্ষ্মণের চরিত্র যার-পর-নাই হীন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং মেঘনাদকে উদারতা ও বীরত্ব গুণে ভূষিত করিয়া নায়ক-স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদের পরাজয়েও জয় হইয়াছে এবং লক্ষণের জয়েতেও বাস্তবিক পরাজয় হইয়াছে। কেহ বলিতে পারেন, এ বিষয়ে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত—তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার কাব্যের নায়ক করিতে পারেন, এবং তাঁহার পাত্রদিগকে যেরূপ করিয়া ইচ্ছা আঁকিতে পারেন। এবিষয়ে Blair যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ কথা। তিনি বলেন, সকল পাত্রকেই যে সৎচরিত্র করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই—স্থল বিশেষে অসম্পূর্ণ চরিত্র—এমন কি,পাপিষ্ঠ,চরিত্রেরও অবতারণা করা যাইতে পারে—কিন্তু কাব্যের যাহারা কেন্দ্রস্থল, সেই নায়কদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া যাহাতে পাঠকের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার উদ্রেক না হইয়া প্রত্যুত বিস্ময় প্রীতি ও ভক্তিরসের উদয় হয়, এরূপ ভাবে রচনা করা কবির নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মাইকেল মধুসূদনের পক্ষে এ দোষটি নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। আপনার ছাগকে কেহ মুণ্ডের দিক দিয়াই কাটুক কিম্বা লেজের দিক দিয়াই কাটুক, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি না হইলেও হইতে পারে কিন্তু যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন

নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি,তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন? মূল গ্রন্থে যে সকল চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন—তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির আরাধ্য দেবতা—সেই রাম লক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রাম লক্ষ্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে না—মহাকাব্যের উপযুক্ত অতবড় মহান চরিত্র রামায়ণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কাব্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া রাবণ কিম্বা মেঘনাদকে নায়ক করিবার তো কোন অর্থই পাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ, চরিত্রচিত্রে কবিবর মধুসূদনের ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদকে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই, যাহা কিছু তাঁহার চরিত্র স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে সে সেই যজ্ঞাগারের দৃশ্যে। তাঁহার পাত্রদিগের চরিত্রে সূক্ষ্ম প্রভেদ সকল উপলব্ধি হয় না। রাবণও বীর—মেঘনাদও বীর—রাবণও বিলাসী, মেঘনাদও বিলাসী। প্রভেদের মধ্যে একজন পিতা, আর একজন পুত্র। যেমন এক জাতীয় হইলেও প্রত্যেক লোকের মুখশ্রী বিভিন্ন—সেইরূপ সাধারণতঃ এক প্রকৃতির হইলেও প্রত্যেক লোকের চরিত্রে সূক্ষ্ম তারতম্য ও বৈষম্য লক্ষিত হয়। এই বৈষম্যগুলি পরিস্ফুটরূপে চিত্র করিতে পারিলে কবির বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে ব্যাস অদ্বিতীয়। য়ুরোপীয় কবিদিগের মধ্যে এই অংশে হোমর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার নীচে ট্যাসো। মেঘনাদবধ কাব্যে যতগুলি পুরুষ চরিত্র আছে তন্মধ্যে রাবণের চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রস্ফুটিত ও আত্মসঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু মূল রামায়ণে যেরূপ রাবণের দুর্দ্ধর্ষ প্রচণ্ড ভাব উপলব্ধি হয়, মেঘনাদ বধ কাব্যে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। মূল রামায়ণেও তাঁহার বিলাপ আছে বটে কিন্তু তাঁহার শোক ও রোষের ভাব এমন নিপুণরূপে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার চরিত্রগত ভীষণ গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। মূল রামায়ণে রাবণের বিলাপ বর্ণনা করিতে করিতে একস্থলে আছে যে রাবণের নেত্র হইতে কিরূপ অশ্রু পতিত হইতেছিল?—না, যেমন জ্বলন্ত দীপশিখা হইতে তপ্ত তৈল বিন্দু বিন্দু স্খলিত হয়। এই একটি উপমাদ্বারা রাবণের রোষদীপ্ত শোক কেমন জ্বলন্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্র কেমন সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া দানব-বালা প্রমীলা যে সময়ে পতি দর্শনে যাত্রা করিতেছেন সে দৃশ্যটি অতি চমৎকার—তাহা পাঠকের মনকে বীরভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

সমস্ত মেঘনাদবধকাব্যে প্রমীলার চরিত্র বেশ নিপুণরূপে চিত্রিত হইয়াছে। দেব দেবীগণের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া মেঘনাদ বধকাব্যে অনেক সময় দেবোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মেঘনাদ বধ কাব্যের কার্য্যটি মহান্ হইলেও, তৎসম্পর্কীয় পাত্রদিগের চরিত্রের মহত্ত্ব তেমন সুন্দর রূপে বিকশিত হয় নাই। ঐ বৃহৎ কার্য্যটি সাধন করিবার জন্য যে সকল সরঞ্জামের আবশ্যক, তাহা খুব জম্‌কালো হইয়াছে সন্দেহ নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইতে তাহার বিস্তৃত আয়োজন অত্যন্ত ঘটা করিয়া আহরণ করা হইয়াছে। বলিতে কি, মেঘনাদবধকাব্যে সরঞ্জাম ও কৌশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল কথা, চরিত্রের মহত্ত্ব বিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা মেঘনাদ বধ কাব্যে কোথায় ?

অবশেষে দেখা যাক্—মেঘনাদ বধ কাব্য আখ্যান ও বর্ণনা-অংশে উপাদেয় হইয়াছে কিনা। কাব্যগত কার্য্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলেই যে উপাদেয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই। কারণ, কেবল মাত্র সাহসের কার্য্যগুলি, যতই কেন বীরোচিত হউক না—নীরস ও বিরক্তিজনক হইতে পারে। কিন্তু কবিবর মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কাব্য মধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া, দেবদেবী প্রভৃতি অলৌকিক সরঞ্জাম (machinery) আনয়ন করিয়া, দুই একটি সুন্দর প্রকরী (Episode) প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং যাহাকে এপিক কবিতার পাকচক্র বলে (Intrigue) সেই নায়কদিগের বাধা বিঘ্ন সকল যথোপযুক্ত রূপে কাব্য মধ্যে বিন্যাস করিয়া তাঁহার কাব্যটিকে একরূপ বেশ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

এপিক কাব্যগত আখ্যান-বিন্যাসের দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। কবি আপনার মুখেই সমস্ত উপন্যাসটি বর্ণনা করুন কিম্বা তাঁহার কাব্যগত বিষয়ের পূর্ব্ব ঘটনা গুলি তাঁহার পাত্রদিগের মুখেই বর্ণনা করুন তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কবিবর হোমর তাঁহার ইলিয়াডে প্রথমোক্ত প্রথাটি ও তাঁহার অডিসিতে দ্বিতীয়োক্ত প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনও তাঁহার কাব্যগত মূল বিষয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আনুসঙ্গিক ঘটনাগুলি সীতা ও সরমার কথোপকথনে ব্যক্ত করিয়া সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। যদিও মাইকেল মধুসূদন চরিত্র চিত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন নাই কিন্তু বাহাদৃশ্যগুলি একরূপ মন্দ চিত্রিত করেন নাই; তাঁহার অনেকগুলি ছবি বেশ সজীব ও জ্বলন্ত। আমার বোধ হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা তিনি লৌকিক দৃশ্যগুলি চিত্রিত করিতে অধিক সফল হইয়াছেন। তাঁহার চিত্রকর্ম্মের প্রণালী এই যে তিনি প্রত্যেক খুঁটি নাটি ধরিয়া চিত্র করেন—দুই একটি পোঁচ দিয়া চিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার রাবণের সভাবর্ণনা—যুদ্ধক্ষেত্র বর্ণনা—লঙ্কাপুরী বর্ণনা—রণপ্রয়াণের বর্ণনা পাঠ করিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে। তাঁহার ভাষায় এপিক

কবিতাসুলভ তেজস্বিতা ও বেগবত্তা আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাঁহার পাত্রদিগের কথা বার্ত্তায় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নাই—অকৃত্রিম আবেগ নাই—কেমন সকলেই অভিনয় করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। উত্তরপ্রত্যুত্তর গুলি বেশ কাটাকাটা, সাজানো-গোছানো, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের অভাব উপলব্ধি হয়। উহাতে প্রেমের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের স্থলে নাগরিক রসিকতা, প্রকৃত শোকের স্থলে আড়ম্বরময় বিলাপ, এবং প্রকৃত বীরত্বের স্থলে বীরত্বের আস্ফালনই অধিক প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বর্ণনায় আমাদের কবি অধিকাংশ স্থলে পুরাতন কবিদিগেরই অনুসরণ করিয়াছেন—নূতন ভাব অতি অল্পই আছে। সেই কোকিল সেই ভ্রমর সেই পদ্মিনী সেই চকোর। তাঁহার উপমাগুলি অনেক সময় কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়, অনেক সময়ে মনে হয় উপমা দিবার জন্যই উপমা দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়ে তিনি অযথা-স্থলে "যথা" প্রয়োগ করিয়া রসভঙ্গ করেন। সাধারণতঃ বলিতে গেলে, অলঙ্কারের আড়ম্বরে তাঁহার কবিতায় সরল সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি পায় না। যে সর্গে সীতা, সরমার নিকট তাঁহার পূর্ব্ব কাহিনী বলিতেছেন—সেই সর্গটি অতি চমৎকার—উহার অনেক অংশে স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার রচনায় কুরুচি প্রকাশ পায়। তাঁহার নরক-বর্ণনা অত্যন্ত বীভৎস জনক। যদিও ইনিয়ড় ও মিল্টনেও কোন কোন স্থলে ঐরূপ বীভৎস-জনক বর্ণনা আছে, তাই বলিয়া উহা অনুকরণীয় নহে। কোন ইংরাজ সমালোচক বলেন ইনিয়ডের তৃতীয় সর্গান্তর্গত হার্পিদিগের উপন্যাস এবং প্যারাডাইসলষ্টের দ্বিতীয় "বুকের" অন্তর্ভূত পাপ ও মৃত্যুর রূপকটি উক্ত দুইটি প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হইত।

কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উহা সুখপাঠ্য। বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের সমাবেশ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণে, অত বড় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদিগের ক্লেশ বা ক্লান্তি বোধ হয় না, প্রত্যুত আমোদ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে যে আমোদ পাই—সাধারণ মানবপ্রকৃতিসুলভ আড়ম্বরপ্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজ পথে ঘোরঘটা করিয়া, বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া, যখন চাকচিক্যময় গিল্টির সাজে সুসজ্জিত কোন প্রতিমাকে বাহির করা হয়—তখন যেরূপ সেই দৃশ্য সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়—মেঘনাদবধ কাব্য পড়িয়া অনেক সময়ে আমরা যে আমোদ পাই, সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ঐ প্রকারের আমোদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কারে উহা পরিপূর্ণ। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু সে আ-

মোদ উচ্চ দরের নহে, উহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে বটে কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু একটি কথা শেষে বলা আবশ্যক। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদের সাহিত্য রাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব সংসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হাস্যাস্পদ প্রয়োগ থাকিলেও শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতা সাধন করিয়া সাধারণতঃ তিনি বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আর যদি কিছুরই জন্য না হয় অন্ততঃ এই উপকারটির জন্য তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনন্ত মরণ।

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে ল'য়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
আমি মৃত্যু, তুমি মৃত্যু, মৃত্যু সকলেই,
হাসে খেলে, মৃত্যু চারি পাশে!
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ!

যতটুকু বর্ত্তমান, তারেই কি বল প্রাণ?
সে ত শুধু পলক নিমেষ!
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে র'য়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ!
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ ম'রে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে!

এই জীবনের তলে কত যে মরণ আছে
আজ আমি ভাবিতেছি তাই!—
শৈশবে যা ছিনু আমি হাসিতাম খেলিতাম,
আজ আমি আর তাহা নাই!
কাল যাহা ছিনু তাহা কাল দিবসের সাথে
না জানি কোথায় গেছে চ'লে,
সে আমি কোথায়গেছে! তারা সব মরে গেছে,
আছে এই জীবনের তলে!
এই মুহূর্ত্তের নীচে কত বরষের দেহ,
কত বরষের মৃত হাসি,
মৃত সুখ, মৃত আশা, মৃত স্নেহ ভালবাসা,
রহিয়াছে মৃত্যু রাশি রাশি!
তাই আমি ভাবি ব'সে,(হাসি আপনার মনে,)
মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি?
জীবন ত মৃত্যুর সমাধি!

শৈশবের মৃত-আমি, কালিকার মৃত-আমি,
প্রতি নিমেষের মৃত-আমি,
রয়েছে আমারি মাঝে, দেখ দেখি একবার
জীবনের মাঝখানে নামি!
কখন বা সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝে যাই মোরা
জীবনের সমাধি-ভবনে,
মৃত-শৈশবের তরে আঁখি হতে বারি ঝরে,
মুখ তার পড়ে বুঝি মনে!
সাধের দিবস গুলি যেখানেতে শুয়ে আছে
সেখানেতে ভ্রমিয়া বেড়াই,
পরিশ্রান্ত হৃদয় জুড়াই!

এক মুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে,
মরণের সমষ্টি কেবল?
একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ!
নাম নিয়ে এত কোলাহল!
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে,
নক্ষত্রের কিরণ-নিবাসে।

ভাবিতেছি কল্পনায়, কত কাল গেছে চলে,
বয়ক্রম সহস্র বরষ,
মরণের স্তরে স্তরে অতি দীর্ঘ—দীর্ঘ প্রাণ,
কোন্ শূন্য করেছে পরশ!
হয়ত গিয়েছি আমি, কত শত গ্রহ ছুঁয়ে,
বৃহস্পতি গ্রহের মাঝারে,
জীবনের এক প্রান্ত রয়েছে পৃথিবী মাঝে
শেষ প্রান্ত বৃহস্পতি পারে!
একেলা র'য়েছি বসি, সহস্র মরণ রাশি,
দীর্ঘকায় মরণ তাপস!

সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে, অন্ধকার ফুটিতেছে
শ্রান্ত দেহ হয়েছে অবশ।—
শুধু দেখিতেছি চেয়ে সুদীর্ঘ জীবন ক্ষেত্রে,
অতীতের দিগন্তের পানে,
অতিক্ষীণ দেখা যায় পৃথিবী জ্যোতির কণা
জড়িত রয়েছে সেইখানে,
তারি পানে কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে—
হয়ত সহসা কি কারণে,
আজিকার যে মুহূর্ত্তে এত কথা ভাবিতেছি
এ মুহূর্ত্ত পড়িবে স্মরণে!
পৃথিবীর কত খেলা, পৃথিবীর কত কথা,
পরাণেতে বেড়াইবে ভেসে,
পৃথিবীর সহচর না জানি কোথায় তারা
গেছে কোন্ তারকার দেশে!
হয়ত পড়িবে মনে, পৃথিবীর প্রান্তে বসি
গেয়েছিনু যে কয়টি গান,
সে গানের বিম্ব গুলি হয়ত এখনো ভাসে
ধরার স্রোতের মাঝখান!
ভাবিয়া, হাসিব মৃদু হাসি,
ভাবিয়া, ফেলিব অশ্রু-রাশি!

সহস্র বরষ পরে, সেই গ্রহ মাঝে বসি,
না জানি গাহিব সে কি গান!
কি অনন্ত মন্দাকিনী না জানি ছুটিবে,যবে
খুলে যাবে সে বিশাল-প্রাণ!
মরণের সঙ্গীত মহান্!
হয়ত বা সে নিশীথে কবি এক পৃথিবীতে
চেয়ে আছে মোর গ্রহ পানে;
মহান্ সঙ্গীত ধারা গ্রহ হতে গ্রহে ঝরি
পশিবেক তাহার পরাণে!

বিস্ফারিত করি আঁখি শিহরিত কলেবরে
শুনিবে সে আধ-শোনা গান,
কত কি উঠিবে মনে ব্যক্ত করিবার তরে
আকুল ব্যাকুল হবে প্রাণ!
আপনার কথা শুনে আপনি বিস্মিত হবে,
চাহিয়া রহিবে অবিরত
নিদ্রাহীন স্বপ্নটির মত!
নয়নে পড়িবে অশ্রুজল,
বুঝিবেনা, শুনিবে কেবল!

মরণ বাড়িবে যত কোথায়—কোথায় যাব
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার!
উঠিবে জীবন মোর কতনা আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশি,
যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি!
কবেরে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব জগতে জগতে!
আমার মরণ-ডোর দিয়ে
গেঁথে দেব জগতের মালা,
রবি শশি একেকটি ফুল,
চরাচর কুসুমের ডালা!
তোরাও আসিবি ভাই, উঠিবিরে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন!
আমাদের মরণের জালে
জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
এ অনন্ত আকাশ সাগরে
দশ দিক রহিব ঘেরিয়া!
পড়িবে তপন তায়, চন্দ্রমা জড়ায়ে যাবে,
পড়িবেক কোটি কোটি তারা
পৃথ্বী কোথা হ'য়ে যাবে হারা!
আয় ভাই সব যাই ভুলি,
সকলে করিরে কোলাকুলি!
সে কিরে আনন্দ মহোৎসব,
জগতেরে ফেলিব ঘেরিয়া,
আমাদের মরণের মাঝে
চরাচর বেড়াবে ঘুরিয়া!

জয় হোক্ জয় হোক্ মরণের জয় হোক্
আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ!
এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু,
লইলাম তোমার শরণ,
এস তুমি এস কাছে, স্নেহ কোলে লও তুলে,
পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,
আমাদের করহে পালন!
বাড়িব তোমার স্নেহে, নববল পাব দেহে,
ডাকিব হে জননী বলিয়া,
তোমার অঞ্চল ধরি জগতের খেলাঘরে
অবিরাম বেড়াব খেলিয়া!
হেথা নাবি হোথা উঠি করিব রে ছুটাছুটি,
বেড়াইব তারায় তারায়,
সুকুমার বিদ্যুতের প্রায়!
আনন্দে পূরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব,
কার নিমন্ত্রণে মোরা, মহা যজ্ঞে এসেছিরে
উঠেছে মহান্ কলরব!

যে ডাকিছে ভাল বেসে, তার চিনিস্‌নে শিশু?
তার কাছে কেন তোর ডর,
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ ত নহে তোর পর!
আয়, তারে আলিঙ্গন কর,
আয়, তার হাত খানি ধর!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

ষট্ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বহুদিনের পর উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন কিন্তু আগেকার মত তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদা মহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার যে কি হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিস্কৃতি দিবেন এমন ত বোধ হয় না। আমার কি কুক্ষণেই জন্ম হইয়াছিল! তিনি বসন্তরায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে ফিরিয়া যাই।" প্রথম প্রথম বসন্তরায় গান গাহিয়া, হাসিয়া এ কথা উড়াইয়া দিলেন; তিনি গাহিলেন।

আর কি আমি ছাড়্‌ব তোরে!
মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম
জোর কোরে রাখিব ধরে।
শূন্য ক'রে হৃদয় পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরী
তুমিই তবে থাক সেথায়
শূন্য হৃদয় পূর্ণ কোরে!

অবশেষে উদয়াদিত্য বারবার কহিলে পর বসন্তরায়ের মনে আঘাত লাগিল তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্ণ মুখে কহিলেন, "কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?" উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্মনা দেখিয়া বসন্তরায় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, গান গাহিতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন—উদয়াদিত্যের জন্য প্রায় তাঁহার রাজকার্য্য বন্ধ হইল। বসন্তরায়ের ভয়, পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন. পাছে, উদয়াদিত্য আবার যশোহরে চলিয়া যান। দিন রাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন, "দাদা, তোকে আর সে পাষাণ-হৃদয়ের দেশে যাইতে দিবনা।"

দিন-কতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল

হইয়া আসিল। অনেক দিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সঙ্কীর্ণ-প্রসর পাষাণ ময় চারিটি কারাভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্তরায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে, তাঁহার অসীম স্নেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেক দিনের পর চারিদিকে গাছ পালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখীর গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত তাহারা দূর দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গঙ্গাধর আসিল, ফটিক আসিল, হবিচাচা ও করিম্ উল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরাণ ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দ্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচ জন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই, তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, "মহারাজ, আপনি যে মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে আমার এই ছেলেটি জন্মায় আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্ব্বাদে আমার আরো দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে।" বলিয়া সে তাহার তিন ছেলেকে যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, "প্রণাম কর।" তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরাণ আসিয়া কহিল, "এখান হইতে যশোরে যাইবার সময় হজুর যে নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।" শীতল সর্দ্দার আসিয়া কহিল, "মহারাজ আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠিখেলা দেখিয়া বক্‌ষিস্ দিয়াছিলেন, আজ, ইচ্ছা আছে, একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এস ত বাপধন, তোমরা এগোওত।" বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ প্রত্যহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত। মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া বসন্তরায় আসিয়া গান গাহিতেছেন,

"আজ আমার আনন্দ দেখে কে!
কে জানে বিদেশ হতে কে এসেছে!
ঘরে আমার, কে এসেছে!
আকাশে উঠেছে চাঁদা,
সাগর কি থাকে বাঁধা,
বসন্তরায়ের প্রাণে ঢেউ উঠেছে!"

"দাদা, এ গান আমি নিজে বাঁধিয়াছি!" বসন্তরায় খাঁ সাহেবকে ডাকিয়া এই গান তাহাকে শুনাইলেন, ও কহিলেন

"খাঁ সাহেব, এ গান আমি নিজে বাঁধিয়াছি!" খাঁ সাহেব গান বাঁধার অনেক তারিফ করিলেন, বসন্তরায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোক বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়ত রাগ করেন নাই, তিনি হয়ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এত দিন আর কি কিছু করিতেন না!

কিন্তু এইরূপ চোক-বাঁধা বিশ্বাসে বেশী দিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদামহাশয়ের জন্য মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে ফিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বৃথা; তিনি স্থির করিলেন একদিন লুকাইয়া যশোহরে পালাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা, আর কোথায় সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন! কারাগারের সেই প্রতি মুহূর্ত্তকে এক এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জ্জন, বায়ুহীন, বদ্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পালাইতে হইবে। আজই পালাইব, এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না—"একদিন পালাইব" মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে।

আজ দিন বড় খারাপ। সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্তরায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্তরায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভাল মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন—যেন জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হইতেছে!"

উদয়াদিত্য বসন্তরায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, দাদামহাশয়।—ছাড়াছাড়ি যদিবা হয়, ত জন্মের মত কেন হইবে?"

বসন্তরায় অন্য দিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, "তা' নয়ত আর কি! কত দিন আর বাঁচিব বল্, বুড়া হইয়াছি!"

গতরাত্রের দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্তরায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় ত কি হইবে!"

বসন্তরায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া

কহিলেন, "কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস্‌নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস্‌নে ভাই!"

উদয়াদিত্যের চখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন;—তাঁহার মনের অভিসন্ধি যেন বসন্তরায় কি করিয়া টের পাইয়াছেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটিবে দাদা মহাশয়!"

বসন্তরায় হাসিয়া কহিলেন—"কিসের বিপদ ভাই! এ বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি! মরণের বাড়া আর বিপদ নাই! তা, মরণ যে আমার প্রতিবেশী; সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বুড়া বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তীরে আসিয়া তাহার নৌকা ডুবি হইলই বা?"

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্তরায়ের সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্তরায় কহিলেন—"দাদা, কোথায় যাস্!"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"একটু বেড়াইয়া আসি।"

বসন্তরায় কহিলেন—"আজ নাই বা গেলি।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"কেন, দাদা মহাশয়?"

বসন্তরায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হ'স নে, আজ তুই আমার কাছে থাক্ ভাই!"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি অধিক দূর যাব না দাদা মহাশয়, এখনি ফিরিয়া আসিব।" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন প্রহরী কহিল, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাইব?"

যুবরাজ কহিলেন—"না, আবশ্যক নাই।"

প্রহরী কহিল—"মহারাজের হস্তে অস্ত্র নাই!"

যুবরাজ কহিলেন "অস্ত্রের প্রয়োজন কি?"

উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটা দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে, দিনের আলো মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মনে কত কি ভাবনা উঠিল! যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্য হীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছুই স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই—পরের মুহূর্ত্তেই কি হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে—কোথাও ঘর বাড়ি না বাঁধিয়া, কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই সুদূর-বিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া কিরূপে কাটিবে? তাহার পর মনে পড়িল—বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে? এত কাল আমিই তাহার সুখের সূর্য্য আড়াল করিয়া বসিয়াছিলাম—এখন কি সে সুখী হইয়াছে? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন!

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ, বট, খেজুর, সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে—যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে। যুবরাজের আজ পালাইবার কথা ছিল—সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। বসন্তরায় যখন শুনিবেন, উদয়াদিত্য পালাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে—তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখে কেমন করিয়া বলিবেন—"অ্যাঁ! দাদা, আমার কাছ হইতে পালাইয়া গেল," সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে এক জন রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"এই যে গা, এই খানে—তোমাদের যুবরাজ এই খানে!"

দুই জন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে চিনিতে পার কি গা! একবার এই দিকে তাকাও!" যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্যগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "দূর হ মাগী!" সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল—"এ সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে? আমি আনিয়াছি! আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি—"যুবরাজ ঘৃণায় রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ রুক্মিণীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া তফাৎ করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"মুক্তিয়ার খাঁ! কি খবর!"

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল "জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি!"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি আদেশ!"

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত আদেশ পত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, "ইহার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কি? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেইত আমি যাইতাম! আমিত আপনিই যাইতেছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এখনি চল। এখনি যশোহরে ফিরিয়া যাই!"

মুক্তিয়ার খাঁ হাত যোড় করিয়া কহিল—"এখনি ফিরিতে পারিবনা!"

যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন—"কেন?"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"আরেকটি আ-

দেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া যাইতে পারিবনা।"

যুবরাজ ভীত স্বরে কহিলেন—"কি আদেশ!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমকিয়া উচৈস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "না, করেন নাই, মিথ্যা কথা!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।"

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন "মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্তরায়ের——আমি যখন আপনি ধরা দিতেছি, তখন আর কি! আমাকে এখনি লইয়া চল,এখনি লইয়াচল—আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চল, আর বিলম্ব করিও না!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"যুবরাজ, আমি ভুল বুঝিনাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ। তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা, চল, যশোহরে চল। আমি মহারাজার সম্মুখে তোমাদের বুঝাইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন, তবে আদেশ সম্পন্ন করিও।"

মুক্তিয়ার যোড় হস্তে কহিল, "যুবরাজ, মার্জ্জনা করুন, তাহা পারিবনা!"

যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া কহিলেন "মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি এক কালে সিংহাসন পাইব। আমার কথা রাখ, আমাকে সন্তুষ্ট কর!"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন—"মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ, নিরপরাধী, পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবেনা!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই!"

উদয়াদিত্য উচ্চৈস্বরে কহিয়া উঠিলেন "মিথ্যা কথা! যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাহা বলে, সে ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা! নিশ্চয় জানিও মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ!"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি গড়ে ফিরিয়া যাই। তোমার সৈন্য সামন্ত লইয়া সেখানে যাইও—আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সে খানে রণ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিও!"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্যগণ অধিকতর ঘেঁসিয়া আসিয়া যুবরাজকে ঘিরিল। যুবরাজ কোন উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে

চীৎকার করিয়া উঠিলেন "দাদা মহাশয়, সাবধান!" বন কাঁপিয়া উঠিল—মাঠের প্রান্তে গিয়া সে সুর মিলাইয়া গেল। সৈন্যেরা আসিয়া উদয়াদিত্যকে ধরিল। উদয়াদিত্য আর এক বার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দাদামহাশয়, সাবধান!" একজন পথিক মাঠ দিয়া যাইতেছিল—শব্দ শুনিয়া কাছে আসিয়া কহিল "কে গো!" উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন—"যাও যাও—গড়ে ছুটিয়া যাও—মহারাজকে সাবধান করিয়া দাও," দেখিতে দেখিতে সেই পথিককে সৈন্যেরা গ্রেফ্‌তার করিল। যে কেহ সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল—সৈন্যেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েক জন সৈন্য উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিয়ার খাঁ এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাধিক দ্বার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যাকালে, বসন্তরায় বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ির ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁক ঘণ্টা বাজিতেছিল। বৃহৎ রাজবাটিতে কোন কোলাহল নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ। বসন্তরায়ের নিয়মানুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছু ক্ষণের জন্য ছুটি পাইয়াছে।

আহ্নিক করিতে করিতে বসন্তরায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"খাঁ সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিও না। আমি এখনি আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি।"

মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্তরায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "খাঁ সাহেব, ভাল আছত?"

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ মহারাজ!"

বসন্তরায় কহিলেন—"আহারাদি হইয়াছে?"

মুক্তিয়ার—"আজ্ঞা হাঁ।"

বসন্তরায়—"আজ তবে, তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই!"

মুক্তিয়ার কহিল—"আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনি যাইতে হইবে!"

বসন্তরায়—"না, তা' হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে!"

মুক্তিয়ার—"না, মহারাজ শীঘ্রই যাইতে হইবে!"

বসন্তরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভাল আছেত?"

মুক্তিয়ার—"মহারাজ ভাল আছেন।"

বসন্তরায়—"তবে, কি তোমার কাজ, শীঘ্র বল। বিশেষ জরুরি শুনিয়া উদ্বেগ

হইতেছে। প্রতাপের ত কোন বিপদ ঘটে নাই!"

মুক্তিয়ার—"আজ্ঞা না, তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই। মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।"

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি আদেশ—এখনি বল!"

মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশ পত্র বাহির করিয়া বসন্তরায়ের হাতে দিল। বসন্তরায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্যগণ দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্তরায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি প্রতাপের লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল "হাঁ।"

বসন্তরায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব,এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল—"হাঁ মহারাজ!"

তখন বসন্তরায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন "খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন—অবশেষে আবার কহিলেন, "প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল, আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম—সে আমাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না! সেই প্রতাপ, বড় হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম—তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম—সেই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব?"

মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল—সে অধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্তরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল "তিনি বন্দী হইয়াছেন—মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।"

বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন—"উদয় বন্দী হইয়াছে? বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না?"

মুক্তিয়ার খাঁ যোড়হাত করিয়া কহিল—"না, জনাব, হুকুম নাই!"

বসন্তরায় সাশ্রুনেত্রে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন—"একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব!"

মুক্তিয়ার কহিল—আমি আদেশ পালক ভৃত্য মাত্র।"

বসন্তরায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"এ সংসারে কাহারো দয়ামায়া নাই, এস সাহেব—তোমার আদেশ পালন কর!"

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া যোড় হস্তে কহিল—"মহারাজ, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র—আমার কোন দোষ নাই।"—

বসন্তরায় কহিলেন—"না সাহেব—তোমার দোষ কি?—তোমার কোন দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জ্জনা করিব কি?"

বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন—কহিলেন, "প্রতাপকে বলিও, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখ খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধী—দেখিও অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়!"

বলিয়া বসন্তরায় চোক বুজিয়া ইষ্ট দেবতার নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন—ও কহিলেন "সাহেব, এইবার!"

মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, "আবদুল।" আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল—গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য আহার স্পর্শ করিলেন না—কাহারো সহিত একটি কথাও কহিলেন না—কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্থির—তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই—কেবলি ভাবিতেছেন। নৌকায় উঠিলেন—নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কানে প্রবেশ করিল—তবুও কিছুই শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলি ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল—নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল, কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোট ছোট তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে—যুবরাজ একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া—সুদূর-প্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল—নৌকা খুলিয়া দিল—উষার বাতাস বহিল—পূর্ব্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসাইয়া হুহু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন—আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন—নৌকা চলিতে লাগিল—তীরের গাছপালাগুলি মেঘের মত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল—চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল—বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"যুবরাজ, কি ভাবিতেছেন!" যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন—অনেক ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধ প্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন—"ভাবি-

তেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কি করিলাম! আমার জন্য কি সর্ব্বনাশই হইল! হে বিধাতা, যাহারা দুর্ব্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না—যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে—তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে তাহাকেই ডুবায়—পৃথিবীর সকল কাজেই বাধা দেয়—নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর সকলকেও ভারাক্রান্ত করে।—আমি একজন দুর্ব্বল ভীরু, ঈশ্বর আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহারা সংসারের আনন্দ ছিল সংসারের ভরসা ছিল—আমার জন্য তাহাদেরই বিনাশ করিলেন? আর না, এসংসার হইতে আমি বিদায় লইলাম।"

উদয়াদিত্য বন্দীভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব্বশরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল—তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?"

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করেন।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না—আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।"

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কি করিয়া জানিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"দুর্ব্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব—আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না—সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"তুমি তবে কি চাও।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না—কেবল আমাকে পিঞ্জর-রুদ্ধ পশুর মত পায়রে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনি কাশী চলিয়া যাই! আর একটি ভিক্ষা—আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন—আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

সেই দিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন—"মা কালী, তুমি সাক্ষী থাক, তোমার পা ছুইয়া আমি শপথ করিতেছি—যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না—যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদা মহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারাণী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, "বাবা উদয় আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল্।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সে কি কথা মা! তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্যাসী হইয়া থাকিবি—তোকে সেখানে কে দেখিবে? তোর পিতা পাষাণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না!" মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভাল বাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্য তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন "মা, তুমি ত জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার প্রতি পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে—তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই!"

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন—"বিভা, দিদি আমার, কাশী যাইবার আগে তোকে আমি সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শ্বশুর বাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে!"

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, দাদা মহাশয় কেমন আছেন?"

"দাদা মহাশয় ভাল আছেন।" বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল। অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কহিলেন, "বাবা, বিভাকে ত লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অযত্ন করে!"

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেন মা, তাহারা অযত্ন করিবে কেন?"

মহিষী কহিলেন, "কি জানি, তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে!"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"না, মা, বিভা ছেলে মানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখন রাগ করিতে পারে ?"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন—"বাছা, সাবধানে লইয়া যাইও, যদি তাহারা অনাদর করে, তবে আর বিভা বাঁচিবে না !"

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে—দেখিলেন, এখনো শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম স্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কি আছে তা' কে জানে !

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন—পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাঁদিলেন না, তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অন্যান্য গুরু জনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন—"বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে !" রাজ বাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড় ভাল বাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন, এ বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—রক্তপিপাসু কঠোর-হৃদয় রাজবাটি আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্ব্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল ! তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব্ব পারে বনান্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা ঊর্দ্ধশিখা হইয়া উঠিয়াছে ; গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে—লোক জন জাগিয়া উঠিয়াছে, মাঝীরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল, প্রশান্ত, পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখীদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন "জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পাই আর সরল-প্রাণদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি !"

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝীদের গান

ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্ত হৃদয়ে আনন্দের উষালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখ চক্ষে অরুণের দীপ্তি। সে যেন এত দিনের পর একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে ? কে তাহাকে ডাকিয়াছে ? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিতেছে—বিভা ছোট পাখীটির মত ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্ত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ন্যায় মৃদুস্বরে তাহাকে কতকি কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল বিভার তাহাই ভাল লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিকে দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। কি সুন্দর শোভা ! কুটীরগুলি দেখিয়া,লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কি সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল, সকলকেই তাহার ভাল লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-এক জন দরিদ্র দেখিতে পাইল, বিভা মনে মনে কহিল, "আহা, ইহার এমন দশা কেন ? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।" সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ রাজ্যে যে দুঃখদারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটিতে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন কাল প্রাতে লোক পাঠান' যাইবে—বিভার মনের ইচ্ছা—আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ লোকজনরা ভারি ব্যস্ত। চারিদিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটা উৎসব পড়িয়াছে। একে বিভার প্রাণে অধীর আনন্দ জাগিতেছে, তাহার পরে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া, আনন্দ-কোলাহল শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই জন্য কত কষ্টে

সে হাসি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে! উদয়াদিত্য নদীতীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কি হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কাহাদের নৌকা গা?" নৌকা হইতে রাজবাটির ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল—"কেও? রামমোহন যে? এস এস!" রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকায় প্রবেশ করিল। নৌকায় একলা বিভা বসিয়া আছে। রামমোহনকে দেখিয়াই বিভা হর্ষে উচ্ছলিত হইয়া কহিল—"মোহন।"

রামমোহন কহিল—"মা।"

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ, হাসি হাসি মুখ খানি অনেকক্ষণ দেখিয়া ম্লান মুখে কহিল—"মা, তুমি আজ আসিলে?"

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল—"হাঁ মোহন। মহারাজ কি ইহারি মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস্?"

রামমোহন কহিল—"না মা, অত ব্যস্ত হইও না—আজ থাক'—আর এক দিন লইয়া যাইব।"

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল—"কেন মোহন, আজ কেন যাইব না!"

রামমোহন কহিল—"আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—আজ থাক্ না।"

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল "সত্য করিয়া বল্ মোহন, কি হইয়াছে?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না! আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেই খানেই সে বসিয়া পড়িল—কাঁদিয়া কহিল—"মা জননি, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই—তোমার রাজবাটিতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।"

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল তাহার হাত পা হিম হইয়া গেল।—রামমোহন কহিতে লাগিল "মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা? তখন তুই নিষ্ঠুর পাষাণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না, বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না!"

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না,—মাথা ঘুরিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া, রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তৃষার্ত্ত-হৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

বিভা ধীরে ধীরে কহিল—"মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন—আমার আসিতে কি বড় বিলম্ব হইয়াছে?"

মোহন কহিল "বিলম্ব হইয়াছে বৈকি।"

বিভা অধীর হইয়া কহিল—"আর কি মার্জ্জনা করিবেন না?"

মোহন কহিল—"মার্জ্জনা আর করিলেন কই?"

বিভা কহিল—"মোহন, আমি কেবল একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল—"আজ থাক্ না মা।"

বিভা কহিল—"না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।"

রামমোহন কহিল—"যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন্।"

বিভা কহিল—"না মোহন, আমি এখনি একবার যাই।" বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন্।

রামমোহন কহিল—"তবে একখানি শিবিকা আনাই।"

বিভা কহিল—"শিবিকা কেন? আমি কি রাণী, যে শিবিকা চাই! আমি একজন সামান্য প্রজার মত, একজন ভিখারিণীর মত যাইব—আমার শিবিকায় কাজ কি?"

রামমোহন কহিল—"আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না!"

বিভা কাতর স্বরে কহিল—"মোহন, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে আর বাধা দিস্ নে—বিলম্ব হইয়া যাইতেছে!"

রামমোহন ব্যথিত হৃদয়ে কহিল—"আচ্ছা, মা, তাহাই হউক্!"

বিভা সামান্য রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভৃত্যেরা আসিয়া কহিল—"এ কি মা, এমন করিয়া এ বেশে কোথায় যাও!"

রামমোহন কহিল—"এ ত মায়েরি রাজ্য—যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই যাইতে পারেন!"

ভৃত্যেরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চারিদিকে লোক জন, চারিদিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সঙ্কোচে মরিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহার চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্তই যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। চারিদিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁসাঘেঁসি—কিছুই যেন কিছু নয়। চারিদিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্য্যন্ত—চারিদিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্য্যন্ত—তাহার যেন একটা কোন অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুরীর দ্বারের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধরিয়া বিভাকে নিবারণ করিল—তখন সহসা বিভা এক মুহূর্ত্তে বাহ্য জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল—চারিদিক দেখিতে পাইল—লজ্জায় মরিয়া গেল। রামমোহন আগে আগে যাইতেছিল; সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল—অদূরে ফর্ণাণ্ডিজ্

ছিল, সে আসিয়া দ্বারীকে ধরিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অন্যান্য প্রজা, অন্যান্য দাস দাসীর ন্যায় বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল কেহ তাহাকে ডাকিল না, কেহ তাহাকে সমাদর করিল না!

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাঁড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই? ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস্?"

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রু পূর্ণ নেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"না মহারাজ, আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি! আমি তোমাকে পরের হাতে দিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি!"

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল—"মহারাজ, আপনার মহিষী যশোহরের রাজকুমারী।"

সহসা রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ যেন কেমন চমকিয়া উঠিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর-কণ্ঠে কহিল—"কেন, এখন কি আর দাদাকে মনে ধরেনা না কি?"

রামচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন—তিনি ভাবিলেন—বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল—সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল—চোক বুজিয়া মনে মনে কহিল—মা গো, বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও! কাতর হইয়া চারিদিকে চাহিল—রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল!

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস্!"

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—"মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম! তোমার মহিষী, আমার মাঠাকরুণকে বেটা অপমান করিল—উহার হইয়াছে কি, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া সহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম, রামমোহন!"

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন—"কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না! যশোর হইতে যে হউক্—এক-জন ভিক্ষুক আসিয়া মহিষী বলিয়া পরিচয় দিলেই হইল!"

বিভা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন রামমোহন যোড় হস্তে রাজাকে কহিল—"মহারাজ,আজ চার পুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরী করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মাঠাকরুণকে অপমান

করিলে, তোমার রাজ্য-লক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে—আজ আমিও তোমার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম—আমার মাঠাকরুণের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব তবুও এ রাজবাটির ছায়া মাড়াইব না।" বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল—"আয় মা, আয়! এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া আয়!" বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেক গুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

উপসংহার।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশী চলিয়া গেল। সেইখানে দান, ধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে লাগিল। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কাশীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি সেই হাটের নাম রহিয়াছে—

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।"

সমাপ্ত।

প্রলয়।

পৃথিবীর বুঝি একটি পুটিমাছের প্রাণ, তাই হাতের টিপে সকলে এক এক বার ইহাঁর প্রাণ পরীক্ষা করিতে যান। কখন যে ইহাকে কার হাতে মরিতে হয় বেচারা সদাই ভয়ে ভয়ে সারা। একবারে মরিয়া গেলে ছাই বিপদ চুকিয়া যায়—তাহাও হইবে না, কাপুরুষের মৃত্যু ভয়ের ন্যায়—সদাসর্ব্বদা ভয়ে ভয়েই পৃথিবী মরিতেছেন। কেন না লোকের কথায় ইহার মৃত্যু, লোকও অগণ্য, কথা ফেলিতেও মূল্য লাগে না, সুতরাং পৃথিবীর আর নিস্তার নাই। তা যদি পৃথিবীর একার ঘাড়ের উপর দিয়াই সব চুকিয়া যাইত, তো কোন গোলযোগ ছিল না, দিনের মধ্যে সহস্রবার করিয়া মারিয়া পোড়াইতে গেলেও আমরা কথা কহিতম না, দুঃখের মধ্যে পৃথিবী

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও টানেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই যে কতবার আমরা পৃথিবীকে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিতে দেখিলাম, পৃথিবীর কত ফাঁড়াই যে উতরিয়া গেল, তাহার ঠিক নাই। মাদার শিপটন, ন্যায়চাঁদ পরামানিক, গোবর্দ্ধন দাস, প্রভৃতি বাজে লোকের কথায় তো অসংখ্যবার পৃথিবীকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইয়াছে, তাহার পর বৈজ্ঞানিক বড় বড় লোকের দোহাই দিয়াও অনেকে অনেক্ বার ইহার প্রতি অস্ত্র তুলিতে ত্রুটি করেন নাই। এই রূপে এক ধূমকেতু হইতে কতবার যে পৃথিবীর প্রলয় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে এই কারণে পৃথিবীর প্রলয়ের যেরূপ দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল সে রূপ বোধ হয় আর কখন হয় নাই। একটি কথা উঠিল, অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ লালাঁদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, সেই খৃষ্টাব্দে মে মাসের ২০ কিম্বা ২১ তারিখে একটি ধূমকেতু আঘাতে পৃথিবী নষ্ট হইবে। কথাটা উঠিবার তাৎপর্য্য এই মাত্র দেখা যায়—যে সকল ধূমকেতু পৃথিবীতে পৌছিতে পারে—তাহাদের সম্বন্ধে ফ্রান্সের বিজ্ঞান সভায় লালাঁদ একটি বক্তৃতা পাঠ করিবেন, এইরূপ একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতেই কথা উঠিয়া গেল ১২ মে পৃথিবী ধূমকেতু আঘাতে নষ্ট হইবে! সকলে থরহরি কাঁপিতে লাগিল—লালাঁদ এই আশঙ্কা নিবারণ কবিবার জন্য আবার বিজ্ঞাপন দিলেন—"যে সকল ধূমকেতু পৃথিবীতে পৌছিতে পারে, এবং তাহার গতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধে লালাঁদের আর কিছু বলিবার সময় নাই—তিনি এই টুকু মাত্র বলিতেছেন—এইরূপ সংস্রবের সময় নির্ণয় করা অসম্ভব। সম্প্রতি যে ধূমকেতু আঠার বৎসর পরে উদয় হইবে তাহা দ্বারা পৃথিবীর অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই।"

এই বিজ্ঞাপনে সাধারণ অশিক্ষিত ফরাসীদিগের কিছুই শান্তি হইল না—২৪ ঘণ্টা প্রার্থনা করিয়া এই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে সকলে প্যারিসের আর্চ বিসপকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, বিসপ অগত্যা তাহাতে সম্মতি দিয়া আবার হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। ফরাসী তত্ত্বজ্ঞানী ভলতেয়ার সেই প্রলয়ের ধূমকেতু সম্বন্ধে এই রূপে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন—

"কতকগুলি প্যারিসবাসী যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী (Philosopher) নহেন, এবং কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে, যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানী হইবার সময়ও নাই, তাঁহারা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, পৃথিবীর শেষ দিন আসিতেছে, এবং বেওজর এই পৃথিবী মে মাসের বিশ তারিখে লয় পাইবে।

"যে ভবিষ্যদ্বাণী কখনো করা হয় নাই, বিজ্ঞান সভার এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী হইতে তাঁহারা এই প্রত্যাশা করিতেছেন যে, সেই দিন আমাদের পৃথিবীর উপর একটি ধূমকেতু পড়িয়া ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। এই ঘটনা হইতে আর

কোন ঘটনাই অধিক সম্ভাব্য নহে। কারণ জেমাস্ বারনুই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ধূমকেতু আবার ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া প্রলয় বাধাইবে—তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়াছিলেন যে 'সত্য বলিতে কি তাহার শিরোভাগ হইতে কোন আশঙ্কা নাই, তাহার পুচ্ছই বিধাতার রোষের অব্যর্থ সন্ধান হইয়া আসিবে।' জেমস বারনুই যে ভ্রম করিয়াছিলেন তাহা আর বিশেষ কি—তাহা ৫৪ বৎসর তিন দিনের প্রভেদ বইতো নয়!

"এরূপ সামান্য ভুল অঙ্কশাস্ত্র-বিশারদগণ এই অনন্তকালের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত মনে করেন। বিশেষে কিম্বা অন্য কোন বৎসরে পৃথিবীর শেষ দিনের যে আশা করা যাইতেছে ইহা যে অতীব যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রত্যক্ষ। তবে যদি তাহা না হয়, নাই হইল—একটা ঘটনা ঘটিতে বিলম্ব হইল বলিয়া যে, তাহা একেবারেই ঘটিবে না, তাহা নহে। ("ce qui est differè nest pas perdu")

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আবার বিয়েলার ধূমকেতু পৃথিবীর উপর পড়িবে বলিয়া কথা উঠিল—কিন্তু তাহা হইতে সেবার জনসাধারণে একটা বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইবার আগেই কথাটি চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু আবার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই রূপ এক আশঙ্কায় ইংলণ্ড কম্পমান হইয়া উঠিল। কথা উঠিল, সুইস্ জ্যোতির্ব্বেত্তা প্ল্যানটামুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১২ অগষ্টমাসে পৃথিবী একটি ধূমকেতু আঘাতে বিনষ্ট হইবে। কি কথা হইতে যে কি কথা ওঠে আশ্চর্য্য! প্ল্যানটামুরের অপরাধের মধ্যে উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"অগষ্টমাসের ১০।১১ ও ১২ই তারিখে যে সকল উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে, তাহারা একটি ধূমকেতুর অনুচর, সেই ধূমকেতুটির কক্ষ পৃথিবীর অতি সন্নিকট" ইহা হইতে কেমন করিয়া ভয়ের কথা উঠিল তাহা বুঝা অসম্ভব। এই আশঙ্কা নিবারণ করিতে জ্যোতিষীগণ বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, ধূমকেতুর কক্ষটি নিকটে বলিয়া পৃথিবীর অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখন এই আশ্বাস বাক্য ভস্মে ঘৃতাহুতি হইতে লাগিল। সাধারণে একবার শুনিয়াছে পৃথিবীর অনিষ্ট হইবে আর রক্ষা আছে—তাহারা জ্যোতিষীগণের কথার বিরুদ্ধে সগর্ব্বে বলিতে লাগিল—"বিশেষ গণনা দ্বারা প্ল্যানটামুর জানিয়াছেন ১২ অগষ্ট ধূমকেতু আঘাতে পৃথিবী নষ্ট হইবে ইহার কি অন্যথা হইতে পারে!"——একজন শুনিয়াছিল তাহার মাসি মরিয়াছে, হঠাৎ মাসিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল মাসি তুই নাকি মরেছিস? মাসি বার বার তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন তিনি মরেন নাই, মরিলে আর স্বয়ং তিনি কি করিয়া সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবেন—কিন্তু তথাপি তাহার বোনঝির কোন মতে বিশ্বাস হইল না সে বলিল—

তাহা কি করিয়া হইবে—তুই নিশ্চয়ই মরিয়াছিস তা নহিলে কথা ওঠে!" ইংলণ্ডের সাধারণ লোকে তাহাই করিল। ফ্র্যাঙ্কেন্‌ষ্টাইন একবার ভূত জীবিত করিয়া তাহাকে পুনরায় মারিতে যেরূপ মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন জ্যোতিষীদিগেরও সেই দশা ঘটিল।

এইরূপে কতবার যে পৃথিবী যাই যাই হইয়াছেন তাহার তালিকা দিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়। সম্প্রতি জ্যোতিষী প্রকটারের ধূমকেতু সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ হইতে পৃথিবীর আসন্ন মৃত্যুর যে একটি দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করা যাউক। প্রকটারের সেই প্রবন্ধ হইতে ১৫ বৎসর পরেই সকলে পৃথিবীকে লয় পাওয়াইতে বসিয়াছিলেন। আশঙ্কা এত প্রবল হইয়াছিল যে আমার বন্ধু চন্দ্রশেখর বাবু ত সমস্ত কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পারত্রিক চিন্তার ধ্যানে অহরহ নিমগ্ন ছিলেন। একটি কথা কহিতে গেলে মুহূর্ত্তের জন্য ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিতেন "ক্ষমা কর আর কদিনই বা আছে—ইহার মধ্যে আর সাংসারিক চিন্তাকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।" ম্যানচেস্টারের বিসপ ত এই সুযোগে একটি বিষম বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আসন্ন শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন। ইংলণ্ডের স্পেকটেটর প্রভৃতি বড় বড় কাগজে এই প্রবন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল, চারিদিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, পৃথিবীকে অকালে গঙ্গাযাত্রা করাইবার সমস্তই আয়োজন হইয়া গেল, খাটে উঠান মাত্র বাকী রহিল।

প্রকটারের কি কথা হইতে যে এত হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল এইবার দেখা যাউক।

সকলেই জানেন, বহুকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে এক একটি তারকাকে সহসা অল্প দিনের জন্য অত্যুজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তি পাইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি দুই বৎসর পূর্ব্বে মাত্র Northern Crown তারকারাশির একটি তারকা ঐ রূপে সহসা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। একটি ধূমকেতু প্রপাতই এই আকস্মিক দীপ্তির কারণ অনুমান করিয়া প্রকটার তাঁহার প্রবন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন—ঐ তারকা যদি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জীবপূর্ণ গ্রহ উপগ্রহ বেষ্টিত হয় তো সহসা উহার উত্তাপালোকের প্রাচুর্য্যে সেই জীবগণের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অন্য স্থানে আবার বলিয়াছেন যদি কখনো বহু-উল্কাবিশিষ্ট ধূমকেতু আমাদের সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে তো হঠাৎ সূর্য্যের উত্তাপ আলোক বৃদ্ধি হইয়া আমাদের পৃথিবীর জীবগণের প্রাণ নাশ করিবে। পরে আর এক স্থানে বলিতেছেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুটির কক্ষ যেরূপ ছোট হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ তাহার কেন্দ্রাতিগ গতি যেরূপ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে সে দুই একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণের পরেই সূর্য্যে মিশাইয়া যাইবে।" প্রকটারের তিনস্থানের এই তিনটি কথাকে একত্রে আনিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর উদয় কাল যখন আর ১৫ বৎসর পরে আসিতেছে তবে ঐ সময় উহা সূর্য্যে মিশাইয়া পৃথিবীর জীব জন্তু বিনাশ করিবে। সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত তাহার অবশ্য কোন সন্দেহ নাই—তবে কি না প্রকটার যাহা বলেন নাই, তাহা তাঁহার মুখে না বসাইলেই ভাল হইত। প্রকটার বলিয়াছেন বটে বহু-উল্কাপিণ্ড বিশিষ্ট কোন ধূমকেতু আমাদের সূর্য্যের উপর পড়িলে সেই দ্রুত গামী পিণ্ডের গতিবেগ জনিত উত্তাপে আমাদের পৃথিবী জীব শূন্য হইয়া পড়িবে কিন্তু তিনি কোন স্থানে একথা বলেন নাই যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু হইতে তাহা হইবে। কেন না তাঁহার মতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত যেরূপ বহু-উল্কাবিশিষ্ট ধূমকেতু সূর্য্যে পড়া আবশ্যক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু সেরূপ নহে। এস্থলে বলা আবশ্যক ধূমকেতুর শরীর সূর্য্যে পড়িয়া ভস্ম হইলেই যে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, যতই সে সূর্য্যের নিকট আসিতে থাকে ততই তাহার শরীরের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং সেই বেগ হইতেই উত্তাপ জন্মে। এই ধূমকেতুটি সূর্য্যে পড়িলেও যে পৃথিবীর কিছুমাত্র অনিষ্ট আশঙ্কা নাই তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ এই, এই ধূমকেতু ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫০ মাইল বেগে সূর্য্যের ছটা মুকুটের ৩ লক্ষ মাইল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যদি ইহা হইতে পৃথিবীর কোন

অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের সেই প্রভূত গতিবেগে তাহার আভাষ পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইতে সূর্য্যের স্বাভাবিক কোন বৈলক্ষণ্য হওয়া দূরে থাকুক সূর্য্য দ্বারা ধূমকেতুটিরই বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সূর্য্যের ছটা মুকুট মধ্যে বারম্বার বাধা পাইয়া ধূমকেতুটিরই গতি হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সাধারণের আশঙ্কা দেখিয়া প্রকটার যখন সেই ভুল ভাঙ্গাইতে একটি প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য হইলেন—তখন তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুটি একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণের পর সূর্য্যে মিশাইবে ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইতে নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হইবে না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু হইতে ১৫ বৎসর পরে যে পৃথিবী বিনষ্ট হইতেছে না তাহা যেন সিদ্ধান্ত হইল—কিন্তু প্রকটার যে বলিয়াছেন বহু উল্কাপিণ্ড বিশিষ্ট ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িলে পৃথিবীর একদিন মৃত্যু হইবে তাহার উত্তর কি? আজ যেন পৃথিবী বাঁচিয়া গেল কিন্তু তাহার মরিবার সম্ভাবনা ত দূর হইল না। প্রকটারের প্রতিবাদে আশু আশঙ্কা একরূপ শমিত হইলে আবার কিছুদিন হইতে এইরূপ একটি দূর-কল্পিত আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। সত্য সত্য এরূপ হইলে মন্দ হইত না বটে, পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অনন্ত কালের জন্য আমরা সকলে পরিত্রাণ পাইয়া যাইতাম, কিন্তু দুঃখের মধ্যে তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। প্রকটার বলিতেছেন

বটে কোন বৃহৎ ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িয়া তাহার উত্তাপ বাড়িলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর অনিষ্ট হইবে, এবং একথা বলিতেও অবশ্য কোন দৈব জ্ঞানের আবশ্যক নাই, সূর্য্যে অস্বাভাবিক উত্তাপ বাড়িলে যে আমরা পুড়িয়া মরিব ইহা একজন শিশুও বলিতে পারে, কিন্তু ইহার সম্ভাবনা কতদূর? আমরা এইখানে দুই শ্রেণীতে প্রধানতঃ ধূমকেতুদিগকে জমা করিলাম—এক শ্রেণী সৌর পরিবার ভুক্ত, তাহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণী সৌর জগতের বাহিরে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সৌর জগতের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সৌর পরিবার ভুক্ত ধূমকেতু হইতেই প্রধানতঃ এইরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা করা যাইতে পারে, কেন না তাহারাই সূর্য্যের আকর্ষণের বিশেষ রূপ অধীন, যদি সূর্য্যের অধীনে বহু উল্কাবিশিষ্ট হানিজনক কোন ধূমকেতু থাকে ত কালে কোন কারণে তাহা হ্রস্বগতি হইয়া সূর্য্যে মিশাইতে পারে বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ অনিষ্টোৎপাদক ধূমকেতু সৌর জগতে একটিও দেখা যায় না,—প্রকটার বলেন হয় ত এরূপ ধূমকেতু কোন কালেই সৌর জগতে ছিল না, যদিও বা কোন কালে ছিল এমন হয়, ত তাহা বহু কাল পূর্ব্বে সৌর জগৎ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সৌর-পরিবার-ভুক্ত কোন ধূমকেতু হইতেই এইরূপ অনিষ্টের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। এখন দেখা যাক বাহিরের ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িবার কি রূপ সম্ভাবনা।

প্রকটার তাঁহার Myths and Marvels of Astronomyতে সৌরজগৎ বহির্ভূত ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িলে আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা এই অকাট্য সত্যটি বলিয়া আবার তাহাতেই লিখিয়াছেন—"We may dismiss as altogether unlikely the visit of a comet from the star depths to our sun on a course carrying the comet directly upon the sun's surface." প্রকটারের পূর্ব্ব লিখিত এইরূপ কথা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি তাঁহার প্রবন্ধে রঙ্গচ্ছলে ধূমকেতু লইয়া অনেকটা বকাবকি করিয়াছেন। প্রকটার তাঁহার প্রতিবাদ পত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন আর ১৫বৎসর কেন তাঁহার মতে আর ১৫ কোটী বৎসরেও পৃথিবীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই।

যদি কেহ বাস্তবিক মুহূর্ত্তের জন্যও সূর্য্যে ধূমকেতু প্রপাত দ্বারা কালে পৃথিবীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া থাকেন ভরষা করি এখন তাহা দূর হইবে।

কি কথা হইতে যে কি কথা ওঠে উপরের সমস্ত গল্পগুলি হইতে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সর ওয়াল্টর রলি কারাগারে বসিয়া পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে লিখিতে বাহিরে দুই জন মিস্ত্রিকে ঝগড়া করিতে দেখিয়াছিলেন—সেই দিনই অমনি প্রতিজনের মুখে ঐ এক ক্ষুদ্র ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন—তাঁহার ইতিহাস লিখিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইল, ভাবিলেন তাঁহার চক্ষের সামনে যাহা ঘটিল তাহারি যখন কারণের ঠিক নাই তখন অতীত কথার সত্যতার প্রমাণ কোথায়?" রলি যদি তাহাতেই আশ্চর্য্য হইয়া থাকেন, তো বৈজ্ঞানিকদিগের লিখিত একটি কথার মধ্য হইতে আর একটি কথা উঠিতে দেখিয়া কে না অধিক আশ্চর্য্য হইবে?

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

চণ্ডীদাস, বসন্তরায় ও বিদ্যাপতি।

প্রবন্ধের শীর্ষে যে তিনজন কবির নাম অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই জন পাঠকবর্গের সমক্ষে সুপরিচিত। বসন্তরায় দীর্ঘকাল বিদ্যাপতি বসনাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিলেন। সম্প্রতি জনৈক সুলেখক বিশেষ দক্ষতা সহকারে বসন্তরায়কে স্বাধীন ভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। গত কার্ত্তিক মাসে একখাটী একবার আমাদের হৃদয়ে ছায়ার ন্যায় উপস্থিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক যে মহাত্মা বসন্তরায়কে স্বতন্ত্র ভাবে সাহিত্য-জগতে দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি; কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল আমাদের নিকট বঙ্গবাসী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির প্রকৃত পরিচয় পাঠকদিগকে অর্পণ করেন। "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" সন্দর্ভে আমরা বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার কিয়দংশ রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। সেই সন্দর্ভের একস্থানে লিখিত হইয়াছে যে, দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতিকে বিসপী নামক এক গ্রাম দান করেন বিদ্যাপতির উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। রাজা শিবসিংহ নিজ ভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি-দত্ত দানপত্র দৃঢ় করণার্থে আপনি কবিকে একখানি দানপত্র দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর জনৈক বন্ধু সেই দানপত্র হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন।"

এই দুইটী শ্লোক ও মৈথিল পঞ্জি প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু সেই উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিথিলাপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় সেই সনন্দের একখণ্ড প্রতিলিপি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এস্থলে আমরা আমাদের প্রোক্ত সন্দর্ভ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। "শ্রীযুক্ত বিমস সাহেব তাঁহার "বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাপতির এক অদ্ভুত জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছেন! আমরা তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিদ্যাপতি ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্ভবত এই তারিখটীই সঙ্গত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলা ভাষা যেরূপ গঠিত হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার ভাষাও ঠিক সেইরূপ। তিনি ব্রাহ্মণ কুলজ। তাঁহার পিতার নাম ভবানন্দ। তাঁহার প্রকৃত নাম বসন্তরায়। একটী কবিতায় তিনি এই নামের ভণিতা দিয়াছেন। (১) ইঁহার নিবাস যশোহরের অন্তঃপাতি বরনাটোর (?) গ্রামে। বিদ্যাপতি তাঁহার আশ্রয় দাতা রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ ও ও লক্ষ্মী (লছিমা) দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী কবিতায় তিনি পাঁচজন গৌড়েশ্বরের (five Lords of Gour) চিরজীবন প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সকল নিদর্শন দ্বারা আমরা কবি বিদ্যাপতিকে নবদ্বীপবাসী লিখিতে পারি। বিদ্যাপতির পরে এই স্থানে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। রায় শিবসিংহ ও অন্যান্য "গৌড়েশ্বর" নদীয়া প্রদেশের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহার লিখিত ভাষা তৎকালে মালদহ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল।"

শ্রীযুক্ত বিমস সাহেব Indian Antiquary. নামক পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে (Vol. 11.) ইহা লিখিয়াছিলেন। তৎপরে রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে, তিনি পুনর্ব্বার উক্ত পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে (Vol. IV.) "Age and Country of Bidyapati." শীর্ষক প্রবন্ধে আত্মভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। যদিচ তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর ঐকমত্যে বিদ্যাপতিকে মিথিলাবাসী লিখিয়াছেন, তথাপি সকল স্থানে আত্মভ্রম সংশোধন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

"চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি
বিদ্যাপতি ভাণ॥"

বিদ্যাপতির এই পংক্তিটী লক্ষ্য করিয়া বিমস সাহেব প্রথম বারে বলেন যে, "একটী কবিতায় তিনি পাঁচ জন গৌড়েশ্বরের চির জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন।"

দ্বিতীয় বারে বলেন—"One point, however, I was wrong about, and must now abundon. From the expression in *Padakalpataru* 1317, *pancha Gouresvara.*" * * *

Mithila was always closely allied to Bengal, and was subject to it at the time of the introduction of the L. S. era. This accounts for our poet's salutation to the *pancha Gouresvar*', princes of Mithila being regarded as also princes of Gour or Bengal, The five princes are probably Sib Sinha and his four cousins Nara, Ratna. Raghu and Bhanu, the first of whom came eventually to be the ruling prince.

বিমস সাহেবের প্রথম বারের উক্তি লক্ষ্য করিয়া আমরা যাহা বলিয়াছি এ স্থলেও তাহাই উদ্ধৃত করিব। কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞ লেখকগণ এই পদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

বাবু সারদাচরণ মিত্র "বিদ্যাপতির পদাবলি" সংগ্রহের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"একস্থলে কবি শিবসিংহকে "পঞ্চগৌড়েশ্বর" বলিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে শিবসিংহ নৃপতি বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কোন হিন্দু নৃপতি গৌড় দেশ জয় করিয়াছিলেন একথা বলা সঙ্গত নহে। কিন্তু "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" শব্দ ব্যবহারে বোধ হয় শিবসিংহ রাজা প্রতাপশালী ছিলেন এবং গৌড় দেশের অন্যান্য রাজারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেন।" (২)

বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—"পঞ্চ গৌড়েশ্বর—সেন বংশীয়গণের রাজত্ব কালে গৌড় পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগিড়ি, রাঢ় ও মিথিলা।"

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এক্ষণেও বলিতেছি যে, আর্য্যাবর্ত্ত পঞ্চ গৌড় ও দাক্ষিণাত্য পঞ্চ দ্রাবিড় শব্দে আখ্যাত হইত। স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকৌৎকলাঃ। পঞ্চ গৌড় ইতি খ্যাতা—।" বিদ্যাপতি চাটুকর বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার আশ্রয়দাতা শিবসিংহকে "পঞ্চগৌড়েশ্বর" অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর লিখিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন বিমস সাহেব আত্মভ্রম সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কি, না? এবং বঙ্গীয় লেখকগণের ব্যাখ্যা কত দূর সঙ্গত।

বিমস সাহেব স্থানান্তরে পুনর্ব্বার বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম বোধ হয় বসন্তরায়ই ছিল। "বিদ্যাপতি," কবিকঙ্কন ও রায় গুণাকারের ন্যায় একটী উপাধি হওয়াই সম্ভব।

চন্দ্রশেখর বাবু আমাদিগকে সনন্দের যে প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেল তাহাতে লিখিত আছে "শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণ"। যদি বসন্ত রায়ই বিদ্যাপতি হইতেন তাহা হইলে "শ্রীবসন্ত রায় বিদ্যাপতি" কিম্বা "শ্রীবিদ্যাপতি বসন্তরায় শর্ম্মণ" লিখিত হইত। যথা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। কিন্তু

১ বসন্তরায় ভণিতাযুক্ত ৫৮টী কবিতা শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

২ ভূমিকাটী লিখিতে যাইয়া সারদা বাবু যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঐতিহাসিক তত্ত্বানভিজ্ঞতা নিবন্ধন কোনও কোনও স্থানে শিব গড়িতে যাইয়া লাঙ্গূলবিশিষ্ট পুরুষ গড়িয়াছেন।

আমরা কোন স্থানেই "গুণাকর শর্ম্মা" কিম্বা "কবিকঙ্কন শর্ম্মা" দেখিতে পাইলাম না। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, বসন্তরায় বাঙ্গালী, নামেই প্রকাশ। ফলত নামকরণ করিতে যাইয়া বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য কোন দেশবাসী এত রসের ছড়া কাটিতে জানে না। প্রাচীন কালে ও বাঙ্গালায় "বসন্ত" নামের অভাব ছিল না এখনও নাই।

যদি বিদ্যাপতিই বসন্তরায় হইতেন তাহা হইলে তাঁহার জন্মভূমি (মিথিলা) বাসিগণ—অধিকন্তু তাঁহার বংশধরগণ অবশ্যই তাঁহাকে এনামে পরিচয় দিতেন। কালিদাসকে মাতৃগুপ্ত বলা আর বসন্তরায়কে বিদ্যাপতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া একই কথা। বসন্তরায় বলিয়াছেন আমি বসন্তরায়, আমরা কি এক্ষণে গায়ের জোরে বলিব না তুমি বসন্তরায় বিদ্যাপতি। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেরই ২।৩ টী নাম থাকে, মথা কোষ্টির নাম, রাশি নাম ও পিতা মাতার স্নেহপ্রদত্ত নাম। কিন্তু তাহা বলিয়া ত গ্রন্থকারগণ গ্রন্থে গ্রন্থে স্বতন্ত্র নাম প্রকাশ করেন না। বিদ্যাপতি যে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে ও অধিকাংশ কবিতায় বিদ্যাপতি নামে পরিচয় দিয়া কেবল কয়েকটী কবিতায় মাত্র বসন্তরায় নামের ভণিতা দিয়াছেন ইহা কি রূপে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ের পদাবলীতে কি রূপে কত দূর প্রভেদ তাহা "বসন্তরায়" শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখক সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন, সুতরাং আমাদের বিবেচনায় বসন্তরায় ও বিদ্যাপতি ভিন্নভিন্নদেশবাসী দুই স্বতন্ত্র কবি।

বসন্তরায় বাঙ্গালী। কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে কোন্ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন বোধ হইতেছে। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডে লিখিত আছে—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রী গীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু-রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

"রায়ের নাটক গীতি" এই পদের রায় শব্দটী যদি আমরা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করি, তাহা হইলে আমরা বসন্তরায়কে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ণয় করিতে পারি। কিন্তু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই রায় শব্দের লক্ষ্য কিম্বা পদপূরণার্থ "বসন্ত" শব্দ পরিত্যাগ করিয়া কেবল "রায়" শব্দ দ্বারা বসন্তরায়কেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা স্থির রূপে বলা নিতান্ত সহজ নহে।

কতকগুলি পদে বসন্তরায়ের নামের সহিত "গোবিন্দদাসের" নাম সংযুক্ত রহিয়াছে।

যথা—"রায়বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত,
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ।"

আবার—"রায়বসন্ত, মধুপ আনন্দিত,
নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"

পুনর্ব্বার—"গোবিন্দ দাস কহায় মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত।"

ইহা দ্বারা বসন্তরায়কে গোবিন্দ দাসের সমকালীন অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইনি কোন্ গোবিন্দ দাস? সাহিত্য জগতে বিচরণ করিতে যাইয়া আমরা কয়েক জন গোবিন্দ দাসের দর্শন পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় ইহা সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। একজন গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির সমকালীন। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস তথি,
পূরল ইহ রস ওর।"

আবার—

"বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দ দাস রস পূর।"

এ গোবিন্দ দাস সে গোবিন্দ দাস হইলে বসন্তরায়, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমকালীন হইতেছেন। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, সোমপ্রকাশ পত্রিকার জনৈক পত্রপ্রেরকের লেখার অন্তত কিয়দংশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"গত ১ ই পৌষের সোমপ্রকাশে কোন পত্রপ্রেরক এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, 'জেলা যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শুটুর নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণ জাতীয় ভবানন্দ রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাহার পরলোক হয়। উহার প্রকৃত নাম বসন্তরায়, বিদ্যাপতি উপাধি মাত্র। উহার রচিত পদাবলীর নাম বসন্ত সুকুমার কাব্য।"

পত্র প্রেরকের লিখিত বাক্য হইতে যদি আমরা বিদ্যাপতি নামটী উঠাইয়া দিয়া বলি যে "বসন্তরায় ভবানন্দ রায়ের পুত্র, ভূর্শুটুর তাহার জন্মস্থান, ১৩৫৫ শকে তাহার জন্ম, ১৪০৩ শকাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।"(৩) তাহা হইলে যশোহরবাসী বসন্তরায়, বীরভূমবাসী চণ্ডীদাস ও মিথিলাবাসী বিদ্যাপতির সমকালীন হইতেছেন।

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্তরায়ই কবি বসন্তরায় বলিয়া তিনি কোনও কোনও ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। এই উক্তির পোষণোপযোগী কোনও প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। বরং ইহার বিরুদ্ধে একটী প্রমাণ রহিয়াছে। রাজা বসন্তরায় কায়স্থ, গোবিন্দ দাসের একটী কবিতায় "দ্বিজরাজ বসন্ত" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যদি "দ্বিজরাজ" শব্দটী পশ্চাৎ যুক্ত অনুমান করা হয়, (এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে, উদাহরণ স্বরূপ দ্বিজ রামপ্রসাদ।) এবং দ্বিজরাজের পরিবর্ত্তে কবিরাজ শব্দ সংযুক্ত করা যায় তাহা হইলে কবি বসন্তরায় ও রাজা বসন্তরায়কে অভিন্ন অবধারণ করা যাইতে পারে।

---

(৩) জন্ম মৃত্যুর অব্দ কোন বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া এরূপ স্থির রূপে লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত হয় নাই।

অক্ষয় বাবুর গ্রন্থে আমরা বসন্তরায়ের যে সকল কবিতা পাঠ করিয়াছি তাহার একটীর ভণিতায়ও কবির নামের সহিত "দ্বিজ" শব্দ সংযুক্ত নাই, অতএবই বোধ হইতেছে গোবিন্দ দাসের কবিতায় তিন নকলে আসল খান্ত হইয়া কবিরাজ দ্বিজ রাজ হইয়া গিয়াছেন। কবি বসন্তকে রাজা বসন্ত স্বীকার করিলে, কবি বসন্তরায়—দাউদ সাহ ও মোগল সম্রাট আকবরের সমকালীন হইতেছেন, অর্থাৎ শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে ও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগে জীবিত ছিলেন।

অক্ষয় বাবু বিদ্যাপতির এক খানি সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধে আট ও নিম্নে তের পুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির ন্যায় আর কোনও এক জন প্রাচীন কবির এরূপ বংশাবলী আমরা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক পাওয়ার প্রত্যাশাও করিতে পারি না।

বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলিতে স্বীয় আশ্রয়দাতা "রূপনারায়ণ শিবসিংহ" ও রাজ্ঞী লছিমা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। কোন ও কোন ও ব্যক্তি রূপনারায়ণ ও শিবসিংহকে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি অনুমান করেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু বলেন "——এই সকল ভণিতা দেখিয়া বোধ হয় রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহের উপাধি ছিল।" সারদা বাবু বলেন "রূপনারায়ণ শব্দ যে ঐ নৃপতির উপাধি ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ পদাবলির কোন ভণিতা পাঠে বোধ হয় না যে রূপনারায়ণ ও শিবসিংহ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।"

বিমস সাহেব লিখিয়াছেন :—"It also appears that Rupanarayana whose name so constantly occurs immediately following that of Sib Sinha, is not an independent personage but that the Kings of that family took the title of Narayana with some prefeex. Thus we find Maharajas Nara Sinha Darpanarayana, Ratna Sinha Jivanarayana, Raghu Sinha Bijana Narayana and others.

আমরা একটী বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রোক্ত লেখকদিগের মতানুসরণ করিতেছি। সনন্দে নামটী এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা,— "—ভবানীভক্তিভাবনা পরায়ণ রূপনারায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীমচ্ছিবসিংহ দেবপদাঃ সদাসমরবিজয়িনঃ।"

রাজা শিবসিংহ ব্রাহ্মণবংশজ। রাজা ভরত সিংহ এই বংশের স্থাপয়িতা। দ্বার বঙ্গের ইতিহাস লেখক অযোধ্যাপ্রসাদ বাবু এই রাজবংশের যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া আমরা নিম্নলিখিত রূপ বংশাবলী প্রস্তুত করিলাম।

রাজার নাম	রাজ্যশাসন কাল। শকাব্দ।
ভরতসিংহ দেব	... ১২৭০ ... ১৩০৭
দেবসিংহ দেব	.. ১৩০৮ ... ১৩৬৯ "

শিবসিংহ দেব	... ১৩৬৯ ... ১৩৭৩ "
রানী পদ্মাবতী দেবী...	১৩৭৩ ... ১৩৭৪ "
,, লক্ষ্মী (লছিমা) দেবী	১৩৭৫ ... ১৩৮৩ "
,, বিশ্বাস দেবী	... ১৩৮৩ ... ১৩৯৫ "
নরসিংহদেব	... ১৩৯৫ ... ১৪২৮ "
ধীরসিংহদেব	... ১৪২৮ ... ১৪৪২ "
ভৈরবসিংহদেব	... ১৪৪২ ... ১৪৪৩ "
রূপনারায়ণদেব	... ১৪৪৩ ... ১৪৫৫ "
গণেশনারায়ণদেব	.. ১৪৫৫ ... ১৪৭২ "

এতন্মধ্যে শিবসিংহ হইতে নরসিংহ দেবের শাসনকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি মৈথিল রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ কাব গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পদাবলীতে কেবল শিবসিংহ ও লছিমা দেবীর উল্লেখ আছে। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—"রাজমহিষী লছিমা দেবীর সহিত তাহার প্রসক্তি ছিল এবং ঐ মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভাত হইত, এই জন্য তিনি লছিমার নামে ভণিতি দিয়া কবিতা রচনা করিতেন।" আমাদের বিবেচনায় দেশীয় জুগুপ্সিত রুচি এই প্রবাদপ্রসবিত্রী। ঐরূপ ভণিতাসংযুক্ত পদাবলীর মর্ম্মালোচনা দ্বারা আমাদের বোধ হইতেছে রাজা শিবসিংহ তাঁহার পত্নীত্রয় মধ্যে লছিমা দেবীর প্রতিই সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। তদনুসারে কবি উপযুক্ত স্থলে তাহার প্রমাণ স্বরূপ শিবসিংহ ও লছিমা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে বিদ্যাপতির কএকটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

সুধা মুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল,
ত্রিভুবন বিজয়ী আলা॥
সুন্দর বদন, চারু অরু(ণ) লোচন
কাজার রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝ কাল ভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতা বলি
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা-খগপতি-চঞ্চু ভরম ভায়,
কুচগিরি-সান্দি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দুই বাণে!
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তাহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস কোপ যো জান!
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

(২)

... ...
... ...
... ...

ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

(৩)

"রাজা শিব সিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ॥"

(৪)

" রাজা শিব লছিমা প্রমাণে ॥"

(৫)

"ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছমী দেবী পরমাণ ॥"

এই সকল ভণিতা দ্বারা সেই জুগুপ্সিত রুচি-প্রসূত প্রবাদ বাক্যের সত্যতা পোষণ করা যাইতে পারে কি না, তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদের বিবেচনায় কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের চরিত্র সম্বন্ধে দেশপ্লাবিত অশ্লীল গল্প সমুহ যে সকল কলুষিত রুচি-প্রসূত, বিদ্যাপতি চরিত্র সম্বন্ধীয় প্রবাদ-বাক্যটীও সেই রুচিজাত।

বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে নীতিবিষয়ক গ্রন্থ পুরুষপরীক্ষা শিবসিংহের শাসনকালে ও ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে কুমার রূপনারায়ণ দেবের অনুমত্যনুসারে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা বলিতে পরি বিদ্যাপতি ১৩৯ শকাব্দ হইতে ১৪২৮ শকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৈথিল রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

চন্দ্রশেখর বাবুর অনুগ্রহে সনন্দের যে প্রতিলিপি এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সংস্থাপিত রহিয়াছে তাহা হইতে ২টী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমিতে বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে মুনিতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাঃ সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহ বিবৃদ্ধবাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যে সভম ॥
প্রজ্ঞাবান প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদী মাতৃকং
সারণ্যং সসরোবরঞ্চ বিসপী নামান মাসী মতঃ।
শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণে সুকবয়ে পুন্যাদিভির্ভুজ্যতাং
বীরঃ শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি র্গ্রামং দদে শাসনং ॥"

এতৎ দ্বারা অনুমিত হয় যে রাজা শিবসিংহ দেব ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে বিদ্যাপতিকে বিসপীগ্রাম দান করিয়াছিলেন। মূল প্রবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমরা লক্ষ্মণাব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না লিখিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ১০২৮ শকাব্দের মাঘ মাসে বঙ্গের রাজাসন অধিকার করিয়া যে অব্দ প্রচলিত করেন তাহাই অদ্যাপিও "ল সং" আখ্যা দ্বারা মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। সুন্দরবনের তাম্রশাসন ২ লক্ষ্মণাব্দের ১০ ই মাঘ (১০৩০ শকাব্দ) তারিখে লিখিত হইয়াছিল। (৪)

(৪) লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন দেখ। (ভারতী, চতুর্থখণ্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা।) এই প্রবন্ধে অঙ্ক পাত করিবার কালে আমাদের কিঞ্চিৎভ্রম হইয়াছিল।

তর্পণ দীঘির তাম্রশাসন ৭ লক্ষ্মণাব্দের ৩ রা ভাদ্র (১০৩৫ শকাব্দ) লিখিত হয়। বৌদ্ধ গয়ার উৎকীর্ণ ফলক ৭৪ লক্ষ্মণাব্দের ১২ ই বৈশাখ লিখিত হইয়াছিল। (৫) সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থ ৯৯ লক্ষ্মণাব্দে (১১২৭ শকাব্দে) (৬) রচিত হয়। পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্ন

বাবু যদবানন্দ গুপ্ত মহাশয় "বঙ্গীয় সেন রাজবংশ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "কৈলাস বাবু তাম্রশাসনের "সং ২" "সং ৭" প্রভৃতিকে প্রথম লক্ষ্ম সেনের প্রচলিত অব্দ মনে করিয়া মিথিলাপ্রচলিত লক্ষ্মণাব্দের সহিত অভেদ কল্পনা করিতে চাহেন। কিন্তু নানা কারণে আমাদের নিকট তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।" আমরা আপাতত তাঁহার সহিত কোনও রূপ কলহ করিতে ইচ্ছা করি না। ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া সুলেখকদিগের সহিত আমরা সর্ব্বদাই নির্ম্মল চিত্তে তর্ক করিতে অভিলাষ করি।

(৫) ইহার সম্বন্ধে আমরা "দিনাজপুরের প্রস্তর স্তম্ভলিপি" প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মুদ্রাকর প্রমাদ বশত ৭৪ লক্ষ্মণাব্দের পরিবর্ত্তে তাহাতে "৪৭ লক্ষ্মণাব্দ" হইয়াছে। (বান্ধব, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা।)

(৬) শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত কালিদাস সিদ্ধান্তের নিকট তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত একখণ্ড সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ আছে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মিত্র মহোদয় Notice of Sanskrit. MSS. এর তৃতীয় খণ্ডে ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে তাহার একস্থলে লিখিত আছে :—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশ শতে শরদাং।

মিথিলা হইতে ২।৩ শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ আহরণ করিয়াছেন। তাহাতেও লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অদ্যাপি মিথিলা দেশে এই অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গেশ্বর প্রচলিত প্রকৃত বঙ্গাব্দ বঙ্গ হইতে বিদূরিত হইয়া কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হিজিরি বা মহাম্মদাব্দ আমাদের নিকট বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীগণ যদি লক্ষ্মণাব্দকে বঙ্গাব্দ বলিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমরা যথোচিত সুখী হইব। আমরা এই অব্দের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনবগত ছিলাম। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব তাঁহার "হিন্দুবিধিসার সংগ্রহের (Digest of Hindu Laws) ভূমিকায় লক্ষ্মণাব্দের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে আর কোনও লেখক ইহার বিষয় উল্লেখ করেন নাই। দীর্ঘ কালান্তে রাজকৃষ্ণ বাবু লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি ও অস্থিত্বের কথা আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর যদি কোন ও ভ্রম হইয়া থাকে, তবে তাহা উল্লেখ করা আমরা উচিত বোধ করি না।

এই সনন্দে যে কেবল লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ আছে এমত নহে, সনন্দের অন্তভাগে

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ক্ষিতিপস্য রসৈক বিংশে ॥"

এই শ্লোকটীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া মিত্র মহোদয় বলেন "I fouud a MS of the

আরও ৩টী অব্দ লিখিত হইয়াছে, যথা "সন (হিজিরি) ৮০০॥ সম্বত ১৪৫৫॥ শাকে ১৩২১॥" সুতরাং গণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে এই দানকার্য্যটী শিবসিংহের রাজ্যাভিষেকের প্রায় ৪৮ বৎসরের পূর্ব্বে হইয়াছিল।

মৈথিল পণ্ডিতগণ বলেন যে রাজা শিবসিংহ তাঁহার যৌবরাজ্য কালে এই গ্রামটী দান করিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দু রাজগণ অনেকেই বার্দ্ধক্যে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিতেন, সত্য, তাহা বলিয়া যে রাজা দেবসিংহ তাঁহার মৃত্যুর

Saudukti karnamrita, dated Saka 1500=1578 A. D. in the colophon of which the work is described to have been compiled in the Saka year 1127=1405. A. D. which corresponded with some date of Laksh mana Sena which I could not make out."

(J. A. S. B. XLVII. I. 307.)

"রসৈক বিংশে" শব্দই গণ্ড গোলের মূল। মিত্র মহোদয় মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে মূর্খ নকল নবিস গ্রন্থ নকল করিবার সময় না বুঝিতে পারিয়া এক শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ লিখিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে যে কেবল অব্দের গণ্ডগোল হইয়াছে এমত নহে, কবিতাটীও অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কবিতাটী আর্য্যাছন্দে লিখিত। এই ছন্দের নিয়মানুসারে প্রথমার্দ্ধে ৭×৪+২ বা ত্রিশ মাত্রা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৪×৫+১+৪+২ বা ২৭ মাত্রা হইবে। কিন্তু ইহার প্রথমার্দ্ধে একটী মাত্রা কম দেখা যাইতেছে, যথা,—

শা কে স প্ত বিং শ ত্য ধি
২ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ১
ক শ তো পে ত দ শ শ তে
১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২
শ র দাং। } ২৯
১ ১ ২

যদি "বিং" এই দ্বি মাত্রা কথাটী কাটিয়া আমরা তৎ পরিবর্ত্তে "ত্রিং" বসাইয়া দি, তাহা হইলে কবিতার পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ করিলে ঐতিহাসিক রাজ্যে একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। সুতরাং আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধে কিঞ্চিৎ ভ্রম থাকা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে মূর্খ নকল নবিসের কৃপায় ভয়ানক গণ্ডগোল হইয়াছে। ইহাতে ২৭ মাত্রার পরিবর্ত্তে ২৫ মাত্রা হইয়াছে যথা,—

শ্রী ম ল্ল ক্ষ্ম ণ সে ন ক্ষি তি প স্য
২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১
র বৈ ক বিং শে॥ } ২৫
১ ২ ১ ২ ২

কিন্তু এই চরণটী যদি আমরা নিম্নলিখিত রূপ সংশোধন করি তাহা হইলে ইহাতে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না।

শ্রী ম ল্ল ক্ষ্ম ণ সে ন ক্ষি তি
২+২। ২+১+ ১। ২+২। ২+১
প স্য হি র স র সে চা
২। ১+ ১+১+১। ১। ২+২।
ব্দে॥ } ২৭
২

"রসরসে" ৯৯ লক্ষ্মণাব্দের সহিত ১১২৭ শকাব্দ সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে। কারণ ১০২৮ শকে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত হয়। সুতরাং ১০২৮+৯৯=১১২৭ শকাব্দ হইবে।

অন্যূন ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে শিশু পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন ইহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব। অধিকন্তু এরূপ হইয়া থাকিলেও যে শিবসিংহ তাহার পিতার সমক্ষে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা আমরা কখনই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

কাণ্যকুব্জপতি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার পিতা বর্ত্তমানে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তিনি সেই সময়ে যে ভূমিদান করেন, তাহার দানপত্র হইতে উপাধি ও গুণানুবাদ সহ গোবিন্দচন্দ্রের নামটী পূর্ণাবস্থায় উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"তস্মাদজায়ত নরেশ্বর বৃন্দবন্দ্য পাদারবিন্দ
যুগলো জ্বলিতপ্রতাপঃ।
ক্ষৌণীপতীন্দ্রতিলকো রিপুরঙ্গভঙ্গী গো-
বিন্দচন্দ্র ইতি বিশ্রুত রাজপুত্রঃ॥"

স্থানান্তরে—

"মহা রাজপুত্র শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্র দেব।"

পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্র ভূমি দান করিয়াছেন। তখন তিনি কিরূপে লিখিত হইয়াছেন, পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

"পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্র দেব বিজয়ী।"

এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে মৈথিল পণ্ডিতগণের বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪টী অব্দ কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ম্মল হিন্দু হৃদয় এত দূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কত দূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোনও সনন্দে একাধিক অব্দ লিখিত হয় নাই এবং সেই অব্দ যে কোন্ রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থির রূপে লেখা হয় নাই। কিন্তু এ সনন্দে, স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্মণাব্দ, হিজিরি সন, বিক্রম সম্বত, শালিবাহন শকাব্দ, অত্যন্ত সতর্ক, এবম্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।

পাণ্ডব বংশীয় পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের নামাঙ্কিত তাম্রশাসন জাল হইতে পারিলে শিবসিংহের সনন্দ জাল হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। সংসারে প্রবেশ করিয়া জাল দলিলের দ্বারা আমরা দগ্ধ হইয়াছি। ঐতিহাসিক জগতে প্রবেশ করিয়া ও জাল দলিলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলাম না।

এই সনন্দখানা তাম্র পত্রে কি কাগজে লিখিত তাহা আমরা জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। কিন্তু কাগজের দলিল যে এত দীর্ঘকাল কিরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দর্শন না করিয়া বলা যায় না। আমরা একবার মিথিলা প্রদেশে গমন করিতে পারিলে, এ সম্বন্ধে অকুতোভয়ে

লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিতাম। যাহা হউক আমাদের বিবেচনায়—

১। সনন্দ খানা আদ্যোপান্ত জাল হইতে পারে।

২। নচেৎ প্রকৃত সনন্দ নষ্ট হইয়া গেলে, বিদ্যাপতির বংশধরগণ এই সনন্দ খানা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

৩। কথিত আছে দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতিকে ভূমি দান করিয়াছিলেন, শিবসিংহ তাহা দৃঢ় করণার্থে এই সনন্দ লিখিয়া দেন। দিল্লীপতি দত্ত সনন্দ কোথায়? যদি সেই সনন্দ থাকিয়া থাকে তবে আমরা বলিব যে প্রকৃত সনন্দ নষ্ট হইয়া গেলে এই সনন্দ প্রস্তুত হইয়াছে।

৪। নচেৎ এই সনন্দ নিশ্চয়ই জাল!

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

পূরবে উঠেছে শশী!

"বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি কি এক পিরীতি-ময়!"

বি, লা, চ,

১

নীরব গভীর বিজন যামিনী
দুজনে র'য়েছি বসি,
মাথার উপরে ফুটেছে তারকা,
পূরবে উঠেছে শশী!

২

আনন্দে তটিনী উঠেছে মাতিয়া,
বহিছে দখিনা বায়,
দূর হ'তে আসে পিহ পিহ তান
হরষে পাপিয়া গায়।

৩

নয়নে নয়নে প্রেমের কাহিনী,
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা,
দোঁহার পরাণ উঠেছে উথলি
চকোর চকোরী যথা।

৪

স্বর্গের স্বপন আসিছে পরাণে
নয়নে লেগেছে ঘোর,
জগৎ ছাড়ায়ে চেতনা হারায়ে
কি এক আনন্দে ভোর।

৫

চন্দ্রমার আলো বড় লাগে ভাল
বহিলে দখিনা বায়,
দুটি কথা শুধু না হ'তে না হ'তে
প্রাণে প্রাণে মিশে যায়।

৬

এমন যামিনী যদি গো সদাই
থাকিত সমুখে মোর
হৃদয়ে প্রেমের মদির স্বপন
নয়নে প্রেমের ঘোর,

৭

তা হ'লে না জানি কি যে করিতাম
ভাবিয়া পেতেম তাকি!
সারাটি জীবন যাইত বহিয়া
নয়নে নয়ন রাখি।

৮

কেমন নীরব গভীর যামিনী
দু জনে র'য়েছি বসি,
মাথার উপরে ফুটেছে তারকা
পূরবে উঠেছে শশী!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদকের বৈঠক।

পতঙ্গের মরণ। গাড্‌নার সাহেব বলিতেছেন—আমি যখন আইসলণ্ডের একটি জলপ্রপাত দেখিতেছিলাম, দেখিলাম দলে দলে পতঙ্গ আসিয়া সেই জলে ঝাঁপ দিতেছে। কোন কোন পতঙ্গ দূর হইতে আসিয়া, একবার একটু ইতস্তত করে। অবশেষে জলের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সবেগে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। জলধারার চাকচিক্য দেখিয়াই পতঙ্গ বেচারীরা এইরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকে। দেখা যায় অনেক কীট-ভোজী মৎস্য জলপ্রপাতের প্রান্তরবর্ত্তী জলাশয়ে বাস করিয়া থাকে। আমি বোধ করি, তাহার কারণ এখানে তাহারা অনেক পতঙ্গ পাইয়া থাকে।

জাপান-শিল্প। অতি প্রাচীনকাল হইতে জাপান কারিগরগণ ধাতব দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত। এখনো তাহাদের লোহা ইস্পাত প্রভৃতির কাজ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নারা নামক স্থানে বুদ্ধের এক অতি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম নির্ম্মিত হয়। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে মন্দিরে আগুন লাগাতে এই প্রতিমার মুণ্ড গলিয়া পড়ে। পরে তাহা পুনঃ নির্ম্মিত হয়। এই মূর্ত্তি ৬৩॥০ ফিট উচ্চ। ইহার মুখ ১৬ফিট্ দীর্ঘ এবং ৯॥০ফিট প্রশস্ত। মাথার উপরে ৭৮ ফিট কিরণচ্ছটা, এবং তাহার উপরেও ৮ ফিট্ দীর্ঘ মূর্ত্তি সকল রহিয়াছে। শিল্পকারেরা এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে ৭ বার ঢালাই করিয়া অষ্টম বারে কৃতকার্য্য হয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৮১০০০

মন কয়লা লাগিয়াছে, এবং ইহার ভার ১২১৫০ মন। স্বর্ণ, পারদ, টিন ও তাম্রে মিশাইয়া ইহার উপাদান নির্ম্মিত হইয়াছে।

জাপানের দেবালয়ের ঘণ্টাগুলি আয়তনে বৃহৎ ও তাহার শব্দ অতি সুমিষ্ট ও পরিপূর্ণ, য়ুরোপীয় চর্চ্চ ঘণ্টার ন্যায় সুশ্রাব্য নহে। প্রদীপ, ধূপাধার প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সচরাচর মন্দিরে ব্যবহৃত হয় তাহা অতি যত্নে ও সুচারুরূপে গঠিত হয়। জাপানে অতি প্রাচীন কাল হইতে ধাতব পদার্থের আদর, এবং এখনো শিল্পকরেরা তাহাদের নৈপুণ্যের গর্ব্ব করিতে পারে। ইংলণ্ডের কোন শিল্প-শালার এক জোড়া স্বর্ণখচিত ধাতুপাত্র আছে। তাহার কারু কার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে সাত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহাতে যে রঙের বৈচিত্র্য আছে তাহা বাহির হইতে লেপিত নহে। তাহা, কৌশলে নানাবিধ ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

আমাদের ভারতবর্ষের অনেক স্থানে যে দুর্দ্দশা হইতেছে জাপানেও তাহা দেখা দিয়াছে। শিল্পকরেরা অল্পকাল ও অনায়াস-সাধ্য বিদেশীয় শিল্পের অনুকরণ করিয়া দেশজ শিল্প লোপ করিতে বসিয়াছে। আর কিছুকাল পরে জাপান-শিল্প পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া পড়িবে!

জাপান-সাহিত্য। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জাপানে কোন্ কোন্ বিষয়ে কত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, দেখিলে জাপান সাহিত্যের গতি ও উন্নতি অবধারিত হইতে পারিবে। রাজকীয় বিষয় ৫৪৫। আইন—২৫৫। অর্থ শাস্ত্র ১৫। ভূগোল ১৬৪। ডাক্তারী ২৬৭। রসায়ন ১৭। প্রাকৃতিক ইতিহাস ২০। প্রাকৃতিক দর্শন ১৩। অঙ্কশাস্ত্র ১০৭। জ্যোতির্বিদ্যা ৭। নৈতিক বিষয় ২৭৬। কবিতা ৫৫৬। চিত্র বিদ্যা ৩৩৯। যন্ত্রবিদ্যা ২৮। বাণিজ্য ১১৩। স্কুল বহি ৭০৭। উপন্যাস ১৯৩। এতদ্ব্যতীত অভিধান, সংবাদ পত্র প্রভৃতি আছে। য়ুরোপীয় ভাষা হইতে অনেক পুস্তক, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম করা যাইতেছে।

"Smiles's character." Roscoe's chemistry" Palgrave's chairman's Handbook "Mill's Three Essys on Religion." "Drapir's conflict of Religion and Science" "Thomsson's Social Science and National Economy" ইত্যাদি।

জাপান বিশ্ব বিদ্যালয়।—টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় অধ্যাপকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। সেখানে ৮ জন দেশীয় ও এক জন বিদেশীয় আইন-শিক্ষক আছে। বিজ্ঞান শিক্ষক ২৬ জনের মধ্যে ১৮ জন দেশীয়। সাহিত্য শিক্ষক ১৪ জনের মধ্যে ১১ জন দেশীয়। জাপান ছাত্রদিগের বিদ্যালয়ের বেতন অতি সামান্য। তাহাদিগকে চার মাসে ৮ টাকা দিতে হয়, এবং সেখানে বাস করিতে হইলে সর্ব্বসমেত ১৬ টাকা দিতে হয়।

সমুদ্র-তলগামী জাহাজ।—থিও-

ডোরেস্কিউ নামক একজন রুমানীয় যন্ত্রতত্ত্ববিৎ একপ্রকার জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—ইহা বারো ঘণ্টা অনবরত ১০০ হইতে ৩০০ ফিট জলের নিম্নে চলিতে পারে। অন্যান্য ষ্টীমার হইতে ইহার গতি মন্দ। যতক্ষণ জাহাজ জলের নিম্নে থাকে ততক্ষণ এমন আলোর বন্দোবস্ত থাকে যাহাতে সম্মুখে ১৩০ ফিট পর্য্যন্ত দেখা যায়। যে বাতাস জাহাজে থাকে তাহাতে নাবিকগণ ১৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনায়াসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে। আবার, ইচ্ছা করিলেই জলের নীচে থাকিয়াই নূতন বাতাস লওয়া যাইতে পারে। জাহাজ চলিবার অথবা ডুবিবার সময় কোন শব্দ হয় না। ইচ্ছা করিলেই হঠাৎ অথবা ক্রমশঃ ডুবিয়া অথবা ভাসিয়া উঠা যায়। এই তরীউদ্ভাবক নিজে যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সমস্ত সত্য হয়, তবে এই জাহাজে নৌ-যুদ্ধের অনেক উন্নতি হইবে।

চোখ-খারাপ। আমাদের দেশে যুবকদের মধ্যে অনেকেরই চোখ খারাপ দেখা যায়। আলোকের তীব্রতা যে চোখ খারাপ করে তাহা ঠিক নহে। পিকরিং সাহেব কহেন—দীপ হইতে যে উত্তাপ বিকীরিত হয় তাহা, এবং পুস্তকের কাগজ এবং অন্যান্য শ্বেতবর্ণ কাগজ হইতে প্রতিফলিত তাপ আসিয়া চোখ, চোখের পাতা, কপাল ও রগ শুষ্ক করিয়া ফেলে—ইহাতে চোক ও মাথা খারাপ করিয়া দেয়। দীপের চতুর্দ্দিক-বর্ত্তী বাতাসও চোখের পক্ষে অত্যন্ত হানিজনক। সেজ হইতে কিঞ্চিৎদূরে তাপকে বাধা দিয়া একটি কাচফলক যদি এমন ভাবে রাখা যায়, যাহাতে তাপ আসিয়া পুস্তকের উপর ও মুখের উপর সম্পূর্ণ না পড়ে তাহা হইলে অনিষ্ট কিয়দংশে নিবারিত হইতে পারে।

প্রজাপতির ছদ্মবেশ ধারণ। কোন কোন প্রজাপতি বিস্বাদ লাগে বলিয়া পতঙ্গভোজী পাখীরা তাহাদিগকে খায় না। এই নিমিত্ত অনেক পক্ষীর আহার্য্য প্রজাপতিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিদিগের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকে।

কাকের ধূর্ত্ততা। Unbeaten Tracks in Japan, নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার লিখিতেছেন, মোরিতে আমি দেখিলাম, একটি কুকুর একটি মাংস খণ্ড খাইতেছে। লোভী কাকেরা পরস্পর অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। মাঝে মাঝে দুই একটি সাহসী কাক তাহার মুখ হইতে ছিঁড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। অবশেষে একটি বলিষ্ঠ কাক একটুকরা মাংস ছিঁড়িয়া লইতে সক্ষম হইল। সেই মাংস খণ্ড লইয়া কিছু দূরে ফেলিয়া দিল, সেই কুকুরটি তাহার বৃহৎ খণ্ড মুহূর্ত্তের জন্য ফেলিয়া যেমন ক্ষুদ্র মাংসটি লইতে গেল, অমনি দুইটি কাক তাহার মাংস লইয়া গাছে উড়িয়া গেল ও সকলে মিলিয়া খাইতে লাগিল, কুকুরটা গাছের তলা হইতে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। এক জন ভদ্র লো-

কের কাছে শুনা গেল—আর একবার একটি কুকুর ঐরূপ মাংস লইয়া যাইতেছিল—কাকেরা কিছুতেই ছিঁড়িয়া লইতে পারিল না। অবশেষে একটি কাক তাহার লেজে ঠোকর মারিল—যেমনই সে মুখ ফিরাইয়া ঘেউ করিয়া উঠিল অমনি আর দুইটি কাক তাহার মুখ হইতে পতিত মাংসখণ্ড লইয়া গাছে উড়িয়া গেল।

—*—

সন্ধ্যার স্বপ্ন।

১

ধীরে—ধীরে—অতিধীরে—একটি স্বপন সম,
আয় সন্ধ্যা আয় মোর প্রাণে,
দক্ষিণের মেঘখানি যেমন আসিছে ওই
আয় সন্ধ্যা আয় এই খানে!

ডুবেছে রবির কায়া, বহিছে শীতল বায়,
ঘুমে ধরা হ'তেছে মগন,
আলোকে আঁধারে মিশি, খেলিতেছে দিশিদিশি,
জাগে প্রাণে বিচিত্র স্বপন!

স্বপনে ফুটেছে ফুল, স্বপনে গাহিছে পাখী,
স্বপনে নিঝর ছুটে যায়,
হৃদয় প্রতিমা মোর স্বপনে উঠেছে জাগি,
হাসে যেন পাগলের প্রায়!

২

উন্মাদিনী উল্লাসিনী, প্রভাতের বিহঙ্গিনী,
রাতি দিন হাসিবি সদাই,
হাসিবি মনের সাধে, গাহিবি হৃদয়-খুলে
তবে বল আর কিবা চাই!

পাগল পরাণে মোর লেগেছে ভাবের ঘোর
গাও গাও আরো গান গাও
জগৎ মাতায়ে দিয়ে স্বরগে উঠিছে গান
গাও গাও আরো গান গাও

গায় রবি গায় শশী, গায় তারা শূন্যে বসি,
গেয়ে ওঠে পাগল পরাণ!
আজ কেন সন্ধ্যাকালে নিবিড় নীরদ জালে,
দেখিতেছি উষার বয়ান!

৩

একি গো মায়ার খেলা, ফুরায় ফুরায় বেলা,
আঁধারে জগৎ ডুবে যায়,
কে ওই সুধার সুরে, বাজায় বাঁশরি দূরে,
প্রভাতের গান কেন গায়!

জীবন-লহরী মম, শুষ্ক মরু ভূমি সম,
কেন শুনি প্রভাতের গান,
সন্ধ্যা যে আমায় নিয়ে যায় তার পথ দিয়ে,
সন্ধ্যাতেই মিশায়েছি প্রাণ!
কেন শুনি প্রভাতের গান!

পাগল পরাণে মোর, লেগেছে ঘুমের ঘোর,
গাও গাও আরো গান গাও—
জগৎ মাতায়ে দিয়ে, স্বরগে উঠেছে গান,
গাও গাও আরো গান গাও!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গান।

"স্বভাবে অভাব আছে পূরাব কেমন কোরে!
প্রাণে যত ভালবাসা তত ভালবাসি তোরে"॥
বি, লা, চ।

১

এস দেবী হৃদয়ের রাণী!
ঘৃণার হাসিটি ভুলে যাও,
করুণ নয়নে চেওনাক,
প্রেমের নয়ানে ফিরে চাও!

জাননাকি চিরদিন শৈশব জীবন হ'তে
রাখিয়াছ ছায়ায় ছায়ায়,
সে আশ্রয় ত্যেয়াগিয়া কেন তবে বল বল
প্রাণ আজ ছুটে যেতে চায়!

তুমি যে গো স্বরগের দেবী—
তুমি যে গো আকাশের রাণী!

তোমার মহিমা গান ক'রে
পূরিয়া উঠেছে হৃদি খানি।

২

ভক্তি করি জননীর মত,
ভাল বাসি যত প্রাণ চায়,
নিশি দিন শয়নে স্বপনে
গান গাই পাগলের প্রায়!

ধরার প্রাণীর সাথে মিশায়েছ প্রাণতব
ভুলেগেছ স্বরগ-স্বপন,
সেই আমি সেই তুমি, এ নহে স্বরগ ভূমি,
তাই বুঝি দু পারে দু জন!

এস এস হৃদয়ের রাণী,
ঘৃণার হাসিটি ভুলে যাও,
করুণ নয়নে চেওনাক
প্রেমের নয়ানে ফিরে চাও!

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বাধীন জীবিকা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথমাবস্থায় মানবগণ অনায়াসলভ্য ফল মূল তৎপরে মৃগয়ালব্ধ পশু ও পক্ষীর মাংস দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে মানবগণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষিকার্য্য হইতে শিল্প ও বিনিময় আরম্ভ হইল।

ধান্য ও গোধূম কৃষিজাত, ইহাই মানবের প্রধান খাদ্য। কিন্তু ধান্যকে যন্ত্রবিশেষ দ্বারা তণ্ডুল ও গোধূমকে চূর্ণ করিতে না পারিলে খাওয়া যায় না সুতরাং শিল্প কার্য্যের প্রয়োজন হইল। তৎপরে তোমার গৃহে তণ্ডুল আছে, আমার গৃহে লবণ আছে, সুতরাং পরস্পর বিনিময় আরম্ভ হইল। এইরূপ বিনিময়কেই বাণিজ্য বলা যায়, বাণিজ্যই সকল উন্নতির মূল, কিন্তু কৃষি ও শিল্পের আশ্রয় ব্যতীত বাণিজ্য কখনই জীবন ধারণ করিতে পারে না।

বাণিজ্য প্রথমতঃ বিনিময় দ্বারা নির্ব্বাহ হইত, তৎপরে মানবসমাজে মুদ্রার ব্যবহার হইলে বিনিময়-প্রথা উঠিয়া যায়। অদ্যাপি কোনও কোনও অসভ্য জাতির মধ্যে বিনিময় প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বিনিময় দ্বারা নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিত বলিয়াই মানব সমাজে মুদ্রাও তদ্দ্বারা আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত রহিয়াছে তন্মধ্যে কৃষি, পশুপালন, শিল্প ও বাণিজ্যই প্রাচীন, প্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রাচীন ভারতবাসীগণ জীবিকানির্ব্বাহের পথগুলি সুন্দর রূপে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহারা কখনই বলিতেন না যে

নিবাসে বাণিজ্যে লক্ষ্মী, কৃষি কর্ম্মে ঊন।
রাজ কার্য্যে তা'র অর্দ্ধ, ভিক্ষা সর্ব্ব ন্যূন॥

যে সময় আমাদের পিতৃপুরুষগণ এই জলপ্লাবিত বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সে সময়ে আমাদের দেশে, গবর্ণমেণ্টের চাকরী, ডাক্তারী আইন, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি (বর্ত্তমান সময়ের) প্রচলিত ব্যবসায় সমূহের নাম গন্ধও ছিল না। কিন্তু যাহা ছিল তাহাকে তাঁহারা কখনই জীবিকা নির্ব্বাহের উৎকৃষ্ট ব্যবসায় বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। সেই প্রাচীন নিয়মানুসারে তাঁহারা এদেশে পদার্পণ করিয়াই কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতি বঙ্গবাসীদিগের প্রতি সর্ব্বদা অনুকূল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আবশ্যক শস্য ধান্য ও কার্পাস তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে জন্মিতে লাগিল। তাঁহারা শিল্পযন্ত্রের সাহায্যে কার্পাস দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত ও ধান্যকে তণ্ডুল করিয়া দুইটী প্রধান দ্রব্যের বাণিজ্য আরম্ভ করেন। জলপ্লাবিতদেশনিবাসীদিগের বাণিজ্য জলযান ব্যতীত নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে অর্ণবতরী নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতু, হীরক, মরকতমণি প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই দুষ্প্রাপ্য ছিল। সুতরাং আমাদের পিতৃপুরুষগণ তাহাদের প্রধান সম্বল কার্পাস বস্ত্র ও তণ্ডুল লইয়া একদিকে সুবর্ণ ভূমি ও অন্যদিকে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের নৌ বিদ্যার গৌরব ও বাণিজ্যখ্যাতি জগন্মণ্ডলে প্রচারিত হইল। আধুনিক সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতি সমূহের গুরু রোমনিবাসী কার্পাস বস্ত্রের জন্য তাঁহাদের দ্বারদেশে

ভিক্ষুকবেশে উপস্থিত হইল। পিতৃদেবগণ ভিক্ষাদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ভিক্ষুকপ্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহারা সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করিয়া দেশদেশান্তরে বিচরণ করত আধুনিক সভ্য জাতি সমূহের ন্যায় সমুদ্রবক্ষে উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডবাসীদিগের মনুষ্য নামে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে,—কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ দ্বিসহস্রাব্দ পূর্ব্বে, সিংহল দ্বীপে বঙ্গবাসীদিগের কীর্ত্তিপতাকা সংরোপিত হইয়াছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালায় যে সকল নগরী বাণিজ্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল তন্মধ্যে তাম্রলিপ্ত ও সুবর্ণগ্রামই সর্ব্বাগ্রগণ্য।

তাম্রলিপ্ত নগরীর জন্মকাল নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। মহারাজাধিরাজ অশোকের সময়েও তাম্রলিপ্ত নগরীর উন্নতি দেখা যাইতেছে। সে সময়ে বঙ্গীয় নাবিকদিগের অর্ণবতরীগুলি তাম্রলিপ্ত হইতে ভারত সাগরের প্লবমান দ্বীপপুঞ্জে ও চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিত।

শকাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজকন্যা হেমমালা ও তাঁহার স্বামী তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়া সিংহলযাত্রী অর্ণবযান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থানে বঙ্গীয় বণিকের বাণিজ্যতরী আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিয়েনসাঙ লিখিয়াছেন, যে, ইহার অন্তর্ব্বাণিজ্য স্থলপথে ও বহির্ব্বাণিজ্য জলপথে সম্পাদিত হইয়া থাকে। দশকুমার চরিত ও বৃহৎ কথা গ্রন্থে বাণিজ্যোন্নত তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রহিয়াছে। তদ্দ্বারা অষ্টম ও একাদশ শতাব্দীতে ও এই নগরী শ্রীহীন হয় নাই বলিয়া কোনও কোনও লেখক অনুমান করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—

The ruin of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation how the Bengalis ceased to be sea-going people. In the Buddhist era they sent worlike fleets to the east and west and colonized the islands of Archipelago * * * Religious prejudice combined with the change of nature to make the Bengalis unenterprising on the ocean, But what they have been they may under a higher civilization again become.

এরেথেরিয়ান সমুদ্রের (পারস্য উপসাগর) অভিজ্ঞ নাবিক পারিপ্লোস সুবর্ণগ্রামের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, ইহা গঙ্গার মোহানা হইতে কিঞ্চিৎদূরে অবস্থিত বঙ্গের প্রধান বাণিজ্যস্থান, উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র ইহার প্রধান পণ্য দ্রব্য। রোমীয় গ্রন্থকার প্লিনি ও পিলুসিয়মনিবাসী ভূগোলবেত্তা টলেমির সময়েও রোমীয় বণিকগণ সর্ব্বদা কার্পাস বস্ত্রের জন্য সুবর্ণগ্রামে যাতায়াত করিত।

সুবর্ণগ্রাম প্রাচীন ত্রিপুরারাজ্যের একটী অংশ মাত্র। সুবর্ণগ্রাম ত্রিপুর রাজ-

মুকুটের কুহিনোর। ইহার বহির্ব্বাণিজ্য-স্রোত যেরূপ একদিকে যুনানীমণ্ডল ও অন্যদিকে চীন যাপান অবধি প্রবাহিত হইয়াছিল, সেইরূপ আবার ইহার অন্তর্ব্বাণিজ্য ভারতের পশ্চিম প্রান্ত অবধি বিস্তৃত ছিল। বোধ হয় এজন্যই ত্রিপুরাবাসীগণ প্রাচীন কালে রাজস্থানে বণিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১)

শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন দেশীয় বাণিজ্যতরী কার্পাস বস্ত্রের জন্য সুবর্ণগ্রামে যাতায়াত করিতেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজ পরিব্রাজক রল্‌ফ ফিচ সুবর্ণগ্রাম দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন।

Sunnergan is a town six leagues from Serrepore, where there is the best and finest cloth made of cotton, that is in all India.

সচিবপ্রবর আবেল ফাজেল সুবর্ণ গ্রামের উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কার্পাস বস্ত্রের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে খাসার প্রতি থানের মূল্য ৩ টাকা হইতে ১৫ মোহর অর্থাৎ ২৪০ টাকা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন।

আওরংজীব বাদসাহের সময়ে দিল্লীর রাজপরিবারের জন্য প্রতি বৎসর সুবর্ণ গ্রাম হইতে ১৩৬০০০ টাকার কার্পাস বস্ত্র প্রেরিত হইত।

এক শতাব্দী পূর্ব্বেও সুবর্ণগ্রামের অন্তঃপাতী এক দালালপুর পল্লীতেই ১৪০০ পরিবার তন্তুবায় বাস করিত। কিন্তু এক্ষণে সুবর্ণগ্রামের মধ্যে ৫০ খানা তাঁত পাওয়া যাইবে কি না ইহাই সন্দেহস্থল। চরকা নীরব, তন্তু নীরব, বঙ্গবাসীগণ! সুখে নিদ্রা যাও।

সুবর্ণগ্রামের পরেই পশ্চিম বঙ্গস্থিত প্রাচীন কটদ্বীপ (কাটোয়া) সপ্তগ্রাম ও শান্তিপুর ও পূর্ব্ব বঙ্গস্থিত চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুর, বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ ও শ্রীপুরের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী ভ্রমণকারী বিখ্যাত বর্ণিয়ার বাঙ্গালার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

There is in that province such a quantity of cotton and silks, that the kingdom may be called the common store house for those two kinds of merchandise, not of Hindoostan only, but of all the neighbouring kingdoms, and even of Europe. I have been some times amazed at the vast quantity of cotton cloths, of every sort, fine and coarse, white and colored, which the Dutch alone export to different places, especially to Japan and Europe. The English, the Portuguese, and the native merchants deal also in these articles to a considerable extent.

১ Tod's Rajasthan. Vol. 1. p. 92. (Mukerjee's Ed.)

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে যাহা বর্ণন করিলাম, তদ্দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে প্রাচীন বঙ্গবাসীগণ প্রধানত কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আমাদিগের বহির্ব্বাণিজ্য কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু অন্তর্ব্বাণিজ্য তখনও বন্ধ হয় নাই। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে ডি, ফো, নিম্ন লিখিত রূপ চীৎকার করিয়াছিলেন।

The general fancy of the people runs upon East India goods. It has crept into our houses, bedchambers, curtains, cushions, chairs; and at last beds themselves were nothing but calicoes or Indian stuffs; and in short almost every thing relating to the dress of the women or the furniture of our houses was supplied by the Indian trade. About half of the woollen manufacture was entirely lost, half of the people ruined, and all this by the intercourse of the East India trade.

ইহার পর হইতে আমাদের অদৃষ্ট-চক্র এক অভিনব মার্গে সঞ্চালিত হইল। হতভাগ্য বঙ্গদেশ বণিকজাতির অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ উদরগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। বণিকগণ আমাদের দেশের সমস্ত বাণিজ্য কৌশলক্রমে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। আমাদিগকে দাসত্বের প্রথাগুলি সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা দাসত্বকেই জীবিকা নির্ব্বাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় ও সম্মানের আস্পদ বলিয়া জ্ঞান করিলাম। বণিক জাতির কুহকে ভুলিয়া আমরা কর্ত্তব্য জ্ঞান হীন হইলাম।

এক্ষণে আমরাও ডি ফোর ন্যায় বলিতে পারি।

হায় হায় পাশ্চাত্য শিল্পী ও বণিকগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। আর আমাদের অর্ণবতরী সাগরবক্ষে বিচরণ করে না। মহাসাগরের হরিৎ আভা বিশিষ্ট নীল জলরাশি বঙ্গীয় নাবিকদিগের "ভাটীয়াল" রাগিণী শ্রবণে নৃত্য করে না। তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কটদ্বীপ, শান্তিপুর হইতে কোটি কোটি টাকার কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হয় না। এক্ষণে আমরা মানচেষ্টারের ধুতি চাদর, লংক্লথনির্ম্মিত জামা ও পেছিলি-নির্ম্মিত হাফ ষ্টকিং এবং ইংরাজ কিম্বা চীনা চর্ম্মকারনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিয়া "বাবু" সাজিয়া থাকি। বিলাতী মস্যাধার হইতে মসী লইয়া বিলাতী ফিলপেন দ্বারা বিলাতি কাগজে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। বালক বালিকাগণ ইংরাজ কিম্বা ফরাসীনির্ম্মিত খেলনা দ্বারা খেলা করিতেছে। ঐ দরজী বিলাতী সূচ ও সূতা দ্বারা বিলাতী বস্ত্র শেলাই করিতেছে। ঐ কাষ্ঠাসনে বিলাতী ছিটের তুষক উপরে শয়ন করিয়া বঙ্গীয় রোগী বিলাতি কাচের গ্লাশে বিলাতী ঔষধ সেবন করিতেছে। বঙ্গীয় ধনবান যুবক বিলতী গ্ল্যাশে বিলাতী মদিরা পান করিয়া বিলাতী বন্ধুক হস্তে শিকারে বহির্গত হই-

য়াছেন। তাহার বিলাতী পোষাক বিলাতী সুগন্ধ দ্বারা সিক্ত। অধিক কি বলিব বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীর সুসজ্জিত অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর যেখানে দৃষ্টি কর দেখিবে সকলই বিলাতী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ সুতরাং কৃষিকার্য্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন। অতএব এদেশে কৃষিকার্য্য দ্বারা যে সকল পদার্থ জন্মিতেছে এবং সেই সকল দ্রব্যের বাণিজ্য কিরূপে চলিতেছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া ইতর জীব, খনিজ দ্রব্য ও শিল্প কার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিব।

তণ্ডুল—ধান্য বাঙ্গলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কি প্রণালীতে ইহার চাস হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। সমতল বঙ্গে সাধারণত ৪ প্রকার ধান্য জন্মে, তাহাকে "জোম" ধান্য বলা হইয়া থাকে। জোম ক্ষেত্র ইহার উৎপত্তিস্থান বলিয়া ইহাকে জোম ধান্য বলা হয়। এই সকল ধান্যের মধ্যে আমোনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। একমন ধান্যে অর্দ্ধমন তণ্ডুল হইয়া থাকে। তণ্ডুল আমাদের প্রধান খাদ্য। আমাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া বাঙ্গালা হইতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১৬০০০০০০ এক কোটী সাইট লক্ষ মন তণ্ডুল জলপথে ও স্থল পথে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কটন সাহেব প্রণীত বঙ্গীয় তণ্ডুল বাণিজ্য প্রস্তাবে তাহার এইরূপ তালিকা প্রদর্শিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে সমুদ্র পথে প্রেরিত
১০০০০০০০ মন
চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে ,, ৩০০০০০০ ,,
উড়িষ্যা ,, ,, ,, ৫০০০০০ ,,
স্থল পথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত
২৫০০০০০ ,,
১৬০০০০০০ মন (২)

তণ্ডুলের মূল্য মন প্রতি গড়ে ২৷৷০টাকা ধরিলে ইহার মূল্য ৪০০০০০০০টাকা হইতেছে। কিন্তু যে সকল বণিক দ্বারা চারি কোটী টাকার চাউল বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে তাহারা প্রায় সকলই ভিন্ন দেশবাসী। কেবল তণ্ডুলের অন্তর্ব্বাণিজ্য মাত্র দেশীয় বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু অন্তর্ব্বাণিজ্য অপেক্ষা বহির্ব্বাণিজ্য যে অধিকলাভজনক তাহা ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলায় ধান্য জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ নওয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধান্য জন্মে। কলিকাতা বাঙ্গালার সর্ব্ব-

---

(২) ১৮৮০৮১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা গবর্ন্মেণ্টের এডমিনিস্ট্রেসন রিপোর্ট পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সেই বৎসর ১১৫০০০০০ এক কোটী পোনের লক্ষ মন তণ্ডুল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

প্রধান বন্দর। এই বন্দরে বাখরগঞ্জ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল প্রেরিত হইয়া থাকে। কটন সাহেব লিখিয়াছেন:—

Backergunge has the reputation of being the finest rice district in Bengal and a very large proportion of its exports go to Calcutta. The rice is of superior quality and exported at-once instead of being sold in the local markets. There are no deta from which we can estimate the Calcutta import of rice from Backergunge, but probably amounts to between two and three million maunds. Backergunge rice is also extensively imported into the neighbouring districts;

দ্বিতীয় বন্দর চট্টগ্রামের তণ্ডুল বাণিজ্য সম্পূর্ণ ভাবে ত্রিপুরা ও নওয়াখালির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বোধ হয় নওয়াখালি ও ত্রিপুরা হইতে চট্টগ্রামে চাউল রপ্তানী বন্ধ হইলে ইহার বহির্ব্বাণিজ্য একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসন হেস্কী সাহেব তাহার বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছেন:—

A little rice from the district of Chittagong itself is exported, but the merchants prefer the Tipperah and Noakhally grain, which, from the manner in which it is prepared, is better able to stand a sea voyage.

চট্টগ্রাম হইতে যে পরিমাণ তণ্ডুল বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার অধিকাংশই প্রায় লবণের পরিবর্ত্তে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কুটিল রাজনীতির চক্রে আমরা বিনামূল্যে তণ্ডুল বিক্রয় করিতেছি বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।

ঢাকাবাসীদিগকে প্রধানত বাখরগঞ্জ ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের তণ্ডুলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ময়মনসিংহ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ২৭ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্রে প্রেরিত হয় বলিয়া তত্রত্য কালেকটর সাহেব অনুমান করিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গ হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল দক্ষিণ বঙ্গে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হয়। কটন সাহেব পাবনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

This district is much more then selfsupporting.

শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে পাবনার চাউল আমদানী হয়, এজন্যই পাবনা হইতে অধিক পরিমাণে চাউল অন্যত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে। সেরাজগঞ্জ পাবনার প্রধান বন্দর। তথা হইতে প্রতি বৎসর ৩৫—৪০ হাজার মন চাউল কলিকাতায় প্রেরিত হয়।

কটন সাহেব বলেন। The Bagra district is said to import into Calcutta about six hundred thousand maunds annually. * * * The Rajshahye district exports little

direct to Calcutta. It transmits, however, a good deal of rice into Moorshedabad which is locally consumed in the eastern parts of that district. A large export of rice leaves Rajshahye for upcountry consumption. The district of Rangpore exports its immense surplus amounting to at least two or three millions of maunds—to Dacca, Pubna and Furidpore and also north-wards in to the Coach Behar Division.

উত্তর বঙ্গের বধ্যে দিনাজপুর হইতে অধিক চাউল বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কটন সাহেবের প্রস্তাব পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে এক অত্রাই নদীর তীরস্থিত কয়েকটী সামান্য বন্দর হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১১৭৭১৫৫ মন চাউল জলপথে রপ্তানী হইয়াছিল। উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের ন্যায় ধান্য উৎপাদক দেশ অন্যত্রে আছে বলিয়া বোধ হয় না।

উড়িষ্যা দেশেও প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা অপেক্ষা উড়িয়া কৃষকদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। উৎকলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং বারংবার যেরূপ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেছেন, তদ্রূপ জমিদার বেচারাগণ বাধ্য হইয়া নির্দ্দয়-ভাবে জমির খাজানা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কারণ গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে যে পরিমাণ কমিসন দিয়া থাকেন, এই পরিমাণ কমিসন লইয়া জমিদারি রক্ষা করা মানবের অসাধ্য। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি অনেক জমিদারকে দ্বিতীয় বন্দোবস্তে জমিদারি ছাড়িয়া দিতে হইবে। (৩)

ভূমির রাজস্ব, পথকর, প্রদেশীকর ব্যতীত আবার কেনালের কর। গবর্ণমেণ্ট কেনালের খরচ পোষাইবার জন্য কৃষকদিগের ক্ষেত্রে জল যোগাইয়া এই করটী আদায় করিতেছেন। কিন্তু কেনাল সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের দোষে দুর্ব্বল কৃষকগণ মারা যাইতেছে। অনেককে জল না লইয়া ও কর দিতে হইতেছে। কোন কোন স্থানে বর্ষার জলে ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া যায়, কৃষি রক্ষা করা অসাধ্য, তাহাদের কেনালের জলের কোনও প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকেও কেনালের কর দিতে হইতেছে। ইহা ব্যতীত কেনাল সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের আরও নানা প্রকার অত্যাচার দেখা যায়। কিন্তু প্রজাদের রোদন গবর্ণমেণ্টের সামান্য কর্ম্মচারিদিগের পাষাণ হৃদয়ে করুণা জন্মাইতে পারে না। আমরা মহামনাঃ লর্ড রিপন মহোদয়কে অনুরোধ করি তিনি একটুকু অনুগ্রহ করিয়া দুর্ভাগা উড়িয়া কৃষকদিগকে কেনাল সংক্রান্ত অত্যাচার হইতে রক্ষা করুন! জমিদারের কর্ম্মচারিগণ নির্দ্দয়, কেনালের কর্ম্মচারিগণ মহা নির্দ্দয়।

উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত

৩ পেসকসি মহালগুলি আমাদের লক্ষ্য নহে।

না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই।' আমরা উড়িষ্যার জমিদারদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা একটুকু সরল পথ অবলম্বন করুন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন। নচেৎ তাঁহারা যেরূপ নির্দ্দয় ভাবে জমির খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টও মেয়াদ অন্তে বারংবার তাহাই করিবেন। মধ্য হইতে কৃষকগণ মারা যাইবে। নিয়মানুসারে খাজানা আদায় হইবে না, সুতরাং জমিদারদিগকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

কটন সাহেবের প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কটক হইতে ১০০১৩২ মন, পুরী হইতে ১৪৪২৩৬ মন, ও বালেশ্বর হইতে ১৯৩৫৫০ মন সর্ব্বসুদ্ধ ৪৩৮২৯৮ মন চাউল অর্ণবতরী দ্বারা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল।

কার্পাস, তণ্ডুলের পরেই কার্পাসের উল্লেখ করিতে পারি। কার্পাসও কৃষিজাত।

আমাদের দেশে কার্পাসের দুই প্রকার চাস হইয়া থাকে। ১ পার্ব্বত্য বা জোম প্রণালী, ২ বঙ্গীয় প্রণালী। বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য মানবগণ জোম ক্ষেত্রে কার্পাস জন্মাইয়া থাকে। তাহা আমরা অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে,ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। পার্ব্বত্য মানবগণ বর্ষার আরম্ভে বীজ বপন করে। সুতরাং হেমন্ত ঋতুতে তাহারা কার্পাস গ্রহণ করিয়া থাকে। বঙ্গীয় প্রথা অনুসারে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে কার্পাসের বীজ বপন করা হইয়া থাকে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার ফল পাওয়া যায়। যত্ন করিলে বাঙ্গালার সকল জেলাতেই কার্পাস জন্মিতে পারে। প্রাচীন কালে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমিতে অত্যুৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত। সেই কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রই বঙ্গীয় তন্তুবায়দিগকে অদ্বিতীয় গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

ব্রিটিস ভারতের গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুরের ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২২ জুলাই তারিখের রিজলিউসন অনুসারে মিডলকট সাহেব "Cotton Hand book for Bengal" নাম গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নলিখিত তালিকা সঙ্কলন করিলাম।

প্রথম শ্রেণী।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্য কাছাড় খস, জয়ন্তীয়া ও গারো পর্ব্বত	এই সকল স্থানে পার্ব্বত্য প্রণালীর চাস দ্বারা প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মে এবং তাহা অন্যত্র রপ্তানী হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ ঢাকা বগুড়া রঙ্গপুর দিনাজপুর কুঁচ বেহার বীরভূম বাকুঁড়া বর্দ্ধমান	এই সকল স্থানে পার্ব্বত্য ও বঙ্গীয় প্রণালীর চাসের দ্বারা ন্যূন পরিমাণ কার্পাস জন্মে।

তৃতীয় শ্রেণী।

মালদহ
রাজসাহী
পাবনা
ফরিদপুর
ত্রিপুরা
নওয়াখালী
চট্টগ্রাম
বাখরগঞ্জ
সুন্দরবন
যশোহর
নদীয়া
মুর্শীদাবাদ
হুগলি
মেদিনীপুর

} এই সকল স্থানে কার্পাসের চাস নাই। অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী হয়।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত তালিকা দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে ১১৯৪২১৮ মন কার্পাস বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর সেইপথে ১১০৮০৮৩ মন কার্পাস প্রেরিত হইয়াছিল। চট্টগ্রাম পর্ব্বত-জাত কার্পাস প্রতি বৎসর প্রায় ১৭ হাজার মন অন্যত্রে প্রেরিত হয়।

পার্ব্বত্য মানবদিগের চাষের প্রণালী যে নিতান্ত কদর্য্য তাহা ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পার্ব্বত্য মানবদিগের মধ্যে কার্পাস বপনের প্রথা প্রচলিত না থাকিলে, বাঙ্গালায় কার্পাস উৎপাদন কার্য্য প্রায় রহিত হইয়া যাইত। এই প্রথা দ্বারা কি পরিমাণ কার্পাস বাঙ্গালায় জন্মিয়া থাকে তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু পাঠকগণ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবেন যে গত বৎসরে ত্রিপুরার ন্যায় একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে এই কদর্য্য-প্রণালী-জাত কার্পাসের শুল্ক হইতে ৯৪ ৯১ টাকা আদায় হইয়াছে। সুতরাং ভালরূপে সমগ্র বাঙ্গালায় কার্পাসের চাস হইলে যে কত লাভ হইবে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর।

মিডলকট সাহেব সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালার জল বায়ু ও মৃত্তিকা কার্পাস জন্মাইবার জন্য সম্পূর্ণ উপকারী এবং যত্ন করিলে বাঙ্গালায় অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিতে পারে। আমেরিকার অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হইলে পর গবর্ণমেণ্টের যত্নে ভারতে কার্পাসের চাস-বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র ভারতে অন্যূন ২২৫০০০০০ বিঘা ভূমিতে কার্পাসের চাস হইতেছে। তন্মধ্যে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে কিঞ্চিদধিক এককোটী বিঘা ভূমিতে কার্পাসের চাস হইয়া থাকে। আমেরিকা হইতে কার্পাসের বীজ আনাইয়া তত্রত্য ক্ষেত্র সমূহে রোপণ করায় বিশেষ উন্নতি ও উপকার হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় এরূপ যত্ন করিলে সমধিক উন্নতি হইত, কারণ এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে ইংরাজগণ তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশজাত কার্পাস হইতে বঙ্গীয় কার্পাস অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

পাট—নালিতা নামক গুল্মের ত্বকে পাট হয়। নালিতার চাস প্রণালী অতি সহজ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ-মাসে ভূমি উত্তম রূপে চাস করিয়া নালিতার বীজ বপন

করা হয়। তৎপরে চারা উঠিলে সেই ক্ষেত্র বাছিয়া পরিস্কার করিয়া দিতে হয়। বাছিয়া দিলে বৃষ্টির জল প্রাপ্ত হইয়া গুল্ম সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই সকল গুল্ম প্রায় ৮।১০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে আমরা দেখিয়াছি। নালিতা গুল্মে ফল হইবার উপক্রম হইলে তাহা কাটিয়া স্রোতহীন জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়। ১৫।২০ দিন জলে থাকিলে তাহা পচিয়া উঠে। তখন জল হইতে সেই সকল গুল্ম উঠাইয়া তাহার ত্বক কাষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লওয়া যায়। এবং সুখাইবার পূর্ব্বে তাহা জলে ধৌত করিলেই পরিস্কার হইয়া যায়। দিনদিনই আমাদের দেশে নালিতার চাস বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮২৮ খৃঃ অঃ মাত্র ৬০০ টাকার পাট বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের পাট দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত কলিকাতার নিকট স্থানে কয়েকটী পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল কলে চট, থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাও প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের বিদেশে প্রেরিত হয়।

ত্রিপুরা, ঢাকা, চব্বিশপরগনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, হুগলি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। পাটের সম্বন্ধে যাহারা বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বাবু হেমচন্দ্র কর প্রণীত "পাট বিজ্ঞাপনটী" পাঠ করিবেন।

শণ ইহাও নালিতার পাটের ন্যায় স্বনামখ্যাত গুল্মের ত্বক। পাটের ন্যায় ইহার চাস হয় এবং তদ্রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। শণের গুল্ম ২।৩ হাত অপেক্ষা উচ্চ হয় না। কিন্তু শণ-নির্ম্মিত দ্রব্য পাট-নির্ম্মিত দ্রব্য হইতে অধিককালস্থায়ী হইয়া থাকে। শণের দ্বারা লুই প্রস্তুত হয়। ইহার চাস অতি অল্প, সমগ্র ভারতে বোধ হয় ৪॥ সাড়ে চারি লক্ষ মনের অধিক শণ জন্মে না।

নীল—ভারতবর্ষ নীলের জন্মস্থান। এরিয়ান বলেন খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবাসীগণ ভৃগুকচ্ছ হইতে, মিসর দেশে নীল রপ্তানী করিত। নীল কৃষিজাত গুল্মের সার পদার্থ মাত্র।

বাঙ্গালা ইংরাজদিগের অধিকৃত হইলে, ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অফ ডাইরেকটার সভায় এদেশে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট নীল জন্মাইবার প্রস্তাব হয়। তদনুসারে প্রথমত বাঁশবাড়িয়া ও সুখসাগর নামক স্থানে ইংরাজগণ নীলের চাস আরম্ভ করেন। প্রথমাবস্থায় নীলকরদিগের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু অচিরাৎ তাঁহারা সেই ক্ষতি পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র বাঙ্গালায় নীলের চাস হইয়াছিল। সে সময় নীলকরগণ দরিদ্র প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিত। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ নীলকরদিগের অত্যাচারের লাঘব হইয়াছে সেই রূপ নীলের উৎপত্তির পরিমাণও ন্যূন হইয়াছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তা-

লিকা দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে বাঙ্গালা ও বিহারে গত বৎসর (১৮৮০—৮১) ৭৩৫০০ মন নীল হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব বৎসর এই দুই প্রদেশে ৮৯৮৯০ মন মাত্র জন্মিয়াছিল। গত বৎসরে জাত ৭৩৫০০ মন লীলের মধ্যে ১০০০০ মন মাত্র বাঙ্গালা দেশজাত। ক্রমেই বঙ্গে নীল চাসের অবনতি দেখা যাইতেছে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতী পত্রিকায় "নীলের বাণিজ্য" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র কিন্তু উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত আছে "কিন্তু নীলের বাণিজ্য বোধ হয় আর থাকে না। সম্প্রতি একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে এক প্রকার নীল রঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। শুনা গিয়াছিল তাহা প্রস্তুত করিতে যেরূপ অধিক খর্চ্চা পড়ে তাহাতে আমাদের দেশের উদ্ভিদ নীলের স্থান তাহার দ্বারা কিছুতেই অধিকৃত হইতে পারে না। কিন্তু আবার ফেব্রুয়ারি মাসের Nature নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রে সে দিন দেখিলাম যে, খর্চ্চার প্রতিবন্ধকও দূর হইয়াছে। অতএব নীলকরদিগের এক্ষণে সমূহ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত।"

রসায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা নীল প্রস্তুত হইলে ভালই হয়। কারণ আমাদের দেশে যে সকল ভূমিতে নীলের চাস হইয়া থাকে, তাহাতে নীলের পরিবর্ত্তে কার্পাস কিম্বা নালিতা করিলে বঙ্গবাসীদিগের লোকসান হইবে না। বঙ্গদেশে এক্ষণে যশোহর, নদীয়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, মালদহ, মুরশিদাবাদ, রাজসাহি, পাবনা, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে নীলের চাস আছে। নীলের উৎপত্তির পরিমাণ অনুসারে স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে মুরশিদাবাদে প্রথম ও বর্দ্ধমান সর্ব্বনিম্নাসন প্রাপ্ত হইতে পারে। মুরশিদাবাদের পরেই যশোহর ও নদীয়া।

গত বৎসর কলিকাতা হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলজাত ১১৯৯২৯ মন নীল সমুদ্রপথে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। তাহার মূল্য প্রতিমন ২৪১, টাকা করিয়া ২৮৯০২৮৮৯ টাকা পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ নীলকরই শ্বেতকায়, সুতরাং লভ্যের অংশ আমরা অতি অল্পই পাইয়াছি।

চা—চা এক প্রকার গুল্মের পত্র। বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বভাবত চা জন্মিতেছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জনৈক ইংরাজ আসামের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া চার গাছ দেখিতে পান। তিনি তাহার কয়েকটী চারা লইয়া কলিকাতায় আইসেন। উক্ত সাহেবকে মেনেজার করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আসামে চা-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে চার বীজ ও কয়েক জন কার্য্যক্ষম লোক আনাইয়া চা-ক্ষেত্রের কার্য্য বিশেষ রূপে আরম্ভ হয়। তৎপরে বিদেশীয় ও দেশীয় চা-কোম্পানী সৃষ্ট হইয়া কাছাড়, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম দ্বারজিলিং প্রভৃতি স্থানে চা-ক্ষেত্র হইতে লাগিল। বাঙ্গালায় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন দেশ মধ্যে এক্ষণে ২৭৪ টী চা-ক্ষেত্র আছে। (৪) যথা—

দ্বারজিলিং	১৫৫
জলপাইগুড়ি	৪৭
চট্টগ্রাম	৩১
ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশে	৪
ঢাকা	৬
হাজারিবাগ	৬
লোহার ডগা	২৫
	২৭৪

এই ক্ষেত্র গুলিতে গত (১৮৮০—৮১) বৎসরে ৬৬৭২৪৮১ পাউণ্ড কৃষ্ণবর্ণ চা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর নিম্নলিখিত স্থান সমূহ হইতে ৬১৫৫৯৪ মন চা কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫৬২৪১৮ মন বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। নিম্নে দেখ—

আমদানী।

আসাম হইতে	৪৭১১৭১ মন
বাঙ্গালা ,,	১২৬১৬১
বিহার ,,	৩৩৮৮ ,,
পাঞ্জাব ,,	২৭১৪ ,,
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও উড়িষ্যা ,,	১২১৯
ছোট নাগপুর ,,	১২১৪ ,,
অন্যান্য স্থান ,,	৭৯৪ ,,
	৬০৬৬৬১

করিতেছি যে, আমরা আসাম, শ্রীহট্ট ও ও কাছাড়ের চাক্ষেত্রের সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে পারিলাম না।

সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম হইতে আগত	৮৯৩৩
	৬১৫৫৯৪ মন

রপ্তানী।

সমুদ্রপথে ভিন্নদেশে	৫৫৬৫৬৭ মন
ভারতের অন্তর্গত বন্দর সমূহে	৫৮৫১ ,,
	৫৬২৪১৮ মন

চার চাস বেস লাভজনক।—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে চা-ক্ষেত্রের লভ্য অধিকাংশ শ্বেতপুরুষদিগের উদরস্থ হইয়া থাকে। দেশীয় মানবদিগের ইহাতে অতি অল্পই অংশ আছে।

তামাক—বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই তামাক অল্প ও অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আকবর সাহের সময় ভারতে তামাকের ব্যবহার ও চাস আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজগণ আমাদের দেশীয় তামাকের উন্নতি সাধন পক্ষে কিঞ্চিৎ যত্ন করিতেছেন। কিন্তু দেশবাসীগণ সেই প্রাচীন প্রথানুসারেই তামাকের চাস করিয়া থাকেন। যত্ন করিলে তামাক চাস করিয়াও বিলক্ষণ লাভ করা যাইতে পারে।

গত বৎসর কলিকাতায় ৬০২৮৬ মন তামাক আমদানী হয় এবং ২৬৩৭৬৯ মন বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমদানী।

বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে ৫৬০২৯৫ মন

৪ আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ

বিহার প্রদেশ হইতে	২৫০৯৩,,	
উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশ হইতে	২০৭ ”	
অন্যান্য স্থান হইতে সমুদ্র পথে আমদানী	১৭২৬ ”	
	৬০২৮৬৪	

রপ্তানী।

মাদ্রাজে	৮১৭	মন
বোম্বে	৩৭৭	“
ব্রিটীসব্রহ্ম	১৪৯০৫৬	“(৫)
ভারতের অন্তর্গত অন্যান্য বন্দর সমূহ	১৫৫৩০	“
	২৬৫৭৮০	
গ্রেটব্রিটনে	৫০৯১৮	মন
অন্যান্য বিদেশীয় বন্দরে	৪৭০৭১	“
	৯৭৯৮৯	
	২৬৩৭৬৯	

তামাকের মন গড়ে ৮ টাকা ধরিলে আমরা গত সন তামাক বিক্রয় করিয়া ২১১০১৪৩ টাকা পাইয়াছি। মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাকের পরে গাঁজা ও আফিঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকলের চাসও লাভজনক, কিন্তু তাহা গবর্ণমেণ্টের একচাটিয়া ব্যবসায় সুতরাং আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

গোল আলু—বাঙ্গালার কোনও কোন ও স্থানে গোল আলু বা বিলাতি আলুর চাস আছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প যে বিদেশে রপ্তানী করা দূরে থাকুক তদ্দ্বারা আমাদেরই কুলাইয়া উঠে না। আলুর চাস বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে বিলাত হইতে ভাল বীজ আনাইয়া রোপণ করিলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট আলু জন্মিতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশের জোমক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বৎসরান্তে যখন পার্ব্বত্য মানবগণ জোমক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাতে আলু রোপণ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। কারণ পার্ব্বত্য প্রদেশে জঙ্গল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করা অত্যন্ত খরচের প্রয়োজন, কিন্তু পরিত্যক্ত জোম ক্ষেত্রে কার্য্য করিলে জঙ্গল কাটীবার খরচ কিছুই লাগিবে না। ত্রিপুরার মহারাজ ইচ্ছা করিলে অল্প ব্যয়ে নানা প্রকার কৃষি করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত পার্ব্বত্য প্রদেশেও প্রতিবৎসর অনেকগুলি জোম ক্ষেত্র পাওয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট হইতে পাটা লইয়া বঙ্গীয় যুবকগণ পরিত্যক্ত জোম ক্ষেত্রে নানা প্রকার কৃষি করিতে পারেন।

শর্করা—কৃষিজাত ইক্ষু ও খর্জ্জুর বৃক্ষের রস হইতেই প্রধানত শর্করা জন্মে। ভারতবর্ষই শর্করার জন্মস্থান। বোধ হয় ইংরাজি sugar শর্করা শব্দের অপভ্রংশ। শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত বর্ষের জনৈক রাজদূত চীনদেশে গমন করেন। সে সময় তিনি ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের যে তালিকা দিয়াছিলেন, তাহা মাওয়ালিনের গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইক্ষুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আমরা সুযোগ্য বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকমত্যে বলিতেছি যে ভারতবাসীগণই সর্ব্ব প্রথম বৃক্ষরস হইতে শর্করা প্রস্তুত করিয়া জগদ্বাসীদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে অধুনা সেই প্রাচীন নিয়মানুসারেই ইক্ষু ও খর্জ্জুরের চাস হইতেছে, ইহার কিছুমাত্র উন্নতি দেখা যায় না। দিন দিন শর্করার প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে অন্য দেশের নিকট শর্করা ভিক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্টেরও তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ হইয়াছে। এই সময় বঙ্গবাসীগণ ভাল রূপে ইক্ষু ও খর্জ্জুরের চাস আরম্ভ করুন, যথেষ্ট লাভ হইবে।

গত বৎসর কলিকাতায় নিম্ন লিখিত রূপ শর্করা আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে।

আমদানী।

	গুড়		চিনি	
বঙ্গমধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে	৭৪৫২৭৬	মন	২৫৩০৩৫	মন
বিহার প্রদেশ হইতে	৩৯৪০৮	”	২১৩৪৭	”
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা হইতে	৪৪৮১	”	৭৯৪৪	”
মাদ্রাজ হইতে	১৪০	”	২৬১০১	”
বোম্বে হইতে	* *		১২২৬	”
পাঞ্জাব হইতে	২৪৩	”	১	”
অন্যান্য স্থান হইতে	৫৫	”	৫৯৪৭৯	”
	৭৮৯৬০৩	মন	৩৬৯১৩৩	মন

রপ্তানি।

	গুড়		চিনি	
জলযান দ্বারা প্রেরিত	১৯০৩২	মন	১২৮৭৬	মন
বৈদেশিক বন্দর সমূহে	৫৮৮৭	”	৬০০২৯	”
ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহে	২৪৯১৯	মন	৭২৯০৫	মন

৫ আমাদের দেশের মাদক দ্রব্য সমস্তই পূর্ব্বদিকে যাইতেছে, বোধ হয় ইংরাজজাতি মগের মুল্লুকটা উচ্ছিন্ন না করিয়া ছাড়িবেন না।

যে রূপেই হউক আমাদিগের শর্করার কার্য্য একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। ও-দিকে বোম্বেবাসী ভ্রাতৃবর্গ মরীচ দ্বীপের নিকট শর্করা ভিক্ষা করিতেছেন, তাহাদের অভাব পূর্ণ করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মরীচ দ্বীপে কেবল ইক্ষু জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালায় ইক্ষু ও খর্জ্জুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ রস হইতে শর্করা প্রস্তুত হয়। প্রকৃতিক উপযোগিতায় ভারতবর্ষ মরীচ দ্বীপ হইতে হীন নহে। সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ইক্ষু ও খর্জ্জুরের চাস হইলে আমরা প্রচুর পরিমাণে ধনলাভ করিতে পারিব, ভাল রূপ চাস করিলে এক বিঘা ভূমিজাত ইক্ষুদ্বারা ১২ ১৩ মন গুড় হইতে পারে, ৪ টাকা মন হইলে এক বিঘা ভূমিতে ৪৮।৫২ টাকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, সম্ভবত ইংরাজগণ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। * এই সময় বঙ্গবাসীগণ সতর্ক হউন, তাহারা পরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন ইহাই আমাদের অভিলাষ।

শরৎ কাল।

প্রভাত সঙ্গীত।

(দুধের মেয়ে।)

আয় রে আনন্দময়ী আয় মেয়ে বুকে আয়!
হাসিহাসি কচি মুখে নূতন ভুবন ভায়।
স্বর্গের কুসুম তুমি ফুটিয়াছ ভবনে,
ত্রিদিবের মন্দাকিনী হাসে তোর নয়নে।
তুমি সারদার বীণা খেলা কর কমলে,
আধ বিজড়িত বাণী শোনে প্রাণী সকলে।
ঈশ্বরের কৃপা তুমি জগতের জননী,
তাই মা হাসিলে তুই হেসে ওঠে ধরণী।
তোমায় দেখিতে ওই নব ভানু উঠেছে!
কতই কুসুম পরি বনদেবী সেজেছে!
পাখীরা আনন্দে গায় তোমারি মঙ্গল গান,
রাঙা চরণ দুখানি যোগী যোগে করে ধ্যান।
সৌরভে আকুল হয়ে সুখ সমীরণ বয়,
চারি দিকে দেখি সব কি এক আনন্দময়!
কাহার হৃদয় আছে কে তোমার পূজা করে,
কেন গো করুণাময়ী এসেছ আমার ঘরে!
হারায়েছি তোর কোল বহু দিন জননী,
তাই কি দেখিতে মাগো আসিয়াছ অবনী?
আয়রে আনন্দময়ী আয় বরু † বুকে আয়!

* অদ্যাপি সাহেবদিগের চিনির কারবার আছে।

† বরু—বরদারাণী—বয়স এক বৎসর।

কিবে কালো চুলগুলি কাঁপিছে মৃদুল বায়!
পয়োধর-সুধা ভুলে, আহ্লাদে দু হাত তুলে
আকুলি ব্যাকুলি বাছা কেন কোলে আসিতে?
দাঁত দুটী ফুটফুটি অমায়িক হাসিতে!
আয়রে আনন্দময়ী,দাও প্রিয়ে কোলে দাও!
স্নেহেতে গলিয়া প্রাণ ভেসে যায় দুনয়ান,
না জানি প্রেয়সী এরে নির্জ্জনে কি নিধিপাও!
বৃথা পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধানা নারী;
কতই কতই বেশি স্নেহ সুখে অধিকারী!

স্বভাবে অভাব আছে পূরাব কেমন কোরে!
প্রাণে যত ভালবাসা,তত ভালবাসি তোরে॥
আহ্লাদের সীমা নাই—
চাঁদ মুখে চুমি খাই
কোথায় রাখিলি মুখ, এ যে বুক মরুস্থল,
বহে না স্নেহের নদী, ফলে না অমৃত ফল।
উদার—উদারতর
রমণীর পয়োধর
না জানি কাহার তরে সময়ে প্রকাশ পায়!
কিবে কোটি চন্দ্র-প্রভা!
যুবকের মনোলোভা
বালকের ক্ষুধাহরা সুধা'রসে ভেসে যায়!
স্বভাবে অভাবআছে,পূরাব কেমন কোরে!
প্রাণে যত ভালবাসা,তত ভালবাসি তোরে।
বিচিত্র বিধাত! তব স্নেহের মোহন ডোর,
ফুরাবে না স্বপ্ন কভু ভাঙিবে না ঘুমঘোর!
অতি অপরূপ মায়া, অপরূপ সমুদয়,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি কি এক পিরীতি ময়!

মধ্যাহ্ন সঙ্গীত।

(গৌরসারঙ্গ—একতালা।)

চরাচর ব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্ দিগন্তর উদাস মূরতি
উদার স্ফূরতি পায়।

বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য;
দূর—অতিদূর তু পাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

শুভ্র শুভ্র অভ্ররাজি
ধবলা শিখরী সাজি
চলিয়াছে ধীরে ধীরে না জানি কোথায়!

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম,
নত-মুখ ফুল ফল,
নত-মুখী লতা নেতিয়ে প'ড়েছে
স্তবধ সরসী-জল;

শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম, মূঢ় পশু প্রাণী,
'ঘুঘু ঘু—ঘু ঘুঘু' কাতরা কপোতী
করুণা করিয়া গায়।

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর,
স্তব্ধ হ'য়ে আছে উদার সাগর,
ধূধূ মরুস্থলী, বিহ্বল হরিণী
চমকি চমকি চায়।

স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত !
একটু ও নাহি বায় !

বিরাম দায়িনী কোথা নিশীথিনী
স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী ;
মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিণী
মোহিনী মায়ার প্রায় !

ল'য়ে এস সেই মেদুর সমীর,
ঝুরু—ঝুরু—ঝুরু, মধুর, অধীর,
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায় !

সন্ধ্যা সঙ্গীত !

(ভাগিরথী তীরে—দক্ষিণে হাবড়ার সেতু
এবং উত্তরে নিমতলার শ্মশান।)

১

ডুবেছে রবির কায়া, দিবা হ'ল অবসান !
প'ড়েছে প্রশান্ত ছায়া জুড়াতে জগত-প্রাণ।
চারিদিক্ সুশীতল,
নিবে গেছে কোলাহল,
কিবে এক পরিমল ভাসিয়া বেড়ায় !
আলুয়ে প'ড়েছে ভব,
আলুয়ে প'ড়েছে সব,
আলুথালু হ'য়ে ধরা তিমিরে করিছে স্নান।

২

গঙ্গার স্নেহের কোলে
সমীরণ ঘুমে ঢোলে,
স্বপনে সাঁজের তারা মেলিছে নয়ান।
তীর-ভূমে তরুগণে
বসিয়াছে যোগাসনে,
কে তুমি প্রাণের প্রাণে তুলেছ পুববীতান!

৩

ঢুলিয়া পড়িছে মন,
দুর্ব্বাদলে যোগাসন,
কি যেন স্বপন দেখি মুদিয়া নয়ন !
নাবিকেরা খুলে প্রাণ
দূরেতে ধ'রেছে গান,
কি সুধা করিছে পান ঘুমন্ত শ্রবণ !

৪

টুপ্ টুপ্ শব্দ জলে,
আসিতেছে পলে পলে,
কি জানি কি কথা বলে বুঝা নাহি যায় ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ছেলে
কেন বাছা হেসে ফেলে,
শুনিতে সে স্বর্গ কথা সদা প্রাণ-চায়।

৫

নিথর সলিল পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী,
দুপাখা ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে ;
মধুর মন্থর গতি,
চলিয়াছে গর্ব্ভবতী
সম্পূর্ণ-যৌবনা সতী পতির সকাশে।

৬

নৌকায় প্রদীপ জ্বলে
তারকা ফুটেছে জলে,
জলতলে ঝল্‌মলে বিশাল মশাল ;
লুকান তপন-রেখা
ফের বুঝি যায় দেখা !
হারাণো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল !

৭

দুপার জুড়িয়া সেতু,
যেন প'ড়ে ধূমকেতু,
যেন শুয়ে কোন এক দৈত্য দুরাশয়,
লাল লাল চক্ষু মেলি
নিদ্রা মৃত্যু অবহেলি,
আক্রোশে শ্মশান পানে তাকাইয়া রয়।

৮

উঠিল কাঁসর রোল,
শঙ্খ ঘণ্টা উতরোল,
আরতি-প্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে ঘাটে ;
আর্দ্র হ'য়ে ভক্তি ভরে
'মা—মা' শব্দ করে,
আনন্দের কোলাহলে দিক্ যেন ফাটে।

৯

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই !
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হারায়ে আঁধারে,
করিয়া জ্ঞানীর ভাণ,
পুষি বুকে অভিমান,
ঘোর্ পৌতলিক——সদা পূজি আপনারে

১০

নগরীর মনোরথ
পূর্ণ করি রাজপথ,
হাসিয়া উঠিল কিবা প্রসারিয়া কায়া !
সুন্দরী আলোক মালা
সারি দিয়ে করে খ্যালা,
বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ছায়া।

১১

আর্‌তো লাগেনা ভাল,
কে তোরা জ্বালালি আ'ল !
কোথায় হারাল বল ঘুমন্ত হৃদয় !
চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়।

১২

উদয় না হ'তে হায়,
শশীকলা অস্তে যায়,
মুমূর্ষুর প্রাণ যেন ঝিক্ ঝিক্ করে !
বিষণ্ণ শ্মশান-ভূমি,
ঘুমায়ে রয়েছ তুমি !
কার্ ওই চিতানল ভস্মের ভিতরে !

১৩

প্রতিদিন কোলাহল,
প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয় !
এই যে অসংখ্য তারা,
অজর অমর পারা,
এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয় ?

১৪

অনন্ত কালের সিন্ধু,
বিশ্ব বুদ্বুদের বিন্দু,
এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার ;
এসেছি বা কোথা হ'তে,
ফিরে যাব কি জগতে,
কিছুই জানিনা ঠিক্ ঠিকানা তাহার !

১৫

বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
চঞ্চল চাতক দল

উড়ে উড়ে অন্ধকারে করে কল গান !
আমি কেন এই খানে
চাহিয়া শ্মশান পানে
কিছুতেই নাহি পারি ফিরাতে নয়ান !

১৬

ও কে গো কাতর স্বরে
আন্‌-মনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী পানে !
ও রো কি আমারি মত
হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত !
ফোটে না কুসুম আর্‌ সাধের বাগানে !

গান।

কাফি—যৎ।

জীবন যন্ত্রণা-ময়,
কিছু—কিছুই নাই সুখোদয় !
করি প্রেমামৃত পান
ঘুমায় পাগল প্রাণ,
কে তারে জাগালে অসময় !

বসন্তে নিকুঞ্জ বনে
কুহরে কোকিল গনে,
বনবালা প্রফুল্ল বয়ান ;
যৌবন-সীমান্তে আসি
ফুরায় সাধের হাসি,
চাঁদিনী যামিনী অবসান !

কোথা সে নন্দন বন,
কোথা সে সুখ-স্বপন,
আর্‌ কেন দেহে প্রাণ রয় !

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

রুশীয় নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়।

নিম্নলিখিত নিহিলিষ্ট নায়কদিগের বক্তৃতার উদ্ধৃতাংশ গুলি পাঠ করিলেই উহাদিগের মত পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন !

"এই পৃথিবীতে যে সকল রীতি নীতি প্রচলিত আছে তাহা সকলই দূষিত অতএব ইহাকে ধ্বংশ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে নূতন প্রথা সংস্থাপন করিয়া সমাজের পুনর্গঠন করা আবশ্যক। পৃথিবী হইতে মিথ্যাকে বিদূরিত করিয়া সত্য স্থাপন করা প্রয়োজন। এই পৃথিবী মিথ্যায় পরিপূর্ণ, এবং যে মিথ্যা ইহাকে প্রপীড়িত করিতেছে তাহার আদি কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাস। অতীব আদিম কাল হইতে রাজা এবং

ধর্ম্মযাজকেরা সমস্ত-জগতের শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর এই বিশ্বাস মনুষ্যজাতির অন্তঃকরণে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে এবং অদ্যাবধিও দিতেছে। পরলোক আছে এবং ইহলোকে যাহারা রাজা এবং ধর্ম্মযাজকদিগের নীচ আজ্ঞা সকল প্রতিপালন করিতে অণু-মাত্র ত্রুটি করিবে তাহাদিগকে পরলোকে নরকের অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইবে, এই মিথ্যা বিশ্বাস মনুষ্য-হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারিতার একটী কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি বই আর কিছু নহে। ইহার কল্পনা করিবার অর্থ এই যে পৃথিবীর দশ অংশের একাংশ, অবশিষ্ট নয় অংশ মনুষ্যজাতিকে অধীনস্থ রাখিয়া তাহাদি-গের উপর কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচার করি-বার আশয়ে কল্পিত ঈশ্বরের ভীষণ মূর্ত্তি ভীতির স্বরূপ তাহাদিগের অন্তঃকরণে খোদিত করিয়া দিয়াছে। যদ্যপি বাস্ত-বিকই ঈশ্বর থাকিতেন তাহা হইলে যে সিংহাসনের পদমূলে মনুষ্যজাতি শৃঙ্খ-লিত রহিয়াছে সেই সিংহাসনকে তিনি তাঁহার হস্তস্থিত বজ্রদ্বারায় অচিরাৎ বিচূ-র্ণিত করিতেন। এবং সত্য—যে ধর্ম্মালয় সকলের মধ্যে মিথ্যা রূপ মেঘাবৃত রহি-য়াছে, সেই সকল ধর্ম্মকেও অবিলম্বে খণ্ড-খণ্ড করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। ঈশ্ব-রের অস্তিত্বে বিশ্বাস রূপ শৃঙ্খল অন্তঃক-রণ হইতে ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর, কারণ যে পর্য্যন্ত ঐ কুসংস্কার অণুমাত্র অন্তঃকরণে স্থান পাইবে, সে পর্য্যন্ত স্বাধীনতা যে কি পদার্থ তাহা কখনই অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না।"

"যখন ইহা জানিবে যে তুমি পুরো-হিত-প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরে বিশ্বাস অন্তঃকরণ হইতে স্বমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছ, যখন জানিবে যে কেবল আক-র্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণী নিয়মসমষ্টির মিলনেই তোমার এবং চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইহা জানিবে যে তুমি স্বাধীনতার দিকে একপদ অগ্রসর হই-য়াছ ; এবং ইহা নিশ্চয় জানিও যে তখনই তুমি অত্যাচার-প্রসূত কল্পিত মিথ্যা সহজেই তোমার মন হইতে দূর করিতে সক্ষম হইবে।"

প্রথম মিথ্যা ঈশ্বর। দ্বিতীয় মিথ্যা (১) স্বত্ব। (২) ক্ষমতা দ্বারাই অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষতঃ নির্ব্বোধ সাধারণ মনুষ্যজাতি অল্পসংখ্যক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দ্বারা পদদলিত হইবার জন্যই ইহার রাজ্য দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে।"

"ক্ষমতাই সমাজের ভিত্তিমূল। ক্ষমতা দ্বারাই বিধি গঠিত ও খণ্ডিত হইতেছে, অতএব এই যে ক্ষমতা ইহা সাধারণের হস্তে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যে দশাংশের নয় অংশ মনুষ্যজাতির প্রভুত ক্ষমতা অবশিষ্ট একাংশের কল্পিত ক্ষমতা দ্বারা পেষিত হইতেছে সেই প্রভুত ক্ষমতা-শালী সাধারণের হস্তে ঐ ক্ষমতা ন্যস্ত

---

১ Right.
২ Might.

থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যখন তুমি তোমার নিজের ক্ষমতা পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখনই তুমি কল্পিত অধিকারের সংস্কার এক কালীন ধ্বংশ করিতে সক্ষম হইবে।''

" এই প্রকারে যখন তুমি তোমার মনকে ঈশ্বরে ভয়, এবং কল্পিত অধিকারের প্রতি অকারণ আস্থা হইতে নিস্কৃতি দিতে সমর্থ হইবে, তখন তুমি যে সকল অবশিষ্ট শৃঙ্খল দ্বারায় শৃঙ্খলিত আছ, যাহাকে তোমরা বিজ্ঞান, সভ্যতা, বিষয়, বিবাহ, বিচার নীতি এবং ন্যায় বলিয়া থাক তাহা অবিলম্বে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিসাইয়া যাইবে।''

"আমাদিগের প্রথম কার্য্য যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে সেই সকলকে ধ্বংস করা। ভালই হউক আর মন্দই হউক সকলকেই ধ্বংস করিবে; কারণ এই পুরাতন পৃথিবীর এক অণুমাত্রও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে নূতন কখনই গঠিত হইবে না।"

"পুরোহিতদিগের কপোলকল্পিত গল্পে আমরা জানিতে পারি যে পুরাকালে জলপ্লাবনে সমস্ত মনুষ্যজাতি ধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর কেবল মাত্র নোয়া (Noah) কে রক্ষা করিয়া ছিলেন। এই প্রকার নোয়াকে রক্ষা করিবার কারণ কেবল পুরাতন পৃথিবীর মিথ্যা ও অত্যাচারের বীজ নূতন পৃথিবীতে পুনর্ব্বপন করা ব্যতিরেকে আর কিছু নহে। ইহা নিশ্চয় জানিও পৃথিবীর যে অধিকাংশ মনুষ্যজাতি দাসত্বে শৃঙ্খলিত রহিয়াছে তাহারা যখন উত্থান করিয়া ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইবে, তখন এই জগতের যে কোন শক্তি হউক না কেন, তাহার গতিরোধ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।"

"ভবিষ্যতে একটি বড় শ্রেণীর সৃষ্টি হইবে; এক্ষণকার ন্যায় ধনী এবং দরিদ্র বলিয়া দুইটি ভিন্ন সম্প্রদায় থাকিবে না। কি জীবিকানির্ব্বাহে, কি শিক্ষা-লাভে, সমস্ত বিষয়েই সকলে সমান ভাবে অধিকার পাইবে। কি শারীরিক, কি মানসিক পরিশ্রম উভয় বিষয়ে সকলে সমপরিমাণে অধিকারী হইবে। সমস্ত সন্তানকে জন্মাবধি সমান রূপে প্রতিপালন কর, ও শিক্ষা দেও, এবং যৌবনে তাহাদিগের অভাবমোচনের সমান উপায় ও সমাজে সমান পদ দেও, দেখিতে পাইবে যে বৈসম্য এক্ষণে সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা একেবারে অদৃশ্য হইবে। কারণ, ইহা কেবল পৃথক রূপে পালিত ও বর্দ্ধিত হইবার ফল ব্যতিরেকে আর কিছু নহে। যখন তুমি দেখিবে যে, পালন, বর্দ্ধন, ও পরিশ্রম এই সকল বিষয় মনুষ্যজাতির মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে অপরাধ, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি এই পৃথিবী হইতে একবারে লোপ পাইবে।"

"ন্যায় অন্যায়ের বিচার-শক্তি শিক্ষা হইতে উদ্ভূত। বিবেচনা কর যে কোন একটি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কাহাকে হত্যা করে, এবং হত্যা করিবার অগ্রে হত্যা করিব বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়া থাকে, তাহা

হইলে হত্যা করিবার পর ঐ ব্যক্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত অনুতাপিত হয় এবং তাহার মনের মধ্যে একটি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু কোন একটি(৩) রেড ইণ্ডিয়ান, যে, উপরোক্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় প্রত্যেক অংশে রক্তে ও মাংসে গঠিত, সে কোন অরক্ষিত শত্রুকে বধ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়, অথচ তাহার অন্তঃকরণে কোন প্রকার কষ্ট কিম্বা অনুতাপের উদয় হয় না। ইহার কারণ এই যে সে বাল্যাবধি শিক্ষিত হইয়াছে যে শত্রুকে যে কোন প্রকারে হউক নিধন করিতে পারিলেই স্বর্গীয় সুখময় (৪) শিকার ভূমিতে সাদরে গৃহীত হইবে।"

"অনেকের মনে এই কুসংস্কার আছে যে রাজনৈতিক হত্যাকারীদিগের ক্রিয়া সকল ব্যক্তিগত ঘৃণা কিম্বা প্রতিশোধ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এই প্রকার বিশ্বাস তাহাদিগের নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। নিহিলিষ্ট হত্যাকারীরা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছে যে যদ্যপি তাহারা অদ্য একটী সম্রাট্‌কে হত্যা করে কল্য আবার তাহার স্থানে নূতন সম্রাট প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং ঐ সম্রাট পুনশ্চ পুলিষ ও (৫) তৃতীয় বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন। তবে যে মধ্যে মধ্যে হত্যা করা হয় তাহার কারণ এই যে ক্ষমতাকে পূজা এবং উহার প্রতি অযথা মর্য্যাদা করা বহুকাল হইতে মনুষ্যের অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, ফলতঃ এই প্রকার হত্যা করিতে করিতে ক্রমশঃ মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে ঐ অভ্যাস অপসারিত হইবে। সম্রাট্ এবং তাহার কর্ম্মচারিদিগের উপর আক্রমণ যত বৃদ্ধি হইবে ততই লোকে উহাদিগের প্রতি বহু-শতাব্দীপ্রতিষ্ঠিত অসঙ্গতি বুঝিতে পারিবে।

"যখন লোকে ইহা বুঝিতে পারে যে একটী সামান্য ব্যক্তিকে হত্যা করিলে যে দণ্ড হয় রাজাকে হত্যা করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় না, তখন মনুষ্য মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার ভয়ানক যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া মনুষ্য হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাকে হত করা যতদূর সঙ্গত সেইরূপ যে ব্যক্তি তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার-দোষে দোষী তাহার প্রাণনাশ করা সেই পরিমাণে সঙ্গত। যদিও এক্ষণকার সমাজ দূষিত তথাচ ইহা কতকটা বুঝা গিয়াছে যে রাজহত্যা এবং সামান্য মনুষ্যহত্যা উভয় সমান। পুরাতন পৃথিবী এক সময়ে আধিপত্য করিয়াছে কিন্তু এক্ষণে উহার ধ্বংশাবশেষের উপর দুঃখী এবং প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ হাত ধরাধরি করিয়া হাস্য করিবে, এবং নরকে দুঃখী ব্যক্তি যেমন ধনী ব্যক্তিকে এক বিন্দু জল দেয় নাই এবং কহিয়া ছিল "তোমার এক সময় ছিল এক্ষণে আমার সময়" সেই

---

৩ Red Indian.

৪ Sternal hunting ground of Heaven.

৫ Third section of police. Something secret spy.

প্রকার প্রপীড়িত প্রপীড়কদিগকে কহিবে "তোমার এক সময় ছিল এক্ষণে আমার সময় আসিয়াছে।" (৬) তখন নূতন উদার চেতা ও স্বাধীন মনুষ্যজাতির আবির্ভাব হইবে এবং যত দিন না কল্পিত ষিনিক্সের (৭) ন্যায় পুরাতন পৃথিবীর ভস্মাবশেষ হইতে দুঃখের পুনরুত্থান হয়, তত দিন মনুষ্যজাতি সুখে থাকিবে। তখন আমাদিগের সন্তানদিগের সন্ততিরা আমাদিগের কার্য্য নূতন রূপে আরম্ভ করিবে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে দুঃখের উত্থান হইবে তাহা আমরা যে কষ্টের জন্য বিলাপ করিতেছি তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অল্প হইবেক। যেমন আমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছি তাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক সমিত। এই প্রকারে চেষ্টার উপর চেষ্টা এবং বহু শতাব্দীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর মনুষ্যজাতি অবশেষে সম্পূর্ণতায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরে পরিণত হইবে। ভ্রাতৃগণ উত্থান করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হও, ঈশ্বরত্বের জয় করিতে অগ্রসর হও।"

উপরে নিহিলিষ্ট নায়কদিগের বক্তৃতার স্থানে স্থানে যাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম উহা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক মাত্রেই নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। নিহিলিষ্টদিগের মত এবং উহার উদ্ভাবনকর্ত্তার বিষয় আমরা কতকটা অবগত হইলাম, এক্ষণে উক্ত বিষয়ের যতদূর সম্ভব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

নিহিলিষ্টদিগের দর্শন শাস্ত্রে নৈরাস্য ব্যতিরেকে অন্যকিছু দৃষ্ট হয় না। উহাদিগের মতে বর্ত্তমান যে সমাজ আছে তাহাকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন করা সম্ভব নহে। এই দর্শন শাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর ধ্বংশই পৃথিবীর মুক্তি। ফলতঃ সমাজের ধ্বংশ হইলেই সামাজিক দুঃখের অবসান এবং সামাজিক নির্ব্বানই সামাজিক সুখ। রুশীয় সংস্কারকেরা যখন দেখিতে পান যে বর্ত্তমান যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে তাহা দ্বারা সামাজিক অভাব মোচন দুঃখের শেষ ও দোষ সমূহের কিছু প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই তখন তাহাদিগের মন (৮) মৌলিক পরিবর্ত্তনের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ সামাজিক রীতি, বিধি, সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধন এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলের উপর প্রবলরূপে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়।

কোন কোন য়ুরোপীয় লেখক, রুশীয়দিগের এবম্প্রকার মনের ভাব ও সামাজিক বিশৃঙ্খলতার নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ প্রদর্শন করেন।

১ম বিস্তৃত রুশ দেশ পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত।

২ য় (৯) কেন্দ্রীয় বায়ু সদাসর্ব্বদা বহমান।

৩য় সামুদ্রিক বায়ু স্বভাবের উষ্ণতা উপশম করিতে অসমর্থ।

৪র্থ রুশীয়দিগকে স্বভাবের কর্কশ অপ্রসন্ন মূর্ত্তি সদা সর্ব্বদা দেখিতে হয়।

৫ম কৃষকদিগের ঔদাস্যজনক গান।

৬ষ্ঠ আধুনিক কবিদিগের বিলাপকারী শোকপূর্ণ বীণানাদ।

৭ম রুশ দেশীয় প্রান্তর ভূমির দুঃখ ব্যঞ্জক বিমর্ষ দৃশ্য।

৮ম উহার কান্তার ও অরণ্য সকলের নীরস একভাবকতা। উন্নতির পক্ষে এই সকল অনিবার্য্য স্বাভাবিক বাধা সকল থাকা প্রযুক্ত রুশীয়দিগের নিস্তেজ মন নৈরাস্যের দিকে ধাবিত হয়। অধিকন্তু রুশ দেশীয় সাধারণ লোকের অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগের সঙ্গে মিলিত হইবার কোন প্রকার সুবিধা নাই। ফলতঃ আধুনিক য়ুরোপীয় উন্নত ভাব সকল বিশেষ রূপে জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত রুশীয় কৃষকশ্রেণী উন্নতির দিকে সম্পূর্ণ উদাস। স্বভাবের অসম্পূর্ণতা-প্রসূত ক্লেশ ও অভাব সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া রুশীয় কৃষক শ্রেণী নীচ রাজভক্তিতে শৃঙ্খলিত হইয়াছে। তাহারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারবশতঃ দূরবর্ত্তী ক্ষমতাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া থাকে এবং তাহারা বহুদর্শিতার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের চর ও মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া থাকে; অথচ তাহারা স্বেচ্ছাচারপূর্ণ শাসনপ্রণালীর নীচ দাসত্ব বহন করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকারে স্বাধীনতা, উন্নতির আশা, ও উদ্দেশ্যবিহীন হওয়ায় তাহাদিগের মন উদ্যমবিহীন; সুতরাং পাশব প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে করিতে চালিত হয়। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে দাসের ধৈর্য্য-বলগা মুহূর্ত্ত মধ্যে শিথিলিত হইয়া বিষম শত্রুতাতে পরিণত হইতে পারে। স্বাধীন কিম্বা পরাধীন যে জাতিই হউক না কেন যাহারা শীর্ষ স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারায় প্রপীড়িত হইয়া ভয়ে বশ্যতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, তাহাদিগের বাহিরে মূর্খতা ও নম্রতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার ভয়ের বা অনিষ্টের কারণ দেখা যায় না; কিন্তু তাহাদিগের শিরায় শিরায় চতুরতার স্রোত বহমান, সুবিধা পাইলেই তাহারা তাহাদিগের নীচ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

পর্য্যটকদিগের বর্ণনাতে অবগত হওয়া যায় যে রুশ দেশে প্রবেশ করিলেই এক প্রকার স্থিরতার ও মৃতবৎ নিস্তব্ধতা দৃষ্ট হয়। ভয় ও নীরস স্বাতন্ত্রতা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান; এবং কোন প্রকার পরিশ্রম-জনিত ব্যস্ততার অভাবই ইহার কারন বলিয়া প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশ মধ্যে ক্ষমতাশালী মধ্য শ্রেণী আছে, কিন্তু রুশ দেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। ফলতঃ রুশ দেশে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়; এক দিকে উচ্চ শ্রেণী—ইহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী; অপর দিকে কৃষক শ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধই সামাজিক শান্তির পক্ষে বিশেষ দূষণীয়। ইহা ব্যতিরেকে রুশীয়া মধ্যে আর একটী স্বতন্ত্র

৬ For allusion see Bible
৭ Allusion of Phoenix.
৮ Radical.
৯ Polar.

দৃশ্য দেখা যায়। অন্যান্য স্বাতন্ত্রী দেশে উচ্চ শ্রেণী লোকদিগকে বিশেষ ক্ষমতাশালী দেখা যায় কিন্তু রুশ দেশে উচ্চ শ্রেণী লোকদিগের বিশেষ ক্ষমতা নাই; রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা সম্রাটের হস্তগত। রুশীয় ইতিহাস পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায় যে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে যখনই নূতন সম্রাট হইয়াছেন তখনই রাজ্যে দুই চারিটী ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীগত হইয়া ক্ষমতাশালী হইয়াছেন, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। অদ্য যে ব্যক্তির হস্তে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত হইল কল্য হয়ত তাঁহাকে সেই সাইবরিয়ার অরণ্যে নির্ব্বাসিত, না হয় উদ্বন্ধন-কাষ্ঠে দোদুল্যমান হইতে হইয়াছে। এই কারণ গুলি থাকা প্রযুক্ত উভয় শ্রেণী লোকদিগকে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায়।

উপসংহারে বর্ত্তমান রুশীয় রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় কিছু সমালোচনা করিয়া আমরা পাঠকদিগের নিকট অবসর গ্রহণ করিব। রুশ দেশের অবস্থা দিন দিন অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া আসিতেছে; অতি শীঘ্রই যে একটা ভয়ানক রাজ্যবিপ্লব ঘটিবেক তাহাতে সংশয় নাই। কঠিন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও যে নিহিলিষ্ট দলের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না, এবং যাহারা এত দূর নিগ্রহ সহ্য করিয়া নিরুৎসাহ হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ দ্বিগুণতর উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত কোন প্রকার বাধা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাদিগের অভীপ্সিত বিষয় লাভাশয়ে অবাধে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদিগের আশা আপাততঃ না হউক অতি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যত কালের মধ্যেই যে সম্পূর্ণ না হইবে তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? ঐ বিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে যেন প্রত্যেক পদক্ষেপে সন্দেহ পরিপূর্ণ। এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, কারণ প্রজারা তাহাদিগের স্বাভাবিক সত্ত্ব ও অধিকার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট অথবা সম্রাট যদ্যপি এই সময়ে প্রজাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করেন তাহা হইলে নিহিলিষ্ট এবং সম্রাট এই উভয় দলে যে একটী ভীষণ সংঘর্ষণ অপরিহার্য্য তাহা কে অস্বীকার করিবে।

প্রথম নেপোলিয়নের সময় হইতে রুশ সাম্রাজ্য য়ুরোপীয় ক্ষমতাশালী রাজ্যগুলির মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রুশের প্রতিবাসী য়ুরোপীয় জাতি সকলের সহিত সংযোগ হওয়াতে য়ুরোপীয় উন্নত সভ্যতা-প্রসূত স্বাধীন ভাব সকল ক্রমশই রুশদিগের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। তাহারা ঐ য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে ইহা শিক্ষা করিয়াছে যে লোক (১১) প্রিয় প্রথা প্রচলন করাই অত্যাচার নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়, এবং প্রতিনিধি (১২) প্রণালী সঙ্গত রাজ্য তন্ত্রে জাতীয় উন্নতি

১১ Popular Institution,

১২ Representative government.

ও মহত্ত্ব হয়। কিন্তু যখন তাঁহারা তাঁহাদিগের পরিমার্জ্জিত ও উন্নত সংস্কার (১৩) সমূহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহাদিগের দেশীয় (১৪) সামাজিক প্রথা সকল পরীক্ষা করেন তখন দেখিতে পান যে তাহাদিগের দেশীয় ব্যবহার মধ্যে লোকপ্রিয় প্রথা কিছুই নাই। লোক (১৫) সমূহের দ্বারা শাসিত রাজ্য তন্ত্রের পরিবর্ত্তে কেবল স্বেচ্ছাচারিতায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। রুশ রাজ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অজ্ঞাত, এবং আট কোটী লোকের জীবন একটী প্রভূত ক্ষমতাশালী মনুষ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিক সম্রাটের হস্তে রুশ দেশীয় প্রজাগণের ধন, মান, সুখ স্বচ্ছন্দ অধিক কি জীবন পর্য্যন্ত ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সকলের রক্ষা বা ধ্বংশ করিতে পারেন। দেশের এই অবস্থা কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এবং কি উপায় দ্বারা রুশীয়াতে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালীর অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে? যদ্যপি কোন স্বাতন্ত্রী (১৬) রাজ্যে সংবাদ পত্রে প্রকাশ্যে আপনাদিগের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় তর্ক বিতর্ক করিবার স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে স্বাতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত থাকা স্বত্বে ও সে দেশে অন্য একতন্ত্র রাজ্য (যেখানে লোক সমূহের ঐ সকল অধিকার নাই) অপেক্ষা ভয়ের কারণ অনেক অল্প। ইহার কারণ এই যে, রাজা যেরূপ স্বেচ্ছাচারী হউন না কেন প্রজাদিগের মনের ভাব জানিতে পারিলে তিনি অন্ততঃ অনেক পরিমাণে প্রজাপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু রুশ দেশে প্রকাশ্যে সভা করিয়া তর্ক বিতক করিবার স্বাধীনতা নাই, এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা যদ্যপি শাসনপ্রণালীর বিপক্ষে কখন লেখনী ধারণ করিতে সাহস করেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্রাটের এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠেন। এবং যদ্যপি কেহ সম্রাটের অতৃপ্তিকর মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে সাহস করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সেই অস্বাস্থ্যকর অরণ্যময় সাইবিরিয়া প্রদেশে মনের সাধে বিচরণ ও স্বাধীন ভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার পরিবর্ত্তে, স্বাধীন ভাবে মনের সাধে রোদন করিতে হয়। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই ইহা বিশেষরূপে বিদিত আছেন যে ইংলণ্ড যখন অর্দ্ধসভ্য ছিল এবং ইংলণ্ডীয় রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তৎকালে যাঁহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা উন্নত হইতেন, তাহাদিগকে এবং যে আয়র্লণ্ড বাসীরা ইংলণ্ডীয় ভূম্যধিকারীগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেন, তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইত। অথবা তাঁহারা অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিপ্রায়ে আপনারাই নির্ব্বাসিত

১৩ Ideas.

১৪ Institutions of their own country,

১৫ Republican Form of government.

১৬ Despotic monarchy.

হইতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচারে গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ার ল্যাণ্ড হইতে অনেককে আমেরিকার লোক-শূন্য প্রদেশ মধ্যে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। সেই প্রকার রুশিয়ার অধিবাসীর শ্রেষ্ঠাংশকে ক্রমে সাইবিরিয়ার অরণ্যময় প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে, ইহাতে ভবিষ্যতে যে কি ফল ফলিবে তাহা কতক পরিমাণে অনুভব করা কঠিন ব্যাপার নহে। নির্ব্বাসিতেরা যে কোন না কোন সময়ে নিহিলিষ্ট দলের বিশেষ উপকারে না আসিবে; এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ভবিষ্যতে তাহারা রুশ সম্রাটের ভীতির কারণ না হইবে তাহা কে বলিতে পারে। ফলতঃ রুশীয় সাম্রাজ্যের এবম্প্রকার রাজ্যশাসন-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমানে, এবং প্রকাশ্যে সাধারণের উন্নতি সাধনের কোন উপায় না থাকায়, নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গুপ্ত সমাজ গঠিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গোপনের ধর্ম্ম শঠতা বিশেষরূপে প্রচলিত হইতেছে। নিহিলিষ্টদিগের "গুপ্ত সমাজ" অতীব বিস্তীর্ণ; এবং উহার কার্য্য সকল সমস্ত রুশিয়ায় বিস্তৃত গুপ্তসভা সমূহের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। নিহিলিষ্টদল সম্রাট ও সম্রাট-দলের এতদূর ভীতিপ্রদ হইবার কারণ এই যে উহাদিগের পন্থা অতীব গূঢ়। নিহিলিষ্ট দলের গুপ্ত কার্য্যকারকেরা প্রেতাত্মা সকলের ন্যায় এরূপ আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক দ্রুতগামিতার সহিত সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করে, এবং এত সত্বর ও সংক্ষেপে তাহাদিগের ভয়ঙ্কর কার্য্য সকল সংসাধিত করে যে রুশ গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট পুলিস কর্ম্মচারী থাকা সত্তেও তাঁহাদিগের সমাগম ও অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে কোন রূপ প্রতি-কূলতাচরণ করিতে পারে না। হত্যাকাণ্ড ত প্রতিদিনের ঘটনা। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের জীবন সর্ব্বদা শঙ্কাপূর্ণ। কখন ও কি প্রকারে যে তাহারা নিহিলিষ্টদিগের গুপ্ত চর দ্বারায় নিহত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। রুশিয় গবর্ণমেণ্টে আজপর্য্যন্ত উপযুক্ত রাজ-নৈতিক সংস্কারের কোন প্রকার চিহ্নও প্রদর্শন করেন নাই. এবং সামান্য সংস্কারে যে তাহারা স্বীয় অভীষ্ট সাধনে বিমুখ হইবে এরূপ বোধ হয় না। বৈপরীত্যে রুশ রাজ্য ক্রমশঃ বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। নগরবাসিরা পাছে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে কোন প্রকার চক্রান্তে লিপ্ত থাকেন এই আশঙ্কায় তাহাদিগের বাটীসকল পুলিশ কর্ম্মচারী দ্বারায় বিশেষ রূপে পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। গৃহস্বামী আপনার বাটীতে কত লোক বাস করে তাহার তালিকা গবর্ণমেণ্টকে দিতে বাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপরও বিশেষ রূপ দৃষ্টি রাখা হয়। স্বাধীন সংবাদপত্র সকলকে সাধ্যমত দমন করিয়া রাখা হয় এবং ডাকঘরে গোপনীয় পত্র সকল খুলিয়া পাঠ করা হইয়া থাকে। রুশীয় স্বেচ্ছাচারী সম্রাট এই প্রকার অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত প্রজাদিগকে তাঁহার শাসনাধীনে রাখিতে আশা করেন। এই অন্যায় আশা যে

কত দূর ফলপ্রদ হইবে তাহা বলা যায় না।

অতীত কালের ইতিহাস সম্যক রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে যতদূর ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা হউন না কেন যখন প্রজারা সভ্যতার প্রভাবে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করে তখন তাহাদিগকে পেষক (১৭) রাজবিধি দ্বারায় কখনই বশীভূত করা সম্ভব নহে। বস্তুতঃ যখন প্রজারা বিশেষ রূপে উন্নতি লাভ করে এবং সভ্যতার প্রভাবে স্বাধীনতার যথার্থ মূল্য হৃদঃঙ্গম করিতে সক্ষম হয়; তখন যাহাতে তাহারা পশুর ন্যায় অন্যায়ে প্রপীড়িত না হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা পায়। যে সময়ে য়ুরোপে সামন্ত (১৮) তন্ত্র অর্থাৎ ভূমিগত-শ্রেণীবিভাগ-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং মনুষ্য সকল অর্দ্ধসভ্য ছিল তখন তাহারা রাজার সকল প্রকার অত্যাচার অজ্ঞতা নিবন্ধন সহ্য করিত; কিন্তু এই উন্নত উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ য়ুরোপে স্বাধীনতা প্রায় সর্ব্বত্র বিরাজমান; তথায় লোক সকল সভ্যতার ক্রোড়ে লালিত ও পালিত হইতেছে, তাহারা যে একটি অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রাপ্ত মনুষ্যের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিবে তাহা সম্ভবপর বোধ হয় না। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের দলপতিদিগের নিগ্রহ এবং কষ্টসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তে তাহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের ব্যগ্রতা, সাহস এবং উৎসাহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল তেজীয়ান অগ্রণীগণ যে সমূহ বিপদ, যন্ত্রণা ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহার স্মৃতি এই সম্প্রদায়ের লোকদিগের মনকে কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র করে। তাহারা ইহাদিগের নাম চিরকালের জন্য হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত রাখিয়া পূজা করে এবং এই অভিনেতৃগণ যে ইহলোক ধর্ম্ম (১৯) ও পরোপকারের জন্য কুতূহলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন এই বিবেচনায় ইহাদিগকে পার্থিব মহাত্মাগণের মধ্যে পরিগণিত করেন। যে মহাত্মাগণ তাহাদিগের সহগামী ও প্রপীড়িত রুশদিগের কষ্টে কাতর হইয়া পৃথিবীতে আপনাকে ভুলিয়া সকল সুখ এবং আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়া আশা এবং উৎসাহ বিরহিত হইয়া সেই প্রপীড়িত রুশগণ যাহাতে সুখ(২০) ও শান্তি লাভ করে, তাহার চেষ্টায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। তাঁহাদের সেই অসাধারণ ত্যাগস্বীকার স্মরণ করিয়া সহস্র সহস্র নিহিলিষ্টগণের মনে তেজ, ব্যগ্রতা ও সাহস দ্বিগুণতর তেজে প্রজ্বলিত হয়। নিহিলিষ্টদলের অধিনায়কদিগকে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ও সাইবিরিয়া অরণ্য প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা সত্ত্বেও রুশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের উৎ-

(১৭) Repressive measur.

(১৮) Faudal system.

(১৯) Saints sapostless.

(২০) নিহিলিষ্টদিগের মতে যাহা সুখ বলিয়া বিবেচিত হয়

সাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় অবাধে কার্য্য করিতেছে এবং তাহাদিগের বিগত কার্য্যসকলে কৃতকার্য্যতা লাভ করায়, অন্য কথা দূরে থাকুক সম্প্রতি সম্রাটকেও হত্যা করিতে অণুমাত্র ভীত হয় নাই।

যাহাই হউক এই সকল ঘটনা দ্বারা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে রুশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং উহা হইতে যে একটী ভয়ানক কুফল প্রসব হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আর ইহা ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সম্রাট উপযুক্ত এবং জ্ঞানবান রাজনীতিজ্ঞগণ দ্বারায় পরিবেষ্টিত হইয়াও সুনীতিযুক্ত কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই, এবং পেষক রাজবিধির নিষ্ফলতাও অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কোনকোন য়ুরোপীয় লেখক বলেন যে, সময়ে যে সাধারণ লোক সকল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং ন্যায়ের ভিত্তিমূলক যে সকল প্রথা সাধারণ লোক দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইতেছে তাহার গতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নাই। য়ুরোপীয় রাজগণ এবং সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিরোধ ক্রমে ক্রমে যে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে য়ুরোপীয় সমাজে অবশ্যম্ভাবী ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইবে। ইহাতে যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী য়ুরোপীয় রাজগণের সিংহাসন সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হইবে এবং পরাক্রমশালী রাজবংশ সকল তাহাদিগের পূর্ব্বিত উচ্চপদবী হইতে বিচ্যুত হইয়া অচিরাৎ ধরাশায়ী না হইবে তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে রুশ রাজ্যের মধ্যে এই প্রকার বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান থাকাতে সম্রাটের বৈদেশিক যুদ্ধ এবং জয়ের আশা এককালীন অন্তঃকরণ হইতে মূল্যোৎপাটন করা সম্পূর্ণরূপে বিধেয়; এবং উহাতে যে ন্যায্য রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। যখন প্রজারা আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছে তখন যে সম্রাট দূরদেশে বিজয়ী হইয়া লোকসমূহকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিবেন এবং তাহারাই যে উহাতে বিমোহিত হইয়া আপনাদিগের অবস্থা ভুলিয়া স্থির হইয়া থাকিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। য়ুরোপীয় ইতিহাসে ইহা দেখা যায় যে যখন সমস্ত য়ুরোপ অর্দ্ধসভ্য ছিল অর্থাৎ যৎকালে ভূমিগত শ্রেণী বিভাগ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সম্ভ্রান্তদিগের প্রভুত ক্ষমতা ছিল, তৎকালে অজ্ঞ প্রজারা তাহাদিগের রাজার বৈদেশিক যুদ্ধে বিজয়ী দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া অধিকতর বশীভূত হইত; কিন্তু এই উন্নত উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে যখন সাধারণ লোকে তাহাদিগের যথার্থ অবস্থা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন যে তাহারা রাজাকে বৈদেশিক যুদ্ধে জয়ী দেখিয়া ভীত ও বশীভূত হইবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। নূতন সম্রাট যে কিরূপ প্রণালীতে শাসন করিবেন তাহা আমরা বিশেষ রূপ জ্ঞাত নহি। যদিও ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পূর্ব্বসম্রাটদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে রাজ্যের উন্নতি করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তথাচ আমরা উক্ত শাসনপ্রণালীকে এই উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের উপযোগী বলিতে পারি না। এক্ষণে বোধ হয় নূতন সম্রাটের উচিত যে বৈদেশিক যুদ্ধ সকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে যাহাতে উত্তম শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় এবং প্রজারা সুখ ও শান্তি লাভ করে তাহার সম্পূর্ণ রূপ চেষ্টা করা।

ভারতবর্ষীয় খনিজ পদার্থ।

খনিজ পদার্থের জন্য ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আসার পর হইতে আমাদের দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বহুল শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের খনির প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ পড়ে নাই, সুতরাং তাহার তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ বহুল পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইত। দক্ষিণে স্বর্ণগর্ভ প্রদেশে প্রাচীন স্বর্ণ-খণি কারখানার বিস্তৃত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা আমাদের দেশ হইতে বিস্তর স্বর্ণপিণ্ড লইয়া যাইত। সলোমনের সময়েও আমাদের দেশ হইতে বিদেশে স্বর্ণ প্রেরিত হইত, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে ব্রিটিষ অধিকারে ভারতবর্ষে আর স্বর্ণ-খণির কারখানা নাই—নদীর স্রোতোবাহিত স্বর্ণরেণু লইয়া বালি ধুইয়া, যৎসামান্য স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এখন তিব্বতের খণি হইতে এবং অন্যান্য দেশ হইতে আমরা স্বর্ণ পাইয়া থাকি। যাহা হউক্ এত দিন পরে সৌভাগ্য বশতঃ ভারতবর্ষের স্বর্ণ খণির প্রতি ইংরাজদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে নীলগিরি প্রদেশের বাইনাদ উপবিভাগে (Wynaad) এবং মহীসুরের কোলার প্রদেশে স্বর্ণখণির জন্য সন্ধান পড়িয়া গিয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রেলিয়া হইতে একজন এঞ্জিনিয়র আনাইয়া খণি পরীক্ষা করাইয়াছেন। তাহাতে যে রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহা বিলক্ষণ আশাপ্রদ। গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য প্রতি একরে পাঁচ টাকা খাজানা লইয়া খণি-প্রদেশের জমি ছাড়িয়া দি-

লেন। এখন ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। South of Indian Observer নামক সংবাদ পত্র বলেন যে ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ফরাসিস্। উক্ত পত্র বলেন বাইনাদের খনি খনন করিবার জন্য ফরাসীস্‌গণ ইতি মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, এবং মহীশূরস্থ কোলার প্রদেশের স্বর্ণক্ষেত্র ক্রয় করিবার চেষ্টায় আছেন। বোধ করিতেছি, আমাদের ভারতবর্ষীয়েরা কেহ এই ব্যবসায়ীদের সহিত যোগ দেন নাই। বিদেশীয়েরা যখন প্রচুর পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত স্বর্ণ-খনি স্বায়ত্ত করিয়া লইবেন, তখন সহসা অপূর্ব্ব দেশহিতৈষিতার প্রভাবে আমাদের যুবকদের হৃদয়ে আর্য্য-রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং তাঁহারা কবিতার ও বক্তৃতার অনবরত বিলাপ করিয়া বেড়াইবেন যে; "ইংরাজরা, ম্লেচ্ছেরা আমাদের সর্ব্বনাশ করিল, আমাদের সমস্ত স্বর্ণ লুঠ করিয়া লইয়া গেল।" যাহা হউক্, ভরসা করি, স্বর্ণ খনির সন্ধান যেন সফল হয়। এলিয়ট্ জেম্‌স্ সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষে খনি খনন করিবার কতকগুলি বাধা আছে। প্রথমতঃ খনিতে যথেষ্ট মূলধন চাই, তাহা আমাদের নাই। দ্বিতীয়তঃ রাজা, জমিদার, চাষা প্রভৃতি নানা বিভিন্ন স্বত্বাধিকারীর দ্বারা জমী বিভক্ত। তৃতীয়তঃ, এখনো ভারতবর্ষে খনির আইন সম্পূর্ণ হয় নাই, খনকদিগের স্বত্ব ও অধিকার ভালরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের শাসন-বিবরণীর রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সম্প্রতি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ পড়িয়াছে।

সকলেই বলিয়া থাকেন, আমাদের ভারতবর্ষের লৌহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল লৌহ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। এত লৌহ খনিও, বোধ করি; আর কোথাও নাই। অথচ ইংরাজ-অধিকারে লৌহ খননের কোন উন্নতি হয় নাই। কুমাউন; সিমলা; বুন্দেলখণ্ড, সালেম, বেরার; প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত লৌহস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভূবেত্তা ব্যুাণ্ড্‌ফোর্ড্ সাহেব বলেন, যে, শালেমে, (Salem) এত লৌহ আছে যে, তাহা কোন কালে ফুরাইবে না বলিলেও হয়। চান্দারের নিকটবর্ত্তী লোহারায় যে লৌহপিণ্ড পাওয়া যায় তাহা এত বিশুদ্ধ যে, তাহা হইতে প্রায় শতকরা ৭০ সত্তর ভাগ লৌহ পাওয়া যায়।

Indian Agriculturist পত্রিকায় বলেন যে, সিমলা হইতে প্রায় ২০০০ মন লৌহ ভারতবর্ষের অন্যত্র এবং সিমলায় প্রতি বর্ষে প্রেরিত হয়। এই সমস্ত লৌহ দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত হয়। ইহার এক প্রধান অসুবিধা এই যে, আমাদের দেশে যে উপায়ে লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহাতে অত্যন্ত কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। ২০০০ মন লৌহ প্রস্তুত করিতে ২০০০টি বৃক্ষ অর্থাৎ অন্যূন বিশ হাজার মন কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। এইরূপে খনি-প্রদেশের নিকটবর্ত্তী বন ক্রমশই ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে। সেখানে বনরক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই, সুতরাং ভবিষ্যতে বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে।

গোয়ালিয়র লৌহের খনির নিমিত্ত বিখ্যাত। এই রাজ্যে লস্কর এবং শিপ্রির মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহের খনি বিদ্যমান। এই লৌহ স্তর প্রায় ত্রিশ ক্রোশ বিস্তৃত। এবং এখানে যে লৌহ পিণ্ড পাওয়া যায়, তাহা হইতে, দেশীয় অসম্পূর্ণ উপায়েও প্রায় শত করা ৭৫ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। সিন্ধিয়ার মহারাজা তাঁহার নিজ রাজ্যের এই সকল লৌহ খনি স্বয়ং খনন করাইবেন বলিয়া মাঝে মাঝে সংকল্প করিয়া থাকেন। আজ কাল করিয়া সে সংকল্প আর কোন মতেই কার্য্যে পরিণত হইল না। একবার না কি সত্য সত্যই তিনি খননের উদ্দেশে এক জন কোন বাহিরের লোকের হাতে কিঞ্চিৎ টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু গোলেমালে তাহার সমস্তই বাজে খরচ হইয়া গেল। সুতরাং কাজটা ভাল করিয়া আরম্ভই হইতে পারিল না। আমাদের দেশীয় রাজাদের নিকট হইতে দেশের কত উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল অলস, নিরুদ্যম, অশিক্ষিত মহারাজাধিরাজেরা মাতৃভূমির কি উপকার করিতেছেন তাই ভাবি! উত্তম বন্দোবস্তে এই সকল লৌহ খনি খনন করাইলে গোয়ালিয়রের ঐশ্বর্য্য যে কত বাড়িয়া যায়, এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে কত উপকার হয়, তাহা কে বলিবে।

আজ কাল আমাদের দেশে কল কারখানার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অথচ তাহার প্রতি টুক্‌রার জন্য আমাদিগকে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। এমন কি, একটি কল বিগ্‌ড়াইয়া গেলেও তাহা সারাইবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়, অথচ আমাদের দেশে ভাল লৌহের অভাব নাই। উন্নতি দূরে যাউক্, ভারতবর্ষে লৌহ-বাণিজ্যের উত্তরোত্তর অবনতিই হইতেছে। তাহার প্রধান কারণ, লৌহ-খনি প্রদেশে ক্রমেই বন নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অথচ পুনরায় বৃক্ষ রোপণের কোন বন্দোবস্ত হইতেছে না।

আমাদের দেশীয় কারিগরদের বেতন অল্প বলিয়া, এবং অন্যান্য নানা কারণে উৎসাহিত হইয়া অনেক ইংরাজ বণিক অনেক বড় বড় লোহার কারখানা খুলিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হীথ্ নামক এক জন মাদ্রাজের সিবিলিয়ন্ করমণ্ডল উপকূলে সালেম শৈল-প্রদেশস্থ পোর্টো নোবোতে (Porto Novo,) এবং মালাবারস্থ বেপুরে লোহা-খনির কারখানা খোলেন। তাঁহার কারখানা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোহা এবং ইস্পাত প্রস্তুত হইত। যত দিন পর্য্যন্ত নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে কাষ্ঠ যোগান্ পাইয়াছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত কাজ চলিয়াছিল, তাহার পর বন্ধ হইল।

কিছু দিন হইতে, রাণীগঞ্জের নিকটে এবং বীরভূমে ইংরাজী উপায়ে পাথুরিয়া কয়লার সাহায্যে লৌহ পিণ্ড গলাইবার চেষ্টা হইতেছিল। নিকটেই পাথুরিয়া ক-

য়লা যথেষ্ট ছিল, তথাপি লাভের অভাবে কারখানা বন্দ করিতে হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে ইংরাজেরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, অথচ সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই। তাহার এক প্রধান কারণ এই আমাদের দেশে পাথুরিয়া কয়লা বড় ভাল নাই।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে লৌহের কাজ যে কিরূপ সুচারু হইত কুতব-মিনর তাহার এক জাজ্বল্য প্রমাণ বর্ত্তমান। পৃথ্বীরাজের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, রৌদ্রে বৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত ইহা সমভাবে রহিয়াছে। ইংলণ্ডের অনেক সেতু ভারতবর্ষীয় লৌহে নির্ম্মিত। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনো লৌহের কাজ অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যুদ্ধাস্ত্র-নির্ম্মাণে ভারতবর্ষ অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল, এখনো তাহা একেবারে লোপ পায় নাই। ভারতবর্ষে যে এক প্রকার ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তেমন ভাল ইস্পাত পৃথিবীর আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। ভারতবর্ষের তলোয়ার সুচারু কারুকার্য্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। ফিতার কাজের ন্যায় সূক্ষ্ম এক প্রকার শিকলির বর্ম্ম এখনো কাশ্মীর, রাজপুতানা, ও কচ্ছ দেশে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম কয়লার খনি রাণীগঞ্জে খনন করা হয়। এখন ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৫৮টি কয়লা তুলিবার কারখানা খোলা হইয়াছে। এই সকল কারখানায় বৎসরে বৎসরে দশলক্ষ টন্ কয়লা তোলা হয়। কয়লার খনি খননের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রেলের রাস্তা বিস্তৃত হইতেছে। কলের গাড়িতে করিয়া কয়লা বাজারে না আনিলে তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হয়, এবং কয়লাতেও কলের গাড়ির সমূহ সাহায্য করিয়া থাকে; এইরূপে উভয়ে উভয়ের উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলোয়ে খুলিবার পর হইতে ভারতবর্ষের কয়লা খনির কারখানার সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে লাগিল। প্রতি বৎসরে প্রায় দুই তিনটা করিয়া কারখানা খোলা হইতে লাগিল। এই কয়লা হইতে কেবল যে রেলোয়ে চলিতেছে তাহা নহে, কলিকাতার অনেকগুলি কল এবং গঙ্গার অনেক ষ্টীমার এই কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলোয়ে কোম্পানির কাহারবাড়ি এবং শ্রীরামপুরে নিজের খনি আছে। ১৮৭৭—৭৮ খৃষ্টাব্দে সেই সকল খনি হইতে ৩০৮০০৯ টন্ রেলোয়ে নিজে ব্যবহার করিয়াছে, এবং সেই পরিমাণে কয়লা কলিকাতায় পাঠাইয়াছে। কলিকাতায় এমন শতকরা ৮০ ভাগ দেশীয় কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেবল অবশিষ্ট ২০ ভাগ মাত্র বিদেশ হইতে আইসে। কিন্তু বম্বে এবং মাদ্রাজে কেবল মাত্র বিলাতী কয়লাই ব্যবহৃত হয়।

হিউজ সাহেব ভারতবর্ষে কয়লা আমদানীর একটি তালিকা দিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে রেলোয়ে, জাহাজ, কল প্রভৃতিতে প্রায় দশ লক্ষ টন্ কয়লা লাগে। তাহার অর্দ্ধেক বিদেশ হইতে আইসে।

কয়লা যদি ভারতবর্ষেই পাওয়া যায় তবে বিদেশ হইতে এত আইসে কেন? তাহার একটি কারণ আছে, গাড়িভাড়াতেই কয়লার দাম অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। রাণীগঞ্জ, কাহারবাড়ি এবং বার্দ্ধা, এই তিন প্রদেশই কয়লার খনির নিমিত্ত প্রধান। এই প্রদেশত্রয় হইতে কয়লা গাড়ি করিয়া জাহাজে উঠিতে প্রায় তাহার দুই তিন গুণ মূল্য বাড়িয়া যায়। যখন অন্যান্য বহুসংখ্যক রেলের রাস্তা খুলিবে, এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাড়া কমিয়া যাইবে, তখন কয়লার মূল্য কমিয়া যাইবে, এবং দেশী কয়লা দেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে। নহিলে বিদেশী কয়লার আমদানী উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ৪৩৫৬২ টন্ মাত্র কয়লার আমদানী হইত, উত্তরোত্তর বাড়িয়া এখন তাহা ৬০৯৭৩৫ টন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী কয়লা সর্ব্বাপেক্ষা বম্বেতেই অধিক খরচ হয়। ভারতবর্ষে যে কয়লা উৎপন্ন হইয়া থাকে রেলোয়েতেই তাহার অধিকাংশ খরচ হইয়া থাকে। কয়লার খনির কারখানা আরো বিস্তৃত না হইলে অন্যান্য ব্যবহারের নিমিত্ত কয়লায় কুলাইয়া উঠিবে না।

ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশে যে কয়লার খনি আছে, গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলোয়েই প্রায় তাহার সমস্ত কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি ৫০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। এখানে ছয়টি য়ুরোপীয় কোম্পানি আছে, এবং অনেকগুলি দেশীয় কোম্পানিও আছে। এখানকার খনির এক প্রধান সুবিধা এই যে, কয়লা হইতে কোন প্রকার গ্যাস্ উঠে না, সুতরাং ইংলণ্ডের খনির ন্যায় এখানে অগ্ন্যুৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাই। সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতিরাই এই সকল খনির কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

আসামে সুবিস্তৃত কয়লার খনি আছে। খাসী এবং জয়ন্তীয়া পাহাড়ে অনেক বৎসর ধরিয়া ছোট ছোট খনি খনন করিয়া কয়লা তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু শকটের বন্দোবস্ত ভালরূপ না থাকাতে সে সকল খনি কোন কাজে লাগিল না। আরো দূরে লখিমপুর প্রদেশে খুব ভাল কয়লার বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, তদভিমুখে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র রেলোয়ে খুলিবার কথা হইতেছে।

বেরাজে লৌহস্তর বিশিষ্ট একটি কয়লার খনি সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। ডাক্তর ষ্টেন্ হাউস্ বলেন এই খনিস্থ লৌহ সুইডেনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহের সমান। এই দেশের মধ্য দিয়া একটি রেলোয়ে খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই রেলোয়ে খুলিলে আর একটি উপকার হইবে। নিজামের রাজ্যস্থ হাইদ্রাবাদের কয়লার খনি রেলোয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িবে।

লর্ড টুইডেলের কোম্পানি পঞ্জাবের কয়লার খনি খুলিবার নিমিত্ত সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত যদি সুবিধামত নিষ্পত্তি হয় তবে তাঁহারা কার্য্য আ-

রম্ভ করিবেন। ইহাতে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে, কারণ, উত্তর ভারতবর্ষে রেলোয়ে বিস্তৃত হইতেছে ও কয়লার আবশ্যক বাড়িতেছে। একমাত্র সিন্ধ পঞ্জাব এণ্ড ডেল্লি রেলোয়েতেই প্রায় ৩৫০০০ টন কয়লা বৎসরে আবশ্যক হয়।

ভারতবর্ষের আরো অন্যান্য নানা স্থানে কয়লার খণি আছে, কেবল শকট প্রভৃতির অভাব থাকাতে সে গুলি খুলিয়া লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক্, রেলের যতই বিস্তার হইতেছে, ততই কয়লার খণি বিস্তৃত হইতেছে। কয়লা এবং লৌহের খণির উপর দেশের উন্নতি কতখানি নির্ভর করে তাহা বলা বাহুল্য। কয়লার খণির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে এবং উদারহৃদয় রিপণ-প্রমুখ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে লোহার খণির কপালও যে শীঘ্র ফিরিবে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

অন্যান্য ধাতুর মধ্যে ভারতবর্ষে তাঁবা শীষা টিনই প্রধান। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই বহুল পরিমাণে তাঁবা পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা দার্জ্জিলিং হইতে কুমাউন পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাম্রক্ষেত্রই প্রধান। নেপালীরাই এই সকল খণি খনন করিয়া থাকে। কোন ইংরাজ এখনো এই সকল খণিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ছোট নাগপুরে সিংভূম প্রদেশে একটি ইংরাজ কোম্পানি তৎপ্রদেশস্থ তাম্র উত্তোলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যদিও বহুল পরিমাণে তাম্র পাওয়া গিয়াছিল, তথাপি লাভ হইল না বলিয়া তাঁহারা ছাড়িয়া দিলেন। মাদ্রাজে নেলোর প্রদেশেও একবার এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিফল হইল। পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী হিমালয় প্রদেশে শীষা এবং ব্রহ্মদেশে টিন পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের হীরা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। বুন্দেলখণ্ডস্থ পান্নার হীরকখণি হইতে আকবর বাদসাহ বৎসরে আট লাখ টাকা করিয়া লাভ করিতেন। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সেখান হইতে গবর্ণমেণ্ট বৎসরে চার লাখ টাকা উপায় করিয়া লইতেন। এখন সে খণি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। হীন-মূল্যের মটরের ন্যায় ক্ষুদ্র হীরক ইতস্ততঃ পাওয়া যায়। ইহাতে লাভের আশা এত অল্প যে, কোন য়ুরোপীয় কোম্পানি এই খণিতে হাত দেন নাই। সম্বলপুরের খণিতে, গোলকুণ্ডার নিকটবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বে অনেক হীরা পাওয়া যাইত, এখন আর প্রায় নাই। যাহা হউক, হীরায় আমাদের কাজ নাই, হীরার কৃষ্ণবর্ণ সহোদর কয়লা ভারতবর্ষের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভারতবর্ষে লবণের অভাব নাই। গ্রীষ্মকালে লবণহ্রদ শুকাইয়া গেলে তাহার তলায় লবণের স্তর পড়িয়া থাকে। তাহাই তুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শুষ্ক লবণ প্রস্তুত হয়। এইরূপ লবণের হ্রদ রাজপুতনায় এবং উড়িষ্যায় আছে। কিন্তু এ লবণকে খনিজ বলা যায় না। খনিজ লবণ পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। সেখানে বৃহৎ লবণের পর্ব্বত আছে। এমন বিশুদ্ধ লবণ এবং এমন বিস্তৃত লবণক্ষেত্র জগতের আর কোথাও নাই। পঞ্জাব হইতে বর্ষে বর্ষে ৫০০০০ টন্ লবণ উত্তোলিত হয়। ইহা হইতে গবর্ণমেণ্ট চল্লিশ লক্ষ টাকা শুল্ক আদায় করেন। দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই প্রায় দেশজ সমুদ্রের লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেবল বঙ্গদেশে আমরা বিলাতী লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি।

বাহুল্যভয়ে অন্যান্য নানা খণিজের বিষয় আমরা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম না।

নীহারিকা।

১

গভীর নিথর রাতি, মলিন চন্দ্রমা ভাতি
বহে ধীরে শীতল পবন ;
শারদ গগন ভালে, অলস নীরদ জালে
ভাঙা চাঁদ দেখিছে স্বপন !
রজনীর অশ্রুজল ছুঁয়িছে মরমস্থল,
ভাঙা গান-ভোলাতান ভেসে আসে কানে !
নিদ্রা নয়, মৃত্যু নয়, কি এক অলস ময়,
ছায়া মোর পড়িতেছে প্রাণে !
এমন নিথর রাতি, এমন উদাস ভাতি,
দেখেনি কখন আর্ আকাশ অবনি ;
এমন এমন করি, জীবনের মূল ধরি,
গুপ্ত কথা ধীরে ধীরে বলেনি রজনী।
স্থির অবসন্ন প্রাণ করিছে নিশীথে দান
জীবনের ভগ্ন অবশেষ,
মিলেছে বড়ই ভাল, ভাঙাচাঁদ,ভাঙা আলো,
ভাঙা প্রাণে স্বপন আবেশ !
ভাঙা চাঁদ,ভাঙা আলো,ভাঙাভাঙা মেঘজাল,
ঘুমন্ত ছায়ার ওই ভাঙা ভাঙা দেহ,
সকলি গো হৃদি মাজে, নিথর সলিলে রাজে,
আমি যেন হয়ে আছি রজনীর কেহ !
তমাল তরুটি হোথা, কিছু না কহিছে কথা,
মর মর সর সর অরণ্যের বাণী
স্তম্ভিত বিস্ময়াবেশে দেখিতেছে পদদেশে
নগনা জ্যোৎস্না কোলে সুপ্তছায়াখানি !
জানিনা কেমন কোরে,একখানি মেঘসোরে
পড়িল ঢাকিয়া ধীরে চাঁদের বয়ান ;
চেতনা যা কিছু ছিল, তাহাও ফুরায়ে গেল,
স্মৃতির ও প্রেত আত্মা করিল প্রয়াণ !

২

তুষার অঙ্গুলি দিয়া মর্ম্ম স্থান কাঁপাইয়া
শিরদেশে স্থির নেত্রে রজনী আমার,
পড়িছে নিশ্বাস মুখে শূন্য এ উদাস বুকে
আঁধার আঁধার তার করিছে সঞ্চার !
সেই আঁধারের কোলে, হৃদয় পড়িল ঢুলে,
রজনীর রাজ্যে আমি করিনু প্রবেশ ;
উদাস অনিল ধীরে, কি মন্ত্র বলিল মোরে,
জাগিনু গেল না তবু নিদ্রার আবেশ।

বায়ুর সে কথা শুনি, কেমন করিল প্রাণী,
ছায়াময় আলো এলো হিয়ার মাঝারে!
সেই সে আলোক ধরি, চারিদিক্ ফিরি ঘুরি,
দেখিনু চলেছে নদী কানন আঁধারে!
চারিদিকে বৃক্ষ যত নীরব নিঝুম নত
নাহি কোন সাড়া শব্দ—অনন্ত গোধূলি,
ঈষৎ চঞ্চল জলে বোঁটা ভাঙা পদ্ম দোলে
হেরিছে মলিন মুখ মলিন তারকাগুলি।
তার মাজে কি দেখিনু, কেন কেন শিহরিনু,
হৃদয়ের যত তার উঠিল বাজিয়া!
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল মন,
উলটি পালটি গেল বিদলিত হিয়া;
সব গেল্—সব গেল—ভূত ভবিষ্যত গেল—
দেহ মন প্রাণ গেল—গেল গেল সব!
রহিল কেবল জাগি, শূন্যে শূন্যে কৃপা মাগি,
আঁখি দুটি হারাইয়া অশ্রুর বিভব।
সেই সে গোধূলি মাজে, নদীর বুকের মাজে,
দেখিনু ভাসিছে ধীরে ঘুমন্ত আনন!
করুণা ছানিত মুখ, দেখিলে চমকে বুক,
অধরে ফুরাণ হাসি মুদিত নয়ন।

৩

অহো মোর প্রাণের মাঝারে
লাগিয়া রয়েছে সেই শ্রান্ত হাসিখানি,
বিষাদে মুদ্রিত দুটি নয়ন পল্লব,
কুঞ্চিত কপোলে সেই করুণা রাগিণী।

উছলিয়া উঠে প্রাণে কাতর ক্রন্দন,
আঁখি মোর জলে আসে ভেরে,
রজনী পরাণ তব দাও মিশাইয়া
আমার এ প্রাণের মাঝারে!

দাও সখী দাও তব করুণ জোছনা খানি—
করুণ কুসুম তোর যত;
কেঁদে কেঁদে হই সারা, জীবন ফুরায়ে যাক্
তোর শেষ হাঁসিটুকু মত।
দিবস রাজার বেশে, এসনা আমার কাছে,
এস না গো প্রভাতের বায়;
সম্পদের খর হাসি গৌরবের খর দীপ্তি,
আসি ও না তোমরা হেথায়।
দাও মা শ্মশান ভূমি তোমার উদার কোল,
তোমারও চিতা ভস্ম রাশি,
বড় লাগিয়াছে প্রাণে তপস্বিনী বেশ তব
বিষাদ মাখান তব হাসি!
শুইয়া রহিব তোর বুকে,
নিমিলিয়া ক্লান্ত আঁখি দুটী,
চাঁদ মোর মুখ পানে থাকিবে চাহিয়া!
কুলু কুলু কুলু কুলু নাদে
তোমার বারতা লয়ে লয়ে,
আপনা বিলাতে নদী যাইবে বহিয়া!

দূর দূরান্তর হতে আসিবে প্রাণের মাজে
শিবাদের হাহাকার নিশীথ ক্রন্দন,
পেচক কঠোর কণ্ঠে সুধাইবে রজনীরে
কাহাদের শোক বেগ উদ্দাম এমন!
মরণ আসিলে সেই খানে
দুটি হাত ধরিয়া তাহার
নিবেদিব লয়ে চল ল'য়ে চল মোরে
আছে যথা সেই মুখ খানি,
করুণ নয়ন সেই দুটি,
অনন্ত গোধূলি ময় নদীর মাঝারে!

শ্রী প্রিয়নাথ সেন।

রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে প্রাচীন হিন্দুরাজদিগের রাজাভিষেক সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায় এবং তাহা কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা সমুদ্ভূত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ তৎকালের হিন্দুরাজাদিগের রাজাভিষেক পদ্ধতি জানা না থাকাতে অনেকেই সেই সেই প্রস্তাব পাঠে অতৃপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া আজ আমরা তাঁহাদের সুগোচরার্থ এই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বর্ত্তমান হিন্দুরাজগণ এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা সুন্দররূপে জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, বর্ত্তমান রাজগণের অভিষেক-প্রণালী আমাদের বর্ণনীয় বস্তু নহে। প্রাচীন কালের আর্য্য নরপতিগণ যেরূপে অভিষিক্ত হইতেন, তাহাই এ প্রবন্ধে বর্ণিত হইবেক।

অভিষেকের বিধি।

হিন্দুরাজগণের মধ্যে কোন্ সময়ে অভিষেক বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, উক্ত বিধি যজুর্ব্বেদের সময়েই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে "স এষ মূর্দ্ধাবষিক্তো রাজা রাজসূয়েন যজেত" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। অনন্তর যজুর্ব্বেদোক্ত বিধির অনুসরণ করিয়া অথর্ব্ববেদ তাহার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও দৃষ্ট হয়। অতএব, রাজাভিষেক প্রথা বা ব্যাপারটী এদেশের বহু পুরাতন। অথর্ব্ববেদে যে অনুষ্ঠান-সূত্র লিখিত হইয়াছে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেবীপুরাণ ও অগ্নি পুরাণ প্রভৃতি তাহাই বিশদ ও বিস্তৃত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রনয়ণ করিয়া গিয়াছেন।

অভিষেকের উপর ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তৃত্ব।

মহাত্মা মনুর সময়ে, রাজ্যাভিষেকের সহিত ধর্ম্মের সংসৃষ্টতা ও ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তৃত্ব ছিল। যথা—

"ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্।"

ব্রাহ্মং সংস্কারং=ব্রাহ্মণৈঃ কৃতং অভিষেকম্। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয়কে বিধিবিধানক্রমে অভিষেক (রাজাধিকার দান) করেন সেই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ই ন্যায়ানুসারে এই সমস্ত প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ ক-

রিতে পারিবেন, অন্যে নহে। প্রজাপালন করাই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। এই মনুর বচন দ্বারা জানা গেল যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়দিগকে রাজ্যাধিকার দান করিতেন।

অভিষেকের কাল।

চৈত্রমাস, মলমাস, ও বর্ষা ঋতুতে অভিষিক্ত হইবেক না। শনি ও মঙ্গলবার ভিন্ন বারে, চতুর্থী, চতুর্দ্দশী ও নবমী ভিন্ন তিথিতে এবং শ্রবণা, অশ্বিনী, পুষ্যা ও জ্যেষ্ঠা নামক নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক প্রশস্ত। শুক্রাস্তাদি জন্য কালাশুদ্ধিতেও ইহার নিষেধ আছে। এই কালনিয়ামক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন, যে, "মৃতে রাজ্ঞি ন কালস্য নিয়মোঽত্র বিধীয়তে।" যদি পূর্ব্বরাজার মৃত্যু হওয়ার পর অন্য রাজাকে অভিষেক করা আবশ্যক হয়, তবে সেই অভিষেক্তব্য রাজা আপাততঃ সামান্য স্নান (তিল সর্ষপাদির দ্বারা) ও জয় ঘোষণা করিয়া অন্য এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য করিবেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত শুভ দিনে যথাশাস্ত্র অভিষিক্ত হইবেন। আর মূল রাজা যদি জীবিত থাকিয়া কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আর অভিষেক্তব্য ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তিনি একেবারে অভিষেক ও রাজাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অভিষেকের দ্রব্যাদি।

মন্ত্রী, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও কতিপয় প্রজা। যজ্ঞীয় বেদী। সুবর্ণ কলশ। চারি বেদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। পার্ব্বত্য মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, গজদন্ত মৃত্তিকা, সরোবর বা হ্রদ মৃত্তিকা, দেবালয় মৃত্তিকা, ইন্দ্রালয় মৃত্তিকা, রাজপ্রাঙ্গণ মৃত্তিকা, সমুদ্রসঙ্গম বা নদীসঙ্গম মৃত্তিকা, নদীকূল মৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, গজবন্ধন স্থান মৃত্তিকা, অশ্ববন্ধন স্থান মৃত্তিকা, গোষ্ঠ মৃত্তিকা, রথ চক্র মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, ভদ্রাসন, (ভদ্রাসন কি? তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবেক,) সুবর্ণ কলশ, রৌপ্য কলশ, তাম্র কলশ, মৃত্তিকা কলশ, (এই সকল কলশে যথাক্রমে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ও জল পরিপূরিত থাকিবেক,) মধু, কুশা, সহস্র ছিদ্র যুক্ত কলশ, সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, পুষ্প, মাল্য, ফল, নবরত্ন, নদীজল, সরোবরজল, কূপজল, চতুর্দ্দিকস্থ চতুঃসমুদ্রের জল, অভাবে গঙ্গাজল, তদভাবে ব্রাহ্মণেরা যে জল বলিবেন সেই জল, কিংবা যমুনার জল, নির্ঝর জল, ছত্রধারী, চামরধারী, বেত্রধারী, নানা প্রকার বাদ্য, সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি, ক্ষীরা বৃক্ষের শাখা, দর্পন, ঘৃতকুম্ভ, উষ্ণীষ, শুভ্র বস্ত্র, নানা প্রকার অলঙ্কার ও অস্ত্র, বিষ্ণ ব্রহ্ম পূজার দ্রব্য, অষ্ট পট্ট, (অষ্ট পট্ট, কি? তাহা বলা যাইবেক) বৃষাদি সপ্ত প্রকার পশু, অশ্ব, হস্তী, রথ, দানার্থ গাভি. তিল, স্বর্ণ, রৌপ্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাদক, ও মহাদান (অশ্ব হস্তী প্রভৃতি) মঙ্গলদ্রব্য, বাণ, ধনু, খড়্গ, এবং হোমের দ্রব্য।

অভিষেকের পদ্ধতি। (১)

অভিষেচ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজা এই সকল দ্রব্য আয়োজন করিয়া শুভদিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ প্রজার দ্বারা অভিষিক্ত হইবেন। অভিষেকের দিন অবধারিত হইলে তাহার পূর্ব্বে কোন এক দিবসে পুরোহিতের দ্বারা "ঐন্দ্রী শান্তি" নামে এক প্রকার শান্তি কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কি রূপে ঐন্দ্রী শান্তি করিতে হয়, এস্থলে তাহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক বিধায় লিখিত হইল। (২)

পুরোহিত অভিষেকের পূর্ব্বে কোন এক শুভ দিনে মাস পক্ষ তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক "করিষ্যমাণ রাজ্যাভিষেকাঙ্গভূতাং ঐন্দ্রী শান্তিমহং করিষ্যামি" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গণপতি পূজা ও হোতা আচার্য্য ব্রহ্মা সদস্য এই চতুর্ব্বিধ ঋত্বিককে বরণ করিবেন। পরে, "অব্যদশ্চ" ব্যসশ্চ বিনম্বিষ্যামি মায়য়া। ভাভ্যামুদ্ধৃত্য বেদমথ কর্ম্মাণি কৃণ্মহে।" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দাত্র গ্রহণ করিবেক। পরে কতক গুলি কুশা লইয়া "ঔষধাৎ দাতু পর্ব্বম্" এই বলিয়া সে গুলির মূলদেশ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ছেদন করিবেক। অনন্তর "গ্রীষ্মন্তে ভূমে বর্ষাণি—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ভূমিকে নমস্কার করিয়া সেই স্থানে বেদী নির্ম্মাণ করিবেক। এই বেদীর মধ্যে কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেক। এই বেদীর উপরে অপর এক মহা

(১) অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে যে সংক্ষিপ্ত রাজাভিষেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

"অথ রাজ্ঞোঽভিষেকবিধিং ব্যাখ্যাস্যামো বিল্বপ্রভৃতীন্ সম্ভারান্ সম্ভৃত্য ষোড়শকলশান্ ষোড়শবিল্বানি বল্মীকস্যচ মৃত্তিকাং সর্ব্বান্নং সর্ব্বরসান্ সর্ব্ববীজানি। তত্র চত্বারঃ সৌবর্ণা শ্চত্বারো রাজতা শ্চত্বারস্তাম্রাশ্চত্বারো মৃণ্ময়া স্তান্ হ্রদে সরসি বা ঊর্দ্ধস্ততো নামৈ নাম ইত্যুদকেন পূরয়িত্বা বেদিপৃষ্ঠে সংস্থাপ্য কুম্ভে বিল্বমেকৈকং দদ্যাৎ। সর্ব্বান্নং সর্ব্বরসান্ সর্ব্ববীজানি চ প্রক্ষিপ্য উভয়ৈরপরাজিতে রায়ুষ্যৈঃ স্বস্ত্যয়নৈঃ সৌবর্জ্জেষু সম্পাতান্ সংশ্রাব্যৈঃ সংসিক্তীয়ৈশ্চ রাজতেষু ভেষজ্যবৈরংহো মুচৈ স্তাম্রেষু সংবেশ সংবর্গ্যাভ্যাং তাতীয়ৈঃ প্রাণ সূক্তেন চ মৃন্ময়েষু। ততস্তান্ কলশান্ গৃহীত্বা স্তোত্রিয়ৈঃ পবিত্রিয়ৈরভিষ্টুত্যে রাজান মভিষিঞ্চেৎ। ভূমিমিন্দ্রিয়ঞ্চ বর্দ্ধয় ক্ষত্রিয়ং মে ইতি সিংহাসনমারূঢ়মভিমন্ত্রয়েৎ। এবমভিষিক্তস্ত রসান প্রাশ্নীয়াৎ দ্বিজেভ্যশ্চ দদ্যাৎ গোসহস্রং সদস্যেভ্যঃ কর্ত্রে গ্রামবরং বিপুলং যশঃ প্রাপ্নোতি ভুঙ্‌ক্তে ধরাং জিতশত্রুঃ সদা ভবেৎ ইতি।" এই অথর্ব্ব বেদোক্ত পদ্ধতিটী পৌরাণিক পদ্ধতির মধ্যে নিবিষ্ট আছে, সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র বঙ্গানুবাদ করিতে হইবেক না, পৌরাণিক পদ্ধতির অনুবাদ দেখিলেই ইহার অর্থ প্রতীত হইবেক।

(২) এই ঐন্দ্রী শান্তির বিধি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত রাজাভিষেক সূত্রে প্রকাশ আছে। সেই দীর্ঘতম সূত্রটী আমরা প্রস্তাব শেষে উদ্ধৃত করিব। অনেক সংস্কৃত কথা একত্র থাকিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের প্রস্তাব পাঠে অসুখ জন্মে বলিয়াই আমরা সংস্কৃতাংশ অল্প দিলাম।

বেদী প্রস্তুত করিবেক (কিরূপে বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।) এই মহা বেদীব মধ্যে "শ্রীধাস্তে ভূমে বর্ষাণি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ-সহকারে একটী গর্ত্ত খনন করিবেক। সেই গর্ত্তটী পুনর্ব্বার মৃত্তিকান্তর দ্বারা "যত্তে ঊনং তত্তে আয়ুঃ—" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করত প্র-পূরিত করিবেক। অনন্তর এই মহা-বেদীর উপরে "ত্বমস্যা বপনী জনানাং-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কবিয়া বালুকা বিস্তৃত করিবেক। ইহাতেও কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেক। এবং প্রথম বেদীর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রেখা রচনাও করিবেক। (ইহার প্রত্যেক ক্রিয়াই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করিতে হয়। সে সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব কর্কশ হইবে। নিষ্প্রয়োজনে প্রস্তাব বাহুল্য ও কর্কশ করা অন্যায় বোধে সে সকল বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল না এবং মন্ত্রের প্রথমাংশ মাত্র লিখিত হইল।) রেখারচনা ও তাহার সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহাতে শরৎপক্ক ধান্য ও যব ছড়াইয়া দিবেক। অনন্তর "বেষেণ ভূমিঃ পৃথিবী বৃতা—" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জল প্রক্ষেপ করিবেক এবং "যস্যা-মন্নং ব্রীহিযবং যস্যা ইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। ভূমেই পর্জ্জন্যপত্নৈ নমোহস্তু বর্ষমেধসে" এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিবেক। অনন্তর "ত্বামগ্নে ভৃগবো নিষত্তাং—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে অগ্নি আনয়ন করিবেক। কাষ্ঠ-মন্থনজাত অগ্নি উত্তম, অসদ্ভাব হইলে অনিষিদ্ধ অগ্নিই গ্রহণ করিবেক। সেই অগ্নি কাংস্যাদি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক ব্রীহি ও যব প্রক্ষেপ করিবেক। অনন্তর সেই অগ্নি মন্ত্র পাঠ সহকারে বেদীতে স্থাপন করিবেক। অগ্নি যথাবিধি প্রজ্বলিত হইলে তাহাতে "মমাগ্নেবর্চঃ—" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিনটী সমিধ প্রক্ষেপ করিবেক। ভবিষ্যৎ রাজা এই সময়ে সেই প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে "ব্রত পতে ত্বা—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া একটী সমিধ হোম করিবেন। পরে প্রজ্বলিত বহ্নির ঈশান কোণে একটী সুবর্ণনির্ম্মিত কিংবা রজতনির্ম্মিত অথবা তাম্রনির্ম্মিত জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া তাহা গন্ধ, পুষ্প, সর্ব্বোষধি, দুর্ব্বা, পঞ্চ পল্লব, পঞ্চ ত্বক, পঞ্চ গব্য, পঞ্চামৃত, সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা, ফল, পঞ্চরত্ন, এক খণ্ড সুবর্ণ ও যুগ্ম বস্ত্রের দ্বারা অন্বিত করিবেক। এই সজ্জিত কলশটী যবপুঞ্জ কিংবা তণ্ডুলপুঞ্জের উপরে স্থাপন করিতে হইবেক। ইহার সম্মুখে অগ্নির পূর্ব্বভাগে গোচর্ম্মপরিমিত স্থান গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে এক অচ্ছিন্ন বস্ত্র পাতিত করিয়া তদুপরি পঞ্চ বর্ণ গুণ্ডিকার দ্বারা এক অষ্টদল পদ্ম রচনা করিয়া তন্মধ্য ভাগে সুবর্ণনির্ম্মিত ইন্দ্র প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজার ন্যায় উপচার সকল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অর্পণ করিবেক। এস্থলে উপচার শব্দের অর্থ পাদোদক, আসন, স্নানজল, মধুপর্ক, কুণ্ডল, ও অন্যান্য অলঙ্কার, ছত্র, চামর, ধ্বজ ও পতাকা প্রভৃতি। (এই সকল উপচার বা দানীয় দ্রব্যের দানের এক একটী

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহা উল্লেখ করিবার কোন বিশিষ্ট ফল দেখা যায় না। ক্রম জানিবার জন্য লোকের কিঞ্চিৎ কুতূহল দেখা যায় বলিয়াই অভিষেকের ক্রম মাত্র দেখান হইতেছে)। পূজা সমাপ্ত হইলে পর যজমান সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চাহুতি প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্ম স্থাপন করিবেন। ব্রহ্ম স্থাপনের প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে "ঋষীনাং প্রস্তরোঽসি—" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এক খানি আসন প্রদান, পরে "অস্মিন্ কর্ম্মনি ত্বং ভূপতে ভুবনপতে—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তদুপরি পূর্ব্ববৃত ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবেন। অনন্তর ব্রহ্মা "অহং ভূপতিরহং ভুবনপতিঃ—" ইত্যাদি মন্ত্র যপ করিবেন।

ইহার পর হোতা (যিনি হোম কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তিনি) এক মুষ্টি কুশা লইয়া, তাহা অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে পাতিত করিবেন। ব্রহ্মাও সেই আস্তরণ কালে "দেবস্যত্বা—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে কুশাস্তরণ, তাহার সংস্কার, জল প্রসেক ও পর্য্যগ্নিকরণ প্রভৃতি কার্য্য সকল শেষ হইলে, যজ্ঞীয় পাত্র সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল ও অগ্নির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইবেন। পরে আহুতি দান আরম্ভ করিবেন। আহুতি দানের নাম হোম, তাহা এস্থলে অনেক প্রকার। প্রথম সপ্তাহুতি। এই সপ্তাহুতির ৭টী ঋক মন্ত্র আছে। পরে উত্তর পূর্ব্বার্দ্ধ, তৎপশ্চাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বার্দ্ধ হোম। তাহার পর অভ্যাতান নামক হোম। ইহাতে ১৭টী আহুতি সুতরাং ১৭টী মন্ত্র। ইহার পর উত্তরাঙ্গ হোম। ইহাতে ৫টী আহুতি ও পাঁচটী মন্ত্র। পরে সমৃদ্ধি হোম। সমৃদ্ধি হোমের পর সম্নতি হোম। সম্নতি হোমে ৪ আহুতি ও ৪ মন্ত্র। পরে স্বিষ্টিকৃত হোম। ইহাতে ১ আহুতি ও একটী মন্ত্র। তৎপরে একাদশ মন্ত্রের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম। অনন্তর স্মৃতি হোম। স্মৃতি হোমে পাঁচ আহুতি। পরে সংস্থিতি হোম। সংস্থিতি হোমে ৭ আহুতি। পরে স্বাহাপঞ্চক নামক আহুতি। এই পাঁচ আহুতিকে সমান হোম বলে। (এই সকল আহুতি দানের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে—তাহা কস্মিন্ কালেও কাহারও আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া লিখিত হইল না)।

আহুতি দান সমাপ্ত হইলে, হোতা সেই সকল পূর্ব্বাস্তৃত কুশা সকল উঠাইয়া তাহা ঘৃতসিক্ত করত (মন্ত্র পূর্ব্বক) তাহা অগ্নিকুণ্ডে (মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) নিক্ষেপ করিবেন। ইহার নাম বর্হিহোম। পরে অবশিষ্ট ঘৃতাদি দ্রব্যও বহ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবেন। ইহার নাম সংস্রব হোম। পরে স্রুব অর্থাৎ আহুতি দানের পাত্র ইন্দ্রপ্রতিমা সন্নিধানে স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রের পূজা করিবেক। পূজান্তে ইন্দ্রের ও তাঁহার পরিবারবর্গের উদ্দেশে মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেক। "ভো ইন্দ্র! দিশং রক্ষ বলিং ভক্ষ্য যজমানস্য আয়ুষ্কর্ত্তা ক্ষেমকর্ত্তা শান্তিকর্ত্তা ভব।" ইহার পর দশটী মন্ত্রের দ্বারা দশ দিকে দশ দিক-

পতির উদ্দেশেও বলি নিবেদন করিবেক। পরে ক্ষেত্রপালের উদ্দেশে মহাবলি অর্থাৎ পশুবলি প্রদান করিবেক। তাহার মন্ত্র এইরূপ—"ক্ষেত্রিয়া তয়া ক্ষেত্রস্য পতিমা ক্ষেত্রপালায় ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসশাকিনী-ডাকিনীবেতালাদি পরিবারযুতায় নমঃ।" মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা বলি প্রদত্ত হইবা মাত্র তাহা শূদ্র কি কোন দুর্ব্রাহ্মণের দ্বারা চতুষ্পথে কি তৎসদৃশ অন্য কোন স্থানে স্থাপিত করিবেক। অবশেষে শুচি হইয়া ঐন্দ্রী শান্তির পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য পূর্ণাহুতি দান করিবেক। পূর্ণাহুতির দ্রব্য—আজ্য, বস্ত্রবেষ্টিত ও চন্দনমক্ষিত নারিকেল ফল। পূর্ণহোমের পর পুনর্ব্বার সমিধ হোম। পরে মুখমার্জনাদি কতিপয় ও সূর্য্য-দর্শনাদি কতিপয় ক্রিয়া মন্ত্র পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরে অগ্নি বিসর্জন, ব্রহ্ম উত্থাপন, উচ্ছিন্ন মার্জন, নমস্কার ও দক্ষিণা দান করিবেক।

এইরূপে শান্তিকার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা পত্নী সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইবেন, এবং কুটম্বমণ্ডল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিবেন। তৎপ্রকারে উপবিষ্ট রাজাকে পুরোহিতগণ শান্তিকলসস্থ জলের দ্বারা অভিষেক পরে আশীর্ব্বাদ করিবেন। অভিষেকের মন্ত্র অনেক, সুতরাং তাহা না লিখিয়া, একটী সংক্ষেপ প্রতীক মাত্রের উল্লেখ করিতেছি। "পবিত্র শত ধারং" "প্রযতেতঃ পাপী লক্ষ্মীঃ—" ইত্যাদি ৪টী মন্ত্র এবং "হিরণ্যবর্ণাঃ—" ইত্যাদি ১৬টী মন্ত্র।

এই অভিষেকের পর রাজা সর্ব্বৌষধি লিপ্তাঙ্গে পবিত্র জলে স্নান করিবেন, শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্যাদি পরিধান পূর্ব্বক সপত্নীক হইয়া আচার্য্য ও পুরোহিতদিগকে নমস্কার করিবেন এবং তাহাদিগকে বিবিধ দান দ্বারা পূজা করিবেন। দশ গাভি ও ততোধিক বৃষ, লাঙ্গল, অশ্ব, গ্রাম বা ভূমি,—এই সকল দক্ষিণা দেয় বলিয়া বিহিত আছে। অবশেষে ১১ একাদশ সবৎসা ধেনু কোন সুব্রাহ্মণকে দান করিবার উপদেশ আছে। হস্তী, অশ্ব, ও বিবিধ রত্ন দানের বিধিও দৃষ্ট হয়। এই রূপে ঐন্দ্র শান্তি সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত দিনে রাজাভিষেকের অনুষ্ঠান করিবেন। সেই কার্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতে চলিল।

* পুরোহিত ও অভিষেচ্য রাজা পূর্ব্ব দিনে উপবাসী থাকিয়া অভিষেক দিনের প্রাতে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া করণান্তে অভিষেক মণ্ডপে উপস্থিত হইবেন। শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্যাদি বিভূষিত ও কুশাহস্ত রাজা পূর্ব্বাভিমুখে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কারান্তে পূজা সমাপ্ত করিয়া মাস পক্ষ ও তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক "সকল রাষ্ট্রবশ্যতা

* এই প্রারম্ভের পূর্ব্বে দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত, অভিষেক্তব্য রাজার "রাষ্ট্রেঽয়ং রাজা" এই বলিয়া জয় ঘোষণা সভামধ্যে ও সর্ব্বত্র করিবেন। ইহার প্রমাণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে "ঘোষয়িত্বা জয়ং চাষ্ঠ সাম্বৎসর পুরোহিতৌ।" " ইত্যাদিক্রমে উক্ত হইয়াছে।

কামঃ অহং সাম্বৎসর পুরোহিতাভ্যা মাত্মান মভিষেচয়িষ্যে" এইরূপ সংকল্প করিয়া গণেশ পূজা, স্বস্তিবাচন, মাতৃকা পূজাদি আভ্যুদয়িকান্ত সমাধা করিবেন। পরে সাম্বৎসর অর্থাৎ দৈবজ্ঞ বা গণক, পুরোহিত, তিন জন ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অমাত্য, একজন সামবেদী ব্রাহ্মণ অমাত্য, কি যে কোন দেববেত্তা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ও আমাত্যকে বরণ করিবেন। সেই ব্রতীদিগকে মধুপর্ক, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার, বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সমীপে দান মানাদির দ্বারা সৎকার করিয়া নিকটে বসাইবেন। পরে পুরোহিত শুভ্র বস্ত্রাবৃত ও শুভ্র মাল্যাদি ভূষিত মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক হোম স্থানে উপস্থিত হইয়া হোমের আয়োজনাদি করিবেন। হোমকুণ্ডের উত্তরে কদলী-বৃক্ষের তোরণ ও স্তম্ভদ্বারবিভূষিত স্নান শালার মধ্যে কি যবপুঞ্জের উপর ৯টা কলশ স্থাপন করিয়া তাহা তীর্থজলাদির দ্বারা প্রপূরিত করিবেন। সেই সকল কলশে সর্ব্বৌষধি, সর্ব্ব গন্ধ, সর্ব্ব রত্ন, সর্ব্ব প্রকার বীজ, ফল, ক্ষীরি বৃক্ষের শাখা ও ক্ষীরিণী লতার পল্লব নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর তাহা শুভ্র বস্ত্র ও শ্বেত মাল্যের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। সেই নব কলশের সমীপে একটী পঞ্চগব্যযুক্ত জলপরিপূর্ণ মৃত্তিকা কলশ, একটী ঘৃতপূর্ণ সুবর্ণ কলশ, একটী দুগ্ধ পূর্ণ রৌপ্য কলশ, একটী দধি পূর্ণ তাম্র কলশ এবং মধুপূর্ণ মৃত্তিকা কলশ স্থাপন করিবেন। তৎপার্শ্বে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকা কলশ, শত ছিদ্র সুবর্ণ কলশ, নদীজল পূর্ণ, সরোবর জলপূর্ণ, কূপজলপূর্ণ ও চতুঃসমুদ্রোদকপূর্ণ কলশ স্থাপন করিবেন। এই সকল কলশের পরিমাণ উচ্চ ১৬ অঙ্গুল এবং ৫২ অঙ্গুল সূত্রের দ্বারা বেষ্টিত হয়, এরূপ স্থূল হওয়া আবশ্যক।

এই সকল দ্রব্যসম্ভার আয়োজিত হইলে পুরোহিত আথর্ব্বণ গৃহোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহ্নিস্থাপন করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্র শান্তি প্রকরণোক্ত সপ্তদশ আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর শর্ম্মগণ, বর্ম্মগণ, স্বস্ত্যয়ণ যুষ্য, অভয়া অপরাজিতা, এতন্নামধেয় মন্ত্র সমূহের দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন (এই পঞ্চগণ মন্ত্রগুলি আথর্ব্বণ গৃহ্য পরিশিষ্টে উক্ত আছে, নিষ্প্রয়োজন বিধায় সে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম না) হোমকুণ্ডের নিকট যে কলশ স্থাপিত হইয়াছিল, প্রত্যেক আহুতির উৎশিষ্ট ভাগ সেই সকল কলশে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পুরোহিত এবম্প্রকারে হোম করিবেন, রাজা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে দৈবজ্ঞ, সদস্য ও মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট হইয়া সেই হূয়মান অগ্নির সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ দেখিতে থাকিবেন। অগ্নির আবার সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ কি? যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, এজন্য তাহার দুই একটী কথা বলিতেছি, তদ্দ্বারা প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাসের গতি কি রূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"প্রসন্নার্চ্চির্মহাজ্বালঃ স্ফুলিঙ্গরহিতোহি সঃ।
স্বাহাবসানে জ্বলনঃ স্বয়ং দেবমুখং হবিঃ।

যদা ভুঙ্‌ক্তে মহাভাগ। তদারাজ্ঞোহিতং বদেৎ।"
ইত্যাদি ॥)

হূয়মান অগ্নির যদি কোন দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয় তবে তৎসূচক অনিষ্টনাশের জন্য অন্য এক স্বতন্ত্র শান্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবেক।

প্রধান হোম সমাপ্ত হইলে ঐন্দ্র শান্তিতে যে সকল হোমের উপদেশ আছে, সেই সকল হোমেরও অনুষ্ঠান করিবেন। হোম সমাপ্ত হইলে পর রাজা স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বকল্পিত স্নানশালায় গমন করিবেন. পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রকারে অভিষেক করিবেন। পুরোহিত প্রথমে সেই রাজার মস্তকে "সহস্রশীর্ষা—" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পর্ব্বত মৃত্তিকা প্রদান, পরে কর্ণ প্রদেশে বল্মীক মৃত্তিকা, ক্রমে গ্রীবা হৃদয় হস্তদ্বয় বাহুদ্বয় পৃষ্ঠ উদর পার্শ্ব কটি উরুদ্বয় জানুদ্বয়, জংঘাদ্বয়, পদদ্বয় এবং অবশেষে সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল পূর্ব্বাহৃত মৃত্তিকা সকল মন্ত্রপুত করিয়া লেপন করাইবেন।

ক্রমশঃ।

উপহার।

জীবন-সাগর পারে,
কত দূর দূরান্তরে,
মরণ তরঙ্গাহত আঁধার পুলিনে,
আঁধার সাগর বেলা,
তরঙ্গ করিছে খেলা,
আঁধারে চলেছে তরি দিক নাহি চিনে,
কে তুমি সে ভীম তীরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছ ধীরে,
বিচিত্র জীবন জ্যোতি নিকলে নয়নে ?
জীবনের তীরে আমি
কাটাতেছি দীর্ঘ যামি,
তোমার নয়ন জ্যোতি পশিছে নয়নে!
মরনের ভুরু মাঝে
নয়নের টীপ রাজে,
কঙ্কালের ভালে যেন দেবের লোচন!
আঁধার মরণ সিন্ধু,
তাহে তুমি পূর্ণ ইন্দু,
কোন খেদ নাহি র'বে ত্যেজিলে জীবন।

২

গদগদ আধ বাণী,
জানি জানি নাহি জানি—
ধীরে ধীরে ভেসে আসে স্মৃতি-সমিরণে

জীবনের শেষ বায়,
যেমন বহিয়ে যায়.
তেমনি কি কথা যেন আসিছে স্মরণে ;
নীলাম্বর ভেদ করি,
তারা দলে সারি সারি,
ইঙ্গিতে সকলে মিলে আহ্বানে আমায় ;
নেমে নেমে আসে তারা,
নয়নেতে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে ধীরে ধীরে মুখপানে চায় ;
কাছে এলে তারাগণে,
সেই আঁখি পড়ে মনে,
জীবনে দেখেছি যাহে দেখিব মরণে,
মাতৃকর পদ্ম সম,
যে আঁখি সান্ত্বনা মম,
অন্তিমে স্মরিয়ে যাহে শোকশান্তমনে।

৩

স্তম্ভিত জীবন গতি,
উন্মত্ত উদ্ভ্রান্ত মতি,
জটিল জীবন পথে না ছিল সোসর !
নেমে এসে স্বর্গ হতে
দেখালি নূতন পথে,
ভাসিত অধরে হাসি স্বরগ সুন্দর।
শিরেতে চন্দ্রমা হাসে,
চরণে তটিনী ভাসে,
সমীর আসিত লয়ে ফুলের সুবাস ;
দুই করে কর থুয়ে,
নয়ন নামিত ভুয়ে,
পড়িত পরাণে ভুয়ে শান্তি নীলাকাশ !
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা,
তারকা শশীতে যথা,
সোহাগে জড়ানো গান করুণা করিয়ে !
মোহিয়ে অমর কুল,
ভাসন্ত ফুটন্ত ফুল,
দুজনে স্বপন-সরে আছিনু ফুটিয়ে !

৪

জীবন-যামিনী শেষে,
যাইব নবীন দেশে,
হেরিব নবীন উষা নবীন গগনে,
কুতূহলে মেলি আঁখি,
হরষে চাহিয়ে থাকি,
তুমি সে প্রভাত তারা উদিবে নয়নে!
আছি আছি, নাই নাই,
তবু দেখিবারে পাই,
সমান জাগিবে তুমি জীবনে মরণে ;
পুণ্যবান আমি আজ,
স্মৃতির পিঞ্জর মাঝ,
রেখেছি যে পাখী মিলে নন্দন কাননে।
উধাও উধাও তুমি,
ভেদিবে আকাশ ভূমি,
সপ্তসর্গ ভেদ করি করিবে গমন,
কোথা যাবে নাহি জ্ঞান,
কল্পনা অগম্য স্থান,
আজ তুমি দেবতার নিশান্ত স্বপন !

৫

দেবের স্বপন হও,
তবু আমা ছাড়া নও,
বাঁধা আছ, বাঁধা আছি, নয়ন কিরণে ;
মলিন মন্দির মম,
নিরানন্দ নিকেতন,
দেখিয়ে তোমার মুখ রেখেছি জীবনে ;
কেন দোঁহে দুই ধারে,
জীবন মরণ পারে,

কিরণের ডোর কেন সুদীর্ঘ এমন ?
মিলে মিশে এস দোঁহে,
যাই চোলে মায়ামোহে,
পাশাপাশি, মিশামিশি, অভেদে দুজন !
—চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই,
কি ঘোর আঁধার ঠাঁই !

—ওই যে সমুখে আলো হতেছে উদয় !
হ'ল আলো,—আলো নাই !
—স্বর্গ এল !—স্বর্গ নাই !
হের দেখ—তুমি আমি আমি তুমি ময় !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গান।

১

বেড়াব দুজনে মিশি,
কাটাব সুখে নিশি,
আকাশে দিশি দিশি
ফুটেছে তারা,
অচল শিখর পরে
হরিণী খেলা করে,
নিকটে ঝরঝরে
নিঝর ধারা !

২

জ্যোৎস্নায় নিমগন
ঘুমায় ত্রিভুবন,
মৃদুল সমীরণ
বহিয়া যায়,
চৌদিকে ফিরায়ে আঁখি
কে জানে কি যে দেখি
নীরব হ'য়ে থাকি
বিহ্বল প্রায় !

৩

আহাহা ! আহাহা ! বলি
হৃদয় আসে গলি,
নয়ন পড়ে ঢলি,
আকুল প্রাণ ;
কি যেন স্বপন প্রায়
আসিছে পায় পায়
সুদূরে শুনা যায়
কি এক গান !

৪

বেড়াব দুজনে মিশি,
কাটাব সুখে নিশি,
আকাশে দিশি দিশি
ফুটেছে তারা,
অচল শিখর পরে
হরিণী খেলা করে,
নিকটে ঝরঝরে
নিঝর ধারা !

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ।

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ
কি গান গাইল রে !
অতি দূর—দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে !
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া,
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ !
আজি এ প্রভাতে সহসা কেনরে
পথহারা রবি কর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের পর।
বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
প'ড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক রেখা !
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।
আজি এ প্রভাতে কি জানি কেনরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ !
জাগিয়া, দেখিনু চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ !

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি র'য়েছি বাঁধা !
র'য়েছি মগন হ'য়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে !
গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ
একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর !
দূর—দূর—দূর হ'তে ভেদিয়া আঁধার কারা,
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা !
ঘুমায়ে দেখিরে যেন স্বপনের মোহ মায়া,
পড়েছে প্রাণের মাঝে একটি হাসির ছায়া !
তারি মুখ দেখে দেখে,
আঁধার হাসিতে শেখে,
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান ;
শিহরি উঠেরে বারি,দোলেরে-দোলেরে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি,
দোলেরে—দোলেরে হাসি,
দোলেরে প্রাণের পরে আশার স্বপন মম,
দোলেরে তারার ছায়া সুখের আভাস সম !
প্রণয়-প্রতিমা যবে স্বপনে দেখেরে কবি,

অধীর সুখের ভরে
কাঁপে বুক থর থরে,
কম্পমান বক্ষ পরে দোলে সে মোহিনী ছবি;
দুখীর আঁধার প্রাণে সুখের সংশয় যথা,
দুলিয়া দুলিয়া সদা মৃদু মৃদু কহে কথা!
মৃদু ভয়, কভু মৃদু আশ,
মৃদু হাসি, কভু মৃদু শ্বাস;
বহু দিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তান,
দোলেরে প্রাণের মাঝে, দোলেরে আকুল প্রাণ,
আধ আধ জাগিছে স্বপনে,
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে!
তেমনি তেমনি দোলে,
তারাটি আমার কোলে,
করতালি দিয়ে বারি কল কল গান গায়,
দোলায়ে দোলায়ে যেন ঘুম পাড়াইতে চায়!

মাঝে মাঝে একদিন, আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো;
আঁধার সলিল পরে
ঝর ঝর বারি ঝরে,
ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি অবিরল,
বরষার দুখ কথা, বরষার আঁখি জল!
শুয়ে শুয়ে আন মনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই গুণি!
তারি সাথে মিলাইয়ে কল কল গান গাই,
ঝর ঝর কল কল দিন নাই, রাত নাই!
ঝর ঝর কল কল গানেতে মিশিল গান,
তালে তালে তানে তানে প্রাণেতে মিশিল প্রাণ!

বরষা গুহায় পশি,
স্বপন মাঝারে বসি,
কহিল আমার কাছে আমারি প্রাণের কথা;
বসিয়া হৃদয় মাঝে অশ্রুআঁখি কবি যথা
নিজের গানেতে গাহে পরের প্রাণের ব্যথা!

এমনি নিজেরে ল'য়ে রয়েছি নিজেরি কাছে,
আঁধার সলিল পরে আঁধার জাগিয়া আছে!
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
ওরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ,
রুধিয়া রাখিতে নারি!
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে!
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার!
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া,
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া
উঠে শূন্য পানে—পড়ে আছাড়িয়া,
করে শেষে হাহাকার!

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়,
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগত মাঝারে লুটিতে চায়!
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্গ্‌রে হৃদয় ভাঙ্গ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর;
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?
একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন!
জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিবনা আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে!
আমি—ঢালিব করুণা-ধারা!
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা!
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি!
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি!
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ, ব'হে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ!
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!

কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহা সাগরের গান!
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়!
অহো কি মহান্ সুখ, অনন্তে হইতে হারা,
মিশাতে অনন্ত প্রাণে, অনন্ত প্রাণের ধারা!
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন!

আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন
পৃথিবীরে বুকে লয়ে সমুদ্র একেলা বসি
অসীম প্রাণের কথা কহিতেছে দিবানিশি,
আপনি জানেনা যেন,
আপনি বুঝেনা যেন,
মহাসিন্ধু ধ্যানে বসি, আপনি উঠিছে বাণী!

কেহ শুনিবার নাই—নাই কোথা জনপ্রাণী,
কেবল আকাশ একা দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা,
নীরব শিষ্যের মত শুনিছে মহান্ কথা!
কি কথারে—কি কথা সে—শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ,
একেলা কবির মত গাহিছে কিসের গান!
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, দিন নাই রাত্রি নাই,
সঙ্গী নাই, জন প্রাণী নাই,
একাকী চরণ প্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই।
আসিবে গভীর রাত্রি আঁধারে জগত ঢাকি
দিশাহারা অন্ধকারে মুদিয়া রহিব আঁখি।
স্তব্ধতার প্রাণ উঘাটিয়া,
ভেদি সেই অন্ধকার ঘোর,
কেবলি সে একতান সমুদ্রের বেদগান
সারারাত্রি অবিশ্রাম পশিবে শ্রবণে মোর!
ওই যে হৃদয় মোর অ হ্বান শুনিতে পায়,
"কে আসিবি, কে আসিবি, যে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া, জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!"
আমি যাব'—আমি যাব'—
কোথায় সে, কোন্ দেশ,—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান,
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর!
ওরে আজ
কি গান গেয়েছে পাখী,
এয়েছে রবির কর।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজাভিষেক পদ্ধতি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এইরূপে মৃত্তিকাস্নান সমাপ্ত হইলে সেই পূর্ব্ব-স্থাপিত কলশস্থ পঞ্চগব্য-মিশ্রিত জলের দ্বারা স্নান করাইবেন। (ইহার মন্ত্র ৬টী কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করা গেল) অনন্তর রাজা সে আসন পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-নির্ম্মিত ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইবেন। এই ভদ্রাসন সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র কিংবা ক্ষীরি কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মাণ্ডলিক হইলে ভদ্রাসনটীর উচ্চতা এক হস্ত এবং বিস্তারেও এক হস্ত। রাজা

হইলে তাহা সপাদ হস্ত এবং মহারাজা হইলে তাহা সার্দ্ধ হস্ত পরিমাণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। (১)

অভিষেচ্য রাজা ভদ্রাসনে বসিলে, পুরোহিত, পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বস্থাপিত সেই ঘৃতকুম্ভের দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে দাঁড়াইয়া অভিষেক করিবেন। পরে ক্ষত্রিয় জাতীয় অমাত্য সেই পূর্ব্বসংস্থাপিত দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য কলশের দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিবেন। অনন্তর বৈশ্যামাত্য পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়া সেই দধিপূর্ণ তাম্রকলশের দ্বারা স্নান করাইবেন। পরে সামবেদী অমাত্য উত্তর দিকে অবস্থিতি করিয়া সেই মধুপূর্ণ মৃত্তিকা কলশের দ্বারা অভিষেক করিবেন এবং তিনিই সেই কুশোদকপূর্ণ মৃৎকুম্ভের দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। ইহাঁদের জন্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রের উল্লেখ আছে, এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।

অতঃপর পুরোহিত সদস্যদিগকে "অগ্নি রক্ষার্থ "যূয়ং অগ্নিং রক্ষধ্বম্" এইরূপে নিযুক্ত করিয়া হোমকালে যাহাতে আহুতির উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সেই সুবর্ণকলশ লইয়া রাজসূয় যজ্ঞোক্ত অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিষেক করিবেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে সকল মন্ত্রের দ্বারা অভিষেক করিতে হয় সে সকল মন্ত্র ঋক ও যজুর্ব্বেদোক্ত এবং তাহা অনেকগুলি। সুতরাং তাহার সকল না লিখিয়া দুই একটা মন্ত্র এস্থলে প্রদর্শনার্থ লিখিত হইল।

"সোমস্য ত্বা দ্যুম্নেনাভিষিঞ্চামি অগ্নে র্ভ্রাজসা সূর্য্যস্য বর্চসা ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েন ক্ষত্রাণাং ক্ষত্রপতি রেধ্যতি দি দ্যূন্যাহিং। ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জানরাজায় ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় ইমং অমুষ্যপুত্রং অমুষ্যৈ পুত্রমস্মৈ বিশ এষ বোহমীরাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।" ইত্যাদি।

অনন্তর পুরোহিত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গমন করিবেন। অন্য কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তখন সেই ভদ্রাসনোপবিষ্ট রাজাকে শতছিদ্র কুম্ভে জলনিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। পরে মন্ত্রপূত করিয়া সর্ব্বৌষধি গন্ধোদক, বীজ, পুষ্প, ফল, রত্ন, ও কুশ সংসৃষ্ট জলের দ্বারা অভিষেক করিবেন। কোন কোন পুরোহিতেরা বলেন, যে, এই সময়ে কুশ, দুর্ব্বা ও পল্লবের দ্বারা সেই অভিষিক্ত রাজদেহ মার্জনা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কেবল এক ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ গোরোচনাযুক্ত গন্ধের দ্বারা রাজার মস্তক ও কণ্ঠ বিলিপ্ত করিবেন। এই সময়ে নিমন্ত্রিত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও শঙ্কর জাতীয় প্রজাগণ গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর জল, সরোবর জল, কূপ জল, চতুঃসমুদ্রের জল ও নির্ঝর জল (যিনি যাহা

১ ভদ্রাসন নির্ম্মাণের বিধি দেবীপুরাণে বিশদরূপে লিখিত আছে। "হৈমঞ্চ রাজতং তাম্রং ক্ষীরিবৃক্ষময়ঞ্চ বা। ভদ্রাসনঞ্চ কর্ত্তব্যং সার্দ্ধহস্তসমুচ্ছ্রিতম্। সপাদহস্ত মানঞ্চ রাজ্ঞো মাণ্ডলিকান্তরাৎ।" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বরাহসংহিতা গ্রন্থেও ইহার নিয়মাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত হন তিনি তদ্দ্বারা) পূর্ণ কলশ লইয়া অভিষেক করিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, শূদ্র ও সঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিরা মন্ত্র পাঠ করিবেন না। এই সময়েই প্রধান অমাত্যেরা তাঁহার সমীপে রাজছত্র, চামর ও বেত্রহস্ত হইয়া দাঁড়াইবেন। বাদ্যকরেরা বাদ্যধ্বনি করিবেন। বৈদিকেরা বেদগান ও স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিপাঠ করিবেন। যাঁহারা উপায়ন আনিয়াছেন তাঁহারা এই সময়ে তাহা অর্পণ করিবেন। এই উৎসব সমাধা হইলে পর দৈবজ্ঞ সমস্ত কুম্ভের অবশিষ্ট জল এক সুবর্ণ কুম্ভে রক্ষা করিয়া কুশমুষ্টির দ্বারা তাহা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজার শিরঃ প্রদেশে অভিনিক্ষেপ করিবেন এবং "সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই শেষ অভিষেক মন্ত্রের সংখ্যা ১৮০। সেই ১৮০টী মন্ত্র লিখিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই।

দৈবজ্ঞের অভিষেক শেষ হইলে রাজা সুগন্ধি তৈল ও সুগন্ধ উদ্বর্ত্তন ম্রক্ষণ করিয়া সুপরিষ্কার জলে স্নান করিয়া মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষ, অঙ্গে শুভ্র পরিচ্ছদ ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ কি কোন উত্তমাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আদর্শে ও ঘৃত পাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন। ঘৃতপাত্র সুবর্ণ দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া চন্দন, কুঙ্কুম, দধি, দুর্ব্বা ও অন্যান্য মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেন। পরে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করিবেন।

এই অবকাশে দৈবজ্ঞ, রাজার ললাটোপরি পট্ট ও মুকুট পরাইবেন। (২) অনন্তর পট্ট ও মুকুটধারী রাজাকে শুভ লগ্নে মঞ্চো-

---

২ পট্ট কি? তাহা বলা যাইতেছে। দেবীপুরাণে সামান্যতঃ পট্টলক্ষণ উক্ত হইয়াছে কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা তাহার নির্ম্মাণ পদ্ধতি অতি বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার সারার্থ এই, যে, ৮, ১৫, ২২,২৯, কিংবা ২৬ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ, দীর্ঘের অর্দ্ধ পরিমাণ মধ্য ভাগের বিস্তার এবং দুই প্রান্তভাগের বিস্তার তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ একটী সুবর্ণ পত্র,—ইহা বৃত্তাকার অথবা চতুরস্র অর্থাৎ চৌকোষ রূপে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে বা গর্ভভাগে একটী কৃত্রিম পদ্ম তৎসংস্রবে বা তৎপার্শ্বে শ্রীবৎস, শিব কি গণেশ বৃষেভ বা বরাহেভ অর্থাৎ বৃষদেহ ও হস্তিমুখ কিংবা বরাহদেহ ও গজমুখ ও স্বস্তিকাদি চিহ্ন সকল অতি সূক্ষ্ম ও পরিস্কার রূপে শিল্পীর দ্বারা খোদিত করিবেক। এই পট্টের ৫ টী শিখর, যুবরাজের হইলে ৩টী শিখর, রাজমহিষীর জন্য হইলে শিখরাকারে গঠন করিবেক। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, পট্ট কিংবা ভূষণে ব্যাঘ্র, সর্প, হস্তী, সিংহ, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, বৃষ চিহ্ন খোদিত করিবেক না। এবং কৃমিকীট পতঙ্গাদি চিহ্নও খোদিত করিবেক না। পট্ট অষ্টাপদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাঞ্চনের দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া অষ্টাপদ পট্ট এবং পদ্ম, শ্রীবৎস, মৎস্য, স্বস্তিক বিনায়ক প্রভৃতি পৃথক পৃথক আট প্রকার চিহ্নান্বিত পৃথক আট প্রকারের গঠন হয় বলিয়া অষ্টপট্ট নাম দেওয়া হইয়া থাকে, অথবা আট প্রকারের চিহ্ন থাকে বলিয়া অষ্টপট্ট নাম। প্রথমোক্ত মতের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, প্রথম মতে আট প্রকারের যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার পট্ট গ্রহণ করিবেক, কেহ বলেন তাহা নহে, একাধারেই উক্ত আট প্রকার চিহ্ন খোদিত করিবেক। এই পট্টের প্রতিনিধি পট্টিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র পট্ট। এই পট্টিকা হইতেই রাজটীকা নাম উঠিয়াছে। সংস্কৃত বচন গুলি অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।

পরি অথবা রাজাসনোপরি উপবিষ্ট করাইবেন। সেই রাজাসন বা মঞ্চটা উপর্য্যুপরি চর্ম্ম ও বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবেক অর্থাৎ মঞ্চের উপর প্রথমে বৃষচর্ম্ম পাতিবেক, তদুপরি মার্জ্জার চর্ম্ম, তদুপরি তরক্ষু চর্ম্ম, তদুপরি সিংহচর্ম্ম, তাহার উপর ব্যাঘ্র চর্ম্ম, তাহার উপর বহুমূল্য বস্ত্র পাতিত করিবেক। রাজা এতদ্রূপ মঞ্চে উপবিষ্ট হইলে দ্বারপাল যথাক্রমে অমাত্য পুরবাসী বণিক ও প্রজাদিগকে রাজদর্শন করাইবেক। তাঁহারা রিক্ত হস্তে রাজদর্শন করিবেন না, সকলেই কিছু না কিছু উপঢৌকন দান করিবেন। অনন্তর রাজা, পূর্ব্বোক্ত দৈবজ্ঞ, পুরোহিত, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বেদ বেত্তা ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকেও গ্রাম, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, গো, অজ, মেষ ও গৃহদান দ্বারা সম্মানিত করিবেন এবং মোদকাদি বিবিধ দ্রব্য ভোজন করাইবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজন করাইয়া, তাঁহাদিগকে গাভি, বস্ত্র, তিল, রৌপ্যমুদ্রা, বিবিধ অন্ন, ফল, সুবর্ণ, পুষ্প ও ভূমিদান করিবেন। পরে মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণহস্তে সেই যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। গুরু প্রভৃতি নমস্যদিগকে নমস্কার করিয়া এক মহাবৃষ ও সবৎসা গাভী সম্মুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিবেন। এই সময়ে পুরোহিত এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত উত্তম অশ্ব ও এক মহা হস্তী আনয়ন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বৌষধি কলশস্থ জলের দ্বারা সেই দুই টাকেও অভিষেক করিবেন। মন্ত্র গুলি অশ্বশান্তি ও ছাগশান্তি পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র গুলি শুনিতে মন্দ নহে, পরন্তু তাহা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পুরোহিত অশ্ব ও হস্তীকে অভিমন্ত্রিত করিলে রাজা অশ্বের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া অবশেষে সেই অভিমন্ত্রিত হস্তীতে আরোহণ করিবেন। (ইহারই নাম রাজহস্তী) প্রধান অমাত্য ও দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতেরা অন্য হস্তীতে আরূঢ় হইবেন। সকলে একত্রিত হইয়া রাজপথে অবতীর্ণ হইবেন। এবং কিয়ৎকাল নগর ভ্রমণ করিয়া দেবালয় সকলে গমন পূর্ব্বক তথায় তাঁহাদিগকে পূজা ও দেবত্র দান করিবেন। পরে সকলে একত্রিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিবেন। ভ্রমণকালে ও পুরপ্রবেশ কালে তাঁহাদের অগ্রে বাদ্য ও চতুরঙ্গ সেনা অবস্থিত থাকিবেক। শিল্প প্রদর্শন ও অন্যান্য নাগরিক আনন্দোৎসবও অনুষ্ঠিত থাকিবেক। নবাভিষিক্ত রাজা ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া, দান, ও যথোচিত সংকার করিবেন। দীন, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ পঙ্গু খঞ্জ কুব্জ ও বামনাদি দুর্গতদিগকে যথাশক্তি দান করিবেন। দান মান সৎকারাদির দ্বারা সকলকে বিদায় করিয়া অবশেষে সুহৃদগণের

সহিত হৃষ্ট চিত্তে ভোজন করিবেন। রাত্রি-কাল রাজমহিষীর সহিত একান্তে অতিবাহিত করিবেন। পূর্ব্বরাজার সময়ে যদি কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ থাকে তবে তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিবেন। ইহাও একটী তৎকালের কর্ত্তব্য। কেহ বলেন যে, এই কার্য্য অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই করিতে হয়।

এতদূরে রাজাভিষেক-পদ্ধতি সমাপ্ত হইল। মনে এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, এই পদ্ধতিটি যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে লিখিত হইল কি না, তাহা আমরা জানি-না। অতএব তাদৃশ সংশয়িত ব্যক্তির সংশয়াপনোদনের নিমিত্ত আমরা ইহার প্রমাণসূত্রটী উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

"ইতি সম্ভৃত সম্ভারো রাজ্ঞঃ সাম্বৎসর শুভঃ।
কালেঽভিষেচনং কুর্য্যাৎ তং কালং কথয়ামি তে॥

মৃতে রাজ্ঞি ন কালস্য নিয়মোঽত্র বিধীয়তে।
তত্রাস্য স্নপনং কার্য্যং বিধিবত্তিলসর্ষপৈঃ॥
ঘোষয়িত্বা জয়ং চাস্য সাম্বৎসরপুরোহিতৌ।
অন্যাসনোপবিষ্টস্য দর্শয়েতাং জনং শনৈঃ॥
স সান্ত্বয়িত্বা তু জনং মুক্ত্বা বন্ধনগংততঃ।
দত্ত্বাঽভয়ন্ত্বাসনস্থঃ কালাকাঙ্ক্ষী ততো ভবেৎ॥

নাভিষেচ্যো নৃপশ্চৈত্রে নাধিমাসে চ ভার্গব।
ন প্রসুপ্তে তথা বিষ্ণৌ বিশেষাৎ প্রাবৃষি দ্বিজে॥
ন চ ভৌমদিনে রাম চতুর্থ্যাঞ্চ তথৈব চ।
নবম্যাং নাভিষেক্তব্যশ্চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ ভার্গব।॥
ধ্রুবানি বৈষ্ণবং শাক্রং দশ্রপুষ্যৌ তথৈব চ।
নক্ষত্রাণি প্রশস্যন্তে ভূমিপালাভিষেচনে॥
কার্য্যা পৌরন্দরী শান্তিঃ প্রাগেবাস্য পুরোধসা।

প্রাপ্তেঽভিষেকদিবসে সোপবাসঃ পুরোহিতঃ॥

সিতমাল্যোপবীতশ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
বেদিমুল্লিখ্য মন্ত্রেণ হুত্বা তু বিধিবত্ততঃ॥
শর্ম্মবর্ম্মগণঞ্চৈব তথা স্বস্ত্যয়ণং গণম্।
আয়ুষ্যমভয়ঞ্চৈব তথৈব চাপরাগিতম্॥
সমপাতবন্তং কলশং তথা কুর্য্যাচ্চ কাঞ্চনম্।
বহ্নে র্দক্ষিণপার্শ্বস্থঃ শ্বেতচন্দনভূষিতঃ।
শ্বেতানুলেপনঃ স্রগ্বী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
আসনস্থঃ সুখং পশ্যেৎ নিমিত্তানি হুতাশনে॥

পশ্যেযুরন্যে চ তথা নৃসিংহাঃ
দৈবজ্ঞবাক্যং নিপুণঞ্চ ভূয়ঃ।
সাম্বৎসরস্যাথ সদস্যমুখ্যাঃ
সদস্যমুখ্যঃ স পুরোহিতশ্চ।

প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখস্তদা জাম্বূনদপ্রভঃ।
রথৌঘমেঘনির্ঘোষো বিধূমশ্চ হুতাশনঃ॥
অনুলোমঃ সুগন্ধশ্চ——সন্নিভঃ।
বর্দ্ধমানাকৃতিশ্চৈব নন্দ্যাবর্ত্তনিভস্তথা॥
প্রসন্নার্চি র্মহাজ্বালঃ স্ফুলিঙ্গরহিতো হিসঃ।
স্বাহাবসানে জ্বলনঃ স্বয়ং দেবমুখোহবিঃ॥
যদাভুঙ্ক্তে মহাভাগ তদা রাজ্ঞো হিতং বদেৎ।

হবিষশ্চ যদা বহ্নৌ ন স্যাচ্ছিমিশিমায়িতম্॥
ন ব্রজেযুশ্চ মধ্যেন মার্জ্জারমৃগপক্ষিণঃ।
পিপীলিকাশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ তদা কুর্য্যাজ্জয়ং নৃপে॥
অঙ্গহারাদিনাভেতু বহ্নৌ রাজ্ঞো জয়ং বদেৎ।

তথৈব চ জয়ং ব্রূয়াৎ প্রস্তরস্যাপ্যদাহিনি॥

স্নানং সমারভেদ্রাজ্ঞো হোমকার্য্যাদনন্তরম্।
... ... স্বেচ্ছয়া স্নাতঃ পুন র্ঋগ্‌ভিঃ
সমারভেৎ॥

পর্ব্বতাগ্রমৃদা তাবৎ মূর্দ্ধানং শোধয়েন্নৃপঃ।
বল্মীকাগ্রমৃদা কর্ণৌ বদনং কেশবালয়াৎ॥
ইন্দ্রালয়মৃদা গ্রীবাং হৃদয়ন্তু নৃপাজিরাৎ।
করিদন্তোদ্ধৃতমৃদা দক্ষিণন্তু তথা ভুজম্॥
সরোমৃদা তথা পৃষ্ঠং উদরং সঙ্গমান্মৃদা।
নদীকূলদ্বয়মৃদা পার্শ্বৌ সংশোধয়েত্ততঃ॥
বেশ্যাদ্বারমৃদা রাজ্ঞঃ কটিশৌচং বিধীয়তে।
গজস্থানাৎ তথৈবোরু গোস্থানাজ্জানুনী তথা॥

অশ্বস্থানাত্তথা জঙ্ঘে রাজ্ঞঃ সংশোধয়েদ্বুধঃ।
রথচক্রোদ্ধৃতমৃদা তথৈব চরণদ্বয়ম্॥
মৃৎপূতঃ স্নপনীয়ঃ স্যাৎ পঞ্চগব্যজলেন তু।
ততো ভদ্রাসনগতং মুখ্যামাত্যচতুষ্টয়ম্।
বলপ্রধানং ভূপালমভিষিঞ্চেৎ যথাবিধি॥
পূর্ব্বতোহেমকুম্ভেন ঘৃতপূর্ণেন বা ততঃ
দক্ষিণে ক্ষীরপূর্ণেন রৌপ্যকুম্ভেন ক্ষত্রিয়ঃ॥
দধ্নাচ তাম্রকুম্ভেন বৈশ্যঃ পশ্চিমতোদ্বিজ।
মাহেয়েন জলেনোদক্ শূদ্রামাত্যোভিষেচয়েৎ॥

ততোঽভিষেকং নৃপতের্ঋচপ্রচয়োদ্বিজঃ।
কৌবের্য্যাং মধুনা রাম! ছন্দোগোঽথ কুশোদকৈঃ॥

সম্পাতবন্তং কলশং তথাহৃত্য পুরোহিতঃ।
বিধায় বহ্নিরক্ষান্ত সদস্যেষু যথাবিধি॥
রাজসূয়াভিষেকেতু যে মন্ত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তৈস্তু দদ্যান্মহাভাগ! ব্রাহ্মণানাং স্বরেণতু॥
ততঃ পুরোহিতো গচ্ছেৎ বেদিমূলং তদৈবতু॥
বিভূষিতন্তু রাজানাং সংস্থিতং ভদ্র আসনে॥
শতছিদ্রেণ পাত্রেণ সৌবর্ণেন যথাবিধি।
অভিষিঞ্চেত ধর্ম্মজ্ঞঃ সম্যক্ বেদবিশারদঃ॥
যা ওষধী রোষধিভিঃ স্থতাভিঃ সুসমাহিতঃ।
রথে তিষ্ঠেতি গন্ধৈশ্চ আব্রহ্মান্ ব্রাহ্মণেতিচ॥
বীজৈঃ পুষ্পৈ স্তথা সীমংরাম! পুষ্পবতীতি চ।
তেনৈবচৈব মন্ত্রেণ ফলৈস্তমভিষেচয়েৎ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি॥

শ্রীরামদাস সেন।

বঙ্গীয় সেন রাজবংশ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব—সেনরাজারা অম্বষ্ঠ না ক্ষত্রিয়?

ভারতী, পঞ্চম ভাগ, ৫৫০ পৃষ্ঠার পর।

"বঙ্গীয় সেন নৃপতিগণ অম্বষ্ঠ, না ক্ষত্রিয়?" এই বিষয় লইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ বহু আন্দোলন চলিতেছে। একাল পর্য্যন্ত যে সেন নৃপতিগণ অম্বষ্ঠ-কুল-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কুলাচার্য্যগণ, ঘটকগণ, সমুদয় প্রাচীন

নব্য, ভদ্র, অভদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক সকল, ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং কায়স্থদের কুলপঞ্জিকা সকল, বহু শতাব্দী প্রচলিত জনশ্রুতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক যে সেন রাজগণ অসন্দিগ্ধ ভাষায় ও সমস্বরে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন আজ সেই বহু শতাব্দী-প্রবাহী গ্রন্থবচন লৌকিক সংস্কার প্রভৃতিকে অনাদর করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র দুই একটি সন্দিগ্ধ বাক্যের, স্বপ্রত্যয়-পরিপোষক অর্থ লিখিয়া, লৌকিক বিশ্বাস অন্য পথে প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। রাজেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন ভুবনবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের লেখনী হইতে এ প্রস্তাব প্রসূত হইয়াছে বলিয়াই এখনও কোন কোন মহাত্মা সেন নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু অন্য কাহারও সৃষ্ট হইলে, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অর্ব্বাচীন-প্রলাপ বলিয়া পরিত্যক্ত হইত।

বোধ হয় রাজেন্দ্র বাবু সেন নৃপতিগণকে চন্দ্র বংশীয় দেখিয়া, ও অম্বষ্ঠগণকে নৃপতির অযোগ্য বিবেচনা করিয়া, নিজের সহজ সংস্কারানুসারে সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে, তিনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কুলপঞ্জিকার বচনে দৃক্‌পাত না করিয়া, কেন কুলাচার্য্য ঠাকুরের কৃত সাধারণের অজ্ঞাত ও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থ হইতে সমস্ত বাক্য বা সমস্ত শ্লোকের পরিবর্ত্তে, মাত্র "ক্ষত্রিয়বংসহংসঃ" এই কথাটি আদিশূরের বিশেষণ রূপে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিবেন। নতুবা কেন "সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" এই পাদের বহু সরল ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে A garlad for the noblest race of the Khetriya kings" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সামন্ত সেনকে ক্ষত্রিয় করিতে প্রয়াসী হইবেন? তিনি যে যে যুক্তির বলে সেন রাজাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশীয় বলিয়াছেন, অধিকাংশ লোকের বিবেচনায়, তাহা দ্বারা সেন রাজাদের জাতি সম্বন্ধে কোন ও আভাস পাওয়া যায় না; অথবা সেন রাজারা যে অম্বষ্ঠ নহেন, উহাদ্বারা কোন ক্রমেই তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারে না।

অনিশ্চিত, সংশয়পূর্ণ, ও নানার্থবোধক প্রমাণ দ্বারা সেন রাজাদের ন্যায় তেমন একটি চিরবিখ্যাত ও সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয়ের বিরুদ্ধ মত স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব কথা। রাজেন্দ্র বাবু পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু সেন রাজাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, আমি যতদূর জানি তাহাতে, পোনে ষোল আনি লোকের জ্ঞান বিশ্বাস ও যুক্তির বিরুদ্ধে চলিয়াছেন; পোনে ষোল আনি লোকই তাঁহার এ সিদ্ধান্তকে স্বাবলম্বন-পরিপোষক ও যুক্তি-প্রমাণ-বিবর্জ্জিত বলিয়া উপেক্ষা করে। শুধু কয়েক জন কায়স্থ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতিই তাঁহার এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

সর্ব্বসাধারণ যাহা যুক্তি-প্রমাণ-বর্জ্জিত বলিয়া উপেক্ষা করিল তাহাই রাজেন্দ্র বাবুর ন্যায় ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন; ইহার অর্থ কি? তবে কি বলিবে তিনি অম্বষ্ঠ জাতির গৌরবে হিংসাপরতন্ত্র হইয়া সেন নৃপতিদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন? না, একথা আমরা ভ্রমেও স্বীকার করিব না। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই সামান্য কারণে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিবেন একথা মনে করাকেও পাপ মনে করি। যদি তাহাই হইল তবে স্বীকার করিতে হইবে যে রাজেন্দ্র বাবু সহজ সংস্কার অব্যাহত রাখিবার জন্য অনেক গুলি বিশ্বাস্য প্রমাণ ও সর্ব্বসাধারণের চিরসংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া স্বমত-পরিপোষক যুক্তি ও ব্যাখ্যার বলে সেন রাজাদিগকে ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়া ছিলেন। এরূপ অবস্থায় যদি সেন নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় করিবার জন্য, তাঁহার মন গড়াইয়া পড়ে, তবে তাহা তাদৃশ দোষের বিষয় নয়, তাহা সকলেরই হইতে পারে। বোধ হয় শিশুকাল হইতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সেনরাজগণের ন্যায় তেমন প্রতাপশালী নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না, সুতরাং "ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাং কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ" দেখিয়াই তাঁহার চিরসংস্কারের অনুকূল ব্যাখ্যা করিয়া সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। এরূপ হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী অথবা অম্বষ্ঠবিদ্বেষী মনে করা অনুচিত। আমি একজন কৃতবিদ্য মহাত্মাকে দেখিয়াছি, তাঁহার বাল্য কাল হইতে দৃঢ় সংস্কার, ত্রিপুরার নৃপতিকুল কদাচ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নহেন। তিনি ত্রিপুরার নৃপতিকুলকে অনার্য্য প্রতিপন্ন করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু ত্রিপুরার রাজাদের সহিত তাঁহার কোনও অসদ্ভাব বা শত্রুতা নাই। সুতরাং তাঁহাকে পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে না।

আবার জাল কবিদের কুহকে পড়িয়াও অনেক সময় ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইয়া থাকে। বালক কবি চেটারটন প্রদত্ত রাউয়েলির জাল ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ব্যারেট্ সাহেব ব্রিষ্টলের ইতিহাস লিখিলেন, পরে প্রকাশ পাইল চ্যাটারটন প্রদত্ত প্রমাণাদি সকলি কৃত্রিম সুতরাং ব্যারেটের ইতিহাস লেখা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র হইল। কালিদাস প্রণীত জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালিদাসের জীবনী লিখিলেন, ডাক্তার রামদাস সেন প্রমাণ করিলেন জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রণেতা জাল কালিদাস সুতরাং পণ্ডিতবরের লিখিত জীবনীর কোনও মূল্য রহিল না। আজকাল "ভোজ প্রবন্ধ," "রাজমালা" কিম্বা পুরাণাদি কাল্পনিক বা অর্দ্ধকাল্পনিক গ্রন্থের ঐতিহাসিক সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকে এইরূপ প্রতারিত হইতেছেন। কিন্তু এই সকল জাল গ্রন্থাদি বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা গ্রন্থাদি লেখেন তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায়

না। এইরূপ জাল গ্রন্থাদির হাত হইতে বোধ হয় কোন ইতিহাস-লেখক অব্যাহতি পাইতে পারেন না। এমন কি প্রত্নতত্ত্ব-মূলক গ্রন্থাদি পরীক্ষা করিলে বোধ হয় জগতের অর্দ্ধেক গ্রন্থাদি এই দোষে দূষিত হইয়া পড়িবে।

যদি রাজেন্দ্র বাবু এবম্প্রকার কোন ও গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়া "ক্ষত্রিয়বংশ হংসঃ" এই কথাটি আদিশূরের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কোন দোষ দিতে পারি না। সহজ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা জাল কারিদের কুহকে পড়িয়া যাহা সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা ভ্রম-সঙ্কুল কি অযথার্থ হইলে সিদ্ধান্তকারিকে অযথার্থবাদী বা পক্ষপাতী বলা যায় না। ১

রাজেন্দ্র বাবুর "সেনরাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্বারা ঐতিহাসিক জগতের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হউক বা না হউক উহা একটি অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েক জন কায়স্থকুলরত্ন রাজেন্দ্র বাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের বিরুদ্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন এবং বাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অযথা অস্বষ্ঠদের স্বকপোল কল্পিত নানা দোষ রটনা করিতে থাকেন। আবার বৈদ্যগণও এই উপলক্ষে কায়স্থদের নানাদোষ উদ্ঘাটন করিতে ত্রুটী করেন না। এই তুচ্ছ কথা লইয়া বাঙ্গলার দুইটি উন্নততম বংশে পরস্পরের ভ্রাতৃভাবের মূলে কুঠারাঘাত হওয়া কি কর্ত্তব্য ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজেন্দ্র বাবু যে বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইয়া সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। তিনি যেন সহজ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সে কথা স্থিরতর রাখিবার জন্য কেবল বঙ্গীয় কায়স্থগণ এত পীড়াপীড়ি করেন কেন ? সে কথার বিরুদ্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলে কেবল জন কএক কায়স্থ মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠেন কেন ? এতদুত্তরে অনেকে বলিয়া থাকেন (২) আজকাল কায়স্থ-

১ পত্রিকা বিশেষে প্রকাশিত "মহেন্দ্র সেন প্রদত্ত শাসনী" বিশ্বাস করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখক এইরূপ ঠকিয়াছেন কি না বলিবার উপায় নাই। কিন্তু কেহ কেহ উক্ত শাসনীর সত্যতা উম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। সন্দেহ বা অসন্দেহ করিবার কি যুক্তি আছে বুঝিতে পারি না। সন্দেহ কারিগণ কি কারণে সন্দেহ করেন, বোধ হয় আনুমানিক যুক্তি ব্যতীত তাহা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। উক্ত শাসনী বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্য, যে পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে একটী মতস্থির করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত উক্ত শাসনী অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি না।

২ ইহ খলু বঙ্গবিষয়ে সাম্প্রতং কায়স্থ কলাপৈশ্চিরাগতমপি শূদ্রত্বং বিহায় ক্ষত্রিয়ত্বমধিগন্তুং মহানেবাভিলাষঃ কৃতঃ সুমহতীহাপ্যবলম্বিতাচ। তেষাং কেচিৎ কৃতোপনয়না ধৃতসূত্রা বর্ম্মবর্ম্মসন্নদ্ধাঃ সজ্জাতাঃ। কেচিন্ মন্দিরচূড়াপাতাকা পত্রিকা প্রভৃতিষ্বপি ব্রাহ্মণৈরেব গ্রন্থিত গাথায়াং রাজন্যরাজীবিরাজনার্হং বর্ম্ম দ্বিজার্য্যাদি শব্দস্তোমবৎ কর্ত্তুমারেভিরে। অথৈকে ম্লেচ্ছ যবনার্য্যাদিকাদপি ভাষায়্যু-

গণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিয়া অনেকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন। যদি কায়স্থেরা বাস্তবিকই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত মনে করেন, তবে সেন রাজারা ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহারা আরও অধিক গৌরবান্বিত হইবেন; কেন না তাহা হইলে কায়স্থ ও সেনরাজগণ একই বংশোদ্ভব হইয়া পড়েন। যদি কায়স্থেরা বাস্তবিকই এরূপ মনে করেন, তবে আমরা বলিব :—

"যে ক্ষত্রিয়কুলে কোটী মহাবীর
কোটী সার্ব্বভৌম প্রতাপে মিহির,
রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট-অযুত
রাজর্ষি, সুধীর, পার্থিব অর্ব্বুদ
জন্মেছিল ; তার তুলনা কোথায়
দেব হ'তে ক্ষত্র উচ্চ তুলনায়।
* * * *
"যাহাদের নাম খ্যাত চরাচর
কীর্ত্তিমান যারা জিনিয়া অমর।
যাদের বীর্য্যেতে ত্রিলোক কম্পিত,
দিবোঽপি ভারত গৌরব-অন্বিত।

হাৎ প্রমাণ নিবহান সংগৃহ্য, কুতশ্চিদপি সমুদ্ধৃতমিব কৃত্রিমবদাভাসমানবচননিচয় মাকলয্যাপি চ তন্মতং তথ্যমিব দ্রঢ়য়িতুং পুস্তকপ্রপঞ্চং প্রণিন্যুঃ। অন্যৈশ্চ কৈশ্চিৎ বল্লালাদীনাং বঙ্গরাঢ়ীয় ভিষজাং বিচ্ছেদ ভূতানাং সর্ব্ববাদ্যবিসম্বাদসম্মতমম্বষ্ঠত্বং সর্ব্ববর্ম্মণাচার্য্যামরসিংহাদীনামপি ব্রাহ্মণ্যং চ ব্যপনীয় কায়স্থতাং প্রতিপাদয়িতুং নানা সারবেদ্য বচনবিন্যাস বৈচিত্রং প্রকটিতং।
(উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের "কায়স্থ পুরাণ"।)

পবিত্রতা, ভীতি বিস্ময় মিশ্রিত
সে "ক্ষত্রিয় কুল" তুলনা রহিত।

সেই জগন্মান্য ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গে তুলনা করিলে, সেন নৃপতিগণ কীটাণু হইতেও ক্ষুদ্র; সুতরাং সেন রাজাদের ন্যায় দুই চারিটি ক্ষুদ্র নৃপতি সেই বংশে থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। মহাসমুদ্র হইতে দুই চারি ঝিনুক জলে ফেলাইয়া দিলে, তাহাতে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না। যদি কায়স্থগণ অকাট্য শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় করিয়া লইতে পারেন, তবে সেন রাজাদের ন্যায় দুই চারিটি নৃপতির নাম তাহাদের বংশ হইতে বিচ্যুত হইলেও আমরা তাহাদিগকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিব।

সে যাহা হউক; এক্ষণে কথা এই সেন নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয়করণেচ্ছুক কায়স্থগণ শ্রদ্ধাস্পদ রাজেন্দ্র বাবুর প্রমাণ ও অন্যান্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সেন রাজাদিগকে ক্ষত্রিয় করিতে চাহেন; আমার বিশ্বাস, যাঁহারা শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস না করিয়া, অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের বলে কোনও কথা বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল যুক্তি-প্রমাণে এমন কোন বিষয় পাইবেন না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সেন নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা যে পর্য্যন্ত কোনও নিশ্চয়ার্থবোধক ও অকাট্য প্রমাণ না পাইব, সে পর্য্যন্ত শত শত পণ্ডিতের ও বহু গ্রন্থের

বচন উপেক্ষা করিয়া, একজন ঋষিকল্প মহাত্মার উক্তি হইলেও, তাঁহার সংশয়-পূর্ণ আনুমানিক ও হাত গড়ান কথায় কদাপি নির্ভর করিব না।

সেন নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয়করণেচ্ছুক মহাত্মাদের নানার্থবোধক প্রমাণের বলে যে, সেন রাজাদের সম্বন্ধীয় সেই চির-প্রচলিত মতের উপর কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না, এক্ষণে আমরা তাহা দেখাইতে যত্ন করিব। আমরা কায়স্থদের মত ও আমাদের দেশের চির-প্রচলিত মত গুলি উদ্ধৃত করিতেছি,পাঠকগণ! নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখুন এতদুভয়ের কোন্ মত অধিকতর অসন্দিগ্ধ, প্রামাণিক ও বিশ্বাস্য।

সেন নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় করণেচ্ছুক মহাত্মাদের মত ঃ—

(১) রাজসাহীর অন্তর্গত বারিন্‌গ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে, বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুর প্রাপ্ত তাম্রশাসনে সেন রাজদিগকে চন্দ্রবংশীয় এবং সুন্দর বন ও তর্পণ দিঘী প্রাপ্ত শাসনপত্রে সেন নৃপতিগণকে "ঔষধনাথ বংশীয়" বলা হইয়াছে সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়।

(২) বারিণ গ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে সামন্ত সেনকে "সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনিকুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ লেখা হইয়াছে সুতরাং সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়।

(৩) কুলাচার্য্য ঠাকুরের গ্রন্থে আদিশূরের বিশেষণরূপে "ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ" লেখা হইয়াছে সুতরাং আদিশূর ও সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়।

উল্লিখিত তিনটি প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাদের আরও কয়েকটি সামান্য যুক্তি আছে আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহাও উল্লেখ করিব। তাঁহাদের এই সকল কথা যে নিতান্ত আনুমানিক নানার্থবোধক, স্বকপোলকল্পিত তাহাও পরে বলিব।

পক্ষান্তরে এদেশীয় চিরপ্রচলিত মত ও কুলপঞ্জিকা প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) পণ্ডিতকেশরী দেবীবর ঘটক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন (৩)। তিনি আদিশূরকে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরনৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড় বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যদা
... ...

দেবীবর ঘটক কারিকা (শব্দকল্পদ্রুম, ২য় সংস্করণ কায়স্থ শব্দে) দেখ।

(খ) বারেন্দ্র ঘটককারিকায় লিখিত আছে "অথ সকল দিগ্দেশীয় রাজমধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিল মঙ্গলালয়ঃ শ্রীলশ্রী আদিশূর নাম রাজা সদ্বৈদ্য কুলোদ্ভবঃ পরম ধার্ম্মিক আসীৎ।

(গ) ধনঞ্জয় কৃত কুলজিতে ও অম্বষ্ঠসম্বা-

৩ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি দেবীবর ঘটককে প্রায় ১৪৭২ শকের লোক বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে দেবীবর এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদার ব্যবস্থা করেন। আমরা অন্য প্রস্তাবে একথার প্রমাণ করিব।—

দিকায় আদিশূরের অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে প্রাচীনকুল পঞ্জিকা হইতে নীচের বচন উদ্ধৃত আছে—

অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতি র্বীর্য্য শৌর্য্যাদিযুক্ত,
স্তস্মান্নামাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব।

(ঘ) পণ্ডিতবর কবিকণ্ঠহার প্রাচীনকুল পঞ্জিকাদি অবলম্বন করিয়া ১৫৭৫ শকে বৈদ্যকুল পঞ্জিকা প্রকাশিত করেন (৪) উহাতে লিখিত আছে—

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভৃতা
ব্যবস্থাপিত কৌলীন্যং হুহিসেনাদি বংশজে"

(ঙ) সুন্দরবন ও তর্পণদিঘী প্রাপ্ত, লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত তাম্রশাসন দ্বয়ের ৩য় শ্লোকে সেনরাজবংশ বর্ণনকালে লিখিত হইয়াছে "অরিকুলের তেজরূপ বিষজ্বর বিধ্বংসী পার্থিবগণ ঔষধনাথবংশে (চিকিৎসককুলে) উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" তথাহি—

তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্
ভূম্নীভুজঃ স্ফুট-মথৌষধনাথ বংশে। (৫)

৪ পূর্ব্বকুল গ্রন্থান সমীক্ষ্য চ বিচার্য্য চ
যদ্যযুক্তং মাতুলেন সংগৃহ্য চ তদন্ততঃ। ৩
যেচ তৎপরতো জাতা স্তানন্বিষ্য প্রযত্নতঃ।
অকুলীন কুলীনানাং গুণদোষ প্রকাশিনী।৪
কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মণা।
পঞ্চসপ্ততিথৌশাকে ক্রিয়তেকুল পঞ্জিকা। ৫
(কবিকণ্ঠ হার।)

৫ এই শ্লোকের প্রথম শ্লোকার্দ্ধ এই "সেবাবনম্র নৃপকোটি কিরীট রোচি রতুল্লসৎ পদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।" লক্ষ্মণসেন দত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন-সংশোধক কৈলাস চন্দ্র বাবু বলেন, "তৃতীয় শ্লোকের প্রথম

(চ) শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভ মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় কান্যকুব্জ মিথিলা, কাশী নব-

পংক্তির 'ল্ল' ও দ্বিতীয় পংক্তির থো,' এই দুইটী অক্ষর তাম্রফলকে সমভাবে উর্দ্ধ ও নিম্নে (যথা ল্ল থো=ল্ল ?) অবস্থিত।
থো
মূর্খ শিল্পী "ল্ল" এর 'ল, ফলাটি ল হইতে পৃথক করিয়া "থো" এর মস্তকে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় এই সামান্য ভ্রম অনুভব করিতে না পারিয়া স্বর্গগত চূড়ামণি মহাশয় থো" এর পরিবর্ত্তে "থৌ"—তদনুসারে ঔষধনাথ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশত "ধ্বি" এর " ি " টি ও বিসর্জ্জন করা হইয়াছে সুতরাং ন্যায়রত্ন (রামগতি ন্যায়রত্ন) মহাশয়ের প্রকাশিত প্রতিলিপিতে "ওষধিনাথের" পরিবর্ত্তে "ওষধনাথ" মুদ্রিত হইয়াছে। (ভারতী, ৪র্থ ভাগ, ৪৬০ পৃষ্ঠা) কি চমৎকার সিদ্ধান্ত ? "ঔষধনাথ" পাঠ থাকিলে সেন রাজারা বৈদ্যকুল সম্ভূত হইয়া পড়েন। তাহা চক্ষে সহিবে কেন ? সুতরাং ব্যাকরণগত অশুদ্ধ হইলেও সুপণ্ডিত হলধর চূড়ামণি ও শিল্পীকে অযথা মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়া "ওষধিনাথবংশে" করিতেই হইবে। কিন্তু মূর্খতা কাহার ? পাঠক বিচার করুন। যদিচ "ওষধি নাথবংশ" কথাটি দুর্দ্দমনীয় বিদ্বেষভাব ও অলৌকিক সৃষ্টির মহিমায় বহুদিন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে. তথাপি আমরা তর্কস্থলে মানিয়া লইলাম যে, "ওষধিনাথ বংশ" ই পাঠ ছিল। কিন্তু "অথ" ছিল "ওষধিনাথবংশ,' এই বাক্যে সন্ধি পাইয়া কি "অথোষধি নাথ বংশ" হয় ? আমরা এতদিন জানিতাম "ওকারে ঔ, ঔকারে চ" কিম্বা অকার হইতে পর ওকার, কিম্বা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয় (যথা ; তব ওদনং তবৌদনং। তব ঔষধং তবৌষধং।) অতএব "ঔষধনাথ" ই থাকুক কিম্বা "ওষধিনাথ" ই থাকুক উল্লিখিত সূত্র দ্বারা "থ" তে ঔকার

দ্বীপ আসাম, উৎকল প্রভৃতি নানাদিগ্দেশীয় যে সকল অসংখ্য শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বল্লালসেন প্রভৃতিকে একবাক্যে অম্বষ্ঠবংশীয় বলিয়াছেন——

"শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতমাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা, তৎপ্রামাণ্যমপ্যস্তি, পশ্চাত্তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রাসহ বিরোধাৎ কেষাঞ্চিৎ দূরীকৃতং; কেষাঞ্চিদদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্যেণ বর্ত্ততে তথাদৃশ্যতে চ। ...।

"রাজবল্লভ নিমন্ত্রিত পণ্ডিতৈর্ব্যবস্থা পত্রিকা॥"

(ছ) বঙ্গজ ঘটক রমানন্দ শর্ম্মকৃত কুল দীপিকায় লিখিত আছে—

দেওয়ায় চূড়ামণি বা শিল্পীর কোন ও মূর্খতা প্রকাশ হয় নাই। এক্ষণে বলি ইনি কোন্ সাহসে তাম্রশাসন সংশোধন করেন? সিংহ বাবু আরও বলেন "আমরা বিশেষরূপে জানি, বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে এইক্ষণে বিলক্ষণ গোজামিলন চলিতেছে; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও অনভিজ্ঞ-জন-প্রদর্শিত মার্গাবলম্বী দর্শন করিলে স্বভাবত আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে। তিনি এইরূপ, ন্যায়রত্ন-মহাশয়ের উপর, অনেক স্থলেই বাক্যবাণ বিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয় যে তাঁহার মত সংশোধকের ন্যায় অলৌকিক কল্পনা ও সৃষ্টির প্রভাবে কোন ও কথা সৃজন না করিয়া "যদ্দৃষ্টং তৎপ্রকাশিতং" করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিলক্ষণ সাধুতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছিল। বলাবাহুল্য যে ঔষধনাথ বংশ" পাঠ ই প্রশুদ্ধ। কেননা দেব নাগরের "ি" ও বাঙ্গলার "ি" একই প্রকার সুতরাং ইকারটি বুঝিতে না পারিয়া চূড়ামণিমহাশয় উহা বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। তবে যে "ঔষধনাথবংশ" প্রভৃতির স্থলে পণ্ডিত ও শিল্পীকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়া ব্যাকরণকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া "ওষধিনাথবংশ' ইত্যাদি পাঠ উদ্ধার হয়, সে কেবল আধুনিক অসাধারণ ধীসম্পন্ন ও জাতীয় পক্ষপাতে অন্ধ মহাত্মাদের অলৌকিক মহিমার গুণেই। স্বীকার করি ভ্রম প্রমাদ সকলেরই আছে কিন্তু যে কথা লইয়া ইতিপূর্ব্বে বহু আন্দোলন হইয়াছে, যে বিষয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণকে অযথা মূর্খ বলা হইল সে স্থলে যদি কল্পনা, "সৃষ্টি প্রকরণ" বা ভ্রমের ছায়া পতিত হয় তবে বড় ভয়ানক কথা। "এরূপ লোকদ্বারা দিনকে রাত্রি করা বড় অসম্ভব ব্যাপার নহে। সিংহ বাবু এইরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের গুণে পাঠকমহাশয়দের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে অনেক স্থলেই এইরূপ সৃষ্টি বা কল্পনার আশ্রয় লইয়া থাকেন। মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে এক জন ব্রাহ্মণও "আমি নরাধম" বা "আমি চণ্ডালাধম" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। ইনি জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য এরূপ অন্ধ যে, বিখ্যাত চৈতন্যের গুরু ঈশ্বর পুরি বৈরাগ্য বশতঃ "আমি শূদ্রাধম" বলিয়াছিলেন বলিয়া সিংহবাবু অমনি তাঁহাকে কায়স্থ করিয়া লইলেন (তত্ত্ববোধিনী বৈশাখ ১৯০৪ শক) একজন রাজা বা একজন মহৎলোকের উপাধি রায় কি মজুমদার ইত্যাদি দেখিলেই সিংহবাবু অমনি তাঁহাকে ("কায়স্থ") বলিয়া পাঠকের চক্ষে ধূলি দিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হয়েন (ভারতী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩৪ পৃ ইত্যাদি) তবে দুঃখের বিষয় এই রূপ না না কৌশল করিয়াও পাঠকের দৃষ্টি রোধ করিতে পারেন নাই।

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ১

কুরুতে হি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং।

(জ) অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকায় বল্লালাদির অম্বষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এবং বৈদ্যদের উপনয়ন যাওয়া সম্বন্ধে নীচের লিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"শ্রীমদ্বল্লাল নামা ক্ষিতিপতিরতুলো
বৈদ্যবংশাবতংশো
যেনাকারিদ্বিজানাং গুণিগণগুণোৎ (?)
কর্ষতামান্যতা চ।
শুদ্রাণাঞ্চৈব যস্য প্রতিদিনমখিলে
রাজতে কীর্ত্তিরুচ্চৈ,
র্যস্যাজ্ঞাদ্যাপি লোকে শ্রুতিবচনসমা
পাল্যতে সাদরেণ। ১
তৎসৎসুতো লক্ষ্মণসেন নামা
সল্লক্ষণো লক্ষ্মণবীর্য্যলক্ষ্মীঃ।
দূরীকৃতং তেন পিতুস্তমর্ষাৎ
ক্বচিৎক্বচিদ্বৈদ্যকযজ্ঞসূত্রং॥ ২
তদবধিকতি বৈদ্যা শূদ্রভাবং বহন্তঃ,
কতি কতি বুধবৈদ্যাঃ স্বস্বভাবং তথাপি।
... ... —

(ঝ) এতদ্দেশীয় বৈদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থদের শতাধিক কুলপঞ্জিকা, দেশীয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের অসংখ্য ইতিহাস প্রভৃতিতে সেননৃপতিদিগকে যে একবাক্যে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিতে গেলে পঞ্চাশ পৃষ্ঠায়ও শেষ করা যাইবে না, সুতরাং ক্ষান্ত থাকিলাম। অভিনব মত প্রকাশিত হওয়ার পরও উহা অকিঞ্চিৎকর বা কাল্পনিক জ্ঞানে বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য পণ্ডিত, লঘুভারত প্রণেতা এমন কি (দুই চারি জন কায়স্থ ব্যতীত) সকলেই সেন নৃপতিগণকে অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব বলিয়াছেন। তাঁহারা কেহই অভিনব মতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দিগ্ধ না হইয়া চিরপ্রসিদ্ধ মতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। (৬)

সেনরাজগণ সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল চিরপ্রচলিত মত প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা সেননৃপতিদিগকে ক্ষত্রিয়করণেচ্ছুকদের বাক্যের যে কিছুই মূল্য থাকে না আমরা তাহা প্রমাণ করিতেছি।

পুরাকালে যাঁহারা গবেষণা ও কুলেতিহাস সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, সেই সকল সমাজপূজ্য কুলাচার্য্যগণ সকলেই, অপক্ষপাতী হইয়া, স্পষ্ট বাক্যে সেনরাজদিগকে বৈদ্য (বা অম্বষ্ঠ) বলিয়াছেন।

মহাত্মা দেবীবর ঘটক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেও বর্ত্তমান ছিলেন। পণ্ডিতবর কবিকণ্ঠহার তাঁহা হইতে কিঞ্চিদূন দুই শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক (৭) সেন রাজবংশের লাক্ষ্মণেয় সেন ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নদীয়ার সিংহাসনচ্যুত হয়েন। আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলি-

৬ অম্বষ্ঠ সম্বাদিকার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পাঠ করুন।

৭ কবিকণ্ঠহার দেবীবর ঘটকের দুই শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইলেও তিনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদির মতানুসরণ করিয়াছেন। দেবীবরের পূর্ব্ববর্ত্তী এমন কি সেন রাজাদের সমসাময়িক গ্রন্থাদিও তাঁহার ও তদীয় মাতুলের গ্রন্থের আদর্শস্থল হওয়াই সম্ভব। সুতরাং কবিকণ্ঠহার সেন রাজাদের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও সমধিক মূল্যবান।

য়াছি লাক্ষ্মণেয় সেনের পুত্রগণ ও বংসধরগণ ১২৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোনার গাঁ প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন (৮)। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও মুসলমান কর্ত্তৃক সেনবংশীয়গণ সম্পূর্ণরূপে রাজ্যচ্যুত হয়েন নাই। ইহার পরেও যে তাঁহারা নিতান্ত নির্জ্জীব ভাবে কিম্বা ক্ষুদ্র জাইগির স্বরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, বোধ হয় তাহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে (৯)দেবীবরের সময়ে (কিম্বা কবিকণ্ঠ হারের কিছু পূর্ব্বে) যে সেনরাজবংশজগণ নিতান্ত হীনাবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন তাহাও সম্ভব। সুতরাং এক্ষণকার সহস্রাধিক বৎসরের পরবর্ত্তী লেখকদের অনুমান বা কল্পনা প্রসূত যুক্তি হইতে যে দেবীবর প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ দেখিয়া, অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের ঘটনা অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে অধিক সত্য ও প্রামাণিক তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? দেবীবর ঘটক প্রভৃতিই যখন সেনরাজদিগকে অম্বষ্ঠ বংশীয় বলিয়া গিয়াছেন তখন আধুনিক লেখকদের আনুমানিক কথার আর কি মুল্য থাকিতে পারে?

রাজেন্দ্র বাবু যেমন অনুশাসন লেখ্য দেখিয়া সেনরাজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন; দেবীবর প্রভৃতির বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে অনুশাসন ও প্রস্তরাদি লেখ্য দেখিয়া সেইরূপ পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। পাঠকগণ অবশ্য জানেন, দেবীবর প্রভৃতির অনেক পূর্ব্বে (১০৭০ শকে) কহ্লন পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তৎকৃত সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "আমি সর্ব্বশুদ্ধ একাদশ খানি রাজকথাশ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াছি এবং অনেক সত্য বিবরণ, দানপত্র, প্রতিষ্ঠাপত্র, শাসনপত্র, তাম্রশাসন প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া বহুবিধ ভ্রম সংশোধন করিয়াছি।" কহ্লন পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী লিখিত অনেক স্থলেই তাম্রশাসন প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছেন। কবিকণ্ঠ হার প্রভৃতি যেরূপ সুনিপুণতার সহিত কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে, আধুনিক কোন ও পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অপেক্ষা তাঁহাদিগকে গবেষণা বিষয়ে অপারগ বলিতে পারা না।

যখন সহস্রাধিক বৎসর পরেও সেন রাজাদের প্রদত্ত দুই একখানি অনুশাসন পত্র পাওয়া যাইতেছে তখন বোধহয় দেবীবর ঘটকদের সময়ে সেন নৃপতিদের প্রদত্ত দান পত্রাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘরে ঘরে আধুনিক পাট্টা কবেলার ন্যায় সযত্নে রক্ষিত হইত। ঘটক চূড়ামণি দেবীবর প্রভৃতি যে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না একথা আমরা কদাপি বিশ্বাস করিব না। "রঘুকুলতিলক রাম" প্রভৃতির ন্যায় "চন্দ্রবংশ প্রদীপ" "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদামঃ" প্রভৃতি বিশেষণ যে সেন নৃপতিদের নামে ব্যবহৃত হইত তাহা দেবীবর কণ্ঠহার প্রভৃতি ঘটকগণ অবশ্য জানিতেন। তাঁহারা যখন সেন নৃপতিগণকে স্পষ্টাভিধানে "অম্বষ্ঠকুলসম্ভূতঃ" বলিয়া গিয়াছেন তখন আমরা আর আনুমানিক বা কল্পনাপ্রসূত যুক্তিতে কদাপি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

সকলেই জানেন, বল্লাল সেন পদ্মিনী নাম্নী এক নীচ বংশজা কন্যাকে বিবাহ করেন। (১০) বৈদ্যকুল পঞ্জিকা প্রভৃতিতে লেখা আছে "বল্লাল সেন পদ্মিনীকে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াও বৈদ্যগণকে তাঁহার দলে থাকিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। বৈদ্যগণ জাতি যাওয়ার ভয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তদীয় পুত্র পরম ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ সেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের নিকট এই বিষয় জ্ঞাপিত হইলে, তিনি অনন্যোপায় হইয়া বৈদ্যগণকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাচারসম্পন্ন হইতে আদেশ দেন। কেন না, তাহা করিলে বল্লাল সেন, বৈদগণকে শূদ্রাচারসম্পন্ন পতিত-বৈদ্য জ্ঞানে, তাঁহাদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে অপমানিত হইবেন। বৈদ্যগণ কথঞ্চিৎ জাতিরক্ষার্থ লক্ষ্মণ সেনের আদেশানুসারে উপনয়ন পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাচার সম্পন্ন হইলেন। (১১) অধিক সংখ্যক বৈদ্যগণই যে উপনয়ন পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছেন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। অলঙ্ঘনীয় রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে অন্য কোনও সামান্য কারণে যে বৈদ্যগণ সহজে দ্বিজত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন তাহা কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। "প্রাণ দিবে, স্ত্রী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিবে, কঠোর যাতনা সহ্য করিবে তথাপি নিজকুল কলঙ্কিত করিবে না" (১২) ইহা

৮ এ সম্বন্ধে বারান্তরে এক প্রবন্ধ লিখিতেছি।

৯ মিন্‌হাজ সিরাজের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য এ সম্বন্ধে রামজীবন লিখিয়াছেন ঃ—

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান।
পিতাপুত্রে জন্মে ছিল বিরোধ কারণ।
* * * *
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ।
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাকদিয়া সবে।
"ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে"
সেই হৈতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল।

অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা প্রণেতা বলেন "এ-কদা বল্লাল সেনেন একাং নিকৃষ্ট জাত্যুদ্ভবাং পদ্মিনীং কন্যাং সমানীয় উদ্বোঢ়ুং মনশ্চক্রে। তত স্তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণ সেনেন তদ্বারয়িতুমশক্তেন রুষা বহুতর বৈদ্যৈঃ সহ গঙ্গাতীরং গত্বা তং পিতরং প্রতি পত্রিকা প্রেরিতা, তদ্যথা * * *। ততো বল্লালে স্বর্গংগতে লক্ষ্মণ সেনেন বল্লালাশ্রিত বৈদ্যানাং স্বপক্ষাবলম্বিনাং ক্রোধেন যজ্ঞোপবীতাদিকং দূরীকারিতং।
তস্যৈব ভয়তঃ প্রাযো বৈদ্যা নির্ব্বলবুদ্ধয়ঃ।
শূদ্রাচাররতা আসন্ স্বধর্ম্মবিরতাঃ সদা (?) ॥"

সুতরাং অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকার মত সাধারণ মত হইতে কিছু বিভিন্ন।

১০ এই জঘন্য বিবাহ উপলক্ষে বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন পরস্পরের নিকট যে শ্লোকময় পত্র লেখেন সেই শ্লোকগুলি অনেকেই জানেন।

১১ সম্বন্ধ নির্ণয় ১৪০ পৃষ্ঠা ও লঘু ভারত

১২ বরং প্রাণঃ প্রদাতব্যো
বরং ত্যজ্যাঃ সুতাদয়ঃ।
বরং সহ্যং মহৎ কষ্টং
ন কুর্য্যাৎ কুলদূষণং। (কণ্ঠহারঃ)

হিন্দুশাস্ত্রের ও কুলপঞ্জিকার একমাত্র আদেশ।

যদি বল্লালসেন ক্ষত্রিয় বংশীয় হইবেন তবে কেবল বৈদ্যগণকে স্বদলভুক্ত করিতে প্রয়াসী হইবেন কেন? (১৩) জাতি যাওয়ার ভয়ে কেবল বৈদ্যগণই শূদ্রাচারসম্পন্ন হইয়া থাকিবেন কেন? যদি স্বজাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতির লোকদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে যত্ন করিতেন তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদিগকে নিজদলে মিশাইতে পীড়াপীড়ি করেন নাই কেন? তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ ও কথঞ্চিৎ জাতি রক্ষার্থ শূদ্রাচারসম্পন্ন হইয়া রহেন নাই কেন? সুধু বঙ্গীয় বৈদ্যগণই যে বল্লাল সেনের সহিত জাতি যাওয়ার ভয় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কথঞ্চিৎ জাতি রক্ষার্থ ও বল্লালসেন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার মানসে শূদ্রবৎ হইয়া রহিলেন, ইহার কারণ কি? নিরপেক্ষ ও ধীরভাবে এই সমুদয় কার্য্যের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিলে এই কএকটি প্রশ্ন হইতে যে সদুত্তর পাওয়া যায় তাহার মর্ম্ম এইঃ—এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি হইতে ভিন্ন ও শূদ্র বা কায়স্থ জাতি হইতে উচ্চ জাতীয় ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রাদির তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়া বা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না! বৈদ্যগণ তাঁহার স্বজাতি, বৈদ্যদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন না করিলে এবং বৈদ্যদের সঙ্গে পরিণয়াদি সম্বন্ধ ও অন্যান্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হয়, সেই জন্যই স্বজাতি ও স্বজ্ঞাতি বৈদ্যগণকে স্বদলভুক্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কোন কোন বৈদ্য তাঁহার দলে মিসিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, বৈদ্যকুল পঞ্জিকায় এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। (১৪) কিন্তু যে সকল বৈদ্যদের বল্লালের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় ছিল না, তাঁহারা "চণ্ডাল অপেক্ষা শূদ্রবৎ হইয়া থাকাও শ্রেয়" এই নীতি অবলম্বন করিয়া উপনয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন বৈদ্য জাতি হইতে ভিন্ন জাতি হইলে শুধু বৈদ্যগণকেই জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে উপনয়ন পরিত্যাগ করিতে হইত না। উল্লিখিত যুক্তি সকল পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় কোন অপক্ষপাতী মহাত্মাই সেন নৃপতিগণকে বৈদ্য হইতে ভিন্ন জাতীয় বলিতে সাহসী হইবেন না। বৈদ্য জাতির যজ্ঞোপবীত যাওয়া উপলক্ষেও শত শত বৎসর হইতে যে সেন নৃপতিগণ বৈদ্য বংশীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন, আমরা সামান্য অনিশ্চিত বাক্যের বলে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া কখনই ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিতে সাহসী হই না।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

১৩ কয়েকটি কায়স্থ সেনরাজদিগকে ক্ষত্রিয় ও স্ববংশীয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন! তাঁহাদের এই প্রবৃত্তি দেখিয়া আমাদের একটী হাসির কথা মনে পড়িল। একদিন এক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে একটী ঢাকাই শাঁখারির সঙ্গে আলাপ হইতে ছিল। শাঁখারি বলিল "বল্লাল ছ্যেন জ্যে মচ্ছয়, ওরা তো আচ্ছিল্ আমারগোর্ পাড়াপচ্ছি গ্যায়াত্যি। ঢাক্কা আহনের আগ্যে আমার্ গোর্ বাড়ী ও রামপাল্ বল্লালের কাচ্চে আচ্ছিল্।" ভদ্র বলিলেন "তুমি এ কথা কি করে জান"? শাঁখারি, মচ্ছয়রে মচ্ছয়! ও কথা বি কি চ্ছাপ্পা থাক্কে? উ কথা বি আমারগোর্ বাপ্ দাদ্দা চৈদ্দ পুর্চ্ছে জান্যে।" বাস্তবিকই ঢাকার শাঁখারিদের বাড়ী পূর্ব্বে রামপাল ছিল। ইহাদের মধ্যে সেন উপাধীধারী শাঁখারি আছে। তাহাদের অনেকের বিশ্বাস যে সেন রাজারা তাহাদের জ্ঞাতি ছিলেন। যে সূত্রে সেন নৃপতিগণ, ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়েন, আমার বিবেচনায়, ঢাকাই শাঁখারিদের বাক্য তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান! যদি সেন নৃপতিগণ শাঁখারি বংশোদ্ভব হয়েন তবে কাহার আপত্তি আছে কি?

১৪ অনেকটি সিদ্ধ বংশীয় কুলীন বৈদ্যগণ যে বল্লাল সেনের অন্নের দোষে (বল্লালের সহিত ভাত খাইয়া) কষ্ট সাধ্যত্ব (শূদ্রবৎ নিকৃষ্টভাব) প্রাপ্ত হন তাহার সুন্দর প্রমাণ আছে—

"স্থানদোষাদ্রাজদোষাত্তথা সম্বন্ধদোষতঃ।
সিদ্ধবংশভবা যে যে সাধ্যভাবমুপাগতাঃ॥
তথা কষ্টত্বমাপন্না স্তানথ প্রতিচক্ষ্মহে।
গুপ্তবংশ মহৎস্বল্পা বুভাবপ্যধিকারিণৌ।
তথৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ।
গাইসেনোঽক্ষুসেনশ্চ ভূসেনো হীরসেনকঃ॥
স্বর্ণ পীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তি গোত্র সমুদ্ভবাঃ।
বল্লালস্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যত্বমাগতাঃ॥
(কবিকণ্ঠহার।)

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মামুদ টুগলকের সাম্রাজ্য কালে দাক্ষিণাত্য দিল্লির অধীনতা ছিন্ন করিল, রাজ বিদ্রোহী হোসেন গঙ্গ স্বাধীন বামিনি রাজ্য স্থাপন করিলেন, হিন্দু রাজাগণও সময় পাইয়া আপন আপন রাজ্য পুনরধিকার করিয়া লইলেন। এই সুযোগে কর্ণাটরাজ মহাবীর বাক্যরাও গুরুদেব মাধব বিদ্যারণ্যের সাহায্যে ধ্বংশাবশিষ্ট বেলাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তুঙ্গভদ্রা উপকূলে বিজয়নগর রাজধানী স্থাপন করিলেন।

বিজয় নগরের প্রতিষ্ঠাদিন স্মরণ রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর এই দিনে রাজধানীতে একটি করিয়া অস্ত্রোৎসব হইত।

ফুলের মালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অস্ত্র যুদ্ধে যাঁহারা সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতেন তাঁহাদিগকে সেই দিনকার বিজয়ী সূর্য্যরূপে ঘোষণা করিয়া মহারাজ স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিতেন। কি সৈনিক কি অসৈনিক দেশীয় সকলেই অস্ত্র বিদ্যায় নিপুন হইতে যত্ন করিবে এই অভিপ্রায়ে মাধব বিদ্যারত্ন এই উৎসব প্রথার সৃষ্টি করেন।

এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, পঞ্চদশ শতাব্দীও যায় যায়, বিজয় নগরে অস্ত্রোৎসব প্রথা এখনো চলিয়া আসিতেছে।

বিজয় নগরে আজ অস্ত্রোৎসব, চন্দ্রাতপ আবরিত সুসজ্জিত দুর্গপ্রান্তর লোকে পরিপূর্ণ। ফুলময় স্তম্ভবেষ্টিত একটি চক্রাকার মণ্ডলীমধ্যে, সভাসদ-শোভিত উচ্চ সিংহাসনে ত্রিংশৎ বর্ষীয় মহারাজ দেবরাও বসিয়া আছেন। সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে কিছু দূরে ক্ষত্রিয় রমণীগণ বিজয়ীদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পুষ্প হস্তে অপেক্ষা করিতেছে। দূরে মল্ল যুদ্ধের চীৎকার, তরবারি যুদ্ধের ঝনঝনা, দর্শক বৃন্দের সোৎসুক উল্লাসধ্বনি প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

অনেক রকমের ব্যবসাদারই আজ লাভের আশায় দুর্গে জড় হইয়াছে, অদৃষ্টের ব্যবসাদারই বা এ সুযোগ ছাড়িবে কেন? তাহারাও দোকান পাট সাজাইয়া বসিয়াছে, অনেকে তাহাদের কাছ হইতে ঘরের পয়সা দিয়া দুঃখ কিনিয়া লইয়া যাইতেছেন।

এই রূপ একটি দোকানে কিছু বিশেষ ভিড়, নামের জোরে ক্রেতার উপর ক্রেতা আসিয়া জুটিতেছে, বিক্রেতা একা তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পুরাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লাভের পায়ে গড় করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন এই সময় একটি সুন্দরী বালিকা আসিয়া তাহার হাতটি দেখিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিল। সৌন্দর্য্যের অনুরোধ বড় অনুরোধ; গণক ঠাকুর সে অনুরোধটি ছাড়াইতে পারিলেন না, বালিকার হাতটি হাতে ধরিয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখ পানে চাহিয়া সেই রাজরাণী যোগ্য পৃথিবী বিপ্লবকারী রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া একজন দর্শক বলিল "ঠাকুর, মুখে কি অদৃষ্ট গণা যায়, হাত দেখুন।" আর এক জন বলিল—"গণক ঠাকুর কি তেমনি পাত্র, হাতে কিছু না পেলে কি হাত দেখবেন?" বালিকা গণকের হাতে কিছু দিতে গেলেন। গণক অস্বীকার করিয়া বলিলেন "মা তুমি রাজরাণী হইবে—তোমার কাছে কিছু লইব না।" একজন অশ্বারোহী এই জনতার নিকট দিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, কাছে আসিয়া অশ্ব থামাইয়া বালিকাকে বলিলেন "কি শক্তিময়ি, তোমার তো বাসনা পূর্ণ হইল। তুমি তো রাণী হইলে, দেখি আমার ভাগ্যে ঠাকুর কি লেখেন" তিনি গণককে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গণক হস্ত নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "আপনার অদৃষ্টে রাজ্য লেখে আপনি রাজা হইবেন।" দর্শক বর্গ সকলেই হাসিয়া উঠিল, অশ্বারোহী যুবাও হাসিয়া বালিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন "তবে আর কি শক্তিময়ি—তুমিও

রাণী হইলে আর আমিও রাজা হইলাম।" এই সময়ে ভাটের চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিল, তীর-লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য ভাট তীর-যোদ্ধাদের ডাকিতেছিল, অশ্বারোহী সেই দিকে অশ্ব চালনা করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃপাণ-যুদ্ধ বর্ষা-যুদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য অস্ত্র খেলা হইয়া গিয়াছে, তীর খেলাই এখন অবশিষ্ট আছে। অদূরে সহস্র সহস্র অশ্ব প্রস্তুত, মহারাজ দেবরায় সিংহাসন হইতে নামিয়া প্রথমে অশ্বারোহণ করিলেন, তখন সভাসদগণ অশ্ব পৃষ্ঠে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া রাজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে সম্মুখ ভাগে, একটি পক্ষী-হস্ত প্রস্তরময়-রমণী মূর্ত্তি, পক্ষীর মুখ চুম্বন করিতেছে, সেই পক্ষীটির চক্ষু বিদ্ধ করিতে হইবে। পক্ষীটি রমণীর কপোলে এমনি ভাবে স্থিত যে রমণী মূর্ত্তিকে কিছু মাত্র আঘাত না করিয়া তীর দ্বারা কেবল চক্ষু বিদ্ধ করা সুকঠিন। সমস্ত দিন যে সকল খেলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এইটি দেখিতেই সকলে অধিকতর উৎসুক। রাজার ইঙ্গিতে অশ্বারোহী ভাট একটু অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "এই লক্ষ্য ভেদ করিয়া যিনি অদ্যকার সূর্য্য হইতে চাহেন, মহারাজ দেবরায়ের আজ্ঞানুসারে তিনি এইবার সম্মুখীন হউন" ভাট উচ্চৈঃস্বরে তিনবার এই কথা বলিল। হ্রেষারব করিয়া সতেজে গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক, এক তেজস্বী যুবাকে পৃষ্ঠে লইয়া একটি অশ্ব অগ্রসর হইল। সহসা প্রান্তরের কোলাহল ভীষণ নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল, মায়ামুগ্ধের ন্যায় বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবক রাজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে রাজাকে তিনবার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্তর মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন, অমনি ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল, চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া প্রস্তর মূর্ত্তি ঘিরিয়া ফেলিল, দেখিল পক্ষী চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তীর চলিয়া গিয়াছে। আকাশ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অমনি জয়ধ্বনি উঠিল, অমাত্য পুত্র ষোড়শ বর্ষীয় রামচন্দ্র লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা সভাসদ সঙ্গে অশ্ব হইতে নামিয়া আবার সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। দর্শকগণের উল্লাস ধ্বনির মধ্য দিয়া, রমণীগণের পুষ্প বৃষ্টির মধ্য দিয়া রামচন্দ্র রাজ সিংহাসনের সমীপে আনীত হইলেন। দেবরাও সিংহাসন হইতে উঠিয়া স্বহস্তে তাহার কটিদেশে একখানি রাজ-তরবারি বাঁধিয়া রাও অর্থাৎ রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। চারিদিক হইতে আবার উৎসাহের জয়ধ্বনি উঠিল, পুষ্প বৃষ্টির অভ্যর্থনা হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া

বালিকা শক্তিময়ী চঞ্চল অথচ দৃঢ় পদনিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া হস্তস্থিত ফুলমালা রাম রাওয়ের গলে পরাইয়া দিতে গেল। রামচন্দ্র ফুল পরিবার জন্য মাথা না নোয়াইয়া হাতে করিয়া তাহা লইতে গেলেন। গরবিনী বালিকা চমকিয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল, তুষারশ্বেত বদন মণ্ডলে সহসা রক্ত পদ্ম ফুটিয়া উঠিল, ভ্রমরকৃষ্ণ ধনু বিনিন্দিত ভ্রূ যুগের নিম্নে বিশাল হরিণী-নয়ন দ্বয় হইতে গর্ব্বময় একটি জ্যোতি নির্গত হইল, মহারাজ দেবরাও নিষ্পন্দ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা যেমন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়াছিল তেমনি দৃঢ় পদক্ষেপ করিয়া ফুলমালা হস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল। দূরে আসিয়া ফুল মালাটি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, ফুল গুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটীতে পড়িল, বালিকা তাহার উপর আপনার রাঙ্গা চরণ খানি রাখিয়া সেই ছিন্ন ফুল গুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রোষারক্ত স্থির নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠিল, অপমান-কম্পিত অধরে গর্ব্বময় হাসি ফুটিয়া উঠিল, সেই হাসির মধ্য দিয়া অপমানের তীব্র বেদনা আরো সুস্পষ্ট হইয়া বাহির হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জনতার লাঘব হইয়াছে, রামচন্দ্র কল্পনার মোহময় কত কি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে অশ্বারোহণে বাটী গমন করিতেছিলেন। সূর্য্য পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার হেমাভ রশ্মিগুলি অট্টালিকা চূড়ায়, পথ পার্শ্বস্থ বৃক্ষ শিখরে সরোবরের বক্ষে খেলিতে খেলিতে ক্রমে সরিয়া পড়িতেছে। পথ পার্শ্বের একটি সরোবর ঘাটে বসিয়া শক্তিময়ী সূর্য্য-কিরণচ্ছুরিত জল রাশির পানে চাহিয়া অপমান-আন্দোলিত মনের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। শক্তিময়ী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, কিন্তু সে মূর্ত্তিতে বালিকার ভাব কিছু মাত্র নাই, সে মূর্ত্তি সসাগরা পৃথ্বী বিপ্লবে সক্ষমা রূপ গর্ব্বিতা যুবতীর ন্যায়। অশ্বের পদশব্দে শক্তিময়ীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সেই দিকে চাহিয়া রামরাওকে দেখিবামাত্র চকিতের ন্যায় আবার চক্ষু ফিরাইয়া লইল রামচন্দ্র বৃক্ষে অশ্ব বাঁধিয়া শক্তিময়ীর নিকট আসিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "শক্তিময়ি এখানে একাকী যে?" শক্তিময়ী অধর দংশন করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, কথায় বৃশ্চিকের হুল ফুটাইয়া বলিল "শক্তিময়ী পুরুষ নহে, সে রমণী, তাহার শৌর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, ধন ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই, যাহার প্রভাবে সে যশস্বিনী হইয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রশংসার জয়ধ্বনির মধ্যে জীবন কাটাইবে! শক্তিময়ী রমণী, শক্তিময়ী দরিদ্র-কন্যা, শক্তিময়ী একাকী থাকিবে না তো কি?"

শক্তিময়ী রামচন্দ্রের বাল্যসখী, তাঁহাদের বাড়ীর কাছেই শক্তির পিতার বাড়ী, সুতরাং ছেলেবেলা হইতে তাঁহারা প্রায়

একত্রে থাকিয়া আসিয়াছেন, শক্তিময়ীর রাগের ভাব দেখিলে রামচন্দ্র বড় ভয় পাইতেন। রামচন্দ্র ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আজ আবার এ কি ভাব? এ ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর অত কঠোর কেন!" বালিকা তীরস্থ একটি কুলপত্র ছিঁড়িয়া দন্তে কাটিতে লাগিল। হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস যেন তাহার উপর দিয়া নিষ্কৃত করিবে। কিছু শমিত হইয়া পরে বলিল "কঠোর কথা বলি এমন কি ক্ষমতা, তুমি রাজা হইয়াছ, ইচ্ছা করিলে আমার মত শত সহস্র রমণীকে তোমার অশ্ব পদ দলিত করিতে পার।"

রাম। শক্তিময়ি, বল কি? তোমরা শক্তি, আমরা পুরুষ, তোমরা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পার? তোমাদের অনুগ্রহে সংসার জীবিত হয়, তোমাদের নিগ্রহে সংসারে বিপ্লব ঘটে, ক্ষুদ্র আমি তোমার সহিত তুলনাই বা কেন?"

তাহা যদিও মিথ্যা নহে, সমস্ত রমণীর না হউক, শক্তিময়ীর অনুগ্রহ পাইলে অনেকে স্বর্গ তুচ্ছ করে, কিন্তু সেই অনুগ্রহ জগৎ সমক্ষে আজ উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্র তাহাকে অপমানিত করিয়াছেন। শক্তিময়ী দন্তে অধর দংশন করিল, শোণিত বিন্দুতে যে লাল অধরখানি আরো রাঙ্গা হইয়া উঠিল, তাহা জানিতেও পারিল না। হৃদয়ের তীব্রভাব হাসিতে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া বলিল "আদরে যে ফুলহার পরাইতে গেলাম তাহা যে উপেক্ষা করিলে, আমার অনুগ্রহে প্রাণ পাও বলিয়া—না—?"

রামচন্দ্র লজ্জিত হইলেন, তিনি সন্দেহ করিতেছিলেন ঐ জন্যই বুঝি বা শক্তিময়ী রাগ করিয়াছে। বিষম বিপদে পড়িয়া বলিলেন "অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর শক্তিময়ী। নিশ্চয় জানিও বিশেষ কারণ না থাকিলে আমি ওরূপ করিতাম না।"

শক্তি। "কারণটি বলিতে কি কোন বাধা আছে?"

রামরায়ের মুখটি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তিনি বয়সে বালক হইয়াও মনে মনে যুবার পদবীতে উঠিয়া ছিলেন, অন্ততঃ তাঁহার মনে ঐরূপ একটি সংস্কার ছিল। কারণ শুনিলে হৃদয়ের বালকত্ব পাছে প্রকাশ পায়, বালকের ভাব বলিয়া শক্তিময়ী পাছে হাসেন, ইহা ভাবিয়া রামচন্দ্র আপনার কাছেও বালক হইয়া পড়িলেন। বালকের মত লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলেন "লজ্জার কারণ, অন্যে তাহা শুনিলে হয় ত হাসিবে।" কথা আগে থাকিতে বলিয়া রামচন্দ্র লজ্জা কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। বালিকা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, রামরায়ও কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, তীরস্থ বৃক্ষাবলীর ছায়া সরোবর মধ্যে অন্ধকার দারুণ ঘনাইয়া ফেলিল। আকাশে চন্দ্র নাই, অমাবস্যা, দেখিতে দেখিতে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া সরসীদর্পণে মুখ দেখিতে লাগিল। রামরায় কি যেন কি ভাবিয়া বলিলেন "না মাধুরী লজ্জা করিব না, আমার গম্ভীর

সঙ্কল্প, লোকে ছেলে মানুষি ভাবিবে বলিয়া আমি ডরাইব কেন? শুনিয়া হাসিতে হয় হাসিও; যাহাকে বিবাহ করিব সে ছাড়া আমার গলে কেহ মালা পরাইতে পারিবে না।" কথাটি বলিয়া ফেলিয়া রামচন্দ্র বাঁচিলেন, শুনিয়া শক্তিময়ীর মৃত্যু যন্ত্রণা হইল। বালিকাকে তবে রামচন্দ্র বিবাহের অযোগ্য মনে করেন। শত শত বৃশ্চিক এককালে তাহার হৃদয়ে দংশন করিল, জ্বলন্ত যাতনায় উত্তেজিত হইয়া বালিকা বলিল "রূপহীন গুণহীন দরিদ্রকন্যা বাল্যসখী শক্তিময়ী রাজা রামের অস্পৃশ্য হইবে না তো কি?"

রামরাজা কিছু ব্যথিত হইলেন, বলিলেন; "না শক্তি সে জন্য নহে, তুমি জান সেজন্য নহে। তোমার রূপ গুণের ক্ষমতা তুমি বেশ জান। তাহা আর নূতন করিয়া আছে আছে বলিবার আবশ্যক নাই। তুমি জান তোমার অনুগ্রহের উপর কত লোকের জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে, কত রাণী হইতেও তুমি অধিক ক্ষমতাশালী, তুমি আমার স্ত্রী হইবার অযোগ্য নও—আমিই তোমার স্বামীর অযোগ্য।"

শক্তিময়ীর রূপের মুখে ছাই! সহস্র হৃদয় পোড়াইয়া যে রূপ একটি হৃদয়কে স্পর্শ মাত্র করিতে পারিল না, সে রূপের আর ক্ষমতা কি? শক্তির রূপের পায়ে কত হৃদয় গড়াগড়ি গিয়াছে শক্তি একবার চাহিয়াও দেখে নাই, কিন্তু যে হৃদয় তাহার পদদলিত হইতে চাহে না সেই হৃদয় অধিকার করিবার জন্যই শক্তি উৎসুক। তাহা না পারিয়াই তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল, গর্ব্বময়ী বালিকা আজ কাতরচিত্তে বলিয়া উঠিল "রাম—বুঝিয়াছি তুমি আমাকে ভাল বাসনা। তবে কেন ছেলেবেলা হইতে আমার সঙ্গী হইয়া তুষাগ্নির ন্যায় আমার বালিকার হৃদয় দগ্ধ করিলে?"

শক্তিময়ী যাহা বলিলেন—সমস্তই ছলনার কথা নহে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ের একটি প্রধান উপাদান। বাল্যকাল হইতে বালিকা তাহার ঐ ভাবটি হৃদয়ের রক্ত দিয়া পোষণ করিয়া আসিয়াছে। সমকক্ষ লোককে শক্তিময়ী একবার ভ্রূক্ষেপও করিত না, সে জানিত একদিন না একদিন তাহাদের সহিত তাহার স্বর্গ মর্ত্তের প্রভেদ হইবে, একদিন না একদিন বালিকা যে বাল্যসখা রামচন্দ্রের পত্নী হইবে তাহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। যতবার সে অদৃষ্ট গণাইয়াছে ততবারই তাহার মনের মত উত্তর পাইয়াছে, তাহাতে তাহার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইয়াছে, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হইয়াছে। শক্তিময়ী সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভালবাসা মনে করিত। রামচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন "সখি যদি যথার্থই আমি তোমার কষ্টের কারণ হইয়া থাকি, চিরকাল সে কষ্ট আমার দূর হইবে না। কিন্তু আমার অপরাধ নাই, ছেলেবেলা হইতে আমি তোমাকে ভাল বাসিতে চেষ্টা করিতেছি তোমার যে রূপে কত লোক পাগল সেই উন্মত্তকর রূপে আপনাকে পাগল করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাহার ফল হইল কি? যখনি তোমাকে ধ্যান করিবার ইচ্ছায় আপনাকে কল্পনা

স্রোতে ভাসাইয়াছি, অমনি কল্পনা আমাকে একটি নূতন স্বপ্নময় রাজ্যে লইয়া গিয়া একটি অপরিচিত বালিকা-মূর্ত্তি দেখাইয়া আনিয়াছে, তোমাকে ভাবিতে গেলে আমি তাহাকে দেখিতে পাই, তোমাকে হৃদয় দিতে গিয়া আমি তাহাকে হৃদয় দিয়া ফেলি, অথচ আমি জানি না কে সে বালিকা যাহার জন্য শূন্যমনা হইয়া, অতৃপ্ত-বাসনা-স্রোতে আমি ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আমি তাহাকে কখনো দেখি নাই। আমি কেবল এই মাত্র জানি যে সে তুমি নও, সে আমার কল্পনার বালিকা। আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে ব্যথা দিই নাই আমাকে ক্ষমা কর, শক্তিময়ি।"

গণক বলিয়াছিল শক্তি রাণী হইবেন রামচন্দ্র রাজা হইবেন। রাম আজ রাজা হইয়াছেন, বড় আশা করিয়া শক্তি ফুলহার পরাইতে গিয়াছিল, বড় আশা আজ রামরায় ভাঙ্গিলেন। শক্তির হৃদয়ে আর বিন্দু মাত্র আশার স্থান রাখিলেন না, গর্ব্বিত হৃদয়ে আর সহ্য হইল না। শত শত হৃদয় অনায়াসে পাইয়া হৃদয় কুড়াইবার বাসনা শক্তির বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। যে শক্তি সকলকে অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে আজ সে অনুগ্রহ চাহিয়া পর্য্যন্ত পাইল না—শক্তির চক্ষু দিয়া কখনো কেহ জল পড়িতে দেখে নাই, আজ নিশীথের মৃদু সমীরণ আকাশের তারকারাশি সরোবরের আঁধার জল, অপমান-নিঃসৃত অনলাশ্রুবিন্দু তাহার চক্ষু দিয়া ঝরিতে দেখিল।

সহসা শক্তিময়ী বিদ্যুৎবেগে সোপান হইতে উপরে উঠিয়া গেল। কথা কহিবার অবকাশ না পাইয়া রামচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীর রজনীর ঘোর অন্ধকারে বালিকা একাকী জনশূন্য প্রান্তর মধ্যদিয়া চলিতেছিল। কি ঘোর ভীষণতা চারিদিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কি এক বিকট মূর্ত্তি অন্ধকারের অনন্ত সীমা হইতে উঠিয়া নীরব অট্ট হাসিতে চারিদিক ধ্বনিত করিতেছে, কি এক অদৃশ্য আঁধার ছায়া অন্ধকারকে দারুণ সুস্পষ্ট করিয়া দিগন্তে বিলীন হইতে হইতে আবার ভীষণ গর্জ্জনে বালিকার অনুসরণ করিতেছে। নির্ভীক শক্তির সাহসী হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিতেছে, চকিত নেত্রে চকিত পদক্ষেপে বালিকা লক্ষ্য ক্ষীণালোকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দূরে ভগ্নাবশিষ্ট কালীর মন্দির, বালিকা সেইখানে যাইবে।

মন্দির মধ্যে কালীর করাল মূর্ত্তি, তাহার বাম পার্শ্বে নরকপালে পূজার সামগ্রী সজ্জিত, দক্ষিণ পার্শ্বে নরকপালে দীপ প্রজ্বলিত, সম্মুখে নৃমুণ্ডমালিকাধারী জটাযুক্ত পক্ককেশী, শোণিত চন্দন চর্চ্চিত, ক্রূরকটাক্ষশালী, লোলমাংসবদনা কালী হইতেও ভীষণতরা মূর্ত্তি ভৈরবী দণ্ডায়মান। কোটরসংলগ্ন ভ্রূলুকায়িত ক্ষুদ্রচক্ষু দিয়া অনল বাহির হইতেছিল, রোষ বিকম্পিত কুঞ্চিত লোল অধরোষ্ঠ দিয়া, দন্তহীন বদন

প্রবিষ্ট কপোল মধ্য দিয়া ভগ্ন কাঁশরীবৎ অমানুষী বিকট স্বর বাহির হইতে ছিল, ভৈরবী শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় শিরা উপশিরা বহির্গত হস্ত উঠাইয়া মাড়িতে মাড়িতে চিবাইয়া কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছিলেন "রাক্ষসি চিরকাল আরাধনা করিয়াও তোর মন পাইলাম না, আর কতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ করিবি ? যদি আর অল্প দিনের মধ্যে আমার আশা পূর্ণ না করিস, তবে তোর হাতের ঐ তরবার দিয়া তোর জিহ্বা কাটিব, তোর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব, দেখি তোকে কে রক্ষা করে ? রোষে শ্রান্ত ভৈরবী শবোপরি আসিয়া শয়ন করিলেন। ঈষৎ তন্দ্রা আসিল, কালীর জীবন্ত মূর্ত্তি ভৈরবীর শিয়রে আসিয়া দেখা দিলেন, বলিলেন "ভৈরবি, তোর আশা পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই, বিজয় নগরের ভবিষ্য মহারাণী আজ এই মন্দিরে আসিবেন, তাঁহার দ্বারা তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

ভৈরবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি শিয়র দেশে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই কালী মূর্ত্তির স্থানে কে এ পদ্ম-নয়না লাবণ্যময়ী রমণী দাঁড়াইয়া !"

ভৈরবী উঠিয়া বসিলেন, ভৈরবীর ভৈরব মূর্ত্তি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মুখের ভীষণতা আরো বাড়াইয়া অধর ওষ্ঠে একটু হাসির রেখা পড়িল, শক্তিময়ী প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন "দেবী আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ করুন, অনেক কষ্টে আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি, আপনি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

ভৈরবীর অমানুষী বিকট স্বরে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল, বলিলেন "সুখ দুঃখ মাপিতেই বিধাতা যাহাকে জন্ম দিয়াছেন, ক্ষমতা যাহার দাস স্বরূপ সেই ক্ষমতাময়ী বালিকা কি দুঃখে অধীর হইয়া আজ এখানে আসিয়াছেন ?"

ক্ষমতা ! উহা এখন উপহাস মাত্র। বালিকা ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মাতা, বিধাতা আমাকে ক্ষমতাশালী করিবেন আমিও ইহা একদিন মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সকল আশাই নিভাইয়া সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন প্রতিশোধ—কেবল মাত্র প্রতিশোধ—আমার মনে জাগিতেছে, সেই জন্যই আজ আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি" ক্রমে শক্তিময়ী সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, বলিতে বলিতে অপমানের তীব্র ভাবে, নৈরাশ্যের জ্বলন্ত জ্বালায়, গর্ব্বের তীক্ষ্ণতায়, তাহার হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল, উচ্ছ্বসিত আবেগ ভরে বালিকা বলিল, "মা, প্রতিশোধ প্রতিশোধ, আমি ইহার প্রতিশোধ চাই।" শক্তির কথায় কে জানে কেন, ভৈরবী মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন বালিকা হইতেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। বলিলেন "বৎস শান্ত হও, যে মাথায় সে তোমার মালা পরে নাই, সেই মাথা ছিন্ন করিয়া, যে মুখে সে তোমার আশা ভাঙ্গিয়াছে, সেই মুখে তুমি চরণ রাখিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিবে—" ভৈরবীর অঙ্কিত প্রতিশোধ চিত্রে, তাঁহার হলাহল-পূর্ণ ভগ্নকাঁশরী গর্জ্জিত স্বরে অপমানিত,

ক্রুদ্ধ বালিকা হৃদয়ও একবার সহসা শিহরিয়া উঠিল। কম্পিত অধরে বালিকা বলিল "না মাতা মৃত্যু দ্বারা এ হৃদয়ের প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবৃত্ত হইবে না। যে দিন আমি দেখিব রাম রায় আমার প্রেমোন্মত্ত হইয়া, ধন, মান, যশ সমস্ত বিসর্জ্জন করিবে, যে দিন দেখিব আমার একটি অনুগ্রহ বাক্য পাইবার জন্য সে নরকে যাইতেও কুণ্ঠিত নহে, সেই দিন এ হৃদয়ের আশা পূর্ণ হইবে, সেই দিন আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা পরিতৃপ্ত হইবে, বল মা কি করিয়া তাহা হয় ?" ঘৃণার ভ্রুকুটীতে ভৈরবীর মূর্ত্তি সহসা বিকৃত হইল, কুঞ্চিত কপালের শুষ্ক শোণিত চন্দন, ঘর্ম্মে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ভৈরবী শুষ্ক হস্ত দিয়া শোণিত মুছিতে মুছিতে বলিলেন "ইচ্ছা করিলে যে শত শত রাজার হৃদয় দলিত করিতে পারে, সে আজ সামান্য লোকের প্রেমাকাঙ্ক্ষী ? ইহাই তাহার প্রতিশোধ ?" শক্তির চঞ্চল নয়নে জ্যোতি নির্গত হইল, শক্তি বলিল "মা, যে এক জনের হৃদয় চাহিয়া পায় নাই, সে শত শত রাজার হৃদয় পাইবে কি করিয়া ? আমাকে সন্দেহ করিবেন না, আমি তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহি, প্রতিশোধ—এক মাত্র প্রতিশোধ-স্পৃহাতেই আমি তাহার প্রেম চাহিতেছি।"

ভৈরবী। "যদি এক জন সামান্য ব্যক্তির প্রেমই তোমার প্রতিশোধের চরম-সীমা হয়, তবে এখান হইতে যাও, অমন তুচ্ছ কাজ সাধন করিতে কালীপূজা করিলে তাঁহার অপমান হইবে। উহা বিজয়-নগরের মহারাণী যোগ্য প্রতিশোধ নহে।" বিজয়নগরের মহারাণী ! শক্তিময়ী যত উচ্চ আশা করিয়াছে তাহা হইতেও উচ্চ ! ইহা কি কখনো সম্ভব ! না শক্তি স্বপ্ন দেখিতেছে ?

শক্তিময়ী চকিত নয়নে বলিল "দেবি অত উচ্চ আশা আমার নাই, আমি যে আশা করিয়াছিলাম সে অত উচ্চ নহে, তাহাও আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে !"

ভৈরবী। "তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিয়াই তাহা ভাঙ্গিয়াছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, মহারাজ দেবরায়ের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমারি ক্ষমতা প্রভাবে চালিত হইতেছে ; কিন্তু ঐ দেখ তোমার উজ্জ্বল ভাগ্যাকাশ ম্লান করিতে এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ অগ্রসর, তোমার ভাগ্যের সুখচন্দ্র এক রাহু আসিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত, উহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই অবাধে পুষ্প বিকীর্ণ পথের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে।"

শক্তিময়ী রুদ্ধ নিশ্বাসে সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি মুহূর্ত্তের জন্য প্রতিশোধের কথা ভুলিয়া গেলেন, আজন্ম পালিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তিই হৃদয়ে বলবতী হইল। তিনি অতিশয় আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কি উপায় নাই ?"

ভৈরবী। "আছে। তোমার নিজের উদ্যমের উপরই তোমার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ঐ রাহু তাড়াইতে যাহা

করা আবশ্যক, তাহাতে যদি কৃতসঙ্কল্প হইতে পার—যদি সহস্র বিঘ্ন বিপত্তিতেও তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অটল রাখিতে পার—" শক্তির অধীর হৃদয় ভৈরবীর শেষ কথা পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না—বলিল—"পারিব পারিব কি করিতে হইবে বলুন, এ হৃদয় কিছুতে ডরাইবে না।"

ভৈরবী। "বৎসে, এখনও বিবেচনা করিয়া দেখ, উহাতে প্রতি পদে বাধা, প্রতিপদে অশান্তির ভয়, যদি বাধা বিঘ্ন অশান্তির কষ্ট সহ্য করিতে না পার. যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, তো উচ্চে উঠিবার সুখে প্রত্যাশী হইও না। দরিদ্র-পত্নী হইয়া শান্তিতে কাল যাপন কর। যদি তাহাতে সুখী হইতে না পার অসুখের ভয় নাই।" শক্তিময়ী উত্তেজিত স্বরে বলিল "না আমি শান্তি চাহি না, আমি ক্ষমতা চাই, যদি সে জন্য সহস্র কষ্ট সহ্য করিতে হয় আমি তাহাতে বিমুখ হইব না।"

ভৈরবী। "মনুষ্যহৃদয় বড় চঞ্চল, বড় দুর্ব্বল; আজ আশা পূর্ণ হৃদয়ে যে প্রতিজ্ঞা অটল রাখিবে ভাবিতেছ যথার্থ কষ্টের মধ্য দিয়া তাহা রাখিতে যে বিচলিত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?"

শক্তি। "তাহা পারিব না? যদি শক্তির হৃদয়ে যথার্থ ক্ষত্রিয় রক্ত বহমান থাকে, যদি শক্তির হৃদয় শক্তির উপাদানে গঠিত হইয়া থাকে, তো কালীর সম্মুখে কালীর শপথ করিয়া বলিতেছি আমার প্রতিজ্ঞা অটল থাকিবেই। কিন্তু আমি দরিদ্র কন্যা রাজরাণী হইব কি করিয়া?"

ভৈরবী বলিলেন "মৎস্যগন্ধা কি ছিল, সে রাজমাতা হইল কি করিয়া? দেবীর প্রসাদে তুমি রাজরাণী হইবেই, কিন্তু এখনো ভাবিয়া দেখ প্রতিজ্ঞা অটল রাখিতে পারিবে কি না!"

শক্তির জ্বলন্ত হৃদয়ে যেন আহুতি পড়িল, বলিল "তাহা পারিব না! আমি আজ কি জন্য এখানে আসিয়াছি? যে তীব্র অপমানে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে আমি রাজরাণী হইলে সে প্রতিশোধ-স্পৃহাও কি আমার চরিতার্থ হইবে না?

ভৈরবী। "তবে কালীঘট স্পর্শ করিয়া শপথ কর। কোন বিঘ্ন বিপত্তিতে যদি দুর্ব্বল হৃদয় বিচলিত হয়, তো ঐ শপথই হৃদয়ে বল দিবে।" শক্তিময়ী ঘট ছুইয়া শপথ করিতে উদ্যত হইলেন, ভৈরবী বলিলেন "না এখন শপথ করিও না, আগে শোন কি করিতে হইবে, শুনিয়া শপথ করিও।" ভৈরবী অতি মৃদু স্বরে কি বলিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য শক্তিময়ীর প্রজ্জ্বলিত মুখকান্তি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য শক্তির হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, আবার তখনি সেই অপমানের তীব্রতা মনে জাগিয়া উঠিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য লাভ করিল, নূতন ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া শক্তির বালিকা-হৃদয় সহসা বিচলিত হইয়াছিল তাহা আবার দৃঢ় হইল, শক্তি বলিল "পারিব।" ভৈরবী বলিলেন "তবে এইবার শপথ কর" শক্তিময়ী মনের

জ্বলন্ত বেগ ভরে কালীর ঘট স্পর্শ করিয়া শপথ করিল। তাহার পর ভৈরবী নরকপাল হইতে একটি জবাফুল তাহার হাতে দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, পড়া হইলে বলিলেন "এই ফুলটি তোমার কাছে রাখ, রাজার মন আঁকুবাঁকু করিয়া ইহার কাছে আসিবেই আসিবে। কিন্তু দেখো বৎস প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিও, রাণী হইয়া সে কথা ভুলিও না, তাহার উপরই তোমার সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করিতেছে।" শক্তি বলিলেন "আর তিনি কোথায়?"

ভৈরবী। "মাধব বিদ্যারত্নের গৃহে, তাঁহাকে আপন ভ্রাতার ন্যায় দেখিও, তাঁহা হইতেই তোমার সমস্ত মঙ্গল হইবে।"

শক্তিময়ী সেখান হইতে বিদায় হইয়া গৃহে যাইবার জন্য মন্দিরের বাহির হইল। দেখিল নিশা গতপ্রায়, দুটি একটি তারকা আকাশের কোলে জ্বলিতেছে মাত্র, দূরের বৃক্ষাবলী অস্পষ্ট কৃষ্ণ মেঘের মত দেখা যাইতেছে। বালিকা দ্রুত পদ নিক্ষেপে প্রান্তর পার হইয়া, গ্রাম পার হইয়া যখন ইষ্টকনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকায় প্রবেশ করিল, তখন প্রভাত হইয়া পড়িয়াছে।

সেই দিন কিছু বেলা হইলে রাজার সভাসদবর্গ আসিয়া বালিকার পিতাকে বলিলেন "আপনার কন্যা আমাদের মহারাণী হইবেন, মহারাজ দেবরাও তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন।" বৃদ্ধ পিতা মহা আহ্লাদে কন্যাকে আসিয়া সেই কথা বলিলেন। শক্তিময়ী একবার পূর্ণ কটাক্ষে তাহার পিতার পানে চাহিয়া দেখিল মাত্র। সে কটাক্ষে বিস্ময়ের চিহ্ন মাত্র নাই। আহ্লাদের প্রচুরতা, উল্লাসের উৎফুল্লতা তাহাতে কিছুই প্রকাশ পাইল না, শক্তি যেন নূতন কথা কিছুই শুনিল না, মহারাণী হইতেই বালিকা জন্মিয়াছে, মহারাণীই সে হইল ইহাতে আশ্চর্য্য হইবে কেন?

যোগতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক বস্তুবিষয়ক তীব্র ভাবনা বা উৎকট চিন্তা প্রয়োগের নাম যোগ ও সমাধি। সর্ব্ব বৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থাও যোগ ও সমাধি। শেষোক্ত সমাধির প্রথমাবস্থায় ভাব্য পদার্থের জ্ঞান থাকে, ক্রমে তাহার অভাব হয়। চিত্ত তখন বৃত্তিশূন্য বা নিরালম্ব হইয়া কেবল অস্তিত্ব মাত্রে অবস্থিত থাকে। এই সকল পর্য্যালোচনা ক-

রিয়া, যোগীরা বলিয়াছেন যে, সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্—সম্যক্, প্র—প্রকৃষ্টরূপেণ জ্ঞায়তে। ভাব্য পদার্থের বিস্পষ্ট জ্ঞান থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম "সম্প্রজ্ঞাত" আর "ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" কোন প্রকার বৃত্তির উদয় থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম "অসম্প্রজ্ঞাত"।

ধানুষ্কেরা যেমন প্রথমে স্থূল লক্ষ্যে বিদ্ধ করিতে শিক্ষা করে, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম ও ক্রমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে, সেইরূপ, প্রথম যোগিরাও প্রথমে স্থূলতর শালগ্রাম কি অন্য কোন কল্পিত দেবমূর্ত্তি অথবা কোন ভৌতিক পদার্থে ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করেন। পরে সূক্ষ্ম ক্রমে সূক্ষ্মতম অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ প্রবাহিত করেন। সুতরাং জানা গেল যে, তাঁহাদের ধ্যেয় বা ভাব্য দুই প্রকার। স্থূল ও সূক্ষ্ম। "স্থূল" ও "সূক্ষ্ম" এই দুই শব্দের দ্বারা যাহা বুঝা যাইতে পারে তাহাই তাঁহাদের ভাব্য বা ধ্যেয় বস্তু বটে; কিন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাহা এই—

বাহ্য স্থূল ও বাহ্য সূক্ষ্ম এবং আধ্যাত্মিক স্থূল ও আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পাঁচ প্রকার স্থূল ভূত বাহ্য স্থূল-নামে এবং ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক-স্থূল-নামে কথিত হয়, আর উহাদের কারণীভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্রা বা পরমাণু সকল এবং অহংতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব নামক মূল পদার্থকে যথাক্রমে বাহ্য সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম নাম দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন আত্মা ও ঈশ্বর এই দুই স্বতন্ত্র ভাব্য বস্তুও আছে। এই সকল ভাব্য অবলম্বন করিয়া ভাবনা-প্রবাহ প্রবাহিত করিতে পারিলে ভাব্য বস্তুর ক্ষমতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভেই যদি বাহ্য স্থূলে আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারস্বরূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে—তাহা হইলে তাহাকে "বিতর্ক" বলা যায়। বাহ্য সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাহা "বিচার" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আধ্যাত্মিক স্থূল যদি সমাধির অবলম্বন হয় আর তাহাতে ধ্যানজ প্রজ্ঞা জন্মে—তাহা হইলে সে অবস্থার নাম "আনন্দ" এবং বুদ্ধি সম্বলিত আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাতে যদি তাদৃশ আভোগ (সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা) জন্মে তাহা হইলে তাহার নাম "অস্মিতা"। এই বিভাগ বা অবস্থার ভিন্নতা অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিটীও চারি প্রকার বিভাগে বিভক্ত বা চারি প্রকার অবস্থান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। সেই চারি প্রকারের নাম এই—"সবিতর্ক" "সবিচার," "সানন্দ" ও "সাস্মিতা।" এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্ঞাত-যোগ সাধিত হয়—তাহা স্বতন্ত্র এবং তাহার ফলও ভিন্ন। ঈশ্বরাত্মায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ করিতে পারিলে তাহার আর কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না, সে তখন পূর্ণকাম হইয়া নিত্য তৃপ্ত অবস্থায় কল্পকল্পান্ত অতিবাহন করিতে সক্ষম হয়।

উল্লিখিত ভাব্য সমূহের যে কোন ভাব্যের উপর ধ্যান প্রবাহ ছুটাইবে—ক্রমে

ধ্যান পরিপক্ক হইলে চিত্ত সেই ধ্যেয় পদার্থের আকার প্রাপ্ত হইয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থিত থাকিবেক। তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান বা বৃত্তি উদিত হইবে না এবং প্রতিরোধও করিবে না। এইরূপ হইলেই যোগীরা তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া থাকেন।

এই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি সম্বন্ধে একটু সূক্ষ্ম অনুভব আছে। মনে কর, যখন তুমি কোন ঘটের ধ্যান কর—তখন তোমার ঘট-জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকা-জ্ঞানও থাকে। আমি-জ্ঞানও থাকে। কিন্তু আবার এমন ঘটনাও হয় যে, ঘট-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়—কেবল আমি-জ্ঞান ও মৃত্তিকা-জ্ঞান দুই জ্ঞানে জড়িত এক জ্ঞান অথবা পৃথক ভাবে দুই জ্ঞান একত্রে ভাসিতে থাকে। আবার এমনও হয় যে, অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া কেবল মাত্র ঘটাকার জ্ঞান অথবা মৃত্তিকাজ্ঞান কিংবা আমি জ্ঞান থাকে, আর সব লুকায়িত হয়। (যদি কেহ কখন ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন—তবে তিনিই এই উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন) এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ধ্যানের বা সমাধির পরিপাক দশায় যদি ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান অর্থাৎ অহং জ্ঞান কি ধ্যেয় বস্তুর উপাদান জ্ঞান কিংবা তাহার নাম জ্ঞান না থাকে, (যেমন প্রতিমা জ্ঞান ভিন্ন প্রস্তরের জ্ঞান কি তাহার নাম জ্ঞান) অর্থাৎ মন যদি কেবল মাত্র সেই ধ্যেয় বস্তুর আকারে নিরবশেষরূপে পরিণত হইয়া যায়—তাহা হইলে তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে সবিতর্ক না বলিয়া নির্ব্বিতর্ক এবং সবিচার স্থলে সবিচার না বলিয়া নির্ব্বিচার বলা যাইবেক। সানন্দ ও সাস্মিতা নামক সমাধিতে উক্ত প্রকার ঘটনা হইলে যথা ক্রমে "বিদেহলয়" ও "প্রকৃতি লয়" এবং আত্মা ও ঈশ্বর বিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক দশায় উল্লিখিত প্রকার ঘটনা হইলে যথা ক্রমে নির্ব্বাণ ও ঈশ্বরলয় বলা যায়। নসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি? তাহা বলা হইল, এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি রূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অত্যন্ত পরিপাক-দশায় চিত্ত ক্রমে ভাব্য-বস্তু-চ্যুত হইয়া নিরবলম্ব বা নিষ্ক্রিয় দশা প্রাপ্ত হয়। সেই নিরবলম্ব সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। "অত্র ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় কোন প্রকার চিত্তবৃত্তি থাকে না। নিরবলম্ব সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি উপস্থিত হইলে চিত্ত প্রসুপ্তের ন্যায় বা অভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়। (মনে কর,—মন যেন নাই, অথবা যেন কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে) চিত্তের তাদৃশ নিরবলম্বনতা সহজে হয় না। কঠোরতর অভ্যাসের শেষ সীমায় উহা স্বতই উৎপন্ন হয়। এই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি সকল ব্যক্তির হয় না। যে যোগী সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে অতৃপ্ত,—সেই যোগীই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধির অধিকারী এবং সেই যোগীই সর্ব্ব প্রকার চিন্তা ত্যাগ করিতে বা চিত্তকে নিরবলম্ব করিতে সমর্থ। নিরবলম্ব অবস্থা উপস্থিত করিবার উপায় কেবল অতৃপ্তি আর চিত্তে কোন প্রকার সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তি রাখিব

না" এতদ্রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেও যদি তোমার তৃপ্তি না হয়—তবে তুমি সেই ধ্যেয় বস্তু পরিত্যাগ কর। তৎকালে যদি অন্য কোন প্রকার বৃত্তির উদয় হয়—তবে তৎক্ষণাৎ তাহা বিদূরিত কর। যখন যে মনোবৃত্তি উপস্থিত হইবে তদ্দণ্ডে তাহা "এটীও দূর হউক" ইত্যাকার দৃঢ় সংকল্প দ্বারা তাড়িত কর। বার বার ঐরূপ করিতে করিতে ক্রমে অভ্যাস হইয়া আসিবে, অবশেষে অভ্যাস প্রভাবে চিত্ত আর কোন ও বিষয় গ্রহণ করিবে না, ক্রমে প্রসুপ্তের ন্যায় অভাব প্রাপ্তের ন্যায় বা লয় প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবেক। নিশ্চল নিরবলম্ব অবস্থা বা স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেক। তাহা হইলেই তোমার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা নির্বীজ সমাধি সিদ্ধ হইল।

কোন ভূত কি ইন্দ্রিয়ে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ করিয়া যাহাদের দেহপাত হয়—দেহপাত হইলেও যাহাদের যোগভঙ্গ হয় না—চিত্ত সেই যোজ্য বস্তুতেই লীন থাকে—এবং যাহারা কোন দেবতায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ করিয়া দেহান্তে দেবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাদের নাম "বিদেহ।" আর যাহারা অব্যক্ত, মহৎ, অথবা অহংতত্ত্বে চিত্ত লয় করিয়া স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়াছে—তাহাদের নাম "প্রকৃতিলয়।" প্রথমোক্ত বিদেহ আর শেষোক্ত প্রকৃতিলয় এই উভয়বিধ যোগীর সেই সেই যোগ বা সমাধি সংসারমূলক অর্থাৎ সে প্রকার যোগের দ্বারা সংসার নাশ বা কৈবল্য লাভ হয় না; পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয়। কিন্তু সংসারে আসিয়া সে সহজে তাদৃশ সমাধি লাভ করে, কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। পরমাত্মা বা ঈশ্বরে চিত্তলয় ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি বা কৈবল্য লাভের অন্য উপায় নাই।

যাঁহারা মুমুক্ষু—তাঁহারা বিদেহ ও প্রকৃতিলয় ইচ্ছা করেন না। আত্মলয় ও ঈশ্বরলয়ই তাঁহাদের প্রার্থনীয়। এই সকল মুমুক্ষু যোগীদিগের সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি উপায়-মূলক; অর্থাৎ তাঁহাদের যোগ বা সমাধি শাস্ত্রোক্ত উপায় পরম্পরার দ্বারাই উৎপন্ন হয়। যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্রে শ্রদ্ধা, পরে বীর্য্য, ক্রমে স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা তাহা হইতেই ক্রমে উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্মে। শ্রদ্ধা-অর্থাৎ যোগের উপর চিত্তের প্রসন্নতা। বীর্য্য অর্থাৎ তাহাতেই উৎসাহ বা যত্ন। স্মৃতি-অর্থাৎ অনুভূত কর্ম্মের অবিস্মরণ। লোকে যাহাকে মনের অব্যাকুলতা বা ধ্যান শক্তি বলিয়াও থাকে। সমাধি—অর্থাৎ একতানতা। প্রজ্ঞা—অর্থাৎ জ্ঞাতব্য প্রবিবেক=লোকে যাহাকে সাক্ষাৎকার শব্দে উল্লেখ করে। শ্রদ্ধা থাকিলেই উৎসাহ বা যত্ন থাকে—যত্ন করিলেই ধ্যান শক্তি জন্মে। ধ্যান শক্তির প্রভাবেই একাগ্রতা হয়—একাগ্র চিত্তে দর্শন করিতে পারিলেই জ্ঞাতব্য সাক্ষাৎকার হয়—জ্ঞাতব্য-সাক্ষাৎকার হইলেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। এই প্রণালীর সম্প্রজ্ঞাত যোগ যদি আত্মা অথবা ঈশ্বর অবলম্বন করিয়া সাধিত হয়—তাহা হইলেই কৈবল্য লাভ—নচেৎ পুনরাগমন।

উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সকলের ভাগ্যে সমানরূপে বা সমান সময়ে ফল লাভ সংঘটন হয় না, তাহার কারণ এই যে, কার্য্য সম্পাদনের মূল কারণ যে সংস্কার বা মনোবৃত্তি—তাহা সকলের সমান নহে। কাহার তীব্র, কাহার মধ্য, কাহার মৃদু। যাহার কার্য্য-শক্তি তীব্র—সে সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, অন্যে তাহার সমান হইতে পারে না। কার্য্যশক্তি বা কার্য্য সম্পাদনের মূল কারণ সংস্কার কি? তাহা শুন। যে শক্তি থাকায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে সমস্ত কার্য্য বিবরণ অথবা কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা সকল শীঘ্র প্রকাশ পায়—চিত্তের সেই শক্তির নাম সংস্কার। ইহার অন্য নাম "সম্বেগ"। এই সম্বেগ যাহার তীব্র—সে শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে, অন্যে সেরূপ পারে না। অতএব এজন্য তীব্র-সম্বেগ যোগীরাই শীঘ্র সমাধি লাভ করে, অন্যের বিলম্ব হয়।

পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপায়ের কথা বলিয়াছি—তাহাও সকলের সমান নহে। কাহার ও বা মৃদু, কাহারও বা মধ্য, কাহার বা অতিমাত্র অর্থাৎ অতিপ্রবল। তদনুসারে ও কার্য্যসিদ্ধিরও কালের তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার শ্রদ্ধাদি মৃদু—তাহার কিছু বিলম্ব হয়। যাহার মধ্য—তাহার কিছু শীঘ্র হয় এবং যাহার শ্রদ্ধাদি অতি প্রবল তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং বলা হইল যে, যোগীগণের যোগ শক্তি বা সম্বেগ তীব্র হইলে এবং শ্রদ্ধাদি উপায় সকল অতিপ্রবল হইলেই শীঘ্র, নচেৎ বিলম্বে সমাধিলাভ হইবে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের অন্য এক সুগম উপায় আছে। কি? না ঈশ্বর-প্রণিধান। অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা। যোগীদিগের ঈশ্বরোপাসনা কিরূপ? তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ঈশ্বরের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি উচ্ছ্বলিত করা আর ঈশ্বরোপাসনা একই কথা। কায়িক বাচিক মানসিক—সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের অধীন জ্ঞান করিবে। যখন যে কার্য্য করিবে—ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, সুখের অনুসন্ধান না করিয়া সে সমস্ত কার্য্যই সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে অর্পণ করিবে। যখন কিছু না করিবে—তখন কেবল তাঁহাকেই ধ্যান করিবে। অকপটে পুলকিত হইয়া অনবরত এইরূপ করিলেই তোমার ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হইবে। তখন তুমি দেখিবে যে, তোমার অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুরু পরমেশ্বরের শুভানুগ্রহ তোমার আত্মায় অধিরূঢ় হইয়াছে, উৎকৃষ্টতম সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের আর বিলম্ব নাই।

ঈশ্বর কি? তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য না হইলে তৎপ্রতি বিশিষ্ট ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, পরমকারুণিক মহাত্মা পতঞ্জলি সেই ভাবরূপী পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। ভাবুক না হইলে তাঁহার সেই অত্যল্প উপদেশ দ্বারা হৃদয়ে তাঁহার আরোহণ কল্পনা করা যায় না। তিনি বলিলেন কি? না ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে

পারে না, যাবস্ত সংসারী আত্মা ও যাবস্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি স্বতন্ত্র—তিনিই ঈশ্বর।" ক্লেশ=অর্থাৎ অজ্ঞানাদি পাঁচ প্রকার—যাহা জীবাত্মা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া ভোগ করে। কর্ম্ম=অর্থাৎ না না প্রকার ক্রিয়া বা পরিস্পন্দনাত্মক ব্যাপার—যাহা প্রত্যেক জীবে অনুগত আছে। বিপাক= অর্থাৎ কর্ম্মফল—যাহা সুখ দুঃখাদি নামে পরিচিত। আশয়=অর্থাৎ সংস্কার—কর্ম্ম করার পর চিত্তে যে কৃত কর্ম্মের ভাব আহিত হয় তাহাই সংস্কার। ফলিতার্থ এই যে, তিনি জীবের ন্যায় ক্লেশভাগী নহেন, তিনি সর্ব্বক্লেশবিমুক্ত। জীবের ন্যায় তাঁহার কর্ম্মফলভোগ হয় না, সুখদুঃখজাতি ও আয়ু ভোগও হয় না যেহেতু তিনি নিত্য নিরতিশয় অনাদি ও অনন্ত। জীব যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বাসনা নামক সংস্কারের বশীভূত—তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অচিত্ত, এনিমিত্ত তিনি বাসনারহিত। চিত্তনিষ্ঠ জন্য জ্ঞান ও জন্য ইচ্ছার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তির তুলনা হয় না। তিনি এক ও অসাধারণ ও অচিন্ত শক্তিমান্ দেহাদি রহিত আত্মা বা পুরুষ।

তিনি ভক্ত সাধকের হৃদয়ে স্বতই প্রকাশ পান, অন্যকে বোধগম্য করাইতে হইলে অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। ভাবিয়া দেখ, সকল আত্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। সকল আত্মাই কিছু না কিছু অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান বুঝিতে পারে। কেহ বা অল্পজ্ঞ—কেহ বা তদপেক্ষা কিছু অধিকজ্ঞ। আবার তাহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আছে। অতএব যাঁহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ আর নাই—তিনিই পরমেশ্বর। যেমন অল্পতার চূড়ান্ত পরমাণু আর বৃহত্তের শেষ সীমা আকাশ; সেইরূপ, জ্ঞানশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব; আর তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় বটে, কিন্তু তিনি তাঁহাদেরও স্রষ্টা ও উপদেষ্টা। ব্রহ্মাদি দেবতার জন্ম আছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই বিনাশও নাই। তিনি অনাদিও অনন্ত। সেই অনাদি অনন্ত আদ্য পিতা পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ অর্থাৎ সৃষ্টিজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বোধক শব্দ প্রণব অর্থাৎ ওঁ। শৃঙ্গলাঙ্গূলাদিযুক্ত পশু বিশেষের সহিত "গো" এই শব্দের যেরূপ সম্বন্ধ; ঈশ্বরের সহিত প্রণবের ঠিক্ সেইরূপ সম্বন্ধ। পশু বিশেষের প্রতি "গো" শব্দের সঙ্কেত যাঁহারা জ্ঞাত আছেন—তাঁহাদের নিকট গো শব্দ উচ্চারণ করিলে যেমন তাঁহাদের হৃদয়ে সেই পশু বিশেষের আকার উদিত হয়, ওঁ বলিলেও সেইরূপ সঙ্কেতজ্ঞ সাধকের হৃদয়ে তাদৃশ ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সঙ্কেতবন্ধন করা হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাহা আজ কালকার নহে, উহা অনাদিকালের সম্বন্ধ। অনাদি কাল হইতেই যোগীরা প্রণবকে ঈশ্বরবাচক বলিয়া জানেন।

যোগীরা ঈশ্বরের অন্যরূপ উপাসনা

করেন না, কেবল সেই প্রণবের জপ (মানসোচ্চারণ) ও তাহার অর্থ অর্থাৎ ঈশ্বরকে চিন্তা করেন। তাঁহারা যখন সাংসারিক বা দৈহিক কার্য্য করেন—তখনও তাঁহাদের ঈশ্বরধ্যান ত্যাগ হয় না।

"তুলসী অ্যাসা ধেয়ান্ ধর্,
য্যাসা বিয়ান্কা গাই।
মুমে তৃণ চানা টুটে,
চেৎ রাখয়ে বাছাই।"

নবপ্রসূতা গাভী যেমন মুখে তৃণ চনকাদি ভক্ষণ করে অথচ চিত্ত বৎসের প্রতি অর্পিত রাখে—(বৎসের নিকট গেলেই বুঝিতে পারিবেন) যোগীরাও সেইরূপ অন্যান্য কার্য্য করেন কিন্তু সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে তাঁহাতেই নিবিষ্ট বা একাগ্র হইয়া পড়ে, ক্রমে সমাধিও উপস্থিত হয়।

সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধ্যানের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মার যথার্থ উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞান জন্মে। তখন আর কোন বিঘ্নই থাকে না, নির্ব্বিঘ্নে সমাধি লাভ হয়।

অযোগী অবস্থায় (বিষয় ভোগাবস্থায়) যথার্থ আত্মজ্ঞান ও সমাধিলাভ না হইবার যে কারণ আছে—তাহাদের নাম "বিঘ্ন"। বিঘ্ন অনেক; কিন্তু এই কয়টী বিঘ্নই প্রধান। যথা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, এবং অনবস্থিতত্ব। ব্যাধি=ধাতু বৈষম্য জনিত জ্বরাদি অবস্থা প্রাপ্তি। স্ত্যান=মনের অক্ষমতা (ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্য করিবার শক্তির অভাব)। সংশয়=ইহা পারিব? কি না? অথবা ইহা হয়? কি হয় না? ইত্যাকার জ্ঞান। প্রমাদ=চিত্তের ঔদাসীন্য (উদ্যম রহিত)। আলস্য=শরীরের ও মনের গুরুত্ব (যদ্দ্বারা যোগে অপ্রবৃত্তি জন্মে)। অবিরতি=বিষয়তৃষ্ণা (ইহা হউক, উহা হউক, ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা)। ভ্রান্তি দর্শন= ভ্রমজ্ঞান অর্থাৎ এক আর জ্ঞান (যেমন শুক্তি খণ্ডে রজত জ্ঞান। যোগ পক্ষে ভ্রম এই যে, যাহা যোগের উপকরণ নহে তাহা উপকরণ মনে করা এবং যাহা প্রকৃত উপায় —তাহাকে অনুপায় জ্ঞান করা)। অলব্ধ ভূমিত্ব=কোন কারণ বা প্রতিবন্ধকবশতঃ যোগাবস্থা প্রাপ্তি না হওয়া (যোগ আরম্ভ করিয়া কোন সিদ্ধি লক্ষণ না দেখিলে চিত্তে অমনি বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। মনে হয় যে, বৃথা পণ্ডশ্রম হইতেছে ইহাও বিঘ্ন মধ্যে গণ্য) অনবস্থিতত্ব=চিত্তের অস্থিরতা (কোন এক যোগাবস্থা পাইলেও চিত্ত তাহাতে স্থির না থাকে)। এই সকল গুলিই প্রত্যেকে সমাধি ও একাগ্রতা লাভের বিঘ্ন অর্থাৎ বিপক্ষ। এ সকল দোষ নিঃশক্তি বা নিহত না হইলে কি একাগ্রতা কি সমাধি কিছুই হয় না। চিত্তের এই সকল দোষ রজ ও তমঃ প্রভাবে উপস্থিত হইয়া চিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, একাগ্র হইতে দেয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঈশ্বরোপাসনা ও পশ্চাৎ বক্তব্য প্রকারের যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ক্রমে ঐ সকল দোষ লুপ্ত হয়। ঐ সকল দোষ দূর হইলেই একাগ্রতা শক্তি স্থায়ী হয়, সমাধি লাভও হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীকালীবর শর্ম্মণঃ।

গান।

১

কেন ওই নাম শুনিলেই
চমকি চমকি ওঠে প্রাণ!
মনে আসে সেই সব কথা,
মনে আসে সেই প্রিয় মুখ,
মনে আসে সেই প্রিয়গান;
কেন ওই নাম শুনিলেই
চমকি চমকি ওঠে প্রাণ!

২

আশার ছলনে ভুলি ভুলি
কি যেন—কি যেন হ'য়ে যাই!
সাধের নন্দন বনে গিয়া,
ধীরে ধীরে গলা জড়াইয়া,
কতই আদরে চুম খাই;
নিরাশা সমুখে এসে কেন
ভেঙে দেয় সে সুখ স্বপন!

৩

বুকের ভিতর দিয়া ওহোঃ
কি যেন ঝটিকা ব'য়ে যায়!
প্রাণের অনন্ত সীমা হ'তে
কে যেন করিছে হায় হায়!
তবু কেন ওনাম শুনিলে
চমকি চমকি ওঠে প্রাণ!

৪

ভুলে যাই সকল ভাবনা,
ভুলে যাই সকল যাতনা,
মনে পড়ে সেই সব কথা,
মনে পড়ে সেই প্রিয় মুখ,
মনে পড়ে সেই প্রিয় গান,
কেন গো ওনাম শুনিলেই
চমকি চমকি ওঠে প্রাণ!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বাধীন জীবিকা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

রেশম—একপ্রকার কীটের লালা মাত্র। সেই কীটকে গুটীপোকা বলে। কীটের ভিন্ন ভিন্ন জাতি অনুসারে রেশমের শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ হইয়া থাকে। এই সকল কীটগণ তুত, পলাশ, অশ্বত্থ, বদরী প্রভৃতি বৃক্ষে জন্মিয়া, সেই সেই বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। ভারতবর্ষীয় রেশম অধিকাংশই তুতপত্রভুক কীট হইতে জন্মে।

কিন্তু মেদিনীপুর ও অন্যান্য কোনও কোনও স্থানে বদরীপত্রাহারী কীট হইতে একপ্রকার রেশম হয় তাহাকে তসর বলে, তসর তাদৃশ কোমল কিম্বা কমনীয় নহে। তুতআহারী কীটজাত রেশমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

রেশম কৃষিজাত নহে কিন্তু ইহাকে কৌশলে কৃষির অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। রেশমব্যবসায়ীদিগকে তুতের চাস করিতে হয়। রেশমের উৎপত্তি বিবরণ এই রূপ, গুটী পোকা যে সকল অণ্ড প্রসব করে পরিমাণ অনুসারে উত্তাপ পাইলে সেই সকল অণ্ড হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। তখন তুতপত্র কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া কাটিয়া দিলে তাহারা সেই পত্র আহার ও ঐ পত্রের রস লইয়া ইতস্তত বিচরণ করে। এই রূপে অন্যূন তিন সপ্তাহ অতীত হইলে কীটগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা খোলাস পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। তিন চারিবার খোলাস ছাড়িলে, ২।১ দিন অনাহারে থাকিয়া, তুতপত্র মধ্যে লুক্কায়িত হয়। তখন নৈসর্গিক নিয়মে তাহাদের নাসারন্ধ্র হইতে দুইগাছি লালা বাহির করিয়া পত্রে জড়াইতে থাকে। বাতাস লাগিলেই লালা সূত্রের ন্যায় কঠিন হয়। ক্রমে চারি পাঁচ দিন ঐ রূপে লালা বা সূত্র বাহির করিয়া গুটী বা তাহাদের বাসা নির্ম্মাণ করে। গুটী মধ্যে কয়েক দিন থাকিলেই পোকাগুলির পাখা উঠে, তখন তাহারা গুটীর এক পার্শ্ব কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। পোকা গুটী কাটিয়া বাহির হইলে সেই গুটী হইতে রেশম গ্রহণ করা যায় না, সুতরাং কীটগুলি বাহির হইবার পূর্ব্বেই ঐ গুটী গুলি গরমজলে সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে পোকা গুলি মরিয়া যায়।

গুটী হইতে সূত্র বাহির করিতে হইলে তাহা গরম জলে ছাড়িয়া দিয়া যন্ত্র বিশেষে একটী খেই তুলিয়া জড়াইতে হয়। ঐ যন্ত্র ক্রমে ঘুরাইলে তাহাতে রেশমের লাল জড়াইতে থাকে।

বাঙ্গালা হইতে চীন পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে রেশম জন্মে এবং প্রকৃত পক্ষে ইহাকেই রেশমের দেশ বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে রেশম জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। তবে কাশ্মীর রাজের সুবিখ্যাত অমাত্য বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের যত্নে তথায় ইহার উন্নতি দেখা যাইতেছে। প্রাচীন কালে বঙ্গবাসীগণ রোমবাসীদিগের নিকট রেশম বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিত। রোমকগণ মূল্যের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া গোপনে চীনদেশ হইতে স্বদেশে গুটীপোকা লইয়া যায়। তদবধি ইটালি দেশে রেশম উৎপন্ন হইতেছে।

বঙ্গদেশ মধ্যে মালদহ, বীরভূম, রাজসাহি, পাবনা, মুরশিদাবাদ কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলি রেশম উৎপত্তির প্রধান স্থান। বীরভূমে প্রতি বৎসর প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার রেশম জন্মে। রেশম ও রেশমী বস্ত্র প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গবাসীদিগের একটী প্রধান পণ্য দ্রব্য।

ইংরাজ ভ্রমণকারী ফিছ ও ফরাসী পরিব্রাজক বর্ণিয়ার তাহার প্রধান সাক্ষী।

বাঙ্গালা ইংরাজ অধিকৃত হইলে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রেশোমের উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। ইটালি দেশে যে প্রণালীতে রেশম উৎপন্ন ও সূত্র গ্রহণ করা হয়, কোম্পানি সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেই নূতন প্রণালীজাত রেশম ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানি সেই প্রণালীজাত রেশম দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন। ঐ অব্দে তাঁহারা বাণিজ্য পরিত্যাগ করেন, সুতরাং রেশমের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে হয়। তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তি রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের দ্বারা এই ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালা ও আসামে রেশমের ব্যবসায় করিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে।

গত বৎসর কলিকাতায় ২৩১৪০ মন রেশম আমদানী হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২০০৯৬ মন বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। রপ্তানীর তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

সমুদ্র পথে।

রপ্তানী।

ইউনাইটেড রাজ্যে		৫৪৭৭ মন
অন্যান্য বৈদেশীক বন্দরে		৯৯৩৩ মন
		১৫৪১০ মন

মাদ্রাজে		৪১৯৮ মন
ভারতবর্ষীয় অন্যান্য বন্দরে		৪৮৮
		৪৬৮৬ মন
		২০০৯৬ মন

রবার—বাঙ্গালার পূর্ব্ব দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে ও আসামদেশে রবারের গাছ আছে। সেই বৃক্ষের নির্য্যাসই রবার। রবারের ব্যবসায় নিতান্ত লাভজনক। ইহার মন প্রায় ৮০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জাত রবার গত বৎসর ৯১৯ মন চট্টগ্রাম হইতে সমুদ্র পথে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থানেই বরারের গাছ করা যাইতে পারে। রবারের বাগান করিয়া তাহার নির্য্যাস বিদেশে প্রেরণ করিলে কি লাভ হইতে পারে না?

কাফি—বাঙ্গালার মধ্যে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশেই কাফির চাস হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি ইহার লাভ দেখা যায় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কারণ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উইনাদে কাফির চাস আরম্ভ হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে ইহার চাস প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। বাঙ্গালায় ইহার চাস বিস্তৃত ভাবে হইলে লাভ হইতে পারে।

সিন্‌কোনা—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আমেরিকা হইতে চারা আনাইয়া ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে সিন্‌কোনার চাস আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশ মধ্যে দ্বারজিলিং ও দাক্ষিণাত্য মধ্যে নীলগিরি পর্ব্বতে গবর্ণমেণ্ট সিন্‌কোনার চাস করিতেছেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২টী সিন্‌কোনা ক্ষেত্র আছে। এই দুই ক্ষেত্র গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরে ৮০২৯০ টাকা লাভ হইয়াছে। সিন্‌কোনার চাস করিলে কি আমাদের লাভ হইতে পারে না?

রিহা—উত্তর বঙ্গে ও আসামে রিহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বিলাতে রিহার মন ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। রিহার সূত্র গ্রহণ করা অত্যন্ত কষ্টকর কার্য্য। গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন যে, রিহার সূত্র অক্লেশে বাহির করদার জন্য যে ব্যক্তি কল নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, তাহাকে ৫০০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের যত্ন বোধ হয় শীঘ্র সফল হইতেছে না।

"As stated in previous reports, the cultivation of rheea is not likely to prove commercial success in Bengal. The prizes offered for an efficient machine for cleaning tee fibre have hitherto failed no create much interest in the subject, and it is unlikely that zemindars and ryots will undertake the cultivation of the plant until there is cheap and effective means of bringing it into a marketable condition."

(Bengal Adminstration Report 1880—81.

রবিখন্দ—বঙ্গীয় কৃষকদিগের ক্ষেত্রে ধান্য ব্যতীত যে সকল শস্য জন্মে তাহাকে রবিখন্দ কহে। মটর, মসুর, কলাই, মুগ, চানা, অড়হর, খেসারি প্রভৃতি দাইল গুলি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই জন্মে। তন্মধ্যে রাখরগঞ্জের মসুর ও ত্রিপুরার অড়হর অতি উৎকৃষ্ট। সর্ষপ, তিসি, তিল প্রভৃতি শস্য হইতে তৈল হয়। তৈল বিদেশে রপ্তানী করিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে। এরণ্ড হইতেও তৈল জন্মে। বাঙ্গালায় এরণ্ডের অতি অল্প চাস আছে। তাহার উন্নতি আবশ্যক। গম ও বাঙ্গালার বাজে শস্য।

ফল—বাঙ্গালায় নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ফল জন্মে। যথা আম, জাম, কাটাল, নানাবিধ লেবু, কদলী, গুবাক, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, বাদাম প্রভৃতি। তন্মধ্যে মালদহের আম, খসজয়ন্তীয়া পর্ব্বতের কমলা নেবু, শ্রীহট্টের আনারস, ত্রিপুরার কাঠাল, দক্ষিণ বঙ্গের নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। কতকগুলি ফলের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য চলিতে পারে। কতকগুলি ফলের ও মোরব্বা বিদেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে।

পুষ্প—বাঙ্গালায় নানা প্রকার ফুল জন্মে। তন্মধ্যে কুসুম ফুলের বাণিজ্য চলে। বাঙ্গালায় অনেক স্থানে কুসুমের চাস আছে। কুসুম ফুল জাফরানের ন্যায়, কিন্তু ইহার গন্ধ বা স্বাদ নাই। কুসুমফুল দ্বারা উৎকৃষ্ট রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোধ হয় সেই রং পাঠক মাত্রেই দর্শন করিয়াছেন।

কাষ্ঠ—বাঙ্গালায় যত প্রকার উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায় বোধ হয় আর কোনও

এক দেশে তত রকম উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার অরণ্যে সাল, সেগুন, গজারী, মেহগনী, গাম্ভার, শিশু, আবলুস, কাটাল, চাম্বল, চন্দন, জারোল, নাগেশ্বর, চাপলাস, সূর্য্যভেদ, গর্জন,(৬) চালমুংরী (৭) পীতরাজ প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ জন্মে। নৌকানির্ম্মাণকার্য্যে জারোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চট্টগ্রামে অর্ণবতরী সকল জারোল দ্বারা নির্ম্মিত হয়। বঙ্গবাসীগণ পূর্ব্বের ন্যায় নৌবিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগকে জারোলের সহিত পরিচয় করিতে হইবে।

ইতর জীব পশু—বাঙ্গালায় নানা প্রকার পশু আছে। হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ, গবয়, ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশুগুলি আমাদের নানা প্রকার উপকারে আইসে। বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি বন্য হস্তীতে পরিপূর্ণ। "খেদা" করিয়া হস্তী ধরিতে পারিলে প্রচুর লাভ হয়। লোক নিযুক্ত করিয়া কিম্বা পার্ব্বত্য মানবদিগের নিকট টাকা দাদন করিয়া মৃত বন্য হস্তীর দন্ত অস্থি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করিলে লাভ হইতে পারে। গো ও মহিষ দ্বারা আমাদের কৃষি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে (ইহাদের দুগ্ধ পান করিয়া আমরা জীবন ধারণ করি। দুগ্ধ দ্বারা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবসা করা যাইতে পারে। বিলাতে দুগ্ধ দ্বারা শর্করা প্রস্তুত হইতেছে। ছাগ মেষ প্রভৃতি পশু পুলি আমাদের খাদ্য। গো, মেষ, মহিষ ছাগ প্রভৃতি পশুগুলি মরিয়া গেলে তাহাদের চর্ম্মও আমাদের অনেক উপকারে আইসে। চর্ম্মে ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। বঙ্গীয় জনৈক মুসলমান চর্ম্মের ব্যবসায় করিয়া এত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ অধুনা "নবাব" উপাধি ধারণ করত সেই উপাধির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। কোনও কোনও পশুর বসা শৃঙ্গ ও পুচ্ছ আমাদের উপকারে আইসে। আমরা কতকগুলি পশুতে আরোহণ করি, কতকগুলি দ্বারা মাল ও শকট বাহন করাইয়া থাকি। বাঙ্গালার ন্যায় অধিক পরিমাণে মৎস কোন দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মৎস্যের ব্যবসায় করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। কিন্তু দেশীয় মৎস বিক্রেতাদিগের জীবিকা মারিবার জন্য আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনুরোধ করি না। তাঁহারা, সুকনা মাছ, লোণা মাছ ও বিলাতি নিয়মে Preserved মৎস দেশ

(৬) ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার নির্য্যাস একপ্রকার তৈল। গর্জন তৈল নানা প্রকার শিল্পকার্য্যে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বিম বরাগা, চৌকাট, কপাট. প্রভৃতি কাষ্ঠেতে ও বাঁশনির্ম্মিত দ্রব্য সমূহে গর্জন তৈল মাখাইয়া রাখিলে কীটে নষ্ট করিতে পারে না দেখিতেও ভাল দেখায়। এই বৃক্ষ হইতে তৈল বাহির করা অতি সহজ কার্য্য। শীত ঋতুতে বৃক্ষের নিম্নভাগে একটী ছিদ্র করিয়া অগ্নি দিলে নির্য্যাস গুলি তরল হইয়া বাহির হয়। আমরা দেখিয়াছি যে বৃক্ষের কোন অংশ কাটিয়া দিলেও অল্প পরিমাণে তৈল বাহির হইয়া থাকে। গর্জন তৈলের ব্যবসা চলিতে পারে।

(৭) চাল মুবীংর ফল হইতে একপ্রকার তৈল হয়। সেই তৈল চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

দেশান্তরে প্রেরণ করেন তাহা হইলে অল্প মূল ধনে অনেক লাভ হইতে পারে।

খনিজ দ্রব্য—খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা চিরদরিদ্র। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য স্থানেও মৃদঙ্গার পাওয়া যাইতে পারে। গারো খস জয়ন্তীয়া পর্ব্বত, কাছাড় ত্রিপুরা রাণীগঞ্জ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে মৃদঙ্গার, চূণাপাথর ও লৌহ সংযুক্ত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লৌহযুক্ত মৃত্তিকা হইতেই আমাদের দেশের ব্যবহারের জন্য প্রাচীন কালে লৌহ প্রস্তুত হইত। বিলাতি লোহার আমদানী হইয়া দেশীয় লৌহ ব্যবসায়টী রোধ হইয়া গিয়াছে। অল্পমূল্য ও কদর্য্য হইলে ও লৌহ অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। লৌহ ব্যতীত আমাদের কোনও কার্য্য হইতে পারে না। চূণ ও মৃদঙ্গারের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ আছে।

সোরা—ইহার সংস্কৃত নাম যবক্ষার। সোরা সম্পূর্ণরূপে খনিজ পদার্থ নহে। কিন্তু ইহা মৃত্তিকা হইতেই জন্মে। যে স্থানে অধিক পরিমাণে বিন্মূত্র পচিয়া থাকে অথবা যেস্থানে মৃত্তিকা মুখে দিলে লবণের আস্বাদ পাওয়া যায়, সে স্থানের মৃত্তিকা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া জ্বাল দিতে হয়। অগ্নির উত্তাপে জলীয় অংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, তাহার সারাংশ ঘন হইয়া পাত্র মধ্যে জমিতে থাকে, তখন তাহাকে সোরা কেহে। সোরা দ্বারা নানা প্রকার ঔষধ ও বারুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সোরা আমাদের কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইউরোপের কোনও কোনও স্থানে সোরা জন্মে বটে কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এরূপ অধিক পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট সোরা অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গালার মৃত্তিকা হইতে উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণ সোরা জন্মিতে পারে। আমরা বাল্য কালে অনেক স্থানেই সোরা প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ দেখা যায় না। ধন্য রে ইংরাজ।

লবণ—দুই প্রকার। খনিজ ও জলজ। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশের কোনও কোনও স্থানে লবণের খনি আছে। আবোলফজেল লিখিয়াছেন "নাগরকোটের নিকটবর্ত্তী ২০ ক্রোশ দীর্ঘ পর্ব্বত খোদিয়া লবণ বাহির করা হইয়া থাকে। যাহারা লবণ খনন করে তাহারা তিন অংশ ও যাহারা খনি হইতে লবণ বাহির করে তাহারা এক অংশ পাইয়া থাকে। বণিকগণ অর্দ্ধ হইতে দুই দাম (৮) মনপ্রতি মূল্য দিয়া তাহাদের নিকট হইতে লবণ খরিদ করে। জমিদার বণিকগণ হইতে মন প্রতি ১০ দাম শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং প্রতি ১৮ মনে জমিদারকে সরকারে ১ টাকা কর দিতে হয়।"

খনিজ লবণ নানা প্রকার, যথা সৈন্ধব, বিট, করকচ, খাঁড়ী, সচল, সাম্ভারী প্রভৃতি। সচল ও সাম্ভারী লবণের একটী আশ্চর্য্য

৮ ৪০ দামে সেরসাহি এক টাকা। দাম তাম্রমুদ্রা।

গুণ আছে। এই দুই লবণ যে পাত্রে থাকে তাহা শূন্যে থাকিলে লবণ চলিয়া বেড়ায়।

জলজ লবণ দুই প্রকার। সমুদ্রের জলে লবণ হয়, ইহা পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে স্থানে স্থানে লবণ-কূপ পরিলক্ষিত হয় বলিয়া আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস ও চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল কূপের জল হইতেও লবণ জন্মে। মণিপুরবাসীদিগকে কূপজল-জাত লবণের উপরই নির্ভর করিতে হয়। (৯) আমাদের লবণের অভাব ছিল না, তথাপি আমরা লিবারপোলের নিকট লবণ ভিক্ষা করিতেছি:—

"হায় গো রাজা কি কঠিন।"

আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট ধাতু ও প্রস্তর নাই। আমরা বাঙ্গালার ইতিহাসে বলিয়াছি "সমতল বঙ্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ মধ্যে এক মাত্র ছোট নাগপুরেই হীরকের আকর আছে।" ছোট নাগপুর ও আসামের কোনও কোনও নদীস্রোতে স্বর্ণরেণু প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ব্যবসা করিলে খরচ পোষাইবে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্ম দেশের স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা প্রাচীন কালে আমাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, বোধ হয় এই জন্য প্রাচীনেরা ব্রহ্মদেশকে সুবর্ণভূমি বলিতেন।

শিল্প কার্য্য—All the old indigenous industries of this provinces are decaying. Such as the muslins and other of the finest cotton fabrics the coarser cotton cloths. the brass wares, the wicker work, and others. There was one important industry well sustained, namely, the silk fabrics, but of late this also has rapidly declined.

(Bengal Adminstration Report. 1874—75.)

কার্পাস বস্ত্র—যে সময়ে আমেরিকা প্রাচীন পৃথ্বী বাসীদিগের নেত্র ও জ্ঞানগোচর হয় নাই, যে সময়ে মানচেষ্টারের তন্তুবায়গণ বস্ত্র পরিধান করিতে জানিতেন না, সে সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন বঙ্গবাসীগণ কার্পাস বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া জগদ্বাসী মনুজ ও দনুজদিগের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। যুন ঐতিহাসিক পিতামহ হিরোদতস অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বলিয়াছিলেন যে ভারতের তরুগুল্মে পশম জন্মে (Wool grown upon trees)। মহাত্মা হিরোদতসের গুল্মজাত পশম অর্থাৎ আমাদের কার্পাস সেই প্রাচীন কালে যে রূপ বঙ্গের প্রান্তরে ও পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পিতৃপুরুষদিগের উপকার সাধন করিত অদ্যও তদ্রূপ আমাদিগের হিতসাধন করিতেছে। ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বে যে রূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত অদ্যাপি ন্যূন পরিমাণে তাহা হইতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি নিবন্ধন মানবের হস্তের পরিবর্ত্তে কলে কার্য্য হইয়া জগদ্বি

৯ See the Annual Report of the Munnipure Political Agency for 1861—69 pp. 22, 23, 24.

খ্যাত বঙ্গীয় তন্তুবায়দিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বঙ্গীয় তন্তুবায়গণ যে মূল্যে বঙ্গবাসীদিগকে কাপড় যোগাইত, কলের কাপড় তদপেক্ষা নিতান্ত অল্প মূল্যে পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং বঙ্গবাসীগণ এই সামান্য সুবিধার জন্য স্বীয় মস্তকে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন। যৎ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আমাদের কৃষিজাত কার্পাস ও পাট আমরা ইংরাজদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকি। ইংরাজগণ অর্ণবতরী দ্বারা তাহা স্বদেশে প্রেরণ করেন। তথায় কলে এই সকল কার্পাস ও পাট বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যে পরিণত হইয়া পুনর্ব্বার আমাদের দেশে উপস্থিত হয়। তখন আমরা পূর্ব্বপ্রাপ্ত টাকার বিংশতি গুণ অধিক ইংরাজদিগকে দান করিয়া সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকি। পাশ্চত্য মানবগণ আমাদিগের দ্রব্য আমাদিগকে দান করিয়া কেবল বিজ্ঞতা নিবন্ধন প্রচুর অর্থ লাভ করিতেছেন। কিন্তু আমরা যদি বিলাত হইতে কল আনাইয়া স্বদেশে সংস্থাপন করি তাহা হইলে কি আর তাহারা আমাদিগকে কলুর বলদের ন্যায় ঘুরাইতে পারেন। মনে কর, কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ ও সেরাজগঞ্জে কয়েকটী কাপড় ও পাটের কল স্থাপিত হইল, বঙ্গীয় কৃষকগণ উপযুক্ত মূল্য লইয়া কার্পাস ও পাট স্বদেশীয় কলের অধিকারীদিগকে বিক্রয় করিলেন। সেই কলে বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে আমাদের কতদূর সুবিধা হইতে পারে। মানচেষ্টারের তন্তুবায়গণ যে মূল্যে আমাদিগকে বস্ত্র যোগাইয়া থাকেন, আমাদের দেশীয় বস্ত্র দ্বারা দেশীয় কলে কার্য্য হইলে দেশীয় তন্তুবায়গণ অবশ্যই তদপেক্ষা অল্প মূল্যে বস্ত্র যোগাইতে পারিবেন। ইহা দ্বারা যে দেশবাসীদিগের অল্প মূল্যে বস্ত্র খরিদ করাই লাভ হইল এমত নহে, যে সকল লোক উদরান্নের জন্য বিজাতীয় পদ লেহন করিতেছে এমত কতক গুলি লোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে এবং কলের অধিকারীগণেরও প্রচুর লাভ হইবে, দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়া নানা প্রকার সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইবে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি বাঙ্গালায় কল হইলে পুনর্ব্বার অনেক দেশকেই আমাদিগের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিতে হইবে।

রেশমী বস্ত্র—কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে রেশম জন্মিত না। হিন্দুগণ চীনদেশ হইতে রেশম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং চীনদিগের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুটী হইতে সূত্র গ্রহণ ও তদ্দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই উক্তি পোষণ জন্য তাঁহারা যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তৎসমুদায়ই অনুমান ও যুক্তিমূলক, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। চীন দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ও এরূপ কিছু বলেন নাই। বিশেষত শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ও যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষগণ অধিক পরিমাণে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন. চীন লেখক মাতওয়ালিনের গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনু, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে রেশমী বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমরা তাহাদের বাক্য পোষণ করিতে পারিতেছি না। বিশেষত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ন্যায় নানা প্রকার রেশম চীন দেশেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রোক্ত পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের বাক্য প্রমাণহীন। কার্পাস সম্বন্ধে যেরূপ ভারতে বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠ রেশম সম্বন্ধেও তাহাই বটে। কার্পাস বস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ পূর্ব্ব বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠ, রেশমী বস্ত্র সম্বন্ধে তদ্রূপ পশ্চিম বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠ। মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের তন্তুবায়গণ রেশমী বস্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সুবর্ণগ্রামের জগদ্বিখ্যাত তন্তুবায়গণের সমকক্ষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ কার্পাস বস্ত্রেরও অবনতি দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকল শিল্প কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে উন্নতিশীল জগতে বঙ্গবাসীগণ কখনই তাহাদের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন না!

স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কার প্রভৃতি } যদি চ বঙ্গবাসীগণ অন্যান্য দেশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য আহরণ করিয়াছেন তথাপি তাঁহারা এই সকল বাতু সম্বন্ধীয় শিল্পকার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। অদ্যাপি ঢাকার স্বর্ণকারদিগের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া পাশ্চাত্য স্বর্ণকারগণ বিস্মিত হইয়া থাকেন। ঢাকা ও কটকের স্বর্ণকারগণ অদ্যাপি ইহলোক হইতে পরলোক গমন করে নাই, তথাপি হেমিলটন প্রভৃতি বিলাতী স্বর্ণকারগণ আমাদের দেশ হইতে যে পরিমাণ টাকা লইয়া যাইতেছে তাহা ভাবিতে গেলে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কলিকাতা নগরে বিলাতি স্বর্ণকারদিগের যে কয়েকটি কার্য্যশালা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই দেশীয় কারিকর দ্বারা পরিপূর্ণ। ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানের কারিকরগণ যৎ কিঞ্চিৎ অর্থের জন্য বিলাতি স্বর্ণকারদিগের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কেবল ২।১ জন শ্বেত কারিকর রক্ষক স্বরূপ তাহাদের নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। কেবল ২।১টী মাত্র দ্রব্য বিলাত হইতে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা তাহাদের দোকানের সমস্ত দ্রব্য বিলাতি বলিয়া প্রচুর অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া থাকি। এক্ষণে স্কুল কালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক (Medal) পাইয়া থাকেন। সেই সকল প্রায়ই বিলাতি স্বর্ণকারদিগের দোকান হইতে খরিদ হইয়া থাকে। আমরা ১০০ একশত টাকার স্বর্ণ পদক দর্শন করিয়া অনুমান করিয়াছি যে ইহাতে কোন মতেই ৫০ কিম্বা ৬০ টাকার অধিক স্বর্ণ থাকিতে পারে না, কিন্তু এই ১০০ টাকাতে যদি ঢাকা, ভবানীপুর, কিম্বা কটকের কৃষ্ণবর্ণ কারিকরগণ দ্বারা একটি স্বর্ণ পদক নির্ম্মণ করান হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই পদকে অন্তত ৮০ টাকার স্বর্ণ রাখা যাইতে পারিত। ২০ টাকা মেহেনত আনা লইয়া দেশীয় কারিকরগণ এতদপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট পদক নির্ম্মাণ করিত। প্রত্যেক দ্রব্য সম্বন্ধে বিলাতী স্বর্ণকারগণ এরূপ ডাকাইতি করিয়া থাকে। তথাপি দেশবাসীদিগের চৈতন্য হইতেছে না। বাঙ্গালায় কারিকরের অভাব নাই, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে আশ্রয় কিম্বা উৎসাহ দান করেন না। আমাদের দেশে কি হেমিল্টনের ন্যায় একটী কোম্পানি হইতে পারে না?

কাঁসা ও পিতলের বাসন—আমাদের প্রধান ব্যবহার্য্য দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য নির্ম্মাণে বঙ্গীয় কংসকারগণ বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সকলের ও অবনতি দেখা যাইতেছে। উন্নতির প্রয়োজন। ইহার ব্যবসাতেও লাভ আছে।

মৃণ্ময় পাত্র ও খেলনা—বঙ্গীয় প্রাচীন কুম্ভকারদিগের অসাধারণ উন্নতির প্রমাণ অদ্যাপি কৃষ্ণনগরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ অদ্যাপি এরূপ উৎকৃষ্ট খেলনা, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে যে তদ্দর্শনে পাশ্চাত্য শিল্পীগণও ধন্যবাদ না দিয়া বিরত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের সাধারণ ব্যবহার্য্য মৃণ্ময় পাত্রগুলি সর্ব্বাদাই এই কদর্য্য প্রণালীর। চীনা বাসন বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক মানবগণ আমাদের দেশ হইতে প্রচুর টাকা লইয়া যাইতেছে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে একপ্রকার মৃত্তিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা চীনা বাসন নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বিলক্ষণ লাভ করিতে পারেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

অভিমানিনী নির্ঝরিণী।

মহান্ জলধি জলে, প্রাণ ঢেলে দিব ব'লে
সুদূর পর্ব্বত হোতে আসিনু বহিয়া,
পূরাতে প্রেমের সাধ, না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা, কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া!—
কিন্তু-কিন্তু-তবে কেন, আশাতে নিরাশা হেন,
কিছুই আশার মত হ'ল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে, থাকিব রে হেসে খেলে
কই রে!—সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
সুগম্ভীর গরজনে, বহে সে আপন মনে
বহে সে দিগন্ত ভেদি কে জানে কোথায়,
কই রে! সে করে নাত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
আপনে আপনা ভুলে, প্রমত্ত তরঙ্গ তুলে
বায়ু সনে কত খেলা আপনি খেলায়,
কখন প্রশান্ত মতি, কভু বা উৎসাহে অতি
আবেশে ঢলিয়া পড়ে বিবশা বেলায়;
কই রে!—সে করে নাত ভ্রূক্ষেপ আমায়!

একধারে পোড়ে থাকি, নিজ মান নিজে রাখি
তাহারি উল্লাসে যেন আমার(ও) উল্লাস,
সরোষ নির্ঘোষে তার, আমার(ও) দু পারাপার
ঢেকে ফেলি, ভেঙ্গে ফেলি তুলিয়ে উচ্ছ্বাস,

রাখিতে তাহার মন, প্রতিক্ষণে সযতন,
হাসে, হাসি, কাঁদে কাঁদি—মন রেখে যাই,
মরমে মরম ঢাকি, তাহারি সম্মান রাখি,
নিজের নিজত্ব ভুলে তারেই ধেয়াই,
কিন্তু সে ত আমা পানে ফিরেও না চায়!
নিতান্ত যাহারি লাগি, হইলাম সর্ব্বত্যাগী
সে ত রে আমার পানে ফিরেও না চায়,
ভীম দর্পে করেও না ভ্রূক্ষেপ আমায়!

পর্ব্বতে মায়ের কোলে ছিনু যবে শিশুকালে
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,
হ'ল সার অশ্রু ঢালা, নিরাশ মরম-জ্বালা,
দিবা নিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ!
যখন ঝটিকা উঠে গ্রাম পল্লী যায় লুটে
ছিন্ন ভিন্ন মতিচ্ছন্ন কোরে ফেলে মোরে,
বিসর্জ্জি অযুত ধারা মত্ত পাগলিনী পারা
ঝাঁপিয়া সাগরে পড়ি আশ্রয়ের তরে,
আশ্রয় কে দিবে আর? প্রেমোন্মত্ত পারাবার
দুরন্ত ঝটিকা সনে নিজে মেতে রয়,
নিজের গাম্ভীর্য্য ভুলি, সফেন তরঙ্গ তুলি
আলিঙ্গন আশে, পেতে দেয় রে হৃদয়!
চপলা কটাক্ষ-বাণে প্রতি-কটাক্ষটী হানে,
ঝটিকা-উচ্ছ্বাস সনে মেশায় উচ্ছ্বাস!
আহ্লাদের গরজনে, কাঁপে দিগঙ্গনাগণে
ওঠে পড়ে ঘন ঘন মর্ম্ম ভেদী শ্বাস!
আমি সে ঝঞ্ঝার তোড়ে, কোথা যে রহেছি
পোড়ে

কোথা যে প্রাণের প্রাণ-মিশালো আমার,
সে দিকে কি ভ্রূক্ষেপও আছে গো তাঁহার?

তবে কি মায়ের কোলে উজানে যাইব চ'লে
সুখ সাধ সুখ আশা করি বিসর্জ্জন,
সহিতে পারি না আর প্রণয়েতে অত্যাচার
মরমে ঢাকে না আর জ্বলন্ত যাতন।
কি হবে আমার আর নক্ষত্র গ্রথিত হার,
চম্পক চামেলী বেলা অলকা ভূষণ!
আঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে তরল তরঙ্গভরে
নেচে নেচে ব'হে যেতে সাগর সঙ্গম!

নিতান্ত শৈশব কালে যখন মায়ের কোলে
লুকায়ে ছিলাম সেই নিভৃত নিলয়ে
নিজ ভাবে ভাসিতাম, নিজ সুখে হাসিতাম
নিজ মনে গাহিতাম উদার হৃদয়ে;
দারুণ ঝটিকা হোলে, লুকায়ে মায়ের কোলে
উঁকি মেরে দেখিতাম ভীষণ ব্যাপার,
মেঘের গর্জ্জন ঘনে, গাহিতাম নিজ মনে
কুলু কুলু কলরবে দিতাম ঝঙ্কার;
কড় কড় বজ্র শব্দ শুনিয়ে হতেম স্তব্ধ,
চপলা চমকে পুনঃ আসিতাম সোরে,
জড়ায়ে মায়ের বুক, পাইতাম কি যে সুখ
কি যে সে নিশ্চিন্ত-ভাব-কে বলিতে পারে!
পূর্ণিমা-জোছানা রেতে থাকিতাম হৃদি পেতে
আটকি রাখিতে যেন ম্লান শশধরে;
নীহারে নীহারময় গিরিশৃঙ্গ সমুদয়
সেই সে নীহার মাঝে রাখিতাম ধোরে
পূর্ণীমার রজনীর ম্লান শশধরে!
পাখীতে গাহিত গান শুনিয়ে জুড়াত প্রাণ,
শৈশব-হিল্লোলে হৃদি দিতাম খুলয়ে,
বরষার বারি পেলে পরাণ দিতাম ঢেলে,
কি যে আমি, কোথা আমি যেতাম ভুলিয়ে,
সে দিন কোথায় আর, অন্ধকার অন্ধকার,
ঘেরিয়াছে চারিধার জমাট্ আঁধারে,
শৈশব স্বপন গুলি, সব যেন গেছি ভুলি,
ঢলিয়ে পোড়েছি প্রেমে প্রেম-পারাবারে,
উজানে বহিতে তাই তিল মাত্র শক্তি নাই,
যাহাতে মিশেছি এসে মিশিব তাহায়!
সঁপিয়াছি প্রাণ মন, সঁপিয়াই প্রাণ মন
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
দেখিব বিকায়ে হিয়ে পরাণ সর্ব্বস্ব দিয়ে
গম্ভীর সাগর প্রেম পাওয়া কি না যায়!
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
না জুড়াক মন প্রাণ, নাই পাই প্রতিদান,
জ্বলন্ত যাতনে হৃদি হোক্ দগ্ধ প্রায়,
তবুও উজানে ফিরে যেতে সাধ হয় কিরে!
প্রাণ মন বিসর্জ্জিয়ে রহিব হেথায়,
যাহাতে মিশেছি প্রেমে মিশিব তাহায়!

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

স্বাধীন জীবিকা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কাগজ—কোন্ দেশে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তর্ক আছে। কার্পাস দ্বারা সর্ব্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত হয় বলিয়া কোন ও কোন ও পণ্ডিত অনুমান করেন। এই অনুমান সত্য হইলে সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষেই কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল।

মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে বিহার প্রদেশে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে পাট দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইত। বিলাতি কাগজের আমদানী হইয়া দেশীয় কাগজী-দিগকে দাসত্ব ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রাদায় বিলাতি প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত না করিলে সর্ব্বদাই আমাদিগকে অন্যের নিকট কাগজ ভিক্ষা করিতে হইবে। কোনও কোনও দেশে ঘাস দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গ দেশীয় ঘাস বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে এই কার্য্যের উপযোগী নহে। আমাদিগের অন্য উপায় আছে—

So far as the manufacture of paper is concerned, the plantain promises to be the best of the fibre-producing plants in India, and the Government of Bengal has already expressed its readiness to assist any mercantile firm or private persons wishing to try experiments with the plantain in the Chittagong Hill Tracts or elsewhere in Bengal by supplying them with wild plantain stems free of cost at the outset of the experiment, and afterwards at reasonable rates.

Bengal Adminstration Report 1880-81.

সমতলবঙ্গ ও প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে কদলী বৃক্ষের অভাব নাই। তদ্দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রচুর ধন লাভ করিতে পারেন। ইহাতে অত্যন্ত অধিক মূল ধনেরও প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

কালি—আর্য্যগণ প্রথমত পশুরক্ত দ্বারা পুস্তক লিখিতেন বলিয়া বোধ হয়। মহিষ-রক্তে লিখিত ২।১ খানা প্রাচীন চণ্ডী আমরা দর্শন করিয়াছি। তৎপরে কৃষ্ণবর্ণ কালির সৃষ্টি হয়। বঙ্গবাসী কালি প্রস্তুতের প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন।

"তিন ত্রিফলা করি মেলা,
ছাগ দুগ্ধে দিয়া ভেলা।

লোহাতে লাহা ঘসি,
জলে ঘসিলে না উঠে মসী ॥"

পূর্ব্বে আমাদের দেশে সকলেই কালি প্রস্তুত করিয়া লইতেন, সুতরাং ইহার আর ব্যবসায় চলিত না। কিন্তু অধুনা দেশবাসীগণ একটুক পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারেন না, এজন্যই বৈদেশিক মানবগণ আমাদের নিকট কালি বিক্রয় করিয়া প্রচুর টাকা লইয়া যাইতেছেন। কয়েক জন বঙ্গীয় যুবক কলিকাতায় কালির ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিলক্ষণ লাভও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যম অল্পকাল মধ্যেই রসাতলে গমন করিয়াছে।

কলম—প্রাচীন কালে লৌহ-লেখনী দ্বারা বৃক্ষ-পত্রে লেখা হইত। উড়িষ্যা দেশে অদ্যাপি সেই লেখনী দেখিতে পাওয়া যায়। কালির সৃষ্টি হইলে বাঁস ও খাগের কলম প্রস্তুত হইয়াছিল। অধুনা বিলাত হইতে হংসপক্ষ ও "ষ্টিলপেন" প্রভৃতি আমদানী হইয়া বাঁস ও খাগের কলমকে বাঙ্গালা হইতে প্রায় বেদখল করিয়াছে। আমাদিগকে সেই প্রণালীতে কলম প্রস্তুত করিতে হইবে।

লোহার কার্য্য—দেশীয় কর্ম্মকারগণ সর্ব্বদাই মোটা মোটী লোহার কার্য্য জানিতেন। কিন্তু অধুনা আর তাহাতে চলিয়া উঠিতেছে না। রোজাছের দোকান হইতে কেমন সুন্দর ছবি, কাঁচি প্রভৃতি আমদানী হইতেছে, রডা প্রভৃতি কর্ম্মকারগণ কিরূপ উৎকৃষ্ট বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া আমাদের দেশের রাশি রাশি অর্থ লইয়া যাইতেছেন। বন্দুক তরবারি চুলায় যাক, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি ভালরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারিলেও যে দেশের কতকটা টাকা দেশে থাকিয়া যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতি কর্ম্মকারদিগের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিয়া লোহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। বন্দুক, কামান প্রভৃতি অনেক দূরের কথা আপাতত সামান্য সামান্য দ্রব্যগুলিরই দরকার। তৎপরে যদি অর্ণবতরী, কলের জাহাজ (ষ্টিমার) প্রভৃতি নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে একটুকু আশা জন্মে। যাঁহারা এই সকল কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, বোধ হয় উদরান্নের জন্য তাঁহাদিগকে অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে না।

খোদা ও মুদ্রা কার্য্য—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধাতু কিম্বা প্রস্তরফলক উৎকীর্ণ করিয়া নানা প্রকার বিচিত্র কার্য্য ও সনন্দাদি লিখিতে সুপারগ ছিলেন। তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু আমরা এইক্ষণে সেই সকল একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীন বঙ্গবাসীগণ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র ছাপাইয়া ছিট ও নামাবলী প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ে বিলক্ষণ পটু ছিলেন।

গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্য—গজদন্ত সর্ব্বদাই আমাদের পক্ষে সুপ্রাপ্য। বঙ্গীয় কারিকরগণ গজদন্তের কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। অদ্যাপি ত্রিপুরার কারিকরগণের গজদন্তের কার্য্যের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গজদন্ত দ্বারা আমাদের ব্যবহার্য্য নানা প্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে

গজদন্ত দ্বারা অস্মদ্দেশীয় মহিলাদিগের অঙ্গাভরণ প্রস্তুত হইত। সুবিখ্যাত এরিয়ান ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজ ভ্রমণকারী বল্ক ফিছ বঙ্গবালাদিগের গাত্রে গজদন্ত-নির্ম্মিত অলঙ্কার দর্শন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজ ফ্রান্স এক-জিবিসনে গজদন্ত-নির্ম্মিত চেয়ার গোলদান প্রভৃতি কতকগুলি মনোহর দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সূচীকর্ম্ম—ঢাকাই জড়াও শাড়ী, রুমাল মোলর কাপড় প্রভৃতি বোধ হয় অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। জগতের অন্য কোনও অংশে এরূপ উৎকৃষ্ট সূচীকার্য্য হয় বলিয়া আমরা অবগত নহি। শান্তিপুরের সূচীকার্য্যও প্রশংসার যোগ্য। যে দেশে প্রাচীনকাল হইতে এরূপ উৎকৃষ্ট সূচীকর্ম্ম হইয়া আসিতেছে, সে দেশে অবশ্যই উৎকৃষ্ট সূচী প্রস্তুত হইত। কিন্তু এক্ষণে "সূচ, সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে।"

"If the natives of India have any honest war to carry on, it is the wars against English manufacture. If we can conquer English manufacture it is needless to say we gain a great deal. One great means of effecting this object is to do our best to protect native industries. Now we have a double battle to fight against Manchester and the adverse laws passed by the government of India. The odds are great. But patience and perseverance can overcome mountains."

(Amrita Bazar Patrika. January 6th 1876.)

তৃতীয় অধ্যায়।

এই ভূমণ্ডলে জীবিকানির্ব্বাহের বহুবিধ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পশু পালন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই চারিটী উত্তম ও স্বাধীন ব্যবসায়। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ব্যবসায় নীচ ও ঘৃণিত বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভূম্যধিকার, ব্যবহারাজীবিতা, চিকিৎসা, ধর্ম্ম, বিনোদ এই পাঁচটী ব্যবসায় মধ্যবিধ।

ভূম্যধিকার ব্যবসায়টী বিশেষ লাভজনক। সকল দেশেই এই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ গৌরব আছে। কিন্তু প্রকৃতিবর্গ সকলেই ভূম্যধিকারী হইতে পারে না। সকলে ভূমি বণ্টন করিয়া লইলে ইহা লাভজনক ব্যবসায়-শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না। বাঙ্গালায় ভূম্যধিকারিদিগের লাভ ও সম্মান আছে। বণিকগণ ইচ্ছা করিলে অক্লেশে এই লাভ ও সম্মান অধিকার করিতে পারেন। কারণ "দেন ডিক্রী" ও "বাকী খাজানার" দায়ে বাঙ্গালায় প্রতি দিন শত সহস্র জমিদারি নিলাম হইতেছে। এক্ষণে আমরা বাঙ্গলার যে সকল নব্য জমিদার দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই বণিক বৃত্তি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থ দ্বারা জমিদারি ক্রয় করিয়াছেন।

ব্যবহারাজীবিতা—ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্নি, মোক্তার প্রভৃতিকে ব্যবহারাজীব বলা যায়। ইহারা বিচারকের নিকট ব্যবস্থা ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা অর্থী ও প্রত্যর্থীর পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের প্রদত্ত ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এক সময়ে এই ব্যবসায়টী ধর্ম্ম ব্যবসায়ের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু অধুনা ইহা একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবসায়ে অধিক লোক প্রবেশ করিলে তাহাদের অন্ন মেলা ভার হইয়া উঠে। সুতরাং ইহাকে সাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী ব্যবসায় বলা যাইতে পারে না।

চিকিৎসা—ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শারীরিক রোগ নাশ করা চিকিৎসকের কার্য্য, এই ব্যবসায়টী মন্দ নহে। কিন্তু ইহাকেও সর্ব্বসাধারণের জীবিকা-নির্ব্বাহ উপযোগী ব্যবসায় বলা যাইতে পারে না। কারণ দেশশুদ্ধ লোক চিকিৎসক হইলে তদ্দ্বারা কাহারও জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ধর্ম্ম—গুরু,পুরোহিত,ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি মানবগণ এই ব্যবসায় অবলম্বী। এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কত পরিমাণ লোক কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

বিনোদ—অন্যের চিত্ত বিনোদন দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করাই বিনোদ ব্যবসায়। নর্ত্তক, গায়ক, বাজিকর প্রভৃতি মানবগণ এই ব্যবসায় অবলম্বী। এই ব্যবসায়টী মন্দ নহে। বঙ্গীয় বিনোদ ব্যবসায়ীগণ যদি দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া ধন উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিব। বৈদেশীক বিনোদ ব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালা হইতে যে রাশীকৃত টাকা লইয়া যাইতেছেন তাহা কি বঙ্গীয় বিনোদ ব্যবসায়ীগণ দেখিতে পান না?

হিংসা, ভিক্ষা, অপহরণ, ভৃতিগ্রহণ প্রভৃতি ব্যবসায়গুলি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত। হিংসা—যাহারা মাংস, বসা, চর্ম্ম, পক্ষ, রোম, দন্ত, শৃঙ্গ প্রভৃতির জন্য ইতর জীব বধ করিয়া থাকে তাহারাই হিংসাব্যবসায়ী। ব্যাধ, জালজীবি প্রভৃতি মানবগণ এই ব্যবসায় অবলম্বী। ইহা নির্দ্দয়ের ব্যবসায়; কিন্তু এই ব্যবসায় দ্বারাও স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে।

অপহরণ—পরের সম্পত্তি ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করাকে অপহরণ বলা যায়। দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক প্রভৃতি মানবগণ এই ব্যবসায় অবলম্বী। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত দিন দিন এই ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বীদিগের মধ্যেও কোনও কোনও ব্যক্তি সুযোগ পাইলে এই ব্যবসায়টী অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হন না।

ভিক্ষা—ভিক্ষুকের ব্যবসায় ভিক্ষা। আমাদের দেশে দুই প্রকার ভিক্ষুক আছে, এক শ্রেণীর ভিক্ষুক শ্রদ্ধাস্পদ, অন্য শ্রেণীর ভিক্ষুক ঘৃণাস্পদ। অধ্যাপক, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মানবগণ প্রথম শ্রেণীর ভিক্ষুক। ইহারা ভিক্ষা করিয়া বিদ্যার্থী শিষ্যদিগকে

অন্নদান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিক্ষুকদিগের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে না।

ভৃতিগ্রহণ—বেতন লইয়া অন্যের কার্য্য সম্পাদন করাকে ভৃতিগ্রহণ বলা হয়। এই ব্যবসায় অবলম্বী মানবগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—কর্ম্মচারী ও ভৃত্য। ভৃত্য হইতে কর্ম্মচারীর পদটী কিঞ্চিৎ উচ্চ, কিন্তু উভয়ই দাস-পদ-বাচ্য। ইহাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীনতা নাই। রাজা, জমিদার, বণিক, প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক যাহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত তাহারাই কর্ম্মচারী। যাহারা প্রভুর সেবার জন্য নিযুক্ত তাহারাই ভৃত্য। এই ব্যবসায়টী নিতান্ত নীচ। কিন্তু বাঙ্গালায় দাসত্ব ব্যবসায় অবলম্বীদিগেরই সমধিক সম্মান দেখা যাইতেছে। কিন্তু যাহারা স্বাধীনতা-রত্ন বিক্রয় করিয়া মনের সুখ ও শান্তি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা কিরূপে তাঁহাদের গুণ গান করিব।

প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে আমরা বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রাদয়কে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর ৪টী ব্যবসায় অর্থাৎ পশুপালন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অবলম্বন করুন। এই চারিটীই স্বাধীন, নির্দ্দোষ ও লাভজনক ব্যবসায়।

পশু পালন—পশু দ্বারা আমাদের যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালার গো, মহিষ ও হস্তী এই তিনটী পশু প্রতিপালন করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। গো, মহিষ দ্বারা কৃষি ও শকট বাহন প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাদের দুগ্ধ দ্বারাও নানা প্রকারের ব্যবসায় চলিতে পারে। হস্তী ভাড়া দিয়াও অনেক ধন উপার্জ্জন হইয়া থাকে। যাহারা খেদা করিয়া হস্তী ধরে কিম্বা পর্ব্বত হইতে বৃহৎ কাষ্ঠ আহরণ করে তাহারাই সাধারণত হস্তী ভাড়া লইয়া থাকে। অন্যান্য পশু প্রতিপালন করিলেও কিছু কিছু লাভ হইতে পারে। কিন্তু গো ও মহিষ প্রতিপালন করিলেই প্রচুর ধন লাভ হইতে পারে।

কৃষি। আমরা বারংবার বলিয়াছি বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে কৃষি-কার্য্য অবলম্বন করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের কৃষিতত্ত্ব অধ্যয়ন ও তাহার কার্য্য-প্রণালী অবগত হইয়া বাঙ্গালার বিস্তৃত প্রান্তর ও পার্ব্বত্য প্রদেশে কৃষিক্ষেত্র খুলিয়া এই ব্যবসায়টী অবলম্বন করুন! দেশ দেশান্তর হইতে মানবগণ বাঙ্গালায় আসিয়া নীল, চা, সিন্‌কোনা প্রভৃতি চাস করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিতেছেন। দেশীয়গণ সেই প্রণালীতে নানা প্রকার কৃষি করিলে কি তাহাদের লাভ হইবে না? বাঙ্গালায় অধুনা যে যে স্থানে যে যে কৃষি হইতেছে তাহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। কৃষি ব্যবসায়ের জন্য যে সকল পাঠক এই সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন তিনি সহজেই সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। কৃষিব্যবসায়ীদিগের

উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও রসায়ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।

শিল্প—নৈসর্গিক পদার্থ সমূহকে মানবের ব্যবহারোপযোগীরূপে প্রস্তুত করাই শিল্প কার্য্য। শিল্প কার্য্য বিষয়ে ভারত সন্তানদিগের মধ্যে একমাত্র বঙ্গবাসীগণ কতদূর উন্নতি করিয়াছিল তাহা আমরা বিশেষ রূপে দেখাইয়াছি। তথাপি বিবার্লি সাহেব লিখিয়াছেন "That India's legitimate function in the economy of the world is to grow raw produce, and supply it to the factories of Europe." বোধ হয় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বিবার্লি সাহেব এইরূপ উক্তি করিলে জগদ্বাসীগণ তাহাকে বাতরোগগ্রস্ত নির্ণয় করিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিবস নাই। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে বিবার্লি সাহেবের বাক্য সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমরা স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গকে সবিনয়ে বলিতেছি তাহারা শিল্প কার্য্য অবলম্বন করিয়া জাতীয় অভাব জাতীয় কলঙ্ক প্রক্ষালন করুন। তদ্দ্বারা তাহারা সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন; প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম এস্থলেও তাহাই বলিতেছি "প্রাচীন শিল্পীদিগকে উৎসাহ দান কর, নব আবিষ্কৃত শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হও।"

আমাদের প্রাচীন শিল্পীদিগকে অদ্যাপি কোনও দেশীয় শিল্পীগণ জয় করিতে পারে নাই। তাহা আমরা অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

The Emperor expressed himself as highly delighted with the triumphs of British industry noticeable in the Exhibition, and was especially struck with the beauty and novelty of the Indian show, which the Archduke Charles Louis declared in conversation with the Royal Commissioner, to be the best in the whole building.

(Opening of the Vienna Exhibition.)

কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে হস্তের পরিবর্ত্তে কলে কার্য্য হইয়া জগৎপূজ্য ভারত শিল্পীদিগের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ প্রাচীন শিল্পীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে তদ্রূপ অন্যান্য দেশের শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিলাতী শিল্প-জাত দ্রব্যাদি দ্বারা আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যত দিবস আমরা গৃহ হইতে এই সকল দূরীকৃত করিতে সক্ষম না হইব, তত দিবস আমাদের মঙ্গল নাই। এই ব্যবসায়ে যত লোকই প্রবেশ করুক না কেন, তদ্দ্বারা কখনই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ক্লেশকর হইবে না।

ইংলণ্ড প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র দেশ—"From her geographical position and physical conditions, England is a non producing and non-exporting country." এবম্প্রকার অবস্থায়ও ইংলণ্ডের

বর্ত্তমান অসাধারণ উন্নতি ও গৌরবের কারণ কি? তাহার একমাত্র কারণ এই যে, "Her manufacturing power is unrivalled at the present day." ইংলণ্ডবাসী দরিদ্র হইয়াও শিল্প কার্য্যের বলে জগতের সর্ব্বপ্রধান ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডবাসীরা ভিন্ন দেশ হইতে নৈসর্গিক পদার্থ লইয়া গিয়া কলে ও বুদ্ধিবলে সেই সকল আমাদের ব্যবহারোপযোগীরূপে নির্ম্মাণ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া থাকে। তাহাদের পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ তাহারা যে অর্থ পাইয়া থাকে, আমরা আসল পদার্থ বিক্রয় করিয়া তাহার এক চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হই না। কৃষির আশ্রয় ব্যতীত শিল্প জীবন ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু কৃষি অপেক্ষা শিল্প অধিক লাভজনক বটে। প্রকৃতি ইংলণ্ডবাসীদিগের প্রতি অনুকূল নহেন বলিয়াই তাহারা অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া এরূপ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি আমাদের প্রতি অনুকূল, সুতরাং অনায়াসে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে বলিয়াই আমাদের উদ্যম অধ্যবসায় দিন দিন রসাতলে যাইতেছে। আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যে যেরূপ লাভ দেখা যায়, যদি শিল্প বিদ্যায় আমরা তদ্রূপ পারদর্শী হইতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জগতে অতুল ধনী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতাম।

শিল্প সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্যে আমাদের যে প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন তাহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি।

বাণিজ্য—কি অশুভ ক্ষণে বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিংসাবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভারতের যত প্রকার অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। হা পরমেশ্বর! ভারতের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কি তুমি তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলে। হা মাত! ভারতভূমি! তোমার গর্ভজাত সন্তানেরাই তোমার শীর্ষে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছে! প্রাচীন ভারত-সন্তানগণ গগনভেদী গভীর নাদে বলিয়াছিলেন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ পেচকবৎ অশিব চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"নিদিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনং।"

(মনুসংহিতা।)

বৌদ্ধগণ সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—"কিরূপে আমাদের উন্নতি হইবে," "দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে," "জগদ্বাসী মানবগণ আমাদের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইবে।" তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারাভিলাষে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন। যাপান হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত ভূভাগবাসী মানবগণ তাহাদের শিষ্য বলিয়া চরণধূলি পাওয়ার প্রার্থনা করিত। সেই ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া ভারত সন্তানগণ বিস্তৃত স্থল ও জল বাণিজ্য চালাইতে লাগিলেন।

বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন কিসে আমাদের সহিত অন্যান্য জাতির সংস্রব বন্ধ হইবে। সমস্ত ভারতবাসী জ্ঞানহীন অন্ধ হইবে। আমরা ভারতে একাধিপত্য করিব, জাতিভেদের আঁটা আঁটি আরম্ভ করিলেন, উন্নতির শিরে অশনিপাত হইল। বাণিজ্য রোধ না করিলে বিদেশীয়দিগের সহিত সংস্রব এড়াইতে পারা যায় না। মনুর মধ্যে অনেক নূতন কথা প্রবেশ করান হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাণিজ্য শূদ্রপদসেবার ন্যায় ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা করা হইল। কি সর্ব্বনাশ!

মনুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে কাহার সাধ্য। সুতরাং ভারতবাসী ভদ্র সন্তানগণ বাণিজ্য ব্যবসায়টী নীচ শ্রেণীর হস্তে অর্পণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর একটী ব্যবসায়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাই ধরিয়া বসিয়াছেন। এ জন্যই আমরা বঙ্গীয় ভদ্র বংশীয়দিগকে দাসত্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া আসিতেছি। আর্য্যগণ ঘৃণা করিয়া যাহাদের হস্তে বাণিজ্য ব্যবসায়ের ভারার্পণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাহারাই বাঙ্গালার একত ধনী। স্বর্ণ বণিক, শৌণ্ডিক, তৈলিক প্রভৃতি জাতীয় মানবগণ বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত বলিয়া তাহাদের সন্তান সন্ততির গৃহে চঞ্চলা অচলা হইয়া বাস করিতেছেন। যাঁহারা ঘৃণা করিয়া তাহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না, অদ্য তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সকল জাতীয় মানবদিগের পদসেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাণিজ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিলে আমাদের এই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিত বলিয়া আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

বাণিজ্য দুই প্রকার। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য। স্থলপথে দেশমধ্যে যে বাণিজ্য করা হইয়া থাকে তাহাই অন্তর্ব্বাণিজ্য, জলপথে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া যে বাণিজ্য সম্পাদিত হয় তাহাই বহির্ব্বাণিজ্য।

অন্তর্ব্বাণিজ্য অপেক্ষা বহির্ব্বাণিজ্য অত্যন্ত লাভজনক। বিশেষত তাহা নিতান্ত বিপদসঙ্কুল বলিয়া অশেষ মঙ্গলের নিদান। কারণ সমুদ্রপথে পণ্য দ্রব্য লইয়া গমন করিতে হইলেই উপযুক্ত অর্ণবতরীর প্রয়োজন, সুতরাং বহির্ব্বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগকে প্রথমেই উপযুক্ত অর্ণবতরী নির্ম্মাণ করিতে হয়। তৎপরে সমুদ্রপথে পোত চালাইবার কারণ নাবিক বিদ্যায় সুপণ্ডিত হওয়া আবশ্যক। অর্ণবতরী অকর্ম্মণ্য হইলে যেরূপ বিপদের সম্ভাবনা সেইরূপ কর্ণধার অনুপযুক্ত হইলেও অচিরাৎ সমূলক বিনশ্যতি হইতে পারে। ভূগোল, খগোল ও পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া নাবিকদিগের সম্পূর্ণ আবশ্যক। বিপৎপাতে যিনি চঞ্চলচিত্ত না হইয়া উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত নাবিক। তৎপরে অর্ণবপোতারোহিদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার কারণ উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র ও তৎপ্রয়োগ-কুশল যোদ্ধার প্রয়োজন। পণ্য দ্রব্য লইয়া ভিন্ন দেশে গমন করিতে হইলেই আরো সামান্যত এই কয়েকটীর প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। তৎপরে যে দেশে গমন করা যাইবে সেই দেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষা প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ক্রমে এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদিগের ভাষা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা হইলে কতদূর উন্নতি হইতে পারে। ফলত জল-বাণিজ্যের ন্যায় লাভ জনক ও মঙ্গল জনক অন্য কোন ব্যবসায় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ফিনিসিয়গণ সর্ব্বপ্রথম জল-বাণিজ্য আরম্ভ করেন। (১০) কিন্তু জগদ্গুরু ভারত সন্তানগণ যে এই বিষয়টী অন্যের নিকট-শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

ভারত সন্তানগণ বিদ্যা ও সভ্যতা বিষয়ে জগতের গুরু ইহ কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করিয়াছেন। জল-বাণিজ্য বিষয়ে সেই সর্ব্ববাদিসম্মত—আদিম সভ্য মানবগণ অন্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে স্বীকার

১০ Phenicians were among the most early civilized nations of the East. We are indebted to them for the invention of writing and for the first attempts at commercial navigation. Tytler's Elements of general History.

করা যাইতে পারে। প্রায় সার্দ্ধ দ্বি সহস্রাব্দ পূর্ব্বে যে বঙ্গবাসীগণ সাগর-বক্ষে বিচরণ করিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সিংহল দ্বীপের প্রামাণ্য ইতিহাসে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎ পূর্ব্বেও যে ভারত সন্তানগণ সাগর-বক্ষে বিচরণ করিতেন জগতের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। তৎপরে চণ্ডী, মনু, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতির গ্রন্থ হইতেও এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ষষ্ঠানুবাকেরদ্বিতীয় সূক্তে লিখিত আছে "বরুণ দেবতা অন্তরীক্ষস্থ পক্ষী ও অর্ণবতরীর গমন-পথ জানেন।" সপ্তদশ অনুবাকের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে "তুগ্ররাজ দ্বীপবাসী এক শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাহার নির্য্যাতন জন্য স্বীয় পুত্র ভুজ্যকে রণতরী আরোহণে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রবল ঝটিকায় সেই অর্ণবতরী জলমগ্ন হয়।" (১১)

১১ এরেথেরিয়ান সমুদ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সুবিজ্ঞ বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন :—

"It is the sea, where four thousand years ago, the Vedic merchants saild up to in their *Sutaritra navams* for "the sake of gain" and against one of the islands of which—it may be that of Ormus or Gombroom—the earliest recorded naval expedition of Raja Tugra, spoken of in the Rig-Veda was most probably directed."

(Mookerjee's Magazine.)

চণ্ডী রামায়ণ হইতে প্রাচীন। কারণ রামায়ণে চণ্ডীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১২) যে মনুসংহিতায় বাণিজ্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে সেই মনুসংহিতায় লিখিত আছে "অধিক পথ গমন করিতে হইলে দেশ কাল বিবেচনা দ্বারা যে পোতমূল্যের নির্দ্দেশরূপ তারতম্য আছে, তাহা নদী সম্বন্ধে জ্ঞান করিতে হইবে। সমুদ্রে গমন করিলে এবম্প্রকার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কারণ কেবল বায়ুর প্রতি নির্ভর করিয়া সমুদ্রে গমন করিতে হয়।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক ব্যবসায়ীগণ হইতে কুসীদ গ্রহণোপলক্ষে লিখিয়াছেন "বনগামী ব্যবসায়ীগণ শত মুদ্রার দশমাংশ ও সমুদ্রগামী বিংশতি বিভাগের এক ভাগ কুসীদ দিবে।" মিতাক্ষরা প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর মনু ও যাজ্ঞবল্কের মতানুসরণ করিয়াছেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক পাঠে মহাকবি কালিদাসের সময়ে ভারতে বহির্ব্বাণিজ্য প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। সেই বৈদিক সময় হইতে বৌদ্ধদিগের অধঃপতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদিগের বহির্ব্বাণিজ্যের অবনতি পরিলক্ষিত হয় না। বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ আমাদের সর্ব্বনাশের পন্থা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুসলমানগণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিল, ক্রমে ক্রমে পাশ্চত্য উন্নতিশীল জাতীয় মানবগণ ও অর্ণব পোতারোহণে আমাদের দ্বারদেশে উপনীত হইল। তখন আমরা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাহাদের হস্তে বহির্ব্বাণিজ্য সমর্পণ করত "এস্তেফা" নামা লিখিয়া দিলাম।

বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণের কৃপায় আমরা বহু দিবস হইতে বহির্ব্বাণিজ্য এস্তেফা করিয়া বসিয়াছি। অন্তর্ব্বাণিজ্যই আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। ক্রমে তাহাও আমাদের হস্ত হইতে চলিয়া যাইতেছে। যদিচ শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে বাণিজ্যই জীবিকা নির্ব্বাহের স্বাধীন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবসায় বটে কিন্তু অদ্যাপি আমাদের সমাজের রুচি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিছু কাল গত হইল একখানি সংবাদ পত্রে (১৩) একটী সুন্দর গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা এইরূপ "এক ভদ্র লোকের ২টী কন্যা ছিল। একটী জনৈক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ধনীর হস্তে, ও অন্যটী দাসত্ব ব্যবসায়ী "ডিপুটী বাবুর" হস্তে সমর্পণ করা হয়। উভয় কন্যা পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলে "ডিপুটীর স্ত্রীকে "হাকিমের স্ত্রী" বলিয়া সম্মান করা হইত এবং বণিকের স্ত্রীকে "মুদির স্ত্রী" বলিয়া উপহাস করা হইত। এই গল্প সত্য কি না তাহা সম্পাদকই জানেন, কিন্তু আমাদের সমাজের রুচি যে অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।

১২ আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে। ফলশ্রুতি, চণ্ডী।

১৩ বোধ হয় "সাধারণী" হইবে।

বঙ্গবাসীগণ লক্ষ টাকা জামিন দিয়া ৫।৭ শত টাকার চাকরী স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার এক চতুর্থাংশ টাকা লইয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিতে সাহস করেন না। কতকগুলি লোক যাহারা ইচ্ছা করিলে এক একটী কুঠী খুলিয়া কারবার করিতে পারেন তাহারাও দাসত্বের মুকুট শিরে ধারণ পূর্ব্বক "মুচ্ছুদ্দি" যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে কটাক্ষ করিয়া শম্ভু বাবু লিখিয়াছেনঃ—

Meer Jaffar saisid to have been nicknamed *Clive's ass.* The *Banyan may* be nicknamed the *Merchant's ass.* The whole Indian nation is the English man's ass. It is strange, that with far greater risks, but a smaller percentage of commission than before, the rage for Banyanship has not still abated. Not more are the abolition of infant marriages, the abolition of Koolin polygamy, the introduction of widow marriages, and the emancipation of ourfemales, necessary for our physical and social improvement, than is the abolition of Banyanship necessary for our commercial prosperity. * * * India has need of men to work a revolution in her commercial status."

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন ও ব্যক্তি বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য লালাইত। কিন্তু তাহারা মূল ধন সংগ্রহ করিতে অপরাগ হইয়াই দাসত্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি এই সময় আমাদের ধনীগণ যাঁহারা শ্বেত পুরুষদিগের মনোরঞ্জন জন্য সহস্র সহস্র টাকা দান করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা মুক্ত হস্তে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত না করেন,তাহা হইলে দরিদ্রযুবকদিগের চেষ্টায় কিছুই হইবে না। বঙ্গীয় ধনীগণ যেরূপ সাহেবদিগের অনুরোধে চাঁদা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া থাকেন সেইরূপ তাঁহারা চাঁদা করিয়া বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য কিছু কিছু দান করুন। তাঁহাদের মূল ধন কখনই জলে যাইবে না। নানা প্রকার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন করিলে ২।১টীতে কোন সময়ে কিছু লোকসান হইলেও হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ে যে লাভ হইবে তাহা পাঠক মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে "গত ৩১শে মার্চে ১৯০টী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি অর্থাৎ পাঁচ জনে মিলিয়া ব্যবসা চলিতেছিল। ইহাদের মধ্যে ৩৩টী কোম্পানি কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বাকি গুলিতে বেশ লাভ হইয়াছে।"

(সাধারণী)

বাঙ্গালার এইরূপ "জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির" সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই, মঙ্গল। আমরা নিতান্ত দরিদ্র, দলবদ্ধ না হইলে আমরা কখনই কোন প্রকার স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারিব না। বঙ্গীয় যুবক-

গণ দলবদ্ধ হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করুন। সেই সকল দল তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার প্রয়োজন; এক শ্রেণী পশুপালন ও কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, দ্বিতীয় শ্রেণী শিল্প কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর হস্তে বাণিজ্য থাকিবে। (১৪) কিন্তু বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে কৃষি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতির প্রয়োজন। আমরা যখন বড়বাজার কিম্বা চীনাবাজারে দেশীয় লম্বোদর ব্যবসায়ীদিগকে বিলাতি বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেখি, তখন আমরা ইহাদিগকে মানচেষ্টারের নগদা মুটে বৈ আর কিছুই অনুমান করিতে পারি না। অতএবই আমরা বলিতেছি বঙ্গবাসীগণ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করুন। বিবার্লি সাহেব আমাদের ললাটে যে কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন, বঙ্গবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় শিল্প কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া সেই কলঙ্করেখা প্রক্ষালন করুন। শিল্প-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমতঃ আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করাই আবশ্যক। কাগজ, কালী, কলম, দিয়েশলাই, সূচ, কাঁচি, ছবি প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্যগুলি নির্ম্মাণ করিয়া তৎপরে কাপড়ের কলে হস্তক্ষেপ করুন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এক্ষণও বলিতেছি আমরা কলে কাপড় প্রস্তুত করিলে জগদ্বাসী মানবদিগকে পুনর্ব্বার আমাদের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিতে হইবে। বস্ত্রবয়ন কার্য্যেই আমাদের খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছিল, প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের সহিত তাহা বারংবার উল্লেখ করা গিয়াছে। পুনর্ব্বার এলফিনোষ্টনের বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"Of all the Indian manufactures, the most remarkable is that of cotten cloth, the beauty and delicacy of which were so long admired, and which in fineness of texture has never yet been approached in any other country."

বস্ত্রের ব্যবসায়ই প্রাচীন বঙ্গের উন্নতির মূল। কিন্তু অধুনা মানচেষ্টারের কলের বস্ত্র আমদানী হইয়া বঙ্গীয় তন্তুবায়দিগের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যদি আমরা ম্যানচেষ্টরের তন্তুবায়দিগকে জয় করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা কখনই স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। প্রকৃতি ইংলণ্ডের প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল, তথাপি ইংলণ্ডবাসী শিল্পবলে বলীয়ান হইয়া জগতে গগনস্পর্শী বিজয়-পতাকা উড়াইতেছে।

আমাদের দেশে যে সকল কৃষি কার্য্য যেরূপে হইতেছে এবং তদ্দ্বারা কি পরিমাণ লাভ হইয়া থাকে এবং শিল্প কার্য্যাদি কিরূপ চলিতেছে, এক্ষণে কিরূপ হইলে লাভ হইতে পারে তাহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি, পাঠকগণ তন্মধ্য হইতে এক একটী কার্য্য মনোনীত করিয়া তাহাতে

১৪ আমাদের দল ও শ্রেণীর সহিত জাতি ভেদের কোন সম্পর্ক নাই।

হস্তক্ষেপ করুন তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে ও ব্যবসায়ীগণ স্বাধীনভাবে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে বারংবার বলিতেছি বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে শিল্প কার্য্যে পারদর্শী হউন। নচেৎ ইংলণ্ডের নগদা মুটে হইয়া লাভ নাই।

Impartially considered, the position of India, for a manufacturing power, is better than that of England. The latter depends on her foreign and colonial commerce, which is at the mercy of the enemy's cannon ball. India grows her own raw material, and has plenty of customers at home, and therefore, occupies a more solid position. It is only the superiority of physical power that has turned the tables, and nothing else

* * * * *

Let us receive a commercial and industrial education. Allow us a share in the administration, and to frame our own Tariff—and, with perhaps at starting a bit of patriotism to refuse to buy foreign goods, the children of India will prove to the world whether Providence has willed them to be mere agriculturists or whether they cannot dethrone king cotton of Manchester, and once more reestablish their sway in the cotton world.

(Mookerjee's Magaxine.)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

প্রভাত উৎসব।

হৃদয় আজি মোর—কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত
মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি!
এসেছে সখা-সখী,
বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশু গুলি!
এসেছে ভাই বোন্,
পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে,
নয়নে তারা ফুটে,
পরাণে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি!

সখীরা হাতে হাতে
ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি!
শিশুরে লয়ে কোলে
জননী এল চোলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে "ঘুমো ঘুমো!"
আনত দুনয়ানে
চাহিয়া মুখ পানে
বাছার চাঁদ মুখে খেতেছে শত চুমো!
পুলকে পূরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর!
এসেছে রবি শশি এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা!
পরাণ পূরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর!

প্রভাত হল যেই কি জানি হল এ কি!
আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি,
প্রভাত বায়ু বহে
কি জানি কি যে কহে,
মরম মাঝে মোর কি জানি কি যে হয়!
এস হে এস কাছে
সখাহে এস কাছে—
এসহে ভাই এস, বস হে প্রাণ-ময়!
পূরব মেঘ-মুখে পড়েছে রবি-রেখা!
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা!
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আলো কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়;
যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে!
নয়ন ডুলে যায় শিশির আঁখি ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ পারাবারে।

আয়রে আয় বায়ু যা'রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত মাঝারেতে দেরে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে,
সাগর পারে গিয়ে পূরবে যাবি মিশে;
লইবি পথ হতে পাখীর কল তান,
যুঁথীর মৃদু শ্বাস
মালতী মৃদু বাস,
অমনি তারি সাথে যারে যা নিয়ে প্রাণ।
পাখীর গীত ধার
ফুলের বাস ভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর!
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি ব'য়ে;
ধরার চারিদিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ
যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে
আয় রে মেঘ, আয়
বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যারে।
কনক পাল তুলে
বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ পারাবারে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।

প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে।

জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান।

কে তুমি মহারাজ্ঞী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসোনা তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখ পানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝ খানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণ কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণ মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির-ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগত চরাচরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গীয় সেন রাজবংশ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে, কাণ্যকুব্জের স্বদলস্থ ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—

যূয়ং গতা মগধপথেন গৌড়ে
অযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্ত এব।
যদীচ্ছতাং মাদৃশাং পংক্তিভোজ্যং
তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিং।"

আপনারা মগধের পথে গৌড়ে গমন এবং অযাজ্যযাজন করিয়াছেন সুতরাং আমাদের সহিত যদি পংক্তিভোজন করিতে ইচ্ছা করেন তবে পাপ-নিষ্কৃতি করুন' যদি আদিশূর ক্ষত্রিয় হইতেন তবে তাঁহার পৌরোহিত্য করাতে অথবা তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করাতে পাপ হইবে কেন? বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মণগণ চিরকালই দান গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং চিরকালই তাহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। শূদ্র কিম্বা শূদ্রভাবাপন্নদের দান গ্রহণ কিম্বা পৌরোহিত্ব করিলেই অযাজ্যযাজন করা হয়। সুতরাং যখন আদিশূরের নিকট দান গ্রহণ অথবা তাহার পৌরোহিত্য করাতে কাণ্যকুব্জস্থ ব্রাহ্মণগণ আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে অযাজ্য যাজন-দোষে দোষী করিয়া সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন তখন এক অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল যে আদিশূর ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভূত নহেন। কেহ বলিতে পারেন অম্বষ্ঠদের দান গ্রহণ করিলেও দোষ

নাই, যদি আদিশূর অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণ দোষী হইলেন কেন? এ স্থলে ব্যক্তব্য এই; আদিশূর অম্বষ্ঠ-কুল-সম্ভূত হইলেও তিনি স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পতিত হইয়াছিলেন। যে অম্বষ্ঠ স্বীয় চিকিৎসাদি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিতেন পূর্ব্বে তাঁহাকে পতিত হইতে হইত। কবিকণ্ঠহার প্রণীত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে "অম্বষ্ঠ-কুলে ধন্বন্তরি গোত্রীয় মহারাজ শ্রীহর্ষ সেন (১) সেনভূম রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। শ্রীহর্ষ সেনের কমল ও বিমল নামে দুই পুত্র ছিল। রাজ-পদ-লোলুপ কমল সেন পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে কুলহীন ও পতিত হইয়াছিলেন। (রাজ্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া) বিমল সেন "কুলচ্ছত্র" প্রাপ্ত হইয়া রাঢ় দেশে আগমন করেন। এই বিমলই অম্বষ্ঠদের আদিত্য বংশীয় সেনদের আদি পুরুষ। তথাহি—

"সেনভূমাদভূদ্ রাজা
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ৌ
কমলো বিমল স্তথা। (২) ১

"পিতৃরাজ্যে হভিষিক্তোহভূৎ
কমলো, বিমলঃ পুনঃ
কুলচ্ছত্রমুপাদায়
রাঢ় দেশ মুপাগতঃ।" ২
(কবিকণ্ঠ হার, বিনায়ক প্রকরণ দেখ)

অন্যত্রঃ—

"রাজ্যলোভেন কমলো
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
রাজচ্ছত্রমুপাদায়
কুলহীনোহভবৎ কিল।"
(ঐ রাজদোষ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

অতএব বলা বাহুল্য যে, অম্বষ্ঠ-কুল-সম্ভূত আদিশূর স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া রাজত্ব গ্রহণ করাতে পতিত হইয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধনই তদীয় যাজন বা দান গ্রহণ করাতে কাণ্যকুব্জগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ অযাজ্য-যাজন-পাপে পাপী হইয়াছিলেন। আমরা এই প্রমাণ দ্বারা আদিশূর ও সেন রাজাগণ যে ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভূত নন তাহার এক অখণ্ডনীয় যুক্তি পাইলাম। তবে কেহ বলিতে পারেন এ যুক্তির বলে আদিশূরকে কায়স্থকুল-সম্ভূতও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ কথায় একটী সুদৃঢ় আপত্তি আছে যে, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে সদ্‌ব্রাহ্মণ কায়স্থের যাজন বা দান গ্রহণ করিতেন তাঁহাকে দলচ্যুত হইতে হইত, কিন্তু উপনয়ন রহিত বা পতিত বৈদ্যদের দান সদ্‌ব্রাহ্মণ চিরকাল গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। আদিশূর কায়স্থ হইলে আর কায়স্থদের যাজন বা দান গ্রহণ করিলে দোষ হইবে কেন? সুতরাং আদিশূর যে অম্বষ্ঠ ছিলেন তাহার কোনও ভুল নাই। (৩)

এইরূপ আরও অনেক আপত্তি করা যাইতে পারে কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

১ কবিকণ্ঠহারের তালিকা অনুসারে অম্বষ্ঠ নৃপতি শ্রীহর্ষ সেন তাহার সময় হইতে (১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে) ১৪। ১৫ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং মহারাজ শ্রীহর্ষ সেনকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে।

২ পঞ্চকোটী সেনভূমি প্রভৃতি স্থান বৈদ্যদের আদি নিবাস। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর সমকালে ও পূর্ব্বে সেনভূমি প্রভৃতি বৈদ্য নৃপতিদের রাজ্য ছিল। কুল পঞ্জিকাদিতে এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদ্যগণ তিন সমাজে বিভক্ত, রাঢ়ী, বঙ্গজ ও পঞ্চকোটী। বীরভূমিও বৈদ্য রাজাদের রাজধানী ছিল। বীরভূমির বৈদ্যদিগকে কঞ্চকোটীর বৈদ্য এবং সেনভূমির বৈদ্যদিগকে সেনভূমী বৈদ্য বলে।

৩ সেনরাজাদের সময়েই বৈদ্য গ্রন্থকারদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, পরম পণ্ডিত ও বৈয়াকরণকুলশিরোমণি শ্রীপতিদত্ত ও ত্রিলোচন দাস, বিশ্বপ্রকাশপ্রণেতা, উমাপতিধর, হেমকর, আয়ুর্ব্বেদের অধিকাংশ মহা মহোপাধ্যায় গ্রন্থকারগণ প্রভৃতি বহু অম্বষ্ঠ গ্রন্থকারগণ সেনরাজাদের সমকালে সংস্কৃত সাহিত্য অলংকৃত করিয়াছিলেন। "সেনরাজারা স্বজাতির উন্নতিকল্পে অধিক যত্নবান ছিলেন" এ কথা বলিলে কি তত অন্যায় হয়? পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বলেনঃ—"কুলীন বংশের কোন ব্যক্তি অনুলঙ্ঘনীয় কারণ বশতঃ অসদাচরণ করিলেও কুলচ্যুত হয়েন না, বল্লালী মর্য্যাদানুসারে কুল মর্য্যাদার প্রতি বৈদ্যগণের এই এক অসাধারণ স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। এইটী স্বজাতি পক্ষপাত নিবন্ধন বলিতে হইবে। * * *" বল্লালাদি নৃপতিগণের এইরূপ অনেক বিষয়েই বৈদ্যদের দিকে অধিক টান ছিল। এ সব ঘটনা দ্বারাও সেনরাজাদিগকে বৈদ্যদের স্বজাতি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

যাঁহারা সেনরাজাদিগকে ক্ষত্রিয় সাজাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এক্ষণে আমরা তাঁহাদের যুক্তি কয়েকটী খণ্ডন করিতেছি।

(ক) অনুশাসন পত্রাদিতে সেন রাজারা "চন্দ্রবংশীয়" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়। পাঠকগণ সেনবংশীয় নৃপতিগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু চন্দ্রবংশীয় হইলেই যে ক্ষত্রিয় হইবে আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। প্রথমতঃ চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ চাতুর্ব্বর্ণেই থাকিতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবৎ প্রভৃতিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে। স্থল বিশেষে এরূপও দেখা যায় উচ্চ কর্ম্ম দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন আবার নীচ কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণগণও শূদ্রত্ব বা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রবংশীয় গৃৎসমদের বংশে চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল ঃ—

পুত্রোগৃৎসমদস্যাসীৎ শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

ক্ষত্রিয়কুল-সম্ভূত বেনুহোত্র এবং বৎস্য নামা নৃপতিদ্বয়ের বংশে অনেক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম হইয়াছিল।

বেনুহোত্র সুতশ্চাপি গার্গ্যো বৈ নাম বিশ্রুতঃ।
গার্গস্য গর্গভূমিস্তু বাৎস্য বৎসস্য ধীমতঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ। (৪)

সুতরাং সেন নৃপতিগণ চন্দ্রবংশীয় হওয়াতেই যে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় হইতে হইবে আমরা ইহা কদাপি স্বীকার করিব না। কেন না উক্ত প্রমাণানুরূপ কোন ঘটনা দ্বারা চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় অবনমিত হইয়া চন্দ্রবংশীয় অম্বষ্ঠ হইতে পারেন অথবা কোন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় উচ্চ কাজ দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া সেই চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণের ঔরসে ও চন্দ্রবংশীয়া বৈশ্যার গর্ভে চন্দ্রবংশীয় অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু আমরা কেবল এই একমাত্র প্রমাণ উপস্থিত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। পূর্ব্বে যদি চ এক বংশ হইতে নানা বর্ণের উৎপত্তি হইত কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই অপর বংশোৎপন্ন জাতির কোন স্থলেও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। যাহারা একবর্ণ হইতে স্বতন্ত্র বর্ণ বা জাতিতে ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্ব বংশীয়দের জাতির বিষয় এক্ষণে কেহও বিন্দুবিসর্গ অবগত নহেন।

অনেকেই জানেন অম্বষ্ঠদের মধ্যেও সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ আদিত্যবংশ প্রভৃতি বহুবিধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বংশের বিবরণ কবিকণ্ঠহার প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে। যাহারা সূর্য্যসেন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় এবং যাহারা চন্দ্রসেন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহারা চন্দ্রবংশীয় অম্বষ্ঠ। এইরূপ আদিত্যসেন হইতে আদিত্যবংশ, সুধাকর দাস হইতে সুধাকর বংশ হিন্দুসেন হইতে হিন্দুবংশ প্রভৃতি বহুবংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং চন্দ্রসেন নৃপতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই যে সেন নৃপতিগণ চন্দ্রবংশীয় সেন বলিয়া পরিচিত তাহার সন্দেহ নাই। (৫) নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি পাঠ করুন সেন বংশীয়দের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ চন্দ্রকে একটী দেবকল্প মানব বলিয়া বোধ হইবে; তবে অত্যুক্তিপ্রিয় কবি উমাপতি তাহাকে নিশাকরের সমকক্ষ করিবার জন্য যেন তাঁহার শরীরে নিশাকরের গুণগুলিও ঢালিয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।—

৪ বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না, পাঠকগণ বরিসাল হইতে প্রকাশিত, "জাতিতত্ত্ব বিবেক" নামক গ্রন্থের অনুক্রমণিকা দেখুন ভুরি ভুরি প্রমাণ পাইবেন।

৫ অবশ্য আমরা সেন নৃপতিদের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ চন্দ্রসেনকে কবিকণ্ঠহারোক্ত চন্দ্রসেন হইতে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিব। যেমন রঘুর বংশধরগণকে রঘুবংশীয় বলা যায়, সেইরূপ চন্দ্রসেনের বংশধরগণকে চন্দ্রবংশীয় বলা যাইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন "চন্দ্র "যদি ব্যক্তিবিশেষের নাম হয়, তবে তাঁহাকে আবার "সোম" "সুধাদীধিতি" বলা হইল কেন? কিন্তু এ নিয়ম সংস্কৃত ভাষায় বেশ প্রচলিত আছে। হলায়ুধ ত্রিলোচন দাসকে "ত্রিনেত্র" বলিয়াছিল। যথা "আচার্য্যে দুর্গসিংহে প্রলপতি সততং বুদ্ধিহীন স্ত্রিনেত্রঃ।" চরকমুনি মহর্ষি অগ্নিবেশকে "বহ্নিবেশ" বলিয়াছেন যথা "সাংখৈঃ সংখ্যাত সংখ্যাতৈঃ সহাসীনং পুনর্ব্বসুং। জগদ্ধিতার্থং পপ্রচ্ছ বহ্নিবেশঃ স্বসংশয়ং।" চরক, সূঃ ১৩ অধ্যায়। ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

যৎ সিংহাসন মীশ্বরস্য কনক প্রায়ং জটা-
মণ্ডলং
গঙ্গাশীকর মঞ্জরী পরিকরৈর্যচ্চামর প্রক্রিয়া
স্বেতেৎফুল্লফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃ সন্দানদা-
মোরগ—
ছত্রং যস্য জযত্যসাবচরমো রাজা সুধা-
দীধিতিঃ। ৩
বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দা-
ক্ষিণাত্য (৬)
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেন প্রভৃতি ভিরভিত কীর্ত্তি-
মন্ডির্বভূবে।

পাঠকগণ দেখুন, সেন রাজারা চন্দ্রবংশীয় হওয়াতেও অম্বষ্ঠকুল বহির্ভূত হইলেন না। বরঞ্চ সেন নৃপতিগণ যে "বন্দ্রবংশীয় অম্বষ্ঠ তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং সেন নৃপতিদিগকে চন্দ্রবংশীয় দেখিয়া যে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করা হইয়াছিল সে কথার কোনও মূল রহিল না।—

কেহ বলিয়া থাকেন, সেন নৃপতিগণ "চন্দ্র" বা "সোম" (৭) উপাধিধারী বৈদ্য ছিলেন এই জন্যই তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ অম্বষ্ঠকুলপঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ নাই। "চন্দ্র" "সোম" প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যগণ কষ্টভাবাপন্ন অর্থৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত ইহাদের প্রসঙ্গ কুলপঞ্জিকায় লিখিবার রীতি নাই। আমরা বলি তাহা হইলে আর কেশবসেনকে সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ বলা হইবে কেন? যখন "সেন" শব্দটী সেন নৃপতিদের উপাধিরূপে ব্যবহার হইয়াছে তখন তাঁহারাই আবার সোম বা চন্দ্র উপাধিধারী কি প্রকারে হইতে পারেন? তাঁহারা চন্দ্র সেনের বংশধর বলিয়াই "চন্দ্রবংশীয় সেন" নামে বিখ্যাত। বোধ হয় চন্দ্রসেন বংশীয় বৈদ্যগণ নিকৃষ্ট বৈদ্য ছিলেন এই জন্যই তদীয় বংশধর সেন নৃপতিদের বিবরণ কুলপঞ্জিকায় বাহুল্যরূপে বিবৃত হয় নাই।

(খ) রাজসাহী প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে সামন্ত সেনকে "স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" বলা হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু ইহার "A garland for the noblest race of the Khetriya Kings অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিদের শিরোমালা "এই অর্থ করিয়া সামন্ত সেনকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

আমরা, অসংলগ্ন হইলে ও অগ্রে এস্থলে একটী কথা বলিয়া লই। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন।

ব্রহ্মা মুর্দ্ধাভিসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্র বিশাবপি।
অমী পঞ্চা দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিসিক্ত, বৈদ্য ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই পঞ্চদ্বিজের মধ্যে প্রথম

৬ এস্থলে জানা যায় বীরসেন দাক্ষিণাত্যের (Deccan) অধীশ্বর ছিলেন। যাহাদের আয়ত্তে ভারতের অধিকল্প স্থল দেখিতেছি, তাহাদিগকে দিল্লীশ্বর দেখিয়া কেন বৃথা আপত্তি করি?

৭ সেন দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবকরাস্তথা
রাজসোমৌ নন্দিশ্চন্দ্রধর কুণ্ডাশ্চ রক্ষিতঃ
বাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রেচ বৈদ্যা এতেত্রয়োদশঃ।
(অম্বষ্ঠ চারু চন্দ্রিকা।)

ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত, তৃতীয় বৈদ্য, চতুর্থ ক্ষত্রিয় এবং পঞ্চম বৈশ্য গৌরবান্বিত। অতএব হারীতের মতে ক্ষত্রিয় হইতে বৈদ্য গৌরবান্বিত।

পুনশ্চ পরাশর বলিয়াছেন—

সত্যে বৈদ্যাঃ পিতু স্তুল্যাঃ ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎপ্রোক্তাঃ কলৌবৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ।

বৈদ্যগণ সত্য এবং দ্বাপর যুগে পিতার তুল্য (ব্রাহ্মণের তুল্য) দ্বাপরে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ছিলেন। কলিতে তাঁহারা বৈশের তুল্য হইয়াছেন। সুতরাং অত্যুক্তিপ্রিয় কবি উমাপতিধর এই দুই ঋষি বাক্যের বলে বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়ের শিরোদাম করিলে তত আশ্চর্য্য হই না।

এক্ষণে "সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" ইহার কতরূপ অর্থ হইতে পারে দেখা যাউক।

(১) "তিনি (সামন্তসেন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের কুলের শিরোমালা ছিলেন।"

(২) শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধানের মতে নপুংসক লিঙ্গবাচক ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তপ বেদ তত্ত্ব ঈশ্বর। আবার যেমন বৈদ্য শব্দে চিকিৎসক ও বৈদ্যজাতিকে বুঝায় সেইরূপ ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় শব্দে রাজা বা ক্ষত্রিয় জাতি উভয় অর্থই বুঝায়। (৮) সুতরাং

(ক) সামন্ত সেন তপোনিরত নৃপতিদের কুলের শিরোমালা ছিলেন।

(খ) সামন্ত সেন বেদবিদ্ নৃপতিদের কুলের শিরোদাম ছিলেন।

(গ) সামন্তসেন তত্ত্বজ্ঞানী নৃপতিদের কুলের শিরোদাম ছিলেন।

(ঘ) সামন্তসেন ঈশ্বরভক্ত নৃপতিদের কুলের শিরোদাম ছিলেন।

এইরূপ নানা অর্থ করা যাইতে পারে।

(৩) যজুর্ব্বেদোক্ত "ব্রহ্ম ক্ষত্রং" শব্দের অর্থ টীকাকার "ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্র বীর্য্যঞ্চ" লিখিয়াছেন। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করিয়া "সামন্ত সেন ব্রহ্মজ্ঞান এবং ক্ষত্রিয় বীর্য্য সম্পন্ন (ব্যক্তিদের) দের কুলের শিরোমালা ছিলেন" এই প্রকার অর্থও হইতে পারে। (৯)

৮ দ্বিজলিঙ্গী নৃপঃ ক্ষত্রঃ ক্ষত্রিয়শ্চ প্রজেশ্বরঃ। (ত্রিকাণ্ড শেষ)

৯ পার্ব্বতী বাবুর কৃত "আদিশূর ও বল্লালসেন" দেখ।

আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, রামদাস সেন ও রাজেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত "স ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" এবং তদীয় ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া সেন রাজাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন (রাজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ দ্বয়ে ?) অনেক স্থলে এইরূপ সেন রাজাদিগকে "ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোথায় ? রামদাস বাবু যে প্রবন্ধে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার ঐতিহাসিক লেখনী হইতে সর্ব্ব প্রথমে প্রসূত হইয়াছিল। তখন তাঁহার ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা তাদৃশ পরিস্ফুট হইয়াছিল না, সুতরাং সেন রাজাদের সম্বন্ধীয় বহুল প্রমাণানভিজ্ঞ নবীন লেখকের

উল্লিখিত পাদের এইরূপ আর ও ১৫।১৬ প্রকার অর্থ হইতে পারে; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। এই সকল সরল ও অভিধান ব্যাকরণসম্মত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেন যে "উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিদের মালা" এরূপ অর্থ করা হইল, জানি না। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় নামে কোন বংশ অথবা শ্রেষ্ঠার্থে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কোন অভিধানে সাহিত্যে পুরাণে মন্বাদি স্মৃতিতে কি কোন জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে কোথাও নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে রাজেন্দ্র বাবু অষ্ঠদিগকে নৃপতির অযোগ্য বিবেচনায়, রীতিবহির্ভূত হইলেও সহজ সংস্কার পরিপোষক অর্থ লিখিয়া সেনরাজদিগকে ক্ষত্রিয় সাজাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অন্যে যাহাই বলুক আমরা এই হাত গড়ান অর্থের বলে সেন নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বংশীয় বলিতে কদাপি সাহসী হইব না। যে বচনের পঁচিশ প্রকার ভিন্ন অর্থ হইতে পারে, সেই নানার্থপ্রকাশক সংশয়মূলক বাক্যের রীতিবহির্ভূত ব্যাখ্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আমরা কদাপি শত শত বুধবাক্যের উপর সন্দেহ করিতে পারি না।

মত প্রামাণ্য বলিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন তিনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া এ মত প্রকাশ করিয়াছেন তখন উহার মূল্য নিতান্ত অল্প। তিনি প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া ও সেই এক "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম" প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন সুতরাং সেন রাজাদের সম্বন্ধে সে সময় যে অধিক জানিতেন না তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলে উক্ত বচন দ্বারা সেন রাজাদের জাতি সম্বন্ধে কোনও আভাস পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এই সংশয়মূলক প্রমাণের বলে কদাপি সাধারণের মত পরিত্যক্ত হইতে পারে না।

(গ) "ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ" এই বাক্যে কুলাচার্য্য ঠাকুরের গ্রন্থে আদিশূরের বিশেষণ রূপে লিখিত আছে সুতরাং আদিশূর ক্ষত্রিয়।

আদিঅন্তবিহীন সকলের অপরিচিত এই নগণ্য কুলাচার্য্য ঠাকুরের বাক্যে, কোন্ ব্যক্তি, শত শত মহামহোপাধ্যায় কুলাচার্য্য ঠাকুরের অসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট বাক্যকে অনাদর করিবে, আমরা বুঝিতে পারি না। যিনি করিবেন তিনি বাস্তবিকই এক জন অদ্ভুত লোক।

এই "ক্ষত্রিয় বংশ হংস" লইয়া বহু প্রতিবাদের পর ও যখন কুলাচার্য্য ঠাকুরের সম্পূর্ণ বাক্যটী সাধারণের সমীপে উপস্থিত হইল না, তখন এই বাক্যের বলে আদিশূর ক্ষত্রিয় হইতে পারেন কি না; বোধ হয় আবিষ্কারকেরই বিশেষ সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ যাহার নাম কেহ জানে না, যাহার গ্রন্থ, আবিষ্কারক ব্যতীত আর একজন লোক এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না, এরূপ এক সামান্য কুলাচার্য্যের বাক্য যথার্থ হইলে ও বোধ হয় কেহই সেই সমাজপূজ্য পরম পণ্ডিত দেবীবর, কবিকণ্ঠহার প্রভৃতির বাক্যে সন্দিহান হইবেন না। আমরা এই সাধারণের অপরিচিত নগণ্য কুলাচার্য্য ঠাকুরের বাক্যে সেই শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত দেবী-

বর প্রভৃতিকে অযথার্থবাদী বলিয়া সন্দেহ করাকে মহাপাপ জ্ঞান করি।—কুলাচার্য্য ঠাকুর কি ভাবে "ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ" কথাটী আদিশূরের বিশেষণরূপে স্থাপিত করিয়াছেন তাহা না দেখাইয়া লৌকিক সংস্কার ও পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, বলিতে পারি না। এই "ক্ষত্রিয়বংশ হংস" কথাটী আদি শূরের বিশেষণরূপে বহুস্থলে স্থাপন করা যাইতে পারে; অথচ তাহাতে আদি শূরের জাতি সম্বন্ধে কোনও আভাস পাওয়া যাইবে না। কতকগুলি প্রাচীন বাক্যের সহিত ঐক্য রাখিয়া এসম্বন্ধে উদাহরণ দিতেছি।

১। যদ্যপ্যাদিশূরো জাত্যাম্বষ্ঠস্তথাপি দুর্য্যোধনকংশাদপি "ক্ষত্রিয়বংশ হংসঃ।"

২। আদিশূরোঽম্বষ্ঠকুলেপি বীর্য্যশৌর্য্যাদিগুণৈঃ "ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ।"

৩। সোম্বষ্ঠ-বংশ প্রভবাদিশূরো
নৃপেষু স "ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ।

৪। অম্বষ্ঠকুল সম্ভ তাদিশূর আহবেপি ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ।

৫। "আসীন্নরেন্দ্রো ভিষগাদিশূরো
বৌদ্ধান বিজিত্বা পুনরেব বঙ্গে।
ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মং নৃপতীন্নৃপাণাং
সংস্থাপ্য স "ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ।"
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কুলাচার্য্য ঠাকুরের গ্রন্থে যে উল্লিখিত ভাবে 'ক্ষত্রিয় বংশ হংস" কথাটী আদিশূরের বিশেষণ রূপে বসে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে। ভ্রমক্রমে কিম্বা লিপিকরের প্রমাদে "ক্ষত্রিয় বংশ হংস (অর্থাৎ চিকিৎসক * বংশীয়) স্থলে "ক্ষত্রিয় বংশ হংস" হয় নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? যদি কুলাচার্য্য ঠাকুরের গ্রন্থে "ক্ষেত্রিয় বংশ হংসঃ" অর্থাৎ চিকিৎসক বংশীয় সূর্য্য (বা নৃপতি) এইরূপ পাঠ থাকিয়া থাকে তবে কুলাচার্য্য ঠাকুরও স্পষ্ট বাক্যে আদিশূরকে অম্বষ্ঠ-কুল-সম্ভূত বলিয়াছেন। যখন সুপণ্ডিতচূড়ামণি ও শিল্পীকে অযথা মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়াই অনুমান বলে "অথৌষধনাথ বংশ" স্থলে "অথোষধিনাথ বংশ" পাঠ উদ্ধার হইতে পারে তখন এক জন অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লিপিকরের লিখিত অশুদ্ধ গ্রন্থে একটী 'ে' একারের লোপ হওয়া কোনও আশ্চর্য্য নহে। এরূপ সামান্য ভ্রম এক জন ঋষিকল্প লোকেরও হইতে পারে। অতএব আমরা এই সংশয়মূলক ও আগাগোড়া-বিহীন তুচ্ছ কথার বলে নিশ্চিন্ত থাকিয়া শত শত প্রামাণ্য ও অসন্দিগ্ধ ঋষিকল্প বাক্যের উপর সন্দেহ করিতে পারি না।

এতদ্ব্যতীত আমাদের আরো দুই এক কথায় বিশেষ আপত্তি আছে। যাঁহারা সেন নৃপতিদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা আদিশূর ও বীরসেনকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু

* ক্ষেত্রিয় শব্দের অর্থ চিকিৎসা (যথা "ক্ষেত্রিয়ং ক্ষেত্রজ তৃণে পরদেহ চিকিৎসয়োঃ" ইতি মেদিনী। সুতরাং "ক্ষেত্রিয় বংশ" লক্ষণ করিয়া "চিকিৎসক বংশ" এরূপ অর্থ করিলে রীতিবহির্ভূত ব্যাখ্যা করা হয় না। পার্ব্বতী বাবুর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এ কথা যে নিতান্ত অমূলক ও অযৌক্তিক তাহা প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর পক্ষাবলম্বিগণও এ ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন সুতরাং এ কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন। অপিচ কাহারও মত এই যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অম্বষ্ঠ নামে এক ক্ষত্রিয় জাতি ছিল। সেন রাজারা ক্ষত্রিয় জাতির এই শাখান্তর্গত হওয়াই সম্ভব। লোকে মনুর লিখিত ব্রাহ্মণ বৈশ্যোৎপন্ন অম্বষ্ঠ জাতির সহিত নামসাদৃশ্য দেখিয়া ভ্রমক্রমে সেন রাজাদিগকে সেই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতি বলিয়া গণ্য করিয়াছে। যখন মূল প্রমাণই আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, তখন আর এই আনুমানিক কথা লইয়া কিছু বলিতে চাই না। বিশেষতঃ অম্বষ্ঠ নামে যে এক ক্ষত্রিয় বংশ ছিল, ইহা নিতান্ত অমূলক কথা। কোনও গ্রন্থে ইহার প্রমাণ নাই। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মহাভারতে, যে যে স্থলে অম্বষ্ঠ শব্দ আছে সেই স্থলেই অম্বষ্ঠ শব্দে দেশবাসীকে বুঝাইয়াছে। যেরূপ বঙ্গবাসী বলিলে বঙ্গ নামে ক্ষত্রিয় বংশ বুঝায় না সেইরূপ অম্বষ্ঠবাসী বলিলে অম্বষ্ঠ নামে ক্ষত্রিয়বংশ বুঝায় না। সুতরাং অম্বষ্ঠদেশবাসীকে অম্বষ্ঠ নামে ক্ষত্রিয় বংশ কল্পনা করিয়া লজ্জাজনক ভ্রম করা হইয়াছে। আমরাও তর্ক স্থলে বলিতে পারি অম্বষ্ঠদেশবাসীগণ অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য ছিলেন। কেননা আমরা অম্বষ্ঠচারু চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানিয়াছি কষ্টভাবাপন্ন নন্দি উপাধিধারী বৈদ্যগণ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বাস করেন—

রাঢ়ীয় ভিষজা যে যে
প্রায়ন্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে
নিবসন্তি চ কেচন।

অতএব আমরাও অনুমান বলে "মহারাষ্ট্রান্তর্গত অম্বষ্ঠদেশ, অম্বষ্ঠদের (বৈদ্যদের) নিবাসভূমি বলিয়া অম্বষ্ঠদেশ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে" একথা কি বলিতে পারি না?

আমরা এই স্থলেই দ্বিতীয় প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি করিলাম। এই প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবে অথবা একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লাক্ষ্মণেয় সেনের পরবর্ত্তী সেন নৃপতিদের সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে বাসনা রহিল।

(প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ)

শ্রী যাদবানন্দ গুপ্ত।

টর্কিটো ট্যাসো।

কবি নামে কি অভিশম্পাৎ আছে জানি না, অধিকাংশ বিখ্যাত কবির জীবন দুঃখময় দেখা যায়। কল্পনা-প্রাচুর্য্যই প্রধানতঃ তাঁহাদের এই দুঃখের কারণ। কল্পনার প্রসাদে সুখের রাজ্যও তাঁহাদের নিকট যেমন বিস্তৃত, দুঃখের ঘনঘটাও তেমনি নিবিড়। সাধারণ লোকের সহিত ইহাঁদের তুলনা হয় না, অন্যে যাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই দেখিতে পায় না কল্পনার প্রসাদে তাহাতে ইঁহাদের দিব্য চক্ষু। তাঁহাদের সুখ দুঃখ তাঁহারাই বোঝেন—সাধারণে তাহার তীব্রতা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না—সুতরাং সমবেদনা লাভও ইঁহাদের ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। কল্পনার প্রাচুর্য্যে ইহাঁরা যে মোহময় স্বপ্ন দেখিতে থাকেন, সত্য রাজ্যে আসিয়া প্রতি পদে তাহাতে নিরস্ত হইতে হয়। দূর হইতে যাহাকে দেখিয়া কল্পনার উচ্চ শিখর হইতে দেব দেবী রূপে ধ্যান করিতে থাকেন নিকটে আসিয়া মনুষ্যের আভাস মাত্র পাইলেই সে মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, অমনি হতাশ হইয়া পড়েন। এই রূপে তাঁহারা নিজেও অসুখী হয়েন, এবং যাহারা তাঁহাদের সংসর্গে আইসে তাহাদের পর্য্যন্ত অসুখী করিয়া তোলেন। তাঁহাদের দুঃখ তাঁহাদের অভাব সহজে কাহারো বুঝিবার ক্ষমতা হয় না সুতরাং অন্যের দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত হওয়াও অসম্ভব। ইহাঁদের সুখ কল্পনায়, ইহাঁদের সুখ ঘুমাইয়া। কল্পনা ছুটাইয়া, নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া সত্য জগতে আসিয়া দাঁড়াইতে যখন ইহাঁরা বাধ্য হন তখনি ইহাঁদের সুখ ছুটিয়া যায় কি এক দুঃখ আসিয়া জীবন অন্ধকারময় করিয়া তোলে। পৃথিবী একে দুঃখময়—শতবার সহস্রবার কাঁদিয়া তবে একবার যথার্থ হাসি হাসিতে পারা যায়—তাহার পর যথার্থ দুঃখের সঙ্গে আবার কল্পনা খাটাইলে আর রক্ষা থাকে না, প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনায় দুঃখ আসিয়া তাঁহাদের আকুল করিয়া তোলে, এক সময় যাহা তাঁহাদের সুখের সামগ্রী থাকে, তাহাই পরে তাঁহাদের দুঃখের হইয়া পড়ে। কবির দুঃখ বলিলেই সেই জন্য তাহা আমরা অনেকটা কাল্পনিক বলিয়া বুঝি। কিন্তু অভাগা ট্যাসোর দুঃখ সেরূপ নহে।

কবিদের মধ্যে ট্যাসোর জীবন কষ্টের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। শিশুকাল হইতে তিনি যে কষ্ট পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমৃত্যু তাহা সহ্য করিতে হইয়াছিল বলিলেই হয়। শৈশবে মাতৃক্রোড় বিচ্যুত হইয়া, যৌবনে প্রণয়ে নিরাশ হইয়া, প্রতি আকাঙ্ক্ষায় ব্যর্থকাম হইয়া শেষে সুদীর্ঘ বন্ধন

যন্ত্রনা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছিল। অভাগা ট্যাসো ধৈর্য্যের একটি চূড়ান্ত আদর্শ।

কবি প্রসবিনী ইটালী দেশে বিখ্যাত ট্যাসো বংশে টর্কিটো ট্যাসোর জন্ম। সমুদ্র তীরে রমণীয় সেরেণ্টো নগর। বার্নাডো-ট্যাসো কর্ম্মক্ষেত্র স্যালার্ণো নগর হইতে অবসর লইয়া কিছু দিনের জন্য এখানে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পান করিতে করিতে, প্রিয় কবিতা দেবীর আরাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন, অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই কবিতা—কবিতার এই উৎস মধ্যে বার্নাডোর ভবিষ্য অহঙ্কার, সরস্বতীর বরপুত্র টর্কিটো ট্যাসো ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ মার্চ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।

টর্কিটো শিশুকাল হইতেই অভাগা, তাঁহার স্পর্শে যেন প্রফুল্ল কুসুমও শুকাইয়া গিয়াছে, তিনি ভাল বাসিয়া যাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন সংক্রামক রোগের ন্যায় তাঁহার দুর্দ্দশাও যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, টর্কিটো যেন দুরদৃষ্ট সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পরেই যে তাঁহার পিতার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল, তাহা আর জন্মে ঘুচিল না। ট্যাসোর পিতা স্যালার্ণোনগরের যে ডিউকের সেক্রেটরী ছিলেন, নেপল্‌সের রাজ প্রতিনিধি—মিথ্যা রাজবিদ্রোহ অপরাধে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন, ডিউক ফ্রান্সে পালায়ন করিলেন—বার্নাডোও এই অসময়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া সঙ্গে গমন করিলেন। এদিকে ডিউক এবং তাঁহার অনুচর বর্গের যথা সর্ব্বস্ব বিদ্রোহ অপরাধে রাজভাণ্ডারসাৎ হইল। বার্নাডো একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। যদিও কিছুদিন পরে পোপের নিকট হইতে এক নির্ভয় পত্র লইয়া ফ্রান্স হইতে রোমে আসিয়া বার্নাডো বাস করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই যে একবার সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি বাম হইলেন আর কখনই ফিরিয়া চাহিলেন না। শিশুকাল হইতে টর্কিটো সেই যে পরাধীনতার কষ্টে পড়িলেন, সে কষ্ট হইতে জীবনে আর মুক্তি পাইলেন না। স্বামীকে সর্ব্বস্বান্ত দেখিয়া টর্কিটোর মাতা পোর্শিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত যৌতুকধন আনিতে ভ্রাতাদিগের নিকট নেপল্‌সে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহা দেওয়া দূরে থাক, তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন, যদি রাজদরবারে পোর্শিয়া এই অর্থ লইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে রাজ প্রতিনিধির ক্ষমতাবান হস্ত তাঁহাকে শীঘ্রই নিরস্ত করিবে।" কেবল ভয় দেখাইয়াই তাঁহার পামর ভ্রাতাগণ ক্ষান্ত হইল না—পাছে নেপল্‌স হইতে তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত কোন স্থানে গিয়া পোর্শিয়া কোন উপায়ে সেই অর্থ লইবার সুবিধা পান, এই ভয়ে ভগিনীকে নেপল্‌সের বাহিরে আর যাইতে দিল না। পোর্শিয়া কি করেন, কন্যা কর্ণেলিয়াকে লইয়া একটি রোমান কাথলিক ধর্ম্ম মন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন, এবং শিক্ষার নিমিত্ত সপ্তম বর্ষীয় ট্যাসোকে তাহার পিতার নিকট রোমে প্রেরণ করিলেন। মাতাকে ছাড়িয়া আসিতে ট্যাসোর এত কষ্ট

হইয়াছিল যে তাঁহার এই বিদায় চিরকাল মনে অঙ্কিত ছিল। মাতার নিকট হইতে এই তিনি প্রথম বিদায় লইলেন এবং ইহাই শেষ বিদায় হইল, আর কখনো মাকে ইহার পর দেখিতে পান নাই। ২০।৩০ বৎসর পরের একটি কবিতাতে অতি কাতর ভাবে তিনি এই বিদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

জননীর শিশু ছেলে ছিনু আমি মাকে
জড়াইয়া,
নিষ্ঠুর অদৃষ্ট আসি, বক্ষ হতে লইল
ছিঁড়িয়া,
মাতা পাগলিনী পারা,
নয়নে উথলে ধারা,
নিরাশ দলিত হৃদে বার বার বার
চুমিলেন পাংশু বর্ণ কপোল আমার।
উন্মত্ত আগ্রহ ভরে,
এই অভাগার তরে,
কতই যে প্রার্থিলেন দেবতা নিকটে
অঙ্কিত হোল তা সুধু আকাশের পটে।
এখনো সে সব কথা মনে পড়ে যাতনার সনে,
এখনো বিদায় স্মরি অশ্রু জল বাহিরে
নয়নে।
সেই যে ছাড়িনু মারে,
জনমে সে মুখ হা—রে,
কভু পড়িল না আর এ পোড়া নয়নে,
জনমে কখনো আর
এ মোর হৃদয় তার
বাজিল না উচ্ছ্বসি সে স্নেহ আলিঙ্গনে।

* * * *

এই অভাগা কবির জীবন-কাব্যের নায়িকা লিওনোরা। লিওনোরাই তাঁহার সৌভাগ্য চন্দ্রের রাহু, লিওনোরাই তাঁহার সংসার সমুদ্রের ধ্রুব তারা, লিওনোরাই তাঁহার সুখের হন্তারক, লিওনোরাই তাঁহার দুঃখের শান্তি। লিওনোরা রাজবংশীয়া কন্যা, টাসো একজন সামান্য সভাসদ। মর্ত্ত্যের কীট হইয়া স্বর্গের পারিজাতের প্রতি চাহিয়াছিলেন, এই অপরাধেই তাঁহার ভবিষ্যজীবন অন্ধকারময় হইল, কিন্তু সহস্র রূপে সহস্র বিপদে তাঁহার হৃদয় হইতে সে প্রেম কেহ উন্মূলিত করিতে পারে নাই।

ইটালীর ফেরারা নগরই ট্যাসোর দুঃখের ও গৌরবের প্রধান রঙ্গভূমি। যদিও ইতিপূর্ব্বে বিদ্যালয়ে শিক্ষা কালে রিনাল্‌ডো নামে কাব্য বাহির করিয়া তিনি জন সাধারণে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন, তথাপি তাঁহার অন্যান্য উৎকৃষ্টতর কাব্য সকল প্রায় সমস্তই এই সভায় রচিত। কবিত্ব সমীর তরঙ্গিত হৃদয়ের নব বিকশিত প্রেমই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাকে যেন এইখানে ফুটাইয়া তুলিল, এইখানেই আবার কারাগার-বন্ধন-নৈরাশ্য প্রভৃতি কষ্ট তাঁহাকে অভিভূত করিল।

পাঠ সমাপন করিয়া ২১ বৎসর বয়সে ট্যাসো, ফেরারার ডিউক অ্যালফঞ্জো এস্তের ভ্রাতা কার্ডিন্যাল লুইজি এস্তের নিকট কর্ম্ম লইয়া তাহার সহিত ফেরারার রাজসভায় আসেন। লুক্রেসিয়া ও লিওনোরা নামে ডিউক আল ফঞ্জোর দুই ভগিনী ছিলেন। ট্যাসোর তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

এই সাক্ষাতই তাঁহার কাল হইল। যখন লিওনোরাকে কবি দেখিলেন, তখন কবির বয়স ২১ এবং লিওনোরার বয়স ত্রিশ। লিওনোরা সবে মাত্র রুগ্ন-শয্যা হইতে উঠিয়াছেন, পূর্ণ যৌবনের পরিস্ফুট সৌন্দর্য্যের উপর কেমন একটি অলস ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, সেই মোহন সৌন্দর্য্যে ট্যাসোর বালক হৃদয় মোহিত হইল; সেই যে তিনি হৃদয় দিয়া ফেলিলেন, ভবিষ্যতের সহস্র বিপদেও আর তাহা ফিরাইতে পারিল না। ট্যাসো প্রতিভাবলে রমণীদ্বয়ের নিকট আদরণীয় হইলেন, তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন—কিছু দিন পরে জ্যেষ্ঠা ভগিনী লুক্রেশিয়া আরবিনোর ডিউকের সহিত বিবাহিত হইয়া স্বামীগৃহে গমন করিলেন। ইহাতে লিওনোরার সহিত কবির ক্রমে আরো ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে কৌলিনোর বাঁধও অনেকটা ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। ট্যাসো কবিতার একটি ছত্র লিখিয়া লিওনোরাকে না দেখাইয়া থাকিতে পারেন না, লিওনোরার প্রশংসা পাইলে আর কাহারো প্রশংসা কামনা করেন না, লিওনোরাও কবিতার প্রত্যেক ছত্রে কি যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, প্রশংসা করিয়া তাঁহার আশ মেটে না। সেই প্রশংসায় কবির হৃদয় উথলিয়া উঠিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় ক্রমে আশ্বস্ত হইতে লাগিল। এই রূপ অবস্থায় তাঁহাদের কবিতা পড়া কত দূর নিরাপদ সহজেই অনুভব করা যায়। কাব্যের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা পরস্পরের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেন কাব্যের নায়ক নায়িকার প্রেম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দুজনের লুকান উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিত, অথচ কথায় প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আগে যেমন হৃদয় ভাব লুকাইবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে টাসোকে যত্ন করিতে হইত, এখন আর তিনি লুকাইবার জন্য সেরূপ ব্যগ্র নহেন, তাঁহার ভীরু-হৃদয় লিওনোরার প্রশংসায় আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে সাহসী হইল। যে কথা মুখে বলিতে তাঁহার ক্ষমতা হইত না, তাহা কবিতায় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতে লাগিলেন—এইরূপে তিনি হৃদয় হারাইলেন। ট্যাসোর জীবনী লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রেম অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার কবিতা হইতে ইহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম প্রেমের উদ্রেকে যে একটি ভয়ের যে একটী মোহের ভাব উদ্রিক্ত হয় তাহা তাঁহার একটি কবিতা তুলিয়া দিলেই দেখা যাইবে।

পরাণের রাণীরে যখন,
করিবারে যোগ্য সম্ভাষণ,
অধীর হইয়া হৃদি উঠে,
কোন মতে কথা নাহি ফুটে।
আপনা হইয়া যেন হারা,
কেমন কি ভয়ে ভয়ে সারা,
নীরবে দাঁড়ায়ে দূরে রই,
কিম্বা যদি কথাই বা কই
বুদ্ধি মোর ছেড়ে চলি যায়,
কথা কই অর্থ নাহি তায়।

রোম হইতে তাঁহার প্রভু কার্ডিন্যাল ফিরিয়া আসিলে ট্যাসো তাঁহার সহিত ফ্রান্সে যাত্রা করেন—সেই খানে গিয়া লিওনোরার জন্য তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে লিওনোরাকে এই কবিতাটি উপহার দেন।

কবিতার আকর সে পর্ব্বতের শ্রেণী
যথায় তোমার মুগ্ধ আঁখির সামনে
প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি করিছে বিরাজ,
হে সুন্দরী লিওনোরা তাহার মাঝারে
সর্ব্বদাই চিন্তা মোর ভ্রমিয়া বেড়ায়।
সেথাকার সন্ধ্যাচ্ছন্ন কুঞ্জ বনে বনে
চিন্তা মোরে ছুটাইয়ে লয়ে যায় সদা

* * * *

তোমা হতে দূরে এই জনকোলাহলে
থাকিতে চাহে না এই অধীর হৃদয়!

* * * *

অতিক্রমি দূরব্যাপী আলপের শ্রেণী,
অতিক্রমি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ভীষণ,
তোমার নিকটে মোরে কে যায় লইয়া?
কার লাগি বল দেবি কবিতা প্রভাবে
উত্তেজিত হিয়া মোর গাহে এই গান!
বলুক মৃদুল বায়ু কে যে সেই জন!"

ইহাতে প্রকাশের মুক্তকণ্ঠতা নাই, কেমন যেন একটি সঙ্কোচ ভাব, হৃদয়ের অধীরতাকে কমাইয়া দেখাইবার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম প্রেমের সভয় ভাব, কি জানি পাছে কি মনে করে ভাব, লুকাই লুকাই করিয়া প্রকাশ হইয়া গেল—এই যে কি একটি ভাব তাহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার অনেক দিন পরে কবি আর একবার অন্যত্র হইতে লিওনোরাকে যে পত্র লিখিয়াছেন—তাহা ইহা হইতে কত ভিন্ন, তাহাতে হৃদয়ের ভাব কেমন খুলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,

তোমা হতে দূরে এসে প্রেয়সী আমার,
কি যে হল, নাই যেন আগের সে আমি!
একটি আঁধার ছায়া এ আমি গো শুধু,
একটি বিলাপময় শবদ কেবল।
পুরাতন ভাঙ্গা-চোরা প্রাসাদে আহত,
রোদনের এক টিলো প্রতিধ্বনি যেন।
তোরি দান—এ যাতনা আর তো সহে না,
কত না আগ্রহ ভরে ডাকি মরণেরে।

ট্যাসো প্রকাশ্যে কি কবিতায় কি কথায় অন্যের নিকট কখনো তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে জানিলে সেই প্রেমের পবিত্রতা নষ্ট হয়, এই ভয়ে অতি যত্নে পরস্পরের হৃদয়ের নিভৃত দেশে তাহা লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেন। লিওনোরার একটি পত্রে কবিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"প্রেম আর সুপবিত্র আকুলতা হতে,
লো কবিতা শোন তুমি জনম তোমার।
যাওগো গোপনে তুমি তাঁর শুভ্র হাতে,
একটি প্রার্থনা গিয়ে কোরো তাঁর ঠাঁই,
বলিও লুকাতে তোমা হৃদয় মাঝারে,
দেবতা মনেরে যেন না পায় দেখিতে।"

ট্যাসো অন্য সুন্দরীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিনাসঙ্কোচে প্রশংসাগীতি লিখিতে পারিতেন, কিন্তু যেখানেই প্রকাশ্যভাবে লিওনোরার প্রশংসা করিতে গিয়াছেন সেখানে যেন সভয়ে সঙ্কোচে অতি ধীরে ধীরে সে নামটি উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি তুচ্ছ

হইতে তুচ্ছ হইয়া স্বর্গ হইতে উচ্চ সামগ্রীর প্রতি চাহিতেছেন এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তাহার কবিতার মধ্যে এক জায়গায় যখন বলিতেছেন—তিনি লিওনোরার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—অমনি যেন তাহাতে লোকে কি ভাবিবে ভয় পাইয়া সে "মুগ্ধে"র প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া কহিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ের প্রগাঢ় মান্য ভক্তি ভাব দ্বারা কখনো প্রেমের ভাব মনে উদয় হয় নাই, হয়তো সে বাধা না থাকিলে প্রেম হইতে পারিত!"

তিনি পিত্রার্কের ধরণে প্রণয়িনীকে ঊষা সম্বোধন করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছেন লিওনোরার নাম ঢাকিয়া কোন সুন্দরীর প্রতি উল্লেখ করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাবের অনেকটা স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—কিন্তু লিওনোরার প্রকাশ্য প্রশংসাগীতিতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ছায়ার মত পড়িয়াছে মাত্র। অন্য সুন্দরীদের নামে এমনি অসঙ্কোচে কবিতা লিখিতে পারিতেন যে তাহার জীবনী-লেখকেরা কেহ কেহ তাহাদের প্রণয়িনীরূপে ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু লিওনোরা সম্পর্কে এই সঙ্কোচ ভাবই তাঁহার প্রেমের জ্বলন্ত পরিচয় তাহা বোধ হয় প্রণয়ী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। একদিকে হৃদয়ের কথা লুকাইতে ইচ্ছা, অন্যদিকে হৃদয় আবেগে তাহা প্রকাশ করিবার বাসনা, অন্য সুন্দরীর নামের আশ্রয় লইয়া হৃদয়ের এই দুই ইচ্ছাই তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। অন্যের নামে তিনি লিওনোরাকেই ধ্যান করিয়াছেন।

ফেরারা সভায় আসিয়া তিনি প্রথমে লিওনোরাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত লিওনোরার পরের সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতেছেন। তিনি অনেক স্থলে ঊষা নাম দিয়া লিওনোরাকে আঁকিয়াছেন—এখানেও আবার ঊষাকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপে লুকাইয়া লুকাইয়া তিনি যেন লিওনোরাকে আঁকিতে বড়ই আমোদ পাইতেন। তাঁহার কবিতার যথার্থ দেবী কে, অন্যেরা তাহা জানিত না। তিনি আবেগের সহিত লিখিয়া সাধ মিটাইতে পারিতেন। জিরুজিলামের দ্বিতীয় সর্গে কবি সফ্রোনিয়া নামে লিওনোরার যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতে লিওনোরাকে সকলেই চিনিতে পারে। সেই পূর্ণযৌবনা সৌন্দর্য্য-গর্ব্বহীন, উন্নত মহানমনা, অনবরত আপন গুণরাশি ঢাকিতে যত্নশীলা, মনুষ্যের প্রশংসা এড়াইতে নির্জ্জন বাসিনী কুমারীর ছবিতে সকলেই লিওনোরাকে দেখিতে পায়। যখন সফ্রোনিয়া লজ্জাবশত মুখের সৌন্দর্য্য ঢাকিতে ঘোমটায় মুখাবৃত করিয়া পথে চলিতেছেন, সেই সলাজ সৌন্দর্য্যে দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া চলিতেছেন, তখন সকলেই মোহিত হইয়া তাহাকে দেখিতেছে, কিন্তু তাহার যুবা প্রণয়ী অলিন্দোকে কেহই দেখিয়াও দেখিতেছে না। ট্যাসো সফ্রোনিয়াকে যেমন সুন্দরী করিয়াছেন অলিন্দোকে তেমনি লাজুক ও নম্র করিয়াছেন। অলিন্দো সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে সারা, কোন আশা ভরষাই তাহার মনে স্থান পায় না। এই অলিন্দোকে উপলক্ষ করিয়া যে ট্যাসো

নিজের বর্ণন করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

ট্যাসো অভাগা হইলাও এক বিষয়ে সুখী ছিলেন। দান্তের বিয়াত্রিচে পিত্রার্কের লরা তাঁহাদের আশাতীত, অপ্রাপ্য। তাঁহারা কেহ প্রেমের কখনই প্রতিদান পান নাই, কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয় ট্যাসো লিওনোরার নিকট প্রেমের প্রতিদান পাইয়াছিলেন। লিওনোরা চির জীবন বিবাহ করেন নাই, এক জন রাজপুত্রের সহিত যখন তাঁহার বিবাহের কথা হইল, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহা ছাড়া এক জন প্রণয়িনীর প্রত্যেক ভাবে প্রত্যেক কটাক্ষে কপোলের প্রত্যেক লজ্জা রঞ্জিত রেখায়, অধরের মৃদু হাসিটিতে একটি ছোট দীর্ঘ নিশ্বাসে পর্য্যন্ত হৃদয়ের প্রেম কাব্য পড়িতে পারে।

ট্যাসোর একটি কবিতা হইতে লিওনোরার হৃদয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন—

এক দিন প্রাণের সে ললনা আমার,
আছিলেন দাঁড়াইয়া অলিন্দের পরে
কি জানি কি মোহবশে হইয়ে অজ্ঞান,
রাখিলাম হাতটি সে হাতের উপর।
অমনি চমকি পুনঃ হাত সরাইয়ে
বলিনু, শোনগো, যদি দোষ করে থাকি
অপরাধী ক্ষমা চায় ক্ষম গো আমারে।
অমনি মধুর স্বরে উত্তরিল বালা
"অপরাধী বটে তুমি, হইয়াছ রোষ!
এক বার হাতে হাত ক'রে সমর্পণ,
পুন সরাইলে কেন, এই অপরাধ!"

দু একটি কথা বটে, নহেক অধিক,
কিন্তু কি মধুর হায় কিবা সোহাগের!
যেমন আদর মাখা—তেমনি মধুর,
যেমন মধুর মরি তেমনি প্রেমের।
যা শুনিনু তা যদি গো নাহি হয় ভুল
চির কাল প্রাণ প্রণে করিব যতন
সে হৃদয়ে করিবারে সন্তোষ বিধান।
কখনো এমন কাজ করিব না কিছু,
যাতে তার তিলমাত্র হয় অসন্তোষ।"

এই প্রতিদানেই যে ট্যাসোর হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি আরো চাহিতেন, তাঁহার উচ্চ আশা আরো ঊর্দ্ধে উঠিত। অনেক সময় লোক দেখাইয়া প্রকাশ্যে ট্যাসোর সহিত লিওনোরার তাচ্ছিল্য ব্যবহার করিতে হইত। যে লিওনোরা এক জন রাজপুত্রকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেন না—তিনি এক জন সামান্য সভাসদের অনুরাগী ইহা কিরূপ ঘৃণার্হ। লিওনোরার এই জন্য অনেক সামলাইয়া চলিতে হইত। কিন্তু প্রেম প্রতি পদে ভয় পায় প্রতি পদে আহত হয় প্রতি পদে সন্দেহ করিতে চায়। বুঝি বা আহত হইয়া, সন্দেহ করিয়াই কিছু সুখ আছে, বুঝি প্রেম প্রেমের নিকট মিথ্যা কাঁদিয়া প্রেমকে মিথ্যা কাঁদাইয়া সুখ পায়। ট্যাসো লিওনোরার নিষ্ঠুরতায় অভিমান করিয়া যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন—তাহা বুঝি ঐরূপ হৃদয়ভাব হইতেই জন্মিয়া থাকিবে। একবার অভিমান করিয়া আট নয় মাস লুক্রেসিয়ার নিকট গিয়া বাস করিয়াছিলেন—সেইখান হইতেই লিওনোরাকে পূর্ব্বের কবিতাটী লেখেন—

তোমা হতে দূরে এসে
প্রেয়সি আমার! ইত্যাদি।

ট্যাসো কার্ডিন্যালের সহিত আসিয়া কি করিয়াই বা ফেরারার ডিউকের সভাসদ হইলেন, কি করিয়া তাঁহার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

টাসো প্রভু কার্ডিন্যালের সহিত যখন ফ্রান্সে যাত্রা করেন—সেইখানে কোন কারণে তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। সেই জন্য ট্যাসো কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া আবার ফেরারায় আগমন করেন। ভগিনীদের অনুরোধে আলফঞ্জো তাঁহার জন্য মাসিক ১৫ ক্রানে মুদ্রা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ট্যাসো নির্ভাবনায় কবিতা দেবীর ধ্যান করিতে সমর্থ হইলেন। অ্যামিন্টা নামে একখানি কাব্য লিখিয়া মহা খ্যাতি লাভ করিলেন,তাঁহার বিখ্যাত জিরুজিলাম উদ্ধারও ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে শেষ হইল, তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ডিউককে তাহা উপহার দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ট্যাসোর রাজ সভায় এই খ্যাতি প্রতিপত্তি—সভাশদদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল, তাহারা ট্যাসোর নামে ডিউকের নিকট নানা কথা বলিতে লাগিলেন এই খান হইতেই ট্যাসোর দুর্দ্দশার আরম্ভ হইল। জিরুজিলাম ছাপাইয়া ডিউককে উপহার দিবার পর তিনি রোম যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তখন ছাপাইবার যো ছিল না, ডিউককে উপহার দিতে হইবে, সুতরাং অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে দেখাইয়া তাঁহাদের কথামতে ইহার দোষগুণ সংশোধন করা আবশ্যক। তিনি রোমীয় পণ্ডিতদিগকে জিরুজিলাম দেখিতে দিলেন। নানা মুনির নানামত, দুএকজন এত দোষ ধরিতে লাগিলেন—যে সে সকল বদল করিলে তাহার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। কবির মনে ইহাতে কিরূপ আঘাত লাগিতে পারে তাহা কবি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। বসন্তকালে সংশোধন আরম্ভ করিয়া শরৎকালে প্রথমবার সংশোধন হইল, ছাপাইবার এই বৃথা বিলম্বে ট্যাসো অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া রোমে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অলফঞ্জো জিরুজিলাম উপহার পাইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন—ট্যাসো অন্য কাহারো আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাছে সে উপহারে বঞ্চিত হন—সেই জন্য তাঁহার সে ইচ্ছা ছিল না,তথাপি ট্যাসোকে অগত্যা সম্মতি প্রদান করিলেন। রোমের কার্ডিন্যাল ফার্ডিন্যাণ্ড জর্ম্মানির ভবিষ্য গ্র্যাণ্ড ডিউক আপন সভায় ট্যাসোকে রাখিতে চাহিলেন। ট্যাসো যদিও সভাসদদিগের দ্বেষহিংসায় জ্বলিয়া ও অন্যান্য কারণে ফেরারা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণ তাঁর ফেরারায় পড়িয়াছিল। কার্ডিন্যালের প্রস্তাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার ফেরারায় ফিরিয়া আসিলেন। এই কার্ডিন্যালের সহিত আলফঞ্জোর শত্রুতা ছিল, কেহ কেহ বলেন আলফঞ্জো যেরূপ প্রতি-হিংসা প্রিয়—এই শঙ্কে-

তেই ট্যাসোর ভবিষ্যৎ কষ্টের মূল হইল।

ফেরারাতে থাকিয়া দিন দিন যে ট্যাসো দ্রুতপদে কষ্টের সোপানে অগ্রসর হইতেছেন ফেরারা ছাড়িলেই যে দ্বেষ হিংসা কোলাহল অতিক্রম করিয়া তিনি স্বাধীন হইতে পারেন ইহা ট্যাসো বুঝিতে পারিলেন, অথচ বুঝিয়া ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তাড়াইতে অক্ষম। কতবার তিনি চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করেন, অথচ কি এ মোহ—ডিউকের দুএকটি অনুগ্রহ কথায়, লিওনোরার একটু মৃদু হাসিতে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, প্রতি মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি পরাস্ত হন। একদিন পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ভগিনীদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন—লুক্রেসিয়া তাঁহাকে যাইতে বারণ করিলেন লিওনোরা বলিলেন"—আমার মাতার মৃত্যুতে আমার আর বাড়িয়াছে, আমি তোমাকে এখন সাহায্য করিতে পারিব" লিওনোরার এই স্নেহ বাক্যে কবির বজ্র সঙ্কল্প টলিয়া গেল—তিনি আর যাইতে পারিলেন না। ফেরারাতে বসিয়া আবার জিরুজিলাম সংশোধন আরম্ভ করিলেন—আবার নিষ্ঠুররূপে তাঁহার কবিতার পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল—এই সময় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল—তাঁহার এক প্রবঞ্চক বন্ধু তাহার বাক্স ভাঙ্গিয়া কাগজপত্র চুরি করিয়া লইল (অনেকে সন্দেহ করেন এই বন্ধুই তাঁহার প্রেমের কথা রাষ্ট্র করিয়াছিল) তাহার কিছু দিন পরেই ইটালির ভিন্ন ভিন্ন নগরে জিরুজিলাম ছাপা হইয়া বাহির হইল এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন—তিনি কত বৎসর ধরিয়া ইহার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, প্রশংসা পাইবার জন্য তাঁহার মন উৎসুক রহিয়াছে, ইহা হইতে আর হয় বার তিনি কত আশা করিতেছেন, সমস্ত আশা ভরষা তাঁহার নির্ম্মূল হইল। এই ছাপা বন্ধ করিবার জন্য তিনি ডিউকের নিকট আবেদন করিলেন, ডিউক পোপের নিকট হইতে এক আজ্ঞাপত্র আনাইয়া দিলেন যে যত যেখানে ছাপা হইয়াছে তাহা সমস্ত ট্যাসোকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ট্যাসোর জিরুজিলামের আবার সংশোধন চলিতে লাগিল। সভাসদগণও তাঁহার শত্রুতা সাধন করিতে লাগিল—সংশোধনকারীদিগের দারুণ নিষ্ঠুরতায় ও শত্রুদিগের দারুণ আঘাতে তিনি মনের শান্তি হারাইলেন—কে কখন তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করে, বুঝিবা তাঁহাকে কে বিষ পান করায়—এই আশঙ্কা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। এই রূপ মস্তিষ্কের রোগগ্রস্থ হইয়াই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক এক দিন তিনি মুক্ত কৃপাণ হস্তে লুক্রেসিয়ার এক ভৃত্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই উন্মত্ততা আরোগ্যের জন্য ডিউক তাঁহাকে তাঁহার বেনিগার্দো প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ট্যাসো বুঝিলেন ডিউক মুখে যাহাই বলুন মনে মনে কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বারম্বার আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া ডিউকের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ হন নাই বলিয়া ডিউক

বারম্বার আশ্বাস দিতে লাগিলেন তাঁহার তথাপি বিশ্বাস হইল না, তিনি ক্রমাগতই ডিউককে পত্র লিখিতে লাগিলেন। ডিউক বিরক্ত হইয়া পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন ট্যাসো আরো ভীত হইলেন, ফেরারা আর নিরাপদ নয় দেখিয়া গুপ্তভাবে সেখান হইতে এক দিন পলায়ন করিলেন। ফেরারাতে ট্যাসো ১২ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ১২ বৎসরের মধ্যে ২।৪ বার মাত্র ফেরারা হইতে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এইবার যে ফেরারা ত্যাগ করিলেন, এই সময় হইতে ইটালীর গৌরব এই ট্যাসো অনাহারে অনিদ্রায় স্বাস্থ্য হারাইয়া সুখ হারাইয়া বায়ু তাড়িত তৃণের মত এক সভা হইতে অন্য সভায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পলাইয়া প্রথমে নেপল্‌সে ভগিনীর বাটীতে আগমন করিলেন। বাল্যকাল হইতে আর তাহাকে দেখেন নাই তথাপি পরস্পরের প্রতি উভয়ের স্নেহ ছিল। কিন্তু কাহারো স্নেহের প্রতি আর তাঁহার বিশ্বাস নাই, অত্যাচারে কষ্টে কষ্টে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি ভগিনীকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মেষপালক বেশে একখানি পত্র লইয়া তাহাকে দিলেন। পত্র খানি যেন ট্যাসো তাঁহার ভগিনীকে লিখিতেছেন। সে পত্রে এমনি করিয়া আপনার দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে পত্রখানি পড়িয়াই কর্ণেলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন তখন তাহার স্নেহে কবির বিশ্বাস জন্মিল।

ভগিনীর যত্নে যখন ট্যাসো প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন তাঁর মনে হইল কি অল্প কারণেই তিনি ফেরারা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আবার ফেরারায় যাইতে ব্যগ্র হইলেন, বন্ধু বান্ধব কাহারো বারণ না শুনিয়া আবার ফেরারায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহারে ডিউকের নিকট অপমানিত হইতে লাগিলেন। ডিউকের নিকট তাঁহার যে পাণ্ডুলেখ্য কবিতা ছিল তাহা চাহিয়া পাইলেন না,—ডিউক ও ভগিনীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ প্রার্থনাও অগ্রাহ্য হইল। চারিদিক হইতে নিরাশ হইয়া অধীর হৃদয়ে তিনি দ্বিতীয়বার গুপ্তভাবে ফেরারা হইতে পলায়ন করিলেন। সুখহীন শান্তিহীন, নিরাশ্রয় মন লইয়া, এ সভা হইতে অন্য সভায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এরূপে আর কত দিন চলিবে; তাঁহার জীবনের ধ্রুব তারা লিওনোরাকে ছাড়িয়া কতদিন আর তিনি আঁধার সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবেন? তাঁহার হৃদয় লিওনোরার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আর থাকিতে পারিলেন না, পতঙ্গ যে মোহ মন্ত্রে অগ্নিতে আকৃষ্ট হয়, যে মোহমন্ত্রে সুরাপায়ী জানিয়া শুনিয়া সুরাতে আত্ম বিসর্জ্জন করে সেই কিসের কি মন্ত্রবলে ট্যাসো ইচ্ছা করিয়া আগুণে ঝাঁপ দিলেন, তিনি অনেক কষ্টে ডিউক আলফঞ্জোর অনুমতি আনাইয়া আবার ফেরারায় আসিলেন। ডিউকের এই সময় দ্বিতীয় বার বিবাহ হইতে ছিল; যখন ট্যাসো প্রাসাদে আসিলেন, তখন বিবাহ উপলক্ষে

সকলেই ব্যতিব্যস্ত। ট্যাসোকে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিল না। বিবাহের পর ট্যাসো ডিউকের ভগিনীদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইল না; ট্যাসো দুঃখে আত্ম বিস্মৃত হইয়া ডিউকের বংশীয়দিগের নিন্দা করিলেন। এত দিন কবিতা পুস্তকে তাঁহাদের যে প্রশংসা করিয়া আসিয়াছেন একটি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাহার মূল্য হারাইলেন। ডিউক ইহা শুনিয়া তাঁহাকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিলেন, এবং উন্মত্ত বলিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সময় হইতে কারাগারে স্বাস্থ্য হারাইয়া কষ্টে প্রতিভা হারাইয়া নিরাশ প্রেমের দলিত হৃদয় লইয়া তিনি কেবল মাত্র একটি দুঃখের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইলেন।

ট্যাসোর কারারোধের কারণ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী লেখকদিগের মধ্যে এক মত দেখা যায় না। সিরসি বলেন, ট্যাসো দ্বিতীয়বার ফেরারাতে আসিয়া আলফঞ্জোকে যে কটু বাক্য বলেন তাহাতেই ডিউক তাঁহাকে বন্দী করেন। ব্যাক বলেন কবির বাতুলতার জন্যই ডিউক তাঁহাকে বন্দী রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কবির পরম বন্ধু মাঞ্জো ইহার কারণ কিছুই খুজিয়া পান না, উইকেল বলেন, শত্রু বংশীয় কার্ডিন্যাল ফার্ডিন্যাণ্ড মেভিবির আশ্রয় প্রার্থনা করাই ট্যাসোর কারারোধের কারণ। এইরূপে অনেক জীবনী লেখকেরা অনেক রূপ কারণ নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু রসিনী বলেন, লিওনোরার সহিত প্রেমই তাঁহার বন্ধনের কারণ। রসিনির কথাতেই সমস্ত ঘটনার সহিত মিল পাওয়া যায়। যখন ট্যাসো নেপল্‌স্ হইতে আবার ফেরারায় ফিরিয়া আসিলেন, ডিউক তাঁহার কাগজ পত্র তাঁহাকে কিছুই ফিরাইয়া না দিয়া বলিলেন—তুমি এখন পড়া শুনা করিতে পাইবে না—তোমার রোগের চিকিৎসা করাইতে হইবে। ট্যাসো শুনিয়া পলায়ন করিলেন, তাহার পর আবার যথাযোগ্য সম্মান দিতে সম্মত হইলে ফেরারায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তখন সামান্য ভৃত্য দ্বারা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপমানিত করা হইতে লাগিল। অভিসন্ধি এই যে, এই অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া ট্যাসো এমন কিছু কাজ করুন যাহাতে উন্মত্ত বলিয়া আলফঞ্জো কারারুদ্ধ করিবার সুবিধা পান।

প্রধানতঃ ট্যাসোর পত্র এবং গীতি হইতে রোসিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে ট্যাসোর সহিত লিওনোরার প্রেমই কবির বন্ধনের কারণ। এই জন্যই আলফঞ্জো ট্যাসোকে পাগল প্রমাণ করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কবি কারারুদ্ধ অবস্থায় লিখিতেছেন

"যিনি দিয়াছেন মোরে সুখ ও যন্ত্রনা
তাঁ হ'তে আমার এই সুদীর্ঘ বন্ধন।

আর এক জায়গায় ফেরারা হইতে পলাইয়া আবার ফিরিয়া আসিবার কারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

কোন্ তারা আনিল এ পথ দেখাইয়া!
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে এ হিয়া যখন
চাহিল স্বাধীন হ'তে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কে সে মোরে কোন্ তারা ছলনা করিয়া

আশ্বাসি আনিল হেথা নিরাশ করিতে!"

লিওনোরা যে তাঁহার বন্ধনের কারণ তাহা ট্যাসোর কবিতা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়।

রোসিনি কবির এক পত্র হইতে প্রমাণ করিয়াছেন—ডিউক ট্যাসোর এক বিশ্বাসী লোকের নিকট এই প্রেমের কথা শুনিয়া ট্যাসোকে পাগলামি ভান করিতে বলেন, ডিউকের আজ্ঞাতেই তিনি লুক্রেসিয়ার ভৃত্যকে মারিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং পরে যখন বন্দী হইলেন, তখন ডিউকের শিক্ষিত কারারক্ষকেরা এই পাগলামির কথা রাষ্ট্র করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ট্যাসো ভয় পাইয়া নেপল্‌সে পলায়ন করিলেন। কিন্তু চারিদিকে তাঁহার উন্মত্ততার কথা রটিয়া গেল, ডিউক তাঁহার চিকিৎসার জন্য বাছিয়া বাছিয়া ইচ্ছামত চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। নেপল্‌স হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি চিকিৎসার জন্য বন্দী হইলেন, অথচ চিকিৎসকেও তাঁহাকে দেখিত না, এবং নানাপ্রকার খুটিনাটিতে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা হইত। যখন সফোক্লীস উন্মত্ততা অপবাদে বন্দী হইতে অস্বীকৃত হইলেন তখন সকলে তাঁহার রোগহীনতার প্রমাণ চাহিল—তিনি তাঁহার ইলেক্ট্রা দেখাইলেন, ট্যাসোও তেমনি তাঁহার কারাবাসের প্রত্যেক মাসেই তাঁহার রচনা দ্বারা উন্মত্ততার অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। সে রচনায় কাহারো সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। ট্যাসো সেই যে বন্দী হইলেন, ৭ বৎসর কাল সেই অবস্থা সহ্য করিতে হইল, শত শত প্রার্থনাতেও আলফঞ্জোর কঠোর মন গলিল না। বন্দী হইবার অনেক দিন পরে আবার ট্যাসোর লিখিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল, তিনি মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন, দুই বৎসর পরে সমস্ত কবিতা গুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া দুই ভগিনীকে এই বলিয়া উপহার দিলেন, "এই যে সকল কবিতা আমার কষ্টের শেষ বৎসরে রচিত তাহা আপনাদের অর্পণ করিলাম, মনুষ্যের বিদ্বেষ এবং ভাগ্যের কঠোরতা কেহই আমার নিকট হইতে পূর্ব্ব স্মৃতি এবং আপনাদের অদর্শন-কষ্ট অনুভব করিবার ক্ষমতাকে কাড়িতে পারে নাই—আপনারা সুখে থাকুন—এই প্রার্থনা!—" লুক্রেসিয়া ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইলেন, কিন্তু লিওনোরার আর ইহা পড়িয়া অশ্রু ফেলিতে হইল না। তিনি এই সময় শয্যাশায়ী ছিলেন, ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ট্যাসোর জীবন মৃত্যু সমস্তই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। তিনি এই সময় একটি শূন্য অন্ধকার জীবন বহিয়া রহিলেন। ট্যাসো রাজ সভায় অন্যান্য কবিদের ন্যায় লিওনোরার মৃত্যুতে ভূরি ভূরি কবিতা উপহার দেন নাই। কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া যাহা দুএকটি লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মর্ম্মভেদী কষ্টের পরিচয় প্রদান করে—মরিবার অল্পদিন পরেই কবি লিখিয়াছেন—

যে আগুনে ভস্মীভূত হৃদয় আমার,
এখনো যাহার কণা যতনে লুকায়ে,
রেখেছি পুষিয়ে এই ভস্মের মাঝারে—

সে অগ্নি নিভিয়ে এই মর্ত্তধাম হতে,
প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে পুণ্য স্বর্গ পুরে।
ছড়ায়ে নিকুঞ্জ বনে শুভ্র হিম রাশি
নিশীথিনী কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা দিয়া
যখন ঢাকিয়া ফেলে দিবসের মুখ,
তখন দেখিতে পাই আলোটি আমার
প্রণয় পূরিত আঁখে দীপ্তি পরকাশি
চৌদিকে মধুর-ভোগ্য উত্তাপ বিতরে।
মধুর অনল মোর গত জীবনের
সুন্দরী তারকা রূপে বিরাজ গগণে,
যখন আছিলে হেথা যদি গো কখনো
করে থাক অভাগার ভাগ্যকে শাসন,
দূরের বা নিকটের প্রতি পদক্ষেপ
যদি তোমা হতে হয়ে থাকে নিয়ন্ত্রিত,
এখন তবে গো, তুমি অমর দেবতা,
আঁধার তরঙ্গ মাঝে পর্ব্বত আহত
শ্রান্ত এই তরীটিকে পথ দেখাইয়া
শান্ত বিশ্রামের কোলে যাও গো লইয়া।"

তিনি যে সারা জীবন লিওনোরাকে ভুলিতে পারেন নাই তাঁহার শোকের তীব্রতা কমিয়া গেলে বহুদিন পরে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাহা বুঝা যায়।

হৃদয়টি তুইরে আমার,
মধুময় জীবন আমার,
কবে যাব সেই প্রিয় স্থানে
কিম্বা শুধু নিকটে তাহার!
কত দূরে—দূরে থেকে তবু
আছিনু নিকটে কত তার!
সেইরূপ রব পুনঃ গাঁথা
যেথায় ও মদির আঁখির—
কটাক্ষ একটি প্রেম ভরা,
দু'একটি দীর্ঘশ্বাস আর,
একটি সে হাসি প্রাণহরা,
একটু আদর সম্ভাষণ,
একটু সে সোহাগ মমতা,
দু একটি শুধু দু একটি,
হৃদয় জুড়ান প্রেম কথা
আমার এ দীর্ঘ যন্ত্রণার,
হইবে হইবে পুরস্কার।
অথবা যন্ত্রণা নব নব
সেখানেও আছে অপেক্ষায়,
শিকল রজ্জু বন্ধন, তীর বাণ হুতাশন
বাঁধিবে, বিঁধিবে পুনঃ দহিবে আমায়।

কষ্টে কষ্টে ট্যাসোর এই রূপে জীবন কাটিতে লাগিল। তাঁহার স্বাধীনতা হারাইলেন, তাঁহার লিওনোরা হারাইলেন আবার অল্পদিন মধ্যে তাঁহার রচিত কাব্যেরও অধিকার হারাইলেন। লেখকের বিনা অনুমতিতে অনেকে জিরুজিলাম ছাপাইয়া ধনী হইতে লাগিল। ২।১ বৎসরে মধ্যে তাহার ৭ সংস্করণ হইল, এবং ৬ বৎসরের মধ্যে বহু সংস্করণ হইল, লোকে তাহা এত চাহিতে লাগিল যে মুদ্রা যন্ত্রের তাহা যোগাইয়া উঠা দায় হইল। অন্যে এইরূপে ট্যাসোর পুস্তকে ভাগ্যবান হইতে লাগিল, আর ট্যাসো ডিউকের নিষ্ঠুরতায় কারা রক্ষকদিগের অত্যাচারে নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ট্যাসো এই সময় তাঁহার বন্ধুকে দুঃখ করিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন "যদি তিন বৎসর আগে এই বই

ছাপাইতে আমি অনুমতি পাইতাম তাহা হইলে আমি ধনাঢ্য হইতাম এখন প্রাপ্য ধন হইতে সকলেই আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।" কিন্তু পুস্তক প্রকাশে ট্যাসোর অন্য প্রকারে উপকার হইতে লাগিল। যতই ট্যাসোর প্রশংসার জয়ধ্বনিতে দেশ পূর্ণ হইতে লাগিল তত বাধ্য হইয়া ডিউককে ট্যাসোর কারাগারের কঠোরতা কমাইতে হইল। ৭ বৎসর কাটিয়া গেল তাহার পর অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের অনেক রাজ বংশীয়গণের অনুরোধে ডিউক ট্যাসোকে কারামুক্ত করিলেন। ইহার পর ট্যাসো ৭।৮ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। দু এক খানি কাব্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন, ঘৃণা কি বিদ্বেষ তাঁহার আর কিছুই ছিল না।—১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইল। তাহার পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার নাম হইতে লিওনোরার নাম কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। ডিউক নিষ্ঠুরতার দ্বারা যাহা ঢাকিতে গিয়াছেন, কবির নামের সহিত তাহা অমর হইয়া রহিয়াছে। কবি সত্যই বলিতে পারেন

No power in death can tear our names apart,
As none in life could rend thee from my heart.
Yet, Leonora, it shall be our fate,
To be entwined for ever but too late.

আর দু একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধটি শেষ করা যাউক। কারাগার মুক্ত হইয়া ট্যাসো মান্যোয়ার ডিউকের সভায় ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম যাত্রা করেন, রোমে তাঁহাকে লরেল মুকুট পরাইয়া কবি সম্মান দিবার জন্য দুই দুই বার দিনস্থির হয়, কিন্তু পীড়া প্রভৃতি অন্য কারণে দুই বারই তাহা স্থগিত থাকে। তাঁহার জীবদ্দশায় আর সে সম্মান ঘটিয়া উঠে নাই। মৃত্যুর পর যেরূপ মহা সমারোহে তাঁহাকে লরেল মুকুট প্রদান করা হইল, তাহা দেখিতে পাইলে হয়তো তাঁহার কষ্ট অনেক সমিত হইত। পিত্রার্কার পর ট্যাসো এই দ্বিতীয় বার লরেল মুকুট ধারণ করিলেন।

ট্যাসোকে দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার লাবণ্যশালী সুন্দরবর্ণ কষ্টে কষ্টে পাংশুতা প্রাপ্ত হইয়াও তাহার সৌন্দর্য্য একেবারে লোপ হয় নাই। তাঁহার মস্তক বৃহৎ তাঁহার কপাল সুপ্রশস্ত ও উন্নত। শেষাশেষি তাঁহার বৃহদায়তন সুন্দর মস্তকের মধ্য ভাগ কেশ হীন হইয়া পড়িয়া ছিল। তাঁহার সুনীল বৃহৎ চক্ষুর গম্ভীর দৃষ্টি প্রায়ই ঊর্দ্ধে নিপতিত হইত—তাঁহার পাংশু বর্ণ ক্ষীণ ওষ্ঠাধরের মধ্যে ঈষৎ দীর্ঘ মুক্তাশ্বেত ঘন নিবদ্ধ দন্ত শোভা পাইত। তিনি প্রায়ই হাসিতেন না, তবে যখনি হাসিতেন, অতি ধীরে অতি নিঃশব্দে। তাঁহার স্বর পরিষ্কার সুমিষ্ট ছিল, কথা কহিতে কহিতে প্রায়ই তিনি শেষ কথায় ঝোঁক দিতেন। তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ ও সুগঠন ছিল। তাঁহার সমস্ত অবয়বে বিশেষতঃ মুখে একটি গম্ভীর উন্নত ভাব ও আকর্ষনী শক্তি প্রকাশ

পাইত। তিনি স্বভাবতঃ সাহসী ছিলেন ও বিপদের সময় অটল থাকিতেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য হইতে মানসিক সৌন্দর্য্য অধিকতর প্রশংসনীয়। সরল ভাব সত্যনিষ্ঠা, নম্রতা, মিত্রভাব, কৃতজ্ঞতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা এই সকলই প্রচুর রূপে তাঁহাতে নিহিত ছিল। প্রতিশোধ-স্পৃহা ঘৃণা বিদ্বেষ ভাব হইতে তিনি একেবারে দূরে ছিলেন। তিনি অবজ্ঞা সহ্য করিতে পারিতেন না,এই বিষয়ে তিনি অনেক সময় বৃথা ভয়ে ভীত হইতেন। তিনি যেমন অবজ্ঞা সহিতে পারিতেন না,তেমনি অন্য কাহাকে অজ্ঞাত ভাবে অবজ্ঞা করিয়াছেন ভাবিলেও মুক্ত কণ্ঠে মার্জ্জনা চাহিতেন, তাহাতে তাঁহার অপমান মনে হইত না। ট্যাসোর জীবনী লেখকগণ একবাক্যে বলেন ট্যাসো অন্যরূপ যতই কষ্ট পাউন না কেন জীবনে এমন কোন কাজ করেন নাই যাহাতে তাঁহাকে অনুতাপের কষ্ট সহিতে হয়। ট্যাসো সচ্চরিত্রের একটি আদর্শ ছিলেন।

স্বঃ—

গাথা।

১

পাতার কুটীরে সরসীর ধারে
ছিল গো তাহার বাস,
উজল নয়ন, ভুরু-ধনু বাঁকা
আঁধার কেশের রাশ।

২

রাজহংসী দুটি সহচরী তার,
পুকুরের ধারে খেলা,
প্রভাত সমীরে, চাঁদের কিরণে,
মলিন সাঁঝের বেলা।

৩

কমল কোরকে ফুঁদিয়ে ফুটাত
ফেলিত সরসী জলে,
রাজহংসী দুটি দুলিয়া দুলিয়া
দিত আনি পদতলে।

৪

কখন ডুবিত মরালে বঞ্চিয়া
সরসীর কাল জলে,
মরাল দুইটি সোণার কমল
তুলিত ধরিয়া চুলে।

৫

কখন বসিত ঘাট আলো করি
দুধারে মরাল দুটি,
অমল বঙ্কিম মৃণাল গ্রীবায়
বাহুর মৃণালে আঁটি।

৬

কোথা হ'তে এল জানি না গো মোরা
বালিকা রূপের রাণী ;
মরাল দুইটি মানস সরসে
খেলিত গো অনুমানি।

৭

যদিও বালক মোরা দুই জনে,
বালিকা সেও গো ছিল,
হয় নাই কভু তরল শৈশবে
শিশুতে শিশুর মিল।

৮

যদিও কোমল বালিকা বয়স,
ছিল রাজরাণী ভাণ
গ্রীবার ভঙ্গীতে, বাহুর ইঙ্গিতে,
ধরার ঈশ্বরী জ্ঞান।

৯

গলাগলি করি থাকিতে যদিও
চাহিত আমার প্রাণ,
ছুঁই নাই কভু সেই বরবপু—
ত্রিপাদ অন্তরে স্থান।

১০

বদন হেরিতে নয়ন পিপাসা,
আকুলিত হ'ত হিয়া,
মুখ তুলে কভু হেরিতে পারি নে
উজল নয়ন বিভা।

১১

দূর হ'তে তারে বাসিতাম ভাল,
গাহিতাম প্রেম গান,
মনে করিতাম ধরিয়া দু-করে
বলিব কি চাহে প্রাণ।

১২

কাছে গেলে পুনঃ কি যেন বিভ্রমে
হ'তেম আপনা হারা,
জড়াইত বাণী, বাধিত চরণ,
চকিত পাগল পারা।

১৩

মাধবো তাহারে বাসিত গো ভাল
লুকায়ে বলিত মোরে ;—
নিতি নিতি মোরা হাত ধরি ধরি
যেতেম সরসী তীরে।

১৪

আগেতে কখন কহিতে গো কথা
পারি নে—পারি নে মোরা ;
থাকিতাম দূরে বিহ্বল নয়নে
হৃদয় আবেগ ভরা।

১৫

কাল কেশ তলে কভু মুখখানি
ঊষার হরষ বেশ,
আবার কখন বিষাদ মাখান,
পূর্ণিমা যামিনী শেষ।

১৬

নয়ন ইঙ্গিতে ধাইতাম মোরা,
পড়িতাম গিয়া জলে,
আনিতাম ফুল লুটিয়া কানন
রাখিতাম পদতলে।

১৭

হংসীদের মত আমরাও দুটি—
মাধব আমি গো আর ;
কেবল ছুঁইতে সে মোহন বপু
ছিলনাক অধিকার।

১৮

যদি গো কখন আবেগের ভরে
ধরিতাম দুটি করে,
ডাগর নয়নে সে থির সন্ধান
আকুল করিত মোরে।

১৯

শুনিতাম কভু নিশীথ বাতাসে
আঁধার কুটীরে বসি
বালিকা গাহিছে কানন মাঝারে
জোছনা পড়িছে খসি।

২০

জোছনাটি যদি গাহিতে জানিত
গাহিত সে সেই গান,
কুসুম বালারে ডাকিয়া ডাকিয়া
বিলায়ে এলান প্রাণ।

২১

ধীরে ধীরে ওগো সেই গান টুকু
খুঁজিয়া বেড়ায় কারে—
কি যেন গিয়েছে কাহারে ডাকিছে
ছায়াময় আধস্বরে।

২২

গাহিত বালিকা তটিনী তীরেতে
প্রাসাদ সুষমা ভায়,
সারস শোভিত বিমল সরসী,
নলিনী ভাসিছে তায়।

২৩

নিশীথিনী মায়া-পুরীর হৃদয়ে
স্বপন সঙ্গীত কত ;—
খুদে ছেলেটির ঘুমন্ত অধরে
মায়ের স্তনের মত।

২৪

খেলিতাম কভু অপরূপ খেলা,
বালিকা ধরার রাণী
স্বয়ম্বরা হবে কানন মাঝারে
রটাতেম এই বাণী।

২৫

বলিত বালিকা আসিবে কুমার
ধবল করীতে চড়ি,
করপদ্ম করে লইবে হাসিয়া
ভেটিবে গো রাজপুরী।

২৬

কাঁদিতাম মোরা বিরলে দুজনে
তাহার প্রণয় কামি'
সোদর মাধব নহে গো তাহার
স্বজন নহি গো আমি।

২৭

এখনো কুমার এলনা এলনা
বালিকা গাহিত গান
মরাল দুইটি মধুর নিনাদে
তানেতে মিলাত তান।

২৮

একদিন হায় শুনিনু কাননে
বহুল পদের ধ্বনি,
ছুটিনু দুজনে যথা বাস করে
বালিকা রূপের রাণী।

২৯

শ্বেত হস্তী দেখি , কুটীর দুয়ারে
সুসজ্জিত পৃষ্ঠদেশ,
তাহার উপর ভানুর মতন
প্রদীপ্ত মোহন বেশ

৩০

রাজার কুমার ; পাশেতে তাহার
মোদের বালিকা রাণী,
কতই হরষে কহিছে দুজনে
কতই-কতই বাণী।

৩১

শ্বেত হস্তী চলে লইয়া দম্পতি
যায় গো যায় গো চলি ;
আসিবে না আর ? ফিরিবেনা তারা ?
কে আমারে দেবে বলি।

৩২

যায় যায় যায় কুমার সহিত
হরষে মোদের রাণী,
চাহিল না ফিরে বলিল না মোরে
ভুলিয়া একটি বাণী।

৩৩

হায় হায় হায় মানস সরসে
উড়িল মরাল দুটি,
আমরা দুজনে কাঁদিতে কাঁদিতে
ধরায় পড়িনু লুটি।

৩৪

মাধব পীড়িত মলিন শয্যায়,
ক্ষীণ তনু দীন প্রাণ,
আমি গো বেড়াই নগরে প্রান্তরে
খুঁজি খুঁজি সব স্থান।

৩৫

হৃদয়ে আবেশ, নয়নে স্বপন,
অভাব জগতময়,
পাগলের স্বরে গগন বিদারি
অনল হিল্লোল বয়।

শ্রী প্রিয়নাথ সেন।

ফুলের মালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গণিয়া গণিয়া দিন ফুরায়, গণিয়া গণিয়া মাস যায়, গণিয়া গণিয়া বৎসর আসে। এমন সুখী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে, যাহাদের দিন গণিতে হয় না। অধিকাংশ লোকেই এত দুঃখী যে দিন গণিয়াও তাহাদের দিন ফুরায় না। কিন্তু ভাবুকের কল্পনায় এবং লেখনীর মায়া বলে শত শত বৎসর নিমেষে কাটিয়া যায়। মুহূর্ত্ত হইতেও অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পঞ্চদশ বর্ষের পরবর্ত্তী ঘটনায় আসিয়া পড়িলাম। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন আধুনিক মান্দ্রাজ সহর হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত বিজয় নগরাধীপদিগের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দাক্ষিণাত্যের যবন রাজত্ব এই রাজ্যের অতি সন্নিকট। কাছাকাছি হইলে যেমন হইয়া থাকে, অতি অল্প খুটিনাটিতে উভয়ের বিবাদ বাধিয়া সংগ্রামে তাহার নিষ্পত্তি হয়। এইরূপ সংগ্রামে, বিজয়নগরাধীপগণই প্রায় জয় লাভ করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্য ইহাঁদের দ্বিতীয় নাম নরসিংহ। হোসেনগঙ্গের কুলপ্রদীপ আজিমগঙ্গ কুলবর্গের সিংহাসনে বসিয়াছেন, তিনি দেবরায়ের সহিত বিবাদ বাধাইবার সূত্র পাত করিলেন। একদিন মদ্য পানে উন্মত্ত অবস্থায়, স্তুতিকারকদিগের যোগ্য পুরস্কার খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাদিগকে বিজয়নগরে প্রেরণ করিলেন, স্বকোষ হইতে পুরস্কৃত করিবার জন্য দেবরায়ের উপর এক অনুজ্ঞাপত্র জাহির করা হইল। এই পত্র পাইয়া দেবরায় কিরূপ জ্বলিয়া উঠিলেন—বলা বাহুল্য। কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া যাইতে পারে, তাহা লইয়া রাজসভায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

দেবরায় বিচারাসনে বসিয়াছেন, তাঁহার সরল মুখমণ্ডলে ক্রোধের রেখা পড়িয়াছে চিন্তাবিহীন সদা উৎফুল্লময় মুখ কান্তি অপমানের তীব্র ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, হাস্যময় ওষ্ঠাধর হইতে হাসির রেখাটি মুছিয়া

গিয়া কেমন অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। ক্রুদ্ধ দেবরায় মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি স্পর্দ্ধা দেখ দেখি! তাহাদের কারারুদ্ধ করা হইয়াছে ত?" বৃদ্ধ মন্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার স্থানে রামরায় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বলিলেন "হাঁ মহারাজ—তাহাতে কি ত্রুটি হইতে পারে!"

রাজা বলিলেন, "এখন কি করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া যায়, বল দেখি মন্ত্রি?"

মন্ত্রী কহিলেন, "যবন রাজ তাঁহার স্তুতিবাদকদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, তা আমরা তাঁহার কথা অমান্য করিব না। তাঁহার মর্য্যাদানুসারে আমরা তাহাদিগকে পুরস্কার দিব। মুদ্রা দানের বদলে দিব্যরূপে জুতাদান করিয়া গাধার পিঠে তাহাদের চড়াইয়া দেওয়া যাক, জুতা পাইয়া সুলতান বুঝিবেন, আমরা তাঁহার যোগ্য সম্মান রাখিয়াছি কি না?"

মহারাজের মান অপমানের প্রতি সভাসদ নারায়ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রাজার মান নারায়ণ যতটা দেখিতেন রাজা নিজে তত দেখিতেন না। বহিরুদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন মহারাজ উদ্যান শোভায় মোহিত হইয়া বৃক্ষতলে ভূমি শয্যায় বসিবার মানস প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে যে নারায়ণের কিরূপ হৃৎকম্প হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া একটি ক্ষুদ্র বালক কাঁদিয়া চলিয়া যাইতেছিল—দশমবর্ষীয়া রাজকন্যা কল্পনালতা বারান্দা হইতে তাহা দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে দ্বার দেশে আসিয়া তাহার হস্তে একটি সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি হইয়াছে" নারায়ণ সেই সময় সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন, ভিখারী বালকের সহিত রাজকন্যাকে কথা কহিতে দেখিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম মান অপমান জ্ঞানে এতই বাজিল, যে, উহা লইয়া সে দিন মনে মনে সমস্ত দিন আন্দোলন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মন্ত্রীর পরামর্শ আজ তাঁহার বড় ভাল লাগিল না—তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি, মহারাজের অপমান করিয়া আজ স্বচ্ছন্দে যবন রাজের লোকেরা দেশে ফিরিয়া যাইবে? ইহাতে কি বাক্যরায় বংশোজ্জ্বল মহারাজাধিরাজ দেবরায়ের মান রক্ষা হইবে? যদিই বা মান রক্ষা হয়, ইহাতে কি নাম রক্ষা হইবে? জানেন তো বররুচি কি বলিয়াছেন? সাধ্বী স্ত্রীণাং দয়িত বিরহে মানিনাং মানভঙ্গে—সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম। অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে, ভৃত্যাভাবে ভবতিমরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাং।

ইহাতে কি মনে হইবে না সামান্য যবন রাজের ভয়ে মহারাজ দেবরায় ভীত হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন? ইহাতে কি মহারাজের নিষ্কলঙ্ক কুলে চিরকাল কালী পড়িবে না? অপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা মন্ত্রী যাহা বলিতেছেন—এই ভয়ানক অপমানের তাহা প্রতিশোধ নহে, অন্য উপায় স্থির করিতে হইবে।"

দেবরায় এই কথায় ঠিক ঠিক করিয়া উঠিলেন, সভাশুদ্ধ সকলেই ঠিক ঠিক করিয়া উঠিল। নারায়ণ মহারাণীর প্রিয়পাত্র সুতরাং রাজারও প্রিয়, সুতরাং সকলেরি মাননীয়। দেবরায় মন্ত্রীকে বলিলেন "তুমি পিতার পদে উঠিয়াছ বটে কিন্তু তাঁহার বয়সে তো আর উঠিতে পার নাই। কাঁচা বয়সে কাঁচা কথাই স্বাভাবিক। বয়স পাকিলে বুদ্ধিও পাকিবে। এতো আর গান বাজনা কিম্বা তীর লক্ষ্য ভেদ করা নয় যে দুদিনেই পরিপক্ক হইয়া উঠিবে?" রাজার কথায় সভাশুদ্ধ সকলেই হাসিল, রামরায়ও অপ্রস্তুত হইয়া হাসিলেন, অথচ নারায়ণ যে কি পাকা

কথাটি বলিলেন, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না, কেমন করিয়াই বা পারিবেন—তাঁহার কাঁচা বুদ্ধি। রাজা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "নারায়ণ তুমি এ বিষয়ে কি পরামর্শ দাও?" নারায়ণ উত্তর করিলেন "উহাদের প্রাণদণ্ড করিলেই যথেষ্ট প্রতিশোধ হয়। তাহারা ফিরিয়া গেলেই মহারাজের অপমান।" প্রাণদণ্ডের কথাটা মহারাজের ভাল লাগিল না। দেবরায় দয়ার্দ্রচেতা, বিশেষ কারণে না হইলে তিনি ওরূপ আজ্ঞা দিতেন না। রামরায়ও আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ প্রাণদণ্ড করা কখনই উচিত নহে, উহাতে মহারাজের নামরক্ষা মানরক্ষা হওয়া দূরে থাকুক উভয়েরি হানি হইবে—এক জনের দোষের জন্য নিরপরাধীদিগের প্রাণবধ করিলে মহারাজার স্বচ্ছ নামে কলঙ্কই হইবে।"

সভাসদ্‌গিকে ভিন্ন মত হইতে দেখিয়া মহারাজ চিন্তামগ্ন হইলেন। ভাবিলেন শক্তিময়ী নহিলে এ বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ কেহ দিতে পারিবে না। রাজা সভাভঙ্গের আজ্ঞা দিয়া বলিলেন, "আমি ভাবিয়া এ বিষয়ে কাল যাহা হয় বলিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহারাণী বলিলেন "একজন মুসলমান রাজা আজ বাক্যরায় বংশের ক্ষত্রিয় সম্রাটকে অপমান করিয়া স্বচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইবে? মহারাজ তোমার যতই বয়স হইতেছে ততই বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইতেছে। আবার বলিতেছি যাহা বলিলাম এখনি তার আয়োজন কর। সৈন্যগণ কুলবর্গাধীপের রাজ্য চারখার করিয়া ইহার প্রতিশোধ তুলিতে যাউক।"

রূপে গুণে বুদ্ধি বিবেচনায় শক্তিময়ীর তুলনা কোথায়? শক্তি দেবী কি মানবী! যে ফুল স্বর্গের দুর্লভ তাহা পৃথিবীতে ফুটিল কি করিয়া! দেবরায় কি অমূল্য রত্নই লাভ করিয়াছেন। গর্ব্বিত হৃদয়ে দেবরায় বলিলেন, "শক্তি, তুমি নহিলে এমন উপদেশ কে দেয়? যাহা বলিলে সমস্তই হইবে।" রাণী বলিলেন "আর সেনাপতি?"

রাজা—"রামরায়কেই সেনাপতি করিয়া পাঠাইব।"

রাণী। "মন্ত্রীর মৃত্যু হইলে রামরায়কে মন্ত্রী করিবার সময় আমি কতবার বলিয়াছি বল দেখি, রামরায় ঐ পদের যোগ্য নহে। গীত বাদ্যে যে উন্মত্ত, সামান্য লোকদিগের সহিত তীর খেলিয়া বেড়াইতে যাহার অপমান নাই, সে কি কখনো মন্ত্রিত্ব পদের যোগ্য হইতে পারে? এখন দেখিলে তো আমার কথা খাটিল কি না?"

রাজাও গীতানুরক্ত ছিলেন, কিন্তু রাণী গীতানুরাগীদের যেরূপ হেয়জ্ঞান করিতেন, তাহাতে মনে মনে নিজের কাছে তিনি যতই লজ্জিত হইতেন, ততই দশ গুণ অধিক করিয়া গীতানুরাগীদের অপদার্থ বলিতেন। রাজা বলিলেন "তোমার কথাই যে ঠিক তাহা কি আমি বুঝি নাই! তবে বিনা দোষে রামরায়কে পদচ্যুত করি কি করিয়া?" রাণী বলিলেন "বিনা দোষে! যাহার মন্ত্রীর কাজ চালাইবার গুণ নাই তাহার আবার বিনা দোষ কি! ইহাতেও তোমার চক্ষু লজ্জা? তুমি স্ত্রীলোক হইতেও অধম!"

রাজা লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আর কেন? এবার নারায়ণকেই মন্ত্রী করিব।"

রাণী সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—সময় বুঝিয়া বলিলেন "নারায়ণ বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ তাহাতে ব্রাহ্মণ পুত্র। বাক্য রায় কাহার জন্য বিজয় নগরের রাজা হইতে পারিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ মাধব বিদ্যারণ্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া তাহাতো জান?

তোমাকে বলিয়া বলিয়া তবু আমি কালী-নাথকে মন্ত্রী করিতে পারি নাই।"

শক্তিময়ী থামিলেন, ঈষৎ ক্রোধে কৃষ্ণতার সুনীল নয়ন দুটি জ্বলিতে লাগিল, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর কত কি অভিমানের তিরস্কার গাহিতে লাগিল, ক্রোধের ভঙ্গীতে মুখকান্তিতে কেমন সৌন্দর্য্য ফুটিল, রাজা অবাক নেত্রে সেই মুখশোভা দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে হৃদয় উথলিয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শক্তির গলা ধরিয়া সেই রোষাঙ্কিত আঁখির উপর আঁখি রাখিয়া গাহিলেন—

"সাগরছেঁচা মাণিক আমার ঘর করেছ আলো,

তুমি নইলে রতন মণি তিনটি ভুবন কালো,

হৃদয় মাঝে ওই মূরতি সদাই আছে জাগি,

সদাই উথ্‌লে উঠ্‌ছে হিয়া প্রিয়ে তোরি লাগি।"

রাণী রাজার হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "মহারাজ ইহা আমোদের সময় নহে কার্য্যের সময়" দেবরায় মহিষীকে আরো হৃদয়ের নিকট আনিয়া গাহিলেন—

"আমি খুঁজে নাহি পাই,

হৃদয়ের কোন খানেতে রেখে তোরে হৃদয় জুড়াই।"

মহিষী বলিলেন, "রামরায় সেনাপতি হইয়া কল্যই যেন যাত্রা করে—মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত না হউক, রামরায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার উপযুক্ত।"

রাজা গান ছাড়িয়া বলিলেন "বেচারা বাঁচিয়া আসিলে হয়, সে যে উন্মাদ!"

রাণী মনে মনে ভাবিলেন "না আসিলেই ভাল! দেখি কালী কি করেন!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রামরায়ের দুই মূর্ত্তি ছিল। বর্ম্মাবৃত অস্ত্র শস্ত্রধারী যুদ্ধে গমনশীল রামরায়ের সে এক বীরমূর্ত্তি, জয়াকাঙ্ক্ষা যশোলিপ্সা মিলিত হইয়া সে মূর্ত্তিকে তখন তেজস্বী গম্ভীর করিয়া ফেলিত। আবার যখন যুদ্ধ সজ্জা ত্যাগ করিয়া সৈন্য কোলাহল ত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে একাকী বসিয়া রামরায় কল্পনা দেবীর আরাধনা করিতেন, যখন তাঁহার কোন প্রিয় সঙ্গীত লহরী তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত, তখন অজ্ঞান রামরায় এ পৃথিবীতে থাকিতেন না, সেই মধুর সঙ্গীত ছাড়া মধুর কল্পনা ছাড়া রামরায় আর কিছুই শুনিতে পাইতেন না, কিছুই দেখিতে পাইতেন না, কি যে স্বপ্নময় স্পর্শাতীত ভাব তাঁহার হৃদয় দিয়া বহিয়া যাইত,তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না। তখন তাঁহার সেই তেজস্বী বীর মূর্ত্তি মধুর কোমলতাময় কবি মূর্ত্তিতে পরিণত হইত। তাই বলিতেছি রামরায়ের দুই মূর্ত্তি—এক বীর মূর্ত্তি, এক কবি মূর্ত্তি।

এই রামরায় রৌদ্রবেশে, শত শত মুসলমানের শোণিত বর্ষণ করিয়া কুলবর্গাধীপের রাজ্য-সীমানা ছারখার করিয়া তাহার স্পর্দ্ধার প্রতিশোধ লইয়া আসিলেন, আবার কবিবেশে বৃক্ষতলে বসিয়া ঐ কি কোমল সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন।

বিজয়ী রামরায় যবন রাজাকে পরাভূত করিয়া বিজয় নগরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। কি প্রকারে তিনি যবন রাজ্য-সীমানায় গিয়া তাহাদের শাস্তি দিয়া আসিলেন, তাহার সহিত এ উপন্যাসের কোন যোগ নাই সুতরাং তাহা এখানে বর্ণনা অনাবশ্যক। যবন অধিকার ছাড়াইয়া রামরায় কৃষ্ণার উপকূলে আসিয়া পড়িয়াছেন। সন্ধ্যাও আগতপ্রায় আর আজ অধিকদূর যাইবারও বড় যো নাই, সৈন্য-

গণও শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, সে রাত্রের জন্য কৃষ্ণানদী তীরেই শিবির স্থাপিত হইল। রামরায় তীরবর্ত্তী একটি বৃক্ষ মূলে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে ভাসিয়া কৃষ্ণার কৃষ্ণ জল উজ্জ্বল করিল। দূরে বাঁশরী বাজিয়া উঠিল। সন্ধ্যা-সমীর-তরঙ্গিত সেই সঙ্গীত লহরী কৃষ্ণার সুশীতল সলিল লহরী চুম্বনে আরো মধুময় হইয়া রামরায়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে রামরায়ের মন উড়িতে লাগিল, শরীর মাত্র বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল। বাঁশরী বেহাগ রাগিণী গাহিতেছিল, রামরায় সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাঁহার মনের একটি বেহাগ গান গাহিতেছেন। রামরায় এমনি উন্মত্ত, এমনি অজ্ঞান, এক জন সৈনিক আসিয়া যে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিকটে বসিল, তাহা তিনি দেখিতেই পাইলেন না, আগন্তুক সামান্য সৈনিক হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয়, এই যুদ্ধে সে সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া রামরায়ের প্রিয় হইয়াছিল, সুতরাং নিকটে আসিয়া বসিতে কিছুই সঙ্কোচ করিল না। সেনা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া বলিল "আমি বাজারে গিয়াছিলাম, শুনিলাম যবন রাজ নাকি প্রতিশোধ তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।" বাঁশরীর সহিত রামরায় মনে মনে গাহিতেছিলেন

"কে তুমি স্বপনময়ী কল্পনা কুমারী!
ধরিব ধরিব করি ছুঁইতে না পারি!"

কে কথা কহিতেছে স্বর মাত্র তাঁহার কাণে গেল, মাথার মধ্যে তাহা প্রবেশ করিল না। কথা কহিলেই উত্তর দিতে হয়, অভ্যাস, না বুঝিয়া না শুনিয়া অন্য মনে উত্তর করিলেন "হাঁ" সেনা বলিল "যবন রাজ নাকি এবার অসংখ্য সেনা নিয়ে আসছেন। তা সে জন্য আমি ডরাইনে, আমরা ক্ষত্রিয়, সহস্রটা প্রাণ থাকলে যুদ্ধের জন্য দিতে পারি, তা একটা প্রাণ। তবে কি না আমরা দেশের জন্য প্রাণ দেব, তাতে দেশ রক্ষা হবে না, মহারাণী কি পরামর্শ দেবেন, আবার দেশ উৎসন্ন যাবে। মহারাণীর বিবাহ পর্য্যন্ত সে দেশও নাই সে রাজাও নাই, কৃষ্ণরায়ের পুত্র নামে দেবরায় কলঙ্ক দিলেন।"

কি কবি কি বিজ্ঞানবিৎ চিন্তাশীল মাত্রেই অজ্ঞান। নিউটন বিবাহে ইচ্ছুক হইয়া একটি রমণীর সহিত প্রেমালাপ করিতে গিয়াছিলেন। রমণীর হস্তে হস্ত রাখিয়া ভাবিবেন প্রেমের কথা, ভাবিতেছিলেন প্রকৃতির গূঢ় প্রহেলিকার কথা, ভাবিতে ভাবিতে এমনি অজ্ঞান, রমণীর হস্তটি তাঁহার চুরোটের ছাই ভাঙ্গিবার পাত্র বোধ হইল, তিনি জ্বলন্ত চুরোটটি তাহার হাতে ভাঙ্গিলেন, রমণী উঃ করিয়া উঠিল, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। এক জন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানবিতের বাড়ীতে আগুণ লাগিয়াছিল, দাসী আসিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সংবাদ দিল, তিনি রাগ করিয়া বলিলেন "ঘরকন্নার কথা আমাকে বলিস্ কেন আমি কি গিন্নি? সে সব স্ত্রীকে গিয়া বল্!" সেই রূপ রামরায়ও অজ্ঞান, সৈনিকের কথা কিছুই না শুনিয়া হাঁ দিয়া গেলেন। বাঁশরীতে অন্তরা বাজিল, রামরায় গাহিলেন

"ওছবি হৃদয় মাঝে আলো করি সদা রাজে,
দেখিতে না পাই কেন নয়ন প্রসারি!"

সেনার সমস্ত কথাতেই রামরায় হাঁ দিয়া যাইতেছেন, সেনার মনে মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। প্রথমতঃ কাহারো নিন্দায় যোগ দিয়া গেলে নিন্দাকারীর মনে একটা তৃপ্তি জন্মে, দ্বিতীয়তঃ সে নিন্দায় অবশ্য রামরায় সন্তুষ্ট হইতেছেন, নহিলে হাঁ দিয়া যাইবেন কেন? সৈনিক আরো সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিল "আপনি যদি বাক্যরায় বংশে জন্মিয়া দেবরায়ের পরিবর্ত্তে সিংহাসনে বসিতেন, তাহা হইলে বংশের আজ নাম রক্ষা হইত।" রামরায় অন্য

মনে আবার উত্তর করিলেন "হাঁ।" সেনার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, ভাবিল রামরায়ের ঠিক মনের মত কথা কহিয়াছে। সে বলিল "আপনি যে রাজা হইবেন না তাহাই বা কে বলিতে পারে! কপালে যে রাজ চিহ্ন দেখিতেছি, তাহা ছাড়া, ১৪ বৎসর পূর্ব্বে একজন গণক ঠাকুর আপনার হাত দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন স্মরণ আছে কি?" বাঁশরীর সঙ্গে সঙ্গে রামরায় গাহিলেন

"অন্তরে আলোক ভায়
বাহিরে প্রকাশে তায়,
একটি আঁধার ঘোর ছায়া মাত্র তারি!"

মনে মনে গাহিতে গাহিতে মুখে উত্তর করিলেন "হাঁ।" সৈনিক এই হাঁ কথাটির ভিতর রামরায়ের হৃদয়ের লুক্কায়িত কত উচ্চ আশা দেখিতে পাইল. হঠাৎ তাহার কাছে কি এক গুপ্ত দ্বার খুলিয়া গেল. সেনা ভাবিল মহারাজের পুত্র নাই, তিনি মরিলে দেখিতেছি রামরায় রাজা হইবার আশা করিতেছেন। যদি আশাই করিয়া থাকেন, তবে অত দিনই বা অপেক্ষা করিবেন কেন? যবন রাজ তো প্রতিশোধ লইতে আসিতেছেন, তাহার সাহায্য লইয়া মহারাজের বিপক্ষে লড়িয়া এখনি তো রাজা হইতে পারেন।" সেনা রামরায়ের হৃদয় জলের মত দেখিতে পাইল বলিল "যবন রাজ বিজয়নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, আপনি যোগ দিলে দেবরায়ের কি সাধ্য জয়ী হন! আপনি নিশ্চয়ই রাজা হইবেন" বাঁশরী থামিল, রামরায়ের চমক ভাঙ্গিল. সেনার শেষ কথাটি কর্ণে প্রবেশ করিল শুনিলেন সে বলিতেছে আপনি নিশ্চয়ই রাজা হইবেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে গণক তাঁহার হাত দেখিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিল, ভাবিলেন সেনাও তাহাই বলিতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমি রাজা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সেনাপতি হইবে।" সেনা শিবিরে আসিয়া সেই দিনই অন্য সেনাদিগকে বলিল "রামরায় রাজা হইবেন আমি তাঁহার সেনাপতি হইব, এবং যে রামরায়ের বিপক্ষ হইবে তাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট।

নবম পরিচ্ছেদ।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, উদ্যানে দেবরায়ের হৃদয়ের চাঁদ। উদ্যান-সরোবর পূর্ণিমার চাঁদের পানে চাহিয়া হাসিতেছে, রাজা তাঁহার হৃদয় চাঁদের পানে চাহিয়া হাসিতেছিলেন। রাজার মাথার মুকুট নাই। কুঞ্চিত কেশ গুলি স্কন্ধ স্পর্শ করিতেছে, কৃষ্ণকেশের মধ্যে মধ্যে বিজুলি রেখার মত এক একটি শুভ্র কেশ বাহির হইয়া তাঁহার প্রৌঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাজমূর্ত্তিতে ক্ষত্রিয়োচিত তেজস্বিতা, রাজোচিত চিন্তাশীলতার পরিবর্ত্তে কেমন একটি শিশুর নির্ভর কারীভাব, বালকের উৎফুল্ল ভাব প্রকাশ পাইতেছে। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিয়াছে, ফুলের তারকা ফুটিয়াছে, তারকারাশি বুকে ধরিয়া সরোবর হাসিতেছে, সর্পের ন্যায় বেঁকিয়া বেঁকিয়া ঝিল খেলিতেছে, স্থানে স্থানে প্রস্তর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। কোথায় বা বীণাপাণি সরস্বতী বীণা হস্তে, কোথায় বা নবপ্রেম-প্রস্ফুটিত হৃদয়া, রত্নাবলী উদয়ন রাজাকে দেখিয়া লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। উদ্যানের প্রান্তস্থিত তুঙ্গভদ্রা নদী পূর্ণিমালোকের রজত কণা খচিত হইয়া গুণ গুণ গান করিতে করিতে যাইতেছে, সেই গীত ধ্বনি সন্ধ্যা সমীর কম্পিত বৃক্ষাবলীর গুণ গুণ গীতে মিশিয়া উদ্যান মাতাইয়া তুলিয়াছে। উদ্যানের একটি গোলাকার শ্বেত প্রস্তর আসনে রাজা রাণী বসিয়া আছেন, সম্মুখে ফোয়ারার জল রাশি রজত

উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া উপরে উঠিতেছে, ছুটিয়া ছুটিয়া নীচে নামিতেছে। রাজার এক পার্শ্বে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা লাবণ্যময়ী, অপর পার্শ্বে হৃদয়-সর্ব্বস্ব শক্তিময়ী। ফোয়ারার জলে তারা ফুটিয়াছে, চাঁদ ভাসিতেছে, লাবণ্যময়ী পার্শ্বস্থ ফুল গাছ হইতে ফুল তুলিয়া তুলিয়া তাহাতে ফেলিয়া দিতেছে, ফুল গুলি চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, লাবণ্যের মুখটিতে হাসি ধরিতেছে না। কচি কিশলয়ের মত সুন্দর অধর ওষ্ঠ দুখানির মৃদু হাসি, প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত হাসি মাখা নয়ন দুটিকে ক্লান্ত করিয়া লাবণ্য পূর্ণ মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে! রাজা অনেকক্ষণ ধরিয়া মহিষীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নীরব সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন, একটি কথা শুনিবার জন্য হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, শক্তিময়ী একটিও কথা কহিলেন না। রাজার প্রাণের ভিতর হইতে কেমন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, দেবরায় সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তোর মায়ের সহিত আমরা কথা কহিব না, কেমন,লাবণ্য, আয় আমরা দুজনে কথা কই।" লাবণ্য হাসিয়া পিতার হাতখানি ধরিয়া আস্তে বলিল "আমাদের কত কথা আছে, একটিও আমরা মাকে শুনিতে দেব না।" লাবণ্য তাঁহার কানে কানে কি বলিয়া আবার হাসিয়া মাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। রাজাও লাবণ্যের কানে কানে কথা কহিয়া ফিরিয়া রাণীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মহিষী যেমন নিস্তব্ধ যেমন চিন্তাশীল, তেমনি রহিলেন। তাঁহাদের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। দেবরায়ের আর রঙ্গ ভাল লাগিল না, নিরাশ হৃদয়ে চাঁদের পানে চাহিয়া গান গাহিলেন—

"আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ ফুটলো
বুঝি আকাশে ঐ
জোছনা হাসি ঢালছে রাশি প্রাণে ফাঁসি
দিলে যে সই,
সবাই হাসছে ওরূপ দেখে, সবাই উজল
ওরূপ মেখে.
হাসব বলে এসে শেষে কেঁদে কেন
সারা হই!"

গানটি গাহিয়া আবার রাজা শক্তির দিকে চাহিলেন, তাহার হাসিমাখা মুখ দেখিবার প্রত্যাশায় তাহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন আবার সেই সচিন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাজা নিকটে সরিয়া বাহু দ্বারা শক্তির পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া আখির উপর আঁখি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "আজো কি শক্তি তোমার মুখে হাসি দেখিতে পাইব না? এখন আবার তোমার কিসের এত ভাবনা? যবনরাজকে প্রতিশোধ দিয়া তো রামরায় ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন সুসংবাদ পাইয়াও তুমি গম্ভীর হইয়া থাকিবে?" শক্তির বিশাল নয়নের দৃষ্টি রাজার পানে পড়িল, তিনি বলিলেন "আমার ভাবনা কিসের। তোমারি জন্য। তুমি যদি তোমার ভাবনা নিজে ভাবিতে পারিতে, তো আমার আর ভাবনা কি?"

রাজা লজ্জিত হইলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

শক্তিময়ী বলিলেন, "মহারাজ, যবন রাজকে তো অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া হইল, কিন্তু তাহারা যে আমাদের প্রতিশোধ দিতে আসিতেছে তার কি করিলে? ইহা কি ভাবিবার কথা নয়?"

রাজা একটু বিষন্ন ভাবে বলিলেন, "শাস্তি সহজে পাওয়া যায় না। তবে যবনেরা আসে তাহাতেই বা ভয় কি? প্রতিফল পাইয়া যাইবে।"

রাণী। "মহারাজ, তুমি রাজ্যের খবর জান না, কোথায় যে কে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে জানিতে ইচ্ছাও নাই, অথচ সমস্ত

খবর না জানিলে রাজ্য রক্ষাও বড় সহজ হইয়া উঠে না। যবনেরা আসিতেছে বলিয়া আমি চিন্তিত নই, একজন যবন রাজের বদলে সহস্রজন আসিলেও আমি বিজয় নগরের মহারাজের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পরিতাম—কিন্তু যাহাকে ভয় করিতেছি, সে যবন নহে, সে পর শত্রু নহে, ঘরের শত্রু বলিয়াই এত ভাবিত হইয়াছি, রামরায় সিংহাসনে বসিবার জন্য যবনরাজকে আহ্বান করিয়াছে"।

দেবরায় সবিস্ময়ে বলিলেন "কখনই না, যাহা বলিতেছ তাহা অবিশ্বাস্য। রামরায় আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মন্ত্রনা করিবে?" এই অবিশ্বাস রাণীর সহ্য হইল না, অগ্নিবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "রামরায় তোমার এতই বিশ্বাসী? আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু তোমার বিশ্বাসী সেনারা তো আর মিথ্যা বলিবে না, প্রত্যেক সৈনিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তাহারা কি বলে। সেনাদিগকে তোমার বিপক্ষে উত্তে জত করিয়াছে কিনা, শুনিয়া দেখ, তার পর না হয় অবিশ্বাস করিও।" অদূরে প্রহরী দাঁড়াইয়া ছিল—রাণী উঠিয়া তাহাকে কি আজ্ঞা দিলেন, সে চলিয়া গেল, কিছু পরে একজন সৈনিককে সঙ্গে লইয়া পুনরাগমন করিল। সৈনিকের সহিত কি কথা বার্ত্তা হইল তাহার বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, রাজা যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল রামরায় দোষী। কথা শেষ হইলে প্রহরী সৈনিককে লইয়া চলিয়া গেল, রাণী ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন "কেমন এখন তো বিশ্বাস হইল, এখন রামরায়কে কারারুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দাও। কালই বিদ্রোহী অপরাধে তাঁহার মস্তক চ্ছেদন করিয়া অন্য প্রজাদের দৃষ্টান্ত দেখান আবশ্যক।"

রাজা অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সঙ্কোচে বলিলেন, "রামরায় দোষী তাহাতে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু সভায় রীতিমত একেবারে বিচার না করিয়া হঠাৎ আজই রাত্রে কারারুদ্ধ করাটা কেমন দেখাইবে।"

রাণী রাগিয়া বলিলেন, "হাঁ তাহাকে সময় দাও, আর সেই অবকাশে সে পলায়ন করুক।"

রাজা বলিলেন "পলায়ন কি করিবে! সে তো এ সকল কিছুই জানে না।"

রাণী। "সে এ সকল কিছুই জানে না। রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হওয়া যাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার কতদূর সতর্ক হওয়া চাই? হয়তো ইহার মধ্যেই সে সমস্ত সন্ধান জানিয়াছে। কত সৈনিক কত প্রজা সে ইহার মধ্যে বশীভূত করিয়াছে তাহা কে জানে? নহিলে উচ্চাকাঙ্খা সহজে কিছু মনে স্থান পাইবার নয়।"

রাজা। "আজকের রাতটা রাখিয়া কাল যদি বন্দী করা যায়, তাহলে কিন্তু আমার বিচারে কোন দোষ স্পর্শে না—শক্তি একটু বিবেচনা করিয়া দেখ।"

রাণী। "তোমার জন্য ভাবনায় ভাবনায় আমার প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা না বাহির করিয়া তুমি ছাড়িবে না। রামরায় যেরূপ কৌশলী, যেরূপ বীর, তাহাকে দেশের লোক যেরূপ ভালবাসে, সে যদি একবার পলইয়া যায় তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? তাহা হইলে তোমার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া, স্বলতানের সাহায্যে নিশ্চয়ই তোমার সিংহাসন বসিবে। আমি তোমার সেই দুর্দ্দশা স্পষ্ট চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তোমার সে বিপদ আমি কখনই দেখিতে পারিনা মৃত্যু ভিন্ন আমার উপায় নাই।" রাজা আর আর অনিশ্চিৎ থাকিতে পারিলেন না, রাত্রেই রাম রায়কে কারারুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

স্বাধীন বৃত্তি।

কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসায় বঙ্গদেশে চিরকালই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের উহা জাতীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ভদ্রলোক দূরের কথা, এক নীচ জাতিকে অপর এক নীচজাতির ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে জাতিবিশেষে ব্যবসায়বিশেষ অবলম্বন করায় এক্ষণে সেই সেই কার্য্যে তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব হইয়া দাড়াইয়াছে। কোন বিশেষ ব্যবসায়ে কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ দক্ষতা থাকিলেও জাতীয় বৃত্তি নহে বলিয়া তাহা আশ্রয় করিতে সক্ষম হয় না। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতিভেদ উন্নতির পথে এক মহৎ প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে। এই জাত্যভিমানই উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদিগকে কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যে প্রবেশ করিতে নিবারণ করিতেছে। যত দিন না এই কুসংস্কারমূলক জাত্যভিমান বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইতেছে তত দিন তাহাদিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকিবে—তত দিন তাহারা আপনাপন আভ্যন্তরিক অবস্থার কিছুই প্রতিকার করিতে পারিবে না। এই জন্যই এক্ষণে জাতিবিচার পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রলোক মাত্রেরই কৃষিকার্য্য বা বাণিজ্যে প্রবেশ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত উন্নতিই সাধারণ উন্নতির প্রসূতী স্বরূপ, এবং সেই উন্নতির প্রধান উপায় কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসায়।

বঙ্গদেশে কৃষিকর্ম্ম আবহমান কাল হইতে কৃষকদিগের দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাতে প্রায় এ পর্য্যন্ত কোনই উন্নতি হয় নাই। পরিশ্রমের সহিত বুদ্ধির সহায়তা আবশ্যক। এই জন্য উচ্চশ্রেণীস্থ শিক্ষিত বঙ্গবাসীরা যদি কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে যে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সকল প্রকার চাস সমপরিমাণে ফলোপধায়ী হয় না। যে সকল দ্রব্যের চাসে বিশেষ লাভ হইতে পারে তাহাই প্রস্তাবে এই প্রদর্শিত হইতেছে।

ইক্ষু, আলু ও অ্যারোরুটের চাস বিশেষ লাভজনক; ফল ও পুষ্প বৃক্ষাদি রোপণ এবং কলমপ্রস্তুতকরণ-কার্য্যও সুচারুরূপে চালাইতে পারিলে অধিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত অপেক্ষা তুঁতবৃক্ষের চাসে অনেক লাভ হইয়া থাকে, কেন না রেশমের ব্যবসায় তুঁতের চাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, এবং তুঁতবৃক্ষ উত্তমরূপ জন্মিলে গুটিপোকা বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়া

থাকে, এবং তজ্জন্যই উত্তম রেশম প্রচুর পরিমাণে লাভ হইতে পারে। একারণ তূঁতের চাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, ইক্ষু-রোপণ অন্যান্য শস্য রোপণ অপেক্ষা কষ্ট-সাধ্য হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত অধিক ফলোপধায়ী। কিন্তু ইক্ষুরোপণ করিবার পূর্ব্বে ভূমি নির্ব্বাচন করা কৃষকের একটী প্রধান কার্য্য। সকল ভূমিতে সকল শস্য সমপরিমাণে বর্দ্ধিত হয় না, বিশেষ বিশেষ ভূমিখণ্ডের বিশেষ বিশেষ শস্য উৎপাদনের শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; এজন্য ভূমির উৎপাদিকা শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, এবং উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইলে তাহার ঔৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের দেশীয় কৃষকেরা এ সকল বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হেতু অধিক ফল-লাভ হইতে দেখা যায় না। সে যাহা হউক, উত্তম ভূমি মনোনীত করিয়া ইক্ষু রোপণ করিলে এবং উপযুক্ত যত্ন করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক ফসল জন্মিয়া থাকে। ইক্ষু হইতে গুড় এবং গুড় হইতে শর্ক্করা ও চিনি প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট লাভ হইতে দেখা যায়। চিনির ব্যবসায়ে এতদ্দেশে অনেকেই প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছে। চিনি একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য, এবং ইহার ব্যবসায় অন্যান্য বাবসায় অপেক্ষাই লাভজনক। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে ইক্ষুর চাস করিয়া কোন ব্যক্তিই চিনি প্রস্তুত করেন না; কৃষক ইক্ষু হইতে গুড় প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং ব্যবসায়ীরা ঐ গুড় ক্রয় করিয়া শর্ক্করা ও চিনি প্রস্তুত করে, সুতরাং ঐ ব্যবসায়ের বিশেষ লাভাংশ কৃষকের ভাগ্যে ঘটে না। যদি কৃষকই ইক্ষু রোপণ হইতে চিনি বিক্রয় পর্য্যন্ত স্বয়ং করিতে পারে তাহা হইলে যে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক লাভ করিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশের কৃষক দরিদ্র ও মূর্খ বলিয়া ঐ লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যদি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান কৃষক রাখিয়া ইক্ষুর চাস করেন, এবং গুড়, শর্ক্করা ও চিনি প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন তাহা হইলে যথেষ্ট অর্থলাভ হইতে পারে। এইরূপে ইক্ষুর চাসের দ্বারা অনেক ভদ্র-লোকের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। এস্থানে বলা আবশ্যক যে ইক্ষুর ন্যায় খর্জ্জুর বৃক্ষের চাসও লাভজনক। খর্জ্জুর বৃক্ষের চাস করিয়া তাহা হইতে গুড়, শর্ক্করা ও চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে ইক্ষুর চাসের অপেক্ষা অধিক লাভ হইবারও সম্ভাবনা, কারণ খর্জ্জুরের চাসে বিশেষ ব্যয় নাই, এবং প্রতি বৎসর কৃষকের খরচ লাগে না। অধিকন্তু যে স্থানে খর্জ্জুর বৃক্ষ রোপিত হয় সেই ভূমিতে আবার অন্য ফসলও সময়ে সময়ে রোপণ করা যাইতে পারে, ও খর্জ্জুর বৃক্ষসকল উন্নত হওয়ায় নিম্নস্থ ফসলের কোন হানি হয় না। ইক্ষুর ও খর্জ্জুর বৃক্ষের চাস করিলে গুড়ের ভাঁটী ও চিনি প্রস্তুতের কারখানা করা আবশ্যক, এবং প্রক্রিয়া সকলেরও অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় উদ্ভাবন করারও বিশেষ প্রয়োজন। যত সং-

ক্ষেপে ও অল্প ব্যয়ে চিনি প্রস্তুত হইতে পারিবে ততই অধিক লাভের সম্ভাবনা। ইক্ষু হইতে রস নিস্রাবণের কল নিতান্ত আবশ্যক, এবং গুড় হইতে শর্ক্করা ও মাত পৃথক্ করিবার জন্যও নূতন এবং সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শর্ক্করা পরিষ্কৃত করিয়া চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সহজ এবং অল্প ব্যয়সাধ্য করা আবশ্যক। এই রূপ চিনির ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত অধিক ফলদায়ক হইতে পারে। সাহারণপুর নগরে ফ্যারু এবং কোম্পানির চিনির কারখানা ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সে যাহা হউক, আমাদিগের দেশে খর্জ্জুরের চাস অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ জনক হইতে পারে। তাহার একটী কারণ প্রদর্শিত হইতেছে, অর্থাৎ যে ভূমির উপর উন্নত খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে তাহাতে পুনরায় অন্য শস্যাদি রোপণ করা যাইতে পারে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত অনেক স্থানে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণ, ইহার নির্যাস নিস্রাবণের জন্য কল আবশ্যক করে না। কয়েকটী লোকের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইহা ব্যতীত খর্জ্জুরবৃক্ষপূর্ণ ভূমিও অনেক স্থানে প্রাপ্তব্য, সুতরাং তাহাতে রোপণের ব্যয় আদৌ হয় না। ত্রিহুত ও রোহিলখণ্ডের অনেক স্থানে খর্জ্জুরের বন দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল স্থান পতিত ভূমির ন্যায় ভূস্বামীর কোন কার্য্যেই আসে না। ঐ সকল দেশের লোকেরা খর্জ্জুরের রস তাড়ী ব্যতীত অন্য কোন রূপে ব্যবহার করিতে জানে না, সুতরাং ঐ সকল জঙ্গল চিরকালই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি উপরোক্ত ভূমিসমূহ অল্প করে গ্রহণ করা যায়, এবং চিনির কারখানা আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে উহাতে যে অধিক লাভের আশা করা যাইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষ ঐ সকল স্থানে পরিশ্রমের মূল্যও নিতান্ত অল্প, শ্রমজীবিগণকে মাসিক বেতন ৪। ৫ টাকা দিলেই যথেষ্ট। এ অবস্থায় শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা যদি অগ্রসর হয়েন তাহা হইলে যে তাঁহাদের এই উপায় দ্বারা স্বাধীনভাবে ও স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আলুর চাসেও বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহাতে ভূমি মনোনীত করার উপরে লাভালাভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সকল ভূমিতে আলু জন্মে না; অল্প বালুকা-মিশ্রিত অথবা পল্বলময় মৃত্তিকাতে আলু উত্তম রূপে জন্মিয়া থাকে। যদি উপযুক্ত ভূমি পাওয়া যায় এবং রীতিমত যত্ন দ্বারা রোপিত ও রক্ষিত হয় তাহা হইলেই আলু উত্তমরূপ জন্মিতে পারে। আলুর চাস করিলে বিঘা প্রতি যে ব্যয় হইয়া থাকে, ফসল হইলে অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ লাভ হইতে দেখা যায়। বিঘা প্রতি সচরাচর ৮৲ টাকা খরচ ও ৩২৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে বিপরীত ফল ঘটিবারও সম্ভাবনা। আলু পরিপক্ক হইলে তাহা শীঘ্রই তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য, কেননা সে

অবস্থায় বৃষ্টি পাইলে উহার অর্দ্ধেক নষ্ট হইতে পারে। আলু যত পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত হইবে ততই অধিক লাভ হইবার কথা। গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চলের ও বেহারের অনেক ভূমি আলু চাসের উপযুক্ত, এবং ঐ সকল স্থানের কৃষকেরা আলুর চাস করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। ফলে যখন মূর্খ ও দরিদ্র কৃষকেরা এই উপায় অবলম্বন করিয়া উন্নতি করিতেছে তখন শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরা যে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক লাভ করিতে পারিবেন তাহা বলা বাহুল্য। আমাদিগের দেশে যদি কৃষি বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, এবং ভদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরা রীতিমত শিক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে যে তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিলে ভূমির উপযুক্ততা অবধারণ করা যাইতে পারে এবং অনুর্ব্বরা ভূমিরও ঔৎকর্ষ সাধনের জ্ঞান জন্মিতে পারে, সুতরাং তদ্দ্বারা যে দেশের বহুল উপকার এবং ব্যক্তিগত উন্নতি সাধিত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিরল।

অ্যারোরুটের চাসও কম লাভজনক নহে। এই ফসল প্রস্তুত করিতে হইলে উত্তম ও উর্ব্বরা ভূমির প্রয়োজন করে না। ফলবৃক্ষপূর্ণ বাগানে অথবা অন্যান্য উচ্চ বৃক্ষের তলস্থ ভূমিতে অ্যারোরুট জন্মিতে দেখা যায়। ফলতঃ ইহা রোপণে বিশেষ ব্যয় নাই, অথচ প্রতি বিঘায় অন্যূন ২।৩ মন জন্মিতে পারে ও প্রতি মন অন্ততঃ ৮৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় গড়ে প্রতি বিঘায় প্রায় ২০৲ টাকা উপস্বত্ব হইতে পায়ে। অ্যারারুট জন্মিলে তাহা প্রস্তুত করিতে কিছু ব্যয় আছে, কিন্তু তৎসমস্ত বাদ দিয়াও বিঘা প্রতি ২০ টাকা লাভ হইতে দেখা যায়। একারণ ভদ্রলোকে যদি এই ফসলের রীতিমত চাস করেন ও মূল হইতে অ্যারোরুট তৈয়ার করিবার একটী সুবিধাজনক কারখানা করেন এবং সহজ প্রকরণ উদ্ভাবন করিতে পারেন তাহা হইলে যে ইহা দ্বারা সুচারুরূপে ফল লাভ হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে তুঁতের চাস সকল চাস অপেক্ষা লাভ জনক, কেননা ইহার উপর রেশমের ব্যবসায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। মুরসিদাবাদ অঞ্চলে বহুকাল হইতে বিস্তৃত তুঁতের চাস হইতেছিল, এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ প্রদেশে উত্তম রেশম জন্মিত কিন্তু এক্ষণে সেই রেশমের ব্যবসায় পতনোন্মুখ হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ তুঁতের ফসলের পতন। দীর্ঘকাল হইতে যে ভূমিতে তুঁত রোপিত হইতেছে সেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়াছে। তুঁত বৃক্ষে যে সকল উপকরণ গুটিপোকার পোষণের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে আর উত্তম রেশম জন্মে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে সকল ভূমিতে বহুকালাবধি তুঁত

রোপিত হইতেছে ঐ সমস্ত ভূমি সার বা অপর কোন উপায় দ্বারা উর্ব্বরা করা নিতান্ত আবশ্যক, অথবা অন্য নূতন ভূমিতে তুঁত রোপণ করা উচিত, তাহা হইলেই পুনরায় তুঁতের চাসের উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে রেশমের ব্যবসায়েরও উন্নতি সাধন হইতে পারে। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে কৃষকগণের ভূমি উর্ব্বরা করিবার বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু অনেক সময়ে বহুল অপকার হইয়া থাকে এবং কখন কখন তাহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও হইতে হয়। যদি দেশীয় সদ্‌বংশোদ্ভূত লোকেরা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে যে তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের অনেক উপকার হয় এবং তাঁহারাও যে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে ফল ও পুষ্পবৃক্ষের চারা ও কলম প্রস্তুত ব্যবসায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপাততঃ যদিও দুই এক স্থানে কোন কোন লোক এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই বিশেষ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে মৃত্তিকা নির্ব্বাচন, বীজবপন, ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল রক্ষা করণ এবং কলম প্রস্তুত করিবার প্রকরণ প্রভৃতির জ্ঞান থাকা অতীব আবশ্যক। এতদ্দেশে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া অতিশয় কঠিন, একারণ কেহই এরূপ কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েন না। ফলে যদি বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার শিক্ষাদান হইত, এবং বালকদিগকে এই সমস্ত কার্য্যতঃ দেখাইবার জন্য বৃক্ষপালন-গৃহ (Nursery) থাকিত তাহা হইলে যে ক্রমশঃ ইহার দিকে লোকের মন আকর্ষিত হইত তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই উপায় দ্বারা বিদেশীয় তরুলতাদি আনীত হইতে পারে এবং এদেশীয় উদ্ভিদ সকল অন্যত্রে প্রেরণ করা যাইতে পারে, এবং এইরূপ কৌশল দ্বারা জগতের বিশেষ উপকার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা। এই ব্যবসায় এরূপে ফলপ্রদ হইতে পারে তাহা ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। যদি অন্ততঃ কতকগুলি ভদ্রসন্তান এই কার্য্যে প্রবেশ করেন তাহা হইলে যে তাঁহাদিগের অনায়াসেই জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

নীলের চাস দ্বারাও বিশেষ লাভ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথমেই ইহাতে অধিক মূলধন আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয় আমাদিগের দেশীয় লোকেরা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। এতদ্দেশের ভদ্রলোকের কৃষিকর্ম্মে আস্থা অতি অল্প, এবং কৃষকেরা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে, যে কার্য্যে ব্যয়বাহুল্য আছে তাহাতে তাহারা সহজে অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং ইংরাজ ব্যতীত নীলের চাস অল্প লোকেই করিতে দেখা যায়। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা যে নীলের চাস করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু তথাপি এ দেশের লোকে কেহই একার্য্যে প্রবেশ করিতে উৎসুক নহেন।

নীল আজ কাল বাণিজ্যের একটী প্রধান দ্রব্য, কারণ ইহা ইউরোপ খণ্ডে রং করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। নীল অতি মূল্যবান্ রং, একারণ অন্যান্য রঙের ব্যবসায় অপেক্ষা ইহাতে অধিক লাভ হইয়া থাকে। বেহার, ত্রিহুত ও বাঙ্গালার অনেক স্থানে অধিক নীল জন্মিয়া থাকে। নীল বপন করিবার সময় ভূমির বিশেষ পাট করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেই যে অধিক ব্যয় হয় তাহা নহে, নীল প্রস্তুত করিবার সময়েই অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। কি কি প্রকরণে নীল প্রস্তুত করিতে হয় তাহা এস্থানে বলিবার আবশ্যকতা নাই।

লাক্ষা, বকমকাষ্ঠ প্রভৃতিতেও অনেক লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এ সকলের কেহ চাস করে না। লাক্ষা আজ কাল ইউরোপ খণ্ডে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইতে দেখা যায়। লাক্ষা অনেক প্রকার বৃক্ষে জন্মিয়া থাকে। বট, অশ্বত্থ পর্কটী ও কুল বৃক্ষে সচরাচর লাক্ষা জন্মে। লাক্ষা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে কোন কীট বিশেষ ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় ছিদ্র করিয়া বাস করে, এবং তাহাতে যে নির্য্যাসের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয় তাহাই লাক্ষা বলিয়া খ্যাত। ঐ লাক্ষা দ্বারা প্রচুর রং প্রস্তুত হয়, একারণ উহা বাণিজ্যের একটী প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে লাক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে, সুতরাং সংগ্রহ করিবার ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন খরচ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সামান্য কার্য্য অবলম্বন করিলেও অনেক ভদ্রসন্তানের স্বাধীনভাবে ও সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

এতদ্দেশে রেড়ির চাসেও অনেক লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। রেড়ীর চাস করিলে তৈল প্রস্তুত করিবারও কারখানা করা আবশ্যক, তাহা না হইলে উহা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে না। সম্প্রতি এরণ্ড তৈল যেরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে যে ইহার চাস করিলে অনায়াসে অনেক ভদ্রপরিবারের স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। একারণ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগের এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এদ্ব্যতীত আমাদিগের দেশে তামাকুর চাস করিলেও অধিক পরিমাণে লাভ হইতে পারে। কিন্তু উপস্থিত এই ফসলের যেরূপ প্রণালীতে চাস হইয়া থাকে তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। মানিলা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে এই দ্রব্য যেরূপ জন্মিয়া থাকে তাহাতে এতদ্দেশ অপেক্ষা যে অনেক অধিক লাভ হয় তাহা বোধ হয় অনেক অবগত আছেন। বস্তুতঃ এখানে উত্তম তামাকুর চাস অতি অল্পই হইয়া থাকে, এবং যাহাও হয় তাহা উত্তম প্রণালীতে শুষ্ক করা হয় না। শুষ্ক করিবার যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম আছে তাহা এদেশের অনেক কৃষকই অবগত নহে।

অধিকন্তু দেশীয় তামাকু ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির তামাকু অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যদ্যপি ঐ সকল তামাকুর বীজ আনাইয়া রোপণ করা যায় এবং সঙ্কলন করিবার ও শুকাইবার উত্তম নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে ঐ তামাকু অবশ্যই অধিক মূলে বিক্রীত হইবে। তামাকুর চাস এইরূপ্য অধিক লাভজনক হইতে পারে। ভদ্রসন্তানেরা যদি এই সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তামাকুর চাসে নিযুক্ত হয়েন তাহা হইলে যে তদ্দ্বারা সুচারুরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহার আর সংশয় নাই।

যে যে দ্রব্যের চাসে অধিক লাভ হইতে পারে তাহাই এস্থানে প্রদর্শিত হইল। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অনেক ফসলের চাসেও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারা যায়। যদি বিদ্যোৎসাহীগণ কৃষিবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আপনাপন সন্তানদিগকে ঐ বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারেন তাহা হইলে দেশের অসীম মঙ্গলসাধন হয় এবং অনেকে স্বাধীনভাবে ও সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে বিশেষ উন্নতি করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে যত প্রকার লাভজনক ব্যবসায় আছে তৎসমুদায়ই নিম্ন-শ্রেণীস্থ লোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। উচ্চ বংশোদ্ভব শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহার একটীও করিতে স্বীকার করেন না। একারণ ব্যবসায় মাত্রেই জাতিবিশেষের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তন্নিমিত্ত নিম্ন-শ্রেণীস্থ লোকের প্রাদুর্ভাব এবং ভদ্রলোকের অসীম ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। এ অবস্থায় জাত্যভিমানের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ভদ্রলোকদিগের এক একটী ব্যবসায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে এই কুসংস্কারমূলক জাত্যভিমান ত্যাগ না করিলে আর ভদ্রলোকের উপায়ান্তর নাই। সে যাহা হউক, সাধারণতঃ নিম্ন-লিখিত কয়েকটী ব্যবসায় আজকাল বিশেষ আদরণীয় ও ধনাগমের সহজ উপায়। স্বর্ণকারের ও কর্ম্মকারের ব্যবসায়, সূত্রধারের ও কুম্ভকারের কার্য্য, মৎস্যজীবির ও গোপের বৃত্তি এবং রজকের ব্যবসায়। যে যে জাতির হস্তে আবহমান কাল হইতে এই সকল ব্যবসায় ন্যস্ত রহিয়াছে তাহারা নিতান্ত অশিক্ষিত হেতু ব্যবসায়ের বা স্বীয় স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। একারণ যদি সুশিক্ষিত ভদ্রবংশোদ্ভব ব্যক্তিরা ঐ সকল বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ঐ সকল জাতির লোক নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন এমত নহে, ঐ সমুদয় ব্যবসায়েরও সম্যক উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

স্বর্ণকারের ব্যবসায়ে এত অধিক লাভ হইয়া থাকে যে অন্যান্য নীচজাতির লোক ও ক্রমশঃ এই ব্যবসায়ের দিকে আকর্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ একার্য্যে অনেকেরই উন্নতি হইতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু

এ বিষয়ে শিক্ষা না পাইয়া যাঁহারা স্বর্ণকার নিযুক্ত করিয়া কার্য্য করান্ তাঁহাদিগের ক্ষতিগ্রস্ত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন ব্যবসায়েই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। যদ্যপি শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা স্বর্ণকারের কার্য্য শিক্ষা করিয়া ঐ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে যে ব্যবসায়ের ও স্বীয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারেন তাহার আর সংশয় নাই। শিল্প-নৈপুণ্য যে কার্য্যে আবশ্যক তাহাতে বুদ্ধিমান্ লোক যে মূর্খ অপেক্ষা অধিক চাতুর্য্য দেখাইতে সক্ষম হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। নূতন কল্পনা ও নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করা এ ব্যবসায়ে বিশেষ আবশ্যক। এই জন্যই শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে শিল্পের অধিক উন্নতি হইবার কথা, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অবস্থারও ঔৎকর্ষ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

স্বর্ণকারের বৃত্তির ন্যায় কর্ম্মকারের ব্যবসায় সমান লাভজনক না হইতে পারে, কিন্তু ইহা তদপেক্ষা অধিক ব্যবহার্য্য এবং তজ্জন্য এ কার্য্য চিরকাল সমভাবে চলিয়া থাকে। লৌহ সাধারণতঃ এত অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যে কর্ম্মকারের কাজ প্রতিনিয়তই আবশ্যক। একারণ যদি লৌহের কাজ রীতিমত শিক্ষা করিয়া ভদ্র-সন্তানেরা কর্ম্মকার নিযুক্ত করতঃ কারখানা স্থাপন করেন তাহা হইলে যে তদ্দ্বারা বিশেষ অর্থাগম হইতে পারে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কর্ম্মকারের ব্যবসায়ের এক্ষণে যেরূপ আদর তাহাতে ইহা অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কর্ম্মকারের ব্যবসায়ের ন্যায় ছুতারের ব্যবসায়েরও বিলক্ষণ আদর আছে। যে কাজ প্রাত্যহিক জীবনে বিশেষ আবশ্যক, সে কাজের কেনই বা না আদর থাকিবে? এক্ষণে শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরা ২০।২৫ টাকা বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত, কিন্তু একজন কর্ম্মকার বা ছুতারকে ঐ বেতনে পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে আপনাপন ব্যবসায়ে স্বাধীনভাবে প্রতিমাসে অন্যূন ৩০ টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখা যায়। এ অবস্থায় বংশের ও শিক্ষার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রলোকদিগের এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সকল কার্য্যে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে অনায়াসে চাকর রাখিয়া কার্য্য করান যাইতে পারে, এবং তাহাতে সম্যক লাভ হইবার সম্ভাবনা। কাষ্ঠ নির্ব্বাচন, নূতন প্রকার কার্য্যের কল্পনা ও শিল্প চাতুর্য্য প্রভৃতিতে অবশ্যই শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরা সামান্য মূর্খ কারিগরদিগের অপেক্ষা অল্প দিনেই পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন। ফলে এই বৃত্তি অবলম্বন করিলে ভদ্রলোকের সহজে ও স্বাধীনভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

এতদ্দেশে কুম্ভকারের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক বলিয়া বোধ হয় না, তাহার

কারণ এই যে এখানে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যের কোনই উন্নতি হয় নাই। যে কুম্ভ ও স্থালী সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তৈয়ার হইত, এবং যে প্রণালীতে উহা প্রস্তুত হইত, আজ পর্য্যন্ত তাহাই আছে, তাহার কিছু মাত্র উন্নতি সাধন হয় নাই। কিন্তু বিলাতীয় ও চীন দেশীয় মৃত্তিকা পাত্র সকল দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তৎসমুদয় দেখিতে অতি সুন্দর, মসৃণ, ও দেশীয় মৃত্তিকা পাত্র অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কঠিন, এবং তাহাতে প্রচুর শিল্প নৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি এতদ্দেশে বিলাতীয় প্রণালীমতে মৃত্তিকা প্রস্তুত ও পাত্র সকল নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে যে উহা অনেক সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। রাণীগঞ্জ নগরে বরণ কোম্পানির যে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যের কারখানা আছে তাহাই ইহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। যদি বিলাতীয় প্রকরণ ও প্রণালীমতে মৃত্তিকা প্রস্তুত করা যায় এবং সুনিপুণ শিল্পী রাখিয়া তাহার দ্বারা রুচিকর প্রাত্যহিক ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল তৈয়ার করান হয়, অথচ ব্যয় সংক্ষেপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যায় তাহা হইলে ঐ সমুদয়, বিলাতীয় দ্রব্য অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই, এবং তাহাতে ঐ ব্যবসায়েরই সম্যক উন্নতি সাধিত হইবে এমন নহে, যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিবেন তাঁহার নিজের অবস্থাও তৎসঙ্গেসঙ্গে উন্নত হইতে থাকিবে।

একারণ এ বৃত্তি বুদ্ধিমান্ ভদ্র সন্তানদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য। এই উপায় অবলম্বন করিলে সুচারুরূপে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে তৎপক্ষে আদৌ সন্দেহ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে মৎস্যজীবীর ব্যবসায়ে আশানুরূপ লাভ হয় না, তাহার কারণ এই যে, সামান্য ভক্ষনোপযোগী মৎস্য ব্যতীত তাহারা অন্য কোন জলজজীবের ব্যবসায় করে না। বঙ্গদেশে মৎস্যাহার সাধারণতঃ প্রচলিত থাকায় অত্রস্থ মৎস্যজীবীগণকে সহজে ও স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়। ফলে মৎস্যের ব্যবসায়ে যে অনেক ধীবর জাতীয় লোকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। পরন্তু যদি এতদ্দেশে রীতিমত মৎস্যজীবীর ব্যবসায় (fishery) আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে যে অনেক অধিক লাভের পথ উন্মুক্ত হইবে তদ্বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না। সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশ সকল এই ব্যবসায়ের উপযুক্ত স্থান, কারণ সাগরগর্ভেই নানারূপ মৎস্য ও শঙ্খাদি এবং বহুমূল্য প্রবাল মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজি জন্মিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা ইউরোপীয় অনেক জাতি অগাধ অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। নরওয়ে দেশীয় লোকেরা কড্-লিবর অইল প্রস্তুত দ্বারা যে বাণিজ্য সংস্থাপন করিয়াছে তাহা জগতের আর কোন অংশেই হয় নাই। লঙ্কা দ্বীপে যে মুক্তার ব্যবসায় চলিতেছে তাহার

সদৃশ লাভজনক কার্য্য আর কিছু আছে কি না সন্দেহ।

ইদানিন্তন গোপের ব্যবসায়েও অধিক লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধের ব্যবহার এক্ষণে যে প্রকার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে ইহার ব্যবসায়ে অধিক লাভ আশা করা যাইতে পারে। দুগ্ধ ঘৃতাদি বিক্রয় করা যাহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়, তাহাদিগের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু যত দূর উন্নতি হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না ইহার কারণ এই যে আমাদিগের দেশের দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই মূর্খ এবং অনক্ষর। কিরূপে গাভী ও মহিষাদির শারীরিক ঔৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, এবং কি নিয়মে তাহাদিগকে পালন করিলে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এতদ্দেশের গাভী নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত; তাহাদিগের শরীরগত অবনতি হওয়াতে ক্রমশঃ দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় তাহাদিগের শারীরিক উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হওয়া অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কি উপায়ে গাভীর জাতীয় ঔৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহা কেহই অবগত নহেন, অথবা অবগত থাকিলেও তদ্বিষয়ে কেহই চেষ্টা করেন না। বিদেশীয় উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী ও বৃষ আনয়ন করাই ইহার এক প্রধান উপায়। ভিন্ন দেশীয় বৃহদ্‌কায় বলিষ্ঠ বৃষ ও গাভী, দেশীয় গাভী ও বৃষের সংসর্গে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ বৎস উৎপাদন করিবে, এবং কালক্রমে গাভিজাতির শারীরিক উন্নতি সাধিত হইবে। দুগ্ধের পরিমাণও তদনুযায়ী বৃদ্ধি হইবে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে হাঁসি জেলার গাভী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং ঐ দেশীয় গোরু আমদানি করা বিশেষ আবশ্যক। ইউরোপখণ্ডের অনেক স্থানে উত্তম জাতীয় গাভী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তাহাদিগের জীবিত থাকাই সন্দেহ। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের গাভী অতি উত্তম ও বলিষ্ঠ, এবং অষ্ট্রেলিয়ার জলবায়ু অনেক পরিমাণে ভারতবর্ষের সদৃশ বলিয়া ঐ দেশীয় গাভী অনায়াসে এ প্রদেশে জন্মিতে পারে। এ কারণ ঐ দ্বীপ হইতে গাভী আনয়ন করা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ। এই একমাত্র উপায় দ্বারা দেশীয় গাভীর জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অধিক দুগ্ধও আশা করা যাইতে পারে! এতদ্ব্যতীত, সবল বৃষও সুলভ হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা কৃষ্যুপজীবিদিগেরও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে শুদ্ধ ব্যক্তিগত উন্নতি হয় তাহা নহে, সমগ্র দেশের বহুল উপকার অবশ্যম্ভাবী। যদি সুশিক্ষিত উৎসাহশীল ভদ্রলোকেরা এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে যে তাঁহারা স্বাধীনভাবে ও সুখে জীবনযাপন করিতে পারেন তাহা নিসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, উল্লিখিত বৃত্তি সকল ব্যতীত আর কোন সহজ ব্যবসায় দ্বারা স্বাধীনভাবে ও সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে কি না। উপস্থিত অবস্থায় পশুর ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের সমাজে ইহা একটী ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, সুতরাং এ ব্যবসায়ে ভদ্রলোকেরা প্রায়ই অগ্রসর হয়েন না। সে যাহা হউক, সচরাচর ছাগ মেষ ও গাভীর ব্যবসায় করিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে দেখা যায়। ছাগের যেরূপ উৎপাদিকা শক্তি তাহাতে এক বৎসরের মধ্যে প্রতিশতে অন্ততঃ তিন হইতে চারিশত বৎস জন্মিতে পারে। ছাগ পালন করিতে বিশেষ ব্যয় নাই, কেবল রাখাল নিযুক্ত রাখিলেই তদ্দ্বারা চারণকার্য্য ও রক্ষণাবেক্ষণ হইতে পারে। বিশেষ এক্ষণে ছাগের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে যে উহা দ্বারা অধিক লাভ হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মেষের ব্যবসায়ও বিশেষ লাভজনক। যদিও মেষের উৎপাদিকা শক্তি ছাগের সহিত সমান নহে, কিন্তু মেষের মূল্য ছাগ অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং মেষের লোম বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ হইতে দেখা যায়, সুতরাং মেষের ব্যবসায় অন্ততঃ ছাগের ব্যবসায়ের তুল্য হইবে তাহার আর ভুল নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে কি উপায় দ্বারা গাভীর শরীরগত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। ছাগ, মেষ ও গাভী ব্যতীত আর একটী পশুর ব্যবসায়ে প্রচুর ধনলাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহা আমাদের সমাজে এতই নীচ বলিয়া গণ্য যে তাহার ব্যবসায়ে এতদ্দেশের কোন ভদ্রলোক যে কখন প্রবৃত্ত হইবে এমত্ সম্ভাবনা নাই। জাত্যভিমান ইহার একমাত্র প্রতিরোধক। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিবার কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকায় সেখানকার লোকেরা সকল বিষয়ে দিন দিন এতদূর উন্নতির পথে আরূঢ় হইতেছে। সে যাহা হউক, উপরোক্ত পশুদিগের ব্যবসায় ব্যতীত শূকরের ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। শূকর জাতির এককালীন ৮।১০টী সন্তান সচরাচর জন্মিয়া থাকে, সুতরাং বৎসরেকের মধ্যেই ইহার সংখ্যা প্রতিশতে অন্যূন পাঁচ শত হইবার সম্ভাবনা। শূকর ইংরাজদিগের নিকট অতি আদরের সামগ্রী, এবং তজ্জন্য অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। শূকরের বসা ইংরাজী ঔষধের সহিত এত অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে, তদ্দ্বারাও অনেক লাভ হইবার সম্ভাবনা। শূকরের ব্যবসায় করিতে হইলে শূকর প্রতিপালনের নিয়মাদি জানা আবশ্যক। ইংরাজীতে এ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, শূকরের ব্যবসায় করিলে যে প্রচুর ধন লাভ হইতে পারে তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। ফলতঃ যদি কোন ভদ্রসন্তান এই পথ অবলম্বন করিতে সাহসী হন এবং চাকর রাখিয়া স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে যে অনায়াসে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শূকরের ব্যবসায়ের ন্যায় চর্ম্মের ব্যবসায়

যেমন নীচ তেমনি ইহা প্রায় সমপরিমাণে লাভজনক। চর্ম্মের এক্ষণে যেরূপ বিস্তৃত ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এ ব্যবসায়ের যে কখন পতন হইবে এমত সম্ভাবনা নাই। চর্ম্মব্যবসায়ী মুসলমান ও ইংরাজেরা আজ কাল প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু ইহা দেখিয়াও আমাদিগের ঐ কার্য্যে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জন্মে না তাহার একমাত্র কারণ জাত্যভিমান। বঙ্গসমাজ এত স্থিতিশীল, যে সহসা একটা নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না—একটা নূতন পথ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এ সমাজে জীবন নাই, উৎসাহ নাই, বল নাই, একারণ সমাজের সংস্কার হইতেছে না—উন্নতির দ্বার চিরদিন অর্গল-বদ্ধ রহিয়াছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশ ছিল আজ আর তাহা নাই, এমন কি এক্ষণে সে অবস্থার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না। লোকের অভাব এখন এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে যে নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর কোন মতেই চলে না। এক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সমাজে যেন একটা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এ অবস্থায় আর চিরপ্রচলিত পথ অবলম্বন করা বিধেয় নহে। এক পথে সকলেরই স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহের নূতন ও সুগম পথ উদ্ভাবন করা আবশ্যক। যে জাতি সামান্য জাত্যভিমান রক্ষার জন্য পরের চর্ম্মপাদুকা শিরোপরি বহন করিতেছে, তাহারা স্বাধীন জীবনের প্রকৃত মূল্য অবধারণে নিতান্ত অক্ষম। তবে এক্ষণে ক্রমশঃ লোকের হৃদয়ে সত্যের বিকাশ হইতেছে—জ্ঞানচক্ষু ফুটিতেছে—অন্ধকার তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অধীনতা ক্রমশঃ যত ক্লেশকর বোধ হইবে ততই লোকের মন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনে ধাবিত হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে যে ব্যবসায় নীচ ও হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কালক্রমে তাহা অধীনতা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ নীচবৃত্তি হইলেও অধীনতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অগ্নি নিজ প্রভা প্রদর্শন করিবার জন্য সামান্য তৃণ আশ্রয় করিয়া থাকেন। অবশ্য একদিন আসিবে যে দিন নবীন উৎসাহে ও অসীম সাহসে উত্তেজিত হইয়া সকলে স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইবে। কিন্তু সে চির আকাঙ্ক্ষিত সুখের দিন কত দূরবর্ত্তী তাহা কে বলিতে পারে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
জুয়লজিকল গার্ডন্।
আলিপুর।

সন্ন্যাসীর জীবন। *

আমার পিতামাতা সহোদর ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রভৃতি কেহ না থাকাতে ও বিষয় কর্ম্ম সুখজনক বোধ না হওয়াতে সর্ব্বদা চিন্তা করিতাম কিরূপে মনের শান্তি হয়। মনে মনে এই বিষয়ের বহুতর্ক বিতর্ক দ্বারা অবশেষে এই স্থির করিলাম দেশ ভ্রমণে মনের শান্তি সুখ হইতে পারে, এই স্থির করিয়া উপস্থিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম ও দেশে যে কিছু সঙ্গতি ছিল পত্রের দ্বারা জ্ঞাতি ভ্রাতাদিগকে দান করিয়া পাঠাইলাম ও লিখিয়া দিলাম জন্মের মত তোমরা আমার আশা পরিত্যাগ করিবে আর আমার নিকটে যে সমুদায় দ্রব্যজাত ছিল তাহার মধ্যে এক ব্যাগে যাহা ধরে এমত বস্ত্রাদি রাখিয়া অন্যান্য দ্রব্যজাত নিলাম করিয়া দিয়া বহির্গত হইলাম ও ক্রমান্বয়ে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ২ মাস পরে দিনাজপুর আসিয়া দেখিলাম আমার অর্থ প্রায় নিঃশেষ। কি করি কিছু উপায়ান্তর না দেখিয়া খরচপত্র চালাইবার জন্য এক সামান্য ব্যবসা করিতে লাগিলাম ও সময় সময় ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলাম। এক মাসের পর এক দিবস ঈশ্বর কৃপায় একটী কায়স্থ আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন ও আমার নিকট ২।৪ দিবস থাকিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, আমিও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মতি দিলাম; ক্রমে তাঁহার পরিচয়ে জানিলাম তিনি এলে ফেল, ৩০ টাকা বেতনের চাকরী করিতেন, বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ উদ্দেশে আসিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি সন্ন্যাসী হইবেন। সন্ন্যাসী হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা ও ঈশ্বর উপাসনা করিবেন। এই সকল শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম আমিও আপনার সঙ্গী হইব, তিনি প্রথমতঃ অবিশ্বাস করিলেন তিনি কহিলেন আপনার এ কারবার কি করিবেন? আমি কহিলাম, ইহা অতি ক্ষুদ্র বিষয় কল্যই উঠাইয়া দিয়া তরসু এখান হইতে বহির্গত হইব। এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন তবে আমাদের উভয়ে বন্ধুতা পাতান উচিত, আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম ও উভয়ে অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম যে কেহ কোনরূপ পীড়াক্রান্ত হইলে বিশেষ যত্নের সহিত সেবা সুশ্রূষা করিব, যদি কাহারো

* এই প্রবন্ধ লেখক সন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে দেহরাধুনে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট বেদ শিক্ষা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে সাধারণ সন্যাসীদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যাইবে। সং।

মৃত্যু হয় তবে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া 'সমাপন' না করিয়া চলিয়া যাইব না। তবে যদি কেহ সাংসারিক সুখ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উভয়ে ছাড়াছাড়ি হইবে। আর আমরা সুখকর দ্রব্য এমন কি জুতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়াবস্ত্র পরিধান করিব ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিব, লোকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিব। মৎস্যমাংস ভোজন করিব না, তৈলস্পর্শ করিব না, এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। পর দিবস দেনদার পাওনাদার ও অন্য অন্য বন্ধু ও আলাপী সকলকে আমার উক্ত প্রস্তাব জ্ঞাত করাইলাম। শুভকার্য্যে ব্যাঘাত দিতে নাই বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পর দিবস পাওনাদারদিগের মধ্যে যিনি যাহা দিলেন তাহাই লইলাম। আর কহিলাম যাহা আমার প্রাপ্য থাকিল তাহা দীন দরিদ্রদিগকে দান করিও। মহাজন ও ঘরভাড়া ব্রাহ্মণ ও চাকর ইত্যাদির যাহা কিছু আমার নিকট পাওনা ছিল সমুদায় মিটাইয়া দিলাম। পরে গেরু আনিয়া বস্ত্রে রঙ লাগাইলাম ও রুদ্রাক্ষের মালা গাঁথিলাম। কালীর ভোগ দিয়া নিজে আহার করিলাম, ও উপস্থিত বন্ধুকে হবিষ্যান্ন ও দুগ্ধ ভোজন করাইলাম। বন্ধুর নিকট মোট নগদ ১৷৷০ টাকা ও সামান্য বস্ত্রাদি ছিল, কিন্তু বন্ধু জুতা ও সাদা বস্ত্র ছাড়িয়া, গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা ধরিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন আমি তাঁহাকে কহিলাম, বাঙ্গালিদিগের স্বভাবই এইরূপ, গাছে উঠাইয়া মৈ কাড়িয়া লইতে পারেন, মুখে বলিয়া কাজে করিতে পারেন না, তুমিই আমাকে এইরূপ বিষয়ে উৎসাহিত করিলে আবার তুমিই পিছাইতেছ। যদি আমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হই তবে লোকে আমাকে অজস্র উপহাস করিবে, আমি অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সন্ন্যাসী হইব তাহা যদি না হই তাহা হইলে এপাপ কখনই খণ্ডন হইবে না। আর আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে এখনো তোমার মনে সুখ-ইচ্ছা আছে, কেবল মুখেই তোমার বৈরাগ্য, আমিতো তোমাকে উপরোধ করিতেছি না আর তুমিই কহিয়াছিলে সন্ন্যাসী হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, ইহাতে মান অপমান সমুদায় বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি তাহাও স্বীকার পাইয়াছি। আর কেন, এই বলিয়া আমি গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলাম ও রুদ্রাক্ষের মালা আনন্দের সহিত গলায় দিলাম ও তাঁহাকে কহিলাম, ভাই আমি আনন্দের সহিত তোমাকে কহিতেছি যে তুমি বাটি যাও, বিবাহাদি করিয়া সুখে থাকগে, আর আমি তোমার যাওয়ার খরচ দিতেছি, এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন না আমি গৃহে যাইব না। সন্ন্যাসী হওয়াই আমার ভাল, শেষে তাঁহাকে গৃহে যাইবার নিমিত্ত বার বার উপরোধ করিলাম, কিন্তু তিনিও ম্লান মুখে আমার ন্যায় বেশ ধরিলেন। তখন তাঁহাকে কহিলাম আমাদের আর কোন দ্রব্যের আবশ্যক নাই সমুদায় বিলান যাক। তাহাতে তিনি কহিলেন আমাদের দুই জনার ছয় ধুতি তিন পিরান তিন গাত্র-বস্ত্র দুই পুস্তক এক ছাতা এক ঘটি

আর ৫ টাকা নগদ রাখিয়া অন্য সকল বিলাইয়া দেন, তাহাই করিলাম। বৈকালে অনেক লোক আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন আমিও তাঁহাদিগকে যথাযথ সম্ভাষণ করিয়া বসাইলাম ও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কহিতে লাগিলেন যে কোথা হইতে আসিয়া মিল হইল, আবার ফকির হইয়া চলিলেন,সংসারের কি আশ্চর্য্য ঘটনা। কেহ বা কহিতে লাগিলেন ইহাঁরা কত তীর্থ দর্শন করিবেন, ও কত তপস্যা করিবেন, আর ইহাঁরা জন্মান্তরে কত সুখ ভোগ করিবেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেহ বা কহিলেন জন্মান্তরে ইহাঁরা রাজা হইবেন, কেহ কেহ বা আমাদের বহু প্রশংসা আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ বা কহিতে লাগিলেন আমার যদি মা বাপ স্ত্রী পরিবার না থাকিত কিম্বা তাহাদিগকে পালন করিতে না হইত তাহা হইলে আমি নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যাইতাম। কেহ বা এইরূপ কহিতে লাগিলেন যে আর ২।৪ দিন এই স্থানে অপেক্ষা করুন আমি আপনাদের সঙ্গে যাইব, এইরূপ নানা জনের নানা কথা বার্ত্তায় সন্ধ্যা হইল। পরে বন্ধু কহিলেন,দেখ ফকির হইয়া গাঁজা খাইতে হয়। গাঁজা খাইলে দুঃখ দুশ্চিন্তা সকল হরণ হয়, মনের একাগ্রতা সহ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর উপাসনা খুব ভাল হয়, এই জন্যই যোগীরা সর্ব্বদা গাঁজা খাইয়া থাকেন, ও তাঁহারা কহেন গাঁজা না খাইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, আর আমি ২।৩ যোগীকে দেখিয়াছি তাঁহারা খুব গাঁজা খান আর যখন যা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া অনেকে সন্ন্যাসীদিগের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক আনার গাঁজা কিনিতে দিলাম।

রাত্রে বিশ্রাম করিয়া অতি প্রত্যুষে হাত মুখ ধুইয়া তামাক খাইয়া চাকরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দুই জনে বহির্গত হইলাম। কিন্তু জুতা পরিত্যাগ করার দরুণ পায়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিতে লাগিল। চিত্তে হর্ষ থাকা প্রযুক্ত তাহা ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। কিছু দূর যাইয়া সম্মুখে নদী দেখিলাম, পরপার যাইবার নিমিত্ত সেতু কিম্বা নৌকা দেখিলাম না, ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছি এমত সময় একটী লোক দেখিতে পাইলাম, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম নদী পার কিরূপে হওয়া যায়। সে কহিল হাঁটিয়া যান হাঁটুর উপর জল হইবে, কিন্তু আমি এক রূপ অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া পার হইলাম ও প্রায় ৪ ক্রোশ গিয়া এক চটিতে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু বেলা দুই প্রহর হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইল,রাস্তায় মুদির দোকান কিম্বা বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম নাই,কি করি কোন উপায়ান্তর নাই এজন্য ধীরে ধীরে চলিতেছি, কিছু দূর আসিয়া রাস্তার নিকট একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম, বন্ধু কহিলেন আমি এই গাছের তলে বসি তুমি গ্রামে গিয়া দেখ যদি কোন খাদ্য পাও তাহা হইলে লইয়া আইস। আমি তাঁহাকে বসাইয়া গ্রামের ভিতর গেলাম ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, দুগ্ধ কিম্বা অন্য খাদ্য সামগ্রী

পাওয়া যায় কিনা। এইরূপে ৭।৮বাটী ভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটী বাটীতে গেলাম, দেখিলাম দরজার সম্মুখে ৪।৫ টী মহিষ বাঁধা রহিয়াছে। গৃহটি দেখিয়া বোধ হইল নিশ্চয় এই বাটীতে কোন রূপ খাদ্য পাওয়া যাইবেক, মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত বোধ করিলাম, আরো ভাবিলাম যে খাদ্য দিয়া পয়সা ইহারা চাহিবে না। এজন্য হিন্দিতে বলিলাম আমরা দুই জন ব্রহ্মচারী অত্যন্ত ক্ষুধিত, একজন রাস্তায় বসিয়া আছে, দুগ্ধ দেও। যদি তাহা না থাকে তবে অন্য জিনিস দেও। এই বাক্যে গৃহস্বামী অপ্রসন্ন ভাবে উত্তর করিল, আবার খাবার চাহিতে আসিয়াছে! তাহাতে আমি তাহাকে কহিলাম পয়সা দিব, এই বাক্য শুনিয়া সে কহিল, শালারা আবার বুঝি আসিয়াছে, মার শালাদের—বলিয়া লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিতে উদ্যত হইল। আমি কহিলাম আমি বাঙ্গালী অদ্য জেলা হইতে আসিতেছি আমরা নূতন ব্রহ্মচারী; এই বাক্য শুনিয়া সে ক্ষান্ত হইল, আমিও তাহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাটিতে আসিলাম ও আমাকে মারিতে আসার কারণ সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কহিল আপনার ন্যায় পোষাক করিয়া দুই জন আসিয়া উহার নিকট জুয়াচুরি করিয়া গিয়াছে, এজন্য ও রাঙ্গা কাপড় দেখিয়াই চটিয়াছে। যাহা হউক গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যত দিন বাঙ্গালা দেশ না ছাড়াই তত দিন লোকের বাটীতে গিয়া হরিবোল বলিয়া ভিক্ষা করিব ও বাঙ্গালিদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিব, সন্ন্যাসী হইলেই যে হিন্দি কথা বলিতে হয় তাহার কোন মানে নাই, বন্ধুর বাক্য অনুসারে কার্য্য করিয়া অদ্য প্রথম দিনেই এত দুর্দ্দশা না জানি ঈশ্বর পরে কত কষ্টই দিবেন। কিন্তু গত কল্য বন্ধু ও অন্যান্য ভদ্র লোকেরা কহিয়াছিলেন সন্ন্যাসী হওয়া বড় কষ্ট,ঐকষ্ট সহ্য করিতে পারিলে তবে ঈশ্বর সদয় হন, কিন্তু কত কালে ঈশ্বর সদয় হবেন ও কত দিনে পূর্ব্বকৃত পাপ বিমোচন হইবে তাহা কিছুই বলিতে পারি না, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ম্লান মুখে বন্ধুর সমুখে উপস্থিত হইলাম ও তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর যাইয়া এক চাউল-বিক্রেতাকে দেখিলাম ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মুদি দোকান কত দূর। সে কহিল আর এক ক্রোশ হইবে, ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে কহিলাম যে আমাদের বড় ক্ষুধা ও পিপাসা পাইয়াছে, তুমি এক মুঠা চাউল দেও আমরা জল খাই। তাহাতে সে উত্তর করিল আপনারা কোন্ জাতি, আমি কহিলাম ব্রহ্মচারী, সে বুঝিতে না পারিয়া কহিল জাত না বলিলে দিব না, তখন কহিলাম ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী। সে উত্তর করিল মোট খুলিব না, উহা আমি বিক্রী করিব, কোঁচের চাউল এঁঠো বামুনকে দেব না। আমরা অনেক তাহাকে বুঝাইলাম যে চাউল এঁঠো হয় না, শেষে সে আমাদের দুই জনাকে দুই গাল চাউল দিল, আমরা তাহা মুখে

দিয়া জল খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম, জলপানে ও ক্ষণ কাল বিশ্রামে শরীরে বল পাইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু ক্ষণ পরে মুদির দোকানে উপস্থিত হইয়া শয়নাদির স্থান পাওয়া যায় দেখিয়া বন্ধু কহিলেন অদ্য ৮ ক্রোশ আসিয়াছি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অদ্য যাইবার কোন আবশ্যক নাই, প্রথমত কিছু জলখাবার খাওয়া যাক পরে পাক করিয়া খাওয়া যাইবেক। আমিও তাহাতেই সম্মতি দিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া, প্রথমত জল খাবার পরে পাক করিয়া আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া দেখি রাত্র হইয়াছে ভাবিলাম একবার ঈশ্বর উপাসনা করি। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই তাহাতে আবার সংস্কৃত কিছুই জানি না, কেবল গায়ত্রী জানি আর শুনিয়াছি গায়ত্রী সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, এই আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় ১০৮ বার জপ করিলাম, শেষে দুর্গা, দুর্গা, হরি, হরি, কালী, কালী, ইত্যাদি নাম করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলাম, ও শ্যামা বিষয়, ব্রহ্ম-সংগীত, ও অন্যান্য ২।৪টী গান করিয়া নিদ্রা যাইলাম। প্রাতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রথম দিনের ন্যায় নদী পার হইলাম, চলিতে আরম্ভ করিয়া ৪ ক্রোশ গিয়া মুদির দোকান দেখিলাম, কল্য কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া ঐ দোকানে চিড়া দধির ফলাহার করিলাম। এমত সময় এক জন বৈরাগী আসিয়া গাঁজা খাইল ও আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিল, ঐ সকল বাক্য শুনিয়া আমার মন নিতান্ত উদাস হইয়া গেল। পরে ওখান হইতে চলিয়া এক চটিতে গেলাম ঐ চটির ইস্কুল মাষ্টারের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত নিজ বাসায় লইয়া গেলেন ও ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,কেন এরূপ কঠিন আশ্রম আশ্রয় করিলেন। শেষে তাঁহাকে মনের বৈরাগ্য বিষয় জ্ঞাত করাইলাম তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সে যাহা হউক সে রাত্র তাঁহার আবাসে পরম সুখে কাটাইলাম। জুতা পরিত্যাগ করিয়া ২ দিবসে ১৭ ক্রোশ চলার দরুণ উভয়ের পদতলে ফেস্কা হওয়ায় চলিতে অক্ষম বোধে বন্ধু কহিলেন গাড়ি কর। আমি কহিলাম ব্রহ্মচারী হইয়া আবার গাড়ি, উহা অপেক্ষা ধীরে ধীরে চলিব, তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, টাকা রাখিয়া কি হইবে, পরে আমি তোমাকে অনেক টাকা জমাইয়া দিব, তাহাতে আমি কহিলাম টাকা জমাইতে তো বাহির হই নাই। আমি বলি গাড়ি চড়িয়া সুখ করা অপেক্ষা ঐ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিলে ফল আছে, তাহাতে তিনি কহিলেন, ভাই দান পরে করা যাবে, তুমি একটা গাড়ি কর। অগত্যা আমি তাহা ঠিক করিতে যাইলাম, ও গাড়ি রাত্রে যাইবে এইরূপ ঠিক করিয়া আসিয়া বন্ধুকে কহিলাম, ও তাঁহাকে লইয়া এক মুদি দোকানের বসিলাম। এমত সময় একটী যাত্রার দল আসিল তাহারাও আমার পূর্ব্ব পরিচিত, আমার বেশ দেখিয়া

দলাধ্যক্ষ মহাশয় একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, পরে নানা রূপ কথা বার্ত্তায় আমার মনের ভাব জানিয়া আমাকে কহিলেন আপনি আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করুণ আপনাকে আমরা সর্ব্বদা ভাল ভাল গান শুনাইব। আমি কহিলাম আপনি যা বলিলেন তাহা ভাল কিন্তু নানা দেশের তীর্থ সকল পর্য্যটন করিব ও কিছু সংস্কৃত পড়িয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, এইরূপ মনন করিয়াই দুই জনে বহির্গত হইয়াছি এজন্য আপনার কথায় সম্মত হইতে পারি না। এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় হইবার পূর্ব্বে দলাধ্যক্ষ মহাশয় কহিলেন নেপালে যাইয়া পশুপতিনাথ ও গুহ্য কালী দর্শন করিবেন, সেও বড় তীর্থস্থান শুনিয়াছি, আমি কহিলাম যদি ঈশ্বর লইয়া যান তবে যাইব। তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া মাষ্টার বাবুর বাসায় আসিলাম ও রাত্রে তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া গাড়িতে চড়িলাম। পর দিবস বেলা ২ প্রহরের সময় মহানন্দা নদীতীরে উপস্থিত হইয়া স্নান ও ফলাহারাদি করিয়া গাড়ি বিদায় দিলাম।

নদীপার হইয়া শুনিলাম এখানে হিন্দি ও মৈথিলি ভাষা চলিত। এখান হইতে এক ক্ষুদ্র চটিতে আসিয়া এক হিন্দুস্থানির দোকানে উপস্থিত হইলাম ও আহারাদি করিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম করিলাম। প্রত্যুষে মুদি কহিল আপনারা যখন ব্রহ্মচারী তখন আপনাদের এক কম্বল রাখা চাই, আর আপনার লক্ষ্ণৌ ছিটের রেজাই গাত্রে দেওয়া ভাল দেখায় না, ইহা শুনিয়া আমি ঐ রেজাই দিয়া তাহার নিকট এক কম্বল লইলাম ও পায়ের বেদনা উভয়েরি না কমায় উহার দুই ঘোড়া ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার সময় পূর্ণিয়া জেলায় উপস্থিত হইলাম।

ক্রমশঃ।

উদাসীন।

মিসর সমর।

ও

আরবীপাশা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কালঃ সৃজতি ভূতানি
কালঃ সংহরতে প্রজাঃ
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি
কালোঽহি দুরতিক্রমঃ।"

কালের কি অপরূপ লীলা! নিয়তির কি বিচিত্র গতি! দীর্ঘকাল হইতে মিসর-হৃদয়ে, যে অনল, লোক চক্ষুর অগোচরে, প্রচ্ছন্ন ভাবে, ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতেছিল, কালবশে সহসা তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে অতি অল্প কাল মধ্যে এই লোমহর্ষণ অনল-ক্রীড়ায় কত সুন্দর নগর গতশ্রী, ও কত মনুষ্য-জীবন বিনষ্ট হইয়া গেল। এই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে মিসর ভূমি কি শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল—জঘন্য শাসন-প্রণালীর কঠোর বিধানে উহার কি মুমূর্ষু-দশা উপস্থিত হইয়াছিল—তাহা যিনি সম্যকরূপে অবগত আছেন তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে অচিরে একটি ঘোর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইবে। অল্পকাল মধ্যে উহা সংঘটিত হইল। কিন্তু কোন্ অনিবার্য্য কারণে উহা ক্রমশঃ ভীষণতায় পরিণত ও দুইটি বিভিন্ন জাতীয় সমারানলে পর্য্যবসিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত সমগ্র ইয়ুরোপ ও সভ্য জগতের গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে এখনও অনেকে ঘোর সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতেছেন, এবং অনেকের নিকট আজিও ইহা বিষম রহস্যময় বোধ হইতেছে। আজি আমরা 'ভারতীর' প্রিয় পাঠক সমাজে এই যুদ্ধের আদিকারণ, প্রধান প্রধান ঘটনা, ও ভাবী পরিণাম ইত্যাদি বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চারিদিকে সভ্যতার স্রোত তরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে—শিক্ষিত জগতের রুচি দিনদিন পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিতেছে—এখন কোথায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমভাবে শান্তি বিরাজ করিবে, না কোথায় তাহার পরিবর্ত্তে উপর্য্যুপরি যুদ্ধবিগ্রহাদির প্রপী-

ড়নে উহার দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। ইয়ুরোপীয় রাজনীতির অপার মহিমা! এই নীতির অনন্ত লীলাময়ী শক্তি প্রভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীর প্রশান্ত বক্ষের উপর দিয়া উপর্য্যুপরি কয়টি অদ্ভুত যুদ্ধ সংঘটিত হইল। অল্প দিন হইল আমরা অতীব বিস্ময় সহকারে পর-রাজ্য-লোলুপ রুসিয়ার ক্রূর নীতির অন্যতর ফল স্বরূপ রুস-তুরুস্ক যুদ্ধের পরিণাম দেখিয়াছি, সেদিন আমরা বৃটেনিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বেকন্‌স্‌ফীল্‌ডের রাজনীতিজ্ঞান ও মন্ত্রণা-চাতুর্য্য-জনিত কাবুল যুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া মনে মনে হাসিয়াছি, এবং উহার অব্যবহিত পরেই জুলু অভিনয়ের ফল ও ফরাশির ভাবী আশা, যুবরাজ নেপোলিয়নের অদৃষ্টের শোচনীয় পরিবর্ত্তন দৃষ্টে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি, এবং সংপ্রতি বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ প্রণোদিত ভীম পরাক্রমশালী বৃটিশ সিংহের সহিত ক্ষীণ-প্রাণ মিসরের ভয়ানক অনল ক্রীড়া—বৃটেনিয়ার জয় ও মিসরের পতন—দৃষ্টে স্তম্ভিত হইয়াছি। যে কূট রাজনীতির অব্যর্থ অনুশাসনে রুস-তুরুস্ক যুদ্ধ, কাবুল ও জুলু যুদ্ধের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে—দুর্জ্জয় বৃটিশ সিংহ ভৈরব গর্জ্জনে দুর্ব্বল মিসরের প্রতি কেন আক্রমণ করিলেন—কেন তাহাকে চরণতলে বিদলিত করিয়া আপনার অতুল বল-বিক্রমের পরিচয় দিলেন—আজি আমরা সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করিতে প্রয়াসবান্।

মিসর প্রাচীন ইতিহাসের অতি প্রিয় সম্পত্তি। একদিন উহার গৌরব-ছটায় তদাপরিজ্ঞাত সভ্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল। উহা এক্ষণে তুরুস্ক রাজের (সুলতানের) একটি বৃহৎ উপরাজ্য। উহার শাসন-দণ্ড তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী খেদিবের হস্তে সমর্পিত। রাজ্যে সুনিয়ম বিধান ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন জন্য খেদিব সুলতানের নিকট ধর্ম্মতঃ দায়ী। বহু কাল হইতে এই দেশ প্রচুর শস্যশালিনী, বহুবিধ পণ্যদ্রব্য-জননী, প্রভূত ঐশ্বর্য্যময়ী বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এই গুণ-গরিমায় একদিন ইহার প্রতি ভুবনবিজয়ী সেকন্দর সার তৃষিত নেত্র নিপতিত হইয়াছিল—এই গুণগরিমায় প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ ও ফরাশিস্ জাতি ইহাতে অমোঘ অধিকার বিস্তারে নিজ নিজ প্রভুশক্তির পরিচয় দিতেছেন, এবং প্রধান বাণিজ্য-বর্ত্ম, সুয়েজ খাল খননের পর হইতে ইহার চতুর্গুণ গৌরববৃদ্ধি নিবন্ধন সকল সুসভ্য স্থানের বাণিজ্য প্রিয়, ক্ষমতাশালী জাতিগণ ইহাতে স্বস্ব জাতীয় অধিকার স্থাপন ও প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের জন্য একান্ত যত্নবান। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবার পূর্ব্বে, ইংরেজ, ফরাশিস প্রভৃতি ক্ষমতাশালী জাতিগণ যেমন বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে অপ্রতিহত প্রভাবে আপন আপন প্রবল প্রতাপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল হইতে মিসরেও তাঁহারা তেমনই দুর্জ্জয় ক্ষমতার জীবন্ত পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। এই ক্ষমতা প্রসারণের জন্য তথায় তাঁহাদের

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা (কন্সল্) নিয়োজিত আছেন—সপ্ত শ কন্সলের হস্তে দেশের অদৃষ্ট নিয়মিত হইতেছে।" খেদিব নাম মাত্র দেশের অধিপতি—তাঁহার ক্ষমতা বিভিন্ন ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীগণের অযথা মনোরঞ্জনে—তাঁহার তেজ, নিরীহ, দুর্ব্বল, অসহায় প্রজাপীড়নে—তাহাদের সার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে—তাহাদের হৃদয়ের শোণিত শোষণে! ভূতপূর্ব্ব খেদিব, ইস্মাইলপাশা ও তাঁহার পূর্ব্বতন অধিপতিগণের স্বস্ব ক্ষমতার অপব্যবহারে মিসরের দুর্দ্দশার একশেষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাঁদের ঔদাসীন্যে,—ইহাঁদের প্রশ্রয় লাভে, দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারীগণ সাধারণ প্রজাবর্গের উপর নির্ভয়ে যথেচ্ছাচার সমর্থন করিয়াছে। এই সকল সঙ্কীর্ণ হৃদয়, বিলাস-প্রিয়, স্বার্থপর কর্ম্মচারীগণের পাশবশক্তির নিকট প্রজাবর্গ পশুবৎ ব্যবহৃত ও ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ করভারে প্রপীড়িত, বিনাবেতনে রাজকীয় পরিশ্রমে নিয়োজিত, ন্যায্য সত্বে বঞ্চিত, সামান্য অপরাধে হৃত-সর্ব্বস্ব ও কঠোর দণ্ডগ্রস্ত এবং বিবিধ উৎপীড়নে যার পর নাই উৎপীড়িত হইয়া ইহাদের জাতীয় জীবন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। প্রজাসাধারণের দুরবস্থা যাহাতে সুলতানের কর্ণগোচর না হয় এই জন্য এই দুর্দ্দান্ত কর্ম্মচারীগণ, খেদিবের অনুমোদনে উৎকোচ দানে আলিপাশা, ফিউদ্‌পাশা ও মিধৎপাশা প্রভৃতি রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীগণের মুখবন্ধ করিয়াছিল। লোভ-পরতন্ত্র, স্বার্থপরায়ণ, কর্ত্তব্য-বিমুখ কয়টি হৃদয় পরের দুঃখে বিগলিত হইতে জানে? সুতরাং অত্যাচারের স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়াছে। জননী, সন্তানের অরুন্তুদ দুঃখে গোপনে ক্রন্দন করিয়াছে—ভগিনী, ভ্রাতার দুর্দ্দশায় সকাতর উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছে—স্ত্রী, স্বামীর লাঞ্ছনায় নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে—কেহই মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে কাহারও নিকট অন্তরের ব্যথা জানাইতে সাহসী হয় নাই—কে সে বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিবে? ধনশালী প্রতিবাসীর চক্ষুর উপর দিয়া এই সমস্ত লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে, সে অম্লানবদনে চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াছে—আসন্ন বিপদ-ভয়ে একটি কথা বলিতেও সাহসী হয় নাই। একদিকে অমিত-তেজা ইয়ুরোপীয় ও উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া অনন্ত সুখশান্তির ক্রোড়ে পালিত হইতেছে—প্রকৃতি দাসীর ন্যায় তাহাদের পরিচর্য্যায় রত—বিধাতা যেন তাহাদেরই জন্য মিসর ভূমিকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছেন। অপর দিকে দেশীয় অধিবাসীগণ পঙ্কিল শাসন প্রণালীর গুণে স্বদেশের ন্যায্য সত্ব-বঞ্চিত ও অপার লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে—তাহারা যে করভারে প্রপীড়িত বিদেশীয়গণ তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত, তাহারা যে বিচার লাভে বঞ্চিত, বিদেশীয়গণ তাহাতে সর্ব্বথা পরিপুষ্ট—তাহাদের কৃত অন্যায় কার্য্যও দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। এই সকল দেখিয়া ও সহিয়া তাহাদের মধ্যে দুই

একটি হৃদয় বেদনাবোধ ও ক্রন্দন করিতে শিথিল। প্রকৃতির গতি অতিক্রম করে এমন সাধ্য কাহার? অসংখ্য লোকের হৃদয়ের রক্ত পান করিয়া অতি অল্প সংখ্যক নরনারী পরম সুখে কালাতিপাত করিবে—সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ অনন্ত উৎপীড়নে উৎপীড়িত ও আত্ম-সত্ত্ববিবর্জ্জিত হইয়া ঘোর নিরাশায় ও দারুণ অন্তর্দাহে কালাতিপাত করিবে; এই জঘন্য অবস্থা দেশ মধ্যে কতকাল স্থায়ী হইতে পারে? রক্তমাংসের শরীর কতকাল বিনাবাক্যব্যয়ে কঠোর অত্যাচারের নিদারুণ কশাঘাত সহ্য করিতে সক্ষম? এরূপ অবস্থায় লোকে শান্তিহারা ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে—দেশে বিদ্রোহানল প্রধূমিত হইতে থাকে—তখন দেখিতে দেখিতে অন্তর্ব্বিপ্লব একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কাল বশে মিসরের ঠিক সেই দশা উপস্থিত হইল।

অপরিনামদর্শী, অবিবেচক ইস্মাইল পাশার শাসনকালে এই জাতীয় অন্তর্ব্বিপ্লব-বহ্নির প্রথম ধূম নির্গত হয়। তাঁহার ভীরুতা ও চক্রান্তে দেশ দুর্গতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। দেশীয় শাসনপ্রণালীর জঘন্য প্রথা, প্রজা সাধারণের দুরবস্থা, মিসরের ভাবী পরিণাম ও বৃটেনিয়ার অবশ্যম্ভাবী স্বার্থহানি চিন্তা করিয়া কতিপয় চিন্তাশীল বৃটিশ হৃদয় ব্যথিত হইল—বৃটিশ পার্লামেণ্টে তুমূল আন্দোলন চলিতে লাগিল। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী, লর্ড বেকন্স্‌ফীল্‌ড্‌ ও তাঁহার সহযোগী লর্ড সল্‌স্‌বেরি আর নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্যম থাকিতে পারিলেন না। শাসন প্রণালীর পঙ্কোদ্ধার, প্রজাবর্গের দুরবস্থা মোচন, বিজাতীয় চক্রান্ত ও প্রভুতা-পরিশূন্য স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপন জন্য, তাঁহারা খেদিবকে যথাসাধ্য সদুপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ উক্ত উপদেশ সুসঙ্গত জ্ঞানে তদনুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। ভ্রান্তমতি খেদিব, দুরভিসন্ধি, স্বার্থপরায়ণ, বিজাতীয় ও দেশীয় কর্ম্মচারীগণের কুমন্ত্রণায় পরিচালিত ও কুপথে নীত না হইলে মিসর ভূমি সহস্র সহস্র নরশোণিতে কলঙ্কিত হইত না—ইতিহাসে মিসরযুদ্ধ স্থান পাইত না—দেশের স্বাধীনতা-প্রিয় বীরগণ অকালে ঘাতক হস্তে নিহত ও দেশ হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইত না। বৃটিশ মন্ত্রণা-পরিচালিত খেদিবের উদ্দেশ্য ও অবলম্বিত কার্য্য পরিচিন্তনে পর-হৃদয়-শোণিত-পিপাসু নীচ চক্রান্তকারীদিগের অন্তর ব্যথিত হইল—তাহারা অবিলম্বে সর্ব্ব প্রযত্নে কুপরামর্শ দানে পাশাকে কুপথে পরিচালিত করিল। দেশ মধ্যে আবার অত্যাচারের স্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তখন বেকন্স্‌ফীল্‌ড ও তাঁহার সহযোগীগণ আর কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। দুষ্টবুদ্ধি পাশা সিংহাসনে থাকিতে মিসরের মঙ্গল নাই, এবং বৃটেনিয়ার স্বার্থহানি অনিবার্য্য, এই ভাবিয়া তাঁহারা সুলতানের সহিত গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করিলেন। সেই মোহিনী মন্ত্রণা-প্রভাবে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ গত হইতে না হইতে খেদিব প্রভু-শক্তির নিকট অবনত মস্তকে সিংহাসন হইতে বিদায় লইলেন। বর্ত্তমান টুইফিক পাশা তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শাসনকর্ত্তা পরিবর্ত্তিত হইল বটে, শাসন প্রণালী পরিশোধিত হইল না—দেশের প্রধান কণ্টক উৎপাটিত হইল বটে, কিন্তু তাহার পৃষ্ঠপোষক কণ্টকনিচয় বিদূরীত হইল না। দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় দুর্ণীতিক লোকের কুমন্ত্রণায় বর্ত্তমান খেদিব তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীগণ প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হইলেন। রাজস্ব বিভাগে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল—পাশা ঋণ জালে জড়িত হইতে লাগিলেন। প্রজাবর্গের উপর অযথা কর-নির্দ্ধারণ ও বিবিধ যথেচ্ছাচার সমর্থন, অধম-স্বভাব কর্ম্মচারীগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘকাল হইতে যে জাতি গো-গর্দ্দভের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছিল, এখন তাহারা বুঝিতে শিখিল, মনুষ্য সমাজে জন্ম-গ্রহণ করিয়া পশুবৎ ব্যবহৃত হওয়া মানব জীবনের দুরপনেয় কলঙ্ক। যে জাতীয় হৃদয় এতদিন ও ছিন্ন-বন্ধনে নিতান্ত ঘৃণিত অবস্থায় যাহার-তাহার পদদলিত হইয়াছিল, এখন তাহা ক্রমশঃ সংযুক্ত ও এক-প্রাণ হইয়া ক্ষত হৃদয়ে বেদনা বোধ করিতে শিখিল—একটি অঙ্গুলির তাড়নে ক্রমে তাহা একতানে কাঁদিতে শিখিল। দুই বৎসর হইল তাহারা পরস্পর একপ্রাণে মিলিতে শিখিল—একে অপরের দুরবস্থা মোচনে সমর্থ না হউক, তাহার দুঃখের অশ্রুতে আপনার অশ্রু মিশাইতে শিখিল।

মিসর যুদ্ধের সৃষ্টিকর্ত্তা আরবী পাশা এই নব্য সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইলেন। হতভাগ্য ফিলা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি আশৈশব স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশানুরাগ পোষণ করিয়াছিলেন। জন্মভূমির কলঙ্কে ও স্বজাতির দুঃখে ইহাঁর হৃদয় নিয়ত ক্রন্দন করিত।

আরবী প্রথমতঃ সৈনিক বিভাগে এক জন সামান্য কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত হন। স্বীয় অসামান্য বুদ্ধি ও কার্য্য-ক্ষমতা প্রভাবে শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি লাভ করেন, এবং লোকমোহন, সুন্দর স্বভাব গুণে দেশের প্রায় সমস্ত অধিবাসীর আন্তরিক অনুরাগভাজন হইয়া উঠেন। তুরুস্করাজ ইহাঁর আশ্চর্য্য প্রতিভা ও অসাধারণ কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া যারপরনাই প্রীত হইয়াছিলেন; এবং ধীরভাবে ইহাঁর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অল্প দিন হইল ইহাঁকে সামরিক বিভাগের শীর্ষ স্থানীয় যুদ্ধ-মন্ত্রীর পদে বরণ করিয়াছিলেন। উচ্চপদ লাভে আরবীর হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জন্মভূমির ললাট হইতে কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালন করিবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে উচ্চ পদের অধিকারী ও প্রভূত ক্ষমতাশালী করিলেন, এই ভাবিয়া আরবীর হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এখন তিনি সুযোগ পাইয়া স্বজাতীয় সুদক্ষ লোকদিগকে দলে দলে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার গৌরব ও দলবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। স্বদেশের মৃতকল্প দেহে নব-

জীবন সঞ্চারের উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় তিনি সদল মন্ত্রগ্রহণ করিয়া অভীষ্টসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। যে মন্ত্র বলে ইটালির স্বাধীনতা-প্রিয় প্রাতঃস্মরণীয় বীরগণ জন্মভূমির মৃতদেহে নবজীবন দান করিয়া বীর-জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিশৈল নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, সেই মোহিনী মন্ত্রে আরবীর হৃদয় মাতিয়া উঠিল—স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে শক্তির আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

যে নব্য ইটালি আজি নব তেজে তেজীয়ান, নববীর্য্যে বীর্য্যবান, ও নব উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া, জাতীয় গৌরব-সমাজে স্পর্দ্ধায় আসন অধিকার করিয়া, প্রবল সপ্ত রাজ্যের সহিত নির্ভয়ে প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহার মৃতাবস্থা ও পুনর্জ্জীবনের কথা মনে হইলে, মিসরের স্বাধীনতা-প্রিয় বীরগণকে প্রাণগত প্রীতি ও হৃদয়-জাত ভক্তির কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। এক দিন পুণ্যভূমি ইটালির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল—একবাহু বিচ্ছিন্ন হইলে অপর বাহু বেদনা বোধ করিত না—এক চক্ষু উৎপাটিত হইলে আর চক্ষু মুদ্রিত থাকিয়া নিরাপদ জ্ঞান করিত—পুণ্যাত্মা রায়েন্‌জী উহার মৃতদেহে সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন সেই নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ক্রন্দনে একটি হৃদয় বিগলিত হয় নাই। সভ্যতার আদি জননী, পুণ্যভূমি ইটালি ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। উহার স্বাধীনতা-প্রিয় বীরগণ অকালে ঘাতক-হস্তে নিহত ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই বীর-রক্তে, সেই বীর-অশ্রুতে আবার দুইটি বীর হৃদয় পরিগঠিত হইয়াছিল। বীর চূড়ামণি ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্‌ডীর পবিত্র নাম আজি সভ্য জগতের অযুত জিহ্বায় ক্রীড়া করিতেছে—ইহাঁদের বীর জনোচিত কার্য্য আজি সমগ্র বীর জগতের শিক্ষার প্রধান আদর্শ! ইহাঁরাই মৃত ইটালির প্রাণদাতা—ইহাঁরাই তাহার মঙ্গল বিধাতা। যে শক্তির তাড়িৎ প্রবাহ ইহাঁদের প্রত্যেক শিরা উপশিরায় সঞ্চরিত হইত, আরবীও সেই শক্তির প্রিয় উপাসক। অহো বিড়ম্বনা! অহো লাঞ্ছনা! আজি আরবীর অদৃষ্টগতি অন্য রূপ।

আরবী যখন দেখিলেন, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এমন লোক দেশে নাই,তখন তিনি স্বাধীন ভাবে দেশীয় শাসন-প্রণালীর প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শাসনপ্রণালী সংশোধন ও প্রজাবর্গের দুরবস্থা মোচন জন্য প্রথমতঃ খেদিবের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন। খেদিব তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে ক্রমে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। গত ১৮৮১ খ্রীঃঅব্দের ৯ই নবেম্বর তিনি ৪০০০ চারি সহস্র সৈন্যের সহিত আবদিন রাজপুরী অবরোধ করিয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে স্পর্দ্ধিত খেদিবকে ভয় দেখাইয়া আপনার প্রস্তাবে সম্মত করিয়াছিলেন। ১২১৫ খ্রীঃ অব্দে রাণিমিড নগরে ইংলণ্ডীয় ব্যারণ সম্প্রদায় দুর্ব্বৃত্ত জনরাজাকে

এইরূপে ভয় দেখাইয়া জাতীয় সত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। বীরভূমি বৃটেনিয়া বলিয়া তথায় এই উদ্যমে চিরস্থায়ী ফল জন্মিল কুলোকের কুচক্রান্তে মিসরে কোন স্থায়ী ফল জন্মিল না। কেবল সৈন্য দলের তেজ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতেই জাতীয় অন্তর্ব্বিপ্লব বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হইল।

নবেম্বর গত হইল, দেখিতে দেখিতে ডিসেম্বর শেষ হইয়া আসিল—রাজ্যের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল না—সমভাবে প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার চলিতে লাগিল। গতবৎসর জানুয়ারি মাসে আরবী তাঁহার দলস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পরামর্শ স্থির করিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সুলতানের নিকটে পত্র দ্বারা আপনার ইচ্ছা লিখিয়া পাঠাইলেন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দুই জনের মধ্যে পত্র আদান প্রদান চলিতে লাগিল। সুলতান আরবীর সঙ্কল্প অন্তরের সহিত অনুমোদন করিলেন, এবং তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিলেন এবং দূত দ্বারা এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান খেদিব টুইফিককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আরবীকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই সময় হইতেই আরবীর লক্ষ্য স্থির হইল, এবং ভিতরে ভিতরে জাতীয় অন্তর্ব্বিপ্লবের সমস্ত আয়োজন চলিতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে আরবী নির্ভয়ে ও সদর্পে খেদিবের নিকট আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। মিসর দেশে যতদিন বিজাতীয় প্রভুত্ব ও প্রতিযোগিতা প্রবল থাকিবে—যতদিন ভিন্নজাতীয় স্বার্থপর কর্ম্মচারীগণের দ্বারা উহার অদৃষ্ট নিয়মিত হইবে—ততদিন উহাতে কোন মঙ্গলের আশা নাই—ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। দেশে একবার অন্তর্বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে—উক্ত উভয় জাতির স্বার্থের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিবে, ইহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও এমন বিশ্বাস করেন নাই যে তজ্জন্য ফ্রান্স বা ইংলণ্ড যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সেদিন সিডানের গুরুতর আঘাতে ফ্রান্সের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—অল্পদিনমাত্র উহা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। উহার শিরোভূষণ গ্যাম্বেটা কায়মনে উহার জীর্ণ সংস্কার করিতেছেন—এরূপ অবস্থায় ফ্রান্স কখনই যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। পক্ষান্তরে ১৮৮০ খ্রীঃঅব্দে ইংলণ্ডের মন্ত্রী পরিবর্ত্তন কাল হইতে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ প্রমুখ যে বৃটীশজাতি তারস্বরে যুদ্ধের প্রতিবাদ ও শান্তির আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই জাতির প্রধান নেতা গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক দল পদস্থ থাকিতে, ইংলণ্ড কখনই ক্ষীণপ্রাণ মিসরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না—দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদসাধনে যে বৃটিশ জাতি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় ও ঘোরতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সভ্যজগতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ

করিয়াছেন, সেই জাতি মিসরের স্বাধীনতা-প্রিয় দাসাধমদিগের বিপক্ষে কখনই অস্ত্র ধারণ করিবেন না—এই আশার ছলনায় ভুলিয়া মার্চ্চমাস হইতেই জাতীয় অন্তর্বিপ্লবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রী বিজয়লাল দত্ত।

যাত্রা অবসান।

কে আছ গো করুণা করিয়া
দাও দাও পথ দেখাইয়া,
চলিতে শকতি নাই আর
শ্রান্ত অবসন্ন দেহ হিয়া।
যন্ত্রনার মহাদেশ মাঝে
কবে সে যে পড়েছি আসিয়া,
অসীম অনন্ত শূন্যময়
অশান্তির মরু পথ দিয়া—
অবিশ্রান্ত অবিরাম হায়
চলিতেছি কতদিন ধরে,
লক্ষহীন উদ্দেশ্য বিহীন
আশ্রয় আশ্রয় শুধু করে।
বিয়াকুল তৃষিত নয়নে
যেদিকে যেদিকে ফিরে চাই,
কিছু নাই কিছু নাই, চন্দ্র সূর্য্য তারা নাই
জল নাই স্থল নাই, জীব নাই জন্তু নাই,
গাছ নাই পাতা নাই, শুষ্ক তৃণটিও নাই,
কি এক ভীষণ শুধু শূন্যের অপার সিন্ধু
আঁধারে চমকে দিক দেখিবারে পাই।
রুদ্ধশ্বাস, দেহ কম্পবান
আকুল ব্যাকুল হৃদি প্রাণ,
একটু একটু বল নাই
প্রতি পদে পড়ে পড়ে যাই।
তবুও চলিতে আরো হবে,
এই পথ কখন ফুরাবে?
কোথা পাব—কোথায় আশ্রয়
আরো আরো কতদূর গিয়া;
কোথা সেই সুখের আলয়?
কোথা সেই শান্তির আশ্রয়?
কত দূরে ফেল এনু সব
এক দিন পথ হারাইয়া।
শত শত আশা-সূর্য্যশালী
দিবসের চির রাজ্য হতে
কবে সেই করেছি প্রয়াণ,
অসংখ্য রবির সেই হাসি,
প্রজ্জ্বলন্ত রশ্মি রাশি রাশি,
একে একে প্রায় সকলি নির্ব্বাণ।
সে যাত্রার এখনো রে তবু
হোল না হোল না অবসান।
কত দিন, জানিনাগো কতদিন

তার পর গিয়াছে চলিয়া,
সুখ শান্তি কথা ছুট শুধু
এখনো জাগিছে মনে মনে,
কেমন যে আছিল তাহারা
একেবারে গিয়াছি ভুলিয়া।
মানুষের আঁখির উপর
রবি শশী তারা তার পর,
না জানি উঠেছে কতবার
কতবার গিয়াছে নিভিয়া।
না জানি কতেক ঋতু চয়
আসিয়াছে গিয়াছে চলিয়া।
জনম মরণ কত গেছে
অনিত্য ধরার পর দিয়া।
বুঝি বা সে অগণ্য দিবস,
তা না হলে অতীতের স্মৃতি
একে বারে যায় কি মুছিয়া?
সকলেরি আছে আছে সীমা,
সকলেরি আছে আছে শেষ,
কোথায় ফুরাবে তবে এই
যন্ত্রনার অন্তহীন দেশ?
কত জ্যোতিঃ গ্রহ উপগ্রহ
লয়ে রবি নিজ সাথে সাথে,
অসীম আকাশ পথে পথে
বেড়াতেছে করি ছুটা ছুটি।
মহা দূর ব্যাপী সে সৌর বিমান
আর এক মহান মহান
আকাশে পড়িছে গিয়া লুটি।
তার শেষ হোল ঐ খানে;
ব্রহ্মাণ্ড মিশিছে ব্রহ্মাণ্ডের সনে;
সময় মিলায় সময়ের কোলে,
মিশায় অনন্ত অনন্তের তলে।

ফুরায় রে সকলি ফুরায়,
এ যাত্রার শেষ কোথা হায়!
কতদিন—তবে আর কতদিন ধরে
এমনিই হাহাহার করে
শূন্যের এ মহা সিন্ধু মাঝে
চলিব গো ভাসিয়া ভাসিয়া।
শত শত রবির সে ছটা
জীবন করিত যারা আলো,
সব গেছে গেছে মিলাইয়া।
একটি কিরণ রেখা তার
আছে মাত্র এবে অবশেষ,
চলিতেছি তাহাই ধরিয়া।
দেখিতে দেখিতে এইবার
তাও বুঝি যায় ফুরাইয়া।
একি হোল গেল যে গেল যে
সে রেখাও গেল যে নিভিয়া।
কি ভীষণ নিবিড় আঁধারে
চারিদিক পড়িল ডুবিয়া!
আসিল কি প্রলয়ের দিন?
স্থান চ্যুত হয়ে লক্ষ্যহীন
দ্যুলোক ভূলোক চরাচর
এখনি কি মহাশূন্য মাঝে
চূর্ণ চূর্ণ হইবে বিলীন?
লও দেব হাতটি ধরিয়া
এ ভীষণ আঁধার ঠেলিয়া
কোথা যাব যাই বা কেমনে
লক্ষ্যহীন আছি দাঁড়াইয়া।
আকুল স্তম্ভিত হৃদি প্রাণ
যাই বুঝি—গেনুযে পড়িয়া।
নিভিয়াছে জগতের আলো
জ্যোতিহীন—মুদিত নয়ান।

পরাণের স্তিমিত প্রদীপ কবে সেই করেছি প্রয়াণ,
এইবার হয় রে নির্ব্বাণ। সীমা বুঝি ফুরাইল হেথা
যন্ত্রনার মহারাজ্য দিয়া সে যাত্রার বুঝি অবসান।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

দার্শনিক শব্দ ও তাহার সহজ অর্থ।

আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব জ্ঞাপনার্থে ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে শব্দ-ভেদের সার্থকতা ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দগুলি কখন বা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের ভেদার্থ মারা যায়, কখন বা এমনি ঘোর প্যাঁচ করিয়া তাহাদের টীকা ও ভাষ্য করা হয় যে, কাহারো সাধ্য নাই তাহার ভিতর প্রবেশ করে। প্রথম পক্ষে এই একটি বলিবার কথা আছে যে, যেমন, চন্দ্র কখন সুধাকর কখন হিমকর কখন নিশাপতি এইরূপ নানা শব্দে উক্ত হইয়া থাকে, তেমনি, একই বস্তু বিভিন্ন লক্ষণের অনুরোধে বিভিন্ন শব্দে উক্ত হইলেই বা—তাহাতে দোষ কি? তাহাতে ঘোরতর মারাত্মক কোন দোষ নাই—সত্য, কিন্তু দোষ যে নাই তাহা বলিতে পারি না; একই শব্দের ওরূপ নাম-বাহুল্য কাব্যেরই অলঙ্কার—কাব্যকেই সাজে; তদ্ভিন্ন, লৌকিক ব্যবহার, বিজ্ঞান কিংবা দর্শন, এ তিনের কাহারো নিকট তাহা আদর পাইতে পারে না। স্ত্রীলোকের গাত্রে অলঙ্কার শোভা পায় বলিয়া পুরুষের গাত্রেও তাহা শোভা পাইবে—ইহার কোন অর্থ নাই। লৌকিক ব্যবহার স্থলে কেহ আর বলে না "সুধাকর উঠ্‌চে," সকলেই বলে চাঁদ উঠ্‌চে; বিজ্ঞান বা দর্শনের আলোচনা-স্থলে যিনি চন্দ্রের পরিবর্ত্তে হিমকর ব্যবহার করেন তিনি বোধ হয় বিজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞতার কিছু বেশী ভক্ত; "মনুষ্যগণ" তাঁহার মুখ-দিয়া বাহির হয় না—তিনি বলেন "মনুজ-কুল"; "সর্পদংশন" বলিতে তাঁহার বাধো-বাধো ঠেকে—বলেন "আশী-বিষ-দশনাঘাত;" তিনি "পণ্ডিত বর" বলিতে পারেন না—বলেন "বিবুধ-কুল-চূড়;" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজ-কাল-কার লোক বিজ্ঞতা অপেক্ষা বিজ্ঞানের বেশী আদর করেন, সুতরাং যে শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা গেল তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল! বহু দিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি এক সংবাদ পত্র বাহির করিয়াছিলেন,—তাহার নাম ছিল—সৌদামনী পত্রিকা; কোন

পাঠকের মনে হইয়াছিল যে, ছাপার ভুল-ক্রমে ম'য়ের ইকারটা পড়িয়া গিয়াছে; তাই তিনি সম্পাদককে সে ভুলটা সংশোধন করিতে বলাতে সুবিজ্ঞ সম্পাদক একটু হাসিয়া সুধীরে বলিলেন "সৌদামিনীও হয়—সৌদামনীও হয়;" অর্থাৎ যেন—সৌদামনী বলাতে বঙ্গ-ভাষার মহা একটা উপকার সাধন করা হইয়াছে! প্রচলিত শব্দের উপর পাণ্ডিত্য চলে না, অপ্রচলিত শব্দের উপর পাণ্ডিত্য চলে,—এই জন্য পণ্ডিত-শ্রেণীর মধ্যে অপ্রচলিত শব্দের বেশী চলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাবই শব্দের প্রাণ! সর্ব্বদা যে শব্দ ব্যবহার করা যায় তাহার চারিদিকে ভাব জড়ো হইয়া তাহাকে যাবজ্জীবন সমুন্নত রাখে। দেহ যেমন অন্ন সংগ্রহ দ্বারা জীবন ধারণ করে, শব্দ সেইরূপ ভাব সংগ্রহ দ্বারা জীবন ধারণ করে। চাঁদ একটা শব্দ,—ছেলে-বেলায় ধাত্রী মুখে "চাঁদা আয়" শুনিয়া শুনিয়া, সেই স্নেহের ভাব চাঁদ শব্দের গাত্রসাৎ হইয়া গিয়াছে; পূর্ণিমার চন্দ্র উঠিবার সময় বাল্যকালের ক্রীড়া সহচর সকলে মিলিয়া যতবার বলা গিয়াছে "ঐ দেখ চাঁদ উঠ্‌চে" ততবার চাঁদ শব্দ সখ্যভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে; এইরূপ এক একটি প্রচলিত কথা নানা ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে; অপ্রচলিত কথাগুলা অনশন-ব্রত ধারণ করিয়া নির্জ্জীব দশা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাদিগকে আসরে আনিয়া তাহাদিগকে এবং পাঠকবর্গকে কষ্ট দেওয়া নিতান্তই অবিধি। যে কথা-গুলা লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে কিন্তু পুস্তকে অথবা শাস্ত্রে প্রচলিত, তাহারাও প্রচলিত বলিয়া ধর্ত্তব্য,—কিন্তু তাহাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই অধিকারের মধ্যেই তাহারা প্রচলিত। হিমকর, সুধাকর, কাব্যে প্রচলিত, গম্ভীর ভাবের সাহিত্য বিজ্ঞানে চন্দ্রমা শব্দ প্রচলিত; লৌকিক ব্যবহারে চাঁদ শব্দ প্রচলিত; সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে যে, লৌকিক ব্যবহারে যে যে শব্দ প্রচলিত কাব্যেও তাহা চলিতে পারে,—কিন্তু সকল স্থানে তাহা বলা যাইতে পারে না। যে কবি বজ্র শব্দের পরিবর্ত্তে "দম্ভোলি, ইরম্মদ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন অনেকে মনে করেন তিনি ভাষার মহা উন্নতি সাধন করিতেছেন, কিন্তু আমরা সে কথা মানি না। প্রথমতঃ ইরম্মদ বলাও যা আর "তিরম্মদ" বলাও তা—একটা অশ্রুত-পূর্ব্ব শব্দ-মাত্র, তবে কি না ইরম্মদ শব্দ কোন্ এককালে প্রচলিত ছিল—এই যা প্রভেদ,—এ প্রভেদ কেবল নাম মাত্র। শুদ্ধ কেবল "বজ্র" বলিলে ইরম্মদ বা দম্ভোলি অপেক্ষা শতগুণ অধিক ভাব-ব্যক্তি হয়। যদি বজ্র-ধ্বনি কবির মনে বিশেষ কোন অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তবে কবি সে ভাব বিশেষণ বিশেষ কিংবা ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা নূতন-রূপে ব্যক্ত করুন না কেন তাহাতে ত বারণ নাই; তাহা না করিয়া তিনি যে, অভিধান-অরণ্য হইতে একটা প্রকাণ্ড শব্দ শিকার করিয়া আনিয়া সেই মড়া শব্দের শরীর মাহাত্ম্য দ্বারা জ্যান্ত

বজ্রের প্রাণ-মাহাত্ম্য ঢাকা দিতে চেষ্টা পা'ন, তাহাতে তাঁহার ভাবের অন্তঃসার-শূন্যতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। সেক্‌স্‌পিয়রও ত কবি—তিনি বিদ্যুৎকে lightning ছাড়া আর কিছু বলেন নাই—বজ্রধ্বনিকে thunder clap ছাড়া আর কিছু বলেন নাই—অথচ এটা কি জোরের বর্ণনা!

Jove's lightnings, the precursors
O' the dreadful thunder claps, more momentary
And sight outrunning were not;

এ সব বজ্র-বিদ্যুতের ঘটার কাছে দম্ভোলি প্রভৃতি বড় বড় আভিধানিক শব্দ ঘটা কত না হাস্যজনক!

কাব্য ক্ষেত্রেই যখন এইরূপ,—তখন বিজ্ঞান বা দর্শন-ক্ষেত্রে শব্দের মিতব্যয়িতা কত যে আবশ্যক তাহা বুঝাই যাইতেছে—অতএব সে বিষয়ে আর শব্দ ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ শব্দের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার জটিল টীকা ও ভাষ্য বিস্তার করা আর এক রকমের পাণ্ডিত্য। কিন্তু এরূপ পাণ্ডিত্য বিজ্ঞান এবং দর্শন-শাস্ত্রে সত্য-সত্যই আবশ্যক হয়। চক্র বলিলে যাহা সহজে বুঝায়, তাহা জ্যামিতিতে অনেক পেঁচাইয়া বলিতে হয়; বস্তু বলিতে সহজে যাহা বুঝায় দর্শন শাস্ত্রে তাহার ব্যাখ্যা করিবার সময় অনেক দিক্ বাঁচাইয়া ঘোর-প্যাঁচ করিয়া বলিতে হয়;—কিন্তু যেখানে সহজ কথায় কার্য্য-সিদ্ধি হয়, সেখানে ওরূপ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিবার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমতঃ, বিভিন্ন দার্শনিক শব্দ যেখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেখানে গোড়ায় তাহাদের কিরূপ অর্থ-ভেদ ছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা,—যে ভাব একটা শব্দ দ্বারা সম্যক রূপে ব্যক্ত হইতে পারে, সে ভাব ভিনটা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা বড় যে বিজ্ঞতার লক্ষণ তাহা নহে—এক পয়সার সামগ্রী তিন পয়সায় ক্রয় করা যেমন বিজ্ঞতার লক্ষণ উহাও সেইরূপ। কাহারো কাহারো শব্দ-বৎসলতা অতীব বিস্ময়-জনক; "কিরূপ" বা "কি প্রকার" বলিলেই হয়—কিন্তু পাছে এক শব্দ ব্যবহার করিলে আর এক শব্দের অপমান-বোধ হয়—তিনি বলেন "কি রূপ প্রকার।" কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায় যে, "অমুক লোক প্রত্যূষে ধ্যান ধারণা সমাধি করিয়া থাকেন" বক্তার মুখে অতগুলা কথা—কিন্তু তাঁহার মনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে "আমি অত-শত বুঝি না ইষ্ট দেবতার ধ্যান করেন এই মাত্র জানি"। ইহাতে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, ধ্যান শব্দটাই কেবল ভাব প্রকাশের জন্য আবশ্যক—ধারণা ও সমাধি এ দুটা কেবল বিজ্ঞতা-প্রকাশের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় দুই ব, তিন শ, ও দুই ন, পণ্ডিত মূর্খ বাছিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, অথচ এক শ, এক ন, ও এক ব কাজ করে—আর সকলে ঘুমায়। কতক

গুলি দার্শনিক শব্দের ঐরূপ দশা উপস্থিত। কিন্তু গোড়ায় তিন শ'য়ের, দুই ন'য়ের ও দুই ব'য়ের উচ্চারণ-ভেদ ছিল ইহাতে আর ভুল নাই—দার্শনিক শব্দ-সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। দার্শনিক শব্দ বৈচিত্র্যের গোড়ার খবর অন্বেষণ করা আমাদের প্রথম কল্প;—দ্বিতীয় কল্প এই যে, এক জাতীয় শব্দ গণের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি ঐক্যও আছে—টীকা ও ভাষ্যের দৌরাত্ম্যে অনেক সময় সে ঐক্যটি মারা পড়ে। পরমাত্মা এবং পরব্রহ্ম এ দুই শব্দের অর্থ-ভেদ আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু ইহা বলিয়া পরব্রহ্ম যিনি তিনি স্বতন্ত্র পরামাত্মা যিনি তিনি স্বতন্ত্র—এইরূপ এক সত্তাকে বিভিন্ন রূপে সমর্থন করা নিতান্ত অবৈধ কার্য্য। এইরূপ অবৈধ অর্থ-ভেদের প্রতিবিধান করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

যতগুলি—দার্শনিক শব্দ আছে, অস্তি এবং ভাতি এই দুটি শব্দ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। "ভাতি" হ'চ্চে বস্তুর প্রকাশ, এবং সেই প্রকাশ দ্বারা যে অস্তিত্ব সূচিত হয়, তাহা অস্তি শব্দের বাচ্য। স্বপ্ন-কালে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা প্রকাশই পায়; তাহার মূলে হস্তী অশ্বের বাস্তবিক সত্তা নাই। "বাস্তবিক সত্তা নাই" এ কথার অর্থ কি? জাগ্রৎ কালে আমরা যখন হস্তী অশ্ব প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের মন হস্তী-অশ্বের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করে, এবং হস্তি অশ্ব চলিয়া গেলেও তাহাদের সেই সব প্রতিমূর্ত্তি আমাদের মনে জাগিতে থাকে। রাত্রিকালে যখন বাস্তবিক হস্তী অশ্ব নিদ্রায় অচেতন, তখন তাহাদের সেই প্রতিমূর্ত্তিগুলা জাগিয়া উঠিয়া স্বয়ং কর্ত্তা হয়; আসল কর্ত্তাদের নামে আপনাদের পরিচয় দেয়; ভাতি তখন আর ভাতি থাকে না, লোকের চক্ষে ধুলা দিয়া তাহা তখন অস্তি হয়; পূর্ব্বে যেমন তাহারা চুপচাপ ছিল এখন তেমনি মনের সাধ মিটাইয়া রাজ্যময় দাপাদাপি করিয়া বেড়ায়। আমারই সব কল্পনা—অথচ তাহারা এমনি ভান করে—যেন—আমার সঙ্গে তাহাদের কোন কালেই আলাপ পরিচয় ছিল না; আমি নিজে আমার চিত্ত-পটে যে সব ছবি আঁকিয়াছি তাহারা এক এক জন এক এক অবতার হইয়া আমার সহিত মুখামুখি উত্তর প্রত্যুত্তর করে, এমন কি সময়ে সময়ে তাহারা এরূপ উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তি ধারণ করে যে, তখন তাহাদের সামলানো ভার হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া অস্তি এবং ভাতির মধ্যে প্রভেদ—কিরূপ বোধ হইতেছে? জাগ্রৎকালে স্বপ্নকে নাট্য শালা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় সে নাট্যশালা কঠিন কার্য্যক্ষেত্র অপেক্ষা কম কিসে? যদি এরূপ হইত যে, আজ যে স্বপ্ন দেখিলাম, কালও সেই স্বপ্ন বা তাহারই ডালপালা দেখিতে বাধ্য হই, এবং প্রতি রজনীতে যদি সেই একই স্বপ্নের লেজুড় যথা-নিয়মে চলিতে থাকে। যদি আজ রাত্রে স্বপ্নের ভারতবর্ষ ছাড়িয়া, এক সপ্তাহ বাদে স্বপ্নের চীন দেশে উপনীত হই, এবং তথা হইতে একই পথ দিয়া পুনর্ব্বার এক সপ্তাহ

মধ্যে স্বপ্নের ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসি; তাহা হইলে স্বপ্নের স্বপ্নত্ব একেবারেই ঘুচিয়া যায়, তাহা হইলে জাগ্রৎ-কালের এই যে জগৎ ইহার পাশাপাশি আর একটি জগৎকে মানিয়া চলিতে হয়; এখন, কালের কেবল একটি মাত্র ধারা আনুপূর্ব্বিক চলিয়া আসিতেছে; তখন দুই বিভিন্ন কালের দুই বিভিন্ন ধারা চলিতে থাকিবে। জাগ্রৎ-কালের তারিখ সকাব্দা ১৮৮৪, স্বপ্নকালের তারিখ হয় ত ভরতাব্দা ১৯০০, এইরূপ দুই তারিখ পাশাপাশি চলিতে থাকিবে। অতএব অস্তি এবং ভাতির মধ্যে ভেদাভেদ এইরূপ যে, ভাতি স্থির থাকিলেই তাহা অস্তিরূপ ধারণ করে অস্তি অস্থায়ী হইলেই তাহা ভাতিরূপ ধারণ করে। অদ্য রাত্রের স্বপ্ন কল্য-রাত্রে স্থির থাকে না বলিয়াই স্বপ্ন আমাদের নিকট শুদ্ধ কেবল ভাতি বলিয়া প্রতিভাত হয়; এবং আজকের দিনের সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রভৃতি মূল ঘটনা যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত অটল থাকিবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনা স্বয়ং যদিও স্থির না থাকে তথাপি তাহা এবং তাহার ফল প্রবাহের নিয়ম যুগান্তর পর্য্যন্ত অচল থাকিবে—ইহারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা জাগ্রৎ জগৎকে অস্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করি।

আমরা উপমা-চ্ছলে ইতিপূর্ব্বে দুই পৃথক্ জগতের সহবর্ত্তিতা কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইবার জো নাই;—জাগ্রত-কালের পরে স্বপ্ন-কাল উপস্থিত হয়; পরক্ষণে যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার কারণ-সত্তা তাহার পূর্ব্বক্ষণে বর্ত্তমান থাকিতেই চায়; যদি বল যে, জাগ্রৎ জগতেই স্বপ্ন জগতের কারণ বর্ত্তমান, তাহা হইলে দাঁড়াইবে যে, জাগ্রৎ জগৎ ও স্বপ্ন জগৎ একই কার্য্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত সুতরাং তাহারা দুই বিভিন্ন জগৎ নহে কিন্তু একই জগতের উত্তরোত্তরবর্ত্তী পরিণাম-দ্বয়। আর যদি বল যে, আজ-রাত্রের স্বপ্নের কারণ গত রাত্রের স্বপ্নে বর্ত্তমান, তাহা হইলে গত-রাত্রি এবং অদ্য-রাত্রির মধ্যেকার যে সময়টি মাড়াইয়া সেই কারণটি চলিয়া আসিয়াছে, সে সময়ে জাগ্রৎ জগৎ আমাদের মনের উপর কার্য্য করিয়াছে; দুই জগৎ একই সময়ে আমাদের মনের উপর কার্য্য করিয়াছে—স্বপ্ন-জগৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করিয়াছে, জাগ্রত-জগৎ ব্যক্ত ভাবে কার্য্য করিয়াছে; সুতরাং তখন আমাদের মনের অভ্যন্তরে দুই জগৎ একত্র জোড়া দেওয়া ছিল; অতএব আমাদের মন-শুদ্ধ-ধরিয়া দুই জগৎ এক জগতেরই দুই অংশ ছিল; এ ভিন্ন কোন কালেই পরস্পর অসম্বন্ধ দুই পৃথক্ জগৎ কাহারো জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না। অতএব অস্তি এবং ভাতি এ দুইটি দুই বিভিন্ন জগৎ নহে; অস্তিকে যদি সত্য জগৎ বল আর ভাতিকে যদি স্বপ্ন-জগৎ বল, তবে তাহা কবিতাতে চলিতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া সত্য-সত্যই যে, তাহারা পরস্পর অসম্বদ্ধ দুই জগৎ তাহা হইতে পারে না; কেন না ভাতি যদিও অস্তির এক প্রকার বিরোধী পক্ষ, তথাপি উভয়ের একটি আর একটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, উভয়ের বিরোধের মূলে ঐক্য রহিয়াছে। মহাকাল এবং খণ্ডকাল উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—মহাকাল অনাদ্যন্ত, খণ্ড কাল আদ্যন্তবান্ অথচ মহাকালকে ছাড়িয়া খণ্ডকাল থাকিতে পারে না, খণ্ডকালকে ছাড়িয়া মহাকাল থাকিতে পারে না;—অস্তি এবং ভাতির মধ্যেও ঐরূপ অকাট্য সম্বন্ধ।

ক্রমশঃ।

গান।

১

সভয়ে সঙ্কোচে অতি ধীরে ধীরে,
কতনা যতনে কতনা আদরে
ও নামটি করি উচ্চারণ,
একেবারে গোলে যায় মন!

২

সরমে ফোটেনা কোন কথা,
সরমে জনমে কত জ্ঞান!
কতই যে সাধ যায় তোর
ওরে মোর পাগল পরাণ!

৩

কত দিন কত রাত কোথা দিয়ে চোলে গেল
প্রতিধ্বনি জেগে তবু আছে
নিতান্ত উন্মাদ সম মাঝে মাঝে দেয় সাড়া
ছুটে গিয়ে হৃদয়ের কাছে!

৪

প্রাণের কোথায় হ'তে কে যেন কাঁদিয়াওঠে,
বুকের ভিতর ফেটে যায়;
মর্ম্মভেদি হৃদি ভেদি দু একটি অশ্রুজল
ধীরে ধীরে কপোলে গড়ায়!

৫

কি যে মাখা আছে ওই নামে
জেনেও জানেনা যেন প্রাণ!
সরমে ফোটেনা কোন কথা,
সরমে জনমে কত জ্ঞান!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ফুলের মালা।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে, মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে একটি পালঙ্ক। নদীর দিকে মুখ করিয়া রাজকন্যা কল্পনালতা সেই পালঙ্কে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। লাবণ্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, চকিতের ন্যায় কল্পনার হাত হইতে বীণাটি টানিয়া বিছানায় ফেলিয়া দিল, তাহার পর কল্পনার গলা জড়াইয়া অতি

আকুল ভাবে বলিল "দিদি দিদি মুহূর্ত্ত মাত্র সময় নাই, উপায় কর উপায় কর" লাবণ্যের ব্যাকুলতা দেখিয়া কল্পনার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, অতি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "কি হইয়াছে লাবণ্য, কি উপায় করিব ?"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি তাহার ব্যাকুলতার কারণ যতটা বলিতে পারে বলিয়া বলিল "এখনি রামরায় না পালাইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষার আর উপায় নাই" বলিতে বলিতে লাবণ্যের ঘনকৃষ্ণ সুদীর্ঘ নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, লাবণ্য হাসিতে তাহা ঢাকিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রামরায়ের অতুল শৌর্য্য বীর্য্য, তাহার অসীম গুণরাশি, তাহার উদার মুখকান্তি লাবণ্যের মনে জাগিয়া উঠিল," সে সকলি রামরায়ের গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল, লাবণ্য দেখিল রামরায় নির্দ্দোষী। একজন নির্দ্দোষীর শাস্তি হইবে, লাবণ্য জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে? পিতা মাতার বিপক্ষ হইলে ইহাতে সে কোন দোষ দেখিল না। লাবণ্য আবার বলিল "দিদি দিদি আর সময় নষ্ট করিও না শীঘ্র উপায় কর" দিদির হাতেই যেন সমস্ত উপায় পড়িয়া রহিয়াছে, দিদি ইচ্ছা করিলেই সব হইবে। কল্পনাও উপায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মনের ব্যগ্রতা ভরে বলিলেন" উপায় তো আর কিছুই দেখিতেছি না" কি করিয়া তাঁহাকে সাবধান করা যায়? ভবানী বলিয়া কল্পনার সমবয়স্কা এক প্রিয় দাসী ছিল। সে নদীতীরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল এক উপায় আছে, নদীতীরে ঐ দেখুন রামরায় বসিয়া আছেন, যদি এক পত্র লিখিয়া কোন কঠিন দ্রব্যে বাঁধিয়া উহাঁর সম্মুখে ফেলিয়া দেন—তাহা হইলেই হয়।

রাজকন্যা প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলা বীণা বাজাইতেন, রামরায় তাহা শুনিবার জন্য প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলা নদী তীরে আসিয়া বসিতেন। কে বাজাইত তাহাকে কখনও রামরায় দেখেন নাই। বীণার প্রত্যেক ঝঙ্কারে তাঁহার মনে কল্পনাময়ী একটি প্রতিমা অঙ্কিত হইত, তিনি মুগ্ধ চিত্তে তাহারি ধ্যান করিতেন। দাসীর কথায় কল্পনা তাড়াতাড়ি পত্র লিখিতে বসিলেন, লাবণ্য পালঙ্ক হইতে নামিয়া বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইল, পূর্ণিমার পূর্ণালোকে লাবণ্যের লাবণ্যময়ী মধুর মূর্ত্তি রামরায়ের চক্ষে প্রতিভাত হইল। এ কি এ সৌন্দর্য্য! রামরায় চিরদিন ধরিয়া কল্পনাতে যে মূর্ত্তি আঁকিয়া আসিয়াছেন তাহারি জীবন্ত প্রতিমা তাঁহার চক্ষের সামনে। রামরায় নিস্পন্দ নেত্রে পাষাণ চিত্রের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া রহিলেন। আকাশে আর তারা নাই, চন্দ্র নাই, পৃথিবীতে আর নদী নাই, উদ্যান নাই, প্রাসাদ নাই, ব্রহ্মাণ্ডে যেন ব্রহ্মাণ্ড নাই, একটি হাস্যময়ী ক্ষুদ্র মধুর মূর্ত্তির মধ্যে যেন সমস্ত বিশ্বচরাচর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, একখানি ক্ষুদ্র প্রতিমার মধ্যে কুসুম চন্দ্র তারকার সৌন্দর্য্য মহিমা একত্রিত হইয়াছে। রামরায় লাবণ্যের সেই প্রেমময় অতুলন সৌন্দর্য্যশালী এক খানি মুখে সমস্ত জগতের সুখময় উন্মত্ততা অনুভব করিতে লাগিলেন।

কল্পনার পত্র লেখা হইল, লিখিলেন "রামরায়, এখনি পলায়ন করুন, মুহূর্ত্ত মাত্র নষ্ট করিবেন না, নহিলে বিদ্রোহী অপরাধে আজ রাত্রেই কারারুদ্ধ হইবেন, কাল আপনার জীবন পর্য্যন্ত সংশয়। কল্পনা" পত্র খানি কঠিন দ্রব্যে বাঁধিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, কোথায় তখন কি খুঁজিয়া পান, তাড়াতাড়ির সময় যেন সকলেরি অভাব হয়, এদিকে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব সহে না, তিনি মনের ব্যগ্রতাভরে হস্তের স্বর্ণবলয় খুলিয়া তাহাতেই পত্র খানি বাঁধিলেন পরে তাহা ফেলিয়া দিতে বাতায়ন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কি জানি কেন লাবণ্য একটু লজ্জিত ভাবে বাতায়ন হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। রামরায়ের চমক ভাঙ্গিল, কল্পনার সঙ্গে চক্ষে চক্ষে সংলগ্ন হইল, ইনি আবার কে! উন্নত উদার ভাবের জীবন্ত, প্রতিমা রূপিণী, সুকোমল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য শালিনী, বিমলকান্তি শ্বেতাম্বরী, দেবী সরস্বতী বালিকাবেশে ?

রামরায় মুখ নত করিয়া বিস্ময়ে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মনে মনে প্রণাম করিলেন। অধিকক্ষণ সে মুখের প্রতি চাহিতেও যেন ভরষা হইল না, সে দেব-সৌন্দর্য্য মানব চক্ষুর যেন অনধিগম্য; মানব দৃষ্টিতেও যেন তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শিবে। প্রেম ভিন্ন হৃদয়ের যে একটি নিঃস্বার্থ পূজনীয় ভাব আছে, সেই ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইল।

কল্পনা পত্র-সংযুক্ত বালা ফেলিয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্র খচিত চন্দ্রমাশোভিত অম্বরতলে, জ্যোৎস্নালোকদীপ্ত, সুগন্ধী-পবন-তরঙ্গিত উপবন মাঝে প্রস্তরময়ী বীণাপাণি মূর্ত্তি নিম্নে বসিয়া কল্পনালতা বীণা বাজাইয়া গান করিতেছিলেন

"প্রেমের অমৃত বিষে
হৃদয় তো রয়েছে ভরিয়ে
তবে কেন পিয়াস মিটেনা
সই, মেটে কি করিয়ে!
কি মদিরা মাখান সে মুখে
সারাদিন রাখি চোখে চোখে
সারাদিন পিয়া হিয়া ভরি
তবু কেন পিয়াস মেটে না ?
তবু কেন অতৃপ্ত সে জ্বলন্ত বাসনা ?
সুধা পানে মত্ত হিয়া
সুখোচ্ছ্বাসে উঠে আকুলিয়া!
মরি সখি সুখেতে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া আবার চাই বিষে।
বড় সাধ সে হৃদয় এ হৃদয়ে মিশে
বড় সাধ হিয়ায় হিয়ায়,
একেবারে মিলাইয়ে যায়
বল সখি হয় কি করিয়ে ?

নিশীথের সুগন্ধী পবনে তরঙ্গিত হইয়া সঙ্গীতের সেই মধুময় লহরী আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। এই সময়ে যুবরাজ সোমনাথ কি একটি বিষাদময় ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে উদ্যানাভিমুখে আসিতেছিলেন, সহসা তাঁহার গম্ভীর মুখকান্তি হাসিয়া উঠিল, প্রেমের নূতন সম্ভাষণের ন্যায় সেই গীততানে সহসা তাঁহার হৃদয়ের প্রতি শিরা

উপশিরা কাঁপিয়া উঠিল, তিনি দুঃখের ভাবনা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিলে পাছে কল্পনার গান থামিয়া যায়, তিনি কল্পনার নিকট হইতে কিছু দূরে একটি বৃক্ষ তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রেম-ভাব দীপ্ত—চন্দ্রালোক-বিভাসিত সেই মধুর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কল্পনা ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী, তথাচ সে সৌন্দর্য্যে যৌবনের প্রখরতা কিছুই নাই, তাঁহার সেই স্নিগ্ধ বালিকা সৌন্দর্য্য—নির্ম্মল, রমণীয় নিরূপম। ফুলের কোমলতা, জ্যোৎস্নার মধুরতা, উষার রমণীয়তা দিয়া যেন বিধাতা কল্পনাকে সৃজন করিয়াছেন, প্রত্যেক অবয়বের বর্ণনা করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। কল্পনার ঈষদ্দীর্ঘ পবনভরব্যথিত কুসুমকোমল, শুভ্রবস্ত্র শোভিত ক্ষুদ্র দেহ খানির উপর, কুঞ্চিত কেশদামশালী, সুশোভন অমল শ্বেত গ্রীবা বৃন্তে যে মুখখানি ফুটিয়াছে, তাহা নিরূপম। কুঞ্চিত অলকদামশোভিত নির্ম্মল ললাট, সুবর্ণ ওড়না যুক্ত, নিবিড় কেশরাশি বেষ্টিত রমণীয় মস্তক, বীণাবদ্ধদৃষ্টি আনত নয়নদ্বয়ের সুস্নিগ্ধ কটাক্ষ, মুখখানির প্রচ্ছন্ন বিষাদময়ী একটি কান্তি,সকলি অতি সুমধুর। কল্পনার প্রত্যেক চাহনি, প্রত্যেক অঙ্গ চালনা, প্রত্যেক পদক্ষেপ পর্য্যন্ত মধুময়, কল্পনা মধুরতার একটি জীবন্ত প্রতিমা। সেই সৌন্দর্য্য রাশি দেখিতে দেখিতে, সেই মধুকণ্ঠের গীত শুনিতে শুনিতে সোমনাথের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, প্রাতঃসমীরচুম্বিত কুসুমের ন্যায় বিহ্বল হইয়া উঠিল। গান শেষ না হইতে হইতে সোমনাথ ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সোমনাথ রায়গড়ের যুবরাজ। দেবরায়ের সহিত সোমনাথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, সেই নিমিত্ত দেবরায় বাল্যকাল হইতেই কল্পনাকে সোমনাথের বাক্‌দত্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। নানা কারণে এতদিন তাহাদের বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই, সম্প্রতি বিবাহের জন্যই সোমনাথ বিজয় নগরে আসিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাতে তাহাদের অঙ্গে হরিদ্রা অর্পণ করিবার কথা স্থির ছিল। রামরায় যবন-বিজয়ী হইয়া আসিবার পরই এ বিবাহের দিন স্থির হয় সেই অবধি বিজয় নগরে বাদ্য গীত উৎসবের মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল।

সোমনাথ পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা, দেখিতে অতি সুপুরুষ, মস্তক অতি শোভনীয়, ললাট অতি সুপ্রশস্ত, বৃহৎচক্ষু অতি উজ্জ্বল, নাসিকা সুঠাম, ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র। চম্পকদামবর্ণ প্রফুল্ল বদনমণ্ডল ঈষদ্দীর্ঘ নবীন রোমাবলীতে বিভূষিত। বক্ষ বীরযোগ্য দীর্ঘায়ত—শরীর বলবান অথচ কর্কশতা-শূন্য। সুঠাম অঙ্গে তাঁহার বর্ম্ম, কটিদেশে তরবারি, মস্তকে শিরস্ত্রাণ, সোমনাথ রণসজ্জায় সজ্জিত। যুবরাজ সহসা কল্পনার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, লজ্জার রক্তিম রাগে শ্বেত বদনমণ্ডলে গোলাপ ফুটিয়া উঠিল, প্রেমপূর্ণ সুনীল নয়ন দুটি নত হইয়া পড়িল, হাত হইতে বীণাটি খসিয়া ভূমিতে

পড়িল, কি সর্ব্বনাশ! যুবরাজ সোমনাথ, তাহার গান শুনিয়া ফেলিল!

প্রেমপ্রস্ফুটিত আনত বদনখানি দেখিয়া দেখিয়া সোমনাথের আশ মিটিল না, হৃদয়ের কোথায় রাখিলে যে তাহার তৃপ্তি হইবে ভাবিয়া পাইলেন না, ধীরে ধীরে নিকটে প্রস্তরাসনে বসিয়া আধো আধো কণ্ঠে বলিলেন „কল্পনা, এবার কি হবে! আমি তো তোমার গান শুনিয়া ফেলিয়াছি।" কল্পনা একটও কথা কহিল না, একবারমাত্র আনত মুখখানি উন্নত করিয়া সোমনাথের মুখের দিকে চাহিল,আবার তখনি মুখটি নীচু করিয়া ওড়নার অঞ্চল দেখিতে লাগিল, যেন তাহা হইলে তাহার লজ্জা বুঝি আর সোমনাথ ধরিতে পারিবেন না। সোমনাথ বলিলেন "আর কিসের লজ্জা? একবার গাহিলেও যা, এশবার গাহিলেও তা, একবার গাহিলে কেন? আর একবার গাহিতে হইবে।" কল্পনা মনে মনে বলিলেন "একবার গাহিয়াছি তার শাস্তি স্বরূপ নাকি।" মনের কথা মনেই মিশাইল, মুখে ফুটিল না. সোমনাথ বীণাটি কল্পনার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "না গাইলে কখনই আমি ছাড়িব না, একবার গাহিয়া তবে স্বাদ দেখাইলে কেন?" কল্পনা লজ্জার মৃদু মৃদু কি মধুর হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল "তুমি এ সময় আসিবে, তাহা আমি জানিতাম না।" সোমনাথ সোহাগে কল্পনার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন "জানিতে না, কেন জানিলে কি হইত?" "গাহিতে পারিতাম না।"

আমি তবে তোমার পর বুঝি!" অভিমান করিয়া সোমনাথ এই কথাটি বলিলেন—তবু কল্পনার বুকে কথাটি বিঁধিল। সোমনাথ যদি পর, তবে আর তাহার আপনার কে? তাহা হইলে নিজেই সে পর। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া কল্পনা গান করিতে চেষ্টা করিল—কণ্ঠ পর্য্যন্ত কথা আসিয়া আর বাহির হইল না, কল্পনা আবার নীরব হইয়া পড়িল। সোমনাথের অনেক সাধাসাধির পর যদিবা বীণাটী তুলিয়া ধরিলেন, হাত তার স্পর্শ করিতে চাহিল না,গান শুনাইতে এত ইচ্ছা, কণ্ঠ তাঁহার আজ্ঞা শুনিল না, বীণা হস্তে কল্পনা পাষাণ চিত্রের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সোমনাথ অর্দ্ধ সহাস্যে অর্দ্ধ অভিমান ভরে বলিলেন "আচ্ছা কল্পনে তোমাকে আর গাহিতে বলিব না।" কল্পনা আর একবার তাহার বিদ্রোহী লজ্জার সহিত সবলে যোঝাযুঝি করিয়া বীণায় সুর দিবার জন্য ধীরে ধীরে হাত উঠাইল, বীণার তারে দুই একবার ঝঙ্কার করিল। যেমনি সেই ঝঙ্কার ধ্বনি কল্পনার কর্ণে প্রবেশ করিল, হাত কাঁপিয়া গেল, বীণাটি নত হইয়া পড়িল, গলা শুকাইয়া আসিল, বুকটি দুড় দুড় করিতে লাগিল, ওষ্ঠে ভালে বিন্দু বিন্দু ঘাম শোভা পাইল, নীহার-অবনত পদ্মের ন্যায় অতিরিক্ত লজ্জায় কল্পনা ম্লান হইয়া পড়িল। সোমনাথ তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলেন—তাহাকে আর অনুরোধ করা দারুণ নিষ্ঠুরতা। সোমনাথ প্রস্তরাসন হইতে উঠিয়া কল্পনার কম্পিত ঘর্ম্মসিক্ত হাত খানি স্বহস্তে লইয়া আসন

হইতে উঠাইয়া বলিলেন "কল্পনা, তোমার গাহিয়া কাজ নাই, একদিন লজ্জা ভাঙ্গাইয়া গান শুনিব সে আজ নহে।" মাটীতে বীণাটি পড়িয়াছিল, যুবরাজ তুলিয়া কল্পনার হাতে দিলেন, প্রস্তরময়ী বীণাপাণি মূর্ত্তিতলে বীণাপাণি প্রতিমা সজীব হইয়া উঠিল, এ ছবিতে সোমনাথ কল্পনাকে এই প্রথমবার দেখিলেন, মোহিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন, দেখিতে দেখিতে কি মনে হইল, সোমনাথ রাজকন্যার মস্তক হইতে ওড়নাখানি খুলিয়া বেণী এলাইয়া দিলেন, নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠে কপোলে, ছড়াইয়া পড়িল, জ্যোৎস্নালোকদীপ্ত প্রেমময়ী সেই সরস্বতী প্রতিমা রাজপুত্র অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। যখন চেতনা হইল, দেখিলেন রাজকন্যা বীণাটি প্রস্তরাসনে রাখিয়া দিয়াছেন, মুক্ত কেশরাশির উপর আবার ওড়নার সুবর্ণ পাড় মেঘে স্থির বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সোমনাথ বলিলেন "কল্পনা।" কল্পনা এবার পূর্ণ কটাক্ষে সোমনাথের দিকে চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণ লজ্জায় ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। অসময়ে যুদ্ধের সাজ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সোমনাথ বলিলেন "কল্পনা, আমি তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, বিবাহের পরিবর্ত্তে কল্য প্রত্যূষেই যুদ্ধে যাইব।" সোমনাথের অন্তস্তল হইতে কথাগুলি ধ্বনিত হইল, কল্পনার প্রাণের ভিতর কি যেন করিয়া উঠিল। কি একটি অজ্ঞাত দারুণ আশঙ্কায়, কি একটি অন্ধকারময় নিরাশার বিভীষিকায় কল্পনার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, কল্পনা করুণ বিষণ্ণ মুখখানি তুলিয়া অতি দীন আকুলনেত্রে সোমনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল, নীরব অশ্রুপূর্ণনেত্র দুটি অতি কাতরে সোমনাথকে কহিতে লাগিল হৃদয়ের ধন কতদিন কতদিন পরে যদি বা দেখা হইল আবার কোথায় যাইবে? তুমি চলিয়া গেলে অভাগিনী আর কেমন করিয়া থাকিবে? সোমনাথ বলিলেন "রামরায় পলাইয়াছেন তাহা জান? সংবাদ আসিয়াছে রামরায়ের পরামর্শে হরিহরপুরের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রামরায় তাহাদের সেনাপতি, তাহাকে ধরিলেই এ বিদ্রোহের শেষ হইবে। রামরায় বড় সামান্য বিদ্রোহী নহে, তাহাকে দমন করিতে যাহাকে তাহাকে পাঠালেই হইবে না, মহারাজের নিকট আমিই ভার লইয়াছি।" সোমনাথই কল্পনার সর্ব্বস্ব, এই অসীম সংসারে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই, তাহার ভালবাসা পাইয়াই, তাহার সহিত একদিন সুখী হইবে এই আশাতেই সে জীবিত ছিল। বিমাতার অসহ্য তাড়নার মধ্যে, অসহ্য অত্যাচারের মধ্যেও সে সোমনাথকে পাইবার আশাতেই সমস্ত যাতনা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সহ্য করিয়া আসিতেছিল— এতদিনের পর সেই আশা তাহার যখন পূর্ণ হইতে যাইতেছিল সহসা অতি নিষ্ঠুর ভাবে অতি কঠোর ভাবে তাহা কাড়িয়া লইয়া কে যেন অতি সবলে স্বর্গ হইতে অন্ধকার পাতালপুরীতে কল্পনাকে ফেলিয়া দিল! চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য দিগদিগন্তশূন্য কি এক মহা অন্ধকারে কল্পনার হৃদয় পূরিয়া গেল,

হৃদয়ের যত কিছু আশা সুখ শান্তি একে একে তাহার ভিতর ডুবিয়া গেল, প্রলয়ের সেই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের জ্বলন্ত অক্ষরে এই ভীষণ হৃদয়বিদারক কথাগুলি কে যেন লিখিয়া তাহার চক্ষের সামনে ধরিল "আর তুমি সোমনাথকে দেখিতে পাইবে না।" কে যেন সেই আঁধারের অনন্ত সীমা হইতে উঠিয়া বজ্রগর্জ্জনে বারবার করিয়া বলিতে লাগিল "এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে না ফিরে।" তাঁহার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, কি এক মর্ম্মভেদী দুঃখে অধীর হইয়া কল্পনা কাঁদিয়া উঠিল, সোমনাথের হৃদয়ও যেন ভাঙ্গিয়া গেল, সকরুণ স্বরে বলিলেন "কাঁদিও না কল্পনা, সামান্য বিদ্রোহ দমন করিতে ক'দিন লাগিবে! আমি শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিব। কল্পনার ঘূর্ণ্যমান মস্তকে আঁধার বিশ্বচরাচর ঘুরিয়া সেই একই কথা কহিতে লাগিল। ভীষণ বজ্রগর্জ্জনে বারবার কেবল ইহাই বলিতে লাগিল আর তোমার সোমনাথকে পাইবে না। সেই দারুণ অন্ধকারে অতি বিকট হাস্য করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল "অভাগিনী এই দেখা তোর জন্মশোধ" কল্পনা আকুল প্রাণে কাঁদিয়া কহিল কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাইতেছ বাধা দিব না—কিন্তু আর কথা আর কল্পনার ফুটিল না, সেই গভীর নিশীথে উভয়ের নীরব অশ্রুজল শূন্যে মিলাইতে লাগিল, সোমনাথ নীরবে হাত হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া কল্পনার হাতে পরাইয়া দিলেন কল্পনাও আপন হাত হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া সোমনাথকে পরাইয়া দিলেন। পরিয়া সোমনাথ সাশ্রু নয়নে বলিলেন "যত দিন জীবিত থাকিব, এ অঙ্গুরী খুলিব না, মরিলেও ইহা আমার সহিত ভস্ম হইবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নকাল, সমস্ত দিন মেঘ মেঘ করিয়া আছে, একটু বাতাস বহিতেছে না, একটি পাতা নড়িতেছে না, মেঘাচ্ছন্ন গগন দিয়া পক্ষিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাও যেন অতি নিঃশব্দে অতি নিস্তব্ধ ভাবে। প্রকৃতির স্তব্ধতা সম্মুখে কি একটি ভয়ানক আসন্ন বিপদছবি ধরিয়া রহিয়াছে। যুবরাজ সোমনাথ এই সময় সসৈন্যে হরিহরপুর যাত্রা করিতেছিলেন। গ্রাম যদিও আর অধিক দূরে নাই, গ্রামস্থ বৃক্ষাবলীর শিখর, অট্টালিকা সমূহের চূড়া যদিও দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, তথাপি যুবরাজ সেই দিনের জন্য আর অধিক দূর যাইতে সাহসী হইলেন না, গ্রামের বাহিরেই তখনি শিবির স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন। শিবিরস্থাপনযোগ্য একটি উত্তম স্থান বাছিয়া লইতে একজন সেনানী বৃক্ষে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। অদূরে বহমান তুঙ্গভদ্রার নীল জলরাশি, দূরস্থ হরিৎ বনরাশির ন্যায় তাহার চক্ষে পড়িল। নদীতীরে শিবির বাঁধিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যগণ তখন সেই দিকে যাত্রা করিল। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জমিয়া আসিল, সহসা প্রকৃতির স্তব্ধভাবকে কে যেন জাগাইয়া দিল। বাতাস

বহিয়া উঠিল, গাছ পালা নড়িয়া উঠিল, ধূলি উড়িয়া সৈন্যগণের চক্ষু কর্ণ নাসিকায় প্রবেশ করিতে লাগিল, যুবরাজ সসৈন্যে দ্রুতগমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে নদীর নীলজল সেনাগণের দৃষ্টিগোচর হইল, বিশ্রাম পিপাসী সৈন্যগণ আহ্লাদে অধীর হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সেই দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কিন্তু একি এ, পথ যে আর ফুরাইতে চাহে না! তাহারা যতই সোৎসুক চিত্তে, নদীমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, নদী তাহাদের যেন উপহাস করিয়া ততই সরিয়া যাইতে লাগিল। শ্রান্ত ক্লান্ত বিপদ আশঙ্কায় ভীত অবসন্ন সৈন্যগণ ঘূর্ণ্যমান বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া শীঘ্র যাইবার অভিপ্রায়ে বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, সন্ধ্যার আঁধারের উপর মেঘের আঁধার জমিয়া একটিমাত্র ঘনঘোর অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। কোথায় কি কিছুই দেখা যায় না, অন্ধকারে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, অন্ধকারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, অন্ধকারে বজ্রের ভীষণ কড়মড় শব্দ সৈন্যগণকে ভয়াকুল করিয়া তুলিল। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎরাশি যে সেই অন্ধকার এক একবার দূর করিতেছিল, সে কেবল সৈনিকদের অধিক ভয় দেখাইবার জন্য, তাহারা বলিয়া দিবার জন্য যে "দেখ এই নিবিড় অন্ধকারে বন মধ্যে তোমরা নিরাশ্রয়"। সৈন্যগণ ত্রাসে কাঁপিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল, কে কোথায় যাইবে কি করিবে জানে না, অথচ যে যেদিকে পাইল পলায়ন আরম্ভ করিল। যুবরাজ সেই বৃক্ষাবলীর মধ্যদিয়া অশ্ব-চালনা করিয়া দিলেন। বজ্রবৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে, বৃক্ষলতার কণ্টকে প্রতিহত হইয়া চলিতে লাগিলেন। অশ্ব সহসা থামিল। এক বৃক্ষের গুঁড়িতে পদে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থামিল। বিদ্যুতালোকে যুবরাজ দেখিলেন একটি অরণ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, কি করিয়া নির্গত হইবেন ভাবিতে লাগিলেন। কোথায় পথ কিছুই জানেন না। অশ্বকে কোন্ দিকে চালাইবেন নিরুপায় হইয়া সোমনাথ অশ্বের লাগাম ঢিল করিয়া দিলেন। অশ্ব আপন ইচ্ছানুসারে চলিতে লাগিল। সহসা একবার যেন বনমধ্যে একটি আলোক রেখা দেখিতে পাইলেন, যুবরাজের নির্জীব দেহে প্রাণ আসিল, নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যুবরাজ অশ্ব-চালনা করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সে আলোকরেখা অন্ধকারে মিশাইয়া পড়িল, হতাশচিত্তে যুবরাজ আবার অশ্বের লাগাম ঢিল করিয়া দিলেন। অশ্ব চলিতে চলিতে সহসা একটি স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থূল বস্ত্রাবরণ-লুক্কায়িত আলোকের ন্যায় একটি অতি ক্ষীণালোক রেখা তাঁহার নেত্রে পতিত হইল। একবার বিদ্যুৎ হানিল, তিনি দেখিলেন অদূরে একটি বস্ত্র শিবির। শিবির মধ্যস্থ আলোক রেখাই তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। হঠাৎ ঝড়ের একটি দমকা আসিয়া শিবিরের সম্মুখের পরদা ছিঁড়িয়া ফেলিল,

শিবিরের অভ্যন্তর তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিবির মধ্যে খড়্গহস্তা লোলজিহ্ব দেবী চামুণ্ডা। তাহার সম্মুখে সহস্র সহস্র মনুষ্য শাণিত কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান। প্রেতযোনির অস্তিত্ব যুবরাজ বিশ্বাস করিতেন সুতরাং তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। ঝটিকাশালিনী আঁধারে নিস্তব্ধ রজনীতে এ কি প্রেতযোনীর সমাবেশ? এ দুর্যোগে মনুষ্য এ বন মধ্যে আসিবে কেন? যুবরাজ নিস্পন্দ দাড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যে বীরপুরুষের হৃদয় তুমুল সংগ্রামের মধ্যে সহস্র বিপদের মধ্যেও টলে না; সেই অটল হৃদয়ও সহসা এই সময়ে এই অবস্থায় কাঁপিয়া উঠিল। সহসা শিবিরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কে বলিয়া উঠিল "সৈন্যগণ, বন্ধুগণ এখনো তোমরা বুঝিয়া দেখ কি ব্রতে তোমরা ব্রতী হইতে চাহিতেছ। যদি তুচ্ছ ধনলোভে যদি মণিমানিক্যের অসার প্রলোভনে, যদি ক্ষণস্থায়ী পদমর্য্যাদার লালসায়, কেহ আজ এখানে আসিয়া থাক তবে আবার বলিতেছি এখনো যাও, বিজয় নগরের সেই অত্যাচারী অধর্ম্মাচারী রাজার নিকট যাও, এক একটি নির্দ্দোষীর প্রাণবধের বিনিময়ে এক একটি জঘন্য দুষ্কর্ম্মের পরিবর্ত্তে তিনি তোমাদিগকে রাশি রাশি ধনরত্ন ঢালিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইবেন। আর তোমরা সকলে চলিয়া গেলেও এই রামরায় শূন্যহস্ত সহায়হীন এই রামরায় সেই অত্যাচারী রাজার করাল কবল হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রাণ দিবে। তবে যদি তোমারা স্বজাতির কষ্ট নিবারণ করিতে চাও যদি তাহাদের এক এক বিন্দু অশ্রুজল তোমাদের হৃদয়ের শোণিতসমান জ্ঞান কর, যদি নিজ রক্ত দিয়া নির্দ্দোষীর রক্তপাত নিবারণ পুণ্য মনে কর, যদি অবিচারক অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা ধর্ম্ম জ্ঞান কর তাহা হইলে আজ রামরায়ের সেনাপতি হইতে প্রতিজ্ঞা কর। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সম্মুখে আজ এই যে দীনহীন মলিনবেশধারী রামরায়কে দেখিতেছ তাহার আজ কাহার জন্য এই দশা? যে রামরায় রাজার জন্য সহস্রবার প্রাণ দিতে সঙ্কোচ করে নাই তাহাকেই রাজার নিকট হইতে কি অত্যাচার কি দুর্দ্দশাই না সহ্য করিতে হইয়াছে। বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, বালিকা ভগিনীর সহিত রৌদ্র নাই বৃষ্টি নাই দিন নাই রাত্রি নাই অনাহারে অনিদ্রায়, লুকাইয়া লুকাইয়া কি কষ্টে না দিন কাটাইতে হইয়াছে। যদি প্রত্যেকে এইরূপ দুর্দ্দশা হইতে, এইরূপ অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে এস রাম রায়ের সহিত এক সূত্রে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণপণ কর।"

দারুণ উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া সৈন্যগণ সমস্বরে বলিল "যতদিন এ দেহে শৈশবের মাতৃদুগ্ধের অণুমাত্রও মিশ্রিত থাকিবে যতদিন এ দেহে হিন্দু শোণিত বহমান থাকিবে ততদিন আমরা সেনাপতি রামরায়কে পরিত্যাগ করিব না। বিপদে সম্পদে জয়ে পরাজয়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।" উন্মুক্ত তরবারি বাম হস্তে রাখিয়া একে একে সকলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চামুণ্ডার চরণ স্পর্শ করিয়া এই শপথ করিল। তাহার পরে জয় জয় রামরায় ধ্বনি ঝটিকার দারুণ কোলাহল ভেদ করিয়া গগন স্পর্শ করিল। সোমনাথের আর বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না—তিনি পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কোথায় পলাইবেন? পথ কোথা? অশ্বকে চালাইয়া দিবামাত্র অশ্ব ভূমি-পতিত একটি বৃক্ষে আঘাত

পাইয়া পড়িয়া গেল। সেই সময় কতকগুলি সৈন্য বাহিরে আসিতেছিল—শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে আগমন করিল। বলা বাহুল্য সোমনাথ বন্দী হইলেন। রামরায় খবর পাইয়া রাত্রে আর বন্দীকে দেখিলেন না—বন্দী কারারুদ্ধ রহিল, প্রাতঃকালে রামরায় তাহাকে নিকটে লইয়া আসিতে আদেশ করিয়া রাখিলেন।

সম্পাদকের বৈঠক।

১ ম পল্লব।

বাঙ্গালা দেশে স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কথা কওয়া, তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করা, বা তাঁহাকে মুখ দেখান বড় লজ্জার কথা। পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন কোন স্থলে শ্বাশুড়ির সহিত, স্বামীর জেষ্ঠা ভগিনীর সহিত এবং বয়োবৃদ্ধ দেবরের সহিত কথা কওয়াও রীতি-বিরুদ্ধ। আমাদের দেশে মামা শ্বশুর ভাগিনেয় বধূর অঙ্গস্পর্শ করিতে বা কথা কহিতে পারেন না। মানভূমের কোড়া ও কুর্ম্মিদিগের মধ্যেও এই রীতি, কিন্তু মামা শ্বশুরের বাজনার তালে তালে নৃত্য করা ভাগিনেয় বধূর নিষিদ্ধ নহে।

উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে শ্বাশুড়ি জামাতার সহিত কথা কহে না। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় জামাতার দিকে পিছন করিয়া তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা কথা চালাইতে হয়। আমেরিকার ওমাহা নামে এক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহাদিগের মধ্যে শ্বাশুড়ির ন্যায় শ্বশুরও জামাতার সহিত কথা কহিতে পারে না। শ্বশুর বা শ্বাশুড়ির মুখ দর্শন করা, কি কাহারও সাক্ষাতে তাহাদের নাম উচ্চারণ করা রীতিবিরুদ্ধ।

কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে জামাতা স্ত্রীর মাতা কি অন্য কোন নিকট সম্বন্ধীয়ার মুখ দর্শন করিতে পারে না। তাহারা কেহ আসিয়া পড়িলে হয় কোথায় ও লুকাইতে হয়, না হয় পাশ কাটাইয়া পলাইতে হয়। ক্রি, দাকোটা ও কারিব জাতির মধ্যে, ফ্লরিডা দেশে এবং দক্ষিণ—আমেরিকার অরবাকদিগের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। কারিব জামাইরা শ্বশুরের বাড়ীতে কি শ্বশুর জামায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে না।

মোগল ও কালমক পুত্রবধূরা শ্বশুরের সহিত কথা কহিতে বা তাহার সমক্ষে বসিয়া থাকিতে পারে না। চীনদেশে বিবাহের পর আর শ্বশুর পুত্রবধূর মুখ দর্শন করিতে পারে না। যদি হঠাৎ সাক্ষাৎ হয় শ্বশুরকে মুখ লুকাইতে হয়। বর্ণিও ও ফিজিদ্বীপেও এই রীতি। অষ্ট্রেলিয়ায় কেহ শ্বশুর, শ্বাশুড়ি বা জামাতার নাম উচ্চারণ করিতে পারে না।

মধ্য আফরিকার অধীবাসীদিগের মধ্যে বিবাহের পত্র হইয়া গেলে, বর ভবিষ্যৎ শ্বশুর শ্বাশুড়ির মুখপানে আর চাহিতে পারে না। তখন মুখ দেখা দেখি সম্ভব হইলে শ্বশুর শ্বাশুড়িকে মুখ ঢাকিতে হয়।

কাফির মহিলারা স্বামীর গুরু পক্ষীয় কাহারও নাম মনেও আনিতে পারে না। আমাদের মেয়েরা যেরূপ দায়ে পড়িয়া কৃষ্ণকে "ফেষ্ট" বলিয়া ডাকেন, তাহারাও স্বামীর গুরু পক্ষের নাম বিশিষ্ট কাহাকেও ডাকিতে হইলে সেই রূপ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। তাহাদের জামাইরা শ্বাশুড়ির নাম ধরিতে পারে না, কি শ্বাশুড়ির সহিত

এক বাড়ীতে বাস করিতে পারে না। দক্ষিণ আফরিকার বুশমান ও বাসুটদের মধ্যেও এই রীতি। কেবল বিবাহ সম্বন্ধে গুরু জনের নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। পূর্ব্ব আসিয়া এবং পলিনেসিয়ার রাজা বা সর্দ্দারের নামের প্রতি গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়, বিনা ভক্তি সহকারে তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতে নাই। ভারতবর্ষে রাজার ও গুরুর নামের প্রতিও গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়। শ্যাম দেশে রাজার নাম ধরিতে কেহ পারে না। কোন উপাধি ধরিয়া বলিতে হয়। ব্রহ্মদেশে রাজার নাম বীজমন্ত্রের ন্যায় গোপনীয় ও পবিত্র। টাহিটীদের সর্দ্দারের নাম কোন জন্তুর নাম হইলে সে জন্তুর নাম বদলাইয়া দেয়। নব জিলণ্ডে সর্দ্দারের নাম "জল" হইলে জলের নাম বদলাইয়া দিতে দেখা গিয়াছে। ট্যাস মেনিয়ায় আবিপোন জাতির মধ্যে এবং কাফির ও জুলুদের মধ্যেও এই রীতি।

উত্তর আমেরিকায় মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের নিকট ত সে কথা মুখে আনিতেই নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় আবিপোন জাতি মৃত ব্যক্তির নাম না করিয়া "অতীত পুরুষ" বা "গত মহাশয়" প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করে। যদি কোন ফিউজি শিশু মৃত পিতা মাতার কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সে অমনি বলে "চুপ চুপ, খারাপ কথা মুখে আনিও না"। সামোয়া জাতি কেবল ইঙ্গিতে মৃত ব্যক্তির উল্লেখ করে, কদাপি তাহার নাম মুখে আনে না। অষ্ট্রেলিয়ায়, পূর্ব্বোপদ্বীপবাসী পাপুয়া জাতির মধ্যে এবং আফরিকার মসাই জাতির মধ্যেও এই রীতি। ইউরোপেও সেটল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ইহা লক্ষিত হয়। বোধ হয় মৃত ব্যক্তির নামোচ্চারণ করিলে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে এই ভয়ে নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার মৃত ব্যক্তির নাম কোন বস্তুর নাম থাকিলে সে বস্তুর নাম পরিবর্ত্তন করে। ভূতের নাম সয়তান বলিয়া ইয়েজিদিরা নদীকে "সৎ" না বলিয়া নহর বলে এবং সুতার নাম "করতান" বলিয়া সে নাম উচ্চারণ করে না।

দায়াক জাতি বসন্ত রোগের নাম উচ্চারণ করে না, সর্দ্দার বা বনপাতা এইরূপ অভিধানে ইঙ্গিত করিয়া থাকে। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালাদেশের কোন কোন অংশে ঐ রোগকে "দেবীর দৃষ্টি" বা "মায়ের দৃষ্টি" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করে। এ দেশে রাত্রিতে সাপ বলিতে নাই, লতা বলিতে হয়। মাছ ধরিবার সময় কাঁকড়া না বলিয়া দশরথ বলিতে হয়। রাত্রিতে বাঘকে মামা বলিতে হয়। সুন্দর বনের লোকেরা বাঘকে শৃগাল বলিয়া উল্লেখ করে। উয়ুরোপে প্রেতদিগকে দয়াশীল বলিয়া উল্লেখ করে। লাপলাণ্ডবাসীরা ভল্লুককে বৃদ্ধ পুরুষ বলে। সাইবিরিয়ার তুঙ্গুজজাতি ও আনামদেশে বাঘকে ঠাকুর দাদা বা প্রভু এবং সুমাত্রা দ্বীপে বুনো বা পূর্ব্বপুরুষ বলে।

আবিপোন নামে দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতি বাস করে তাহাদের কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে মাদুর মুড়ি দিয়া ছেলে কোলে করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিতে হয়। তাহার গায়ে যেন বাতাস না লাগে। তাহাকেই আঁতুড় ঘরে থাকিতে হয় ও উপবাস করিতে হয়। কিন্তু কোন ভাল মন্দ হইলে সকলেই পিতাকে দোষী করে।

ব্রেজিল দেশে কোরোডো নামে যে অসভ্য জাতি বাস করে। তাহাদের কাহারও স্ত্রী গর্ভবতী হইলে স্বামীকে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে হয়। সন্তান হইবার পূর্ব্বে তাহাকে আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়,

কোন প্রকার মাংস খাইতে তাহার অধিকার থাকে না। প্রধানতঃ মাছ ও ফল খাইয়া তাহার প্রাণ ধারণ করিতে হয়।

গায়নার উত্তরাংশে আকাই ও এবং কারিবী জাতি বাস করে। তাহাদের কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে কাপড় মুড়ি দিয়া শিশু কোলে করিয়া শুইয়া থাকিতে হয়। ধাত্রী তাহারই সেবা করে। প্রসূতি সন্তান প্রসবের পরেই রন্ধনশালায় গিয়া রাঁধিতে বসে।

উত্তর আমেরিকায় সোশোনে জাতির মধ্যে গর্ভিনীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে স্বামীকেও দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী বসিয়া থাকিতে হয়।

গ্রীনলণ্ডে কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

কামাস্কাটকায় কাহারও সন্তান হইবার সম্ভাবনা হইলে প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীকে কঠিন পরিশ্রমের সকল প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।

আমেরিকার কারিব জাতিদিগের কাহারও সন্তান হইলে স্ত্রী প্রসবের পরেই গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। স্বামী শিশু লইয়া পালন করিতে থাকে। তাহাকেই উপবাস দিতে ও পাঁচন এবং ঝাল মসলা খাইতে হয়। এই রূপে চল্লিশ দিন তাহাকে প্রসবগৃহে বাস করিতে হয়। তাহার পর নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। প্রহারে তাহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইলে গোল মরিচের গুঁড়া জলে মিশাইয়া তাহার সর্ব্ব শরীর ধুইয়া আবার তাহাকে বিছানায় শুয়াইয়া দৈয়। সেখানে আরও দশ পনর দিন তাহাকে কাটাইতে হয়। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত কোন প্রকার মৎস্য কি পক্ষী মাংস আহার করা পিতার পক্ষে নিষেধ। প্রহারের সময় অভাগা কাঁদিলে বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে শিশুর অমঙ্গল হয়।(১)

বোর্ণিওর ডায়াকদের মধ্যে কাহারও সন্তান হইলে পিতা ধারাল অস্ত্র কি বন্দুক ব্যবহার করিতে পারেন না। সন্তান হইবার পর পিতাকে কয়েক দিন নির্জ্জন বাস করিতে হয়। এবং কেবল ভাত ও লবণ খাইয়া থাকিতে হয়। পিতার আহার গুরুতর হইলে শিশুর পেট ফাঁপিতে পারে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। (২)

কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ান, পশ্চিম আফ্রিকার জুকলি ও চীনদেশবাসী মিয়াঞ্জি জাতির মধ্যে এবং পূর্ব্বোপদ্বীপের বোরো দেশে শিশু হইলে স্বামী কেই ঔষধ ও পথ্য খাইতে হয়। কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী তিবারেণী জাতির মধ্যে ও স্ত্রী প্রসব করিলে স্বামী বিছানায় পড়িয়া গোঁয়াইতে থাকে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করে ও তাহাকে পথ্য দেয়।

পূর্ব্বে স্পেন দেশেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও পিরানিস্ পাহাড়ে এবং বাস্ক জাতির মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে।

---

১ কোন কোন অসভ্য জাতির আতিথেয়তা এবং সন্তান বাৎসল্য এত অধিক যে তাহারা অতিথিকে স্ত্রীদান করিয়া সন্তান গুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

২ পিতা গুরু পাক আহার করিলে সন্তানের উদরাময় হয়, অসভ্যদিগের এই অন্ধ বিশ্বাসে কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। কোন কোন জাতির মধ্যে স্বামী পাখী পুষিলে স্ত্রীকে মাছ মাংস মসলা পরিত্যাগ করিতে হয়। নতুবা পাখীর পেটের পীড়া হইতে পারে। যদি কোন কারণে পাখী মরিয়া যায় স্ত্রীকে প্রহার সহ্য করিতে হয়, কারণ তাহারই আহার দোষে যে পাখী মরিয়াছে তাহার সন্দেহ কি?

আমাদের দেশেও মান্দ্রাজ শ্রীরঙ্গপত্তন এবং মলয় উপকূলে কোন কোন জাতির মধ্যে কাহারও সন্তান হইলে, পিতাকে এক চান্দ্র মাস কাল শুধু ভাত খাইয়া থাকিতে হয়। কোন গুরু পাক দ্রব্য আহার কি তামাক সেবন তাহার পক্ষে নিষেধ।

২য় পল্লব।

জন্তু বিশেষের মাংস ভক্ষণ করিলে সেই সকল জন্তুর গুণাগুণও ভক্ষয়িতা প্রাপ্ত হন—অনেক দেশের লোকের ইহা বিশ্বাস। বস্তুতঃ জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থায় গুণাগুণ জড় পদার্থ এবং দেহে অবস্থিত বলিয়া দেহেরই অংশ, অসভ্যদিগের এ ভ্রম নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইতি পূর্ব্বে আমরা এই ভ্রমের অন্য রূপ দেখাইয়াছি। পুত্র পিতার অংশ বিশেষ সুতরাং পুত্রের কোমলাবস্থায় পিতার গুরুতর পরিশ্রম বা গুরু পাক দ্রব্য ভক্ষণে শিশুর পীড়া হইতে পারে ইহা পৃথিবীর নানা দেশীয় অসভ্যদিগের বিশ্বাস। প্রসূতির পরিবর্ত্তে কেবল পিতাকে ঔষধ ও পথ্য করিতে হইবে এ ভ্রমের কারণ কি সমাজতত্ত্ববিৎ মনীষিগণ অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

২য়ত মাতা অপেক্ষা পিতা গুণবত্তর জীব বলিয়া সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলে পিতার ক্ষমতা অধিক। সুতরং পিতাকেই কিছু অধিক সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য এইরূপ যুক্তি বলে এই মীংমাসা হইয়া থাকিবে। যাহা হউক এখন আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

আমাদের দেশে রাতকানা রোগ সারাইবার জন্য কলার মধ্যে জোনাকী পোকা খাইতে দেয়। জোনাকী পোকা রাত্রিতে ভাল দেখিতে পায়। গর্ভিনীকে হরিণ মাংস খাওয়াইয়া থাকে, আশা সন্তানের চক্ষু হরিণের ন্যায় আয়ত হইবে। গর্ভিনীর কোন চক্রযুক্ত মাছ খাইতে নাই ছেলের গায়ে চক্র হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় কেহ কাঁকড়া খাইলে শিশুর মুখে গেঁজলা উঠে। বাঘের মত সাহসী হইবে বলিয়া এবং পেঁচার মত রাত্রিতে দেখিতে পাইবে বলিয়া এদেশে মাহুতেরা হাতীকে বাঘের মাংস ও পেঁচার মাংস খাওয়াইয়া থাকে।

বোর্ণিওর ডায়াকরা পুরুষদিগকে হরিণ মাংস খাইতে দেয় না। পুরুষদিগকেই যুদ্ধ করিতে হয়। হরিণেরা বড় ভয়-চকিত। পাছে বীরপুরুষেরা হরিণ মাংস খাইয়া ভীতচিত্ত হয় ইহাই এ নিষেধের কারণ।

প্রাচীনকালে নানা দেশে—যুবতীকে ভেক মাংস খাওয়াইত। ভেক রমণী এক কালে অনেকগুলি ডিম্ব প্রসব করে। উকুন এবং ছারপোকা শীঘ্র শীঘ্র সন্তান প্রসব করে, প্রসববেদনায় কষ্ট না হইবার জন্য বাঙ্গলা দেশে গর্ভিনীদিগকে পানের মধ্যে উকুন ও ছারপোকা খাইতে দেয়। কচ্ছপ ও শূকরের চক্ষু বড় ক্ষুদ্র। এজন্য কারিব জাতিরা কচ্ছপ ও শূকরের মাংস খায় না। ভয় পাছে চক্ষু ক্ষুদ্র হয়।

কুকুরের মত সাহস ও বুদ্ধি হইবে বলিয়া কারিবরা কুকুরের যকৃৎ ভক্ষণ করে।

আরাবদিগের বিশ্বাস তাহারা উটের মাংস খায় বলিয়া তাহারা এত উদ্ধতস্বভাব ও জিঘাংসাপ্রিয়। শীকার করিতে উৎসাহী ও ভয়-শূন্য হইবার জন্য সাইবিরিয়ার লোকেরা ভালুকের মাংস খায়। কাফির জাতীয়েরা ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী ও সর্প প্রভৃতির মাংস শুখাইয়া গুঁড়া করিয়া রাখে। উহার এক একটু খাইলে ঐ সকল জীবের গুণ ভক্ষয়িতা লাভ করেন ইহা তাহাদের সাধারণ বিশ্বাস। চীনদেশীয় একজন ভূত্যকে একটী মানুষের ফুস্ ফুস্ লইয়া খাইতে দেখা গিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল উহা একজন বীরপ্রকৃতি যোদ্ধার ফুস্ ফুস্, খাইলে সেও বীরপ্রকৃতি হইবে। নব জিলাণ্ডের লোকেরা ছোট

ছোট ছেলেকে পাথর কুচি খাওয়ায়। এইরূপ করিলে শিশুর হৃদয় কঠিন ও কোমলতা শূন্য হয় মনে করে। কিয়ৎপরিমাণে এই কারণেই কোন কোন অসভ্য জাতি যুদ্ধে হত শত্রুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা চক্ষুরোগে "Eye bright" বা চক্ষুর্জ্জল নামক এক প্রকার ফুল খাইয়া থাকে। এস্কিমো জাতি বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের গলায় ইংরাজদিগের জুতার তলার মালা করিয়া পরাইয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে ইংরাজদিগের অনেক সন্তান হইয়া থাকে। সুতরাং সংসর্গগুণে তাহাদিগের জুতারও সে শক্তি জন্মিয়া থাকে। দেহসংস্পর্শে কাপড় বা জুতা, দেহের সামান্য অংশ নখ বা চুল ভাঙ্গা দাঁত পর্য্যন্ত ও দেহীর গুণ ধারণ করে; এমন কি দেহের প্রতিকৃতি, হাতের লেখা, এবং নামটি পর্য্যন্ত ও দেহীর সকলগুণ সংযুক্ত, ইহা নানা জাতীয় লোক বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ বালকে যেমন সকল বিষয় কার্য্যের যুক্তি করে অসভ্যেরা সেইরূপ করিয়া থাকে। এমন কোন কর্ম্মই তাহারা করে না যাহার কারণ তাহারা নির্দ্দেশ করিতে না পারে। তবে প্রবীণ বলিয়া মার্জ্জিত ও চৌকশ বুদ্ধি বলিয়া তুমি বালকের যুক্তি উপেক্ষা করিয়া থাক।

অসভ্যেরা কাহাকেও তাহাদের ফটোগ্রাফ বা প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে দেখিলে বড় ভীত হয়। ছবি বা পুতুলের প্রাণ আছে ইহা বালক মাত্রেই বিশ্বাস করে। সে প্রাণ কোথা হইতে আসিল? যাহার ছবি তাহার প্রাণের অংশ অবশ্যই তাহার চোখ কান হাতের সহিত ছবিতে উঠিয়া আসে। সুতরাং ছবি যত ভাল হয় তাহাদের ভয়ের কারণও তত বৃদ্ধি হয়। উত্তর আমেরিকা, বোণ্ড ডাহো, ল্যাপলাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশের অসভ্যদিগের মধ্যে ইহা দেখা গিয়াছে। আবার শত্রুর একটা ছবি পাইলে তাহাকে যাদু করিতে বা বাণ মারিতে অসভ্যদিগের বড় সুবিধা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীরা নাচিবার সময় ঘাস দিয়া কাঙ্গারুর একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করে। তাহা হইলেই বনের একটী জীবন্ত কাঙ্গারুর উপর যে তাহাদের আধিপত্য জন্মিল ইহা তাহাদের বিশ্বাস। উত্তর আমেরিকার গুণীরা বনের কোন পশু মারিতে হইলে ঘাস কি কাপড় দিয়া তাহার একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর তীর মারে। পেরু দেশের যাদুকরেরা কাহাকে পাগল করিতে বা মারিয়া ফেলিতে হইলে তাহার একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে ছুঁচফোটায় বা চাপিয়া ধরে কি অন্ধকারে লুকাইয়া রাখে। উয়ুরোপেও প্রাচীন কালে এবং ভারতবর্ষে অদ্যাপি এ প্রবাদ প্রচলিত আছে। বোর্ণিওর যাদুকরেরা মোম দিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে এবং ক্রমে ক্রমে উহা গলাইয়া ফেলে। আমাদের দেশের যাদুকরেরা মূর্ত্তির বুকের উপর শত্রুর নাম লিখিয়া উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। ব্রহ্মদেশের কারেণ জাতিরা যেখানে শত্রুর পায়ের দাগ পড়ে সেখানকার মাটী লইয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তুলার বীজ ফুটাইয়া দেয়। তাহা হইলেই সে বোবা হইয়া যায়।

প্রতিকৃতির ন্যায় নামও দেহের অংশ বলিয়া অসভ্যেরা বিশ্বাস করে। তাহারা সহজে আপন নাম কাহাকে বলিতে চায় না। এমন কি প্রতিবেশী মণ্ডলেও প্রকৃত নাম কেহ কেহ প্রকাশ করে না। পাছে কেহ কোন প্রকার যাদু করিয়া ক্ষতি করে। রোমানরা রোমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কাহাকে বলিত না পাছে শত্রুরা সে দেবতাকে ভুলাইয়া দেশটী কাড়িয়া লয়। বোর্ণিওর লোকেরা কাহারও পীড়া হইলে নামটি বদলাইয়া ফেলে কারণ যে অপদেবতা তাহার নাম জানিয়া তাহাকে পীড়া

ভোগাইতে ছিল নূতন নাম জানিতে না পারিয়া সে আর কষ্ট দিতে পারিবে না। মোহক জাতীয় একটী বৃদ্ধ একজন সাহেবকে বড় ভালবাসিত। সে আপন নামটি সাহেবকে দিয়াছিল, সেই অবধি তাহার পূর্ব্বকৃত গৌরব ও পুণ্য সাহেব লাভ করেন। চীন দেশীয় চিকিৎসকেরা ঔষধ না থাকিলে একখানি কাগজে ঔষধের নাম লিখিয়া সেই কাগজ খানি ধোয়া জল বা ভস্ম করা ছাই রোগীকে খাইতে দেয়। কোরাণের বয়েৎ ধোয়া জল খাইলে নানা প্রকার পীড়া আরোগ্য হয় ইহা মুসলমানদিগের সাধারণ বিশ্বাস।

প্রতিকৃতি ও নামের ন্যায় নখ, চুল বা ভুক্ত দ্রব্যের অংশ পর্য্যন্ত ও যাদুকরের নিকট বিশেষ মূল্যবান। দক্ষিণ সাগর দ্বীপের সর্দ্দারেরা থুথু ফেলিলে চাকরেরা বিশেষ যত্নের সহিত উহা লুকাইয়া ফেলে, কোন গুণী না জানিতে পারে। টানা দ্বীপে কাহার ও পীড়া হইলে সে অমনি বুঝিয়া লয় যে কোন যাদুকর তাহার উচ্ছিষ্ট লইয়া নল পাকাইয়া পোড়াইতেছে। পোড়ান শেষ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। এজন্য কাহারও পীড়া হইলে "পূজা দিব ক্ষান্ত হও" বলিয়া দেশের সর্ব্বত্র ঢাক বাজাইয়া সংবাদ দেওয়া হয়। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আমেরিকা পলিনেসিয়া, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া ও ইটালী দেশে অদ্যাবধি প্রচারিত আছে। আফ্রিকার লোকেরা মৃত শত্রুর দেহের এক অংশ শিঙা ও ঢাকের সহিত বাঁধিয়া রাখে। যেহেতু সে গুলি বাজাইলে শত্রুর প্রেতপুরুষ পর্য্যন্ত ভয়ে কাঁপিতে থাকিবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কুসুমাঞ্জলি। পদ্য সন্দর্ভ। শ্রীমোজাম্মেল হক্ প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

পুস্তকের মলাটে নাম দেখিয়া বুঝা গেল, এই গ্রন্থখানি কোন মুসলমান কবি কর্ত্তৃক বিরচিত, কিন্তু গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া তাহা বুঝিবার যো নাই। ইহাঁর লেখা অনেক বাঙ্গালীর লেখা অপেক্ষা সরল ও সুশ্রাব্য। বাঙ্গালার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বিস্তর, অথচ আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রভাব লক্ষিত হইল না ইহা আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। বোধ করি, লেখকের সদ্দৃষ্টান্তে কৃতবিদ্য মুসলমানগণ স্ব স্ব হৃদয় ভাব রুদ্ধ না রাখিয়া জন্ম ভূমির প্রচলিত ভাষায় স্বদেশীয় লোকদের সমক্ষে প্রকাশিত করিবেন ও এই উপায়ে হিন্দুদের সহিত স্থায়ীতর দৃঢ়তর সদ্ভাবের সূত্রপাত এবং বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টিসাধন হইবে।

নীতি-কুসুম। প্রথম ভাগ। শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য ১০ আনা।

প্রথমতঃ, মাথায় মার্কা-মারা নীতি গল্পে যে বালকদের বা বৃদ্ধদের কোন উপকার হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, দ্বিতীয়তঃ, গল্প গুলি যদি সরস না হয়, তবে তাহা না দেবায় ন ধর্ম্মায়, কোন কাজেই লাগে না, তাহাতে না নীতি শিক্ষা করা

যায়, না আমোদ বোধ হয়। বালকদের জন্য যে যথার্থ ভাল বই লিখিবার আবশ্যক, ইহা যেন কাহারো মাথায় নাই। বালকদের গল্প বলিতে গেলে যে, গল্প সাজাইয়া বলিতে হয়, মাল মস্‌লা দিয়া তাহাকে মুখ-রোচক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা কেহ মনে করেন না—বোধ করি তাঁহাদের বিশ্বাস, বেত চিবাইতে দিলে বালকেরা তাহাতে ইক্ষুর স্বাদ পায়, নহিলে এমন সকল অকিঞ্চিৎকর অসার যাহা-তাহা বালকদিগকে দেওয়া হয় কেন? সচরাচর যাঁহারা ছেলেদের জন্য বই লেখেন, বোধ করি তাঁহাদের ছেলে-ভালবাসা নাই, ছেলেদের সহিত তাঁহাদের সমবেদনা নাই। ছোট ছোট হৃদয়ে কি করিলে সুখ দুঃখ জাগিয়া উঠে, বালকদের সরল প্রাণ কি উপায়ে কৌতুকে নাচিতে থাকে, কৌতূহলে আন্দোলিত হয়, তাহাদের তরুণ নেত্র আমোদে জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ বিদ্যুতের ন্যায় খেলিতে থাকে, তাহারা অধীর হইয়া হাততালি দিয়া উঠ, তাহা তাঁহারা বুঝেন না—কেবল বালকদের হৃদয়ের নিকট হইতে লক্ষ ক্রোশ দূরে থাকিয়া কতকগুলা নীতির শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুকুমার-হৃদয়দিগকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া তাহার ফল যে কি হয় বুঝিতে পারি না। নীতি-কুসুমে গল্প ছুলে শিশুদিগকে নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গল্পের ছল আছে বটে, কিন্তু গল্প নাই। সুতরাং ইহার দ্বারা নীতি-শিক্ষা হইবে না।

পাঠসার। প্রথম ভাগ। আনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত। মূল্য দুই আনা।

এই পুস্তকে বালকদিগের উপযোগী কবিতা দুই একটি আছে, কিন্তু সকল গুলি নহে। ইহাতে নীতিমঞ্জরী শীর্ষক কতকগুলি নীরস কবিতা আছে, তাহার অনেক স্থলে নীতি বিরুদ্ধ ও বালকদের পাঠের অযোগ্য কথা বলা হইয়াছে।

আলস্য বিষম ভূত স্কন্ধে যার চাপে,
সুখের জীবন তার যায় পরিতাপে;
লজ্জাহীনা কলঙ্কিনী হয় কুলনারী,
বলবান বলহীন পথের ভিখারী।

ইহার তৃতীয় ছত্রটির অর্থ ছেলেরা বুঝিতে পারিবে না, বুঝাও ভাল নহে।

শরীরের পক্ষে যথা রক্ত পিত্ত ঘা,
সন্তানের পক্ষে তথা অশিক্ষিতা মা;
কায়াটি থাকিতে কেহ মায়া নাহি ছাড়ে,
জীবনের দফা রফা করে একেবারে।

এই নীতি শিক্ষা করিয়া ছেলেদের যে কি উপকার হইবে, কিছু বুঝিতে পারি না। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছেলের মা অশিক্ষিতা, গ্রন্থকার কি চান যে তাহারা তাহাদের মাকে রক্ত পিত্ত ঘায়ের ন্যায় জ্ঞান করিবে?

কীট সম নীচ যেই ঘৃণা করি তারে,
পতঙ্গ সমান দুঃখী বিলাসী সংসারে।
অনাসক্ত কার্য্য-ক্ষম বিহঙ্গের প্রায়,
যে জন, অবশ্য ভাল বাসিব তাহার।

এই শ্লোকটি বুঝিতে কিছু কষ্ট হয়। প্রথমতঃ, "পতঙ্গ সমান দুঃখী বিলাসী সংসারে" এই পদটিতে দুঃখী কর্ত্তা কি বিলাসী কর্ত্তা সহসা বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, পতঙ্গের যে কোন বিশেষ দুঃখ আছে তাহা জানা নাই, তৃতীয়তঃ, পতঙ্গের সহিত বিলাসীর সুখ দুঃখের কি সাদৃশ্য আছে তাহা সহজে বুঝা যায় না। চতুর্থতঃ, অনাসক্ত শব্দের সার্থকতা কি?

মহতের কাছে হবে বিনম্র বিনীত,
ইতরের কাছে কাজ কর পদোচিত;
না হইলে কার্য্য-সিদ্ধি কখনো হবে না,

এই রূপ অনেকগুলি কথা নীতি মঞ্জরীর মধ্যে কীটের মত আছে, ইহাতে ফল ভাল হইবে না।

দার্শনিক শব্দ এবং তার সহজ অর্থ।

অস্তি এবং ভাতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহা অস্থায়ী তাহাই ভাতি এবং যাহা স্থায়ী তাহাই অস্তি বলিয়া গণ্য হয়। সকল ঘটনাই কতক পরিমাণে স্থায়ী, সেই পরিমাণে তাহা অস্তি। কিন্তু সত্যসত্যই—একান্তই—কে স্থায়ী কে অস্থায়ী তাহা স্থির করিবার উপায় কি? কোন উপস্থিত বিষয় চিরস্থায়ীও হইতে পারে অচিরস্থায়ীও হইতে পারে; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, চিরস্থায়ী বস্তুর স্থায়িত্বেরই বা নিদর্শন কি? অচিরস্থায়ী বস্তুর অস্থায়িত্বেরই বা নিদর্শন কি? স্থায়ী বস্তুর গাত্রে কি এমন কোন চিহ্ন অঙ্কিত আছে, যাহা দেখিবামাত্রই তাহার স্থায়িত্ব বিষয়ে আর আমাদের সংশয় থাকে না? স্বপ্নের বিষয়-সকল অস্থায়ী ইহা আমরা এখন জানিতেছি,—কিন্তু স্বপ্নে যদি আমরা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন দেশ আবিষ্কার করি, তখন কি আমরা দ্বিতীয় কলম্বস্ হই না? যদি স্থায়ী বস্তুর গাত্রে স্থায়িত্বের চিহ্ন এবং অস্থায়ী বস্তুর গাত্রে অস্থায়িত্বের চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে, স্বপ্ন স্ব-রাজ্যেও স্বপ্ন বলিয়া ধরা পড়িত। স্বপ্নের কথা ছাড়িয়া দেও জাগ্রৎকালের স্থায়িত্বেরই বা নিদর্শন কি? সূর্য্যের দৈনিক উদয়াস্ত এত দিন পর্য্যন্ত টলে নাই, ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলি যে, সূর্য্যের উদয়াস্ত চিরকালই অটল থাকিবে;—কোন ভূমি-সম্পত্তি অনেক দিন ধরিয়া ভোগ করিলে তামাদির নিয়মানুসারে তাহাতে ভোক্তার সত্ত্ব জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু কোন সংস্কার অনেক দিন ধরিয়া লোকের মন অধিকার করিয়া আসিতেছে বলিয়া, শুদ্ধ সেই কারণে, লোকের মনে তাহার চিরস্থায়ী সত্ত্ব জন্মিতে পারে না। ৬০০০ বৎসর ধরিয়া লোকে জানিয়া আসিতেছিল যে, সূর্য্য গগণ মণ্ডল পরিভ্রমণ করে,—গালিলিওর নব-সিদ্ধান্ত কঠোর প্রমাণের বলে সেই স্পষ্ট চাক্ষুষ জ্ঞানকে তাহার ৬০০০ বৎসরের অধিকার হইতে উচ্ছেদ করিল—জগৎশুদ্ধ লোকের মন হইতে উন্মূলিত করিল; দেখ—৬০০০ বৎসরেও তামাদি হইল না। সত্যের বিচারালয়ে তামাদির দাবি কোন কার্য্যেরই নহে; সেখানে, ৬০০০ বৎসর কেন—যুগযুগান্তরের ভোগ-দখলও অধিকারের নিদর্শন বলিয়া—দলিল বলিয়া—গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং "সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সূর্য্যের দৈনিক উদয়াস্ত টলে নাই" এই মাত্র বিবরণ সূর্য্যের স্থায়িত্বের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সূর্য্যের স্থায়িত্ব সপ্রমাণ করিতে হইলে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

সৌর জগতের সমস্ত নিগূঢ় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা চাই—তাহা যে কোন্‌খানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। অতএব আবহমান কালের দেখা-শুনার নিকট হইতে "অস্তির" অকাট্য নিদর্শন প্রত্যাশা করা বৃথা,—জ্ঞানের নিজালয়ে যদি তাহা থাকে, সেইখানে একবার তত্ত্ব করিয়া দেখা যাউক। এখানে কেহ বলিতে পারেন যে, মান্ধাতার আমল হইতে লোকে সূর্য্য দেখিয়া আসিতেছে—ইহাতেও কি তোমার মনের সন্দেহ মিটিল না? ইহার উত্তরএই যে, সূর্য্যের স্থায়িত্বের সংস্কার আমার মনে খুবই দৃঢ়বদ্ধ আছে—তোমার মনেও যেমন দৃঢ়বদ্ধ আছে আমার মনেও তেমনি দৃঢ়বদ্ধ আছে—কিন্তু আমি সেই স্থায়িত্বের জ্ঞানমূলক নিদর্শন চাই, অকাট্য প্রমাণ চাই; আমি চাই—সেই স্থায়িত্ব আমার জ্ঞানে ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হউক; শুদ্ধ কেবল সংস্কার মাত্রে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না; ৬০০০ বৎসরের বা ১০০০০ বৎসরের অতি-বৃদ্ধ সংস্কারও সংস্কার বই আর কিছুই নহে—জ্ঞান নহে।

প্রত্যেক বস্তুরই কতকগুলি লক্ষণ স্থায়ী কতক-গুলি লক্ষণ অস্থায়ী; এবং এক বস্তুকে অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাহার স্থায়ী লক্ষণ-গুলির প্রতিই জ্ঞানের লক্ষ নিবিষ্ট হয়। গো জাতির কতক গুলি স্থায়ী লক্ষণ আছে সে লক্ষণ গুলির কুত্রাপি ব্যভিচার নাই; আর কতক গুলি অস্থায়ী লক্ষণ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবে; কোন গো শ্বেত বর্ণ, কেহ বা কপিল বর্ণ, কেহ বা কৃষ্ণ বর্ণ,—গো জাতির বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল; তাহার মধ্যে, তাহার মুখের আকৃতি, স্কন্ধের আকৃতি, গলদেশের আকৃতি, ও খুরের দ্বিখণ্ডতা, এই গুলির একত্র বিদ্যমানতা গোজাতির অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ; গো'কে অশ্ব হস্তী প্রভৃতি আর আর পশু হইতে পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে, শেষোক্ত অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণের প্রতিই আমাদের লক্ষ নিবিষ্ট হয়। তেমনি আবার পশুকে মনুষ্য পক্ষী প্রভৃতি আর আর জীব হইতে পৃথক্ রূপে নির্দিষ্ট করিতে হইলে, চতুষ্পদত্ব প্রভৃতি তাহার স্থায়ী লক্ষণ গুলির প্রতিই আমাদের লক্ষ নিবিষ্ট হয়। গরুর স্থায়ী লক্ষণ-গুলির একত্র সমাবেশই নৈয়ায়িক ভাষায় গোত্ব বলিয়া উক্ত হয়, এবং পশুর স্থায়ী লক্ষণ গুলির একত্র সমবস্থিতিই পশুত্ব বলিয়া উক্ত হয়; গরুর গোত্ব লক্ষণ এবং পশুর পশুত্ব লক্ষণ এমনি স্থায়ী যে,প্রত্যেক গরুতেই গোত্ব লক্ষণ থাকা চাই, প্রত্যেক পশুতেই পশুত্ব লক্ষণ থাকা চাই। যাবতীয় গরুর সম্বন্ধে গোত্ব যদিও অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু পশুর সম্বন্ধে গোত্ব সেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নহে; কেন না, পশু গরু না হইয়া ঘোড়া হইতে পারে, হাতি হইতে পারে, তাহাতে-আর তাহার পশুত্বের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না। গোত্ব লক্ষণ যাবতীয় গরুর সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয়, পশুত্ব লক্ষণ যাবতীয় পশুর সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয়,—এমন নহে যে, সকলেরই সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের জ্ঞানে এমন কোন ধ্রুব

তত্ত্ব আছে কি না যাহা সকল বিষয়েরই সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয়?—সর্ব্বসাধারণ বিষয় কি? না—বস্তু। যাহা কিছু জ্ঞানের লক্ষ্য বিষয় তাহাই বস্তু—দেয়াল, করিকাট, হাতি, ঘোড়া, সকলই বস্তু। কিন্তু বস্তু-শব্দের অর্থ কি? নানা লক্ষণাক্রান্ত গরুর মধ্যে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই গো'র গোত্ব; নানা পশুর মধ্যে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই পশুর পশুত্ব; সেইরূপ জ্ঞানের বিষয় মাত্রেরই মধ্যে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই বস্তুর বস্তুত্ব। কিন্তু সাধারণ জাতি-বাচক গো যেমন বিশেষ বিশেষ গো'র সম্বন্ধ-সাপেক্ষ, সাধারণ জাতি-বাচক বস্তুও সেইরূপ বিশেষ বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধ-সাপেক্ষ। শুদ্ধ কেবল গোত্ব-লক্ষণ দ্বারা গো বিষয়-রূপে প্রত্যক্ষ হয় না; হয় কৃষ্ণবর্ণ, নয় শ্বেত বর্ণ, এইরূপ কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণ তাহার সহিত জুড়িয়া দিলে তবেই গো বলিয়া একটা বিষয় খাড়া হয়; তেমনি, বস্তুর বস্তুত্ব-লক্ষণ—যাহা অপরিবর্ত্তনীয়—তাহার সহিত যদি এমন কোন লক্ষণ জুড়িয়া দেওয়া যায়—যাহা এক বস্তুতে আছে আর-এক বস্তুতে নাই—যাহার বিকল্প সম্ভবে—তাহা হইলে বস্তুর সেই বস্তুত্ব বিষয়রূপে পরিণত হয়। পূর্ব্বে অস্তি এবং ভাতি এই দুইটি শব্দের আলোচনা করা হইয়াছে, এক্ষণে, তাহারই অনুরূপ আর দুইটি শব্দ দেখা দিতেছে,—(১) বস্তুর বস্তুত্ব-এবং (২) বস্তুর বিষয়ত্ব;—একটা নির্বকল্প, আর একটা সবিকল্প অর্থাৎ পরিবর্ত্তনীয়। এখন, ইহা সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, জাতি-বাচক বস্তু জ্ঞানের বিষয় নহে তাহা জ্ঞানের অঙ্গ। শ্বেত নীল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বর্ণই দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু জাতিবাচক বর্ণ, যাহাতে সকল বর্ণেরই বর্ণত্ব হয়, তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন একটি বিশেষ বর্ণের পরিচায়ক নহে, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের নিজেরই পরিচায়ক; সেইরূপ, (১) বিশেষ বিশেষ বস্তুই জ্ঞানের বিষয়, (২) জাতি-বাচক বস্তু, যাহাতে বস্তুত্ব লক্ষণ ভিন্ন আর কোন লক্ষণ বিদ্যমান নাই—যাহাতে এমন একটিও লক্ষণ নাই যাহার বিকল্প সম্ভবে, তাহা জ্ঞানের বিষয় নহে—তাহা জ্ঞানের বিষয়োন্মুখী স্ফূর্ত্তি মাত্র। বর্ণের পরিবর্ত্তনীয়তা এবং নানাত্ব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বর্ণের নির্বিকল্পতা ও একত্ব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নিজের উপর নির্ভর করে; চক্ষুরিন্দ্রিয় নিজে এক—বর্ণ তাই জাতিতে এক, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় অনেক—বর্ণ তাই অনেক; সেইরূপ—জ্ঞান নিজে এক তাই জাতি-বাচক বস্তু এক—জ্ঞানের বিষয় বিভিন্ন তাই ব্যক্তি-বাচক বস্তু বিভিন্ন। জ্ঞানের নিজের স্থায়িত্ব এবং একত্ব, আর বিষয়ের নানাত্ব এবং পরিবর্ত্তনীয়ত্ব এ দুয়ের যদি মানচিত্র দেখিতে চাও—তবে কালকে দেখ; এক দিকে এক কাল অনাদি এবং অনন্ত, তাহা চিরস্থায়ী, আর একদিকে নিত্য-নূতন বর্ত্তমান কাল—আজিকের বর্ত্তমান কাল কালিকের বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন; বর্ত্তমান কাল

ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন। ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যাহা জ্ঞানেতে স্থায়ী রহিয়াছে তাহার সহিত বর্ত্তমান কালের নূতন নূতন বিষয় গ্রথিত হইয়া জ্ঞান ক্রমশ পুষ্ট হইতে থাকে। মালার সূত্র যেমন এক ও পুষ্প যেমন অনেক, সেইরূপ কালের প্রবাহ এক—মুহূর্ত্ত অনেক। এইরূপ জ্ঞানের একত্ব এবং স্থায়িত্ব ও বিষয়ের অনেকত্ব এবং পরিবর্ত্তনীয়তা উভয়েরই ছবি কালের গাত্রে স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে।

জ্ঞানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থের প্রথমেই একটি সুন্দর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে,—

"শব্দ স্পর্শাদয়ো বেদ্যা, বৈচিত্র্যাজ্ জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎ সম্বিদ্, ঐকরূপ্যাৎ,
নভিদ্যতে ॥
তথা স্বপ্নে ; হত্র বেদ্যস্তু ন স্থিরং, জাগরে স্থিরং।
তদ্ভেদো, হতস্ ; তয়োঃ সম্বিদ্ একরূপা
ন ভিদ্যতে ॥
সুপ্তোত্থিতস্য, সৌষুপ্ত-তমো-বোধো,
ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধ-বিষয়া, হববুদ্ধং তৎ তদা, ততঃ ॥
স বোধো বিষয়াদ্ ভিন্নো, ন বোধাৎ,—স্বপ্ন বোধবৎ।
এবং, স্থান-ত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিৎ ; তদ্বদ্
দিনান্তরে ॥
মাসাব্দ-যুগ-কল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদ্ এষা স্বয়ং
প্রভা ॥

ইহার অর্থ।

জাগ্রৎকালে শব্দ স্পর্শাদি বেদ্য বস্তু বিচিত্রতা-নিবন্ধন পরস্পর হইতে বিভিন্ন, কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদির জ্ঞান একরূপতা-প্রযুক্ত শব্দ স্পর্শাদি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা একই অভিন্ন। সেইরূপ, স্বপ্নকালে; এখানে (অর্থাৎ স্বপ্ন-কালে) বেদ্য বস্তু অস্থির, জাগ্রৎ-কালে তাহা স্থির ;—অতএব স্বপ্ন-কালের বেদ্য বস্তু হইতে জাগ্রৎকালের বেদ্য বস্তু ভিন্ন ; কিন্তু উভয়-বিধ বেদ্য বস্তুর জ্ঞান একই জ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন দুই জ্ঞান নহে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালীন অন্ধকার-জ্ঞান স্মরণ হয়; জ্ঞাত বিষয়েরই স্মরণ সম্ভবে; এজন্য সুষুপ্তি-কালে তাৎকালিক অন্ধকার-জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল (অর্থাৎ একই জ্ঞান সুষুপ্তি কালের মধ্য দিয়া এক দিনের জাগ্রৎকাল হইতে পরদিনের জাগ্রৎকালে চলিয়া আসে; নচেৎ মাঝে কোথাও যদি তাহার ভঙ্গ ঘটিত তবে তাহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যাইত না)। সে জ্ঞান বিষয় হইতে ভিন্ন কিন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকালের ত্রিবিধ বিষয় হইতে সেই ত্রিবিধ বিষয়ের জ্ঞান ভিন্ন, কিন্তু এককালের জ্ঞান হইতে আর এককালের জ্ঞান ভিন্ন নহে, যে জ্ঞান জাগ্রৎকালের বিষয়ের গ্রাহক সেই জ্ঞানই স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালের বিষয়ের গ্রাহক। এইরূপ তিন কালের জ্ঞান তিন জ্ঞান নহে কিন্তু একই জ্ঞান; দিনান্তরেও জ্ঞানের ভিন্নতা হয় না; মাস বৎসর যুগ কল্প ইহারা অনেক প্রকারে গত

এবং আগত হইতেছে, তাহার মধ্যে স্বয়ম্প্রভা রূপী জ্ঞানই কেবল উদয়ও হয় না অস্তও হয় না অর্থাৎ তাহা স্থির-প্রতিষ্ঠিত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং জ্ঞানই স্থায়িত্বের নিদান। এখানে এই-রূপ এক আপত্তি উঠিতে পারে যে, "জ্ঞানের নিজের স্থায়িত্বের কোন নিদর্শন আছে কি না" এ কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, জ্ঞানের লক্ষ্য বস্তু সকলের স্থায়িত্ব অস্থায়িত্বের নিদর্শন কি তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের লক্ষ্য বস্তুর স্থায়িত্বের প্রমাণ যদি থাকে তবে তাহা জ্ঞানেতেই ত থাকিবে; জ্ঞানের নিকট হইতেই ত তুমি জ্ঞান-মূলক প্রমাণ চাহিতেছ ;—অজ্ঞান-মূলক প্রমাণ ভূরি ভূরি পড়িয়া আছে, তাহা ত চাহ না। অজ্ঞানবশতঃ সকলেই মনে করে যে, শরীর একটি স্থায়ী পদার্থ, অথচ প্রতিক্ষণেই তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে; সূর্য্য যে, সেরূপ নয় তাহার প্রমাণ কি? শরীরকে দশ বৎসর কাল স্থায়ী দেখিয়া বালকের মনে যদি এরূপ সংস্কার জন্মে যে, এ শরীর চিরস্থায়ী, তবে তাহা কি সত্য-সত্যই শরীরের চির-স্থায়ীত্বের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? পৃথিবী-শুদ্ধ লোকের এইরূপ সংস্কার যে, সূর্য্য চিরস্থায়ী ; কিন্তু পৃথিবীর হয় ত এখনো শৈশবাবস্থা ঘুচে নাই, তাহা হইলে সে সংস্কারের মূল্য ঐ বালকের সংস্কার অপেক্ষা অধিক-আর কিসে? সংস্কার যাহার যাহা থাকুক্ না, তাহার উপর আমাদের কোন বাদানুবাদ নাই, জ্ঞানেতে কি পাওয়া যায় তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। জ্ঞান-রাজ্য অন্বেষণ করিয়া একটি বস্তুরই কেবল স্থায়িত্বের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়—সে বস্তু জ্ঞান স্বয়ং। জ্ঞানেতে যাহাই প্রকাশ পায় তাহারই সঙ্গে জ্ঞান নিজে আপনার নিকট আপনি প্রকাশ পায়, সুতরাং জ্ঞান-গোচর সকল বস্তুর সঙ্গেই নির্ব্বিকল্পে এবং নির্ব্বিশেষে জ্ঞান নিজে প্রকাশ পায়, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে আর কোন বস্তুই সেরূপ নির্বকল্পে প্রকাশ পাইতে পারে না ; অন্যান্য সকল বস্তুই বিকল্পে প্রকাশ পায়; অশ্বের পরিবর্ত্তে হস্তী প্রকাশ পাইতে পারে, হস্তীর পরিবর্ত্তে পর্ব্বত প্রকাশ পাইতে পারে ; ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রকাশের সঙ্গেই অন্যান্য বস্তু প্রকাশ পায়, সুতরাং জ্ঞানের নিজের প্রকাশ এবং জ্ঞানের বিষয়ের প্রকাশ এ দুইকে যদি পরস্পর তুলনা করিয়া দেখা যায় তবে, এইরূপ দাঁড়ায় যে, (১) জ্ঞানের প্রকাশের তুলনায় বিষয়ের প্রকাশ পরিবর্ত্তনীয়, (২) বিষয়ের প্রকাশের তুলনায় জ্ঞানেয় প্রকাশ অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব জ্ঞান ভিন্ন আর কোন বিষয়ই জ্ঞান অপেক্ষা স্থায়ী বলিয়া জ্ঞানেতে প্রকাশ পাইতে পারে না ; আর যাহা কিছু স্থায়ী বলিয়া প্রকাশ পায় তাহা কেবল সংস্কারেই প্রকাশ পায়। হস্তী এক হিসাবে আমার জ্ঞান অপেক্ষা স্থায়ী ; আমার যখন জ্ঞান ছিল না তখনও হস্তী ছিল ; প্রমাণ কি? না হস্তী শব্দ পূর্ব্বতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ;—আমি শিক্ষকের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি যে সংস্কৃত

ভাষা বহু প্রাচীন ভাষা, তাহাতে আমার ধ্রুব সংস্কার জন্মিয়াছে যে, হস্তী শব্দ বহুকালীয় পুরাতন; এবং সেই সংস্কার হইতেই আমি পাইতেছি যে, হস্তী আমার জ্ঞানের পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে; এবং যতবার আমি যত হস্তী দেখিয়াছি ততই আমার মনে সেই সংস্কার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু আমার জ্ঞানের পূর্ব্বে, উক্ত সংস্কার বিদ্যমান ছিল, না উক্ত সংস্কারের পূর্ব্বে আমার জ্ঞান বিদ্যমান ছিল? আমার জ্ঞান অবশ্য উক্ত সংস্কারের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে; তবেই দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞানের নিকট জ্ঞান অপেক্ষা স্থায়িতর আর কিছুই নাই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের নিজের স্থায়িত্বের নিদর্শনই জ্ঞান-মূলক,—অন্যান্য বস্তুর স্থায়িত্বের নিদর্শন সংস্কার-মূলক ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

ক্রমশঃ।

চেঁচিয়ে বলা।

আজ কাল সকলেই সকল বিষয়েই চেঁচিয়ে কথা কয়। আস্তে বলা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। চেঁচিয়ে দান করে, চেঁচিয়ে সমাজ সংস্কার করে, চেঁচিয়ে খবরের কাগজ চালায়, এমন কি গোল থামাইতে গোল করে। সেক্‌রা গাড়ি যত না চলে, ততোধিক শব্দ করে; তাহার চাকা ঝন্ ঝন্ করে, তাহার জান্‌লা ঝর্ ঝর্ করে, তাহার গাড়োয়ান গাল পাড়িতে থাকে, তাহার চাবুকের শব্দে অস্থির হইতে হয়। বঙ্গসমাজও আজ কাল সেই চালে চলিতেছে, তাহার প্রত্যেক ইঞ্চি হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। সমাজটা যে চলিতেছে ইহা কাহারো অস্বীকার করিবার যো নাই; মাইল মাপিলে ইহার গতি-বেগ যে অধিক মনে হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঝাঁকানী মাপিলে ইহার গতি-প্রভাবের বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না। ঝাঁকানীর চোটে আরোহীদের মাথায় মাথায় অনবরত ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে, আর শব্দ এত অধিক, যে, একটা কথা কাহারো কর্ণ-গোচর করিতে গেলে গলার শির ছিঁড়িয়া যায়।

কাজেই বঙ্গসমাজে চেঁচানটাই চলিত হইয়াছে। পক্ষী জাতির মধ্যে কাকের সমাজ, পশুজাতির মধ্যে শৃগালের সমাজ, আর মনুষ্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালীর সমাজ যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, ইহা শত্রু পক্ষকেও স্বীকার করিতে হইবে।

শুনা গেছে, পূর্ব্বে লোকে গরীবকে লাখ টাকা দান করিয়াছে, অথচ টাকার

শব্দ হয় নাই, কিন্তু এখন চার গণ্ডা পয়সা দান করিলে তাহার ঝম্‌ঝমানিতে কানে তালা লাগে। এই ত গেল দানের কথা। আবার, দান না করিয়া এত কোলাহল করা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। ভিক্ষুক আসিল, দয়ার উদ্রেক হইল না, তাহাকে এক কথায় হাঁকাইয়া দিলাম, এই প্রাচীন প্রথা। কিন্তু এখন লোকে ভিক্ষুক তাড়াইতে গেলে, পোলিটিকল ইকনমির বড় বড় কথা আওড়াইতে থাকে, বলে, দান না করাই যথার্থ দয়া, দান করাই নিষ্ঠুরতা, ইহাতে সমাজের অপকার করা হয়, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ভিক্ষাবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখা হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্তই মানি। কিন্তু তোমার মুখে এ সব কথা কেন? তুমি এক পয়সা উপার্জ্জন কর না, ঘরের পয়সা ঘরে জমাইয়া রাখ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, কেবল অকেজো কতকগুলা বিলাস দ্রব্য কিনিয়া পয়সা ধ্বংশ কর, ভিক্ষা দিবার সময়েই তোমার মুখে পোলিটিকল ইকনমি কেন? পোলিটিকল ইকনমিটাকে কেবল ঢাকের কাজেই ব্যবহার করা হয়, আর কোন কাজে লাগে না।

দেশ-হিতৈষিতা, আলো জ্বালিবার গ্যাসের মত যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙ্গের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে—কিন্তু যখন চোঙ্গ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশ ছাড়া হইতে হয়। আজ কাল রাস্তায় ঘাটে দেশ-হিতৈষিতা-গ্যাসের গন্ধে ভূত পালাইতেছে, অথচ আবশ্যকের সময় অন্ধকার। গ্যাসটা কেবল নাকের মধ্য দিয়াই খরচ হইয়া যায়, বাকী কিছু থাকে না। আত্ম-পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি শূল বেদনার মত বিরাজমান, যে ব্যক্তি মাকে ভাত দেয় না, ভাইয়ের সঙ্গে লাঠালাঠি করে, পাড়াপ্রতিবেশীদের নাম পর্য্যন্তও জানে না—আজকাল সে ব্যক্তিও ভারতবর্ষকে মা বলে, বিশ কোটি লোককে ভাই বলে—শ্রোতারা আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। পূর্ব্বে আর এক রূপ ছিল—তখনকার ভাল লোকেরা বাপ পিতামহদের ভক্তি করিত—আত্ম পরিবারের সহিত দৃঢ় রূপে সংলগ্ন ছিল, পাড়া প্রতিবেশীর উৎসবে আমোদে কায়মনোবাক্যে যোগ দিত, বিপদে আপদে প্রাণপণে সাহায্য করিত। কিন্তু বাপকে ভক্তি করিলে, ভাইকে ভাল বাসিলে বন্ধু বান্ধবদিগকে সাহায্য করিলে, তেমন একটা হট্টগোল উপস্থিত হয় না—পৃথিবীর বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু সমস্ত চুপে চাপে সম্পন্ন হয়। কাজেই এখন "ভ্রাতাগণ" "ভগ্নিগণ," "ভারত মাতা" নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে, অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায়, ও ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোন সুবিধা হয় না আর ঘরের কোণে মিট্‌মিট্

করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিলেও অনেক কাজে দেখে।

আমি বেশ দেখিতেছি, আমার কথা অনেকে ভুল বুঝিবেন। আমি এমন বলি না যে, হৃদয়কে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অথবা একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাই ভাল। যদি সমস্ত ভারতবর্ষকে ভাল বাসিতে পারি, বিশকোটি লোককে ভাই বলিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কি ভাল হইতে পারে! কিন্তু তাহা হইল কই? যাহা আমাদের খাঁটি ছিল, তাহা যে গেল; তাহার স্থানে রহিল কি? বীজের গাছগুলা উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে গোটাকতক গোড়া-কাটা বৃক্ষ পুঁতিয়া আগায় জল ঢালিতেছি। বিদেশী বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করার চেয়ে যে আমাদের দিশি ধনুকে তীর ছোঁড়াও ভাল। কিন্তু আমাদের শব্দপ্রিয়তা এমন বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই শব্দের প্রতিই মনোযোগ।

কানটাই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। দেখ না, বাঙ্গলা খবরের কাগজগুলি কেবল শব্দের প্রভাবেই পাঠকদের কান দখল করিয়া বসিয়া আছে। কি যে বলিতেছে তাহা বড় একটা ভাবিয়া দেখে না, কেবল গলা খাট না হইলেই হইল। একটা কথা উঠিলে হয়, অমনি বাঙ্গালা খবরের কাগজে মহা চেঁচামেচি পড়িয়া যায়। কথাটা হয়ত বোঝাই হয় নাই, ভাল করিয়া শোনাই হয় নাই, হয়ত সে বিষয়ে কিছু জানাই নাই—কিন্তু আবশ্যক কি? বিষয়টা যত কম বোঝা যায়, বোধ করি, ততই হো হা করিয়া চেঁচাইবার সুবিধা হয়। জ্ঞানের অপেক্ষা বোধ করি অজ্ঞতার আওয়াজটা অধিক। ইহাত সচরাচর দেখা যায়, আমাদের বাঙ্গালা সংবাদপত্র দেশের অবস্থা কিছুই জানে না, এমন কি দেশের নামগুলা উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারে না, অথচ গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞ ভাবে উপদেশ দেয়; আইন জানে না উভয় পক্ষ দেখে না অথচ বিচারককে বিচার করিতে শিখায়; অনেক অনুসন্ধান করিয়া, বিস্তর বিবেচনা করিয়া যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা যাহা অনেক দিনে স্থির হইয়াছে, তাহা অবহেলা করিয়া, অথচ নিজে কিছু মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া বসে। গলা ভারি করিয়া কথা কয়, অথচ কথাগুলা ছেলেমানুষের মত, বলিবার ভঙ্গী এবং বলিবার বিষয়ের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য, যে, শুনিলে হাসি পায়। কথায় কথায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। কেহ বা লিখিলেন, "অমুক গাঁয়ের নিকট পদ্মায় সহসা এক ঝড় উঠিয়া তিন খানা নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, অমুক শালে আর একবার এইরূপ সহসা ঝড় উঠিয়া অমুক স্থানে আর দুই খানা নৌকা ডুবিয়া যায়, আশ্চর্য্য তথাপি আমাদের গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইল না!" কেহ বা বলিলেন—"অমুক গাঁয়ে রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় এক ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হয় ও জমিদার বাবুদের এক আস্তাবল পড়িয়া যায়, গবর্ণমেণ্টের

পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল।" কেহ বা লিখিলেন—"বাঙ্গালীরা দুইবেলা ডাল ভাত খাইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, অথচ আমাদের শাসন কর্ত্তারা এবিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছেন না!" হয়ত ইহা হইতে প্রমাণ করিলেন যে ইংরাজদের স্বার্থই এই যে, আমাদের ডাল ভাত খাওয়াইয়া রোগা করিয়া রাখা। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া এক উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হইল—বলা হইল যে, যে দেশে এককালে শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের লোকেরা যে ডাল ভাত খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছেন ইহা কেবল বিদেশীয় শাসনের ফল! পাঠ করিয়া উক্ত জগদ্বিখ্যাত কাগজের ১৩৭ জন অন্যরারি পাঠকের সর্ব্ব শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! মাঝে একবার সহসা দেখা গেল, কোন কোন বাঙ্গালা কাগজ তারস্বরে ইংরাজি Statesman পত্রকে গাল দিতে আরম্ভ করিয়াছেন—রুচি-বিরুদ্ধ কঠোর ও অভদ্র ভাবে উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের অপরাধের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-স্খলন হইতে পারে তাহাই দেখাইয়া দেওয়া যথার্থ বন্ধুর কাজ। অমনি বাঙ্গালা খবরের কাগজের ঢাকে কাঠি পড়িল। এরূপ আচরণ অতিশয় হাস্যজনক। যে ব্যক্তি অপ্রিয় সত্য শুনিতে পারে না, সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই নহে, সে ব্যক্তি বালক, দুর্ব্বল, লঘুচিত্ত! তুমি কি চাও, আদুরে ছেলেটির মত কেবল তোমার স্তুতিগান করিয়া তোমাকে বুকে তুলিয়া নাচাইয়া বেড়ানই Statesmen পত্রের কাজ? তোমার একটা দোষ দেখাইয়া দিলেই অমনি তুমি হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিবে? যাহার হিতৈষিতার সহস্র প্রমাণ পাইয়াছ, সে যদিই বা হিত কামনা করিয়া একটা কঠোর কথা বলে অমনি তাহা বরদাস্ত করিতে পার না, এমনি তুমি নন্দদুলাল হইয়াছ?—পূর্ব্বকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহার কুটীল অর্থ বাহির করিতে থাক, এমনি তুমি অকৃতজ্ঞ? এইরূপ প্রত্যেক সামান্য ঘটনায় চীৎকার করিবার ভাব প্রতিনিয়ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে। ইহাতে ফল এই হইতেছে সাধারণের মধ্যে ছেলেমানুষের মত এক প্রকার খুঁৎখুঁতে কাঁদুনে ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। অনবরত আত্ম-প্রশংসা করিয়া, নিজের দোষের জন্যে পরকে তিরস্কার করিয়া নিজের কর্ত্তব্যভার পরের স্কন্ধে চাপাইয়া, কেবল গলার আওয়াজেরই উন্নতি করিতেছি, ও চক্ষু বুজিয়া মনে করিতেছি যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত আমরা ব্যতীত আর বিশ্বশুদ্ধ সকলেই দায়ী!

গোটাকতক ইংরাজি শব্দ আসিয়া আমাদের অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। Independent Spirit নামক একটা শব্দ আমাদের সমাজে বিস্তর অপকার করিতেছে—বাঙ্গালীর ছেলেপিলে খবরের কাগজপত্র

সকলে মিলিয়া এই Independent Spirit-এর চর্চ্চায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দটার প্রভাবে প্রতিমুহূর্ত্তে বাঙ্গলা দেশ হইতে সহজ ভদ্রভাব চলিয়া যাইতেছে ও এক প্রকার অভদ্র উদগ্র পরুষ ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। খবরের কাগজের লেখা গুলার মধ্যে আগাগোড়া এক প্রকার অভদ্র ভঙ্গী দেখা যায়। ভাল মুখে মোলায়েম করিয়া কথা কহিলে যেন Spirit-এর অভাব দেখান হয়—সেই জন্য সর্ব্বদাই কেমন তেরিয়া ভাবে কথা কহিবার ফেষিয়ান উঠিয়াছে—অনর্থক অনাবশ্যক গায়ে পড়িয়া অভদ্রতা করা খবরের কাগজে চলিত হইয়াছে। যেখানে উপদেশ দেওয়া উচিত সেখানে গালাগালি দেওয়া হয়—যেখানে কোন প্রকার খুঁৎধরা রুচি-বিরুদ্ধ, সেখাতে জোর করিয়া খুঁৎ ধরা হয়। এইরূপ সংবাদপত্রগুলি পাঠকদের পক্ষে যে কিরূপ কুশিক্ষার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অন্ধকার দেখিতে হয়! আজকালকার ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এম্‌নি Independent spirit ফুটিয়া বাহির হইতেছে যে, তাহাদের ছুঁইতে ভয় করে। তাহারা সর্ব্বদাই যেন মারিতে উদ্যত। চব্বিশঘণ্টা যেন তাহারা হাতের আস্তিন গুড়াইয়া কোমর বাঁধিয়াই আছে। কিসে যে সহসা তাহাদের অপমান বোধ হয়, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এক এক জন ইংরাজ যেমন দিশী-জুতা দেখিলে অপমান বোধ করে—তেমনি দিশি লৌকিক আচরণ ইহাদের পিঠে দিশী জুতার ন্যায় বাজিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কোন অনভিজ্ঞ প্রাচীন ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়ের ঠাকুরের নাম কি?" অমনি ইহারা ফোঁস্ করিয়া উঠে। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন, জগৎ সংসার ইহাদিগকে অপমান করিবার জন্য অবিরত উদ্যোগী রহিয়াছে, তাই জন্যে ইহারা আগে হইতে পদে পদে জগৎকে অপমান করিবার জন্য ধাবমান হয়। শুয়া পোকার ন্যায় দিনরাত্রি কণ্টকিত হইয়া থাকাকেই ইহারা Independent spirit কহে। গল্পে শুনা যায়, এমন এক এক জন অতি-বুদ্ধিমান্ আছেন, যাঁহারা নাকে কানে তুলা দিয়া মশারীর মধ্যে বসিয়া থাকেন, পাছে তাঁহাদের বুদ্ধি কোন সুযোগে বাহির হইয়া যায়; ইহাঁরাও তেমনি সজারুর মত সর্ব্বদাই চারিদিকে কাঁটা উঁচাইয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে থাকেন, পাছে ইহাঁদের কেহ অপমান করে। এদিকে আবার ইহাঁরা ভীরুর অগ্রগণ্য; দুর্ব্বলের কাছে, ভৃত্যের কাছে, স্ত্রীর কাছে ইহাঁরা Independent spirit নামক বৃহৎ লাঙ্গুলটা এমনি আস্ফালন করিতে থাকেন যে, কাছাকাছির মধ্যে লোক তিষ্ঠিতে পারে না, আর, একটা শ্বেত মূর্ত্তি দেখিলেই সে লাঙ্গুলটা গুটাইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। যাহার যথার্থ বল আছে সে সর্ব্বদাই ভদ্র—সে তাহার বলটাকে গণ্ডারের শিঙ্গের মত অহোরাত্র নাকের উপর খাড়া করিয়া রাখে না। আর যে দুর্ব্বল, হয় সে লাঙ্গুল গুটাইয়া কুঁকড়ি মা-

রিয়া থাকে, নয় সে খেঁকি কুকুরের মত ভদ্রলোক দেখিলেই দূর হইতে অবিরত ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। আমরাও কেবল দূর হইতে অভদ্র ভাবে ঘেউ ঘেউ করিতেছি। শব্দে কান ফাটিয়া যাইতেছে।

প্রাণের সঙ্গে যখন কোন কথা বলি, তখন যাহা বলি তাহারি একটা বল থাকে—যখন প্রাণে বাজে নাই অথচ মুখে বলিতে হইবে, তখন চেঁচাইয়া বলিতে হয়, বিস্তর বলিতে হয়। বঙ্গসমাজে যে আজকাল বিশেষ চেঁচামেচি পড়িয়া গিয়াছে ইহাও তাহার একটি কারণ। বক্তা যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন, তখন সে এক অতি কষ্টকর দৃশ্য উপস্থিত হয়। গ্রহণী রোগীর ন্যায় তাঁহার হাতে পায়ে আক্ষেপ ধরিতে থাকে, গলার শির ফুলিয়া ওঠে, চোখ দুটা বাহির হইয়া আসিতে চায়। যিনি বাঙ্গলা দেশের কিছুই জানেন না, তিনি কথায় কথায় বলেন, "কুমারিকা হইতে হিমালয় ও সিন্ধুনদী হইতে ব্রহ্মপুত্র;" ফুঁ দিয়া দিয়া কথাগুলাকে যত বড় করা সম্ভব তাহা করা হয়; যেখানে বাঙ্গালা দেশ বলিলেই যথেষ্ট হয় সেখানে তিনি এসিয়া না বলিয়া থাকিতে পারেন না; যেখানে সামান্য জমাখরচের কথা হইতেছে, সেখানে ভাস্করাচার্য্য ও লীলাবতীর উল্লেখ না করিলে তাঁহার মনঃপুত হয় না; একজন ফিরিঙ্গি বালকের সহিত দেশীয় বালককে ঝগড়া করিতে দেখিলে তাঁহার ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুনকে পর্য্যন্ত মনে পড়ে। যথার্থ প্রাণের সঙ্গে বলিলে কথাগুলা খাট খাট হয়, ও কিছুই অতিরিক্ত হইতে পায় না।

আজ কালকার সাহিত্য দেখ না কেন, এইরূপ চীৎকারে প্রতিধ্বনিত। পরিপূর্ণতার মধ্য হইতে যে একটা গম্ভীর আওয়াজ বাহির হয়, সে আওয়াজ ইহাতে পাওয়া যায় না। যাহা কিছু বলিতে হইবে তাহাই অধিক করিয়া বলা, যে কোন অনুভাব ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাকেই একেবারে নিংড়াইয়া তিক্ত করিয়া তোলা। যদি আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি আরম্ভ হইল, বাজ্ বাঁশী, বাজ্ কাঁশী, বাজ্ ঢাক্ বাজ্ ঢোল্, বাজ্ ঢেঁকি, বাজ্ কুলো—ইহাকে ত আনন্দ বলে না, ইহা এক প্রকার প্রাণপণ মত্ততার ভাণ, এক প্রকার বিকার, রোগ;—যদি দুঃখ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি ছুরী ছোরা, দড়ি কলসী, বিষ আগুন, হাঁস্ ফাঁস্, ধড়্ ফড়্, ছট্‌ফট্—সে এক বিপর্য্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। এখনকার কবিরা যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরবাসী অনুভাবগুলিকে বিকৃতাকার করিয়া তুলিয়া হাটের মধ্যে দিগ্‌বাজি খেলাইতে ভাল বাসেন! কোন কোন কবি সমাজের নাসিকাকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের ক্ষতগ্রস্ত ভাবকে হয়ত কোন কুলবধূর নামের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিতান্ত বেআব্রু কবিতা লিখিয়া থাকেন। ইহাকেই চেঁচাইয়া কবিতা লেখা বলে। আমাদের প্রাচ্য-হৃদয়ে একটি আব্রুর ভাব আছে। আমরা কেবল দর্শকদের নেত্রসুখের জন্য হৃদয়কে উলঙ্গ করিয়া হাটে ঘাটে প্রদর্শনের জন্য রাখিতে

পারি না। আমরা যদি কৃত্রিম উপায়ে আমাদের প্রাচ্য ভাবকে গলাটিপিয়া না মারিয়া ফেলিতাম, তবে উপরোক্ত শ্রেণীর কবিতা পড়িয়া ঘৃণায় আমাদের গা শিহরিয়া উঠিত। সহজ সুস্থ অকপট হৃদয় হইতে এক প্রকার পরিষ্কার অনর্গল অনতিমাত্র ভাব ও ভাষা বাহির হয়, তাহাতে অতিরিক্ত ও বিকৃত কিছু থাকে না—টানাহেঁচড়া করিতে গেলেই আমাদের ভাব ও ভাষা স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত অতিশয় দীর্ঘ হইতে থাকে ও বিকৃতাকার ধারণ করে।

যখন বাঙ্গালা দেশে নূতন ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ হইল, তখন নূতন শিক্ষিত যুবারা জোর করিয়া মদ খাইতেন, গোমাংস খাইতেন। চেঁচাইয়া সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করিতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন। এখনো সেই শ্রেণীর একদল লোক আছেন। তাঁহাদের অনেকে সমাজ-সংস্কারক বলিয়া গণ্য। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, তাঁহারা যে হৃদয়ের বিশ্বাসের বেগে চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধে গমন করেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্ধভাবে চেঁচাইয়া কাজ করেন। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদের দুর্দ্দশায় তাঁহাদের যে কষ্টবোধ হয় তাহা নহে, তাঁহারা যে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া কোন কাজ করেন তাহা নহে, তাঁহারা কেবল চেঁচাইয়া বলিতে চান আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইহাঁদের দ্বারা হানি এই হয় যে, ইহাঁরা নিজ কার্য্যের সীমা পরিসীমা কিছুই দেখিতে পান না—কোথা গিয়া পড়েন ঠিকানা থাকে না। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি বিশ্বাস একটি সংস্কার ধ্রুব তারার মত জ্বলিতে থাকে, তাঁহারা সেই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাকেন; তাঁহারা জানেন কোন খানে তাঁহাদের গম্যস্থান, কোন দিকে গেলে তাঁহারা কিনারা পাইবেন। কেবল দৈবাৎ কখনো স্রোতের বেগে ভাসিয়া, বিপথে যান।

আমাদের সমাজে আজকাল যে এইরূপ অস্বাভাবিক চীৎকার-প্রথা প্রচলিত হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছু নহে, আমরা হঠাৎ সভ্য হইয়াছি। আমরা বিদেশ হইতে কতকগুলা অচেনা ভাব পাইয়াছি, তাহাদের ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই, অথচ কর্ত্তব্যবোধে তাহাদের অনুগমন করিতে গিয়া এক প্রকার বল পূর্ব্বক চেঁচাইয়া কাজ করিতে হয়। আমরা নিজেই এখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কাজগুলা আমরা বিশ্বাসের প্রভাবে করিতেছি, আর কোন্‌গুলা কেবল মাত্র অন্ধভাবে করিতেছি। কোন্ খানে আমরা নিজে দাঁড় টানিয়া যাইতেছি, আর কোন্ খানে আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বড় বড় বিদেশী কথার মুখস্ পরিয়া আমরাত আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না? আমাদের যেরূপ দেখাইতেছে আমরা সত্যই কি তাহাই হইয়াছি? যদি হইতাম তাহা হইলে কি এত চেঁচাইতে হইত? আর যদি না হইতেই পারিলাম, তবে কি মাংসখণ্ডের ছায়া দেখিয়া মুখের মাংসখণ্ডটি ফেলিয়া ভাল কাজ করিতেছি? শেষকালে কি অভ্রুবও যাইবে ধ্রুবও যাইবে?

মালয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার।

মানবজাতির ইতিহাস পাঠ অবগত হওয়া যায় যে আর্য্যজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং উহা হইতেই প্রায় সমস্ত আধুনিক সভ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যখন আর্য্যজাতি সকল সভ্যজাতির আদি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আর্য্যভাষাও ও যে সমগ্র সুসভ্য ভাষার মূল এবং আর্য্যধর্ম্ম যে সকল ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্যভাষার প্রথম শাখা সংস্কৃত, সুতরাং সংস্কৃতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা। কোন কোন পণ্ডিত এরূপও ও কহিয়াছেন যে সংস্কৃতই আর্য্যভাষার আদি ভাষা এবং ইহাই সকল ভাষার প্রসূতী স্বরূপ? সে যাহা হউক, আর্য্যেরা তাঁহাদিগের অক্‌শস্ নদী-তীরস্থিত আদিম আবাস ভূমি ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলে সংস্কৃত ভাষার ও তৎসঙ্গে সঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন তাহা এক্ষণে নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কোন কোন ভারততত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত কহিয়াছেন যে অন্যূন আট সহস্র বৎসর অতীত হইল ভারতে আর্য্যজাতি প্রথম প্রবেশ করেন। কিন্তু আর্য্যদিগের অভ্যুদয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। কাল সহকারে এই প্রাচীন ধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। কিন্তু ইহার বিস্তার ভারতবর্ষেই নিবদ্ধ রহিল না; ক্রমশঃ ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া শ্যাম ও মালয়রাজ্যে প্রকাশিত হইল। এবং অবশেষে ভারত মহাসমুদ্রস্থিত সিঙ্গাপুর সুমাত্রা, জাবা, বালি, লম্বক প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও প্রবাহিত হইল। কোন্ সময়ে হিন্দুধর্ম্ম এই সকল দ্বীপ নিবাসীদিগের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু অনুমান দুই সহস্রাধিক বৎসর হইল এই সকল রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয় হয়। তৎকালে নির্ম্মল বৈদিকধর্ম্ম ক্রমশঃ পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছিল, বিদ্যার ও বিজ্ঞানের আলোক হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং মালয়দ্বীপপুঞ্জে তৎকালোচিত ধর্ম্মই প্রচারিত হয়। অদ্যাপি ঐ সকল দ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের যে অত্যল্পমাত্র নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে খৃষ্টীয়

ধর্ম্মপ্রচারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম শ্যাম ও মালয় রাজ্যে বাহিত হয়। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহারা শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপে আর্য্যধর্ম্ম বিস্তার করিয়া সিঙ্গাপুর (সিংহপুর?) দ্বীপে উপনীত হয়েন এবং সিঙ্গাপুর হইতে সুমাত্রা, জাবা, লম্বক, বালি, সাম্বয়া, ফ্লুরিস্, সাবু, রতি এবং তাইমর দ্বীপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপে অধিকাংশ মালয়দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বর্ণিও এবং সেলিবিস দ্বীপে প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যধর্ম্ম বিস্তার হইয়াছিল কি না বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঐ সকল দ্বীপবাসিগণের প্রচলিত আচার ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান হয় যে কোন দূরবর্ত্তী সময়ে এ সকল স্থানেও হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল; কিন্তু বিজাতীয়দিগের সহবাসে ক্রমশঃ উহা বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল মালয়দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুধর্ম্ম প্রথম প্রবিষ্ট হয়। তৎকাল হইতে প্রায় ১৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত দ্বীপবাসিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। অন্যূন চারি শত বৎসর হইল মুসলমানেরা উপরোক্ত দ্বীপ সমূহে প্রবেশ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং তৎকাল হইতে সেই স্থানে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মহীন অসভ্য লোকেরা অনতিবিলম্বেই মহম্মদীয় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া পড়ে, এবং তাহাদিগের সংসর্গে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরাও যাবনিক ধর্ম্ম গ্রহণ করায় হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হয়। এইরূপে কালক্রমে হিন্দু-ধর্ম্মের ক্রম-বিস্তার নিরস্ত এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। কিন্তু যে সকল দ্বীপে আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত রূপ বিস্তার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহাতে অদ্যাপিও ঐ ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে। জাবা, বালি, লম্বক, সাবু এবং রতি নামক দ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে বিদ্যমান আছে।

সিঙ্গাপুর দ্বীপের অনেক স্থানে এ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত আছে। সিঙ্গাপুর নগরে ও অপরাপর কয়েকটি গ্রামে হিন্দুদেবতার প্রতিমূর্ত্তি ও দেবমন্দির সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে ঐ দ্বীপে বিভিন্ন দেশীয় লোক ব্যবসায় ও অন্যান্য কার্য্যসূত্রে উপনিবিষ্ট হওয়ায় হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উপস্থিত অবস্থায় সিঙ্গাপুর দ্বীপে আট জাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়,—ইংরাজ, চীন, মালয়, পর্ত্তুগীজ, ক্লিং, আরব, বাঙ্গালী ও পারসী। এতদ্ব্যতীত জাবা, বালি, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপেরও অনেক লোক দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতি বিভিন্ন ভাষাভাষী, ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম যে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তবে অদ্যাপিও যে দেবমন্দির সমূহ জাজ্বল্যমান আছে, এবং হিন্দু দেবমূর্ত্তি সকল অর্চ্চিত হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে এক সময়ে সমগ্র দ্বীপবাসীই হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া এ পর্য্যন্ত

এককালীন বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। সে যাহা হউক, সিঙ্গাপুরে যে সকল দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশেরই হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কাল সহকারে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ঘটিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা, শিব প্রভৃতি সিঙ্গাপুরের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা।

জাবা দ্বীপে হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত-লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। জাবার স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন দেবমন্দির সকল বিদ্যমান আছে। অনেক নগরে মন্দিরের ভগ্নাংশ মাত্র দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা নাম নগরে চাঁদি সেওয়া (চণ্ডীসেবা) নামক স্থানে এক সহস্র মন্দির ছিল, তন্মধ্যে ২৯৬ টি মন্দিরের অবশিষ্টাংশ এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু কাল সহকারে অধিকাংশই স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে, অথবা তাহাদিগের উপর বৃহদাকার বৃক্ষাদি জন্মিয়া এককালীন আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা এরূপ নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত যে ইষ্টক হইতে ইষ্টকের ব্যবধান পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল মন্দির অতিশয় উচ্চ ও সুগঠিত, এবং ভূরি ভূরি কারু কার্য্যে পরিপূর্ণ—মনুষ্য ও পশু পক্ষীর আকৃতি অতি সুন্দররূপে মন্দির দেহে খোদিত আছে। এই সকল মন্দির যে হিন্দু শিল্পীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহা যদিও এক্ষণে প্রমাণ করিতে পারা সহজ নহে, কিন্তু জাবা-নিবাসীরা যে এই সকল শিল্প কার্য্য আর্য্যজাতির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

চাঁদিসেওয়ার অনতিদূরে চণ্ডী কালী বেনিং নামা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেবীর মন্দির যদিও অতি প্রাচীন, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য এমত চমৎকার যে ইহাকে সহসা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য সর্ব্বসংহারকারী কালকে উপহাস করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দির ৪০ হস্ত পরিমিত উচ্চ এবং ইহার আয়তন প্রায় ৪৮ হস্ত। এই মন্দির দেহে নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত থাকায় এক অনুপম শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। অধুনা এরূপ দেবমন্দির ভারতবর্ষের কোন অংশেই লক্ষিত হয় না। ব্রহ্মানাম নগরে আরও বহু সংখ্যক দেবমন্দির বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই এক কালীন ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। এস্থানে লরোজংগ্রাণ বা দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহা আমাদিগের দেশীয় দুর্গার প্রতিমা হইতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ। উহা অষ্টভুজা মূর্ত্তি এবং বৃষোপরি সংস্থিত। বৃষ পদচতুষ্টয় সংযত করিয়া উপবিষ্ট আছে এবং দেবী তাঁহার অধস্তন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বৃষের পুচ্ছ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অন্যতর তিনটি দক্ষিণ হস্তে শর, খড়্গ ও রজ্জু-নির্ম্মিত চক্র শোভমান আছে। বাম হস্ত-চতুষ্টয়ে শঙ্খমালা, পতাকা, ধনু ও দেওত মহিকাসুরের (মহিষাসুর দৈত্যের)

কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছেন। মহিষাসুর রজ্জুবদ্ধ ও যোড়হস্তে নীত।

এতদ্ব্যতীত বরোবতো নামক নগরে এক প্রকাণ্ড মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত, এবং ইহার চতুর্দ্দিকের প্রস্তররাশি কর্ত্তন করিয়া স্তরে স্তরে ক্রম-নিম্ন ভাবে সপ্তশ্রেণী অলিন্দ প্রস্তুত হওয়ায় এক অপরিসীম সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। মধ্যস্থিত গম্বুজটি আয়তনে প্রায় ৩৩ হস্ত এবং ঊর্দ্ধে ৬৮ হস্ত হইবে। এই প্রকাণ্ড গম্বুজটিকে বেষ্টন করিয়া ৭২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজ দণ্ডায়মান আছে। দূর হইতে এই মন্দিরের দৃশ্য অতি মনোহর। ইহাতে ভূয়সী শিল্প চাতুর্য্য ও নির্ম্মাণ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত। কত অর্থব্যয়ে, কত পরিশ্রমে ও কত সময়ে যে এরূপ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা কল্পনাতীত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ও অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গুণং প্র নামক শৈলোপরিও প্রায় চারি শত ভগ্ন মন্দিরের অবশিষ্টাংশ এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। কেদিরি এবং মালং নামক স্থানেও অনেক প্রাচীন দেব গৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এইরূপ জাবার প্রায় সকল প্রদেশেই হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন এ পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে জাবা হইতে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং কালসহকারে উহা হয়ত একেবারেই বিলুপ্ত হইবে।

বালি এবং লম্বক দ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম অদ্যাপি সম্যক রূপে বিদ্যমান আছে। মালয়দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কেবল এই দ্বীপদ্বয়ের নিবাসিগণ এখনও ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তবে এতদ্ উভয়ে বহুকাল হইতে স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী লোকও অনেক বাস করিতেছে। এই দুই দ্বীপের অধিপতিদিগকে রাজা কহে। রাজা ব্যতীত প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা (পুরোহিত) অসীম মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বালি ও লম্বক উভয় প্রদেশই অতি ক্ষুদ্র এবং পর্ব্বত পূর্ণ এবং এই দুইটি দ্বীপেই এক একটি অত্যুচ্চ আগ্নেয় শৃঙ্গ বিদ্যমান আছে। হিন্দুরা এই আগ্নেয়গিরিকে দেবতা স্বরূপে পূজা করিয়া থাকে। বালি ও লম্বক দ্বীপের নানা স্থানে দেবমন্দির স্থাপিত আছে, এবং অদ্যাপি নিবাসিগণের হিন্দুধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকায় জাবার দেবমন্দির সমূহের ন্যায় ঐ সমস্ত নষ্ট বা ভগ্নাদশাগ্রস্ত হয় নাই। বালি ও লম্বক প্রদেশ পরস্পর এত সন্নিহিত যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও আচার ব্যবহারে উভয়েই এক হইয়া পড়িয়াছে। এই দুই স্থানেই নানা হিন্দু দেবদেবী অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং হিন্দু অধিবাসীরা দেবতাদিগের সম্মুখে বলি প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে।

সাবু ও রতিদ্বীপ অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে হিন্দুদিগের সহিত এই দুই দ্বীপবাসিগণের শারীরিক ও প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই উভয় প্রদেশেই এ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুর, জাবা, বালি, লম্বক প্রকৃতির ন্যায় এই দুই স্থানেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির সমূহ বর্ত্তমান আছে। সাবু ও রতির লোকেরা এক জাতীয়; ইহাদিগের মধ্যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্যান্য দেশীয় লোকের সহিত ইহাদিগের বিশেষ সংশ্রব ও ঘনিষ্ঠতা না থাকায় এ পর্য্যন্ত ইহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিপর্য্যয় ঘটে, কিন্তু ইহাদিগের অবস্থা যে ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
জুয়লজিকল গার্ডন্
আলিপুর।

প্রেম-গীতি।

১

কত যেন দোষী হ'য়ে, কত যেন পাপ ল'য়ে
আসিয়াছি নিকটে তোমার!
কি যেন দুখের চিত্র, কি যেন সুতীব্র বিষ
আসিয়াছি দিতে উপহার!—

২

জ্বলন্ত আঁখিতে আছে কি যেন কলঙ্ক-লেখা!
—আঁখি তুলি' দেখিতে না চাও!
রুদ্ধ কণ্ঠে আছে যেন মৃত্যুর কঠোরাদেশ!
—দেব-কর্ণে শুনিবারে পাও!—

৩

আঁধারে মাথার পরে পরিণাম-নিশাচরী
দাঁড়াইয়া পাখা বিস্তারিয়া!
—দেখিতেছ তুমি যেন সময়ের মেঘ ঠেলি'
নিশীথের চিরিয়া চিরিয়া!—

৪

উদ্গীর্ণ করিবে চিন্তা কি অনল, ধাতু-স্রাব
চরাচর যা'বে যেন জ্বলে!
—নিভা'তে নারিবে যেন কয়টা সমুদ্র দিয়া
কি তোমার বিন্দু দুই জলে!—

৫

হৃদয়-ভিতরে যেন শ্মশান হইয়া গেছে,
নিশি শুধু রেখেছে ঢাকিয়া!
—তোমার একটি দৃষ্টি ঊষার আলোক-ধারা
দিবে যেন মোহ জ্বালাইয়া!—

৬

প্রাণের ভিতর যেন প্রস্তুত হইয়া সব!
—সিন্ধু যেন পূর্ব্বে ঝটিকার!—
একটি কথায় তব অনল-স্ফুলিঙ্গে এক—
সব যেন হ'বে ছারখার!
তুমি আমি হ'ব ছারখার।—

৭

তাই তুমি ঘৃণা ক'রে ভীত হ'য়ে যাও স'রে
মোর শ্বাস যায় না যেখানে?
কি ছিলাম কি হ'য়েছি, কেমন করিয়া আছি
দেখ না ফিরিয়া আঁখি-কোণে!

৮

শুন তবে রমণিরে বলি তোরে গর্ব্ব-ভরে—
এ প্রণয় স্বার্থ শূন্য নয়!
নিভিবে না এ প্রণয় স্বার্থ না হইলে পূর্ণ!
এ প্রণয় মহাস্বার্থময়!

৯

চিন্তায় অভাব আছে,কার্য্যেতে অভাব আছে,
জগতে অভাব আছে মোর!
সুখেতে অভাব আছে, দুখেতে অভাব আছে,
স্বরগে অভাব আছে ঘোর!

১০

পূরা'তে অভাব এত এসেছি তোমার কাছে;
—করুণা বিরক্তি নাহি চাই!
হও কুসুমের মত কিম্বা পাষাণের মত
—জানিবার সে বাসনা নাই!

১১

লইয়া অভাব এত —লইয়া এ মহাশূন্য—
আসিয়াছি নিকটে তোমার!
যতটুকু পার তুমি এ শূন্য পূরিয়া দাও!
—শুধু দাও শক্তি দাঁড়াবার!—

১২

এ শূন্যের তিন ভাগ অপূর্ণ রহিবে যাহা
আমি দিব গ'ড়ে কল্পনায়;
তোমার মূরতি খানি, তোমার হৃদয় খানি!
মহাশূন্য পূ'রে যা'বে তা'য়!
—এ ব্রহ্মাণ্ড ঠেকিবে মাথায়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

চাক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের এখানে তিন জাতির কুলি আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গজ (মুসলমান) বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী কুলিদের বৃত্তান্ত এতক্ষণ বলিলাম। পশ্চিমে কুলিরা কেমন এক রকম নির্জ্জীব মত। তাহারা কিছুমাত্র গোলযোগ করিত না, বাঙ্গালীরা যেমন সদা সর্ব্বদা সাহেবদের প্রতি অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করিত পশ্চিমেরা সে রূপ বলাবলি করিতেছে শুনি নাই। তবে আমাকে বরাবর তাহাদের কষ্ট জানাইত। আমাকে বলিত যে তাহাদের অতি ভয়ানক রূপ পরিশ্রম করিতে হয় অথচ তদুপযুক্ত বেতন পায় না; আমাদের বাগানে সকল কুলির অপেক্ষা পশ্চিমে কুলির ভাগ অধিক ছিল। পূর্ব্ব বাঙ্গলার কুলীর সঙ্গে আমাদের প্রায় কোন সংশ্রব ছিল না, তাহারা সমস্ত দিন জঙ্গলে বেত কাটিত ও আবশ্যক হইলে মজুরির কাজ করিত। ইহাদের (সমস্ত কুলিদের) সন্তান সন্ততিরা বাগানের ছোটখাট কাজ সকল করিত, এ ছাড়া ইহাদের স্ত্রী কন্যাগণ পাতাতোলা গাছ কাটা ইত্যাদি অল্প পরিশ্রমের কাজ করে। প্রত্যেক জাতির কুলির সহিত সেই জাতির এক এক জন সর্দ্দার থাকে। তাহারা তাহাদিগকে সমস্ত দিন পরিশ্রম করায়। তাহাদিগের উপর সাহেব হুকুম দিয়া যান—এই এই প্রকারে কাজ করাইবে তাহার ত্রুটি হইলে তাহাদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে, সর্দ্দারেরা কুলিদের প্রতি সদয় ভাবে ব্যবহার করিতেছে—যেমন তাহারা পরিশ্রান্ত হইলে পরে বসিতে দেয়, তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জল খাইবার ছুটী দেয়। সেই জন্য অনেক সময় সাহেবদের নিকট তাহারা বিলক্ষণ গালাগালি খায়। আমাকে এক জন কুলির সর্দ্দার বলিয়াছিল যে আবশ্যক হইলে স্ত্রী কুলিরা কোদালও পাড়িয়া থাকে। তাহা যদি হয় ত সে অতি ভয়ানক ব্যাপার। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে সে দৃশ্য দেখিতে হয় নাই। মেয়েদের সাহেবরা মারধোর কিছু করিতেন না, তবে হাজরীবন্ধ এ সকল কুলিরই হইত। সাহেবরা মেয়ে কুলিদের খুব আদর দিতেন, সাহেবেরা যখন কোন মেয়ে কুলিকে কাজের জন্য ধমকাইতেন তাহারা প্রায় হাসিয়া উড়াইয়া দিত। আমি যখন দিনকতক নূতন গিয়াছিলাম, আমি এক দিন গ্রহদোষে মেয়ে কুলি মহলে গিয়াছিলাম। আমি একটা কাজ দেখিয়া অপরাধের মধ্যে বলিয়াছিলাম যে এ কাজটা ভাল হয় নাই, অমনি সকলে বলিয়া উঠিল যে "তুইত সব জানিস্" "তুই সে দিন

এসেছিস্"। এই বলিয়াই যে চুপ্ করিল তা নহে। চারিদিক হইতে মাটির ঢেলা অ সিয়া আমার উপর পড়িতে লাগিল, আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। মেয়ে কুলিরা আমাকে আদবে আমলই দিত না। চুপ্ চাপ্ করিয়া থাকিতাম বলিয়া সকলেই আমাকে ঠাট্টা তামাসা করিত। পূর্ব্বে জানিতাম বোবার শত্রু নাই এখানে আসিয়া শিখিলাম বোবার শত্রুই অধিক। আমাকে একবার কতকগুলি কুলি বলিয়াছিল যে একটী সাহেব মেয়ে কুলিকে মারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জবাব হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের যদি মারিয়াও ফেলে তথাপি কেহ খোঁজ নেন না। কুলিদের দুঃখের কথা ত বলিলাম, কিন্তু তাহাদিগের সুখের জন্য সাহেবরা কি কি আয়োজন করেন দেখা যাউক। কুলিদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তার জন্য খুব যত্ন করেন, যেমন পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের জন্য ডাক্তার আছে, এ ভিন্ন তাহাদের ধোপা ও নাপিতের পয়সা দিতে হয় না। কিন্তু দেখিতে গেলে এ গুলি তাঁহারা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য করেন কেন না তাহাদের শরীর ভাল থাকিলে তাহাদের আরও বেশী করিয়া খাটাইতে পারিবেন। কিন্তু নিস্বার্থ ভাবে তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়া কুলিদের সর্ব্বস্বান্ত হয়; আমি থাকিতে থাকিতে একবার কুলি লাইনে আগুন ধরিয়াছিল, সে দিন আমি একেলা মাত্র বাগানে ছিলাম। ম্যানেজার সাহেব ও অন্য অন্য সকলে রোজাকান্দি নামক স্থানে পোলো খেলিতে গিয়াছিলেন। আমি আমার বাঙ্গলায় সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বসিয়া আছি,এমন সময় একজন আসিয়া খপর দিল যে লাইনে আগুন ধরিয়াছে। আমি দৌড়িয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখি বেচারীদের ঘর বাড়ি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; তাহারা সকলেই তাহাদের দুঃখ-সঞ্চিত অর্থ বাহির করিয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত, আমি দেখিলাম ধূ ধূ করিয়া চাল জ্বলিতেছে তথাপি তাহারা বাড়ির ভিতর জিনিস পত্র সরাইবার জন্য প্রবেশ করিতেছে, কেহ কতক কতক বাহির করিতে পারিয়াছে কাহারও সর্ব্বস্ব পুড়িয়া যাইতেছে, অনেকেই মস্তকে হাত দিয়া রোদন করিতে বসিয়া গিয়াছে। সে দেখিলে একেবারে মন যে কি পর্য্যন্ত দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে বলা যায় না, আমি যথাসাধ্য জল ঢালিতে লাগিলাম ও আগুন নিবাইবার জন্য জল আনিতে সকলকে আদেশ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। অবশেষে ঘরের চাল খুলিয়া দিতে বলিলাম; এরূপ করিয়া একটি মাত্র ঘর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। যখন এই রূপ অগ্নিকাণ্ড হইতেছে তখন একটি লেডি দাঁড়াইয়া আমোদ দেখিতেছিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না, তাতে আমোদকর কি ব্যাপার ছিল। আমি তাঁর নিকটে যাইতে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন বোধ করি আগুন নিভিল। আমি বলিলাম আমারও বিশ্বাস যে আর আগুন জ্বলিবে না। তৎপরে সাহেবরা খেলা হইতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন। কুলিদের সর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে তাহার জন্য কেহ ত দুঃখিত হইলেন না। তাঁহারা চৌকিদারকে আগুন লাগার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "যে এক ব্যক্তি রন্ধন করিতে করিতে উঠিয়া গিয়াছিল, চুলা হইতে আগুন লাগে। তাই শুনিয়া একটি সাহেব বলিলেন Three hundred rupees lost for a cooly dinner. একবার ভাবিলেন না যে তাহাদের কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। সেই দিবস হইতে যত দিন পর্য্যন্ত না সাহেবরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঘর তৈয়ারি করাইয়া দেন তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা বাহিরে হিমে পড়িয়া থাকিবে।

এবার আমরা সকলে কি রকম করিয়া কাটাইতাম লিখি। প্রাতঃকাল হইতে বিকাল ছয়টা পর্য্যন্ত সকলে বাগানের কাজ কর্ম্ম করিতে ব্যস্ত থাকেন, তৎপরে আমোদ প্রমোদ করা যাইত। আমাদের সকলকেই খুব প্রাতে উঠিতে হইত, উঠিয়া স্নান করিতে হইত, কেহ কেহ প্রাতে উঠিয়া কুলি বিলি করিয়া অর্থাৎ, যত কুলি যে স্থানে পাঠান আবশ্যক তাহা পাঠাইয়া স্নান করিতেন, তৎপরে তাঁহারা চা রুটী প্রভৃতি খাইয়া বাগান দারকে যাইবার উদ্যোগ করেন। আমার অত সকালে আদবে ক্ষুধা হইত না, ভবিষ্যৎ ক্ষুধাটাকে রাশ মানাইবার জন্য যা হোক কিছু খাইতাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না; আমার যে সময়ে খাওয়া অভ্যাস ছিল সে সময় আসিলেই অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইত; আমি তাহাতে কুলিদের দুঃখ আরও অনুভব করিতে পারিতাম। তার পর সমস্ত বাগানটা প্রদক্ষিণ করিয়া কুলিরা ঠিক মত কাজ করিতেছে কি না দেখিতে হইত। প্রায় বারটা বাজিত, সেই সময়ে ক্ষুধা উদরের মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিতেন তখন আর অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পাইত না, বাড়ি কখন পৌঁছিব এই ভাবনাতে মন ভরপূর থাকিত। বাটীমুখা হইলেই আমার ঘোড়া অতি বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিত, সে তার মনিবের কষ্ট বিলক্ষণ বুঝিত। যখন বাটী যাইবার সময় হইত সে আমার পাজামার কাপড় কামড়াইয়া ধরিয়া টানিত, দুই তিন বার টানিয়া ছিঁড়িয়াও দিয়াছিল। আমি প্রথম প্রথম তাহার কি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতাম না। শেষে দেখিলাম যে বাটীর দিকে যাইলেই সে ক্ষান্ত হয়। তখন হইতে আমার ঘোড়া একবার ঘাড় বাঁকাইবার উদ্যোগ করিলেই বাটীমুখা হইতাম, এই জন্য কাজ বাকী থাকাতে ও আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকবার বাড়ী আসিতে হইয়াছিল। তৎপরে বাড়ী আসিয়া আমি মধ্যাহ্নে ভোজন করিয়া এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া আবার বাহির হইতাম। প্রাতে যে যে কাজ করিতে বলিয়া আসিয়াছি সেই সেই কাজ করিয়াছে কি না দেখিতে যাইতাম। অন্যান্য সাহেবরা প্রায় তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া বাহির হইতেন তবুও আমাকে বলিতেন যে, দেখ, তুমি যদি সমস্ত দিন কুলিদের সঙ্গে সঙ্গে থাক তাহলে তারা আরও ভাল রকম কাজ করে।

সন্ন্যাসীর জীবন।

সন্ধ্যার সময় পূর্ণিয়া জেলায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ও আমার সঙ্গি বন্ধুর সহিত বলাবলি করিতে লাগিলাম কি করি, কোথায় যাই. হাতে মোট ছয়টা পয়সা আছে। পরে অনেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এখানে কোন ধর্ম্মশালা আছে কি না? তাহারা সকলেই কহিল এখানে ৩।৪টী ধর্ম্মশালা আছে। অবশেষে এক জন কহিল "আপনারা খাতাঞ্জির ধর্ম্মশালায় যান, স্বচ্ছন্দে থাকিতে ও খাইতে পাইবেন, এই রাস্তায় কিছুদূর গিয়াই একটা গলির মধ্যে বড় বাড়ি দেখিবেন সেই বাড়ি।' আমরা ঐ বাটীর দরজার নিকট যাইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে সদাব্রত পাওয়া যায় কি না, সে উত্তর করিল, যায়। ঐ সময় সন্ধ্যা আরতি সমাপ্ত হইল। আমরা বাটীর দরজা হইতে দেখি. সম্মুখের গৃহে বাতি জ্বলিতেছে, সিংহাসনোপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে। দেবালয়ের পরিচারকেরা কেহ বসিয়া কেহবা দাঁড়াইয়া আছে। বন্ধু আমার গা টিপিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "ভাল করিয়া প্রণাম করিবে, নচেৎ উহারা আমাদিগকে অভক্তি করিবে।" বন্ধুর কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমার জ্ঞান চৈতন্যে তো কখন কৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করি নাই, বিশেষ আমার কোন পুরুষেও শূদ্রের বাটীর দেবতাকে প্রণাম করেন নাই, সন্ন্যাসী হইয়া ভাল বিপদে পড়িয়াছি। মনে মনে এইরূপ বিরক্ত হইয়া বন্ধুর উপরোধ রক্ষার্থ গড় হইয়া প্রণাম করিলাম। এক ব্যক্তি হিন্দিতে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল আপনারা কোন্‌জাতি, ও কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি কহিলাম অনেক দূর হইতে আসিতেছি, আমরা ব্রহ্মচারী। সে কহিল কোন্ মঠের ব্রহ্মচারী? আমি তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। সে ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে কহিল, দুই জন বাঙ্গালি অতিথি আসিয়াছে, ইহাদিগকে থাকিবার ঘর ও সিধা সামগ্রী দেও, আর আমাদিগকে কহিল সদর দরজা দিয়া পূর্ব্বদিকের বাটীতে যাও। আমরা বাহির হইয়া থানায় গিয়া পড়িলাম, একজন কনেষ্টবল্ ধর্ম্মশালার রাস্তা দেখাইয়া দিল, আমরা উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিলাম। অন্য দ্বার দিয়া ঐ বাটীর চাকর প্রদীপ লইয়া আসিয়া, আমাদিগকে একটী ঘরে একখানি চটাই বিছাইয়া দিয়া ক্রমে সিধা সামগ্রী আনিয়া দিল। বন্ধু সিধা দেখিয়া আমাকে কহিলেন, চাউল তো মোটা, ইহার মধ্যে দুই একটা ধানও আছে, ডাউল তো কলাইয়ের তাও আবার আকাঁড়া,

ঘৃত তো একটুকু তাও আবার পচা, তরকারি তো কিছুই দেয় নাই, শুধু নুণ মরিচ দিয়া কি ভাত খাওয়া যায়। রাঁন্ধিতে হইলে ইন্দারা হইতে জল উঠাইতে হইবে, ভাত রাঁন্ধিয়া কড়াই মাজিতে হইবে, আর একাষ্ঠেও ডাল্ ভাত হবে না। এই সকল কথা শুনিয়া আমি কহিলাম আমি কিছু জানিনা যাহা তোমার ভাল বোধ হয় তাই কর। তাহাতে তিনি কহিলেন এ ধর্ম্মশালা ভাল নয়; কল্য ভাল দেখিয়া একটা ধর্ম্মশালায় যাইব, সেখানে ভাল করিয়া খাইতে পাওয়া যায়। তাহাতে আমি কহিলাম, তুমি হইলে সন্ন্যাসী, এখনো তোমার ইচ্ছা ভাল খাবে, ও ভাল পরিবে, ও পরের নিন্দা করিবে! তুমি আমাদের দেশের যেমন লালাবাবুর, বর্দ্ধমানের মহারাজার ও অন্যান্য বড় লোকেদের অতিথিশালা দেখিয়াছ সে রকম প্রত্যহ কোথায় পাবে? ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে কহিলেন, রাগ করিও না, ভাল অতিথি শালা পাওয়া যাবে, আমি জানি, ক্রমে তোমাকে দেখাব, সে যাহা হউক একটু আগুণ কর। আমি তাহাই করিলাম। পরে দুই জনে বাজার হইতে এক আনার জল খাবার আনিয়া উহা খাইয়া রাত্রিতে বিশ্রাম করিলাম, প্রত্যুষে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বন্ধুর বাক্য অনুসারে গত রোজের সিধা বাঁধিয়া লইয়া বহির্গত হইলাম। বাজারের মধ্যে একটী বাঙ্গালির ঔষধের দোকান দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিলাম। তিনি কহিলেন ইতিপূর্ব্বে আমি তিন বৎসর ব্রহ্মচারীর বেশে, কাশী, এলাহাবাদ বৃন্দাবন হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়াছি। পরে তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন? তাহাতে আমি কহিলাম এখনো আমরা মন্ত্র গ্রহণ করি নাই, ভাল গুরু মিলিলেই মন্ত্র গ্রহণ করিব, ভাট পাড়ার ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গুরুব্যবসায়ীদিগের নিকট অর্থ শূন্য কং, নৃং মন্ত্র শিখিয়া কি পরমার্থের কাজ হইবে। তাহাতে তিনি কহিলেন সৎগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে প্রথমত চিত্ত শুদ্ধি ও ভবিষ্যতে সুফল হইতে পারে, যখন আপনারা সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া বহির্গত হইয়াছেন, তখন ঈশ্বর অবশ্যই সৎগুরু মিলাইয়া দিবেন, কিন্তু আপনাদের উচিত বেদ ও বেদান্ত শিক্ষা করা। আমি কহিলাম কোথায় শিখিব? তিনি কহিলেন কাশীতে, কিম্বা প্রয়াগে, কি হরিদ্বারে, কি মারহাট্টাদেশে ইত্যাদি অনেক স্থানে শিখিতে পারিবেন। পরে আমি তাঁহাকে কহিলাম আমি গৃহস্থাবস্থায় অনেক দিন কাশীতে ছিলাম, সেখানকার পোনর আনা লোকের চরিত্র মন্দ, সেখানে বোধ হয় সৎ স্বভাবে থাকিতে পারিব না। তাহাতে তিনি কহিলেন হরিদ্বার সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান, সেখানে অনেক পরম হংস ও সন্ন্যাসী ও বৈরাগী প্রভৃতি সাধু মহাপুরুষ আছেন, সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে ও পড়িতে পারিবেন। শেষে ২।৩ টী সাধুর আশ্চর্য্য গুণের প্রশংসা করিয়া, তিনি কহিলেন আমার গুরু

পরম হংস তিনি এরূপ শুদ্ধ সত্ত্ব যে রাস্তা দিয়া চলেন না, তিনি ফল খান ও হিন্দুর ঘরেপোষা গাভির দুগ্ধ খান, গ্রামের ভিতর যান না, ও মৃত্তিকাতে শয়ন করেন না, কারণ পাছে, সেই মৃত্তিকা কোন কালে মল মূত্রে দূষিত থাকে, সেই জন্য তিনি গাছের উপর শয়ন করেন, ও তিনি গাছে গাছেই বেড়ান। এই কথাটি শুনিয়া আমার কিছু হাঁসি আসিল, তিনি বুঝিতে না পারেন এইরূপে হাস্য সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে কহিলাম আপনি কেন গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আসিয়াছেন? তাহাতে তিনি কহিলেন ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করা, তাহাও সকল দিন পূর্ণ হয় না, বিশেষ বস্ত্রাদিও মেলে না, তজ্জন্য কৌপিন পরিতে হয়, ব্যাম হইলে কেহ সেবাশুশ্রূষা করে না, এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ সহ্য করিতে হয়, উহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে পারক না হইয়া পুনরায় সংসারে লিপ্ত হইয়াছি। এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি কহিলেন কাল হইতে জল খাইয়া আছেন আপনারা পাক করিয়া আহার করুণ। আমি বৈদ্যজাতি আমার নিকট ব্রাহ্মণ নাই, যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার এখানে পাক করিয়া খাইতে পারেন, না হয় আমাদের এখানে এক কালী বাড়ি আছে তথায় চলুন, স্বচ্ছন্দে প্রস্তুত অন্ন খাইতে পারিবেন, আর আমরা এখানে যে কয়েক জন বাঙ্গালি আছি সর্ব্বদাই কালী বাড়ি গিয়া থাকি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কালী বাড়ী কত দূর। তিনি কহিলেন অতি নিকটে, নদীর তীরে, রাস্তার বাম দিকে। উহা শুনিয়া বন্ধুকে কহিলাম তবে সেখানেই যাই চল। তিনিও কহিলেন তবে চল। উভয়ে তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া কালী বাড়ী আসিলাম। কালীর দালানের দক্ষিণ নদীর তীরে মহাদেবের একটী মন্দির, পশ্চিমে সদর রাস্তা, পূর্ব্বদিকে ফুল বাগিচা, বাড়ীটি বেশ পরিস্কার, ইহাতে হৃষ্ট হইয়া কালীদেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম। পরে পূজারি ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হইল, তিনি কহিলেন আপনারা পাক করিয়া খাইবেন না মহামায়ার প্রসাদ খাইবেন? তাহাতে আমি কহিলাম মৎস্য মাংস খাইব না, তিনি কহিলেন ভগবতীর প্রসাদে দোষ নাই। আমরা তাহাই বিশ্বাস করিলাম। পরে তিনি কহিলেন তৈল মাখিয়া আপনারা স্নান করুণ, আমি কহিলাম আমরা তৈল মাখা ছাড়িয়া দিয়াছি। তিনি কহিলেন একেবারে এত দূর কঠিন ব্রত অবলম্বন করা ভাল নয়। লোক দেখানের জন্য একটা চাই, যেখানে যেমন সেখানে তেমনি করাই উচিত। কথাটা শুনিয়া মনে ভাবিলাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজেদের মতই এই উপদেশ। ইহারা ঘরে সিদ্ধ চাউল খান, আর লোকের বাড়ি গেলেই আতপ চাউল ছাড়া খান না, উপদেশটাও সেইরূপ দিলেন। যাহা হউক এঁর সঙ্গে আর তর্ক ক'রে কি হবে এই বলিয়া তৈল মাখিয়া স্নান করিলাম, ও ভক্তি সহকারে শিব পূজাদি করিয়া জল খাইলাম, পরে আহারাদির পর অনেকের উপরোধে

তাস ও সতরঞ্চ খেলা করিলাম। সংধ্যার পর দুই চারিটি সংগীত হইয়া অনেক রূপ গল্প আরম্ভ হইল। এক জন কহিলেন চম্পানগরের মহারাজা ও তাঁহার পুত্র উভয়ে মোকদ্দমা করিতেছেন, দুই পক্ষের বেরিষ্টার আসিয়াছে অনেক টাকা খরচ হইতেছে,—এখন কলিকাল এই জন্যই পিতা পুত্রে মোকদ্দমা হইতেছে। কেহ বা কহিলেন আমি অনেক কালী সিদ্ধ ও পিশাচ সিদ্ধকে দেখিয়াছি। কেহ বা কহিলেন আমি এক সিদ্ধকে দেখিয়াছি মদ্যকে শোধন করিয়া দুগ্ধ করিলেন, এইরূপ অনেক গল্পের পর আহারান্তে নিদ্রা গেলাম। প্রভাতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া উভয়ে সহর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম, শেষে অর্দ্ধ আনার জল খাইয়া কালী বাড়ী আসিয়া পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় যাপন করিলাম ও দর্ভাঙ্গা যাইবার রাস্তা লিখিয়া লইলাম। পর দিবস প্রত্যুষে মুখ হাত ধুইয়া ওখান হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দূর আসিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী পার হওয়া আবশ্যক হইল, খেয়া ওয়ালা পয়সা চাহিল; পয়সা না থাকায় তাহাকে দিতে পারিলাম না সেও আর কিছু বলিল না। ঐ নদীতে স্নান করিয়া একটী শিবালয়ে যাইলাম, সেখানে কোন খাদ্য না পাওয়ায় আমার নিকট যে চাল্ ডাল্ ছিল তাহা শিবালয়ের সম্মুখস্থ মুদি দোকানে দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে চিঁড়াগুড় লইয়া জল খাইলাম। ওখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, ও আর একটী বিল অতি কষ্টে পার হইয়া বেলা চারিটার সময় চাম্পানগরের রাজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজ বাটীর দৃশ্য কিছুই দেখিলাম না। উক্ত স্থানে গিয়া শুনিলাম অনেক দিন হইতে রাজার সহিত রাজপুত্রের মোকদ্দমা হইতেছে। এখানে যত অতিথি আসেন রাজার ঘড়ি-ঘরে প্রত্যেককে এক আনা করিয়া পয়সা দেওয়া হয় আমরা তাহা না পাইয়া রাজার মুন্সীর সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে কহিলাম আমরা সমস্ত দিন আহার করি নাই, আপনি আমাদের কোন জিনিস লইয়া দুই জনার খাবার দেন। তিনি কহিলেন আমার এখানে পাক করিয়া খাওয়া বিশেষ অসুবিধা হইবে, আপনারা বাজারে গিয়া থাকুন এই বলিয়া আমাদিগকে চারি আনা পয়সা দান করিলেন। আমরা বাজারে আসিয়া সাড়ে তিন আনা দিয়া ফলাহার করিয়া মুদি দোকানেই বিছানা বিছাইয়া নবাগত মুগা বিক্রেতা মহাজনদিগের নিকট সেতার বাদ্য ও ২।৪টী গান শুনিয়া নানারূপ কথা বার্ত্তার পর রাত্রে বিশ্রাম করিয়া প্রভাতে মুদির নিকট দুই পয়সার জল খাবার লইয়া ওখান হইতে বাহির হইলাম। পথিমধ্যে স্নান ও জল খাইয়া বেলা তিন প্রহরের সময় একটী ক্ষুদ্রবন্দরে বাঙ্গালীর গোলাতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমাদের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে তৎক্ষণাৎ এক পোয়া জিলাপী আনাইয়া জল খাইতে দিলেন, পরে ব্রাহ্মণ পাক করিয়া আমাদিগকে উত্তম রূপ খাওয়াইল। পরে তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ের নানা রূপ কথা

বার্ত্তা ও তাস পাশা ইত্যাদি খেলা করিয়া পরম সুখে দুই দিবস থাকিয়া তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে হাত মুখ ধুইয়া ওখান হইতে বহির্গত হইলাম। কিছু দূর গিয়া একটী গ্রামে হরিদাস ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট খাদ্য চাওয়ায় সে যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া চিড়া আনাইয়া দিল, কিন্তু ও সকল স্থানের চিড়া এত জঘন্য যে দেখিতে চাউলের মত অথচ অর্দ্ধেক ধান। তাহাই একরূপ বাছিয়া জল খাইলাম, ও তাহাদের সঙ্গে নানা রূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া সায়াহ্নকালে পাক করিয়া আহারান্তে নিদ্রা যাইলাম। প্রভাতে ওখান হইতে বহির্গত হইয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কোন খাদ্য না পাওয়ায় অবশেষে একটী লোকের নিকট এক মুঠা চাউল লইয়া দুই জনে জল খাইয়া চলিতে চলিতে বেলা তিন প্রহরের সময় কুশী নদীর ধর্ম্মঘাটে উপস্থিত হইলাম। শীতকাল তথাচ নদীর খরতর স্রোত দেখিলাম। নদী পার হইয়া কিছু দূর আসিয়া দেখিলাম এক শুষ্ক নদীর তীরে, একটী ক্ষুদ্র কুটীরে ৩জন লোক বসিয়া আছে তাহারা আমাদিগকে ডাকিয়া ঐ শুষ্ক নদী পারের পয়সা চাহিল। তাহাতে আমি নম্রভাবে ঘাটোয়ালকে কহিলাম আমরা দুই জন ব্রহ্মচারী আমাদের হাতে পয়সা নাই। ইহাতে সে ব্যক্তি আমাদিগকে কহিল দেখ সকলের নিকটই আমি দুই পয়সা করিয়া লইতেছি, আমার এ সরকারী ডাকের ঘাট, যদি পয়সা না দেও তবে তোমাদের কাপড় কাড়িয়া লইব। এই কথা শুনিয়া মনে ভাবিলাম ঘাটোয়ালতো ইতর মুসলমান, নম্র কথায় কোন ফল ফলিবে না। এইরূপ ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, আমরা তোর ঘাটে পার হই নাই, তুই সরকার হইতে কি হুকুমনামা পাইয়াছিস এখনি তাহা বাহির কর, লোকে শুষ্ক জমি দিয়া আসিয়া তোকে পয়সা দেবে কেন? বেটা বজ্জাত ডাকাৎ তুই এখনও জানিতে পারিস নাই যে আমরা বাঙ্গালি, তোকে এখনি থানায় ধরাইয়া দিয়া তোর পয়সা খাওয়া ঘুচাইয়া দিব, ও তোর হাতে পায়ে বেড়ি লাগাইয়া জেলখানায় দিব। এইরূপ নানাবিধ তিরস্কার করায় ঘাটোয়াল অত্যন্ত নরম হইয়া আমাদিগকে শেলাম করিল, ও বসাইয়া তমাক খাওয়াইল। ওখান হইতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় প্রতাপগঞ্জে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের গোলাতে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাদের পরিচয় লইয়া অত্যন্ত যত্ন করিলেন ও নানা কথা বার্ত্তার পর আহারান্তে নিদ্রা যাইলাম। প্রভাতে হাত মুখ ধোয়ার পর তাঁহার পুত্র আমাদিগকে লইয়া ডাক্তারখানায় বেড়াইতে গেলেন, নানা কথার ছলে আমাদের বাড়ি ও পিতার নাম পর্য্যন্ত শুনিয়া লইলেন। ওখান হইতে আসিয়া তিনি আমাদিগকে অমৃতবাজার পত্রিকা দেখাইলেন তাহাতে ৫।৬টী বাঙ্গালী যুবক নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন, এরূপ বিজ্ঞাপন আছে, তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে পারিলে নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার পাইবেন, এরূপ লিখিত আছে। শেষোক্ত বিজ্ঞাপনটিতে উক্ত হইয়াছে, একটী ব্রাহ্মণ ও একটী কায়স্থ উভয়ে একত্রে বহির্গত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত আমাদের নাম ধামের অমিল কিন্তু অবয়ব ও জাতি ইত্যাদি সমস্তই মিল আছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন আপনারা সত্য পরিচয় দিতেছেন তো, আমি কহিলাম সত্যই দিতেছি। তাহাতে তিনি কহিলেন আমার সন্দেহ হইতেছে, বোধ হয় আপনারা নাম ধাম গোপন করিতেছেন, আমি তাঁহাকে নানা বাক্যে বুঝাইয়া কহিলাম মিথ্যা কহিতেছি না। পরে তাঁহার পিতার সঙ্গে কথা আরম্ভ হইল, তিনি আমাদিগকে কহিলেন জুতা পরিত্যাগ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই, দেখুন আপনাদের পা ফাটিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে বন্ধু কহিলেন চিনের বাড়ির জুতা পায়ে দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করা ভাল দেখায় না বলিয়াই জুতা ছাড়িয়া দিয়াছি, তিনি কহিলেন চট পায়ে দিলেও তো হইত, আমি কহিলাম জুতা না পায়ে দেওয়াতে তত দুঃখ বোধ হইতেছে না। তিনি কহিলেন আমার এখানে সময় সময় দুই একটী সাধু আসেন তাঁহারা ২।৪ দিন বিশ্রাম করেন, ও যাইবার সময় আমি কিছু বিদায় দিয়া থাকি, একবার একটী ব্রহ্মচারী আসিয়া ছিলেন তিনি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন ও তাঁহার নিকট অনেক শালগ্রাম ও দেবতার মূর্ত্তি ছিল। আর একজন আসিয়াছিলেন তিনি সন্ন্যাসী তিনি পারাভস্ম ও হরিতাল ভস্ম ইত্যাদি

করিতে পারিতেন। এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তার পর, আহারান্তে বন্ধুকে কহিলাম এখান হইতে গমন করা যাক। তিনি কহিলেন ২। ৪ দিন এখানে থাকা যাক। আমি উহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি কহিলেন তবে কিছু পয়সা ভিক্ষা করিয়া লও, তাহাও আমি স্বীকার না করায় বন্ধু আমার উপর বিরক্ত হইলেন, শেষে উভয়ে ওখান হইতে বহির্গত হইলাম! সন্ধ্যার সময় একটী ক্ষুদ্র চটিতে উপস্থিত হইলাম, নিকটে পয়সা না থাকায় বন্ধু মুদির নিকট ছাতাটি বিক্রয় করিলেন। ঐ পয়সা দিয়া দুই জনে ফলাহার করিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিলাম। প্রত্যূষে ওখান হইতে বহির্গত হইয়া বেলা তিন প্রহরের সময় আর একটী বড় চটিতে উপস্থিত হইলাম, ও তথায় শুনিলাম এক জন বাঙ্গালি ডাক্তার ওখানে আছেন তিনি ব্রাহ্ম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের ঘটি কম্বল একটী মুদি দোকানে রাখিয়া ডাক্তার খানায় যাইলাম। দেখি ডাক্তার বাবু ও তাঁহার কম্পাউণ্ডর উভয়েই পুস্তক পড়িতেছেন। আমরা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র কম্পাউণ্ডর বাবুটী আমাদিগকে বাঙ্গালি বুঝিতে না পারিয়া হিন্দিতে কহিলেন ক্যা মাংতা হ্যায় জী। আমি কহিলাম আমরা বাঙ্গালী। তাহাতে ডাক্তার বাবু দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সম্মানের সহিত বসাইলেন, পরে উভয়ের পরিচয় আদি হইল। আমাদের আহার হয় নাই শুনিয়া তিনি প্রথমত জলখাবার আয়োজন পরে পাকের আয়োজন

করাইয়া দিলেন, ক্রমে পাক ও আহারাদির পর নানা কথাবার্ত্তা কহিয়া নিদ্রা যাইলাম। পরদিবস দুই একটী কথার পর তিনি কহিলেন আপনাদের এখনো সম্পূর্ণ লজ্জা আছে। আপনারা যখন যেখানে যাইবেন সেই খানেই ঘটি কম্বল লইয়া যাইবেন, সন্ন্যাসী হইলে মান অপমান সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি আমাদিগকে আরো কহিলেন, যখন আপনারা গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তখন আপনাদের সংস্কৃত শিক্ষা করা উচিত। আমি কহিলাম কোথায় শিখিব? তিনি কহিলেন দর্ভাঙ্গার মহারাজা রোহিকা গ্রামেতে একটা বেদ শিক্ষার ইস্কুল করিয়াছেন, আমি এইরূপ শুনিয়াছি। সেখানে না হয়, দুর্ভাঙ্গায়, না হয় জনক পুর ইত্যাদি অনেক স্থানে শিখিতে পারিবেন। আর আপনারা মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিবেন, আপনাদের খরচ পত্র আমার যথা-সাধ্য সাহায্য করিব। এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ইনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী, দেখি দিবসে তিন বার স্নান ও তিনবার ঈশ্বর উপাসনা করেন, মৎস্য মাংস খান না, বিশেষ দয়া আছে, কাহাকেও অশ্রদ্ধা করেন না, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এমন লোকতো আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, ঈশ্বর এমন লোকের মঙ্গল করুণ। পরে তাঁহাকে কহিলাম আপনি কখন ভাল সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন কি না? তাহাতে তিনি কহিলেন জনকপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক দেখিয়াছি ও 'আমার নিকট এক সময় ৬ জন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন তাঁহারা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা খুব ভাল লোক।" রাত্রে বিশ্রাম করিয়া প্রত্যূষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

ক্রমশঃ।

উদাসীন।

কবিতা-সাধনা।

(১)

কবিতারে, কোথায় থাকিস তুই বল!
সারা দিন সারা রাতি
তোর ও মুখের জ্যোতি
খুঁজে খুঁজে হারা মোর
আঁধার বিভ্রান্ত হৃদি!

তোর সাধনার তরে
কত আয়োজন করে,
কতই যতনে হেরে
ভূধর কান্তার নদী!
উধাও হইয়া ধায়
আকাশের কাঁল গায়,

আঁধার সীমান্তে তার
সন্ধান করে গো কাঁদি।
আকুল হইয়া পুনঃ,
বিভ্রান্ত তারকা হেন,
ধায় গো ধরার দিকে—
তবু তুমি তায় বাদী!
কল্পনা কোমল বালা
দেখিতে না পারি জ্বালা
দূতী হ'য়ে চারি দিকে
মিলাবার আশে ধায়;

আনে ফুল তরু লতা
পাখীর কানন কথা,
সাঁঝের কোমল কায়া,
উদাস নিশীথ বায়।

শিশুর কোমল হাস,
প্রথম প্রেমের শ্বাস,
প্রথম স্বপন, মরি,
কবির কোমল প্রাণে;

শরতের অশ্রু জল,
বসন্তের কোলাহল,
আকাশের স্থির দৃষ্টি
শ্যামল ধরার পানে।
কল্পনা দুরন্ত মেয়ে
রড়ে পুনঃ যায় ধেয়ে
প্রদীপ্ত দামিনীলতা
বাঁধিয়া চরণ তলে,

ঝটিকার হাত ধ'রে
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ঘোরে,
উন্মাদ আবর্ত্ত রাশি
জাগায় সাগর জলে।

মহীধরে কাঁপাইয়া,
চন্দ্র সূর্য্যে নিভাইয়া,
বাজায় প্রলয় ভেরী
তরস্ত ধরার কাণে!
তবুও তোমার, হায়!
নাহিক সন্ধান পায়,
অভাব নয়নে তার,
দারুণ শূন্যতা প্রাণে।

কি ঘোর আঁধার, মরি,
রহে বিশ্ব গ্রাস করি,
কাঙালিনী কলপনা
ফিরে যবে আসে ঘরে!

পৃথিবী ভাসিয়া যায়,
চন্দ্র সূর্য্য নিবে যায়,
রুদ্ধ শ্বাস হয় বায়ু
হৃদয় আছাড়ি পড়ে!

এ ঘোর প্রলয় যবে
বিরাট আসনে তবে
বসে গো হৃদয় মোর
সাধিতে কবিতে তোরে।

যেমনে তেমনে তোরে
আনিব এ হৃদি পরে—
অন্তরে জাগাব আমি
বাহিরে না পাই যারে।

অহো কি অসীম, হায়!
মনোরাজ্য চলে যায়
দূর—দূর—অতি দূর্
আকাশ ফেলিয়া পাছে।
কি মহান্ স্বর্গ হাঁসে,
কি ঘোর পাতাল গ্রাসে,

উনমত্ত হৃদয়ের
অনন্ত বিস্তৃতি মাঝে!
তথায়ো তোমার হায়
দেখা নাহি পা(ও)য়া যায়,
একটি কিরণ ওগো
পশেনা আঁধার প্রাণে।
বিশ্ব যে আমার নয়,
ডাকিলে না কথা কয়,
অজানা লোকের মত
চেয়ে থাকে মুখ পানে।
যদিও বা হাসে ব্যোম,
হাসে ধরা রবি সোম,
হাসির লহরী ধায়
দুলে দুলে দুলে নদী,
তীরে হাসে ধীরে লতা,
ধীরে ধীরে দোলে পাতা,
হেলে দুলে ফোটে ফুল,
ফোটে না যে শূন্য হৃদি;
দিবস রাজার বেশে
ধরার হৃদয়ে বসে,
দেখায় চাঁদিনী রাতি
নগন সুষমা,
তবুও যে হৃদি মাঝে
নাহি রাজে, নাহি রাজে
সে চির বসন্ত স্রোত
প্রাণের পূর্ণিমা।

(২)

কবিতারে, কেথায় থাকিস তুই বল!
তুইও কি তাহার মত,
দিবানিশি অবিরত
যাহার দুরন্ত প্রেমে
অস্থির কাতর প্রাণ?
চির জীবনের তরে
নিয়তিরে সাক্ষ্য করে
রূপের অশনি যার
দহিছে মরম স্থান!
প্রদীপ্ত আলসাময়,
আবেগের অশ্রুময়,
অরুণ নয়ন দুটি
অমৃত গরল;
ফুলমালা বিজড়িত,
শাণিত কৃপাণ মত,
কোপন সৌন্দর্য্যময়
অধর যুগল।
কবিতারে, কতই গরবী মোর হৃদয়ের রাণী!
ধরিলে গো দুটি করে
চাহে না বারেক ফিরে
নিজের গরবে মত্ত
কহে না একটি বাণী।
কাঙাল নয়ন হায়
তার পাছু পাছু ধায়
সে যেন গো চলে যায়
উনমুক্ত সৌদামিনী।
এক দৃষ্টে চক্ষু রাখি
যদি গো দাঁড়ায়ে থাকি,
রূপের জ্বলন্ত শিখা
তাহার নয়ন ধারে;
ভুরুক্ষেপে দৃষ্টি নাই
কেহ যেন কাছে নাই,
কি যেন ভাবিছে সে গো
কি এক মদিরা ভরে।

তপণ কিরণ ধার,
অক্ষত আসব ভার,
ধরিয়া হৃদয়ে গর্ব্বে
যথা থাকে কমলিনী;
তেমনি সে দর্প ভরে
বদন রাখিয়া করে
আনত আননে রহে
তোলে না শ্রবণে বাণী।
স্ফুরিত অধর মোর,
পদ্ম কাঁপে থর থর,
নয়ন আবেগ ভরা
জ্বলন্ত তারকা যেন;
সে বেশ বহিয়া আছে,
চারি দিকে খেলিতেছে
রূপের গরিমা তার
প্রদীপ্ত দামিনী হেন।
কবিতারে কেমনে বলিব তোরে বল!
মুখানি রাখিয়া সেই ভাবে,
ধীরে—ধীরে—অতি ধীরে যবে
একটি লহমা তরে
চাহে গো আমার পানে।
কি এক বিপ্লব হয়,
হৃদয়ে ঝটিকা বয়,
তরঙ্গিত হয় তনু
তড়িৎ তাড়না প্রাণে।
আলোক আঁধার হয়,
আঁধারে আলোক বয়,
স্থাবর লভে গো গতি
বিহ্বল নয়ন পাতে।
বিদ্যুৎ অনল ছটা,
কুসুম সুষমা ঘটা
ঝিলসে—ঝলসে সেই
তীব্রকান্ত দৃষ্টিপাতে।

(৩)

কবিতারে, নিষ্ঠুরা ভেবোনা
তুমি তারে!
যদিও সাধিলে পরে,
ধরিলে গো দুটি করে,
কহে না একটি বাণী
চাহে না কাতর জনে।
ধরার ঈশ্বরী সে যে—
রূপের প্রতিমা সে যে—
সে কেন চাহিবে বল
কাঙাল আমার পানে!
আমার সাধনা শত
যদিও গো কোন মত
পাবে না লভিতে তার
একটি মধুর হাসি,
একটি, একটি তার
নয়ন কিরণ ধার,
একটি বচন শুধু
"বড় ভাল বাসি";
তবুও নিষ্ঠুরা তারে
বলিতে নাহিক পারে
তার প্রেম বিগলিত
বিহ্বল হৃদয় মোর;
তাহার যে ভাল বাসা
মানে না আমার আশা,
হঠাৎ যামিনী আসে,
হঠাৎ হয় গো ভোর।
কর না সাধনা যত
রবে সে আপন মত

কিছুতেই টলিবে না
অটল হৃদয় তার।
কিন্তু যবে ইচ্ছা হবে
ভাল বেসে আকুলিবে,
প্রেমের অনলস্রোতে
ভাসাইয়া চারি ধার!

সে প্রেম অপূর্ব্ব কথা
কে বর্ণিতে পারে যথা
স্বরগে জনম তার
স্বরগে বিজয় গান!

অপ্সরী; মানবী নহে,
কখন অনলে দহে,
কখন দেয় গো ঢালি
অমৃত করিতে পান।

তাই বলি কবিতারে
দুরভাগা এ জনারে
তুমিও তাহার মত
হাসাও কাঁদাও কত!

তোমাও সাধিলে পরে
ধরিলে গো দুটি করে
দেখ না কাঙাল জনে
আপনাতে থাক রত!

কল্পনার হাত ধরি
ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া ঘুরি
তবুও সন্ধান তব
পায়না হৃদয় মোর;

রুধিয়া ইন্দ্রিয় দ্বার
তোমারেই করি সার
তোমারে পাবার আশে
ধ্যানে যদি হই ভোর,

তবু ধ্যান মগ্ন মনে
তবু হৃদি দরপণে
পশে না পশে না দেবি,
তোমার মোহিনী ছায়া।

তোমার মধুর হাসি
নয়নে জ্যোৎস্নারাশি
নিশীথে নিথর জলে
তারকিত নভঃকায়া।

আবার কখন মরি
এস গো হৃদয়োপরি
না বলিতে না ডাকিতে
ভাল বাস—ভাল বাসি।

মুখেতে মধুর গান,
নয়নে সরল প্রাণ,
অধরে হৃদয়-ভরা
উদাস মোহন হাসি।

সংসারের একধারে
আঁধার বিজন ঘরে
স্রোতোহীন হৃদি মোর
একেলা পড়িয়া আছে।

সাধনা প্রার্থনা নাই
উঠিছে অলস হাই,
নিদ্রা গেছে দূরে চলি
ভাবনা রাখিয়া কাছে।

ভগন গবাক্ষ পথে
হারাইয়া মনোরথে
নিরাশ হেমন্ত বায়ু
ফেলিছে কাতর শ্বাস;

হৃদি ভাঙা দু একটি
তারার মৃদুল দীপ্তি

পরাইছে শোকাকুলা
সন্ধ্যারে ধূসর বাস;
জানিনাক কি বুঝিয়ে
সোণার কাটিটি লয়ে
আঁধার মন্দিরে মোর
কর গো প্রবেশ তুমি!
কেন এত অনুরাগী,
পরশ' কিসের লাগি
মৃত কল্প দেহ আর
শিথিল হৃদয় ভূমি!
কর পরে কর ধর,
নয়নে নয়ন রাখ,
উদাস করিয়া কেন
চাহ গো আমার পানে!
কেন অই অশ্রু রাশি,
কেন গো তরল হাসি,
হৃদে কেন নব বল
স্বপন কেন গো প্রাণে!

তাই বলি কবিতারে,
দুরভাগা এ জনারে
তুমিও তাহার মত
হাসাও কাঁদাও কত!
তোমায়ও সাধিলে পরে
ধরিলে গো দুটি করে
দেখ না কাঙাল জনে
আপনাতে থাক রত!

(৪)

লেখা, যা' তুই তাহার কাছে।
যদিও সে গরবিণী,
ধরার ঈশ্বরী মানি,
তবু তুই একবার
ভালবাসা ভাবি তার,
হৃদে নিয়ে আধ আশা,
প্রাণে পূরে ভালবাসা,
কোন রব নাহি করি,
পাখিটির বেশ ধরি,
যা' তুই তাহার কাছে।
সাঙ্গ হলে খেলা দেলা
মলিন সাঁঝের বেলা
শিশুগুলি যথা যায়
ধূলি কাদা মাখি পায়
আপন আপন ঘরে;
পাখী যথা যায় নীড়ে
মুখে মৃদু কোলাহল
কার মুখে ফুল ফল—
যা' তুই তাহার কাছে।

তুলে নে কানন হ'তে সৌরভ আকুল
সাঁঝের শিশির-ধোয়া শুভ্র দুটি ফুল।
সেই দুটি হোক তোর যুগল নয়ন,
মাখাগে তাহাতে দুটি পথহারা তারার কিরণ
হরিণী হারালে শিশু করুণ নয়নে
চায় গো চৌদিকে যথা বিহ্বলিত মনে,
সে কাতর দৃষ্টি হোক তোর আঁখিপরে;
সাথী হারা পাখী যথা সকরুণ স্বরে
গায়গো শোকের গান শুষ্ক শাখী পরে
বল গে তাহারে তুমি সে উদাস স্বরে:—
তুমি যদি কহ বাণী
কবিতা জনমে প্রাণে—
কবিতা মাতে গো পুনঃ
তোমার প্রেমের গানে,
তোমার রূপের ধ্যানে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি স্বীয় পিতৃ পিতামহাদির গুণ সম্পন্ন ছিলেন, এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই শতানীক ৮২ বৎসর ২ মাস কাল রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপরই তাঁহার মৃত্যু হয়।

শতানীকের পর তৎপুত্র সহস্রানীক রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সহস্রানীক অতি তেজস্বী রাজা ছিলেন এ বিষয়ে তৎকালে কেহই তাঁহার প্রতিপক্ষ হইতে সাহস করেন নাই। সুতরাং তিনি নিরাপদে রাজ্য করিতেন এবং সর্ব্বদাই যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। সহস্রানীকের রাজ্য শাসন কাল ৮৮ বৎসর ১১ মাস নির্ণীত আছে।

এই সহস্রানীকের পুত্রের নাম 'অশ্বমেধজ"। পিতার উপরমে অশ্বমেধজ তৎ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ৮১ বৎসর ১১ মাস পর্য্যন্ত তাহাতে আরূঢ় ছিলেন। অনন্তর তিনি "অসীম কৃষ্ণ" নামক এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গ লাভ করেন।

এই অসীমকৃষ্ণও পিতার ন্যায় তেজস্বী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তিনি ৭৫ বৎসর ২ মাস পর্য্যন্ত প্রজা পালন করিয়া অবশেষে সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন।

অসীম কৃষ্ণের পুত্রের নাম 'নীচচক্র"। এই নীচচক্রের রাজ্য শাসন কাল ৭৬ বৎসর।

নীচচক্রের পুত্র "উপ্ত"। পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে উপ্ত রাজা হইলেন। ৭৮ বৎসর রাজ্য করিয়া তিনিও "চিত্ররথ' নামক পুত্র রাখিয়া মৃত হইলেন।

উপ্ত পুত্র চিত্ররথ সাতিশয় নীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেকানেক অরণ্যময় স্থানের অরণ্যতা দূর করিয়া প্রজা পত্তন করিয়াছিলেন এবং কৃষি কার্য্যের সমধিক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযশ সর্ব্বত্রই পরিঘোষিত হইত। রাজা চিত্ররথ ৮০ বৎসর একমাস রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন।

চিত্রের পুত্র "শুচিরথ"। এই শুচিরথ অতিধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁহার সমধিক আস্থা ছিল। ইহার রাজ্যকাল ৬৫ বৎসর।

শুচিরথের পুত্র "ধৃতিমান্"। ইহাঁর রাজত্ব কাল ৬৯ বৎসর এবং ৫ মাস।

ধৃতিমানের পুত্র "সুষেন"। সুষেন পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহা ৬৪ বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত পরিশাসিত করিয়াছিলেন।

সুষেনের পুত্র "সুনীথ"। এই সুনীথ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও সমধিক ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ইনি ৬২ বৎসর ১ মাস শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া অবশেষে বদরিক শ্রমে গিয়া তপোলগ্ন হইয়াছিলেন।

উক্ত সুনীথের পুত্র "নৃচক্ষু"। এই নৃচক্ষু যখন পিতৃ পরিত্যক্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন তখন যৌধিষ্ঠিরাব্দের ১১০২ বৎসর ৬ মাস অবসান হইয়াছে। ইনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজনহিতৈষী ও দয়াবান্ রাজা ছিলেন। ইহার রাজ্যকালে, যৌধিষ্ঠিরাব্দের ১১১৩ অব্দ ও ৬ মাস অতীত হইলে অর্থাৎ ১১ বৎসর রাজ্য করা হইলে এক সর্ব্বান্তকর ভীষণ জলপ্লাবন

উপস্থিত হইয়াছিল। এক মাস ১০ দিন অবিশ্রান্ত মুষলধারে বারিবর্ষণ ও তৎসঙ্গে পশ্চিম সমুদ্রের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীকে জল মগ্ন প্রায় করিয়াছিল। তাহাতে উত্তর পশ্চিম সমুদ্রের নিকটস্থ প্রায় সমস্ত দেশই রসাতলগামী হয়। এতদ্দেশেরও পর্ব্বতময় উচ্চ প্রদেশ ব্যতীত প্রায় সমস্ত দেশই জলমগ্ন হইয়াছিল। হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি বহুতর রাজধানী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মগধ, বারাণসী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ উৎসন্ন হয় নাই, এরূপ বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। এই সর্ব্বান্তকর ভীষণ উপদ্রবের সময় মহারাজা নৃচক্ষু কাশ্মীর দেশে গিয়া বাস করেন। তদ্দেশজাত যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাসদ হইয়াছিলেন তিনি তাহাদিগকে "পণ্ডিত" খ্যাতি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহাদের বংশধরেরা পণ্ডিত-আখ্যায় পরিচিত আছেন। (আধুনিক কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত-উপাধিধারা ব্রাহ্মণেরা সেই নৃচক্ষু দত্ত উপাধি অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন)। জলবিপ্লব অন্তরিত হইলে মহারাজা নৃচক্ষু পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠাপিত ইন্দ্রপ্রস্থের অনতি দূরে যমুনা নদীর তীরে এক অভিনব রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। সে স্থানটী এক্ষণে দিল্লী নামে বিখ্যাত। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ অরণ্যময় হইয়া রহিল, হস্তী রাজার হস্তিনা গঙ্গা গর্ভে লুক্কায়িত ছিল। হস্তিনার একাংশ এক্ষণে "কয়ফুবাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাদৃশ জলবিপ্লবের সময় মহাত্মা নৃচক্ষুর এক পুত্র জন্মে। জলবিপ্লবের সময় জন্ম হওয়ায় তিনি "বারি বিপ্লব" নামে বিখ্যাত হইলেন। কোন মতে ইহাঁর অন্যনাম "বৃষ্টিমান্"। ভাগবত মতে অসীম কৃষ্ণের "নেমিচক্র" নামে অন্য এক পুত্র ছিল তিনি "কৌশাম্বী পুরী" তে (কুসুমপুর পাটনা প্রদেশস্থ স্থান বিশেষ) গিয়া রাজধানী স্থাপনা করিয়াছিলেন। * ভাগবতের মতে পাণ্ডববংশের পৌর্ব্বাপর্য্য এইরূপ—

* এই জলপ্লাবনের কথাই বোধ হয় বাইবেল প্রভৃতি ম্লেচ্ছ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। তদ্গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির ১৬৪৬ বৎসর পরে জলপ্লাবন হয়। ইব্ ও আদমের নিম্নতন কয়েক পুরুষের পর অর্থাৎ তদীয় জন্মের ৭৭৩ বৎসরের পর জলপ্লাবন হয়। উক্ত সংখ্যাদ্বয় সমষ্টি করিলে ২৪২৯ বৎসর হয়। আদম সৃষ্টির ৭৭৩ বৎসর পরের জলপ্লাবন আর নৃচক্ষুর সময়ের জলপ্লাবন প্রায় তুল্যকালিক। তবে যে যৎকিঞ্চিৎ কালের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ এইরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, নোয়ার পর তদ্দেশে লোকের নূতন বাস হওয়ায় তাহার অনেক কাল পরে তদ্দেশের লোকেরা লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল বা কিঞ্চিৎ সভ্য হইয়াছিল। সুতরাং তখন তাহারা কিংবদন্তী অনুসারেই আনুমানিক সংখ্যা সংমিলন করিয়া উক্ত প্রকারে লিখিয়া গিয়াছিল। কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করায় তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কালাবধারণ করিতে পারে নাই। সেই জন্য তদ্গ্রন্থের লিখিত কাল সংখ্যা ভ্রমগ্রস্ত। নৃচক্ষুর সহিত নোয়ার যৎকিঞ্চিৎ কালের অনৈক্য আছে বটে পরন্তু জলপ্লাবনের মূল প্রস্তাবের অসত্যতা নাই। এই জলপ্লাবনে উত্তর পশ্চিমদেশ

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুনপৌত্র পরিক্ষিৎ। জনমেজয়। শতানীক। সহস্রানীক। অশ্বমেধজ। অসীমকৃষ্ণ। নেমিচক্র। উষ্ণ। চিত্ররথ। শুচিরথ। বৃষ্টিমান। সুসেন। সুনীথ। নৃচক্ষু। বারিবিপ্লব। পরিপ্লব। সুনয়। মেধাবী। নৃপঞ্জয়। দূর্ব্ব। তিমিঃ। বৃহদ্রথ। সুদাস। শতানীক। দুর্দমন। মহীনর। দণ্ডপাণি।১ নিমি। ক্ষেমক।২

এই সকল রাজগণের রাজত্ব কাল (যাহা পুরাতন হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে) সপ্রমাণ কি নিষ্প্রমাণ, জানি না। ভাগবতে লিখিত আছে যে, কলির ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত পাণ্ডববংশীয় উল্লিখিত রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এবং রাজা নেমিচক্র পৈতৃক স্থান ত্যাগ করিয়া কৌশল্যা নগরীতে গিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ হইতে নৃচক্ষু পর্য্যন্ত ১৪ জন রাজার রাজ্যকাল বলা হইল। অতপরঃ তৎপরবর্ত্তী রাজগণের কাল সংখ্যা ব্যক্ত করিয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

শ্রীকালিবর বেদান্তবাগীশ।

ফুলের মালা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল, শুভ্র শ্বেতগগণ উষার চরণ স্পর্শে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, লাজময়ী উষারাণী সরমে লুকাইয়া পড়িবেন ভয়ে, অতিধীরে, অতি সন্তর্পণে তরুণ তপন পূর্ব্বগগণে দেখা দিলেন। সূর্য্যকরস্পর্শে বৃষ্টি বিন্দু শোভিত অরণ্য হাসিয়া উঠিল। রামরায় শিবিরের একটি কক্ষে বসিয়া বাতায়ন মধ্য হইতে, প্রকৃতির নিস্তব্ধ প্রভাত সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। মৃদু মৃদু শীতল সমীর তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছিল, আরণ্য পক্ষীগণের মধুর সঙ্গীত তান তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতেছিল। রামরায় আর পূর্ব্ব রাত্রের রামরায় নহেন, তাঁহার আর সেই উত্তেজিত বীরভাব নাই, রামরায়ের মুখকান্তি এখন কোমল স্বপ্নময় ভাবে শোভিত। রামরায় পক্ষীগণের ললিত তান শুনিতে শুনিতে মনে মনে গাহিতেছিলেন

"সুখের স্বপনে ছিনু কে ভাঙ্গালে ঘুম ঘোর,
সে মধু মূরতি আহা কোথা মিশাইল তোর!
কোথায় পালালি বালা, ফুরালো সুখের খেলা,
ভাঙ্গিল সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিল হৃদয় মোর।
ফিরে পুনঃ স্বপ্ন ঘোরে, মোহের ছলনে,
ও রূপ দেখিতে পেলে কি চাহি ললনে!
তাতো হইবে না আর, যে স্বপন একবার,
ফুরায়েছে, তাকে হৃদে পাব আর কেমনে!
আবার পাব কি ফিরে, কল্পনার সে সখীরে?
মধুর ভাবের খেলা ফুরালো নিমেষে।
স্মৃতি সুখ বিন্দু আর নিরাশার অশ্রুধার,
রহিল সম্বল মাত্র স্বপনের শেষে।"

ক্রমে বেলা হইল, পাখীদিগের মধুর নিনাদ মন্দীভূত হইয়া আসিল, রামরায় ও কল্পনার উচ্চ শিখর হইতে ক্রমে মর্ত্ত্যে নামিয়া পড়িলেন। পার্শ্বে ভগিনী স্নেহলতা বসিয়া তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কার করিতেছিল—তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল—বলিলেন "স্নেহলতা তোমার পরিশ্রম বৃথা যাইবে না, এ সকল শীঘ্রই কাজে লাগিবে। শুনিয়াছ যুবরাজ সোমনাথ আমার মাথা লইতে আসিতেছেন?" স্নেহলতা আনত মস্তকেই বলিল "পরের মাথা লইতে আসিয়া আপনার মাথা খোয়াইয়া না যান" রামরায় কি ভাবিতেছিলেন অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "আচ্ছা আমিতো বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছি, আমিতো সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু যখন বাস্তবিক যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইব, যখন মহারাজের সঙ্গে চক্ষে চক্ষে দেখা হইবে তখন কি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলিতে পারিব? কখনই না, ভাবিতে গেলেও সমস্ত বল আমাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহাই যদি না পারি তবে সৈন্য সজ্জা প্রভৃতি এ সকল বৃথা আড়ম্বর কেন?" স্নেহলতার ভ্রমর-স্পন্দিত নীল পদ্মপত্রের ন্যায় চঞ্চল কৃষ্ণতার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি ক্রোধে ঈষৎ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, সুগঠন ঈষৎ দীর্ঘ গ্রীবাটি ক্রোধের চারু ভঙ্গিতে উন্নত করিয়া চম্পকদামবর্ণী সুন্দর ক্ষুদ্র মুখ খানি ভ্রাতার নয়নে বিম্বিত করিয়া বলিল "তাহা পারিবে কেন? মনে করিয়া দেখ দেখি কিরূপে আমরা পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কিরূপ কষ্টে, কিরূপ অসহায় অবস্থায় আমাদের দিন কাটিয়াছে? বিনা দোষে বিনা অপরাধে কাহার জন্য আমাদের এত দুর্দ্দশা এত যন্ত্রণা?, যখন নির্ব্বাসিত দেবরায় আমাদের মত স্ত্রী কন্যা লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া অনাহারে অনিদ্রায় বেড়াইবে তখন আমার সে দুঃখ দূর হইবে।" রামরায়ের ভাবান্তর হইল, সেই রাত্রের জ্যোৎস্নালোকদীপ্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী মুখ দুইটি মনে জাগিয়া উঠিল—কুসুম নির্ম্মিত সেই দেবী

• সকল এককালে বিলীন হইয়া গিয়াছিল • সুতরাং নোয়াই তদ্দেশের আদিপুরুষ হইয়া বসিয়াছিলেন।

নোয়ার সময়ের জলপ্লাবন আর নৃচক্ষু সময়ের জলপ্লাবন যখন তুল্যকালিক, তখন আর নোয়ার সহিত বৈবস্বত মনুর উল্লেখ করা যাইতে পারে না যিনি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বৈবস্বত মনুর সময়ের জলপ্লাবন আর নোয়ার সময়ের জলপ্লাবন এক করিতে চাহেন তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। কেন না এ জলপ্লাবন পাণ্ডব বংশীয় নৃচক্ষুর সমসাময়িক। • উহা যৌধিষ্ঠিরাব্দের ১১০২।৬ গত হইলে হইয়াছিল। আর বৈবস্বত মনুর সময়ের জলপ্লাবন তাহার অনেক কাল পূর্ব্বে হইয়াছিল। এ বিষয়ে অনেক যুক্তি তর্ক আছে, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে বলা হইল।

১ এই দণ্ডপাণি শাক্যসিংহের কুটুম্ব এবং তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

২ এই ক্ষেমকের পর পাণ্ডববংশের অভাব হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের নাম-গৌরব এই স্থানেই পরিশেষিত হইয়াছিল।

প্রতিমা দুইটি দীন হীন ভিখারিণী বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, রামরায়ের হৃদয় কণ্টকিত হইল, তাঁহার চক্ষে জল আসিল তিনি বুঝিলেন কখনই তিনি যুদ্ধ করিতে পারিবেন না—এ সকল মিথ্যা বিড়ম্বনা মাত্র। রাম রায় ভগিনীকে বলিলেন "স্নেহলতা, স্ত্রীলোকের মুখে ওরূপ প্রতি হিংসার কথা সাজে কি!" রামরায় জানিতেন স্নেহলতা রাগ করিয়া যাহাই বলুক, রাগের সময় যাহাই মনে করুক, শত্রু যথার্থ কষ্টে পড়িলে সে আবার নিজেই কাঁদিবে। তবু স্নেহকে লজ্জিত করিয়া থামাইবার জন্য ও কথা বলিলেন, স্নেহলতা সত্যই মনে মনে ঈষৎ লজ্জিত হইল। কিন্তু পাছে ভ্রাতা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন এই ভয়ে আরো ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিল "স্ত্রীলোকের মুখে যদি ও কথা না শোভা পায়, তো মনে কর আমি স্ত্রীলোক নই। পুরুষের তো আর স্ত্রীলোক হওয়া সাজে না! তুমি স্ত্রীলোকের মত কথা বলিলেই তো আমার রাগ হয়।" রামরায় ওকথা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "দেখ স্নেহলতা যুবরাজ সোমনাথই যদি কাল রাত্রে বন্দী হইয়া থাকেন?"

স্নেহ। "অনেক রক্তপাত কমিয়া যায়, বিনাযুদ্ধে যাহাকে চাও তাহাকে পাইবে।"

রাম। "তিনি কয়েদী হইলে তুমি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?"

স্নেহ। "শত্রুর মত। আমার ভাইকে খুন করিতে আসিয়াছিল, খুনীর মত।"

রামরায় অপেক্ষা স্নেহলতা যদিও প্রায় পঞ্চদশ বৎসরের ছোট, তথাপি তিনি ভগিনী সহিত অনেকটা সখীর মত ব্যবহার করিতেন। রামরায়ের গৃহে আর কেহই ছিল না, হাসিবার কথা কহিবার, গল্প করিবার কেবল এক স্নেহলতাই ছিল—সুতরাং স্নেহলতা অনেকটা তাঁহার সখীর মত হইয়া পড়িয়াছিল। রামরায় স্নেহের কথায় হাসিয়া বলিলেন "আমি যদি শত্রুকে তোর মিত্র করিয়া দিই, যদি তাহার সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিই!" স্নেহলতাও একটু মৃদু হাসিয়া বলিল "তাহা হইলে তোমার মতই কাজ কর বটে"

রাম। "কেন তাহাতে দোষ কি?"

স্নেহ। "শত্রুকে বিবাহ করিব? এ প্রাণ থাকিতে না।"

রাম। "যদি শত্রুকে ভাল বাসিয়া ফেলিস? কেন এমন তো অনেক গল্প শোনা গিয়াছে। এরূপ ঘটা তো আর আশ্চর্য্য নয়।"

স্নেহ। "স্নেহের হাড়ে তাহা লেখে না। তাহা হইলে আরো দূরে থাকিব। প্রেমের অযোগ্য বলিয়া মনকে বুঝাইব, আরো তাচ্ছিল্য ভাবে তাহাকে দেখিব।"

রাম। "যদি সে তোকে ভাল বাসিয়া ফেলে?"

স্নেহ। "হাঁ রাজার ছেলে অমনি আমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিল আর কি?"

রাম। "মনে কর যদিই ভাল বাসে—কেন প্রেমের কাছে রাজা আর প্রজা কি?" স্নেহের মহা সমস্যা লাগিল, যেন কত বড় অঙ্কের সমস্যাই তাহার পূরণ করিতে হইবে সে ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—"তাহা হইলে

—বড় মুস্কিল। না তা ভাল বাসিবে না।" রামরায় হাসিয়া বলিলেন "মনে কর না যদিই ভাল বাসে তাহলে?" স্নেহলতা হাসিয়া বলিল "সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করাইয়া তাহার ভালবাসার পরীক্ষা করি—"

রাম। "যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন"—স্নেহলতা তরবারি খানি ভূমে রাখিয়া বলিল "না বাপু অত আমি জানিনে"।

দুই জন সৈনিক এই সময় গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বন্দীকে লইয়া আসিয়াছি দ্বার দেশে রহিয়াছে"। রামরায় গৃহে আনিতে আদেশ করিলেন। স্নেহলতা গৃহের একটি কোণে অস্ত্রাদি রাখিতে গমন করিল, সোমনাথ আনীত হইলেন। একবার মাত্র বন্দীর দিকে চাহিয়া স্নেহলতা গৃহ হইতে চলিয়া গেল। চকিত বিহারিণী বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় সে রূপ রাশি সোমনাথ দেখিতে পাইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কল্পনার একমাত্র আশা একমাত্র আশ্রয় সোমনাথ চলিয়া গিয়াছেন—কল্পনার আর আছে কি! কল্পনার জীবন তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, যন্ত্রণা ছাড়া আর কল্পনার জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। আজীবন অপেক্ষা করিয়া করিয়া যে মুহূর্ত্তে মুমূর্ষু কল্পনা লতা সোমনাথের আশ্রয়ে জীবিত হইতে যাইতেছিল সেই মুহূর্ত্তেই বিধাতা তাহাকে নিরাশ করিলেন। কল্পনার আশা করিতেও আর ভরসা হয় না।

যন্ত্রণা ভুলিবার কল্পনার কি আছে? বিমাতা শত্রু, কল্পনা বিমাতার দু চক্ষের বিষ, পিতা যদিও মনে মনে কতকটা ভালবাসেন কিন্তু তিনি রাণীর ভয়ে ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। রাণী সহস্র কষ্ট দিলেও পিতা কিছুই বলিতে সাহস করেন না। লাবণ্যকে কল্পনা ভাল বাসে, কিন্তু কল্পনার সহিত দেখা শুনা রাণীর বারণ, লুকাইয়া লুকাইয়া যা তাহাদের মিলন। এই অন্ধকার নিরাশ্রয় অট্টালিকার মধ্যে তবে কি করিয়া তার দিন যায়? এই ভীষণ প্রাসাদেও তাহার একটি সঙ্গী ছিল, একটি জুড়াইবার আশ্রয় ছিল, যাহার কাছে গিয়া ক্ষণকালের জন্যও সে সান্ত্বনা পাইতে পারিত। সেই জুড়াইবার সঙ্গী তাহার বীণা। কিন্তু সোমনাথ গিয়া পর্য্যন্ত সে বীণাও এখন নীরব। সেই দিন অবধি কল্পনা বীণা বাজাইয়া আর গান পর্য্যন্ত করে নাই। যতবার বাজাইতে গিয়াছে, বীণা কোলে করিয়া সমস্ত দিন কাটিয়া গিয়াছে একবার তার বাজাইবার জন্যও ছুইতে পারে নাই। যে বলটুকুর আবশ্যক, তাহাও বুঝিবা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কিছুতেই তাহার আর সুখ নাই মনের শান্তি নাই। কল্পনা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না, শুইয়া বসিয়া বেড়াইয়া গাহিয়া বাজাইয়া কিছুতেই তাহার আরাম নাই, সর্ব্বদাই কি একটি অসহ্য যাতনায় মন হুহু করিয়া কাঁদিতে থাকে, দিন রাতে কতবার সেই করুণ যাতনা ব্যঞ্জক চক্ষু দুটি দিয়া জল

উথলিয়া উঠিতে চায়—কতবার অভাগিনী কল্পনা তাহা সামলাইয়া রাখে। সোমনাথ কতদিন গিয়াছেন—একখানি চিঠি পর্য্যন্ত সে পায় নাই—আর তো সে পারে না, এরূপে কেমন করিয়া তার দিন কাটিবে গো? মন যখন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠে, প্রাণ যখন নিতান্ত দেহের বাহির হইতে চায়, তখন কল্পনা নিরাশার বলে বলী হইয়া, জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ আশাকে হৃদয় মধ্যে ডাকিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কতবার দিনের মধ্যে কল্পনা ছুটিয়া উদ্যান মধ্যে যায়, বীণাপাণির তলে সেই দিনকার মত বীণাটি হাতে করিয়া বসে, সেই রাত্রের সেই সুখময় স্মৃতিতে হৃদয় জুড়াইতে যায়—কিন্তু শেষের সেই দুঃখময় বিদায়ই কেবল মনে জাগিয়া উঠে। কল্পনা পাষাণ চিত্রের মত বসিয়া থাকে, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া ওঠে। সোমনাথ সেদিন যেমন সহসা সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—তেমনি যদি আজ আসিয়া দাঁড়ান? সে যেন তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিতে পায়। বিকম্পিত হৃদয়ে চক্ষু ফিরাইয়া দেখে—নিরাশ হইয়া তাহার বুক আরো ভাঙ্গিয়া যায়। এক শুক্লপক্ষ গিয়া—আর এক শুক্লপক্ষ আসিয়াছে, কল্পনা বীণাটি হাতে করিয়া উদ্যানে বসিয়া আছে। তেমনি করিয়া সেই জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে, গাছে গাছে তেমনি ফুলের শোভা, আকাশে তেমনি তারকার হাসি—অথচ কল্পনার নিকট কিছুই যেন তেমন নাই—তাহার কাছে আর চাঁদ হাসিয়া উঠে না ফুল হাসিয়া ফোটেনা, সমীর মাতিয়া ছোটে না—তাহারা সকলেই যেন কেবল বিষাদের গান গায়, তাহারা সকলেই যেন বিষাদের ছবি। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কল্পনা আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল—সেই বিদায়ের কথা মনে পড়িতে লাগিল—যেন সোমনাথ তাহার কাছে বিদায় লয়েন নাই, যেন কল্পনাই চির জীবনের জন্য তাঁর কাছে হইতে বিদায় লইয়াছে—সেই যেন অতি নির্দ্দয় ভাবে সোমনাথের আশ্রয় হইতে আপনাকে ছিঁড়িয়া অতি দূরে দূরে চলিয়া আসিয়াছে সে আশ্রয় সে শান্তির আলয় আর কখনো কখনো বুঝি তাহার আলয় হইবে না। কল্পনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার অদৃষ্ট তাহার চক্ষের সম্মুখে জলজ্বল করিতে লাগিল—কল্পনা অনিমেষ নেত্রে—শূন্য দৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তারপর বীণাটি তুলিয়া লইল—সোমনাথ বিদায় লইবার দিন সে যেন মনে মনে কি কথা বলিয়া বিদায় লইয়াছিল—তাহাই মনে পড়িল—বীণাটি তুলিয়া তাহাতে সে ঝঙ্কার দিল অনেক দিন পরে তাহাতে কল্পনার হাত পড়িল—কল্পনা সেই গানটি আবার গাহিল—

জনমের মত সখা বিদায় দেহগো মোরে;
এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে না ফিরে।

ও মোহন মুখশশী, ওই মধুময় হাঁসি,
জন্মশোধ শেষবার দেখে নি নয়ন ভোরে,
অঙ্কিত যে ও মূরতি হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছিবে তবু ও ছবি মুছিবে কি রে!

নয়নে দেখি না দেখি, তবুও দূরেতে থাকি,
যতনে পূজিব ছবি অভাগির অশ্রুনীরে,
তাতেই ভুলিয়া রব, তাতেই প্রাণ সঁপিব,
স্মরণের সুখে সুখী রহিব অন্তরে।"

আর গাওয়া হইল না, বুকের মধ্যে বড় কেমন করিয়া উঠিল, বীণাটি ভূমে ফেলিয়া হাত দুটির মধ্যে মুখখানি লুকাইয়া ফেলিল। বুঝি বা কল্পনা কাঁদিতেছে? বুঝি বা মর্ম্মের সেই অশ্রুজল লুকাইবার জন্য মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল। বাগানে তো কেহই নাই—কাহার কাছে অশ্রুজল ফেলিতে তবে লজ্জা! কেন আকাশে চন্দ্র আছে, তারা আছে, বাগানে গাছ আছে—ফুল আছে—তাহারা যদি দেখিয়া ফেলে? অভাগিনী কল্পনা তোর কান্না কবে ফুরাইবে—?

কল্পনার দাসী উদ্যানে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল—"রাজ কন্যা।" কল্পনা চমকিয়া হাত হইতে মুখ উঠাইলেন। ভবানী তাঁহার ক্রোড়ে এক পত্র দিল। দেখিয়াই কল্পনা সোমনাথের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলেন। কত দিন পরে তাহার বিষণ্ণ মুখখানি আজ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ঘুমের ঘোর।

কুসুমের কোলে মাথাটী থুইয়ে
ঘুমায়ে রহিব রে;
কৌমুদী-মদিরা দিবে পিয়াইয়া,—
ছানিত অমিয়া রে;
তবু ঘুমঘোর যাবে না ভাঙ্গিয়া,—
জীবনে জড়িত রে!
শিশিরের জলে ধোয়াবে নয়ান,
ভাঙ্গিতে ঘুমের ঘোর,
তবু না মেলিব অলস নয়ান,—
শ্রান্ত বড় মাথা মোর;

শ্বাসিয়া বহিবে নিশীথের বায়,
চাহিবে নিশাস রে,
আমি তো কখনো মিশাব না শ্বাস,
—সমীর আমার কে?
ভোরের সময় হাসিবে অরুণ—
জীবন-জীয়ান হাসি,
উদিবে তপন জগত জীবন,
ফুটিবে কুসুম রাশি;
আমি না হাসিব আমি না কাঁদিব,
আমি না মেলিব আঁখি,

কুসুমের কোলে ঘুমায়ে রহিব,
ঘুমন্ত মাথাটী রাখি ;
গুন্ গুন্ গেয়ে গেয়ে কালো অলি
কত না সাধিবে রে,
ইনিয়ে বিনিয়ে মধুরে মধুরে
কত না কাঁদিবে রে,

আমি তো কখনো তুলিব না মাথা,
রহিব ঘুমেরি ঘোরে ;
তারা সীমন্তিনী শান্ত নিশীথিনী
আসিয়া হেরিবে মোরে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সম্পাদকের বৈঠক।

তৃতীয় পল্লব।

পীড়া কেন হয়? এই দেখিলাম সুস্থ শরীরে বসিয়াছিল—সহসা শীতে কাঁপিতেছে, চিৎকার বা ছটফট করিতেছে—ইহার কারণ কি? হাঁচি আসিতেছে বা হাই উঠিতেছে—সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া নিবারণ করিতে পারি না কেন? প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইলে আমার শরীর আমার বশ মানে না। রোগ যে কেবল ভূতের উৎপাত মাত্র—ভূত শান্তি করিতে পারিলেই রোগ শান্তি হয় ইহা অসভ্য সাধারণের বিশ্বাস। অসভ্য দেশের চিকিৎসক ওঝা। কাফিরদিগের মতে রোগের তিনটী কারণ (১) শত্রুর যাদুকরা ; (২) জলদেবতার কোপ। (৩) অপদেবতার দৃষ্টি। গিনিদেশের ওঝারা রোগীকে নানা রঙ্গে চিত্রিত করে, তাহা হইলে অপদেবতা সন্তুষ্ট হইয়া ছাড়িয়া দেয়। সাইবিরিয়ার কালমক, কার্গিজ, ও বাস্কির জাতি, ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণী মাত্রেই বিশেষতঃ আবোর, কাছাড়ী, কোল প্রভৃতি জাতি মধ্যে, আণ্ডামান দ্বীপে, সামোয়ান প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, মাডাগাস্কার দ্বীপে, কারিব প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস লক্ষিত হয়। কালমক চিকিৎসকদিগের একমাত্র চিকিৎসা ভূত ঝাড়ান। সর্দ্দারের পীড়া হইলে অপর কেহ তাহার নামটী গ্রহণ করে—তখন অপদেবতা সর্দ্দারকে ছাড়িয়া নামওয়ালাকে ধরে। রোম, গ্রীস, এসিরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতম জনপদেও এই বিশ্বাস ছিল, ইহুদিদিগের মধ্যে অদ্যাপি ইহা সাধারণ বিশ্বাস। আমাজুলু, টাঙ্গন, ও আবিসিনিয়ানেরা বলে অপদেবতার আক্রমণ হেতু ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। কাহারও হিক্কা হইলে ইহাকুতেরা বলে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। প্রসববেদনা ভূতের আক্রমণ বলিয়া কার্গিজেরা মনে করে। এজন্য প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে ভূত তাড়াইবার জন্য সকলে মিলিয়া অভাগিনীকে প্রহার করিতে থাকে। বিকারে প্রলাপ বকিলে আরব ও টুপী জাতিরা বলে রোগীকে ভূতে পাইয়াছে। কেহ পাগল হইলে টঙ্গা সামোয়ান, ও সুমাত্রাদ্বীপের অধিবাসীরা বলে তাহাতে ভূতে পাইয়াছে, ভূতে না পাইলে উন্মাদ কাহার সঙ্গে কথা কয়? কি হেতু শরীরের বল সহসা এত বৃদ্ধি হয়? য়ুরোপে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই মত প্রচলিত ছিল। আমাজুলু ও সামোয়ানেরা বলে পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহারই প্রেত ফিরিয়া আসিয়া পরিবারস্থ অন্যান্যের পীড়া উৎপাদন করে। সাহেব দেখিলে নবকালিফর্ণিয়ার অধিবাসীরা বলে তাহাদিগের কৃষ্ণকায় পূর্ব্ব পুরুষ রোগ উৎপাদনের জন্য মরিয়া সাহেব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কোথাও ব্যথা হইল অরচাকেরা বলে ভূতে তীর মারিয়াছে। ডায়কদিগের মতে অদৃশ্য অপদেবতার অদৃশ্য বর্ষার অদৃশ্য আঘাতে লোকের রোগ জন্মে। লেপচা, কিরাত, ধিমল, বোদো প্রভৃতি ভারতের প্রান্তবাসী অসভ্যদিগের মতে অপদেবতার প্রকোপেই লোকের পীড়া হয়। নিগ্রোরা বলে শত্রুর যাদু বা ভূতের দৃষ্টি না হইলে রোগ হয় না। জুলুরা বলে পরলোক গত পূর্ব্ব পুরুষকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে তাহারা বংশাবলির রোগ উৎপাদন করে। মৃত্যু বা যে কোন বিপদ সংসারে ঘটিতে পারে কুকীরা বলে সে সকলই অপদেবতার কৃত। খন্দ জাতিরা বলে মানুষকে যে মরিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই, দেবতাকে না চটাইলে মানুষ চিরদিন বাঁচিতে পারে। বয়োবৃদ্ধ মরিলেও বুশমানেরা বলে কেহ যাদু করিয়া বুড়াকে মারিয়াছে। ফান্-জাতিরা বলে কেহ গুণ না করিলে মানুষ হাজার বুড়া হইলেও মরে না। জলে ডুবিয়া, গাছ হইতে পড়িয়া, বিষ খাইয়া, বা যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে মরিলেও তাহারা যে অপদেবতার দৃষ্টি বা শত্রুর যাদু করায় মরিয়াছে এ বিশ্বাস লোয়াঙ্গো, টাহিটী, সাওউইক্, আষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ হাঁচিলে আমাদের দেশে 'জীব' বলিয়া থাকে। ভাল কি মন্দ কোন দেবতার আবির্ভাবে যে অন্যান্য রোগের ন্যায় হাঁচিতে হয় ইহা নানা জাতির বিশ্বাস। কেহ হাঁচিলে ইংরাজ রমণীরা বলে 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ'। কাহাকে হাঁচিতে দেখিলে খন্দরা বলে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। হোমর, আরিষ্টটল, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে এ বিশ্বাসের উল্লেখ দেখা যায়। ইহুদি, নিগ্রো ও কাফির জাতির মধ্যে, কুরদিস্তান, ফ্লরিডা, টাহিটী নবজিলণ্ড এবং এবং টঙ্গা দ্বীপেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান-মধ্যে হাঁচি সয়তানের আবির্ভাবের লক্ষণ। এই জন্য কাহাকে হাঁচিতে দেখিলে তাহারা আল্লার নাম গ্রহণ করে। কাহাকে হাঁচিতে

দেখিলে জুলুরা বলে যে কোন পিতৃপুরুষের আত্মা তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। এ জন্য হাঁচি পাইলে জুলুরা বলে "আমি ধন্য, পূর্ব্বপুরুষের আত্মা আমাতে আসিয়াছে।" এই বলিয়া পিতৃপুরুষের উপাসনা করিতে বসে এবং তাহার নিকট স্ত্রী গরু বা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রার্থনা করে। আমাদের ন্যায় জুলুদের মধ্যে হাঁচি পীড়া সারিবার লক্ষণ। কেহ হাঁচিয়া বলে "স্বজাতিগণ, তোমরা আমাকে অনুগ্রহ কর—আমার প্রার্থিত সৌভাগ্য মিলিয়াছে।" শিশুকে হাঁচিতে দেখিলে অভিভাবকেরা বলে 'সুখে বাড়িতে থাক," কাহারও পীড়া হইলে "প্রতিবেশীগণ জিজ্ঞাসা করে সে হাঁচিয়াছে কি না? না হাঁচিয়া থাকিলে রোগ কঠিন বলিয়া আশঙ্কা করে। জুলু দৈবজ্ঞেরা বড় অধিক হাঁচে—জানাইতে চায় যে তাহাদের শরীরে সর্ব্বদাই দেবতার আবির্ভাব। মনমোটপা নামে আফরিকার একটী প্রদেশের রাজা যখনই হাঁচে অমনি সকল পারিষদেরা মিলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে। গিনি দেশে কোন সম্ভ্রান্ত লোক হাঁচিলে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই জানু পাতিয়া ভূমি চুম্বন করে এবং হাতে তালি দিতে থাকে। নিগ্রোদিগের সন্তানেরা হাঁচিলে গৃহিণী "দূর হও" বলিয়া উঠে—যেন হাঁচি অপদেবতা ছাড়িবার লক্ষণ। নবজিলণ্ডে কেহ হাঁচিলে উপস্থিত লোকেরা একটী ভূত ছাড়ান মন্ত্র পড়ে। সামোয়ানদিগের মধ্যে হাঁচিবার পর "বাঁচিয়া থাক" বলিবার প্রথা আছে। আমাদিগের ন্যায় টাঙ্গানেরা হাঁচিকে মনস্থ কর্ম্মের বিঘ্ন সূচক মনে করে। কেহ হাঁচিলে ক্লরিডার লোকেরা অবনত মস্তকে তাহাকে অভিবাদন করে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া বলে, সূর্য্য তোমাকে রক্ষা করুণ, তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে বড় করুণ ইত্যাদি।" আমাদের দেশে ঠগেরা হাঁচিকে বড় ভয় করিত। ইহুদিরা হাঁচিবার সময় বলে "টোবিনচইন অর্থাৎ মুখের জীবন। জর্ম্মাণ ও ফরাসিদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। হাঁচির ন্যায় হাই তোলাও ভূতের আবির্ভাব বলিয়া জুলুরা মনে করে। আমরাও এই হাই তুলিবার সময়ে তুড়ি দিই এবং দেবতাদের নাম করি। মুসলমান ও ইহুদিরা হাই তুলিবার সময়ে ঈশ্বরের নাম করে এবং মুখ চাপিয়া ধরে যেন সয়তান পেটের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পায়। জার্ম্মনির কোন কোন স্থলে হাই তুলিবার সময় মস্তকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকিতে হয়। আইসলণ্ডে এই প্রথা।

ভূত প্রাপ্তির ন্যায় বাহ্য পদার্থের শরীর মধ্যে প্রবেশও রোগের কারণ বলিয়া কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে কাহার দাঁতের পীড়া হইলে ব্যাধ কন্যাগণ তাহার মধ্যে হইতে কত কি বাহির করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আমাশয় রোগে রোগীর উদর হইতে হাড় ও সুতা বাহির করিতে দেখা গিয়াছে। কালিফর্নিয়ার কেহ পীড়িত হইলে একটী ডাকিনী তাহার সর্ব্ব শরীর চুষিতে থাকে। অবশেষে রোগীর দেহ মধ্য হইতে হাঁসের ডিম্বের মত এক খণ্ড বড় পাথর বাহির হয়। কাহারও বাতব্যাধি হইলে এস্কিমো ডাকিনীগণ কুলার মধ্য হইতে চর্ম্মখণ্ড প্রভৃতি বাহির' করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় পীড়িতের শরীর হইতে হাড়ের টুকরা বাহির হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কোরাণের বয়েৎ ধোওয়া জল বা ঔষধের নাম লেখা কাগজ ভস্ম করিয়া বা ধুইয়া খাইলে রোগ উপশম হয় ইহা কোন কোন জাতির বিশ্বাস। যদ্দ জাতি বসন্তদেবী না আসিতে পারে এ জন্য বাড়ীর চারিদিকে কাঁটা দিতে থাকে নিকোবর দ্বীপেও এই প্রথা আছে। কুকিদিগের কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তারকে ঔষধ খাইতে হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় পীড়িতের মস্তকে বা স্কন্ধে দড়ি বাঁন্ধিয়া তাহার অপর অংশ কোন আত্মীয় আপন ঠোঁটে ঘসিতে থাকে। ঘষিতে ঘষিতে ঠোঁট হইতে রক্ত বাহির হইলে সে রক্ত পীড়িতের শরীরস্থ বিকৃত রক্ত বলিয়া অনুমান করা হয়। কেবল প্রার্থনা করিলে রোগ সারে ইংলণ্ডের কোন কোন শ্রেণীর খৃষ্টানেরা ইহা বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে চণ্ডীপাঠ করা রোগ সারাইবার অমোঘ উপায়।

বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া দিনান্তে সকল দিন অসভ্যদিগের উদর পূর্ণ হয় না। উপবাস করিয়া বা গুরুপাক দ্রব্য উদর পূর্ণ করিয়া নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন বড় সুলভ। সভ্যদিগের নিকট স্বপ্ন অকিঞ্চিৎকর। অসভ্যদিগের নিকট সেরূপ নহে। তুমি দেখিতেছ তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ। মৃত দেহের ন্যায় শরীরটা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অপর দিকে তাহার মন একটা হরিণের পশ্চাত ধাবমান হইয়া হরিণটা মারিল তাহাকে কাটিল তাহার মাংস রাঁধিয়া খাইতে যায় এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কখন বা খাদ্যপূর্ণ কুটীর, শিশুপূর্ণ সংসার, ফল পুষ্প পূরিত কানন দেখিয়া আসিল। কে এ সকল দেখিয়া আসিল?—আত্মা। দেহ যখন মৃতপ্রায় পড়িয়া আত্মা তখন স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। আবার মৃত্যু ও নিদ্রায় প্রভেদ কি? নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা কিছুক্ষণের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া ফিরিয়া আসে তখন মানুষ জাগিয়া উঠে।

মৃত্যু হইলে আত্মা দেহ ছাড়িয়া যে যায় সে আর ফিরে না। তুমি দেহ কবরসাৎ বা ভস্মসাৎ কর আত্মার তাহাতে ক্ষতি নাই। সে স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছে। সেই আত্মার নাম প্রেতাত্মা। অসভ্য সাধারণের বিশ্বাস নদ, নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গৃহ সর্ব্বত্র প্রেতাত্মা বিচরণ করে। এ পর্য্যন্ত এমন অসভ্য জাতি দেখা যায় নাই যাহারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে না। কেবল নিদ্রা ও মৃত্যু সময়েই কেন, জাগ্রতাবস্থায়ও কখন কখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাকেই লোকে মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ কহে। আবার অনেক সাধ্য সাধনা করিলে আত্মা আপন আবাস গৃহে ফিরিয়া আসে। তখন রোগ সারিয়া যায়। কখন কখন স্বজনের

প্রেতাত্মা স্বপ্নাবস্থায় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া থাকে। সে গুলি সর্ব্বথা পালনীয় ও বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। এ জন্য স্বপ্নাদেশের জন্য উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবার প্রথা আছে। স্বপ্নে প্রায় পিতা মাতাকেই ও দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ জন্য কোন কোন জাতি মনে করে পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগের ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের আত্মা মরিয়া যায়। অসভ্যদিগের মধ্যে আর একটী বিশ্বাস, যখন আত্মা দেহ ছাড়িয়া অল্প বা বহুকালের জন্য স্থানান্তরে গমন করে, তখন অন্য আত্মা আসিয়া কখন কখন দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। এ জন্য আমাদের দেশের লোকেরা মৃতদেহের দানব প্রাপ্তির কথা বলিয়া থাকে। বেতালপঞ্চবিংশতিতে এই বিশ্বাসের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তোমাতে আমাতে।

রবিতে শশীতে, দিবসে নিশাতে,
জননী অঙ্কেতে, মরণে শান্তিতে,
তারকা কুসুমে, বিপুল বাসনা রে ;
স্বপনে সুখেতে, আলসে ঘুমেতে রে।
সৌরভে সমীরে, তটিনী সাগরে,
চকোরে সুধাতে, কাতরে চাতকে,
গিরিতে গগনে, মিশিয়ে মিশিয়ে রে ;
দম্পতী কপোতে, পাপিয়া পাগলে রে ;
অরুণে উষাতে, সন্ধ্যাতে বিষাদে,
গোধূলি প্রবাসে, রজনী স্বদেশে,
নিশীথে নীরবে, আকুল হইয়ে রে ;
বিরহে মিলনে, নয়নে নয়নে রে ;
হাসিতে শিশুতে, নারীতে পীরিতে,
প্রকৃতি পুরুষে, অনাদি অনন্তে,
পুরুষে সুজনে, সুন্দরে সুন্দরে রে ;
যোগীতে যোগেতে, প্রশান্ত প্রশান্ত রে ;
সলিলে তরঙ্গে, আকাশ নীলিমে,
তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে,
সাগরে গভীরে, বিজনে বিপিনে রে ;
তোমাতে আমাতে, কেমনে কেমনে রে !

উড়িষ্যার ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

কেশরীবংশের বংশাবলী।

নাম অভিষেকের শকাব্দা।
১। জনমেজয় (কেশরী) দেব * * *

দ্বিতীয় নরপতি মহারাজ ঘটোৎকচের নামে "গুপ্ত" শব্দ সংযুক্ত নাই। (১) বঙ্গীয় সেন রাজশ্রেণীর শেষ নরপতির নামের অন্তে "সেন" শব্দ দৃষ্ট হয় না।

(জনমেজয় দেব।) মাদলা পাঞ্জির মতে যযাতি কেশরী বংশের স্থাপয়িতা। বংশাবলীলেখক যযাতির পিতা চন্দ্র কেশরীকে এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা লিখিয়াছেন। যযাতির জন্মদাতার নাম সম্বন্ধে বংশাবলীলেখকের কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিলেও আমরা তাহার বাক্য প্রকারান্তরে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বোধ হয় চন্দ্র বংশীয় আদি কেশরী এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া বংশাবলীলেখক জনমেজয়কে চন্দ্র কেশরী লিখিয়াছেন।

যযাতির তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাঁহার পিতা জনমেজয় ভুজবলে শত্রুগণকে জয় করিয়া মহানদীতীরস্থিত (যৌমুয়ার) নগরে রাজপাট সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমের সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন। সম্বলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয় রাজা জনমেজয় মগধ রাজদণ্ডের অধীন ছিলেন। বোধ হয় দন্তকুমার ও হেমমালা বুদ্ধদন্ত লইয়া উড়িষ্যা হইতে পলায়ন করিলে রক্তবাহু ও তাহার সহচরগণ কিছুকাল উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, কিছু কাল অন্তে মহারাজাধিরাজ মহাভব গুপ্ত রক্তবাহুর সহচরবর্গকে উড়িষ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জনমেজয়কে উৎকল সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবত জনমেজয় মগধাধিপতির জনৈক সেনাপতি ছিলেন (রাজবংশজ হওয়াই সম্ভব) এবং তাহার বাহুবলেই উড়িষ্যা রক্তবাহুর অনুচরবর্গের কবলভ্রষ্ট হইয়াছিল।

সম্বলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয় সেই প্রদেশ তৎকালে উড়িষ্যার অধীন ছিল। জনমেজয় দেব তুঙ্গাতট পরগণার (২) বকবেদ্দ গ্রাম ভিন্ন-ভিন্ন-গোত্রজ ৪ জন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের বার্ষিক রাজস্ব ৮ পল (৩) রৌপ্য ধার্য্য করা হইয়াছিল। জনমেজয় একজন সামন্ত নরপতি সুতরাং দান কার্য্যটী তাহার নামে না হইয়া সম্রাটের নামে হইয়াছিল। (৪)

১ See the Inscriptions on the Bbitari Lat and on the Allahabad Pillar.

(J. A. S. B. Vol. VI. pp. 4, 977.)

২ তুঙ্গাতট বিষয়, প্রাচীনকালে পরগনাকে বিষয় বলিত। অদ্যাপি উড়িষ্যা দেশে "বিষয়" বা "বিষয়ী" শব্দ নিতান্ত অপ্রচলিত নহে। আমরা জমিদারি সেরেস্তার কাগজ পত্রে পরগণার পরিবর্ত্তে "বিষয়" ও "বিষয়ী" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শাসনপত্রের ইংরেজি অনুবাদ করিতে যাইয়া "বিষয়" কে District লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এই অনুবাদটী সঙ্গত বোধ হইতেছে না। পরগণাকে District বলা যাইতে পারে কি না তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

৩ অমরকোষে পলের উল্লেখ আছে। উড়িষ্যায় অদ্যাপি পলে ওজন হইয়া থাকে। ৮ পল আধুনিক ৪৮ টাকা হইবে।

৪ সম্বলপুরে প্রাপ্ত শাসনপত্র তিন খণ্ড

জনমেজয়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। ঢেঁাহুয়ার ও পুরণের তাম্রশাসনের মর্ম্মালোচনায় অনুমিত হয় যে জনমেজয়ের তিরোভাব ও যযাতির আবির্ভাব কাল মধ্যে আরও দুই তিন জন নরপতি উড়িষ্যা শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সকলই গুপ্ত নরেন্দ্রদিগের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। জনমেজয়, কন্দর্প ও যযাতির তাম্রশাসন পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তৎকালীন গুপ্ত রাজ বংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছি। (৫)

১। শ্রীশিবগুপ্ত দেব।

২। শ্রীমহাভব গুপ্ত। ৩। শ্রীমহাদেব গুপ্ত।

৪। শ্রীমহাশিব গুপ্ত।

১ ও ২ নং নাম জনমেজয়ের শাসন

তাম্রফলকে লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এই শাসনপত্রের প্রতিলিপি ও অনুবাদ স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। (See J. A. S. B. Vol. XLVI. part. 1. page 173 to 178.) এই সনন্দের প্রথম তিনটী পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

"ওঁ স্বস্তি মুরস্তীম সমাবাসিত শ্রীমতো বিজয় কটকাৎ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীশিবগুপ্ত দেব পাদানুধ্যাত পরম মাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর সোমকুলতিলক ত্রিকলিঙ্গাধিপতি শ্রীমহাভবগুপ্ত রাজদেবঃ॥"

শাসনপত্রের অন্তঃভাগে লিখিত আছেঃ—

"ইতি পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীজনমেজয় দেবস্য বিজয় রাজ্যে সম্বৎসরে ষষ্ঠে আষাঢ় মাসে সিত পক্ষেতিথাবষ্টম্যাং যত্রাঙ্কতোপি সম্বত ৬ আষাঢ় শুদি। লিখিতমিদং শাসনং মহাসন্ধিবিগ্রহি শ্রীমল্লাধার দত্ত সুতবদ্ধ কায়স্থ কৌই ঘোষেণ বল্লভ ঘোষ সুভেনেতি অস্তি ক্ষৌণীশ্বরাণামমলমণিরুচাময়ঃ কৌস্তভাভঃ শৌর্য্যত্যাগাম্বুরাশিঃ বিরচিত বিধিবদ্ধানশুভ্রকৃতাভঃ শ্রীমানজনমেজয়াখ্য স্ত্রিদশপতিসমঃ কৃচ্ছ্রগাং ভোক্তুকামঃ প্রখ্যাত দ্বোষিবর্গ প্রবিদলন পটুভূপতিঃ সোমবংশি॥"

প্রতাপ বাবু বলেন—"What this Janamejaya had to do with the grant is not at all evident from the inscription." আমরা তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে জনমেজয় সামন্তনরপতি, স্বাধীন ভাবে ভূমিদান করিবার তাহার অধিকার ছিল না, এই জন্যই সম্রাটের নামে দান কার্য্য হইয়াছিল। যযাতির শাসনপত্র লক্ষ্য করিয়া রঙ্গলাল বাবু এই রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। (J. A. S. B. XLVI. part 1 p. 150) শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহোদয় এই মত সমর্থন করিতেছেন। (P. A. S. B. 1882. page 9.)

৫ কন্দর্পদেব ও যযাতির শাসনপত্র হইতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মিত্র মহোদয় এইরূপ বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছেন।

I Bhava-gupta.

11 Siva-gupta.

111 Mahadeva gupta. প্রোক্ত দুই খানা শাসনপত্রের সহিত জনমেজয়ের সনন্দ সমালোচনায় আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহোদয়ের প্রকাশিত বংশাবলী অসঙ্গত বোধ হইয়াছে।

পত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ ও ৩ নং নাম কন্দর্প দেবের শান পত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ২ ও ৪ নং নাম যযাতির তাম্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৌদুয়ার নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় মহাদেব গুপ্তের শাসনকালে কন্দর্পদেব উড়িষ্যা শাসন করিতেছিলেন। জনমেজয়ের সময়ে মল্লাধার দত্ত "মহাসান্ধিবিগ্রহি" ছিলেন। কন্দর্পদেবের শাসন সময়েও "বিশুদ্ধ কায়স্থ" সেই মল্লাদত্ত কেই আমরা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

কন্দর্পদেবের শাসনপত্র পাঠে বোধ হয় এই সনন্দ জনমেজয়ের সনন্দ দর্শন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। (৬) বোধ হইতেছে মহাভব গুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা মহাদেব গুপ্ত জনমেজয়ের পুত্রকে রাজ্য প্রদান না করিয়া কন্দর্পদেবকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কন্দর্পদেবের পর আর ও ২। ১ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভব গুপ্তের পুত্র মহাশিব গুপ্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া যযাতিকে উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

(যযাতি কেশরী।) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যযাতি, জনমেজয়ের পুত্র। তিনি মহারাজাধিরাজ মহাশিব গুপ্তের সমসাময়িক ও দণ্ডাধীন ছিলেন। যযাতির শাসন পত্রের বিষয় আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। এই শাসনপত্র দ্বারা ভরদ্বাজ গোত্রজ অনন্ত ভট্টের পৌত্র দিবাকরের পুত্র গঙ্গাপাণিকে দক্ষিণ কোশল দেশস্থ মরড় বিষয়ের অধীন চাদ্র গ্রাম দান করা হইয়াছিল। (৮) গঙ্গাপাণির পূর্ব্ব পুরুষ মধ্য দেশ (৯) হইতে

৬ কন্দর্পদেবের শাসন পত্রের প্রথম ৪ টিপংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে

"স্বস্তি শ্রীমদারাম সমাবাসিতঃ শ্রীমতো বিজয় কটকাত্। পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর—শ্রীশিবগুপ্ত দেব পাদানুধ্যাত পরম মাহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর সোমকুলতিলক ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীমহাদেব গুপ্ত দেবঃ।"

শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহোদয়ের প্রকাশিত উক্ত শাসনপত্রের প্রতিলিপি হইতে প্রোক্ত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত হইল। জনমেজয়ের সনন্দের "মুরস্তীম" এর পরিবর্ত্তে এই সনন্দে "শ্রীমদারাম" ও সেই সনন্দের মহাভব গুপ্তের পরিবর্ত্তে ইহাতে মহাদেব গুপ্ত লিখিত হইয়াছ। যে "মহারাজাধিরাজ" শব্দের নিম্নে রেখা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পুনরুক্তি বোধ হইতেছে। ইহা আধুনিক ভ্রমও হইতে পারে।

৮ দক্ষিণ কোশল—বর্ত্তমান কটক জেলা। (দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ।) মরড় এক্ষণে হরিহরপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন মরড় বিষয় বর্ত্তমান হরিহর পরগণা, কাটজুরি ও পাইকা নামক নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। চন্দ্রগ্রাম অধুনা চান্দুরা নামে পরিচিত। চান্দুরার অনতিদূরে কাটজুরির শাখা অলকা নদী প্রবাহিত হইতেছে।

৯ মনু মধ্য দেশের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্য দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মনু; দ্বিতীয় অধ্যায়। ২১ শ্লোক।

আগমন পূর্ব্বক উড্র দেশস্থ শিলাভঞ্জ গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

মহারাজ যযাতি স্বনামখ্যাত "যযাতি পুর" মতান্তরে "যজ্ঞপুর" নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজপাঠ স্থাপন করেন। প্রবাদ অনুসারে মহারাজ যযাতি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক যযাতিপুরের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ কত দূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু জনৈক বিখ্যাত লেখক ভ্রমক্রমে ইহাই উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ আগমনের প্রথম সূত্র লিখিয়াছেন। যযাতির বহুকাল পূর্ব্বেই যে ব্রাহ্মণগণ উড়িষ্যায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইতে হইবে না। কেশরী বংশের শাসনারম্ভে যদি কোন ব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উড়িষ্যায় আনীত হইয়া থাকে, তবে তাহা জনমেজয়ের শাসন কালে হওয়াই সম্ভব। শৈব নরপতি মহাভব গুপ্ত বৌদ্ধদিগের হস্ত হইতে উড়িষ্যার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক তৎকালে জনমেজয়কে উৎকল রাজাসনে স্থাপন করেন। সেই সময় অবশ্যই ধর্ম্ম ও রাজ কার্য্যানুরোধে এক দল ব্রাহ্মণ মগধ হইতে উড়িষ্যায় প্রেরিত হইয়াছিল। যযাতি কতকগুলি যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই কার্য্য সম্পাদন জন্য আর্য্যাবর্ত্ত হইতে এক দল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হওয়া সম্ভব। অদ্যাপি সেই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ সন্তান যাযপুরে বাস করিতেছেন, তাহারা অগ্নিহোত্রী নামে পরিচিত। বৈদিক নিয়ম অনুসারে অদ্যাপি তাহাদের গৃহে অগ্নিদেব সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। আমাদের প্রাচীন ভ্রাতা পার্সিগণ ও এই বৈদিক নিয়মটী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনায় কেশরী বংশের রাজারম্ভে আমরা উড়িষ্যায় একটী প্রকাণ্ড বিপ্লব দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন কালে আদিম, বৌদ্ধ ও হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের লোক উড়িষ্যায় বাস করিত। রক্তবাহুর অনুচরণগণ দ্বারা আরও একটী শ্রেণী বৃদ্ধি হয়। তৎপরে শৈব নরপতিগণ উড়িষ্যা বিজয় করিয়া আরও এক দল নূতন হিন্দু উৎকলে স্থাপন করিলেন। এই সকল লোক একত্রিত হইয়া উড়িষ্যায় যে বিপ্লব উপস্থিত করে—হস্তপদবিহীন, কিন্তূত কিমাকার, না হিন্দু না বৌদ্ধ জগন্নাথমূর্ত্তিই তাহার প্রত্যক্ষ ফল; অতএব এক্ষণে আমরা জগন্নাথের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(জগন্নাথদেব।) আমরা দারুব্রহ্ম ও ক্ষেত্রপুরাণ নামে ২ খণ্ড উড়িয়া গ্রন্থ (১০) হইতে প্রথমতঃ জগন্নাথের ইতিহাস সংগ্রহ করিব। এই গ্রন্থে উড়িয়াগণ তাহাদের কল্পনা অশ্বের বলগা উন্মোচন করিয়া একটী অসত্যের পূর্ণ চক্রের ঘোড়দৌড় করিয়াছেন। এই গল্পের মধ্যে তিল পরিমাণ সত্যের অস্তিত্বও সন্দেহজনক, তথাপি যে অসত্যের সাহায্যে উড়িয়া ব্রাহ্মণগণ ভারতবাসী সমস্ত হিন্দু হৃদয়ের উপর অসীম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ একবার শ্রবণ করুন।

১০ দারুব্রহ্ম শিশুরায় দাস প্রণীত ও ক্ষেত্রপুরাণ মাগুনিয়া দাস প্রণীত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে মালব দেশে একরাজা ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব। একদা দেবর্ষি নারদ (১১) ইন্দ্রদ্যুম্নের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, মহারাজ, তুমি বিষ্ণু প্রাপ্ত হইবে এবং জগতে তোমার যশঃ ঘোষণা হইবে। রাজা বলিলেন দেব, বিষ্ণু কোথায় আছেন, তাহা বলিয়া দিন। নারদ বলিলেন, তিনি নীলগিরি পর্ব্বতে নীলমাধব রূপে বিরাজ করিতেছেন। জনৈক শবর গোপনে তাঁহাকে পূজা করিতেছে। তৎপরে নারদ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিকে প্রেরিত হইলেন। বিদ্যাপতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া এক দিবস সন্ধ্যাকালে নীলগিরি পর্ব্বতনিবাসী বসু শবরের গৃহে অতিথি রূপে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপতি কিছু কাল সেই শবরগৃহে বাস করিয়াছিলেন। ললিতা নামে শবরের এক যুবতী কন্যা ছিল। শবর বিদ্যাপতিকে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। ব্রাহ্মণ শবরকন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত হইলেন। তখন শবর ক্রোধে উন্মত্ত-সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, দেখ্ ব্রাহ্মণ, আমার পিতা একটী বাণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিয়াছিলেন। আমি কি তোর ন্যায় একটী সামান্য ব্রাহ্মণকে বধ করিতে পারিব না। এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ ভয়াতুর হইয়া বলিল, "তোমার পিতা কি রূপে নারায়ণকে বধ করিয়াছিল, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর। তৎপরে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

শবর বলিতে লাগিল।

কৃষ্ণের মায়ায় দ্বারকায় "কুকুরাভয়" (১২) উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ যাদববংশ সহ সমরাভরণে সজ্জিত হইয়া কুকুর বধ করিতে চলিলেন। কুকুর যাদববংশ সন্দর্শন ভয়ে পলায়ন করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীরস্থিত কদম্ব বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যে, এই বৃক্ষমূলে কুকুর লুক্কায়িত হইয়াছে। বলরাম ক্রোধান্ধ হইয়া সেই বৃক্ষোপরে মুষল প্রহার করিলেন। দারুণ আঘাতে কদম্ব বৃক্ষ হইতে দুগ্ধবৎ নির্য্যাস বহির্গত হইল। যদুকুলপতি বলিলেন, যাদবগণ, আইস আমরা এই উপাদেয় কাদম্বরী পান করি। তৎপরে সকলেই কাদম্বরী পানে উন্মত্ত হইয়া কলহ করিতে লাগিল। ক্রমে আত্মকলহে যাদব বংশ ধ্বংশ হইল। বলরাম জলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ "সিয়লী" লতার মধ্যে শয়ন করিয়া শোক করিতে লাগিলেন।

এই সময় আমার জনক সেই বনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি লতা মধ্যে কৃষ্ণপদ সন্দর্শন করিয়া মৃগকর্ণ বোধে শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই

১১। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন শালিবাহনের কনিষ্ঠ ইন্দ্রদ্যুম্নের সময়েও দেবর্ষি নারদ জীবিত ছিলেন।

১২ "কুকুরাভয়" যদুবংশের অন্ধক রাজপুত্রের নাম কুকুর। এই নামেই বংশের নাম কুকুরবংশ হইয়াছে। তৎসম্বন্ধীয় ভয়।

বাণে কৃষ্ণপদ বিদ্ধ হইল। "হে অর্জ্জুন রক্ষা কর" বলিয়া কৃষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমার পিতা নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শরাঘাত দর্শনে অচেতন হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, শবর তুমি ভয় করিও না। পূর্ব্বজন্মে আমি নিরপরাধে তোমার পিতাকে বধ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। আমার পিতা বলিলেন, ভগবন! পূর্ব্বজন্মে কে আমার জনক ছিলেন। নারায়ণ বলিলেন, বালি, তুমি তাহার পুত্র অঙ্গদ।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, শবর তুমি হস্তিনায় যাইয়া পাণ্ডবগণকে বল যে, কৃষ্ণ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। শবর কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। পাণ্ডবগণ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শবরের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া নানাপ্রকার আক্ষেপ করত অর্জ্জুনের বল হরণ পূর্ব্বক জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ চিতা নির্ম্মাণ করত কৃষ্ণের দেহ দাহ আরম্ভ করিল। ক্রমে সাতদিবস চেষ্টা করিয়াও পাণ্ডুপুত্রগণ কৃষ্ণের দেহ ভস্ম করিতে পারিল না। তখন দৈববাণী হইল হে পাণ্ডবগণ তোমরা কি পাগল হইলে, অগ্নি কি নারায়ণের দেহ দগ্ধ করিতে পারে, এ দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ কর কলিযুগে দারু ব্রহ্মরূপে নীলাচলে ইহার পূজা হইবে(১৩)। তদনুসারে পাণ্ডবগণ সেই দেহ সমুদ্রে ভাষাইয়া দিল।"

শবর এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া বলিল "আমি সেই শবর পুত্র, তুই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে কখনই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবি না।"

বিদ্যাপতি কিছুকাল ইতস্তত করিয়া শেষে ললিতাকে বিবাহ করিলেন। শবরগৃহে বিদ্যাপতি বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ললিতা বুঝিতে পারিল যে তাহার স্বামী সর্ব্বদাই কোন একটী চিন্তায় মগ্ন থাকে। একদা ললিতা বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল প্রভু! কি জন্য তোমার দেহ দিন দিন দুর্ব্বল দেখা যাইতেছে, আমার বোধ হয় তুমি সর্ব্বদাই কোন একটী বিষয় চিন্তা করিয়া থাক। তুমি অকপট চিত্তে তোমার হৃদয়ের ভাব আমার নিকট ব্যক্ত কর, আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিব।"

(১৩) বৌইলে দেবে স্বর্গে থায়ি।
পাণ্ডবে হইলেক বাই॥
অগ্নিরে কাঁহি হেবজুর।
ভসাই দিয় সমুদ্রের॥
ভসাই দিব এবে রজা।
কলিযুগরে হেব পূজা॥
শ্রীদারু ব্রহ্মরূপে হরি।
নীল গিরিরে বিজে করি॥
স্থনি পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
সমুদ্রে মেলি দিলে নেই॥
মাণ্ডনীয়া দাস।

দেবতারে ডাক দেলে আধা স্বর্গে থাই।
নিশ্চয় বাই হইলা পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥
সমুদ্রেন মেলি দিয় প্রভুদেব রাজা।
কলিযুগে হইবে দারু ব্রহ্ম পূজা॥
(শিশুরাম দাস।)

ললিতার বাক্য শ্রবণে বিদ্যাপতি বলিলেন, প্রিয়ে, তুমি সত্য করিয়া বল, তোমার পিতা প্রত্যহ ২।১ দণ্ড রাত্রি থাকিতে কোথায় চলিয়া যান এবং মধ্যাহ্ন কালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে চন্দনগন্ধ বহিতে থাকে।"

ললিতা বলিল "এই সামান্য কথার জন্য তুমি চিন্তা করিতেছ। (নীলকন্দার) নীলমাধব বিরাজ করিতেছেন, একথা কেহই জানে না, আমার পিতা গোপনে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। অদ্য আমার জনক গৃহে আসিলে, আমি তাহাকে বলিয়া, তোমাকে কল্য তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিব, তথায় তুমি জগন্নাথ দর্শন করিতে পাইবে।১৪

যথাকালে শবর গৃহে উপস্থিত হইলে, ললিতা তাহার নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল। শবর ললিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল এবং ললিতাকে বলিল, তুই কেন ব্রাহ্মণকে দেবতার কথা বলিলি, আমি পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথকে পূজা করিবে, এক্ষণে বোধ হইতেছে যে এই ব্রাহ্মণই তাহার দূত, যাহা হউক তোর অনুরোধে আমি ব্রাহ্মণকে জগন্নাথ দর্শন করাইব, কিন্তু তাহাকে পথ দেখাইব না, তাহার চক্ষুঃ বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব।"

ললিতা তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া পতির নিকট গমন করিল। ব্রাহ্মণ, বস্ত্রদ্বারা চক্ষুঃ বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং বলিল "পথ চিনিতে না পারিলে আমার জগন্নাথ দর্শনে কোনও লাভ নাই।"

ললিতা বলিল "তাহার জন্য চিন্তা কি?" আমি পথ চিনিবার উপায় করিয়া দিতেছি। তোমার টেঁকে কতকগুলি তিল বাঁধিয়া দিব, গমন কালে সেই তিল তুমি পথের দুই পার্শ্বে বুনিয়া যাইবে। যথাকালে তিলের গাছ হইলে তুমি পথ চিনিয়া লইতে পারিবে। (১৫)

তৎপর দিবস প্রত্যূষে বিদ্যাপতি শবরের সহিত অন্ধের ন্যায় জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কৃপায় পথের দুই পার্শ্বে তিল বুনিতে লাগিলেন, তখনও অন্ধকার ছিল সুতরাং শবর কিছুই জানিতে পারিল না। বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া চক্ষের বন্ধন খুলিয়া বটবৃক্ষমূলে নীলমাধব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মৃত দেহ, যাহা পাণ্ডবগণ জ্বালাইতে না পারিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিল।) মূর্ত্তি দেখাইয়া দিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

১৪ ললিতা কহচি মনাই।
ভাল এছার কথা পাই॥
কহই শুন মোর পতি।
শ্রীনীল মাধব আছন্তি॥
তাহাঙ্কু পিতা মো পূজহি।
এহা যে কেহি নজানহি॥
আজ যে পিতা মো আইলে।
কহিবি বুঝাই তা তুলে॥
কালি পাঠাই দেবি তোতে।
দেখিবু প্রভু জগন্নাথে॥
(মাগুনীয়া দাস।)

১৫ ললিতা কহই পণ্ডায়ে।
করিন আছি মু উপায়ে॥
আথিরে আঙ্গুলি পকাই।
নেবই পথ যে কঢ়াই॥
তুম্ভ আণ্টিরে খসা থিব।
দুই পাশেরে বুনি জিব॥
সে খসা জেবে গছ হেব।
তেবে সে পথই জানিব॥
(মাগুনীয়া দাস।)

ফাহিয়ানের তীর্থযাত্রা।

সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশবাসী বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়োন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভারতীর চতুর্থভাগে (পৃঃ৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁর দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ফাহিয়ান নামক অন্য একটি পরিব্রাজক ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় এই সকল বৌদ্ধ যাজকদিগের পুস্তক পাঠে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব ও ভূগোলতত্ত্বের অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বে ফাহিয়ান পদব্রজে অন্য যে সমস্ত দেশ দর্শন করিয়াছিলেন তাহার বিষয় অগ্রে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম ও অনুশাসন পুস্তক সমূহ (১) বিলুপ্ত প্রায় দেখিয়া ফাহিয়ান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর (৩৯৯-৪১৩ খৃঃ অঃ) প্রান্তভাগে তীর্থযাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। কথিত আছে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতেরা তীর্থের জন্য নগর হইতে নগরান্তরে, চীন হইতে ভারতবর্ষে, এবং ভারতবর্ষ হইতে চীনে ভ্রমণ করিতে হইলে কখন একাকী ভ্রমণ করিতেন না। ফাহিয়ান তদনুসারে গুটিকতক খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'চ্যাঙ্গ-আন' (আধুনিক Si'an, in Shen si) নগর হইতে শুভযাত্রা করিলেন। 'লুং' (২) এবং

১। 'তি-নট-সাম্=সংস্কৃত অর্থ ত্রি-পিটক, তিনটি ভাণ্ডার। ১ম,—তুল্-ভা (সং-বিনয়) শাসন ব্যবস্থা; ২য়,—দো (সং-সূত্র) বুদ্ধদেবের মূলবাক্য; ৩য়,—হস্-নন্-পা (সং-অভিধর্ম্ম), ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পরে রাজগৃহে শাক্যমুনির শিষ্যেরা যখন সাধারণ সভা আহ্বান করেন, সেই অবকাশে কাশ্যপমুনি "অভিধর্ম্ম," আনন্দ "সূত্র," এবং উপালি "বিনয়" রচনা করেন।

২। লুং পর্ব্বত Shen si রাজ্যের পশ্চিমে, সিং (Thsing) নদীর পূর্ব্বে, এবং রাজধানী পিকিনের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

'ইয়াং-লেয়ু' পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া 'চ্যাং-ই' রাজ্যে প্রবেশ করতঃ সেখানে উক্ত-ব্রতে-ব্রতী আরো কতিপয় সহযাত্রী পাইয়া ফা-হিয়ানের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তথা হইতে তিনি 'থানহুয়াং' নগরে উপনীত হইয়া এক মাসের অধিক কাল বাস করেন। এই প্রদেশের রাজ-প্রতিনিধি লি-হাও "সা-হো" (৩) (বালুনদী) নাম্নী মরু অতিক্রম করিতে তাঁহাকে আবশ্যকমত সাহায্য প্রদান করেন। ফা-হিয়ান বলেন যে উক্ত মরুভূমিতে ভূত-প্রেতের অত্যন্ত উপদ্রব। তথাকার বায়ু এরূপ তীব্র ও কষ্টপ্রদ যে আগত ব্যক্তি-মাত্রেই কালকবলে পতিত হয়। খেচর ভূচর কোন প্রাণী তথায় দৃষ্ট হয় না। যত-দূর দৃষ্টি যায় কেবলমাত্র মৃত মনুষ্যের কঙ্কাল, সেই কঙ্কাল লক্ষ্য করিয়াই পথ নির্ণয় করিতে হয় (৪)। সপ্তদশ দিবস পদব্রজে এই মরু অতিক্রম করিয়া,১২৫ ক্রোশ (১৫০০ লি) দূরে তিনি 'সেন সেন' (৫) রাজ্যে উপনীত হইলেন। ফাহিয়ান বলেন যে এই দেশের রাজা ফোয়ের (৬) অনুশাসনগুলি শিরো-ধার্য্য করিয়া রাখে। তিনি আরো বলেন, যে চীন রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া যত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে মঠবাসী পুরোহিতেরা "ভা-রতের ভাষা ও পুস্তক" (৭) অধ্যয়নে

৩। সা-হো মরুর বিষয় ফা-হিয়ান যাহা বলিয়াছেন মার্কো পোলো তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। তিনি বলেন ইহা থানহুয়াং হইতে লব-হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ফাহিয়ান বলেন ইহার বিস্তৃতি ১৫০০ লি, মার্কো পোলো বলেন ১১০০ লির অধিক নহে।

৪। মার্কো পোলো ইহা সম্পূর্ণ ধ্রুব বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছেন, তিনিও বলেন ইহা সর্ব্বসাধারণে বিদিত যে এই মরুপ্রদেশ প্রেতদিগের আবাসভূমি। প্রেতেরা অ-দ্ভুত ও প্রীতিপ্রদ ছলনা দ্বারা পথিক-দিগকে সুবিধামত বধ করে। এমন কি দিবালোকে যদি কোন পথিক দলচ্যুত হইয়া একাকী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে তাহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির স্বর শুনিতে পায়; সেই স্বরাহ্বানে প্রতারিত হইয়া পথ হারাইয়া সে অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়। আশ্চর্য্য বলিতে কি, সময়ে সময়ে, পথিকেরা নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি ও করতালি শুনিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়ে।

৫। লবহ্রদের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহা অনুর্ব্বর ও বালুময়।

৬। ফো (Fo or Foe) একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আবিষ্কর্ত্তা। খৃষ্টাব্দের ১০২৭ বৎসর পূর্ব্বে ইনি (কাহারো মতে কাশ্মীরে কাহারো মতে বারানসীতে) জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টাব্দের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ফো-র অনুশাসনাবলি চীনরাজ্যে সমাদৃত হয়। কথিত আছে ইনি জাতিভেদ ও নরপূজা সমূলে উৎপাটিত করেন। তাঁহার অনুশাসনের মধ্যে এইগুলি প্রধান;—(১) মিথ্যা কথা বলিও না, (২) প্রাণী হিংসা করিও না, (৩) পানদোষ হইতে বিরত হও, (৪) বিশুদ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, এবং (৫) পরকালের পুরস্কার ও দণ্ডের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর।

৭। "ভারতের ভাষা ও পুস্তক"—ইহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক উত্থাপিত হয়। কোলব্রুক বলেন যে অতি পুরাকালে পালি বৌদ্ধদিগের

অধিকতর মনোযোগী। তথা হইতে পঞ্চ-দশ দিবস উত্তরপশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া 'উ-ই' (ou-i) রাজ্যে পদার্পণ করিলেন। তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে কত নদ,—কত জনশূন্য পল্লী, কত মরু অতিক্রম করিয়া 'দেড় মাস কাল পরে তাঁহারা 'যু-থিয়ান' (৮) রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে এই রাজ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিসীমা ছিল না। ফাহিয়ানের মতে ইহার অধিবাসীরা অধিক-তর ধর্ম্মে মন দিত বলিয়া অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিত। প্রত্যেক নগর-বাসিরা স্বস্ব আলয়ের বহির্দেশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র মঠ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিত। তদ্ব্যতীত এখানে চতুর্দ্দশটি 'সঙ্গালয়' (৯) ছিল। যুথি-য়ানের সম্রাট ফাহিয়ানকে যে সঙ্গালয়ে আতিথ্য দান করিয়াছিল তাহার নাম "গোমতী" (১০)। উড়িষ্যাদেশের জগ-ন্নাথ দেবের রথযাত্রার ন্যায় এখানে পুরা-কালে বৌদ্ধদিগের দেব-মূর্ত্তির (১১) যাত্রা-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। ফাহিয়ান তাহার এইরূপ বর্ণনা করেন:—আষাঢ় মাসের শুক্ল-পক্ষে রাজ্যের সমস্ত পথ ঘাট জলসিক্ত ও নগরের প্রবেশ-দ্বার নানা বর্ণের প-তাকা ও পুষ্পদ্বারা বিভূষিত হয়। এই স্থলে রাজা রাজ্ঞী ও রাজ্যের সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারে পরিশোভমানা হইয়া "গোমতী" সঙ্গালয়ের পুরোহিতদিগের সহিত ধর্ম্ম পু-স্তক পাঠ করতঃ,—পুরোহিতবর্গ সমভি-ব্যাহারে দেবমূর্ত্তির সর্ব্বাগ্রে পদব্রজে গমন করেন। তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বিংশ হস্ত পরিমিত উচ্চ এক রথ প্রস্তুত থাকে। এই রথের আকার গৃহের ন্যায়, সপ্তরত্ন, পুষ্প এবং রেশমের পর্দা দ্বারা বিভূ-ষিত। মধ্যস্থলে দেবমূর্ত্তি, দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ব আসীন থাকে (১২)। তদ্ব্যতীত

ভাষা ছিল, এবং এই ভাষা সমস্ত ভারত-বর্ষের লোকেরা বুঝিতে পারিত, এমন কি শাক্যমুনির সময়ে এই ভাষা পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিত রেমুসাৎ বলেন যে চীনবাসী বৌদ্ধেরা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে যে গ্রন্থগুলি পাইয়াছিল তাহা সং-স্কৃত ভাষায় এবং দাক্ষিণাত্যে পালিভাষায় লিখিত ছিল।

৮। আধুনিক "খোটান"—তুর্কি স্থানের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সংস্কৃত ভাষা হইতে যে কতকগুলি বৌদ্ধ দেশের নাম সংরক্ষিত হইয়াছে এই নাম তাহার উদা-হরণ স্বরূপ, কারণ, 'যুথিয়ান' সংস্কৃত "ক্ষু" (পৃথিবী) ও "স্থান" হইতে উদ্ভূত, ইহা পণ্ডিতদিগের মত।

৯। সেং-কিয়া-লান। উইলসন সাহে-বের মতে এই নাম সংস্কৃত "সঙ্গালয়" হইতে গৃহীত।

১০। কিউ-মা-তি। পণ্ডিতবর রেমুসাৎ বলেন যে এই নাম সংস্কৃত "গোমতী"-র অপভ্রংশ মাত্র।

১১। এই যাত্রা-ক্রিয়ায় কোন্ বিশেষ দেবতার মূর্ত্তি যে পূজিত হয় তাহা ফাহি-য়ান লেখেন নাই। কেহ কেহ শাক্যমুনি, কেহ বা অমিতাভ বলিয়া অনুমান করেন।

১২। ফাউ-সা (Phou sa)। বুদ্ধদেব হইলে "ধর্ম্ম" ও "সঙ্ঘ" নামে দুই বোধিসত্ব। অমিতাভ হইলে "শাক্যমুনি" ও "মৈত্রেয়"। মঞ্জুশ্রী হইলে "বজ্রপানি" ও "পদ্মপাণি"। ফরাসী পণ্ডিত লাঁদ্রেস্ বলেন, জগন্নাথের রথযাত্রা বৌদ্ধদিগের যাত্রাক্রিয়ার অনুকরণ

চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ, রৌপ্য, অথবা বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রবেশদ্বার হইতে একশত পদ নগর মধ্যে অগ্রসর হইয়া সম্রাট রাজ-মুকুট ও পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন অধৌত বস্ত্র পরিধান করেন। অবশেষে দেবমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুষ্প ও ধূপ ধুনা দিয়া পূজা করেন। রথ রাজবাটির সন্নিকট হইলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত মহিলারা রাজপ্রাসাদের ছাদ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিয়া রথ ছাইয়া ফেলে। রাজ্যের চতুর্দ্দশ সঙ্গালয়ের এইরূপ অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। শুক্লপক্ষের প্রারম্ভ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান কার্য্য সমাপ্ত হইত।

'যুখিয়ান' হইতে পশ্চিমাভিমুখে পঞ্চবিংশ দিবস পরে 'সিউ-হো' তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে 'সুং লিং' (১৩) পর্ব্বত ও 'ইউ হোঙ্গ' রাজ্য অতিক্রম করিয়া এক মাসকাল পরে 'কি-ছা' (১৪) প্রদেশে উপনীত হইলেন। এ রাজ্যে অদ্যাবধি "পঞ্চায়ুষ" (১৫) নামক ধর্ম্ম-সম্মিলন-সভা আহূত হয়। বসন্তকালের মধ্যভাগে বৌদ্ধেরা দেশ বিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া একমাস কাল ধর্ম্মালোচনা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করে। এখানে ফো-দেবের একটি দন্ত ও প্রস্তরনির্ম্মিত এক পিক্‌দানি দেখিতে পাওয়া যায়। নগর বাসীরা সেই দন্তটি পূজা করিবার জন্য এক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিল।

"কি-ছা" হইতে পশ্চিমাভিমুখে চির

মাত্র। বৎসরের যে সময়ে এবং যত দিন ধরিয়া বৌদ্ধদিগের অনুষ্ঠান হইত, প্রায় ঠিক সেই সময়ে, এবং তত দিন ধরিয়া রথযাত্রা হইয়া থাকে। বুদ্ধের পার্শ্বস্থিত দুই বোধিসত্বের ন্যায় জগন্নাথদেবের দুই পার্শ্বে "সুভদ্রা" ও "বলরাম" আসীন থাকে।

" * * * * and when further bear in mind that the famous temple at Puri is supposed to stand on the site of an ancient Buddhist chaitya ; and the annual festival is accompanied by that singular anomaly, the *suspension of all caste* for the time being ; and lastly, that the image contains the supposed relics of Krishna, feature entirely abhorent from Hinduism, but is eminently characterestic of Buddhism."

১৩। চীনদেশীয় ভূগোলতাত্বিকদিগের মতে এই পর্ব্বত হিমাচল হইতে নির্গত হইয়া উত্তর দিকে প্রধাবিত হইয়াছে।

১৪। 'কি-ছা' সুং লিং পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। কানিংহাম বলেন যে 'কাশ' নামক একজাতি সিন্ধুনদীর উপকূলে একবার মাত্র ভ্রমণ করিয়াছিল। বাবরও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিব্বতবাসীরা অদ্যাবধি কাশ্মীরকে " খা-ছাল " বলিয়া থাকে। এইরূপ কতগুলি প্রমাণ দ্বারা পণ্ডিতেরা এই নির্ণয় করিয়াছেন যে, "কাশ" জাতি এই "কি-ছা" রাজ্যে বাস করিত, এবং এই "কিছা" রাজ্য আধুনিক "কাশ্মীর"।

১৫। "পান্‌চে-ইয়ু-সে"। অশোক রাজার রাজত্বকালে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার অনুশাসনে লিখিত আছে যে "অধর্ম্ম পরাজয়ের জন্য ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য স্বদেশে এবং প্রত্যেক পরাজিত রাজ্যমধ্যে প্রতি পঞ্চবর্ষে একটি করিয়া সম্মিলন-সভা আহূত হউক।"

তুষার মণ্ডিত সুং-লিং পর্ব্বত পুনরায় এক মাস কাল ধরিয়া অতিক্রম করিয়া ফা-হিয়ান্ অবশেষে ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পদার্পণ করিলেন। এইস্থলে "থো-লি" (১৬) নগর সংস্থাপিত। ফা-হিয়ান বলেন যে এই নগরে অতি পুরাকালে একটি "অর্হণ" (১৭) বাস করিত। সে তাহার অমানুষিক শক্তিবলে মৈত্রেয়ের আকৃতি ও গঠন পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ইহ-লোকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার কাষ্ঠমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য এক ভাস্করকে স্বর্গের "তুষিত" (১৮) ভবনে প্রেরণ করেন। এই পঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ মূর্ত্তি বুদ্ধদিগের প্রতি উৎসব দিনে দীপমালা দ্বারা আলোকিত হইত। ইহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে।

তীর্থস্থান দর্শন মানসে চীনরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে ফা-হিয়ানকে কতশত কষ্ট মস্তকে বহন করিয়া—কত পর্ব্বত, মরু ও নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। গণনা করিয়া দেখা যায় তিনি পদব্রজে একশত সত্তর দিবস ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সিন্ধুতটে উপনীত হন। তাঁহার লিখিত ভারতবর্ষের তীর্থস্থানের বিবরণ দ্বিতীয় প্রস্তাবে সবিস্তারে বর্ণনা করিব।

ক্রমশঃ।

স, প্র, গ।

ফুলের মালা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজ প্রাসাদ মধ্যে কল্পনার এক সখী বীণা, প্রাসাদের বাহিরে এক সখী পুষ্পবতী। পুষ্পবতী মন্ত্রী নারায়ণের স্ত্রী। পুষ্পবতী কল্পনার জুড়াইবার দ্বিতীয় স্থান। পুষ্পবতী প্রায়ই কল্পনার নিকট আসিতেন, কখনো কখনো রাজকন্যাও তাঁহার বা-

১৬। হিয়ান সাঙ্ ইহার অবস্থানের বিষয় কিছু লিখেন নাই, ফা-হিয়ানের ন্যায় নামটির উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। উইলসন সাহেব বলেন যে ইহা আধুনিক "দর্দ" প্রদেশ, সিন্ধুনদীর উৎপত্তি স্থলে অবস্থিত।

১৭। আ-লো-হন, বৌদ্ধদিগের মতে যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতাবলে ধর্ম্মের চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হইয়া অন্যকে সেই পথে লইয়া যাইতে ক্ষমতাবান্ হন তিনিই এই উপাধির যোগ্য পুরুষ। ইহা সংস্কৃত "অর্হণ" (পূজ্য) শব্দ হইতে উদ্ভূত। উক্ত অর্হনকে হিয়ান সাঙ্ "মো-থিয়ান-তি-কিয়া" (মধ্যান্থিকা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮। তিউ-সাও-থো। বিষ্ণুর 'কাম বচরা' নামক স্বর্গের অষ্টভবনের মধ্যে ইহা তৃতীয়; যথা, চতুর্মহারাজ-কায়িকা,ত্রয়স্ত্রিংশা, তুষিতা, যমা, নির্ম্মাণবতী, পরনির্ম্মিতা-বাসবর্ত্তী। (Trans: roy: As: soc: Vol1I: p. 233 234) কথিত আছে মৈত্রেয় শাক্যমুনির ধর্ম্মপ্রচারকালে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে পৃথিবীতে আগমনের পূর্ব্বে এই তুষিত ভবনে বাস করিতেন।

টীতে যাইতেন। আশ্চর্য্য এই তাহাতে মহারাণী রাজকীয় মানের কিছুমাত্র হানি হইতে দেখিতেন না—কিন্তু অন্য সভাসদ-পত্নীর বাড়ী যাওয়া দূরে থাক কাহারো সহিত যদি রাজকন্যা বন্ধুর ন্যায় সমান ভাবে কথা কহিতেন তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ বাধিয়া যাইত, রাজার মান ভাণ্ডারের সে ক্ষতির আর কোন কালে কিছুতে পূরণ সম্ভাবনা থাকিত না। এ সম্বন্ধে নারায়ণ বর্জ্জিত বিধির মধ্যে গণ্য ছিলেন।

রাজকন্যা পুষ্পবতীর নিকট মনের কথা সমস্তই বলিতেন, সোমনাথের পত্র পাইয়া যতক্ষণ তাহাকে না দেখাইতে পারিলেন ততক্ষণ মন তৃপ্ত হইল না, তিনি পুষ্পবতীকে পত্রে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

প্রাতঃকাল, পত্রখানি হাতে করিয়া কল্পনা পালঙ্কে শুইয়া আছেন। রাত্রি হইতে কতবার যে পত্রখানি পড়িয়াছেন, ঠিক নাই, তথাপি পড়া শেষ হয় নাই, এইবার বোধ হয় সহস্রবার হইবে। কল্পনা পড়িতে লাগিলেন।

"কল্পনা, বাল্যসখি, হৃদয়রাণি, এত "দিন পত্র না পাইয়া না জানি তুমি কি "ভাবিতেছ! আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া কতই "অভিমান করিতেছ, আমি যেন তোমার "অভিমানের সেই বিষণ্ণ মুখ খানি মনশ্চক্ষে "স্পষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু সকল শুনিলে, "বুঝিতে পারিবে আমার কোন দোষ নাই। "আমরা যে দিন হরিহরপুরের নিকট আ-"সিয়া পড়িলাম সেই দিন সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত "ঝড় আরম্ভ হইল, সেই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে "পথহারা হইয়া আমি একটি বন মধ্যে "আসিয়া পড়িলাম।

"যে রামরায়ের বিদ্রোহ দমন করিতে "আসিতেছিলাম—বন মধ্যে তাহারি সেনা-"দলের ভিতর পড়িয়া বন্দী হইলাম। বন্দী "হইলাম শুনিয়া ভয় পাইও না, আমি এখন "আর বন্দী নাই। রামরায় অতি মহান-"চেতা। রামরায়ের শত্রু হইয়া আসিয়া তা-"হার সহিত এখন সখ্যতা-ডোরে আবদ্ধ "হইয়াছি, রামরায় এখন আমার পরম বন্ধু। "রামরায় যে নিরপরাধ তাহার আর সন্দেহ "নাই, বিনা দোষে মহারাজ তাহার প্রাণ-"দণ্ড করিতে গিয়াছিলেন, বিদ্রোহী হওয়া "ভিন্ন রামরায়ের আর উপায় ছিল না।

"মহারাজ যদি তাহাকে মার্জ্জনা করেন "ত তিনি এখনো মহারাজের অনুগত ভৃত্য। "নিরপরাধ জানিলে যে মহারাজ তাহাকে "মার্জ্জনা করিবেন তাহাতেও আমার সন্দেহ "নাই। তবে ক্ষমা না করিলেও, রামরায় "কথা দিয়াছেন আর বিদ্রোহাচরণ করি-"বেন না, আমিও তাঁহাকে আশ্বাস "দিয়াছি, মহারাজের মার্জ্জনা চাহিয়া "দিব। তবে ক্ষমা না করিলেও আমি রাম-"রায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না। মহারাজকে "এই বিষয় খুলিয়া এক খান পত্র লিখিলাম, "তাহার উত্তর পাওয়া পর্য্যন্ত এইখানে অ-"পেক্ষা করিব, উত্তর পাইলেই সেই খানে "গিয়া তোমার চাঁদ মুখখানি দেখিব, তো-"মাকে রাজ্যেশ্বরী করিয়া চিরজীবনের অতৃপ্ত "বাসনা পূর্ণ করিব—তোমারি সোমনাথ—

"পুঃ একটি গল্প করি শোন, রামরায়ের

"একটি সুন্দরী ভগিনী আছেন, তিনি আ-"মার প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন। অতিথিসৎকা-"রের নিমিত্ত যে ভদ্রতা আবশ্যক তাহা "লঙ্ঘন করিয়াও তিনি আমাদের আহারের "সময় প্রথম কিছু দিন দূরে দূরে থাকিতেন। "রামরায়ের একান্ত অনুরোধে যদিই বা "সদয় হইয়া শেষে দেখা দিলেন, ত প্রথম "সাক্ষাতে যেরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন, "তাহাতে আমার অন্তরাত্মা একেবারে শী-"তল হইয়া গেল। এমন গর্ব্বময় এমন তা-"চ্ছিল্যময় ভাব আমি আর কখনো দেখি "নাই, তিনি যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া নরা-"ধম আমার সহিত দু একটি কথা কহিয়া "দারুণ বাধিত করিয়া রাখিলেন। অপরা-"ধের মধ্যে কি কথা কহিব ভাবিয়া না পা-"ইয়া আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কল্পনার সহিত আপনার আলাপ আছে" "তিনি ক্ষুরের ধারে উত্তর করিলেন রাজ-"পরিবারের সহিত ক্ষুদ্র লোকের কি আ-"লাপ সম্ভবে?, সম্ভব হইলেও অতদূর সাহস "করিতাম না 'আমি থতমত খাইয়া বলি-"লাম" না, না কল্পনা অতি সরলা, রাজ-"বংশের অহঙ্কার তাহাতে নাই—'স্নেহ-"লতার মুখে ব্যঙ্গের ভ্রুভঙ্গী প্রকটিত হইল "তিনি বলিলেন—তিনি বুঝি আপনার "ভাবী রাণী হইবেন—কথার অর্থ এই—"সেই জন্যই আমি যেন তোমার অহঙ্কার "দেখিতে পাই না। আমি আর কথা কহি-"লাম না, তোমাকে লইয়া ওরূপ নাড়াচাড়া "আমার সহ্য হইল না। আমার মনে হইল "স্নেহলতা কোন কারণে যেন তোমার প্রতি "ঈষৎ বিমুখ। তাহা না মনে হইলে তাহার "সেই গর্ব্বময় ধরণ ধারণ দেখিয়াও অভ্যস্ত "তাচ্ছিল্য ভাব পাইয়াও আমি তাহাকে "ভাল বাসিতে পারিতাম—তাহার মুখে এমন "একটি বুদ্ধির প্রভাব—এমন একটি তেজ-"স্বী সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত যে তাহার প্রতি "কাহারো যত্ন করিয়া ভালবাসা টানিয়া আ-"নিতে হয় না। হয় তো তাহার সেই গর্ব্বময় "ভাবের জন্যই তাহাকে আমার ভাল "লাগিত। অবশ্য এ ভালবাসা আমার "কল্পনার ভালবাসার মত নহে, সখ্যতার "ভালবাসার কথা বলিতেছি।" (এই খানটি পড়িয়া কল্পনার হাসি আসিল—এত টীকা করিবার আবশ্যক কি? কল্পনার তো কই মুহূর্ত্তের জন্যও ওরূপ সন্দেহ হয় নাই, এত সহজে সে সোমনাথের ভালবাসায় যে দিন অবিশ্বাস করিবে—সে দিন এ জীবন আর রাখিবে না।)

'আমি কথা আর না কহিয়া তাহাকে "নিস্তব্ধে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, তো-"মার সেই সরল সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার "সেই গর্ব্বময় সৌন্দর্য্যের প্রভেদ অনুভব "করিতে লাগিলাম।" (এই স্থানটি পড়িয়া কল্পনার একটু দুঃখ হইল—যুবরাজ সৌন্দর্য্য লইয়া কল্পনার সহিত অন্যের কি করিয়া তুলনা করিতে গেলেন! তাহা কেমন করিয়া পারিলেন। তাহাতে যে কি দোষ—তাহাতে যে দুঃখ হইবার কি কারণ তাহা কল্পনা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না—অথচ তাহার দুঃখ হইল।)

"সেই দিন হইতে স্নেহলতাকে দেখিলে

"আমিও তাচ্ছিল্য ভাব ফিরাইয়া দিই। "তাহার দেখার যে আমি প্রত্যাশী নহি, "তাহার অনুগ্রহ যে আমাকে নিতান্ত "বাধিত করে না—তাহা এখন বোধ হয় "তিনি বুঝিয়াছেন।" কাহার পায়ের শব্দ হইল—কল্পনা তাড়াতাড়ি পত্র খানি বক্ষে লুকাইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পুষ্পবতী চঞ্চলপদে গৃহে প্রবেশ করিলেন, পালঙ্কের নিকট আসিয়া দুম করিয়া কল্পনার নিকট বসিলেন, বসিয়াই ক্ষীণা কল্পনার গাত্রের উপর পড়িয়া দুই বাহু দিয়া তাহাকে টিপিয়া ধরিলেন। আদরের আতিশয্যে কল্পনা শশব্যস্ত হইয়া সহাস্যে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পুষ্পবতী উচ্চহাস্য করিতে করিতে হাত ছাড়িয়া দিলেন। পুষ্পবতীর মুখখানি পুষ্পের ন্যায় ঢলঢল, প্রেমময় ভাবপূর্ণ। পুষ্পবতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী। তাঁহার বর্ণ গৌর না হইয়াও অতি সুন্দর অতি লাবণ্যশালী। পুষ্পবতী দোহারা হৃষ্টপুষ্ট, কল্পনা ক্ষীণা, দুজনে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে লতাবদ্ধ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পায়। পুষ্পবতীর হাতে কল্পনা সোমনাথের পত্র খানি দিলেন; পুষ্পবতী ঔৎসুক্যের সহিত পত্রখানি পড়িতে লাগিলন, শেষ হইলে হাসিয়া বলিলেন—

"আর দেখিতেছ কি? সোমনাথ যাহাই বলুন লক্ষণ বড় ভাল নহে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, যুবরাজ তোমাকে যে ভালবাসেন—বুঝিবা রাজবংশের লক্ষণ তিনি রাখিলেন না—তাহা হইল না—সপত্নী তোমার ভাগ্যে জুটিল বলে!" কল্পনার হৃদয় আজ প্রফুল্ল, তাহার অন্ধকার ভবিষ্যতে আবার জ্যোতিষ্মান হইতে চলিয়াছে। বিনা কষ্টে বিনা যুদ্ধে হরিহরপুরের বিদ্রোহ দমন হইয়া গিয়াছে, যুবরাজ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছেন, কল্পনা যাহা স্বপ্নেও আশা করে নাই তাহাই হইয়াছে—কল্পনার উৎফুল্ল হৃদয় আজ সকল বিষয়েই সুখী হইতে উন্মুখ, পুষ্পবতীর সেই উপহাসও তাহার ভাল লাগিল, কল্পনা সহাস্যে বলিলেন" না হয় সতীন হইল—তাতে আর ভয় কি!"

পুষ্প। ও কাষ্ঠ হাসি রাখিয়া দেও সব বিষয়ে দাতব্যগিরি করা যায়—কেবল ঐটি ছাড়া—স্বামী কাউকে প্রাণ থাকিতে দেওয়া যায় না।"

কল্পনা। "কেন তুমি যে কথায় কথায় যাকে তাকে স্বামী উপহার দিতে চাও।"

পুষ্পবতী। সে কি ভাই প্রাণ থেকে? সে মুখের কথা। আমার স্বামী আমার মুটোর মধ্যে, আমার উপর তাঁর ভালবাসা অটল, এরূপ জায়গায় তাঁকে যদি কেউ ভালবাসে—তাতে আমার রাগই বা কেন হবে, কষ্টই বা কেন হবে, কেনই বা তাকে আমি স্বামী উপহার দিতে চাবনা—একটি সুখের গর্ব্বে পুষ্পবতীর চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল—হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আবার বলিলেন—আমার শ্যামচাঁদ ভাই, কি মন্ত্র জানেন, তা নলেই যে দেখে সেই মোহিত হয়!

পুষ্পবতীর এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। এই জন্য অনেকের নিকট তিনি হাস্যাস্পদ হইতেন, তথাপি তাঁহার সে বিশ্বাস টলে নাই। কল্পনা হাসি চাপিয়া বলিলেন "আবার কে নারায়ণকে দেখিয়া হৃদয় হারাইল। পুষ্পবতী বলিলেন "সে দিন দীনু দিদি বোনপোর একটি কাজের জন্য আমার কাছে আসিয়াছিলেন স্বামীর সহিত দেখা শুনা কথাবার্ত্তা হইল তাহার পর স্বামীর সুখ্যাতি তাঁহার আর মুখে ধরে না—শত মুখ হইলেও সুখ্যাত করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না।"

কল্পনা। "কিন্তু সুখ্যাতি করাই কি হৃদয় হারাইবার প্রমাণ? তোমার কথা শুনিলে যে ভয় করে—"

পুষ্প। "এ কি ভাই এমন তেমন সুখ্যাতি, বুকে কাঁটা না ফুটলে সে সুখ্যাতি বার হয় না—"

কল্পনা। তোমার মুখে আগুন, আর দীন দিদির তোমার মরণ দশা—তাই তোমার স্বামীর সুখ্যাতি করেন—"

পুষ্প। "তুই তো ভাই বলিলি মুখে আগুন, স্বামীকে যখন এই সব কথা বলি তিনি যে ভাই আমার মুখে ফুল চন্দন দেন।"

কল্পনা। "স্বামীকে বুঝি আবার ঐ সব বলিতে যাস—"

পুষ্প। "বলিবনা! শ্যামচাঁদকে সব না বলিলে চলে! কিরূপে কে তাঁহার কি সুখ্যাতি করিয়াছে, কাহার কি কথায় গাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এই সব শুনিতে স্বামী যেরূপ উন্মত্ত হন, তাহাতে আমার বড়ই মজা লাগে। আমি এক গুণ হইলে দশ গুণ বাড়াইয়া বলিতে ছাড়ি না—"

কল্পনা। "যদি তোমার স্বামীর হৃদয় অটল থাকে, তাহা হইলে তিনি অন্যের অনুরাগের কথায় বিরক্ত না হইয়া সন্তুষ্ট হন কেন?"

পুষ্পবতী। "রাজকন্যা তুমি কি নিতান্ত ছেলেমানুষ, তুমি এইটুকু বোঝ না! স্বামী অন্যকে না ভাল বাসিলেও—অন্য কেহ তাঁহাকে ভাল বাসিলে সুখী হইবেন না কেন? আমার বোধ হয় পুরুষ মাত্রেরই এই দুর্ব্বলতা টুকু আছে"

কল্পনার হাসি আসিল পুষ্পবতী স্বামীর দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইতেছেন—কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতায় অন্ধ। কল্পনা বলিলেন "তোমার স্বামীর ভালবাসার প্রতি যেমন তোমার অচল বিশ্বাস যুবরাজের প্রতিও আমার তেমনি অটল বিশ্বাস। আমার সতীন হইবার ভয় তোর করিতে হইবে না।" পুষ্পবতী কি উত্তর দিতে গেলেন—আর বলা হইল না—লাবণ্য গৃহে প্রবেশ করিল। "কল্পনা বলিলেন "কি লাবণ্য এ সময়ে যে? মা কোথা?"

লাবণ্য দিদির কাছে আসিয়া গলা জড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "মা—ভাই কোথায় গিয়াছেন, অনেকক্ষণ দেখিতে পাই নাই, পালাইয়া আসিয়াছি। এই যে পুষ্পবতী, মন্ত্রীজির খবর কি—"

পুষ্প। "খবর আর বিশেষ কি—"

লাবণ্য। "এখন রাত্রে কি পগ্‌গ মাথা হতে নামে!"

পুষ্প। "তুই ভাই কি আর সেই এক কথা চিরকালই বলবি?"

লাবণ্য। "তোর অমন সুপুরুষ সুন্দর স্বামী নানা রূপ সাজে কোথা দেখবি—তা না—সারাদিনই পাগড়ি-আঁটা মুখ দেখতে হয়, তোর দুঃখে দুঃখী হয়েই বল্‌ছি, বলি শ্লোক আওড়ান তাঁর একটু কমেছ কি?" লাবণ্য হাসিতে হাসিতে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—পুষ্পবতীও হাসিয়া বলিলেন—'কমতে যাবে কেন, বেড়েছে কি না জিজ্ঞাসা কর, ও যে কবির লক্ষণ!" লাবণ্য "বেড়েছে, তবে ভাল, এবার কবির পদটাও দেখছি পিতা কোন্ দিন মন্ত্রীকে দিয়ে বলেন। সে যা হক দিদি শুনিলাম সোম নাথের নাকি পত্র পেয়েছ? বেশ আমাকে দেখাইলে না!" কল্পনা বলিলেন "তোকে কখন দেখাই বল—এই দ্যাখ।" কল্পনা না দিতে দিতে লাবণ্য হাত হইতে টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে হর্ষের ভাবে লাবণ্যের মুখখানি ফুটিয়া উঠিল। লাবণ্য বলিল "দিদি সোমনাথ লিখিয়াছেন রামরায় নির্দ্দোষী—দেখিলেত? পিতা মিছামিছি তাহার কি গুরুদণ্ডই আজ্ঞা দিয়াছিলেন—এখন তাহা বুঝিতে পারিবেন।" কি একটি ভাবে লাবণ্যের হৃদয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল সে আর অধিকক্ষণ এখানে রহিল না, পত্র খানি পড়া হইবা মাত্র তাহা পালঙ্গে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া সে গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নারায়ণের বয়স পঞ্চত্রিংশের কিছু এ দিক ও দিক। মুখশ্রী মন্দ নহে, চক্ষু বিলাস ভাব পূর্ণ, নাসিকা শুকচঞ্চুর ন্যায় বঙ্কিম, ওষ্ঠাধর চিবুক কপোল কিছুই মুখের সহিত বেমানান নহে, কপাল ও মস্তকের কাছেই কিছু গোলযোগ। নারায়ণের মুখে কপাল বলিয়া একটা কিছু নাই বলিলেই হয়। স্থূল কৃষ্ণবর্ণ ভ্রুযুগের উপরে অল্প স্থান আছে বটে, কিন্তু তাহা ভ্রু হইতে উঠিতে না উঠিতে হঠাৎ এত হটিয়া পড়িয়াছে যে সে কপাল চিনিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। নারায়ণের অতি ক্ষুদ্র কামান" মস্তক উচ্চনীচ নানা রূপ পাহাড় পর্ব্বতে শোভিত। সেই জন্যই বোধ করি নাপিত ছাড়া তাঁহার পাগ্‌ড়িহীন মুখশ্রী দেখা আর কাহারো ভাগ্যে কখনো ঘটিয়া উঠে নাই। দাক্ষিণাত্যে সাধারণের মধ্যে পাগড়ি পরা একটি চলিত রীতি বটে, কিন্তু নারায়ণ সে সম্বন্ধে অন্য সকলকেই হারাইয়াছিলেন। রাত্রে শয়ন কালেও মন্ত্রীর পাগ্‌ড়িটি নারায়ণের মাথা হইতে নামে না বলিয়া অনেকেই সন্দেহ করিত। কেবল বাল্যকালে লাবণ্য হঠাৎ এক দিন তাঁহার পাগড়িটি খুলিয়া দিয়াছিল, সেই দিন অনেকে তাঁহার মাথার ব্যাপারটি জানিয়া ফেলে সেই ঘটনাটিতে মন্ত্রী মহাশয় এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেত যে সে বলিবার নহে। লাবণ্যের সে গুরুতর অপরাধ এ পর্য্যন্ত তিনি ভুলিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু আরণ্য নরের ন্যায় তাঁহার সেই

বিষম মস্তক, দৃষ্টির অগম্য সেই ক্ষুদ্র কপাল, পুষ্পবতীর চোখে বড়ই ভাল লাগিত, বিশেষ তাহার ভিতরেই তিনি একটি অতি লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। সেই জন্যই নারায়ণের মুখ খানি যেন অধিক সুশ্রী দেখাইত। বিশেষ, যমুনা অন্নপূর্ণা প্রভৃতি সুন্দরীগণ কেহ স্বামীর কেহ ভ্রাতার কেহ আত্মীয় কাহারো কোন কাজের দরকারে আসিয়া পুষ্পবতীর নিকট নারায়ণের উষ্ণীষাবদ্ধ সুশ্রী মস্তক ও ক্ষুদ্র কপালের প্রশংসাতেই দিন কাটাইতেন। বাস্তবিক প্রেম অন্ধ বলিয়া, কিম্বা তাহার দিব্য চক্ষুর গুণে পুষ্পবতী কেন নারায়ণের কপালে ও মস্তকেই মত সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তাহা বলিতে পারি না। পুষ্পবতীই যখন ভাল দেখিতেন, তখন সখীদের আর কি, তাহাদের তো আর তাহাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে হইবে না, তাহারা পুষ্পবতীর কথায় আর কথা কহিত না, মনে মনে যদিও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। নারায়ণ দীর্ঘাকৃতি কিন্তু স্থূলকায়। স্ফীত উদরে মন্ত্রীর পোষাকটি যেমন শোভা পাইয়াছিল, ক্ষুদ্র মস্তকে দিব্য দিক্‌গজ পাগড়িরও কম বাহার হয় নাই।

নারায়ণ শয়নকক্ষে আসিয়া, পুষ্পবতীকে দেখিতে পাইলেন না, জানিতেন তিনি রাজবাটী গিয়াছেন তবুও গৃহে আসিয়া অভ্যাসবশতঃ পুষ্প পুষ্প করিয়া দু এক বার ডাকিলেন। পুষ্প আসিল না, কি করেন—আপনিই মন্ত্রীর পরিচ্ছদ খুলিয়া অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় লেখা পড়া প্রভৃতি বুদ্ধির কার্য্য ছাড়া অন্য কার্য্য করিতে এত নারাজ যে পরিচ্ছদটি খুলিয়া লইবার জন্যও তাহার পুষ্পবতীকে আবশ্যক হইত।

এইখানে শয়ন কক্ষটির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কক্ষটি না বড় না ছোট, সমস্ত দেয়ালে দেব দেবীদিগের প্রতিমূর্ত্তি, একপাশে একখানি পালঙ্ক, প্রস্তরের মেজ্যায় আবার আর একটি শয্যা, সেই শয্যার শিয়রে রৌপ্যদণ্ডোপরি রৌপ্য দীপ। পালঙ্কে, শয্যায়, গৃহের প্রতি কোলঙ্গায় বেদ পুরাণ-কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের ছড়াছড়ি। নারায়ণ যে একজন মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত এই কক্ষ হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বস্ত্রাদি ছাড়িয়া আরো কতকগুলি পুস্তক লইয়া, নীচের বিছানায় ফেলিলেন, তাহার পর উচ্চ বালিসে মস্তক রাখিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। বুকের উপর শকুন্তলা, গৃহে কেহ আসিলেই মনে করিত নারায়ণ পড়িতেই ব্যস্ত—কিন্তু দুঃখের মধ্যে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত। এই অবস্থায় পুষ্পবতী রাজবাটী হইতে গৃহে আগমন করিলেন, স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া শ্যামচাঁদ শ্যামচাঁদ করিয়া দুই একবার ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। তখন মস্তক হইতে উষ্ণীষটি খুলিয়া দিলেন তবুও মন্ত্রীর সাড়া নাই। গৃহের একটি কোলঙ্গাতে কতকগুলা আবির পড়িয়াছিল উঠিয়া দুই হস্তে তাহা মাখিলেন, মাখা হইলে সেই হাতে স্বামীর চোখ টিপিয়া ধরিলেন। মন্ত্রী

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন, উঠিয়াই মস্তকে হাত পড়িল ব্যাকুল ভাবে পাগড়ীর জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন কোথাও দেখিতে পাইলেন না, বুঝিলেন পুষ্পবতী কোথায় লুকাইয়াছে সহজে পাইবার নয়, হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পুষ্পবতি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। মন্ত্রী বলিলেন—"তুমি কখন আসিলে? আমি শকুন্তলা পড়িতে পড়িতে এত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তুমি কখন প্রবেশ করিয়াছ জানিতেই পারি নাই। যেখানে নবপ্রেমোন্মত্তা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছেন না, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধিবার ভান করিয়া চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িতেছেন, সেই স্থানটিতে আসিয়া শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমারো হৃদয় পাগল হইয়া উঠিয়াছে সেই সময় তুমি আমার সেই মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিলে—" পুষ্পবতী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "শ্যামচাঁদ মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়াছি—আসল নিদ্রাতো নয়!"

নারায়ণ আবার শকুন্তলার সেই দৃশ্যটি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিয়াছে, মাথা নাড়ার বিরাম নাই, তিনি ভাবে অভিভূত হইয়া বলিলেন "আহাহা কি সুন্দর! কেবল সুন্দর বলিলেও ঠিক বলা হয় না, কি মোহময়! কি উন্মত্তকর! কালিদাস কবিতা, নবংবয়ঃ মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ ঐণমাংসমবলাচ কোমলা সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি"।

পুষ্পবতী বলিলেন—এখন তোমার শ্লোক আওড়ান ছেড়ে রাজকন্যাদের গল্প শুনিবে—"

"নারায়ণ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন 'রাজকন্যাদের কথা? শুনিব বই কি! তাঁহারা আমার কথা কিছু বলিলেন?

পুষ্পবতী হাসিয়া বলিলেন—"বলিলেন না, কত বলিলেন, বিশেষতঃ ছোট রাজকন্যার মুখে ত আর তোমার কথা ধরে না—"

আহ্লাদে নারায়ণের সমস্ত দন্তপাটি বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষু ঢুলিয়া পড়িল, বুকের ভিতরে কেমন কম্প দিয়া উঠিল। পুষ্প স্বামীর চিবুক ধরিয়া সোহাগ ভরে বলিলেন "অত আহ্লাদ কেন?" মন্ত্রী বলিলেন "রাজকন্যাদের অনুগ্রহ তুমি কি সামান্য কথা ভাবিলে"।

পুষ্প। "কেন বাজে প্রশংসায় বুঝি আশ মিটিয়া গিয়াছে, এখন আরো উচুঁতে সাধ?"

নারা। "সে যাক্, তোমরা সমস্তক্ষণ কি করিলে—তার গল্প কর। জান ত সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বেফলে অমৃতোপমে কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ।" বাহির হইতে একজন দাসী পুষ্পবতীকে ডাকিল পুষ্পবতী গমন করিলেন মন্ত্রী বলিলেন, "পুষ্প আর তামাসা না, পাগড়ি আনিতে ভুলিও না কেহ আসিয়া পড়িবে।"

মহারাণীর দাসী যমুনা আসিয়াছিল—তাই দাসী পুষ্পবতীকে ডাকিল। যমুনাকে লইয়া পাগড়ি হস্তে পুষ্পবতী শয়ন কক্ষে আবার প্রবেশ করিলেন। যমুনাকে দেখিয়া মন্ত্রী

মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কলেকর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল, যমুনা তাহাকে বিনা পাগড়িতে দেখিয়া ফেলিয়াছে। ক্রোধ দমন করিয়া ত্রস্তে উঠিয়া তিনি পুষ্পবতীর হস্ত হইতে পাগড়ি লইয়া শিরে ধারণ করিলেন, আবিরাক্ত লালমুখে লাল পাগড়ীর বড় শোভা হইল। পুষ্পবতী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন,যমুনারো হাসি সামলান দায় হইল। মন্ত্রী মহাশয় বড় ফাঁফরে পড়িলেন, অত হাসির মধ্যে না হাসিলেই বা কেমন দেখায়, অথচ হাসিই বা আসে কি করিয়া! তিনি মনে মনে স্ত্রীকে অভিশম্পাৎ দিতে দিতে দারুণ যত্নে সুদৃশ্য দন্তপাটির মধ্য দিয়া হাসির ধ্বনি বাহির করিলেন। যমুনা আর থাকিতে পারিল না বলিল 'ঠাকুর, মুখের ও চেহারা কে করিল?" পুষ্পবতী হাসিতে হাসিতে একখানি আয়না আনিয়া সমুখে ধরিলেন, মন্ত্রী শ্যামমুখে লালবর্ণের শোভা দেখিতে পাইলেন। কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া আবির ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন, "একি করিয়াছ পুষ্পবতী, এ তোমারি কাজ।"

যমুনা বলিল—ছোট রাজকন্যার জ্বর হইয়াছে, মহারাণী আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন শীঘ্র চলুন—"

নারায়ণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নারায়ণ সরস্বতীর বরপুত্র। বেদ পুরাণ কাব্য মহাকাব্য তাঁহার কণ্ঠস্থ। তিনি সকল বিদ্যাতেই পণ্ডিত, চিকিৎসা বিদ্যাতেই বা কেননা হইবেন। তাঁহার বিশ্বাস তিনি চিকিৎসকদিগকে এক হাটে কিনিয়া আর এক হাটে বিক্রয় করিয়া আসিতে পারেন, রাণীরও সেই বিশ্বাস।

লাবণ্য পালঙ্গে শয়ান। ভবানী লক্ষ্মী প্রভৃতি দাসীগণ পদপার্শ্বে উপবিষ্ট এই সময় লাবণ্যকে দেখিতে নারায়ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণকে দেখিলেই লাবণ্যের বড় হাসি পাইত। তাঁহার স্ফীত উদরে সেই মন্ত্রীর সাজ, হেলিয়া দুলিয়া চলার সেই ধরণ, চক্ষুর সেই ঢুলু-ঢুলু ভাব, ভ্রু আবরিত সেই উষ্ণীষের বাহার, কথার সেই অনুপ্রাসছটা, শ্লোক আওড়াইবার সেই ভঙ্গী, সকলেতেই লাবণ্যের হাসি উথলিয়া উঠিল। দূর হইতে নারায়ণকে হেলিয়া দুলিয়া আসিতে দেখিয়াই লাবণ্য হাসিতে আরম্ভ করিল, দাসীদের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল "ঐদেখ আমি যা বলিতেছিলাম ঠিক কিনা। ঐ চলন দেখে মানুষ কি না হেসে থাকতে পারে।" নারায়ণ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন—লাবণ্য চুপ করিল। লাবণ্যের নিকট পালঙ্গে দুই একখানি বই পড়িয়াছিল নারায়ণের প্রথমেই তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল বলিলেন "বিষাধার অসার সংসার বিষবৃক্ষে কাব্যই অমৃত সার ইহা শাস্ত্রের উক্তি সত্য কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলে অধিক পাঠ স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব হানিপ্রদ। তা—কি পড়িতে ছিলেন?" মন্ত্রীর অনুপ্রাস ছটার প্রাচুর্য্যে লাবণ্যের হাসি রাখা দুষ্কর

হইল, অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন—"রত্নাবলী।"

কল্পনার কোমল সরল বালিকামূর্ত্তিতেও যে একটি লুক্কায়িত গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত তাহাতে তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইতে নারায়ণ প্রতিপদে থমকিয়া দাঁড়াইতেন একটি কথা কহিতেও যেন সাহস হইত না, কিন্তু বালিকা লাবণ্যের নিকট আপন কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়া পাণ্ডিত্যের ছড়াছড়ি করিয়া সে খেদ মিটাইতেন। এখন যোগ্য অবসর দেখিয়া নারায়ণ বলিলেন—

"নব প্রস্ফুটিতহৃদয়া রত্নাবলী প্রেম লুকাইয়া কিরূপ দাবানল দগ্ধ হইতেছেন তাহাত পড়িয়াছেন, আহা কি স্বর্গীয় ভাব! এরূপ ভাব পৃথিবীতে নাই, উহা কবি কল্পনামাত্র—" লাবণ্য ধীরে ধীরে বলিলেন "কে বলিল পৃথিবীতে নাই? কত হতভাগ্য স্ত্রীলোক রত্নাবলী হইতেও অধিক ভালবাসিয়া, সেই উচ্ছ্বাস হৃদয় মধ্যেই চিরকাল লুকাইয়া রাখে।" এই কথায় আহ্লাদে নারায়ণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কত কথা তাঁহার হৃদয় দিয়া বহিয়া গেল। গর্ব্বের আতিশয্যে কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া মন্ত্রী বলিলেন "হাত দিন। তদেবযুক্তং ভৈষয্যং যদারোগ্যায় কল্পতে, সচৈবভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যঃ যঃ প্রমোচয়েৎ" আর লাবণ্য থাকিতে পারিলেন না, শ্লোক আওড়াইবার সেই ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিলেন।

মন্ত্রি কহিলেন, "এত হাসি কিসের—আমিত আর বিদূষক নই যে আমাকে দেখিলেই আপনার হাসি আসিবে?"

হাসির উচ্ছ্বাস থামাইয়া লাবণ্য বলিল বাস্তবিক আপনাকে দেখিলেই আমার হাসি পায়।

মন্ত্রী হাতদেখা ভুলিয়া গেলেন। মন্ত্রীকে দেখিয়া রাজ কন্যার হাসি আসে এ কি সামান্য প্রশংসার কথা। আহ্লাদে নেত্র মুদ্রিত হইয়া পড়িল। নাড়ীটেপা দীর্ঘস্থায়ী। ভবানী ভীত হইয়া বলিল "নাড়ী কিরূপ"! নারায়ণের হুঁস হইল, বলিলেন "নাড়ি ঈষৎ চঞ্চল আছে, ঔষধ যাহা চলিতেছে, তাহাই চলুক, বদলাইবার আবশ্যক নাই। চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তানাম গরীয়সী, চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি সজীবং"।

রোগী দেখিয়া নারায়ণ চলিয়া গেলেন। লাবণ্য মনের সাধে উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া বাঁচিল। কল্পনা এই সময় পুষ্পবতীর সহিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কে উত্তর দিবে সকলের হাসি আরো যেন উথলিয়া উঠিল। কল্পনাও শেষে সহানুভূতির দায়ে পড়িয়া তাহাদের হাসিতে যোগ দিলেন। শক্তিময়ী হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেই রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া, কম্পমান ওষ্ঠাধর দেখিয়া সকলের বিশেষতঃ কল্পনার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন আশু কোন বিপদ উপস্থিত। রাণী ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া কল্পনার দিকে চাহিয়া বলিলেন "স্ত্রীলোকের অত উচ্চ হাসি কি?

তোর জন্য কি রাজবাড়ীর কলঙ্ক হইবে? দূরহ এখান থেকে।"

লাবণ্য মাতার আদুরে। অন্য সকলে যেখানে রাণীর সহিত কথা কহিতে ভয়ে কাঁপিত, সেখানেও সে অসঙ্কোচে কথা কহিত। সে বলিল "না মা দিদি হাসেন নাই, আমি হাসিয়াছি।" রাণী আরো রাগিয়া বলিলেন "হাসে নাই? অবশ্য হাসিয়াছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। সে হাসি তোর কখনই না!" লাবণ্য আবার বলিল "না মা সে আমি।" এই প্রতিবাদে রাণী আরো ভীষণ হইয়া উঠিলেন বলিলেন "তুই হাসিয়াছিস? কাহার কাছে তবে তোর শিক্ষা এরূপ হইল! তোর স্বভাব কখনই অমন নহে। ঐ রাক্ষসী তোর কাছে আসিয়াই তোর ছোঁয়াচে লাগিয়াছে। ও আমার সর্ব্বনাশ করিল। দূর হইয়া যা হতভাগিনী। কতবার বারণ করিয়াও পারিলাম না, এবার এ গৃহে আসিতে দেখিলেই সর্ব্বনাশ হইবে।" কল্পনার করুণ নেত্র দুটি ছলছল করিয়া আসিল, আনত মস্তকে খাটের বাজু ধরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেখান হইতে সে চলিয়া গেল। লাবণ্যের অসুখ, লাবণ্য আর সে দিন কল্পনার কাছে যাইতে পারিল না, ভবানীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল "দিদিকে দুঃখ করিতে বারণ করিস মাতো চিরকালই এক কথা বলিয়া থাকেন, সে জন্য কি আর সত্য সত্যই আমাদের দেখা শুনা বন্ধ হইবে"।

পুনর্ম্মিলন।

কিসের হরষ কোলাহল,
শুধাই তোদের তোরা বল!
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
এমন দেখিনি কবে—এমন দেখিনি কাল
এমন দেখিনি বহু দিন।

প্রকৃতি গো, জননি গো, খেলাতেম ছেলে বেলা,
তোমার কোলের কাছে কত কি—কত কি খেলা!
দুটি ছোট ছোট হাতে তোমারে জড়ায়ে ধরে,
তোমার মুখের পানে চাহিতাম প্রাণ ভোরে!
এখনো সে মনে আছে—শীতের সকাল হলে
তাড়াতাড়ি ফুলবনে একেলা যেতেম চলে;—
নবীন রবির আলো,
সে যে কি লাগিত ভাল!

বিমল কনক সুধা যেনরে করিয়া পান,
কি জানি কি হয়ে যেত সেই বালকের প্রাণ!
প্রভাত শিশির গুলি ঘাস হতে তুলিতাম,
কপালে, কপোলে মোর ফোঁটা ফোঁটা
ফেলিতাম।
তরুণ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিত প্রাণ,
বিমল কোমল হৃদে কি যেন ঝরিত গান!
এখনো সে মনে আছে সেই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
জানালার কাছে ব'সে একেলা বিজন ঘরে,
চারিদিক স্তব্ধ হেরি কি যেন করিত প্রাণ,
যতদূর দেখা যায় চেয়ে আছে দু নয়ান।
মাঝে মাঝে সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সমুদ্রের প্রান্ত হতে,
কল্পনার তীর হতে—
সেই সমীরণ স্রোতে কি যেন আসিত ভেসে!
কত মায়া, কত পরী, উপন্যাস কত শত,
সেই বাতাসের সাথে ছিল যেন বিজড়িত!
মনে পড়ে আমাদের ছিল এক ছোট ঘর,
জাহ্নবী বহিয়া যায়, তরু করে মরমর!
আমরা দুইটি ভাই সেথায় র'য়েছি বসে,
জাহ্নবী-প্রবাহ পানে চেয়ে আছি অনিমিষে।
নিভৃত গাছের ছায়
ঝুরু ঝুরু বহে যায়,
বকুলের ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে যায়—
ঢেউ গুলি ব'হে যায়—তরীগুলি ভেসে যায়
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—সারাদিন চলে
যায়!
যেমন নদীতে ঢেউ উঠিছে পড়িছে কত,
বালক কল্পনা মনে ওঠে পড়ে কত শত!
হয়ত বরষা কাল--ঝর ঝর বারি ঝরে,
পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে;
থেকে থেকে ঝন ঝন,
ঘন বাজ বরিষণ,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি!
বহিছে পূরব বায়,
শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদ দিবা হয়েছে আঁধার মুখী!
সাধ যেত যাই ভেসে
নূতন—নূতন দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ কোথা নিয়ে যেত শেষে!
কূলে কত নিকেতন,
কত বন, উপবন,
কত গাছ, কত ছায়া, জটিল বটের মূল—
তীরে বালুকার পরে,
ছেলে মেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল!
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব,
কত দেশ, কত মুখ, কত কি দেখিতে পাব!
কোথা বালকের হাসি,
কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখীর গান!
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
মাঝী গেল গান গেয়ে,
কোথাও বা তীরে ব'সে পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
আকাশেতে ভাসে মেঘ—আকাশেতে ওড়ে
পাখী!

সেই—সেই ছেলে বেলা,
আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো—জননি গো—কেবলি তোমারি
কোলে।

তার পরে কি যে হল—কোথা যে গেলেম চলে!
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা!
সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি নাহি শশি, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক!
আমি শুধু একেলা পথিক!
তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন,
ম্রিয়মান—সুখশান্তি হীন!
আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে!
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান,
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ!
দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখী,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে!
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার পরে!
চারিদিকে বহে বায়ু,চারিদিকে ফুটে আলো,
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিক পানে চাই, চারিদিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ!

কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা
বোলে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা,
কেহ হাসে,কেহ গায়,কেহ আসে, কেহ যায়,
এ কি হেরি আনন্দের মেলা!
যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন!
ও কে হোথা গান গায়,প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কি শুনি অমিয়-বচন!
কেরে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস্ ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর,
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারি ধারে!
বুঝেছি গো বুঝেছি গো—এতদিন পরে বুঝি
ফিরে পেলে হারান' সন্তান!
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান!
তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে,
বারবার করে আলিঙ্গন,
আকাশ আনন্দ ভরে আমার মাথার পরে
করিছে প্রভাত বরিষণ!
তাই বুঝি মেঘমালা পূরব দুয়ার হতে
স্নেহ দৃষ্টে মোর মুখে চায়!
তাই বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাঝে
বারবার ডাকিছে আমায়।

ওই শোন পাখী গায়—শতবার ক'রে গায়,
ওই দেখ ফুটে ওঠে ফল!

আমি কে গো,জননি গো,আমারে হেরিয়া কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল!
ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পুরিল উল্লাসে!
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে?
মোরে কেন এত ভাল বাসে?
মরি মরি কচি হাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভাল,
প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছ,
না ফুটিতে প্রভাতের আলো!
বায়ুভরে ঢলি ঢলি করিবিরে গলাগলি,
হেরিব তোদের হাসিমুখ,
তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উঘাটিয়া পরাণের সুখ!

ভালবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রু বারি ধারা!
ভ্রমিলাম দূরে দূরে—কে জানিত বল দেখি,
হেথা এত ভালবাসা আছে!
যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকে ভালবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে!
হেথা যারে ভালবাসি ফিরে দেয় ভালবাসা,
নাই হেথা নিরাশ প্রণয়!
কাঁদিলে কাঁদিতে থাকে,হাসিলে হাসিয়া ওঠে
জগতের করুণ হৃদয়!
মা আমার, আজ আমি কতশত দিন পরে
যখনিরে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, র'ব হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিবরে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভাল; কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভাল বাসিবে যে কেহ!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিসর যুদ্ধ ও আরবী পাশা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহম্মদ আলির শাসনকালে জনৈক সুদক্ষ ফরাশিস কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে মিসরে পাশ্চাত্য প্রথানুসারে রাজস্ববিভাগ, সৈনিক ও বিচারবিভাগ প্রভৃতি পরিগঠিত হইয়াছিল। সেই সময় তত্রত্য শাসন প্রণালীর উৎকর্ষসাধনোদ্দেশে তথায় একটি মন্ত্রণালয় (Parliament) স্থাপনের যত্ন বিহিত হয়; কিন্তু অনভিজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কর্ম্মচারীগণের অনাস্থায় তাহা সফল হয় নাই। অনন্তর ইস্মাইল পাশার সময়ে উক্ত উদ্যম অংশতঃ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। খেদিব রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক লইয়া

শাসন-প্রণালীর দোষ গুণ বিচারের জন্য একটি মন্ত্রণা-বিভাগ স্থাপন করেন। যে বিশুদ্ধ প্রণালীতে য়ুরোপীয় মন্ত্রণা-গৃহ পরিচালিত, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মিসরে তাহার ছন্দাংশও প্রবর্ত্তিত না হইয়া প্রাচ্য প্রণালী অনুসারে উহার অবয়ব পরিগঠিত হইল। নৃপতি-কলঙ্ক জনের সময় হইতে কত কূট মন্ত্রণা, কত আন্দোলন, কত শোণিতপাত ও কত পরিবর্ত্তনে বৃটিশ পার্লামেণ্ট যে উপাদানে নির্ম্মিত ও বৃটিশজাতীয় জীবন যে ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা কুসংস্কার সম্প্রন্ন মিসরবাসীর সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-সীমার অতীত। যাহা হউক য়ুরোপের দৃষ্টান্তে মিসরে পার্লামেণ্ট প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল না। সাধারণ প্রজাবর্গের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ রহিল না। স্বার্থপর কর্ম্মচারীগণ প্রজাসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে কখনই কোন প্রস্তাব করে নাই। গবর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত বিধান মাত্রের দোষ-গুণের প্রতিবাদ করিবার জন্য কতিপয় কর্ম্মচারী একটি প্রতিবাদী দলে (Opposition Party) বিভক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ কখনই একটি বিষয়েরও প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় নাই। খেদিব ও তৎপ্রিয়পাত্রগণের মুখ হইতে যখন যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক, অন্য সকলেই একতানে তাহার অনুমোদন করিয়াছে, সুতরাং কত অন্যায় বিধান বিনা আপত্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই নবপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রণা-গৃহ কোন শুভ ফল প্রসব না করিয়া রাশি রাশি কুমন্ত্রণার প্রশ্রয় দানে দেশের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিয়াছিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইহার কার্য্যে কখনই উৎসাহ দান করেন নাই। তাঁহাদের নিকট ইহা একটি অদ্ভুত, আড়ম্বরময়, কুমন্ত্রণাজনক অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। যে দেশের অধিকাংশ লোক অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক-শিক্ষা-বর্জ্জিত,তথায় পার্লামেণ্ট-প্রণালী একটি হাস্যজনক অনুষ্ঠান। যখন প্রধান প্রধান লোকদিগের কুমন্ত্রণায় রাজস্ব-বিভাগে বিশৃঙ্খলা ও দেশ মধ্যে অশান্তির কারণ উপস্থিত হইল তখন ফরাশিস কন্সল্-এম, নাইনের উপদেশ অনুসারে বেকার পাশা ইহার সংস্কারে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার উদ্যম কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ইস্মাইল পাশা পদচ্যুত ও বর্ত্তমান খেদিব টুইফিক পাশা তাঁহার পদে স্থাপিত হইলেন। এই পরিবর্ত্তনে বেকার পাশার সমস্ত উদ্যম বিফল হইল। ভীরু টুইফক ইস্মাইলের দুর্দ্দশা দেখিয়াও সতর্ক হইলেন না। তিনি প্রধান মন্ত্রী রিয়াজ পাশার কুরধৃত পুত্তলিকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময় দুইমতি তুর্কী ও সারকেশীয় কর্ম্মচারীদিগের ষড়যন্ত্রে দেশ ওতপ্রোত হইতে লাগিল। দেশীয় অধিবাসীগণের দিন দিন দুরবস্থা বাড়িতে লাগিল। দেশের এই দুর্গতি দমন করিবার জন্যই আমেদ আরবী দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

ক্ষণজন্মা ক্রম্‌ওয়েল্, যে শক্তির উদ্দীপনায় স্বীয় সহচরবর্গের সহিত দুরাচার চার্ল্‌স্-শীর্ষক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বীর পরাক্রমে বৃটিশ পার্লেমেণ্টের কলঙ্ক মোচন ও জাতীয় স্বত্ব দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পুনঃ সংস্থাপনে জাতীয় ইতিহাসের পবিত্র বক্ষঃস্থল উজ্জ্বল,অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে অলঙ্কৃত করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, আজি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা-প্রিয় আরবী ও তৎসহচরবর্গ সেই গরীয়সী শক্তির প্রভাবে মৈসর পার্লেমেণ্টের সংস্কার, শাসন প্রণালীর দুর্গন্ধময় পঙ্কোদ্ধার এবং অত্যাচারী খেদিবের ক্ষমতা সঙ্কোচ ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য বীরবেশে সজ্জিত হইলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে (১৮৮২) মন্ত্রীসম্প্রদায় পরিবর্ত্তিত হইল। ফেরিফ পাশা সদল পদত্যাগ করিলেন। মামুদ সামি পাশা প্রধানমন্ত্রী, মুস্তাফা পাশা বিদেশীয় কার্য্য মন্ত্রী, আলি পাশা রাজস্ব মন্ত্রী, আবদাল্লা পাশা সাধারণ শিক্ষা মন্ত্রী এবং আমেদ আরবী যুদ্ধ মন্ত্রীর পদে নিয়োজিত হইলেন।

নূতন মন্ত্রী সম্প্রদায় পরস্পর বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে স্বদেশের হিত-ব্রতে ব্রতী হইলেন। অচিরকাল মধ্যে রাজ্যের চারিদিকে সুনিয়ম ও শান্তি সংস্থাপিত হইতে লাগিল। বিচারালয় সংশোধন, সৈনিক বিভাগে সুশৃঙ্খলা স্থাপন ও পদোন্নতিদানে সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও অনুরাগ আকর্ষণ, ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানে দেশের অশান্তি কিছুদিনের জন্য অনেক পরিমাণে নিবারিত হইল—প্রায় দেশব্যাপী জ্বলন্ত অনল ক্রমশঃ মৃদুভাব ধারণ করিতে লাগিল। খেদিব আরবীর দেশ হিতৈষিতা গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ ভুলিয়া গেলেন, এবং 'পাশা' উপাধি দানে তাঁহার গৌরব ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

এই সময় আরবীর সুনাম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তুরুস্ক-রাজ তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের পরিচায়ক মহান্ সঙ্কল্প ও সাধু অনুষ্ঠানে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রধান প্রিয়পাত্র শেখ মহম্মদ জাফর ও আমেদ পাশা রতি দ্বারা তাঁহার নিকট বিবিধ উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলেন। সুলতানের অভিপ্রায় ও অভিমত সম্বন্ধে এতদিন তিনি মনোমধ্যে যে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই দুই জন মাননীয় কর্ম্মচারীর পত্রে, তাঁহার গভীর সহানুভূতি লাভে, তাহা অপনীত হইল। অনন্তর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অবলম্বিত ব্রত পালনে নিবিষ্টচিত্ত রহিলেন। ক্রমে ক্রমে দেশের প্রায় সমস্ত লোক তাঁহার সাধু উদ্যমে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত দলবদ্ধ হইতে লাগিল। চারিদিকে সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জীবন্ত লক্ষণ লক্ষিত হইল। এই সময় দেশীয় পুরাতন দুর্গ সংস্কার ও দুই একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণোপায় অবলম্বিত হইল।

মানুষ যতই কেন চেষ্টা করুক না, প্রাকৃতিক ঘটনার পথ রোধ করা মনুষ্যের

সাধ্যায়ত্ত নহে। ঘৃতসংযোগে নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নি যেমন সহসা প্রবল বেগে পুনর্জ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তেমনই হঠাৎ একদিন কতিপয় সারকেশীয় কর্ম্মচারীর অমানুষী ষড়যন্ত্রে মিসরের নির্ব্বাণোন্মুখ বিদ্রোহানল আবার অতি ভীষণরূপে জ্বলিয়া উঠিল। উক্ত নরকুল-কলঙ্কগণ মিসরবাসীদিগের পদোন্নতি ও মিসরের ভাবী মঙ্গল চিন্তায় ঈর্ষাদগ্ধ হইয়া প্রথমতঃ আরবীর সহযোগী আবদেলকে বিষপান করাইয়া নিহত করিবার আয়োজন করিল এবং তাহা বিফল হইলে তাহাদের পথের প্রধান কণ্টক আরবী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ মিসরবাসীকে গুপ্ত ভাবে হত্যা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিল। এই লোমহর্ষণ ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইতে না হইতেই সেনাপতি তৌফিক পাশা ও যাবতীয় মৈসর সেনা ক্রোধে জর্জ্জরিত ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিহিংসার জন্য ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। আবার দেশ মধ্যে ভয়ানক অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইল। ষড়যন্ত্র-লিপ্ত অপরাধীগণ ধৃত ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্র ও তাহার বিষময় ফল হইতেই মিসরের অদৃষ্ট-গতি শোচনীয় পথে পরিবর্ত্তিত হইল। এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে খেদিবের সহিত মন্ত্রীসম্প্রদায়ের একান্ত মতভেদ উপস্থিত হইল। খেদিবের দুর্ম্মতি ও উত্তেজিত সেনাদলের রণোন্মত্ততা হইতেই অন্তর্ব্বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সৈন্যদলের উপদ্রব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। খেদিব অনতিবিলম্বে ফ্রেঞ্চকন্সল্ এস্‌মঙ্গ ও বৃটিশ কন্সল্ কুক্‌সনের নিকট প্রকাশ করিলেন যে মিসরে তাঁহার ও ইয়ুরোপীয় অধিবাসীগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত, অতএব তাঁহারা যথা সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগী হউন। এই কুসংবাদই মিসরের শেষ অভিনয়ের প্রথম কারণ।

ভীরু নির্ব্বোধ খেদিব দেশের সর্ব্বনাশের জন্য এই কুসংবাদ বৃটিস্ ও ফরাশিস্ কন্সলের কর্ণগোচর করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে সামান্য বিষয় গুরুতর করিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও ফরাশিস্ সাধারণ তন্ত্রে উপস্থাপিত করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে ফ্রান্স আপনার স্বার্থহানি ও প্রভুত্ব লোপ ভয়ে অতিশয় ভীত হইলেন। যে ফ্রান্স হইতে মিসরের বর্ত্তমান গৌরব শ্রী—যাহা হইতে উহা সর্ব্ব প্রথমে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমুজ্জ্বল আলোক লাভ করিয়াছে—যাহা হইতে উহাতে সর্ব্ব প্রথমে য়ুরোপীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে—সৈনিক, বিচার ও শিক্ষাবিভাগ গঠিত হইয়াছে—যে দেশীয় লোক দ্বারা উহার অদৃষ্ট নিয়মিত হইতেছে—যে দেশীয় লোক সুয়েজখাল খনন করিয়া উহার গৌরব শত শাখায় বিস্তার ও বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতার কারণ করিয়াছে—সংক্ষেপতঃ যে দেশ উহার বর্ত্তমান প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে—মিসরে আজি সেই ফ্রান্সের গৌরব পরিম্লান হইবার সময় উপস্থিত ভাবিয়া ফ্রান্স সাধারণ তন্ত্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের হৃদয় ব্যথিত হইল। ফরাশিস্ গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন যখন এই

বিদ্রোহানল পূর্ণ মাত্রায় জ্বলিয়া উঠিবে তখন মিসরে ফরাশিস্ ও বৃটিস্ স্বার্থের প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা।

এই ভাবিয়া সাধারণ তন্ত্রের শিরোমুকুট এম, গাম্বেটার প্ররোচনায় সত্বর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই প্রজ্জ্বললোন্মুখ অগ্নি নিবাইতে ডাকিলেন। ইংলণ্ড প্রথমতঃ একরূপ উদাসীন ছিলেন, এবং যতদিন তাহার স্বার্থ আহত না হইয়াছিল, ততদিন ফ্রান্সকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছিলেন যে ইংলণ্ড কোন বিষয়ে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত নহেন—মিসর আপনা হইতেই প্রশান্ত ভাব ধারণ করিবে। ইংলণ্ডের এই উদাসীনতা বুঝিতে পারিয়া এবং ভবিষ্যতে তাঁহা হইতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই এই ভ্রমে আরবীর দল দিন দিন অত্যন্ত মাতিয়া উঠিল—বিদ্রোহাগ্নি নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে থাকিয়া ধীরে ধীরে জ্বলিতে লাগিল। মার্চ্চ এপ্রিল দুই মাস এইরূপে বিগত হইল।

মে মাসের প্রথম হইতেই মিসরের অবস্থা বড় মন্দ হইয়া দাঁড়াইল। স্থানে স্থানে দুই এক জন বৃটিশ, ফরাশিস্ ও সার্কেসীয় অধিবাসীও বণিক আক্রান্ত ও তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সাধারণ বাণিজ্যে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিল। এতদিন যে ইংলণ্ড ফ্রান্সের প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন আজি তাঁহার স্বার্থে আঘাত লাগিবামাত্র তিনি আর নিরুদ্যম রহিলেন না। যে অকৃত্রিম স্বজাতি-বৎসলতা হেতু বৃটিশ জাতির এত উন্নতি, এবং যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য হইতে বৃটিশ জাতির বর্ত্তমান প্রভুত্ব গৌরব, আজি মিসরে সেই বিজয়ী বৃটিশ সন্তানের লাঞ্ছনা ও বৃটিশ বাণিজ্যের দুর্গতির বিষয় পরিচিন্তনে ইংলণ্ডের হৃদয় বিষম ব্যথিত হইল। এখন তিনি ফ্রান্সের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে হউক মিসরবাসী য়ুরোপীয়দিগের রক্ষার সদুপায় বিধান করিবেন। এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সুয়েজখাল সুরক্ষিত ও সাধারণ বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া বন্দরে বৃটিশ ও ফরাশিস্ রণতরী প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স য়ুরোপীয় প্রবল রাজ্যগুলির মত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিতে যত্নবান হইলেন।

১৫ ই মে মিসরে য়ুরোপীয় রণতরী দৃষ্টে দেশীয় অধিবাসীগণ আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইল। স্বাধীনতা বা স্বর্গ-সুখভোগী যে বৃটিশজাতি দাসত্বের উচ্ছেদ সাধক ও পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা সেই মহৎ জাতি কোথায় হস্তাবলম্বদানে অধঃপতিত মিসরের দুর্দ্দশা মোচন করিবেন, না কোথায় তাহার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিলেন, এই মর্ম্মান্তিক বেদনায় মিসরবাসীগণ ক্রমে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। এই শোচনীয় কারণ হইতে দিন দিন ইয়ুরোপীয় ও দেশীয়গণের সহিত শত্রুতা বাড়িতে লাগিল। এই সময় বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ কন্সলগণ মন্ত্রীপরিবর্ত্তন ও দেশ হইতে আরবীর নির্ব্বাসন জন্য খেদিবকে অনুরোধ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের শিরঃস্থানীয় আর কোন ব্যক্তিই এই অযথা

অনুরোধে সম্মতি দান করেন নাই, কেবল খেদিব ও তাঁহার প্রিয়পাত্র বেকার পাশা ইহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করিলেন। দেশের ছোট বড় সকলেই একবাক্যে বলিল ভ্রান্ত-মতি খেদিব যখন স্বদেশের স্বাধীনতা পরহস্তে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি দেশের শত্রু, সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াই তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার। এই উপলক্ষে সৈন্যগণ আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

মে মাসের প্রথম হইতেই মিসর নীতি লইয়া বৃটীশ মন্ত্রণা-গৃহে তুমুল আন্দোলন ও ঘোর মতভেদ চলিতে লাগিল। এক্ষণে লর্ড গ্র্যান্‌ভিল্ ও সার্ চার্লস ডিল্‌ক লর্ডস ও কমন্স্ সভায় একতান স্বরে শান্তির উপযোগিতা ও যুদ্ধের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উদারনীতিক সম্প্রদায় (Liberal Party) আগ্রহাতিশয় সহকারে এই বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ স্থির হইল ইয়ুরোপীয় প্রবল রাজ্য নিচয়ের সহায়তায় বিনা যুদ্ধে শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

একাল পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ কোন বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। লর্ড ডাফ্রিন্ পোর্টে (Porte) ইংলণ্ডও ফ্রান্সের সঙ্কল্প জানাইলেন এবং দূত দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। পোর্ট হইতে উত্তর আসিল—'মিসর সুলতানের উপরাজ্য; তথায় শান্তি ও অশান্তির জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। তিনি আপনা হইতেই তথায় শান্তি স্থাপন করিবেন, তজ্জন্য অন্য কোন রাজ্যের চিন্তার কারণ নাই এবং কোন সভা আহ্বানেরও প্রয়োজন নাই। সুলতান মিসরে শীঘ্রই কতিপয় সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদের দ্বারাই সমস্ত অশান্তি নিবারিত হইবে'। ইংলণ্ড এই কৌশলময় বাক্যে ভুলিয়া আপনার লক্ষ্য হারা না হইয়া ফ্রান্সের সাহায্যে অন্যান্য রাজ্যের মত সংগ্রহে যত্নবান হইলেন।

২৬ শে মে মন্ত্রী সম্প্রদায় পদত্যাগ করিলেন। এই এক দিনেই দেশ মধ্যে ঘোর উপদ্রব ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তৎপর দিবস রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিবর্গ একটি সভায় সমবেত হইয়া একবাক্যে স্থির করিলেন আরবী পুনরায় স্বপদ গ্রহণে দেশের শান্তি রক্ষা করিবেন। খেদিব ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবেন। পর দিন প্রভাতকালে সুলতানপাশা ও সলেমন্ পাশার প্রস্তাবে ও খেদিবের অনুমোদনে আরবী পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। খেদিব ইতিপূর্ব্বেই আত্মরক্ষার্থ বিভিন্ন স্থান হইতে বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছলেন। এখন তাহাদের কোলাহলে কেরো ও আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়াবাসী দেশীয় ও ইয়ুরোপীয়গণ মহাভীত হইল। আরবী শত চেষ্টা বিধানেও সে কোলাহল নিবারণ করিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত জলরাশির প্রবল প্রবাহে যখন দেশ প্লাবিত হইয়া যায় তখন

তাহার গতিরোধ করা যেমন একান্ত অসাধ্য, দেশব্যাপী ভয়ানক অশান্তি ও যুদ্ধোদ্যম-জনিত সাধারণ প্রমত্ততা নিবারণ করাও তেমনই অসম্ভব। অতঃপর মিসরে আর শান্তি দেখা দিল না। বিনা যুদ্ধে আর শান্তি স্থাপনের আশা রহিল না। এখন আরবী প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন।

মে মাস এইরূপে গত হইল, জুন মাসেরও কিছুদিন গেল, ইয়ুরোপীয় কোন প্রবল রাজ্য প্রস্তাবিত মিসর সম্বন্ধীয় সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন না। সকলেই স্বার্থানুরোধে নিরুদ্যম রহিলেন। এক্ষণে আমরা ক্ষণকালের জন্য মিসর সম্বন্ধে তুরুস্ক ও অন্যান্য প্রবল রাজ্যের স্বার্থ ও নীতি সংক্ষেপে সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

তুরুস্ক।

তুরুস্কের সহিত ফ্রান্সের চিরশত্রুতা। যে কুদিনে ফ্রান্স অন্যায় পূর্ব্বক টিউনিস্ গ্রাস করেন, সেই দিন হইতেই ফ্রান্স তুরুস্কের নেত্র-কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। টিউনিস্ ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হইলে মিসর ও কনষ্টাণ্টিনোপল্ যে অনির্ব্বচনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার অসুখজনক ফল সুলতান দিবারজনী উপভোগ করিতেছেন। এই অন্যায় অধিকারে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন বলিয়া এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্য বিশেষতঃ সাইপ্রস অধিকার নিবন্ধন সুলতান তাঁহার প্রতি আন্তরিক বিরক্ত। সুদূর-বিস্তৃত জল রাশির মধ্য স্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ যেমন শোভা পায়, ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তুরুস্কও তেমনই শোভা পাইতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী প্রবল রাজ্যগুলির একান্ত ইচ্ছা ইয়ুরোপ হইতে মুসলমান রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিরাজিত হউক। সুলতান ইহা বিলক্ষণ জানেন। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তাঁহার প্রধান উপরাজ্য মিসর ভূমিকে গ্রাস করিবার জন্য দীর্ঘকাল হইতে সুযোগ ও পন্থা অন্বেষণ করিতেছেন, ইহাই বা তিনি কেমনে ভুলিবেন। মিসর যাহাতে তাঁহার হস্তস্খলিত ও কোন বিজাতীয় রাজ্যের হস্তগত না হয়, এবং তথায় তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা চির বিদ্যমান থাকে তজ্জন্য তিনি আমেন আরবীকে উৎসাহ দিয়া মাতাইয়াছেন। এখন তিনি কিরূপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থপূর্ণ, কৌশলময়, সুললিত কথায় ভুলিয়া আত্ম-স্বত্ব বিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন? এই সকল বিষয় সম্যক্ রূপে চিন্তা করিয়া সুলতান প্রস্তাবিত সভায় যোগ না দিয়া য়ুরোপীয় ক্ষমতার মান রক্ষার্থ দরবিশ পাশাকে প্রধান কমিসনর স্বরূপ মিসরে প্রেরণ করিলেন। প্রকাশ করিলেন, তিনি খেদিব, আরবী ও ইয়ুরোপীয় প্রধান কন্সল্গণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহের কারণ নিবারণ করিবেন।

জর্ম্মণি।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মণিকে কে চিনিত? কে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিত?

নাকে কেহ অনেক টাকা দিলে আপনি কি লন না? আমি কহিলাম না। তিনি কহিলেন আমাকে কেহ অনেক টাকা দিলে আমি আচ্ছা করে গাঁটরী বাঁধিয়া লইয়া গিয়া মজা করি। এই কথা শুনিয়া নিজ ভাষায় বন্ধুকে কহিলাম এ অভদ্র লোকদের সঙ্গে আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই। চল আমরা ইহাদের অগ্রে যাই। এই বলিয়া ওখান হইতে উঠিয়া ৬ ক্রোশ উক্ত মহারাজের আর একটী কাছারির একাউণ্টেণ্ট বাবুর নিকট ৩ দিবস যত্নে থাকিয়া মধুবনি আসিলাম। প্রথমত বাঙ্গালি বাবুদের বাসায় অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় অগত্যা বাজারে আসিলাম, ও নিজ ব্যয়ে উভয়ে চিড়া দধির ফলাহার করিলাম। কিন্তু তথায় শয়নের স্থান দুষ্প্রাপ্য বিধায় ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে একটী বাঙ্গালি ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবুর বাসার নিকট যাইয়া বন্ধু আমাকে কহিলেন আমি এই স্থানে দাঁড়াই, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আমি তাঁহাকে কহিলাম দুইজনে একত্রে যাইতে দোষ কি? তিনি কহিলেন আমার বড় লজ্জা বোধ হচ্চে, তুমি আগে যাও। অগত্যা আমাকেই অগ্রে যাইতে হইল। উক্ত বাবুর বাসায় গিয়া দেখিলাম তিনি ও আর ২।৩ জন ভদ্র লোক একত্রে বসিয়া গল্প করিতেছেন, আমি তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া কহিলাম, আমি ব্রহ্মচারী। আপনার এখানে অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করিবার স্থান মিলিতে পারে? ইহা শুনিয়া তিনি বিস্ময়ের সহিত কহিলেন আপনারা কয়জন, আমি কহিলাম দুই জন। তিনি কহিলেন আর এক জন কোথায়? আমি কহিলাম বাহিরে আছেন। তিনি বলিলেন শীঘ্র ডাকুন ডাকুন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলাম। পরে উক্ত বাবু আমাদের পরিচয় লইয়া বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে তিনি বন্ধুকে কহিলেন আপনার গৃহ ত্যাগকরা ভাল হয় নাই আপনি কোন স্থানে চাকরী করুন। এইরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে কহিলেন আপনারা পাক করিয়া আহার করিবেন, না আমার ব্রাহ্মণের হাতে ভোজন করিবেন? আমি উত্তর করিলাম যে, আমরা বাজার হইতে ফলাহার করিয়া আসিয়াছি এজন্য কিছুই আর আহার করিব না। তিনি মনে করিলেন আমরা বুঝি লজ্জাপরবশ হইয়া ঐ কথা বলিতেছি। কহিলেন গৃহস্থের আশ্রমে অতিথি আসিলে তাঁহাকে আহার দেওয়া উচিত, উপবাসী রাখিলে মহাপাপ হয়। আমি কহিলাম আমাদের ক্ষুধা নাই। ইহা শুনিয়া তিনি ভদ্রতাসহকারে কহিলেন তবে আমার এখানে শয়নের স্থান মিলিবে না, যদি আপনাদের ক্ষুধা এখন না থাকে তবে একটু রাত্র গৌণে আহার করিবেন। ইহা শুনিয়া ও তাঁহার যত্ন দেখিয়া মনে ভাবিলাম আহার না করিলে নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পায়, এই স্থির করিয়া তাঁহাকে কহিলাম আপনার ব্রাহ্মণের হাতে ভোজন করিব। প্রভাতে তাঁহাদের নিকট বিদায় হইয়া

রহিকা আসিলাম, ও তথায় দর্ভাঙ্গার মহারাজার বাঙ্গালি একাউণ্টেণ্ট বাবুর বাসায় ভোজন করিয়া ওখান হইতে বহির্গত হইলাম। প্রায় সন্ধ্যার সময় একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া কয়েক খানি মুদির দোকান দেখিলাম, কিন্তু তথায় থাকিবার সুবিধা না হওয়ায় রাস্তার পশ্চিম দিকে কতক গুলি লোক এক স্থানে বসিয়াছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম দর্ভাঙ্গা যাইবার কি এই রাস্তা? তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল হাঁ। আমরা ঐ রাস্তায় কিছু দূর গিয়াছি, এমত সময় এক ব্যক্তি আমাদিগের পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল আপনারা গ্রামে ফিরিয়া চলুন, এখান হইতে ৩।৪ ক্রোশ না যাইলে আর চটি মিলিবে না, বিশেষ রাস্তায় আজ কাল জানোয়ারের ভয় হইয়াছে, আমার খুল্লতাত এখানকার জমাদার তিনি আপনাদিগকে ডাকিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বন্ধু নিজ ভাষায় আমাকে কহিলেন আমার বোধ হইতেছে ইহারা ডাকাত উহাদের মনে সন্দেহ হইয়াছে যে আমাদের নিকট অনেক টাকা আছে। নচেৎ গ্রাম দিয়া যখন আসিলাম তখন কেহ থাকিতে বলিল না আর এতদূর হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অতিথি সেবা করাইবে, ডাকাতের বুদ্ধি আমি বেশ বুঝিয়াছি। আর বিলম্বের আবশ্যক নাই সত্বর পলান যাক। আমি বলিলাম পলাইয়া কোথায় যাইব? অপরিচিত স্থান, পলাইলে উহারা সন্দেহ করিবে, পলায়ন অপেক্ষা উহাদিগের নিকটে যাওয়া যাক, কিছুই নাই দেখিলে আর আমাদের হত্যা করিবে না। আমি বন্ধুকে কহিলাম, যা করেন ঈশ্বর চল উহার সহিত যাওয়া যাক। এই বলিয়া উভয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যে কয়েক জন লোক বসিয়াছিল তাহারা আমাদিগকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিল ও আমাদের বসিবার নিমিত্ত এক খাটিয়া দিল। পরে এক ব্যক্তি তামাক সাজিয়া আনিল অন্যে পদ প্রক্ষালনের জল আনিয়া দিল তাহা দেখিয়া ও তাহাদের সাধুতার পরিচয় পাইয়া আমাদের মনের সন্দেহ দূর হইল। পরে গৃহস্বামী আমাদের আহারের নিমিত্ত দুগ্ধ, পুরি, ও মিষ্টাদির আয়োজন করিল, ও শয়নের নিমিত্ত পোয়ালের উপর কম্বল বিছাইয়া দিয়া পাশে অগ্নিকুণ্ড করিয়া দিল। উক্ত ব্যক্তির পরিচয়ে জানিলাম সে ব্যক্তি কনেষ্টবল। ঐ সকল স্থানে অত্যন্ত বদমাইস লোক আছে তাহাদের উৎপাত নিবারণের জন্য উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহাকে রাখিয়াছেন। সে একেলা থাকে বলিয়াই লোকে তাহাকে জমাদার বলে। উক্ত ব্যক্তি লেখা পড়া জানে না, তথাচ তাহার ধর্ম্ম-বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে, সে ব্যক্তি তাহার কার্য্যের পাপ পুণ্যের বিষয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা তাহার যথাসাধ্য উত্তর দিলাম। শেষে সে কহিল এই গ্রামের নিকট পূর্ব্বে এক বিদ্বান সাধু পরমহংস ছিলেন তিনি এখন এখানে নাই, তাঁহার শিষ্যেরা কোন কার্য্যের নয়,

আর এক বড় পণ্ডিত এখানে আছেন যদি বলেন তবে প্রাতঃকালে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়া আপনাদের সঙ্গে তর্ক করিতে দিই। ইহা শুনিয়া আমি তাহার মতে সম্মতি দিয়া নিদ্রা যাইলাম। প্রভাতে উক্ত ব্যক্তি একটী পণ্ডিত সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকট আসিল। পরস্পর অভিবাদন ও ২।৪ টী কথার পর উক্ত পণ্ডিত আমাদিগকে কহিলেন, আপনারা সাকার দেবদেবী মানেন কি না? আমি কহিলাম মানি। তিনি কহিলেন পূর্ব্বে ঋষিগণ যেরূপ নিয়মে ব্রহ্মচারী হইতেন আপনারাও সেইরূপ নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তখন আপনাদের সাকার উপাসনা উচিত নয়। আপনারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও গায়ত্রী জপ করিবেন, ওঁকার উপাসনা ভিন্ন কখনই জীবের মুক্তি হইবে না, সাকার দেবদেবী শূদ্রের উপাস্য দেবতা। ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ এই জন্য সকল জাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এমত স্থলে আসল ছাড়িয়া নকল কোন্ মূঢ় প্রার্থনা করে, বর্ব্বরেরাই সোণা পরিত্যাগ করিয়া গিল্টির সমাদর করে। এই রূপ তাঁহার সদুপদেশ-সূচক তিরস্কার বাক্য শুনিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও থতমত হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, আপনি যাহা কহিলেন সমুদায় সত্য, আমরাও ঐরূপ মানি। তত্রাচ পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন সাকার দেবদেবী মানিয়া আসিতেছেন, আজ আমি কি বলিয়া তাহা অবমাননা করি? তাহাতে তিনি কহিলেন, আপনার ও আমার পূর্ব্বপুরুষ ভিন্ন ননু, সকলই ঋষিপুত্র, তাঁহারা সাকার দেবদেবী পূজা করিতেন না। ওঁকারের আরাধনা ও যাগ যজ্ঞাদি করিতেন, আপনারা বেদাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তাহা সবিশেষ জানিতে পারিতেন। পরে আমি তাঁহাকে কহিলাম আপনি কি সাকার দেবদেবী মানেন না; তিনি কহিলেন, না, তবে নির্ব্বোধেদের পূজার নিমিত্ত দেবলয়ে গিয়া মূর্ত্তি পূজা করি, ও তাহারা যাহা দেয় তাহা গ্রহণ করি। এইরূপ নানা কথা বার্ত্তার পর উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে কহিলাম আপনি আমাদের দুইজনকে পড়াইতে পারেন? তিনি কহিলেন সংপ্রতি ৮।৯মাসের জন্য প্রবাসে যাইব। এই সকল কথার পর ওখান হইতে বিদায় হইলাম। অনেক দূর আসিয়া দেখিলাম ঐ কনেষ্টবল্ এক ঘোড়া চড়িয়া আসিতেছে। সে ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিল, পণ্ডিতজী আপনাদের বড় প্রশংসা করিলেন। আমিও তাহার নিকট পণ্ডিতের প্রশংসা করিলাম। শেষে উক্ত ব্যক্তি আমাদিগকে কহিল আপনাদের আহারের নিমিত্ত আমি আগের চটিতে মুদিকে বলিয়া যাইব, আপনারা তথায় আহার করিয়া যাইবেন। এই কথা বলিয়া উক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া দর্ভাঙ্গা চলিয়া গেল, আমরা তাহার সাধুতার প্রশংসাদি করিতে করিতে চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মুদি আমাদের পরিচয় অবগত হইয়া উক্ত ব্যক্তির দাতব্য চিড়া দধির

TORN PAGES.

ফলাহার করাইল,আহারান্তে চলিতে চলিতে দর্ভাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া রাজবাটীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একটী বাঙ্গালির গোলায় উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদের সহিত পরিচয়ের পর ওখানকার কালী বাড়ি ও বাজার ইত্যাদি ভ্রমণ করিলাম। পরে বন্ধু আমাকে কহিলেন দেখ আর তো কষ্ট করা যায় না, একটা চাকরী জুটাইয়া লওয়া যাক্। খরচ বাদে যাহা বাঁচিবেক তাহা জমা করিয়া রাখিব। পুনরায় যখন বহির্গত হইব তখন আর ভিক্ষাও করিতে হইবে না আর হাঁটিতেও হইবে না, রেলগাড়িতে চড়া যাইবে। আর তুমি এখানে কোন রূপ সুযোগে পোরাক পোসাকের সংস্থান করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ কর, আমার চাকরী হইলে আমিই তোমার সমুদায় খরচ দিব। এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম বন্ধুর এক্ষণ আশা হাঁস বিক্রয় করিয়া ঘোড়া কেনা ও ঘোড়া বিক্রয় করিয়া জমিদারী কেনা। আজ কাল যেরূপ চাকরীর বাজার তাহাতে সত্বর যে একটা বড় চাকরী মিলিবে তাহার কোন সম্ভব নাই। বিশেষ ২০।২৫ টাকার এক কেরাণিগিরি হইবে, খরচ পত্র বাদ এমন কি অধিক জমিবে যে তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে অত সুখে চলা যাইবে। যখন উনি এই কয়েক দিনের সামান্য কষ্টকে গুরুতর কষ্ট বলিয়া জানিয়াছেন, তখন যে উনি ভবিষ্যতে আবার সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। যখন উনি চাকরী করিতে আরম্ভ করিবেন তখন তো পুনরায় গৃহস্থ হইলেন, গৃহস্থাশ্রমের সুখ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় যে কষ্টকর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন তাহা আর আমার বোধ হয় না। এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে বন্ধুকে কহিলাম্ তুমি যে ইচ্ছা করিতেছ তাহা অতীব সুখের, আমি তো প্রথম দিনেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে তুমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, ও কর্ম্ম কাজ করিয়া সংসার-সুখে সুখী হওগে, কষ্টকর সন্ন্যাস আশ্রমে তোমার আবশ্যক নাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম তাহা তোমার দ্বারা ভঙ্গ হইতেছে, তজ্জন্য আমি কোন দোষে দোষী নহি। এজন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি যে কল্য হইতেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া জনকপুরের দিকে অধ্যয়নের চেষ্টা দেখিতে যাইব, যদি সুবিধা হয় পশ্চাৎ তোমাকে লইয়া যাইব। এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় রাত্রে বিশ্রাম করিয়া প্রভাতে বন্ধুকে কহিলাম—এই সংসার মায়াময়, কেহ কাহারো সঙ্গী নয়, ঈশ্বর উপাসনার নিমিত্ত যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছি, তখন কাপুরুষের ন্যায় ব্রত ভঙ্গ করিয়া ফল কি, যা করেন ঈশ্বর তাহাই হইবে, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। ইহা শুনিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন তোমার বড় কঠিনপ্রাণ, মায়ামমতা কিছুই নাই, তাঁহার ঐ ভাব দেখিয়া আমিও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে কহিলাম যখন সন্ন্যাসী হইয়াছি, তখন আর মায়া মমতা কি। এই বলিয়া আমি ১ কম্বল ১ মোটা চাদর ৩ ধুতি ১ পিরাণ ১ গাছি লাঠি ১টী ঘটি ও ১ খানি দেবনাগর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও একটী রূলপেনশিল্ লইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে বন্ধুকে কহিলাম যদ্যপি জগদীশ্বর অনুগ্রহ করেন তবে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া তাঁহার সহিত হস্ত বিকম্পনের পর চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিতে আরম্ভ করিলাম এখন হইতে আমি একা। ইতি।

ক্রমশঃ।

উদাসীন।

প্রাকৃতিক শক্তি।

(ইহাদিগের কার্য্যকারণভাব)

বহুকাল পূর্ব্বে য়ুরোপে প্রাকৃতিক ও গণিত বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের যে সকল সাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সৌখিন শিল্পের অভ্যুদয় ও উন্নতি তাহার একটি প্রধান ফল। সেই কালের শিল্পের সহিত আধুনিক শিল্পের অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। সামান্য সামান্য শিল্পকর্ম্ম দ্বারা যশোলাভে প্রোৎসাহিত হইয়া বৈজ্ঞানিকেরা অপেক্ষাকৃত কঠিন কর্ম্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা মনুষ্য ও অন্যান্য জীবদিগের অনুকরণ করিয়া আকৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃত্রিম জীবন দান করিতে সচেষ্ট হইলেন। গত শতাব্দীতে বোকাসোঁ নামক একটি ফরাসী শিল্পী এক হংস নির্ম্মাণ করেন, সেই হংসটি খাদ্য আহার করিয়া হজম করিয়া ফেলিত। তাঁহার নির্ম্মিত অপর এক পুত্তলিকা বংশী বাদনের সময় যথাস্থানে অঙ্গুলী নিক্ষেপ করিত। ড্রজ্ নামক অপর একটি বালক এক পিয়ানো-বাদক পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করেন, সে বাজাইবার সময় অঙ্গুলি নিক্ষেপনের উপর দৃষ্টি রাখিত, এবং বাদ্য শেষে সভ্যগণের প্রতি সম্ভ্রমে গ্রীবা আনত করিত। এই পুত্তলিকা জার্ম্মনিতে প্রদর্শিত হয়। ইহার আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি এত জটিল যে তাহা সামান্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকের সহজে বোধগম্য হইত না। কথিত আছে যে সেই বালক যাদুবিদ্যা চর্চ্চার দোষে দোষী স্থির হওয়ায় স্পেন দেশের বিচারালয়ে প্রেরিত হয়, এবং অনেক কষ্টে পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করে। এই সকল প্রতিভাশালী শিল্পীদিগের বিশেষ সাহায্য

TORN PAGES.

রহি
মহার
সায়
হইল
উপ
দে
না
গুলি
তা
যাই
এক
কিন্তু
আ
নি
চলু
আ
ক
খু
নি
বন্ধু
বো
সা
ট
f
ে

গ্রহণ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা শিল্প ও যন্ত্র তত্ত্বের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

এই সকল পুত্তলিকা নির্ম্মাণ হইতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মস্তকে আর এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়। তঁহারা অবিশ্রান্ত গতি সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হন। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহারা এমন একটি কল চান—যাহা দমদেওয়া ব্যতিরেকে এবং জল, বায়ু বা অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক বলের সাহায্য সাপেক্ষ না হইয়া আপনা হইতেই চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ সেই অবিশ্রান্ত গতি জোগাইবার ক্ষমতা শুদ্ধ সেই কলেতেই থাকিবে। তাঁহারা ভাবিলেন যে জীবদিগের সহিত এই রূপ কলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে, কারণ জীবেরা আপন ইচ্ছায় চলিতে ফিরিতে পারে, কাহাকেও তাহাদের গতি প্রদান করিতে হয় না। শক্তির উৎপত্তির সহিত যে খাদ্য ও পুষ্টির একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহা বোধ হয় তাঁহাদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, খাদ্য দ্বারা শরীর পোষণ করা কল-চক্রে চর্বি দেওয়া মাত্র। আপনা হইতে শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে কেননা প্রাণী মাত্রেই এই ক্ষমতা বিশিষ্ট। সুতরাং যদি মনুষ্য সৃষ্টি করিতে হয় তবে অগ্রে অবিশ্রান্ত গতির সৃষ্টি আবশ্যক। ইহা ত গেল মুখ্য; তাঁহাদের আর একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অর্থ। সেই অবিশ্রান্ত গতি হইতে যে যথেষ্ট কর্ম্ম উৎপন্ন হইবে তাহা নিশ্চিত, এবং সেই গতি এক প্রকার বিনা সাহায্যে উৎপন্ন হইবেক। কর্ম্ম অর্থের উপায়। সুতরাং তাঁহারা দেখিলেন যে অবিশ্রান্ত গতি শুদ্ধ যে মনুষ্য জীবনের সারাংশ তাহা নহে, তাহা অর্থলাভেরও একটি উপায়।

এই মনোগত ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে শত শত বিজ্ঞ মস্তিষ্ক জাগ্রত হইল। পরীক্ষার উপর পরীক্ষা, পরিশ্রমের উপর পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গণিতাশ্রিত যন্ত্র বিজ্ঞান (Mathematical mechanics) রাজ্যে পদার্পণ করিয়া তাঁহারা পরিণামে এই স্থির করিলেন যে শুদ্ধ কৌশল বলে সেই অবিশ্রান্ত গতির উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব।

কল মাত্রেরই একটা গতিচালিকা শক্তি আছে। মনুষ্য ও জন্তুদিগের কার্য্যের পরিবর্ত্তে কলের কার্য্যকারিতা; সেই জন্য মনুষ্য বা জন্তুদিগের কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া আমরা শিল্প যন্ত্রের কার্য্যকারিতার মাত্রা ধার্য্য করি; যেমন বাষ্পীয় কলের কার্য্য অশ্ব শক্তির সহিত তুলনা করা হয়। মনুষ্যকৃত কর্ম্মের মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে আমরা নিপুণতা ও শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি। তুমি কিছু মনে করিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে নিপুণ ও বলবান্ শিল্পী পাইতে পার না; সেই নিপুণতা লাভ করিতে বুদ্ধি চাই ও শিক্ষা চাই; এবং শিক্ষালাভ করিতেও সময় চাই ও পরিশ্রম চাই। কিন্তু দেখ, একটি কল যদি

আমি কহিলাম বাঙ্গালাদেশ হইতে
তেছি পশ্চিম দেশে তীর্থ ভ্রমণের
ত যাইব। ইহা শুনিয়া তিনি কহি-
ন আপনারা কোন্ সাধু? আমি কহি
ব্রহ্মচারী, তিনি কহিলেন কোন্ মঠের
চারী? আমি কহিলাম মঠ কাহাকে
লে? তিনি কহিলেন গুরু দ্বারা যেখান
ইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই গেরুয়া বস্ত্র
াইয়াছেন। আমি কহিলাম আমার নিজ
য় নিজে কাপড় রঙ্গাইয়া ও অন্য স্থানে
ীর ভোগ দিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারী হই-
ছি। তিনি কহিলেন আপনাদের গুরু
? আমি কহিলাম পরমেশ্বর আমাদের
রু। তিনি কহিলেন আপনার নাম কি?
আমি কহিলাম শ্রী * * চট্টোপাধ্যায়।
ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে উপহাস
করিয়া হাস্যের সহিত কহিলেন তুমিতো
বাঙ্গালী বাবু বাহ্বারে, আপনাআপনি
সাধু হইয়া গিয়াছ। তাঁহার এইরূপ
উপহাস করিবার কারণ আমি তখন
বুঝিতে পারি নাই। তখন আমি যে উত্তর
দিয়াছিলাম তাহা আমার মতে ঠিক উত্তর,
কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের মতে ঐরূপ উত্তর হাস্যজনক ও ক্রোধজনক, পরে তাহা আমি
বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তখন আমি
তাঁহাকে কহিলাম যে ব্যক্তি আপনাকে
আপনি সাধু বলে সে ব্যক্তি কখন সাধু
নহে। এইরূপ দুই একটী কথার পর উক্ত
সন্ন্যাসী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কোন্ সাধু? তিনি কহিলেন আমি
গোঁসাই সন্ন্যাসী। আমি কহিলাম ইহারাও কি সন্ন্যাসী? তিনি উত্তর করিলেন
হাঁ উহারাও সন্ন্যাসী "আমার চেলা।" আমি
কহিলাম আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন আর কোথায় যাইবেন? তিনি উত্তর
করিলেন কুশী নদীর নিকট হইতে আসিতেছি প্রয়াগতীর্থে কুম্ভের মেলায় যাইব।
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কিছু সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িয়াছেন কি? তিনি উত্তর
করিলেন আমি কোন শাস্ত্র পড়ি নাই,
আলক্ বলি আর দ্বারে দ্বারে ঝুলি ফিরাই
ভিক্ষা করি, ও গাঁজা ভাঙ্ খাই ও দেশে
বিদেশে ফিরিয়া সচ্ছন্দে থাকি। শাস্ত্র-
অধ্যয়নের বৃথা পরিশ্রমে ফল কি, লেখা-
পড়া শিক্ষা করিয়াও আমাদের যে ফল, না
করিয়াও তাই, লোকে সাধু দেখিলেই নি-
শ্চয় ভিক্ষা দিবে, আমাকে কেহ ভিক্ষা
দিবার সময় জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে না
যে তুমি লেখা পড়া জান কি না। গুরুর
নিকট হইতে যে লাল পোসাক পাইয়াছি
ইহা দেখিলেই লোকে ভক্তি করিবে, তবে
আর লেখা পড়া শিক্ষার প্রয়োজন কি?
এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন বাঙ্গালা দেশে দাতা-
লোক কেমন আছে, অল্প দিনে অধিক
অর্থ পাওয়া যায় কি না? উহার ঐ সকল
বাক্য শুনিয়া ও তাহাদের কদাকার চেহারা
দেখিয়া মনে ভাবিলাম ইহারা অত্যন্ত নীচ
জাতি হইবে। তথাচ প্রকাশ্যে তাঁহাকে
কহিলাম আপনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন আপনার অর্থের লোভে আবশ্যক কি? পরমেশ্বরের নাম করুণ। তিনি কহিলেন আপ-

মুদ্গর
ক্ষেপন
বং সেই
ত ক
ক, পুন
ব দ্বিতীয়
সুতরা
া তবে
ক্তির
ং বা
মাসে
ড়লেই
দ্বারা
দুই
তন
স্ত
তে
স যে
কার্য্য
রুত্ব
াত্রা
কার
ক
া
ত

TORN PAGES.

সাডোবা ও সিডানের বিজয়-দুন্দুভির সহিত তাহার বীর-পরাক্রম দেশদেশান্তরে বিঘোষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জর্ম্মণি আজিও ফ্রান্স ও রুসিয়ার ভয়ে ভীত। তুরুস্কের সহিত সদ্ভাব থাকিলে তাঁহা দ্বারা জর্ম্মনির দুইটি মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে—তুরুস্ক মনে করিলে আল্‌জিরিয়ায় ফ্রান্সের দুর্গতি এবং আরমেনিয়ায় রুসিয়ার বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। রাজনীতি বিশারদ প্রিন্স্ বিস্‌মার্ক বোধ হয় এই ভবিষ্য কল্পনায় সুলতানের মনস্তুষ্টির জন্যই প্রস্তাবিত সভায় যোগদান করিলেন না।

অষ্ট্রিয়া।

পোর্টের সহিত সখ্যভাবে অবা করিবার জন্য অষ্টীয়ার একান্ত বাসন কিছুকাল হইতে তিনি সেই ভাব স্থাপনে জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেছেন। তাঁহ বিশ্বাস এই; পোর্ট হইতে তিনি বসনিয়া (Bosnia বিষম বপদে পড়িতে পারেন সংপ্রতি জর্ম্মণির সহিত তাঁহার কোন অপ্রিয় ভাব নাই। জর্ম্মধি পোর্টের হিতৈষী পোর্ট অষ্ট্রিয়ার শত্রু নহেন। সুত অষ্ট্রিয়াও জর্ম্মনির ন্যায় সভা যোগ দিয়া ধীরভাবে ফ্রান্স লণ্ডের কা পরিদর্শনে নিযুক্ত ন।

সন্ন্যাসীর জীবন।

বেলা এক প্রহরের সময় একটী চটিতে উপস্থিত হইলাম। তথায় দর্ভাঙ্গার মহারাজের এক কাছারি আছে ও একজন বাঙ্গালি একাউণ্টেণ্ট আছেন শুনিয়া তাঁহার নিকট যাইলাম। তিনি আমাদিগকে থাকিতে না বলায় তাহার ১ মাইল দূরে একটী বাঙ্গালির গোলাতে উপস্থিত হইলাম, তিনি যত্ন পূর্ব্বক আমাদিগকে আহার করাইলেন। তথাকার মেম্ সাহেবের দেওয়ানের পুত্র বাবু আশুতোষ বসু বৈকালে আমাদের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন, সেখানে নানারূপ কথাবার্ত্তা ও ক্রীড়াদি করিয়া তিন দিবস কাটাইলাম। আমার নিকট গুপ্তপ্রেসের একখানি ডিক্সনারি ছিল তাহা তাঁহার নিকট ॥৶০ আনায় বিক্রয় করিয়া ওখান হইতে বহির্গত হইলাম। কিছু দূর গিয়া এক মুদির দোকানে বসিয়া আছি এমত সময়ে ৬ জন সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন, আর কোথায় যাই-

সেইরূপ নৈপুণ্য ও তদধিক বলের সহিত কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া অল্পায়াসে অনেক কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে। সুতরাং হিসাবমত বলিতে গেলে, কলের শক্তি প্রয়োগের উপর তাহার কার্য্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ।

এখন দেখা যাউক কি করিলে এই শক্তির পরিমাণ করা যায়, এবং উক্ত শক্তির তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়। য়ুরোপে শুদ্ধ জলের সাহায্যে এক প্রকার কল চালিত হয়, তাহাকে Water-mill বলে। এই কলের এক পার্শ্বস্থিত একটি চক্র প্রপতিত জল দ্বারা অনবরত গতিপ্রাপ্ত হয়। সেই চক্রনেমিগত কাষ্ঠ ফলকের স্থানে স্থানে কতকগুলি Projections অর্থাৎ বহির্লম্ব ভাগ আছে, ঘুরিবার সময় সেই গুলি একটি মুদ্গরকে উত্তোলন ও নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত মুদ্গর নিম্নস্থিত ধাতুখণ্ডকে বেগে আঘাত করে। এই মুদ্গার উত্তোলন করিতে হইলে ইহার গুরুত্বকে (Gravity) অতিক্রম করিতে পারে এমন এক শক্তি সেই কলে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। সুতরাং মুদ্গরের ভার শক্তি প্রয়োগের সহিত সমানুপাতিক। প্রথমোক্তের ভার যদি দ্বিগুণিত হয় তাহা হইলে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক। কিন্তু মুদ্গারের কার্য্য কেবল যে তাহার নিজ ভারের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, কতদূর উচ্চ হইতে ইহা নিক্ষিপ্ত হয় সেই দূরত্বের উপরেও তাহা নির্ভর করিতেছে। দুই হস্ত উচ্চ হইতে এই মুদ্গার নিক্ষিপ্ত হইলে এক হস্ত উচ্চ নিক্ষেপন অপেক্ষা অধিক ফলদায়ী হইবে; এবং সেই এক হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে কত যতটুকু শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক, পুন সেই শক্তিটুকু প্রয়োগ করিলে তবে দ্বিতীয় হস্ত উর্দ্ধে মুদ্গার উত্থিত হইবে। সুতরা মুদ্গারের গুরুত্ব ও দূরত্বের গুণনে তবে মুদ্গারের কার্য্য নিরূপিত হয়।

প্রপতিত জল সেই মুদ্গার উত্তোলন শক্তির উৎপাদক। জল সোজা হইয়া পড়ুক বা তির্য্যক ভাবেই পড়ুক তাহাতে কিছু আসে যায় না, উচ্চ হইতে নিম্ন দেশে পড়িলেই কলের গতি আরম্ভ হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে তিন সের ওজনের মুদ্গার দুই হস্ত উচ্চে উঠাইতে হইলে, হয় তিন সের জল দুই হস্ত বা ছয় সের জল এক হস্ত বা বার সের জল অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইতে পতিত হওয়া চাই। তবে দেখা গেল যে জলের শক্তি প্রয়োগে তবে মুদ্গারের কার্য্য আরম্ভ হয়। সুতরাং প্রপতিত জলের গুরুত্ব ও দূরত্বের গুণনে তবে কলের কার্য্যের মাত্রা নিরূপিত হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মুদ্গার উত্তোলন করিবার জন্য তাহার গুরুত্বকে অতিক্রম করে এমন এক শক্তি সেই কলে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। দেখা গেল প্রপতিত জল হইতেই কল সেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট সীমায় উত্থিত হইয়া মুদ্গার পুনরায় নিম্নস্থিত ধাতুখণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। যত উচ্চ হইতে পতিত হইবে ততই তাহার শক্তি ও বেগবল (Velocity) বর্দ্ধিত

TORN PAGES.

হয়। ঠিক ধরিতে গেলে এই বেগবল হইতেই মুদ্গারের যথার্থ কার্য্য স্থিরীকৃত হয়। গতিশীল পদার্থের বেগবলই তাহার কার্য্যের যথার্থ কারণোপায়। সদাসর্ব্বদা দেখা যায় যে, পদার্থ মাত্রেরই গতি, হয় ঘর্ষণে, বা বায়ুর প্রতিবন্ধকতায়, নয়ত অন্য কোন না কোন কারণে হ্রাস হইয়া ক্রমে রোধ হইয়া যায়; সেই জন্য আমাদের মনে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয় যে পদার্থের এই যে অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী গুণ কি করিয়া এত কার্য্য সম্পাদনে ক্ষমতাবান হয়। কিন্তু জানা উচিত, গতিপ্রাপ্ত পদার্থ যদি কখন অন্য কোন শক্তির প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে তাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমবেগে পর্য্যটন করিতে থাকে। প্রমাণ দেখ, গ্রহমণ্ডলী কত কাল হইতে সমভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে। সুতরাং শুদ্ধ কেবল প্রতিবাধিকা শক্তি দ্বারাই গতি হ্রাস ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গতি প্রাপ্ত পদার্থ (যথা, মুদ্গর বা বন্দুকের গুলি) যদি অন্য কোন পদার্থকে আঘাত করে তাহা হইলে হয় তাহাকে চাপিয়া থাকিবে নয় তাহা ভেদ করিয়া যাইবে। তবে যদি আহত বস্তুর প্রতিবাধিকা শক্তি গতিপ্রাপ্ত বস্তুর বেগ অপেক্ষা অধিক হয় তবেই শেষোক্ত বস্তুর বেগ রুদ্ধ হইয়া যায়। যে শক্তি পদার্থকে গতিবান্ করিয়া কার্য্য করায় তাহাকে বিজ্ঞানে জীবন্ত শক্তি বলিয়া থাকে। অতএব, মুদ্গর সেই ধাতুখণ্ডকে শুদ্ধ না চাপিয়া যখন শক্তিবলে তাহাকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে থাকে তখন আমরা দেখি যে মুদ্গর জীবন্ত শক্তি প্রাপ্ত হইল।

আমরা প্রথমতঃ জলের গতিচালনী শক্তি; দ্বিতীয়তঃ তদ্দ্বারা মুদ্গর উত্তোলন; তৃতীয়তঃ, সেই মুদ্গারের জীবন্ত শক্তি দেখিলাম। একখণ্ড স্থূল ইস্পাতের উপর যদ্যপি আমরা সেই মুদ্গরকে পড়িতে দিই, তাহা হইলে প্রতিহত হইয়া জলের বিনা-সাহায্যে মুদ্গর পুনরায় আপনা হইতেই হয় ত সেই নির্দ্দিষ্ট উচ্চে উত্থান করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু তদধিক উচ্চে উত্থান করা ইহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সুতরাং সময়ে সময়ে জীবন্ত শক্তি প্রযুক্ত শক্তির ন্যায় কার্য্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেও হইতে পারে।

সকলেই জানেন যে ঘড়ি দুই উপায়ে চলিয়া থাকে;—নিম্নগামী ভারের দ্বারায় বা সূক্ষ্ম ধাতুসূত্রের স্থিতি-স্থাপকতা গুণে। মনুষ্য নিজ হস্তে দম্ দিলে তবে তাহা চালিত হইবে, নচেৎ তাহাদের নিজের ফলোৎপাদনের কোনই ক্ষমতা নাই। মনুষ্য সেই ভারি পদার্থে এবং ধাতুসূত্রে যে পরিমিত শক্তিটুকু অর্পণ করে, তাহা আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ঘর্ষণে এবং দোলকের দোলন জনিত বায়ু প্রবাহের প্রতিবন্ধকতায় অল্পে অল্পে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং ঘড়ির কলের কোন শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা রহিল না, শুদ্ধ প্রযুক্ত শক্তিটুকুকে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সমভাবে খাটাইতে পারিল মাত্র।

এক প্রকার বন্দুক আছে তাহা ঘনীভূত

বায়ুর সাহায্যে চালিত হয়, তাহাকে বায়ু-বন্দুক বলে। সেই বন্দুকে একটি কক্ষ আছে, air pump দ্বারা এই কক্ষে অধিক পরিমাণে বায়ু ঘন ভূত করা যায়। বন্দুকের চোঙ্ এবং সেই কক্ষ—এই দুয়ের মধ্যস্থিত দ্বার খুলিয়া দিলে, বিস্তৃত হওনাশায় ঘনীভূত বায়ু চোঙে প্রবেশ করিয়া বারুদের ন্যায় সমশক্তিবেগে গুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বায়ু ঘনীভূত করিতে যে শক্তিবল আবশ্যক হইয়াছিল, তদপেক্ষা গুলিতে অর্পিত জীবন্ত শক্তির বল অধিক হইতে পারে না। দেখ, ঘনীভূত বায়ু কোন কার্য্যকারিতা শক্তি উৎপাদন করিতে পারিল না, শুদ্ধ পূর্ব্বার্পিত শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া গুলিতে বেগবল প্রদান করিল মাত্র। মনে করিয়া দেখ, বায়ু ঘনীভূত করিতে অন্যূন ১৫ মিনিট লাগিল, কিন্তু বন্দুক ছুঁড়িলে সেই শক্তি নিমেষের মধ্যে ব্যয় হইয়া গেল। অতি অল্প সময়ে অতটা শক্তি ব্যয়িত হইল বলিয়া সেই গুলিতে অধিকতর বেগবল প্রদত্ত হইল। শুদ্ধ বাহুবলের নিক্ষেপনে তাহা একেবারে অসম্ভব।

এই কয়টি উদাহরণে দেখা গেল যে, কোন যন্ত্রের কোন শক্তি উৎপাদন করিবার ক্ষমতা নাই। শুদ্ধ, যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি (যথা, প্রপতিত জল, বায়ু, বাহুবল ইত্যাদি) তাহাদের উপর অর্পণ করা হয় তাহাদের সাহায্যেই তাহারা কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। গণিত-যন্ত্র-বিজ্ঞানপ্রণালী অনুসরণ করিয়া গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই অবিশ্রান্ত গতি নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল বস্তুর গুরুত্ব, স্থিতিস্থাপকতা এবং তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের চাপ—এই কয়েকটি শক্তিবলের বিষয় অবগত ছিলেন কিন্তু এতদ্ব্যতীত উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ, আকর্ষণী শক্তি, ও রাসায়ণিক শক্তি,—এই যে গুটিকতক প্রাকৃতিক শক্তি কলের কার্য্যের সহিত বহুল উপায়ে সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা তাঁহাদের মস্তকে উদিত হয় নাই। প্রাকৃতিক কার্য্যপ্রণালীতে এমন কিছুই নাই যাহা হইতে কলের কার্য্য উৎপন্ন না হইতে পারে। এখন অবিশ্রান্ত গতির প্রশ্ন উপস্থিত হইল, ইহার নিষ্পত্তি হইতেই আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ণীত হইতেছে।

পূর্ব্বে বায়ু বন্দুকের দৃষ্টান্তে দেখা গেল যে, বেগ-প্রক্ষিপ্ত গুলির কার্য্য বাহুবল দ্বারা সম্পাদিত হইল। সাধারণতঃ যে সকল বন্দুক দেখা যায় তাহার গুলি অন্য উপায়ে প্রক্ষিপ্ত হয়। বন্দুকে বারুদ পূরিয়া দিলে তাহা যে পরিমিত স্থানটুকু অবলম্বন করিয়া থাকে দাহকার্য্য নির্ব্বাহের পর বারুদ বাষ্পীয় আকার ধারণ করিয়া তদধিক স্থান অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং বাহুবলের সাহায্যে অধিক সময়ে যে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল তাহা শুদ্ধ এক বারুদের দাহ হইতেই অতি অল্পায়াসে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল।

জলজাত বাষ্পের পরিব্যাপিনী শক্তি হইতেই বাষ্পীয় কলের গতিবিধি। এখানে এই বাষ্পকে ঘনীভূত করিতে যন্ত্রোদ্ভূত শক্তির সাহায্য আবশ্যক করে না। বাষ্পীয়

TORN PAGES.

কলের অভ্যন্তরে একটি আবদ্ধ কটাহ আছে, উত্তাপ প্রয়োগে সেই কটাহ-মধ্যস্থিত জল বাষ্পে পরিণত হয়। নিরূপিত স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া এই বাষ্পের চাপ অধিকতর বৃদ্ধি হইলেই বাষ্পীয় কলের কার্য্য আরম্ভ হয়। সুতরাং এখানে উত্তাপ সেই যন্ত্রের গতিচালনী শক্তির উৎপাদক। আমরা নানা উপায়ে সেই উত্তাপ প্রাপ্ত হইতে পারি; তন্মধ্য অঙ্গার দাহ হইতে যে উত্তাপ উদ্ভূত হয় তাহাই প্রচলিত।

ক্রমশঃ।

স, প্র, গ।

সম্পাদকের বৈঠক।

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ন জাতি মনে করে, দেহের ভিতর দুইটী আত্মা আছে। নিদ্রার সময় একটী দেহের মধ্যে থাকে, অপরটী স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে যায়। গ্রিনলণ্ডের লোকেরা বলে, দেহ যখন নিদ্রা যায়, আত্মা তখন যথা ইচ্ছা গমন করে। নবজীলণ্ডের লোকেরা বলে, দেহের নিদ্রাবস্থায় আত্মা বেড়াইতে গিয়া যাহা দেখিয়া আসে, তাহার নাম স্বপ্ন। ফিজিদ্বীপের লোকদের মতে জীবন্ত মনুষ্যের আত্মা অন্যের নিদ্রাবস্থায় তাহার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কষ্ট দেয়। বোর্ণিও দ্বীপের লোকেরাও এইরূপ বিশ্বাস করে। দায়াকেরা বলে যে নিদ্রাবস্থায় আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া দেখিতে শুনিতে ও ভ্রমণ করিতে অনত্র যায়। এবং স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায় তাহা প্রকৃতই ঘটে। ভারতবর্ষে কারেণ জাতি ও প্রাচীন পৃথিবীর সভ্য পেরুবিয়নদেরও এই রূপ বিশ্বাস। বাঙ্গালীরা বলে নিদ্রাবস্থায় প্রাণ পুরুষ বেড়াইতে যায়, এবং যাহা দেখে বা করে তাহাই স্বপ্নে দেখা যায়। এই সময়ে প্রাণ-পুরুষ কোন কোন অভাবও মোচন করিয়া লয়। কথিত আছে, এক জনের প্রাণ পুরুষ নিদ্রাবস্থায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের কলসী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সহসা কলসীর মুখের সরা চাপা পড়াতে আর বাহির হইতে পারে নাই, সুতরাং দেহ আর জাগিল না। তখন লোকটী মরিয়াছে বলিয়া বাড়ির সব হাঁড়ি কলসী ফেলিয়া দেওয়া হয়, জলের কলসী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র প্রাণ-পুরুষ মুক্তি পাইয়া ছুটিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। তখন লোকটী জাগিয়া উঠে। সেই অবধি ছিদ্রযুক্ত আবরণ জলের কলসীর উপর চাপা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পেরুর লোকেরা বলে দেহ নিদ্রা যায় আত্মার নিদ্রা নাই। সে অবসর পাইয়া বেড়াইয়া আসে। পশ্চিম আফরিকার জয়ুবান জাতি বলে যে পিতৃ পুরুষগণ নিদ্রাবস্থায় দেহ মধ্যে প্র-

বেশ করিয়া স্বপ্ন যোগে উপদেশ দেয়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়নেরা যদি স্বপ্ন দেখে কেহ তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করিতেছে তবে জাগিয়া উঠিয়া বাঁধিয়া প্রহার করিবার জন্য আত্মীয়দিগকে অনুরোধ করে। যাডাগাস্কারের লোকেরা বলে যে নিদ্রাবস্থায় হিতৈষী প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ দেয়। দক্ষিণ আফরিকার মঙ্গঞ্জ জাতি যদি স্বপ্ন দেখে কোন পূর্ব্ব পুরুষ তাহাকে তাড়া করিয়াছে তবে তাহার সন্তুষ্টির জন্য বলিদান করিয়া থাকে। বাসুট জাতিরও এই রীতি। টঙ্গানেরা বলে সাধারণ লোকের আত্মা দেহের সহিত মরিয়া যায়। কিন্তু প্রধান-লোকদিগের আত্মা বাঁচিয়া থাকে এবং স্বপ্নে দেখা দিয়া পুরোহিত, কুটুম্ব বা অন্যান্য-লোকদিগকে উপদেশ দেয়। নাসাসন জাতি কিছু ভবিষ্যত কথা জানিতে হইলে পিতৃ পুরুষের কবর পার্শ্বে স্বপ্নাদেশের জন্য উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকে। ইরিকোয়া, চিপোয়া, মালাগাজি, বোর্ণিকা, কাফির, সাণ্ডুইচ, টাহিটী, ও কোঙ্গো দেশের লোকেরও এই বিশ্বাস। স্বপ্ন দেখিয়া যদি কেহ উঠিয়া বেড়ায় আমাদের দেশে বলে তাহাকে "নিশি" ডাকিয়াছে। অষ্ট্রেলীয়দিগের মধ্যে যদি কেহ স্বপ্ন দেখে কেহ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে সে জাগিয়া উঠিয়া একখণ্ড জলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দেয়। কারণ প্রেতাত্মা অগ্নির জন্য আসিয়াছিল অগ্নি পাইলেই চলিয়া যাইবে। তাহারা বলে যে ফোইন নামে এক প্রকার ভূত মানুষের বেশে মানুষের মত গায়ে চিত্র করিয়া বেড়াইতে থাকে এবং নিদ্রিত দেখিলে কখন কখন লইয়া পলায়। অভাগার বন্ধু বান্ধবে যদি চিৎকার করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয় তখন ভূত তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। ফিজিয়ানেরা মনে করে যদি কেহ মূর্চ্ছা যায় বা মরিয়া যায় সাধ্য সাধনা করিলে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিতে পারে। উত্তর গিনির নিগ্রোরা বলে যে অকালে আত্মা চলিয়া গেলে মানুষ বৃদ্ধ হয়। আরাগণের অসভ্যরা বলে আত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া যায় তখন শীঘ্র শীঘ্র ওঝা ডাকাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত করা উচিত নতুবা মানুষটী মরিয়া যাইতে পারে। তির্ব্বত ও তাতার দেশে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ প্রস্থানের পর আত্মাকে ধরিয়া দেয়। কাহারও ইন্দ্রিয় বা স্মৃতি শক্তি শিথিল হইলে তাহারা মনে করে কোন দৈত্য তাহার আত্মাকে চুরি করিয়া থাকিবে। তখন লামা আসিয়া ভূত ছাড়াইতে থাকে। তাহাতেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে পীড়িত ব্যক্তিকে ভাল কাপড় পরাইয়া তাহার সঞ্চিত ধন রত্ন নিকটে দিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখে। তখন আত্মীয়গণ তাহার বাড়ীর চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে এবং নাম ধরিয়া আত্মাকে সাদরে ডাকিতে থাকে। লামা সেই সময় শাস্ত্র খুলিয়া নরক যন্ত্রণা বর্ণনা করিতে থাকে। এইরূপ করিলে আত্মা না ফিরিয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মদেশে কিরাত জাতির কেহ পীড়িত হইলে তাহার আত্মীয়গণ

TORN PAGES.

পলায়মান আত্মাকে ধরিতে ছুটাছুটি করে। তাহারা বলে আত্মা বেড়াইতে গিয়া যদি ধরা পড়িয়া আর না ফিরিতে পারে তবেই লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহাদের চিকিৎসকেরা যদি চেষ্টা করিয়া পূর্ব্ব আত্মাকে ফিরিয়া না আনিতে পারে তবে কোন জীবিত মানুষের আত্মা আনিয়া মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া দেয় কিন্তু যাহার আত্মা ধরিয়া আনে সে মরিয়া যায়। চীন দেশে পলায়িত আত্মাকে ধরিয়া আনিবার আর এক প্রকার উপায় আছে। তাহারা মৃত ব্যক্তির একটী জামা ও একটী শ্বেত বর্ণের মুরগী বাঁশে বাঁধিয়া আকাশে উড়াইতে থাকে। কিছু ক্ষণ পরে বাঁশ আস্তে আস্তে ঘুরিয়া আসিলে বুঝিতে হইবে পলায়িত আত্মা জামার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কোন কোন জাতি ছায়াকে আত্মা বলিয়া মনে করে। ফিজিরা বলে মানুষের দুইটী আত্মা। প্রথম ছায়া—ইহা কৃষ্ণবর্ণ—মৃত্যুর পরে ইহা নরকে যায়। অপরটী প্রতিবিম্ব। নদী জলে বা দর্পণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ যেখানে মরে দ্বিতীয় আত্মা সেখানে বাস করে। উত্তর আমেকার ইণ্ডিয়নেরা ছায়াকে মনুষ্যের জীবন বা আত্মা বলিয়া মনে করে। বাসুটোরা নদী পার হইবার সময় নদীজলে ছায়া পড়িতে দেয় না। কারণ কুম্ভীর ছায়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। ফিজি, উত্তর আমেরিকার আলগণকিন জাতি এবং ব্রহ্মদেশীয় কিরাত জাতি মনে করে মনুষ্যের দুইটি আত্মা। গ্রীক ও চিনাদিগের মতে তিনটি এবং দাকোটা জাতির মতে মনুষ্যের চারিটী আত্মা। মনুষ্যজাতিই আত্মার একমাত্র অধিকারী নহে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়নেরা রেট্‌ল্ স্নেক্ নামক অতি ভীষণ সর্পকে স্বর্গীয় দূত বলিয়া মনে করে। ইণ্ডিয়নেরা ভালুককে ও কাফ্রিরা হাতীকে বধ করিবার সময় তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারা জাতি কোন কোন জীব বধ করিলে আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে একবার তাড়া করে তাহা হইলে হত্যাকারীর উপর সেই জন্তুর আত্মার ক্রোধ শান্তি হয়। যেসো নিবাসী আইনো জাতি ভালুক মারিলে তাহার মৃতদেহ পূজা ও প্রণাম করে। কারিওকেরা ভালুক কি ব্যাঘ্র মারিলে তাহার চর্ম্ম আত্মীয় একজনকে পরাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দেব সমাদরে নৃত্য করে এবং বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং বলে তাহারা এমন অন্যায় কাজ করে নাই তাহাদের শত্রু রুসিয়ানেরা করিয়া থাকিবে। মৃতদেহ কাটিবার সময় তাহারা রুস দেশ নির্ম্মিত ছুরি ব্যবহার করে। গোলবি ও ডায়কজাতি ভালুক কি কুম্ভীর মারিলে মৃতদেহকে রাজা প্রভু পিতামহ প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করে। সোসাইটী দ্বীপের লোকেরা মানুষের ন্যায় জন্তু ও উদ্ভিদের আত্মা আছে বলে। ডায়কেরা এবং ব্রহ্মদেশের লোকেরা বলে ধানগাছের আত্মা আছে ধানগাছ শুকাইলে তাহার আত্মা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কারেণেরা এইরূপ মন্ত্র বলে—"এস ধানের আত্মা এস, মাঠে এস, ধানগাছে এস, পশ্চিম থেকে এস পাখীর ঠোঁট, বানরের মুখ, আর হাতীর

কণ্ঠা হইতে এস যাহার গোলায় থাক এস" ইত্যাদি। কোন কোন জাতি নূতন পদার্থেরও আত্মা আছে বলিয়া মনে করে। বাঙ্গালি বালকেরা দোয়াতে কালি ফুরাইলে আর কাহারও দোয়াত হইতে আনিবার জন্য কালির নাম করিয়া ডাকে। পাছে পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করে এই ভয়ে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়নেরা দুইখান জাল একত্র ফেলে না। এবং যে বর্শিতে একবার মাছ ধরে এক মুঠা বর্শি অপেক্ষা তাহাকে অধিক মূল্যবান মনে করে। কাপ্তেন লিয়ন সাহেবের বাজাইবার একটী বড় অর্গন ও একটী ছোট বাক্স ছিল। এস্কিমো জাতিরা ছোট বাক্সটীকে বড় অর্গানের সন্তান বলিয়া মনে করিত। বুশমানেরা চাপমান সাহেবের বড় গাড়ীকে ছোট গাড়ীর মা বলিত। কুক সাহেব টাহিটী দ্বীপের লোকদিগকে কয়েকটী পেরেক দিয়াছিলেন, তাহারা সেই গুলি মাটীতে বপন করিয়াছিল। ইহারা বলে পাথরের আত্মা আছে, এবং পাথর ভাঙ্গিয়া গেলে বলে তাহার আত্মা স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। টঙ্গানেরা বলে কুড়ুল কি বাটালি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাদের আত্মা দেবতাদের কার্য্য করিতে চলিয়া যায়। ইহাদের মতে ঘরেরও আত্মা আছে। মোহক জাতি হ্রদের এবং হিন্দুরা নদী পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির আত্মা আছে বলিয়া মনে করে। পাথর ভাঙ্গিলে ইহারা গঙ্গা জলে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে এবং নূতন গৃহে প্রবেশ সময় গৃহের আত্মার পূজা করিয়া থাকে। আদিম নিবাসীদিগের ধর্ম্মমত আলোচনা করিবার সময় আমরা আত্মা ও প্রেতাত্মার আকার প্রকার, বেশভূষা, খাদ্য ও বাসস্থান সম্বন্ধে অসভ্যদিগের বিশ্বাস সবিস্তর বর্ণনা করিব।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমালোচক কাব্য। মূল্য এক আনা। সমালোচনা স্থলে ভারতী বর্ত্তমান গ্রন্থকারের কোন একটি কাব্যকে ভাল বলেন নাই, এই অপরাধে ভারতীকে আক্রমণ করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যখানি পড়িয়া তাঁহার পূর্ব্বতন গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের মতের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। এই লেখার দরুণ পাঠকদিগের নিকটেও যে তাঁহার পূর্ব্বগ্রন্থের বিশেষ আদর বাড়িবে, তাহাও নহে। তবে লিখিয়া ফল কি হইল? লেখক কি মনে মনে বড় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন? তবে তাহাই করুন, তাহাতে আমরা ব্যাঘাত দিব না। কথাটা এই যে, নিজের লেখা ভাল বলিয়া লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে পারে, তাহা লইয়া কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিবে না, কিন্তু সমালোচকেরও যে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া যাইবে এরূপ আশা করাটা কিছু অতিরিক্ত হয়। আমাদের মতে অনর্থক গালিমন্দ দেওয়া বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সমালোচকের কর্ত্তব্য কাজ নহে, কিন্তু যে সমালোচক কোন প্রকার অভদ্রতাচরণ না করিয়া শুদ্ধ মাত্র নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত লেখকের ঝগড়া করা ভাল দেখায় না। সমালোচকের কাজটা দেখিতেছি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বনের মহিষ তাড়ান, মাঝে মাঝে গুঁতাটাও খাইতে হয়।

তৃণপুঞ্জ। শ্রী জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। মূল্য আট আনা। ইহা একখানি কাব্য গ্রন্থ। মনে হয় যেন, ইহার অনেক

TORN PAGES.

গুলি কবিতাতে লেখকের যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন; তাহার একটা বিশেষ ভাব নাই, একটা দাঁড়াইবার স্থান নাই, একটা উদ্দেশ্য নাই—অথচ তাহার একটা নাম আছে ও তাহার সহিত মিল বা অমিল বিশিষ্ট, বাঙ্গলায় বা বিকৃত বাঙ্গালায় লিখিত কয়েকটি ছত্র সংলগ্ন আছে। তবে, স্থানে স্থানে কবিত্বের রেখা পড়ে, কিন্তু আবার তখনি মুছিয়া যায়—কবিত্বে সমস্ত ছত্র গুলি ভরিয়া উঠে না, কঠিন ও বিকৃত ভাষার উৎপীড়নে ও ভাবের অভাবে কল্পনা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। লেখক অনেক স্থলে ইংরাজি ভাব বাঙ্গালায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দোষের কথা নহে, কিন্তু তিনি ইংরাজিকে বাঙ্গালা করিতে পারেন নাই, মাঝের হইতে বাঙ্গালাকে কেমন ইংরাজি করিয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থ পড়িয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, লেখক বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত এখনো তাঁহার ভাবের প্রবাহ উন্মুক্ত হয় নাই, এখনো তিনি প্রতিকূল ভাষাকে আপনার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন নাই, ভাষা তাঁহাকে অপরিচিত দেখিয়া তাঁহার ভাবগুলির প্রতি ভালরূপ আতিথ্য-সৎকার করিতেছে না। দেখা যাউক ভবিষ্যতে কি হয়।

শান্তি-কুসুম। শ্রী বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বিষয়টা কিছুই নহে, লিখিবার যোগ্যই নয়। বোধ করি গ্রন্থখানি ব্যক্তিবিশেষের জন্য লিখিত, সাধারণের জন্য লেখা হয় নাই। সুতরাং এগ্রন্থ সমালোচনা করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, লেখাটি বড় ভাল হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষাটি অবিকল বজায় আছে। আধুনিক গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে এ গ্রন্থখানি সহসা পড়িলে ইহার ভাষা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু ইহার আর কোন গুণ নাই।

সুর সভা। শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য দুই আনা।

কৈলাস-কুসুম। " " " "

মণি মন্দির। "মূল্য তিন আনা।

পার্থ প্রসাদন। " " " "

প্রমীলা পুরী। " মূল্য এক আনা।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি ব্যতীত আর সকল গুলিই গীতিনাট্য। গীতিনাট্যের যথার্থ সমালোচনা সম্ভবে না, কারণ গীতগুলি কেবলমাত্র পড়িয়া সমালোচনা করা যায় না। গান লিখিবার সময় কবিত্ব কিছু না কিছু হাতে রাখিয়া চলিতে হয়, সমস্তটা প্রকাশ করা যায় না, কারণ তাহা হইলে সুরের জন্য আর কিছুই স্থান থাকে না। গানের লেখাতে কবিত্বের যে কোরকটুকুমাত্র দেখা যায় সুরেতে তাহাকেই বিকশিত করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত সকল সময় গান পাঠ করা বিড়ম্বনা। তথাপি বলিতে পারি, এই গীতিনাট্য গুলির স্থানে স্থানে ভাল ভাল গান আছে। মণিমন্দিরের গানগুলিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে।

ষড়ঋতুবর্ণন কাব্য। শ্রী আশুতোষ ঘোষ প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা। গ্রন্থকার লিখিতেছেন "বহু দিবস হইতে আমার ইচ্ছা ছিল যে, পদ্যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিব; অধুনা অনেক কষ্টে দুরাশাগ্রস্ত হইয়া অমিত্রাক্ষর চতুর্দ্দশপদী ষড় ঋতু বর্ণন নামক কাব্য খানি রচনা করিয়া মহানুভাব পাঠক মহাশয়গণের করকমলে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।" গ্রন্থকর্ত্তার এতদিনকার এত আশার গ্রন্থ খানিকে ভাল না বলিলে তিনি মনে আঘাত পাইবেন সন্দেহ নাই—কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধ পালন করিতে হইলে এ গ্রন্থখানিকে কোন মতেই সুখ্যাতি করিতে পারি না।

TORN PAGES.